তাসিলার মেয়র

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
স্টল নং—৪৩
ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া * নোনাচন্দনপুকুর

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলকাতা-৭০০০৬

তাসিলার মেয়র

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

তাসিলার জং, অথবা সংক্ষেপে তাসিলাকে শহরই বলতে হবে। একটা জং অর্থাৎ দুর্গও ছিল এক সময়ে। চুনাপাথরের ভঙ্গুর এক ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায় এক টিলায়। গল্প এই, এটা কোন লা, অর্থাৎ গিরিপথের, সঙ্গে যুক্ত, যে পথে তাসি নামে কেউ কখনো অভিযান করেছিল।

শহরের উচ্চতা আড়াই থেকে তিন হাজার ফিট। লোকসংখ্যা হাজার, বারোশো হবে। যদি শহরের উপান্ত অর্থাৎ বনে ডুবে থাকা বস্তিগুলোকে যোগ করে নিই, সংখ্যাটা কিছু বাড়ে। একে শহর বলার যুক্তি এই : গ্রাম বলতে আমাদের মনে চাষের জমি, কৃষক-কুটির, মেটে রাস্তা ইত্যাদি ভেসে ওঠে, তা এখানে কোথাও নেই। কিছু কিছু পাথর, সিমেন্ট, কংক্রিটের বাড়ি ; অল্পবিত্তদের বাড়িও, পাথর বা কাঠের মেঝে, কাঠের দেয়াল, ছাদ প্রায়ই টিন, যদি বা দু-একক্ষেত্রে খড়েরও হয়। রাস্তা তো পাথরেরই, দুটো রাস্তায় পিচও আছে। উপরন্তু, অন্তত কোন কোন অঞ্চলে লোহা ও বাঁশের নলে জল সরবরাহ হয়। তখন বুঝতে হবে, ক্ষুদে এক পাম্পিং স্টেশন আছে। সেই পাম্প হাউসে ট্র্যান্সফর্মার আছে। জাকিগঞ্জে যে ছোট হাইড্যাল পাওয়ার হাউস সেখান থেকে বিদ্যুৎ আসে। বিদ্যুৎ শহরের একাংশেই মাত্র আছে—যাকে ফরেস্টকলোনি বলে। ফরেস্টকলোনির বাইরে শুধু পোস্টঅফিসেই বিদ্যুৎ আছে। ইচ্ছা করলেই অন্যেরা বিদ্যুৎ নিতে পারে না। কারণ এসবই ফরেস্টের বন্দোবস্ত। এসব সম্বন্ধে আরো জানা যায়, এখানকার পোস্টমাস্টারের সঙ্গে কথা বললে। ভদ্রলোক এখানে আট-নমাস হল এসেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক গবেষণা করেছে তাসিলা নিয়ে। তার মতে তাসি কারো নাম নয়। তাসিলা অর্থে পবিত্র গিরিপথ বোঝায়।

শহরের যে বাংলোয় মেয়র আছে তা অবশ্যই সুদৃশ্য। তাকে এক নম্বর বাংলো, কখনো ভি আই পি বাংলোও বলা হয়। দশ-পনের কাঠা মাপের এক উপত্যকার মাথায় সাদা দেয়ালের, গোলাপি টিনের ছাদের সেই বাংলোর দরজা জানালাগুলো বড় বড় আর কাচের শার্সিযুক্ত হওয়ায় দিনের আলোয় ঝকমক করে। এটা নিশ্চয় তাসিলার সেই অল্পসংখ্যক বাড়িগুলোর একটি যেখানে ইলেকট্রিসিটি আছে। ফলে রাতে তাসিলায় যখন সামুদ্রিক নীল অন্ধকার, তখন দূর থেকে এটাকে এক প্রকাণ্ড রত্নের মতো দেখায়। বিশেষ সেই সব রাতে যখন ভি আই পি কেউ, যেমন ডিএফও বলিন বসু এসেছিল, অথবা সে সব রাতেও, যখন প্রভঞ্জন রেঞ্জার বাংলোর খেলার ঘরে আলোর নিচে টেবিল টেনিস খেলে। সে খেলায় মেয়রও যোগ দেয় ভালো খেলোয়াড় হিসাবে।

এখানকার রাতের অন্ধকারের কথা উঠেছে। সব পাহাড়ি শহরে এরকম হয় কিনা, জানা নেই। এখানে রাতে কুয়াশা নামে। কাজেই কৃষ্ণপক্ষের রাতে সামান্য কৃত্রিম ভাবে আলোকিত অংশটুকুর দিকে চারদিক থেকে জোনাকি-জ্বলা অন্ধকার, পাহাড়ী বন যেন এগিয়ে আসে, ঘিরে ধরে। জোনাকিগুলো অবশ্যই পাহাড়ের গায়ে সাজানো বাড়িগুলোর জানালাদরজার আলো। এখানে, অবশ্যই, শুক্লপক্ষের রাতও আসে। তখন চারদিকের পাহাড়গুলো বন-সমেত দূরে চলে যায়। আর

তখন যা কিছু দৃশ্য তা অবশ্যই অলৌকিক।

যাক, সেই এক নম্বর বাংলোয় শহরের একমাত্র ক্লাব বা খেলার ঘরের কথা বলছিলাম। তেমনি শহরের একমাত্র লাইব্রেরিও সেই বাড়িতে। দেড়হাজার মানুষের সেই ক্ষুদে শহরে ক্লাব বা লাইব্রেরি স্থাপনের মূলে কারো না কারো উদ্যোগ দরকার হয়। খেলার ঘর বা ক্লাব প্রভঞ্জন রেঞ্জারের উৎসাহে। টেবল টেনিসের টেবল সেই যোগাড় করেছে। আর তাস খেলার টেবল চেয়ারও। লাইব্রেরিটা হয়েছে বলিন বসুর স্ত্রী রিনি বসুব সৌজন্যে। মাস ছয়েক আগে, রিনি বসু এই বাংলোয় এক সপ্তাহ কাটিয়েছিল। তখন লাইব্রেরিটার অলিখিত সংবিধান তৈরি হয়েছে। সে অনুপ্রেরণা, অবশ্য, আরো আগেকার এক আর্মি অফিসার থেকে, যে যাটের দশকে কী এক জরিপের কাজে এসে এই বাংলোয় কিছুদিন ছিল। সে হয়তো বইয়ের জন্য কষ্ট পেয়ে থাকবে। যাওয়ার সময়ে সে তার পেপারব্যাক বইগুলোকে এখানে রেখে যায়। তার একটার ফ্লাইলিফে এরকম লিখেও গিয়েছিল : আপনার যদি এখানকার অবস্থান প্রীতিপ্রদ হয়ে থাকে, তবে আপনার বইগুলো আপনার পরে যে আসবে তার জন্য রেখে যাবেন। রিনি বসু হঠাৎ লেখাটাকে আবিষ্কার করে। সুতরাং সে তার নিজের সঙ্গে আনা খান দশেক বই, যার বেশিরভাগ পেপারব্যাক, সে সব তো রেখে গিয়েছিলই, উপরন্তু মেয়র ও প্রভঞ্জনকে বলেছিল, এখন থেকে এই নিয়ম থাকবে, বই পড়া হলে, তা স্পেয়ার করার মতো হলে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হবে। রিনি সমতল থেকে আরও বই পাঠিয়েছে। প্রভঞ্জনের বই পড়া আর কেনার অভ্যাস আছে, প্রায়ই তা দর্শন আর মনস্তত্বের–তার কিছু কিছু এখানে এসেছে। পোস্টমাস্টার কিছু পুরনো পূজাসংখ্যা, বাংলা পত্রিকা পাঠিয়েছে। পোস্টমাস্টার, যার নাম মুরলীধর বসু। তার স্ত্রী সুচেতনা অল্পবয়সী ও কলকাতার মেয়ে হওয়ায় পূজাসংখ্যা একাধিক না কিনে পারে না। তাসিলার যে কেউ এখানে এসে পড়তে পারে। কে পড়ছে?

রিনি বসুর তাসিলায় আসা অন্যভাবেও মূল্যবান। সব শহরের, তা সে যতই ছোট হোক, সব মেয়রের, যতই সে সাধারণ হোক, ভাগ্যে এমন ঘটে, যার পর সেই শহরকে আর আগের মতো অগণনীয় মনে হয় না, তার সেই সাধারণ মেয়র গল্প করার মতো বিষয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাসিলার মানুষের কাছে রিনিই প্রথম দেখিয়েছিল, সেই ছোট্ট শহরে মেয়র আছে, আর সে মেয়রের গুরুত্বও আছে।

রিনি বসু এই শহরের শুধু নয়, এই অঞ্চলের সব চাইতে গুণবতী ও সুন্দরী মহিলা। সে বলিন বসুর স্ত্রী। আর বলিন বসু তাসিলা ফরেস্ট ডিভিশনের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। যারা বনাঞ্চলে থাকে না, তাদের পক্ষে ডিএফও সম্বন্ধে ঠিক ধারণাটা হয় না। ডিএফও-র এই বনাঞ্চলে আধুনিক পোশাক পরা এক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আছে। আর তা থাকা প্রয়োজনের। যে ক্ষেত্রে মাইলের পরে মাইল বিস্তৃত বনভূমিতে একটা ম্যাজিস্ট্রেট নেই, পুলিশ চৌকি নেই, নিকটবর্তী থানা ত্রিশ মাইল দূরে, সেখানে কাউকে না কাউকে থাকতে হয়, যার আদেশ মানা হবে।

তরুণ ডিএফও চলেছিল নানা ফরেস্ট রেঞ্জ পরিদর্শনে। রিনি তার সঙ্গে তাসিলা পর্যন্ত এসেছিল। তার মতো ভিআইপি আর কে? সে মেয়রের এই এক নম্বর বাংলোয় দশ দিন ছিল। স্বভাবতই মেয়রই তার সঙ্গী ছিল সেই দশ দিন। শুধু বাংলোর ভিতরে লাউঞ্জে, ড্রয়িংরুমে, খাবার টেবলে নয়। কখনও সুদৃশ্য সেই গাড়িতে, অনেক সময়ে পায়ে হেঁটে, সুবেশিনী সেই সুন্দরীপ্রধানা তাসিলার বাঁধানো পথে, পাকদণ্ডিতে, ছোট ছোট টিলায় ক্লাইম্ব করে বেড়াতে ভালোবাসতো। সঙ্গী মেয়র। প্রকৃতপক্ষে তাসিলার জনসাধারণ তখনই প্রথম, সে যে মেয়র তা জেনেছিল, বুঝতে পেরেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই বিস্মিত আনন্দে তারা অনুভব করেছিল, তাদের শহরে একজন সুন্দর আধুনিক মেয়র আছে, যে মেমসাহেবের সঙ্গী হলে একদম মানিয়ে যায়। তার আগে যারা একজন লম্বা মানুষকে সবজে খাকি পোশাকে, পিঠে রাইফেল, কোমরে ঝোলানো টর্চ, কচিৎ দেখে থাকবে এক

বনে ঢাকা রিজ থেকে অন্য বনে ঢাকা রিজে চলে যেতে, যাকে কাছে যাওযাব মতো পবিচিত মনে হয় নি। কেউ কেউ বলে, লাজুক চেহারার একজন ফরেস্ট কর্মচারীকে তারা দেখেছে এ বাড়িতে সে বাড়িতে, জঙ্গলের আড়ালের সেই সব খড়ের বাড়িতে বসে চা, ছাং খেতে খেতে, জলের আর জমির দু টাকা তেত্রিশ পয়সা খাজনা আদায় করতে গিয়ে বসে, খাজনাব কথা ভুলে গল্প করতে করতে একসময়ে উঠে যায়।

মেয়র বাংলোর টিলাটা, যা এক অসমান বাহুর পঞ্চভুজ, অন্য দিকে নানা কোণেব ঢালে চাবিদিকে পাহাড়ি জমিতে মিশেছে ; কিন্তু উত্তর বাহুর যেখানে শেষ সেখানে দশ-পনের ফিট চওড়া, ত্রিশ-চল্লিশ ফিট গভীর একটা ফাটল। যা যেন টিলাকে তাসিলা থেকে কিছু পৃথক করে। ফাটলের উপরে এক সুদৃশ্য রূপা-রঙ লোহার ব্রিজ। ব্রিজের উপরে দাঁড়ালে সেই খাদের তলার যে পাথরগুলো চোখে পড়ে, তার এক কালচে বেগুনি রঙ আছে। হয়তো লোহার জন্য। কিন্তু কারো মনে হতে পাবে, তা ভূগর্ভের উত্তাপে, যা নিশ্চয়ই ভুল। কারণ ত্রিশ-চল্লিশ ফিট নীচে কি পৃথিবীর লিবিডো চোখে পড়ে? তাসিলার পোস্টমাস্টার মুরলীধর বসুই এখানে দাঁড়িয়ে একদিন বলেছিল লিবিডোর কথা। এতে, অবশ্য, মুরলীধরকেই চেনা যায়, খাদটিকে নয়।

বাংলোয় ঢুকতে দরজার পাশে বারান্দার উপরে দাঁড়ালেই ঘোষণাটা চোখে পড়ে, যে টিলাটার উচ্চতা ২৯২৫ ফিট। তাসিলা পাহাড়ের তৃতীয় উচ্চতা। জং অথবা সেই চুনাপাথরের ভঙ্গুর দুর্গ ৩০০০ ফিটের কিছু বেশি। আর সেই খণ্ড একটা বনের মাথায় একটা খণ্ড পাহাড় ; কিংবা তা একটা গোটা পাহাড়ই যার মাঝামাঝি আলম্ব ধ্বসে এক ভাগ মাত্র দাঁড়িয়ে আছে, যার উপরে বাড়িঘর করার কথা কেউ ভাবে না, কারণ তা যেন একটা নরম কিছুর, যেন উই মাটির, যা কোনদিন তার মাথার উপরের বন-সমেত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পাবে। প্রতি বছরই কিছুটা করে ধ্বস নামেই, তার চিহ্ন সব সময়েই চোখে পড়ে। এক কথায়, পাহাড়ে এসে যদি কারো মনে অতি পরিচয়ের অবজ্ঞা আসে, তা হলে সে যেন ওই আধা-পাহাড়ের দিকে চায়। ওটা একটা উপকারী ভয়। তার উচ্চতাও ৩০০০ ফিট।

ব্রিজটা অবশ্যই দর্শনীয়। একদিক দিয়ে তাকে জাহাজের ব্রিজের মতো বলা যায়। মেয়র তার উপরে মাঝে মাঝেই দাঁড়ায়। ব্রিজের উপবে দাঁড়ালে, এদিক ওদিক করে, অনেকগুলো পথের ওঠানামা, পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাক খেয়ে চলা কয়েকটি পথ, সে-সব পথের ধারে বাড়িগুলোর বেশ কয়েকটিকে, দূরের পাহাড় এবং বনের অনেক ছবিকে, দেখতে পাওয়া যায়। ছবিই তো এবং তা অপরূপ।

যেমন উত্তরে ক্লুটলং টিলার একটা পাশ, যেমন উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে যাকে তাসিলার ভাষায় চোর্টেন বা চৈত্য পাহাড় বলা হয়। যদি কাছের গাছপালায় বা মাথার উপরের টিলায় দৃষ্টি ঢাকা না পড়ে, সেই চৈত্যপাহাড়, তাসিলার অনেক জায়গা থেকেই, যেমন ব্রিজে দাঁড়ালে, চোখে পড়ে, আর তখন বোঝা যায় কেন ওটার তেমন নাম। যেন একটা বৌদ্ধস্তূপ যার রঙ এখন ময়ূরকণ্ঠি নীল, যার উপবে এমন কি একটা ছোট খাড়া চুচুক। তা স্তনই যেন, যার নিম্ননাভি, উদর ও শ্রোণি তাসিলা। কিন্তু সব সময়ে নীল থাকে না। ঋতু অনুসারে কুয়াশায়, মেঘে, কখনো নীল-সাদায়, কখনো সাদায়-বেগুনিতে, কখনো নীলে-কালোয় ঢাকা পড়ে। আর যেন সেই শাড়ি-টানা দেখে তাসিলার লোকে বুঝতে পারে, ঋতুসঞ্চার হয় কি না। এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, নাকি ৩৫১৫ ফিট। কিন্তু এতো আলোতে দেখার কথা। অন্ধকারও তো নামে, গাঢ় কুয়াশা আর রাতের অন্ধকার যুক্ত হয়। তখন চৈত্যজননী কালোয় অবগুণ্ঠনে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আবার আলো ফুটলে সস্নেহ প্রশান্তি দেখা দেয়, কিন্তু জননীর সেই নিস্পৃহ কঠোরতার কথা সবটুকু ভোলা যায় না।

এই পাহাড় এক দেবতা, যা, পোস্টমাস্টারের মতে, শুধু এখানেই আছে, অন্য কোথাও নেই।

তাও সকলের পক্ষে নয়, তাসিলার মানুষদের নিমজ্জিত একটা অংশের। এই তাসিলায়, তার মতে, আর সে তার মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে কলকাতার এক দৈনিক পত্রিকায় অন্তত একটি প্রবন্ধ লিখেছে, নাকি তিন স্তরের মানুষ আছে-- যারা এখানে প্রবাসী এবং যাদের অন্যত্র দেশ আছে , যাদের অন্য কোথাও দেশ থাকার গল্প থাকলেও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ দুপুরুষ ধরে যারা এই পাহাড়ে ; আর সব চাইতে নিচে তারা হয়তো দু-একশো বছর থেকে পুরুষানুক্রমে এটাকেই পৃথিবী মনে করে। এই শেষ শ্রেণীর লোকের কাছে এই পাহাড়-দেবতার নাম চৈত্য-জননী। পোস্টমাস্টার প্রবন্ধে লেখার চেষ্টা করেছে, যে বৌদ্ধধর্মের কোনো এক অধঃপতিত পর্যায়কে তারা বুদ্ধির সাহায্যে গ্রহণ করলেও, অনুভূতির দিক দিয়ে, যা বুদ্ধির তুলনায় গভীর এবং আদিম, এই যৌন প্রতীককেই বেশি মূল্য দিয়ে আবেগের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছে।

২

এখন সকাল আটটা হবে। মেয়র বাংলো থেকে বেরিয়ে রোদকে অনুসরণ করে ব্রিজটার উপরে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ চৈত্য-পাহাড়ের গিয়ে পড়ল। সে খুশি হয়ে উঠল।

মেয়র পঁচিশ-ছাব্বিশের এক যুবকই সকলের চোখে। কিন্তু কখনো যদি তাকে বেশ শিথিল মনে থাকতে দেখা যায়, যার সম্ভাবনা খুবই কম, বুঝতে পারা যায় সে প্রকৃতপক্ষে একুশ ছাড়ায়নি। তাকে পঁচিশ-ছাব্বিশ দেখানোর কারণ প্রথম, তার অসাধারণ উচ্চতা যা ছ-ফিটের উপরে ; দ্বিতীয়ত, তার মুখের উপরে ছড়ানো একটি তাপদগ্ধ কর্কশতা যা শীতের বাতাস লেগে হতে পারে ; তৃতীয়, তার গোঁফ যা ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নেমে চিবুক ছাড়িয়ে ঝুলতে চাইছে, তিন সপ্তাহের দাড়িও যেন ইতিমধ্যে কুড়ি-একুশের তাজা ভাব হারিয়ে সন্দিগ্ধ, অভিজ্ঞ, সতর্ক।

মেয়রের পরনে লেবুহলুদ পাজামা, রক্তলাল কামিজ। পায়ে স্যান্ডাল। কিন্তু ডান হাতে লম্বা একটা বাঁশের লাঠি ওক রঙের। বুকের কাছে জামার আড়াল থেকে একটা সোনার মজবুত চেন চিকচিক করছে। বাঁ হাতের আঙুলে সেই সোনার হার নিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে খেলছে, ফলে তার লকেট হিসাবে জেডের সুদৃশ্য ক্রসটা চোখে পড়ছে। লাঠিটাও তার হাতে নতুন দেখা যাচ্ছে। মাটিতে লাঠি ঠুকে চলা দেখে, এবং সতর্কভাবে পা ফেলা দেখে অনুমান হয়, পায়ে কোথাও ব্যথা থাকতে পারে।

অনুমান যথার্থ। একটা অ্যাকসিডেন্টের ফলে সে শয্যাশায়ী ছিল। আজই প্রথম বাংলোর বাইরে ব্রিজ পর্যন্ত এসেছে। পাজামার আড়ালে বাঁ পায়ে পুরু প্লাস্টারে শ্লীপদ সে। গায়ে রোদ পড়ছে। সে ব্রিজের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দৃশ্য সব দিকেই পরিচিত, তা হলেও, শেষ রাতের হালকা বৃষ্টিতে মুখ ধোয়ার ফলে তা তার তাজা লাগল। পথগুলো চোখে পড়ল, যার উপরে মানুষ চলাচল করছে। মেয়ে, পুরুষ, দল বেঁধে, ছাড়াছাড়ি, আরোহী-ছাড়া একটা খচ্চর। বোকু, প্যান্ট, পাহাড়ী চোগা, নেপালী টুপি, বাটিমার্কা ভুটিয়া তা ; এতদূর থেকে লোকগুলো অকার হলুদ, পোশাকের রঙ কালো-বাদামি থেকে ম্যাটমেটে লাল, কাঁচা-হলুদ, ময়লা-সাদা। সে দেখলে, পিচের পথের অনেকটা উপরে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝাঁকড়া-লোম গরু তাড়িয়ে নিয়ে উঠছে এক ছোকরা। সে জানে, ওটা একটা অপ্রধান পথ যা এঁকে বেঁকে উঠে জঙ্গলে ঢুকেছে, যার আড়ালে দু-একটা এক-দুই ঘরের বাড়ি থাকবে।

একটা মাদার গাছ যার লাল লাল ফুল প্রদীপশিখার সারি যেন। তার নীচে ছোট ঘরটা ধোবিখানা, যার এক পাশে, সে জানে, একটা চায়ের দোকানও আছে। আরে, ওটা যে গুমছে। দোকানটার

কিছু উপরে পোস্ট অফিসের কাছাকাছি ব্যাগ পিঠে উঠছে গুমছে ভুটিয়া, যে ডাকের রানার। তাকে, অবশ্য, গুমছে বলে চেনা যাচ্ছে না, কারণ তাকে তো মাত্র এক-দেড় হাত উঁচু দেখাচ্ছে, ব্যাগ থেকে আন্দাজ হয়।

মেয়র ভাবল, তার এই অ্যাকসিডেন্টটা এখন আর ভয়ের নয়, ব্যথাও নেই। ব্যথাটাকে পার হয়ে এসেছে সে, এখন তা নিয়ে হাসতে পারে। এক সময়ে ভুলেই যাবে। কিন্তু এই অ্যাকসিডেন্টটা হয়তো এমন কিছু, যা জীবনের একটা নতুন পরিচ্ছেদের আরম্ভ, যেন এক নভেলের নতুন এক খণ্ডের সূচনা। কে বলছিল যেন? পোস্টমাস্টার? মেয়র হাসল।

সে দু-এক পা হেঁটে সরে দাঁড়াল। কিন্তু কিছু ভাবার আগে, সে দেখতে পেলে ফোর্টের নিচে যে খেলার মাঠ, তা পার হয়ে কয়েকজন পাকদণ্ডি দিয়ে গিরিশিরায় উঠছে, যার কাঁধের পথটা পোস্টঅফিসের দিকে যেতে তার রিজের বাইরে প্রান্তটাকে ছুঁয়ে যায়।

রিনি এমন একজন, যার কথা একবার উঠলে সহজে অন্য দিকে যাওয়া যায় না। মেয়রও তার কথা না ভেবে পারে না। মেয়রের ভাবনাতেও সে এসে গেল।

বলিন তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে এই বাংলোয় দুদিন ছিল, আর তা তাসিলারেঞ্জ পরিদর্শন করতে। তার পর রিনিকে রেখে সে তার পনিতে চড়ে উধাও হয়েছিল। এখন জানা যাচ্ছে, সে নুমপাই গিয়েছিল সেখানে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করতে। তার একটা কারণও ছিল, অন্তত বলিনের কাছে।

নুমপাইও একটা ফরেস্টরেঞ্জ। সেটাও পাহাড়। ফরেস্টের বেশির ভাগই পাহাড় জুড়ে। আগে হাতিঘিষা দিয়ে নুমপাই যাওয়ার সহজ পথ ছিল। এক সময়ে ডলোমাইটের খোঁজ পাওয়া গেল। ডলোমাইটের জন্য পাহাড়ে ডিনামাইট মারা শুরু হল। বছর পাঁচেক আগে সে রকম ডিনামাইট করতে গিয়ে এক প্রচণ্ড ধ্বস নেমেছিল। নুমপাই পাহাড়ের দক্ষিণপূর্ব অংশটাই ভেঙে পড়ছিল। একদিনে থামেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে, তিন-চার দিন ধরে চাঁই-পাথর গড়িয়ে পড়তো। এমনকি নাকি এই তাসিলার পাহাড়েও তার কম্পন অনুভব করা যেতো। লোকক্ষয়ও হয়েছিল। নুমপাইয়ের বনে যারা কাজ করতো, তাদের কতজনের মৃত্যু হয়েছিল, তার হিসাব হয় না। ডলোমাইট কনট্রাক্টরের কর্মচারী, কুলিদের বস্তিতে লোক ধ্বসে চাপা পড়েছিল, তা গোপন করা যায়নি। এখন আর হাতিঘিষার পথে নুমপাই যাওয়া যায় না। সেখানে রেঞ্জঅফিস আর কার্যকরী নয়। বলিন নুমপাই পাহাড়কে আবার শাসনে আনতে চায়। সে চেষ্টা করছিল, তাসিলা দিয়ে নুমপাই যাওয়ার কোনো পথ আবিষ্কার করা যায় কি না। তা, তাসিলার দু-এক জায়গা থেকে আকাশের গায়ে নুমপাই পাহাড় চোখে পড়ে বটে, কিন্তু চোখে পড়লেই সে জায়গায় যাওয়ার পথ পাওয়া সহজ কি?

যাক, বলিন বসু সত্যি পথ আবিষ্কার করে, নুমপাই দর্শন শেষ করে, ফিরে এসেছিল। বললে,

কেমন ছিলে, ডারলিং? অবিশ্যি ভালোই থাকবে, সঙ্গী যার এমন সর্বোত্তম।

রিনি তখন ইজিচেয়ারের হাতলে। সে সেই পথ আবিষ্কারের কথা জেনে বললে, আ, ডারলিং, সবটুকু ক্রেডিট একা নিলে!

কিন্তু তখন আদর করার অবসর ছিল না, কারণ দরজার গোড়ায় তার অর্ডারলি ট্রেতে হুইস্কি ইত্যাদি সাজিয়ে আনছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে খবর পেয়ে, এখানকার রেঞ্জ অফিসার, মেয়র প্রভৃতিও উপস্থিত হয়েছিল প্রায় একই সঙ্গে।

বলিন ঘোষণা করলে, কালই আমরা যাচ্ছি।

নারেঙ্গিহাটে পৌঁছে যাবে। আসার
া তো? হ্যাঁ, এখানে একটা পোস্ট-

অফিসও আছে। আজ রাতে পনিদুটো বিশ্রাম করে নিক, কাল সকালে আমরা নামবো।

রেঞ্জ অফিসার আর ডিএফও চাকরির ব্যাপারে তো সংযুক্তই। তারা অফিস সম্বন্ধে আলোচনা করলে।

সেই সূত্রেই ডিএফও বললে, নুমপাইকে আর পৃথক রেঞ্জ রেখে লাভ নেই। তাসিলা রেঞ্জের মধ্যেই তাকে আনলে ভালো হয়। বরং এরকম একটা প্রস্তাব দেয়া যায় যে নুমপাইয়ের জন্য এক ডেপুটি রেঞ্জারের পোস্ট তৈরি করা হোক। কী মনে হয় আপনাব? আমি আসতে আসতে ভাবছিলাম, দুজন বিট অফিসার হলেও হয়। আমি কিছু হরিণ দেখেছি, আর রবার, আর ওক গাছ, মেষ যাদের শিং মোষকে হার মানায়, অন্তত একজোড়া খুবই দুষ্প্রাপ্য, আর সিলভার ফেজ্যান্ট। রক্ষা করা দরকার। ওখানে দাওআর মতো একজন থাকলে, আপনি পারেন না নুমপাইয়ের সুপারভিশান নিতে আপনার রেঞ্জে?

এসবই বলিন এ কয়েকদিন ভেবে ভেবে স্থির করে থাকবে।

রেঞ্জ অফিসার বললে, আমি একবার ভেবে নিয়ে লিখবো। এর পরে মেয়রের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল বলিন। কথা বলার আগে সে মনে মনে হাসল। বললে, তো, মেয়র সেদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করা হয়নি তেমন। বলো, কেমন চলছে তোমার।

(রিনির দিকে ফিরে) জানো, রিনি, এখানে মেয়র হওয়ার এই এক অসুবিধা, যে করপোরেশন নেই, টেবল চাপড়ে বক্তৃতা নেই। তা, ওয়াটার ওয়ার্কস, পাওয়ার হাউস, রোড মেনটেনেন্স, চৌকিদারি এসবের ভার তো মেয়রেরই। কী বলেন, প্রভঞ্জনবাবু, তাই আশা করি না?

রিনি বললে, ডিএফও, তোমাদের এই পকেট শহরে ইলেকট্রিসিটির কিন্তু ভালো বন্দোবস্ত নেই। সন্ধ্যা হতে হতে অন্ধকার নেমে আসে। এরকম চলতে থাকলে মেয়রের নিন্দা হয়। আরো আলো চাই।

বলিন বললে, কেন নিন্দা হবে? না, না, নিন্দা হতে দিচ্ছি না আমরা। (সে হাসল) দেখো, স্মল ইজ বিউটিফুল। যদি বলো, আরো আলো চাই, তা হতে পাবে, যদি ফরেস্টের সব কর্মচারী মিলে ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার জন্য আন্দোলন করে। দেখো, এটাকে এক ট্যুরিস্ট সেন্টারও করা যায় ওই ফোর্টটাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যা বলছিলাম, স্মল ইজ বিউটিফুল। একটা হাজার অধিবাসীর পকেট শহর আর তার মেয়র। ওয়ান ম্যান আর্মি। কী প্রভঞ্জনবাবু, কবিতাটা আপনাকে অ্যাপীল করে না? আর, দেখো, রিনি, কেমন আমাদের মেয়র, হাউ ইয়ং অ্যান্ড টল। দেখো, ইম্পিরিয়ালটাও কেমন সুন্দর নয়?

বলিন তার ট্যুর শেষ করে ফিরে গিয়েছিল। প্রভঞ্জন, অবশ্যই, ইতিপূর্বেই তার অফিসের খাতাপত্র ঘেঁটে জানতে চেষ্টা করেছিল—বর্তমান মেয়রের আগে, অর্থাৎ যখন এই তাসিলা শহর ফরেস্ট বিভাগের পকেট-শহর হয়নি, যখন আর্মি ক্যান্টনমেন্ট, তখনও কে কবে মেয়র ছিল, ছিল কি না। বর্তমান মেয়র হঠাৎ একদিন উপস্থিত হয়েছিল, ডিএফও-র চিঠি নিয়ে। বলো কী? মেয়র! তাসিলার মেয়র? তো, কবিতাটাই প্রভঞ্জনকে তখনই অ্যাপীল করেছিল বৈকি, যদি তাকে কবিতা বলা হয়।

ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে মেয়রের বলিন বসুর কথাও মনে পড়ছে। কাল সন্ধ্যায় যখন পোস্টমাস্টার, রেঞ্জার ও সে বাংলোর খেলার ঘরে তাস খেলতে বসেছিল, তখন বলিন আর দাওআকে নিয়ে আলাপ শুরু হল। গল্প জমার কথাই। পোস্টমাস্টারের চরিত্রের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য, বোধহয়, কৌতূহল, যা তাকে গবেষণার দিকে ঠেলতে থাকে। রেঞ্জার প্রভঞ্জন দত্ত, তার নিজের কথার, যাদের বনে বনে ঘুরতে হয়, তারা রোজ কথা বলার মানুষ পায় না, পেলে একটু গ্যারুলাস হয়ে পড়ে।

কাল রেঞ্জার বলেছিল, এতদিনে দাওআ সত্যিই নুমপাই যাচ্ছে। তুমি কি দাওআকে চেনো, মেয়র? একটু থেমে বলেছিল, দাওআ ছাড়া আর কেউই রাজি হত না নো-হোয়ারে যেতে, যদিও এটা দাওআর একটা প্রমোশন। সে একটা উপত্যকা, কিন্তু সব চাইতে কাছের লোকালয়, এখন হাতিঘিষার পথ বন্ধ হওয়াতে, এই তাসিলা থেকে অসমান চড়াই-উৎরাই পাহাড় ডিঙিয়েই একদেড় দিনের পথ। মানুষের মুখ দেখার উপায় নেই। গোটা উপত্যকায় যদি মানুষ দেখোই, তা হলে সে কোনো বেপরোয়া পোচার, কিংবা স্মাগলার, যে সীমান্ত পার হয়ে চলে।

রাত নটা পর্যন্ত গল্প চলেছিল। তা সংক্ষেপে গুছিয়ে বললে এইরকম হবে। (অ্যাকসিডেন্টের ফলে যা যা নতুন হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা : প্রভঞ্জন ও পোস্টমাস্টার তাকে দেখতে আসে, শয্যার পাশে বসে, আর যেমন তাদের স্বভাব, বসলেই গল্প জমে যায়) প্রভঞ্জন বলেছিল :

নুমপাইয়ের পাহাড়ি বনের পথ নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। আবার সমতলের বনও কম বিপজ্জনক নয়। তেমন বিপজ্জনক বনের মধ্যে সামলিং আবার সবিশেষ। ডিএফও বলিন ডাইরেক্ট রিক্রুট। লেখাপড়ায় খুব তুখোড়, কমপিটিটিব পরীক্ষায় বিশেষ ভালো করার ফলে চাকরি। সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য। কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে বাড়ি। চাল-চলনে কথাবার্তায় কয়েক পুরুষের সাহেব-ঘেঁষা বড়লোকদের একজন। আর তার স্ত্রী রিনি, তাকে তো তাসিলার সকলেই দেখেছে। ইউরোপের কোনো শহরে বরং মানায়। ডিএফও-র হেড কোয়ার্টার জাকিগঞ্জে, সরকারি গাড়ি ছাড়াও নিজস্ব ক্যাডিলাক আছে। তা সত্ত্বেও, বড় স্ট্যালিয়ন ঘোড়া কিনতে হয়েছে, পনি কিনতে হয়েছে। রিনির পনিটাকে দেখলে মনে হয়, একটা বাদামি ঘোড়ার মধ্যে থেকে একটা সাদা ঘোড়া বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু এই বলিন বোসও (মেয়র কথাটা মনে পড়ায় মিটমিট করে হাসল) একবার সামলিং-এ পথ হারিয়েছিল। সে এমন আদিম ফরেস্ট।

বলিন বসু, প্রভঞ্জনের মতোই, বটানির লোক, কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর থেকে মথ আর প্রজাপতি তাকে পেয়ে বসেছে। তার জাকিগঞ্জের বাংলোর কাচঘেরা বারান্দাতে একের পর এক গ্লাস-কেসে অসংখ্য রকমের মথ আর প্রজাপতির নমুনা সাজিয়ে রাখা দেখা যায়।

এখন, সামলিং-এ একটা ছোট, পরিত্যক্ত, অবজারভেশন বারান্দা-সমেত একটা বাংলো আছে। এমন যে তার কেয়ারটেকারও নেই। কারণ সামলিং-এ হরিণ যা ছিল এক বন্যায় মরে যায়, গন্ডারগুলো অন্য বনে পালিয়ে যায়। পাখি আছে, সাপ আছে, মাঝে মাঝে জলা বলে পোকাপতঙ্গ বেশি। হাতির দল মাঝে মাঝেই আসে। হরিণ নেই তাই বাঘও নেই ; কিছু চিতা, কিছু বাঁদর, আর অনেক ময়ূর, আর বুনো শুয়োর। দিনেও অন্ধকার, সেজন্য অনেক জোনাকি, আর কয়েক রকমের, যা অন্যত্র দেখা যায় না, এমন বিচিত্র রঙের মথ। সেই বাংলোয় যাওয়ার পথের নিশানা বনে ঢাকা।

কলকাতা থেকে রিনির এক সময়ের সহপাঠী হিরণ্য রিনির নিমন্ত্রণে বেড়াতে এসেছিল। গভীর বন দেখতে তার শখ হওয়ায়, দিনের বেলাতেও ঝিঁঝির ডাকে কাঁপা এই সামলিং বন পছন্দ করেছিল বলিন। তিন দিনের রসদ নিয়ে তিনজনে সেই বাংলোয় পৌঁছেছিল। সেখানে সব সময়েই সন্ধ্যা।

কখনো একা, কখনো হিবণ্যকে অথবা রিনিকে সঙ্গে নিয়ে বলিন মথের খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। পুরনো শুকনো ঝোরা ঝর্নার পথে, গাছের মধ্যে মধ্যে সরু সরু যে পায়ে-চলার মতো দাগ তাকে পথ ভেবে, দেরি হয়ে যাওয়া ডিনারের সময় পর্যন্ত তারা ঘুরে বেড়াতো। মথ সংগ্রহ হতো। ময়ূরের ডাক চমকে দিতো। দু-একটা ফ্যাঁস করে ওঠা চিতাকে সরে পড়তে দেখা যেতো। গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে দিনের বেলাতেও যে শেয়াল রঙের আলো, তা কালো মিশানো কোবাল্ট নীল রঙ, পরে ক্রমশ কালো হয়ে যেতো তারা ফিরতে ফিরতে।

তৃতীয় দিনে বলিন একা তার নেট, টর্চ, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেললে। পথ হারিয়ে ফেলার দু দিনের মাথায় সে যখন হাতিঘিষা বিট অফিসের কাছে ক্লান্ত, অস্নাত, অনাহার-পীড়িত, পায়ের ফোস্কায় খোঁড়াচ্ছে, তখন দাওআর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কোথায় তার জাকিগঞ্জ আর কোথায় হাতিঘিষা? প্রায় একশো আশি ডিগ্রির ফারাক। সে দাওআকে বলেছিল, সামলিং-এর বাংলোয় হিবণ্য ও রিনি আটকে পড়েছে দুদিন হয়। দাওআ তাদের উদ্ধার করেছিল, বনের মধ্যে বলিন পথ হারানোর তৃতীয় দিনে। তখন রিনি ও হিরণ্য বনে বনে ঘুরে পুরো দুদিনের অনাহারে, পিপাসায়, ভয়ে মুখ শুকনো, চোখে কালি, এক কথায় যাকে হ্যাগার্ড বলে, বাংলোটাই হারিয়েছে বন থেকে বেরুতে গিয়ে।

পোস্টমাস্টার বললে, অথচ, দাওআ যা পারলে বলিন তা পারলে না কেন? হতে পারে দাওআ তাসিলা ডিভিসনে সব চাইতে ওস্তাদ ট্রেকিং-এ, বলিনকেও আনাড়ি বলা যায় না। যায় কি? সে তো তাসিলা থেকে নুমপাই যাওয়ার পথ আবিষ্কার করতে পেরেছে।

রেঞ্জার বললে, দাওআ আর বলিনে বাইরে থেকে সব দিকেই পার্থক্য। এক ফর্সা, অন্যে কুচকুচে কালো ; এক যুবক, অন্যে প্রৌঢ় ; এক বিদ্বান, অন্যে প্রায় নিরক্ষর ইত্যাদি। কিন্তু এক জায়গায় এই মিল, যে তারা বনের ভিতরে যেন নিজেকে খুঁজে পায়।

পোস্টমাস্টার খপ করে বললে, ও মশায় অবচেতনের ব্যাপার নয় তো? তা হলেও বন বলিনের অবচেতন, আর দাওআর চৈতন্য। বনের বাইরের পৃথিবীই বরং দাওআর কাছে অজ্ঞাত। আমরা কি জানি, খাঁচার মধ্যে থেকে চিতাগুলো যে পৃথিবীকে দেখে, তা তাদের কাছে মগ্নচৈতন্যের জগতের মতো জটিল বোধ হয় কি না।

রেঞ্জার হো হো করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, রিনি-হিবণ্যকে সেরকম বিপদে ফেলার অস্ফুট ইচ্ছায় বলছেন?

হাসতে হাসতেই প্রভঞ্জন বললে, অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে। তবে এটা ঠিকই কিন্তু, ডিএফও মাঝে মাঝে যা নেই, তাকে তৈরি করার চেষ্টা করে থাকে। তা করতে গিয়ে তার কী অসুবিধা বা কষ্ট হল, তা দেখে না। সে কি সামলিং বনে একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে চাইছিল? যেমন নুমপাইকে আবার মানুষ দিতে চাইছে। অসম্ভব কী? ঔপন্যাসিকরাও তো পাত্রপাত্রীকে অদ্ভুত সিচুয়েশনে ফেলে, হয়তো কৌতুক বোধ করে।

তারপর তারা, রেঞ্জার আর পোস্টমাস্টার, কথা বলার সুখে হেসে উঠেছিল। পোস্টমাস্টার বললে, এই ভাবে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি রূপে। পুরুষ এবং নারী সৃষ্টি করলেন তিনি তাঁদের। এবং ঈশ্বর দেখলেন, সব কিছু যা তিনি তৈরি করেছেন, এবং, দেখো, তাহা অতি উত্তম হয়েছিল। এবং সন্ধ্যা এবং সকালে ষষ্ঠ দিন হল।

গিরিশিরার উপর দিয়ে এগিয়ে আসা মানুষ কয়েকটি তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মেয়র চিনতে পেরে মনে মনে বললে, রেঞ্জার দেখছি, আর তার সঙ্গী ফরেস্টগার্ডরা। রেঞ্জারকে সে এ পর্যন্ত কখনো একা দেখেনি, সঙ্গে কেউ না কেউ থাকবেই। আর ডাক আসার সময়ে সে পোস্টঅফিসে যায়নি, এমন ঘটনাও কোনো দিন ঘটেনি বোধ হয়। তা এখনই ডাক আনলে বটে গুমছে। আশ্চর্য নয়?

মেয়র রেঞ্জারের সঙ্গে কথা বলার জন্য, ব্রিজটা পার হয়ে, কয়েক ধাপ নেমে, রেঞ্জার যে পথে উঠবে তার উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

সে ভাবলে, আর কোনো সময়েই কি তাকে বিশ্রাম নিতে দেখেছে? কিছু-না-কিছু একটাকে ধরে আছে। অফিস তো বটে, বনে তদন্তে যাওয়া তো বটেই, অন্য সময়েও দেখবে, হয় খেলা নিয়ে ব্যস্ত, না হয় পড়ছে, না হয় স্কুলে পড়াচ্ছে, না হয় ছবি আঁকছে। হ্যাঁ, ছবি। যখন কিছুই করছে না, তখনো পোস্টমাস্টারের সঙ্গে নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ করছে। সমস্যা তো বটেই। কে ভাবতে পেরেছে, যা আমরা ভাবি তার নিচে নিচে আর-এক রকমের ভাবনা নাকি আছে? মনের নিচে নিচে আর একটা নাকি মন থাকে! আছে, নতুবা তার একটা নাম কেন? এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা মনে পড়ায় মেয়র আপন মনে হাসল। মন খুঁজে পাওনা, তার নিচে আবার!

রেঞ্জার মেয়রকে দেখতে পেয়ে দূর থেকেই বললে, হাল্লো, মেয়র। বেরুলে?

মেয়র বললে, আসুন, সার, আসুন।

রেঞ্জার বললে, এখন নয়, সার। আজ হঠাৎ ছুটি পড়েছে। ডাকপিওন বেরোবে না। খবরের কাগজটা আনি। অসমান পথে হাঁটতে ব্যথা লাগছে না তো?

নাঃ।

ভালো। ভালো।

রেঞ্জার যেতে যেতে হাসিমুখ ফিরিয়ে বললে, বলা যায় না। পোস্টমাস্টার রাজি হলে তাকে নিয়ে এখনই আসতে পারি। ছুটির দিনে এখন একবার পিংপং মন্দ হবে না।

রেঞ্জার চলে গেলে মেয়র আবার ব্রিজে উঠল। সেই চৈত্যচূড়া আবার তার চোখে পড়ল। কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করা যায় সেদিকে তাকালেই। আজ কি অন্য দিনের চাইতে রঙিন?

রিনি, তার মনে হল, সে রিনির কথা ভাবছিল। মেয়র ভাবলে, হয়তো রবীন্দ্রনাথের কুমুও তত সুন্দরী নয়, রিনি যত। সেদিক দিয়ে আমাদের ডিএফও সৌভাগ্যবান। ডিএফও নুমপাই আবিষ্কারে গেলে, রিনি ঝকঝকে আলোকিত বাংলোয় একা একা কাটাতে লাগল। বিকেলের প্রসাধন শেষ করে তাসিলার পথে বার হতো মেয়রকে সঙ্গী করে। বলিন রওনা হওয়ার সময়ে বলেছিল, তোমার মতো ভাগ্য কার রিনি, শহরের মেয়র যার সঙ্গী এবং দেহরক্ষী?

তাসিলার অধিকাংশ পথেই ইলেকট্রিক নেই, তা হলেও, অনেক সন্ধ্যায় সেই পথ সমতলবাসীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠলেও, রিনি বেড়াতে চাইতো। আর ফিরে আসতে বাধ্য হলেও, কখনো এ জানালা, কখনো ও জানালায় গিয়ে বসতো। বাইরে তখন অন্ধকার ঘনাচ্ছে। আর তার মধ্যে এ টিলা, সে টিলা, স্তনহেন সেই চোর্টেন-পীক, আর ছড়িয়ে রাখা পায়ের ভাঁজের মতো ক্রটলং গিরিশিরা—এ সবই সে চেয়ে চেয়ে দেখতো যেন। গভীরে নেমে যাওয়া ছায়াবৃত্ত বাদামি-খয়েরি উপত্যকার ভাঁজগুলো ছাড়া তখন আর কী চোখে পড়বে? বসে বসে অন্ধকার দেখা? সে সব সময়ে মাঝে মাঝে রিনির হাতে হুইস্কির গ্লাস থাকতো। দু একবার এমন হয়েছে, যে মেয়রকে টেবল থেকে মদের বোতল এনে মদ ঢেলে দিতে হয়েছে। রিনি অসাধারণ উজ্জ্বল ; অনেক গুণ ;

একই দোষ, অসাধারণ মদও খায়। ডিনার টেবলে মাঝে মাঝে টলতো।

এক রাতে, তা রাত দশটা তো হবেই, ডিনার ঘণ্টা-দুয়েক হল শেষ হয়েছে রিনির। মেয়র সে রাতে বাইরে বেরোচ্ছিল। তার গায়ে এমন পোশাক যে দেখলে তাকে ফরেস্টের এক শ্রেণীর কর্মচারী থেকে পৃথক করা যাবে না, পিঠে রাইফেল, হাতে টর্চ। বাংলো থেকে বেরোতে বেরোতে তার মনে হল, রিনির শোবার ঘরের একটা কাঁচের জানলার পর্দা কিছু সরানো, আর তার কাছে বসে আছে রিনি, সামনে মদের গ্লাস। মেয়রের মনে হল, রিনি হাসল তাকে দেখে, হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকলে।

মেয়র বাংলোয় ঢুকে রিনির শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু কি দরকার ছিল ম্যাডাম? রিনি বললে, বসো, মেয়র, বসো। এ কী বেশ? বরং এ বোতলটাকে খুলে দাও। আর তখন আলাপে অন্ধকারকে অতীতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছিল বোধহয়। রিনিই হেসে বলেছিল বোধহয়, বেশ হয় যদি রাইফেল কাঁধে অতীতে ঢোকা যায়। তাই বলছো?

রিনি তার সেই শোবার ঘরে, বাংলোর স্টেটরুম যাকে বলে, ছোট টেবলটার ধারে মদ নিয়ে। মেয়র বোতলের ছিপি খুলে দিতেই অনেক ফেনা উপচে নেমেছিল বোতলের গা বেয়ে।

তাকেই বোধ হয় মদে বিবশ হওয়া বলে। রিনি একবার জিজ্ঞাসা করলে, খাও না, না? একেবারেই না! কিন্তু মেয়র তখন টেবলটা থেকে খানিকটা দূরে, বরং সেই পর্দা গুটানো জানলার কাছে ; সেই কাঁচের শার্সি দিয়ে সমুদ্র-নীল আকাশে সোনার টুকরোর মতো তারা দেখা যায়। গ্লাসে মদ ঢেলে ঢেলে সেটাকে টইটম্বুর করে রিনি উঠে দাঁড়াল একবার, বরং মেয়রের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পড়ে যাবে নাকি? এই ভয়ে মেয়রকে রিনির দিকে এগিয়ে যেতে হল। রিনির চেষ্টা যেন সে ফেনা-উপচানো গ্লাসটাকে মেয়রের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরার। পাছে একজন ভদ্রমহিলার হাতে ধরা মদের গ্লাসে চুমুক দিতে হয়, এই ভয়ে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটাকে ধরলে মেয়র। একই গ্লাস ধরা দুজনের দুখানা হাত ফেনাযুক্ত লালচে মদে ঢেকে গেল। রিনির চোখদুটো অদ্ভুত, তাদের প্রান্তগুলো লাল। যেন হাত খালি হওয়াতে রিনির সে হাত মেয়রের মুখ ছুঁতে গিয়ে টালমাটাল করে গাল বেয়ে বেয়ে নেমে তার কাঁধের উপরে আশ্রয় নিল।

তো, সেই রাতে শেষ পর্যন্ত শিফনপরা সেই স্খলিতচরণাকে পাঁজা-কোলে করে তার স্টেটরুমের বিছানায় নিতে হয়েছিল মেয়রকে। তখন তার ভয় হয়েছিল, সেই একটা অদ্ভুত উষ্ণতায় সেই বিবশার কি মৃত্যু হতে পারে? কেমন একটা উষ্ণতা মেয়র নিজেও অনুভব করছিল। ভয়ে ভয়ে বোতাম খুলে, যেন তাতে রিনির দম নেয়া সহজ হবে, সেই স্বচ্ছ গাউনটাকে খানিকটা আলগা করে দিয়েছিল মেয়র। তখন রিনি তো ঘুমিয়েই পড়েছে।

আশ্চর্য নয়? না, মদ খাওয়াটা নয়। সে তো নিজের পয়সায় দামি মদ খায়। সেই অনেক সন্ধ্যায়, অনেক রাতে জানলার ধারে তেমন চুপ করে বসে থাকা রিনি মেমসাহেবের।

মেয়র নিচের দিকে তাকাল। ব্রিজের নিচে সেই কালচে-বেগুনি পাথরের অসমান চাঁইগুলোতে দৃষ্টি পড়ল তার। বাইরে থেকে যা বোঝা যায় না, তেমন কোন ভাবনা আছে কি না রিনির কে জানে? কিছুক্ষণ কিছু না ভেবে, সে যেন অবাক হয়ে ভাবনার এক দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। একেই কি রেঞ্জার মনের তলার মন বলে?

ওরা দুজনেই বিদ্বান, পোস্টমাস্টার আর রেঞ্জার ; ওদের অনেক কথাই মেয়র বুঝতে পারে না। দেখো, কী আশ্চর্য কথা, মানুষের মনের নিচেও নাকি স্তরে স্তরে মন আছে। অন্ধকার? পথ হারানো সামলিং বনের মতো? নাকি বনের কাছে বলেই শহরের রিনিমেমদের তেমন হয় এখানে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

জাকিগঞ্জ জায়গাটা বড় নয়। একটা ছোট রেলওয়ে স্টেশন আছে। একটা ডাক-তার ঘর। কয়েকটা ছোটখাটো দোকান আছে। তাসিলার ফরেস্ট ডিভিশনের অফিস, রেসিডেন্স, গেস্টহাউস, কর্মচারীদের কিছু কিছু কোয়ার্টার্স, দু-তিনটে পিচ-বাঁধানো পথ সেগুলোকে ছুঁয়ে, ঘিরে ; কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছ যেমন ইউক্যালিপটাস, ওক, কিছু মূল্যবান গাছ যেমন মেহগনি, শিশু ; করাত-কল গোটা দুযেক, একটা প্লাইউড কারখানা, তাদের শ্রমিক কর্মচারী। কিন্তু মূলত ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার। যেন নতুন একটি ক্ষুদে শহর যাকে হাতের চেটোয় রাখা যায়। যেন ওই গাছগুলোর নার্সারি। একটা হ্রদের ধারে যেন, যে হ্রদ একটা ছোট ঝর্নাকে বাঁধ দিয়ে তৈরি।

ডিএফও-র আগাগোড়া কাঠ, কাচ, লোহার শিটের ছাদে তৈরি গোলাপি রঙের রেসিডেন্স জাকিগঞ্জের সব চাইতে দ্রষ্টব্য বাড়ি। আসলে সেটা একটা প্রকাণ্ড দোতলা আটচালা। ইংরেজি গেবেলড ছাদের কায়দায়। যা দিয়ে মশা মাছি পতঙ্গ আসতে পারে না, এমন তারের সূক্ষ্ম জাল দিয়ে ঘেরা, ঢাকা বারান্দায় উজ্জ্বল আলোর মধ্যে ডিএফও বলিন বসু। পৃথক অফিস থাকলেও বলিন এখানে বসে কাজ করতে ভালোবাসে। আজ কিন্তু সে অফিসের কাজ নয়, বরং নিজেব ধরা কয়েক রকম মথের ক্যাটালগ তৈরি করছে।

সেই বারান্দা থেকে প্রধান পথটাকে দেখা যায় অনেকটা দূর পর্যন্ত। সে দেখতে পেলে হালকা হলুদ রঙের ক্যাডিলাকটা আসছে। বলিন উঠে বারান্দা পার হয়ে রিনির জন্য অপেক্ষা করতে লনে নামল। ফলে লনের ওপারে গেটের কাছে সিড়িঙ্গে লম্বা, কুচকুচে কালো, সাদা চুল, এক ফরেস্ট-কর্মচারীকে দেখতে পেলে। তাকে দেখে বলিন গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেল। বললে, আরে এসো, এসো, দাওআ, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এই সময়ে গাড়িটাও এসে থামল। বলিন বেশ গ্যাল্যান্টভাবে এগিয়ে দরজা খুলে দিলে রিনি নামল। সে অবশ্যই তার পোশাকে এবং স্বল্প-সংখ্যক কিন্তু মূল্যবান অলঙ্কারে ঝকঝক করে উঠল।

বলিন বললে, চিনতে পারছো রিনি? এই দাওআ। তুমি অবশ্য এরকম পোশাকে দেখোনি। তখন বোধহয়, খালি গা আর কাঁধে টাঙি। পশুরাও মানুষ বলে বোঝে না! বিট অফিসার।

পলকে রিনির রুজরাঙা গাল কাগজ-সাদা হয়ে গেল। নিশ্চয়ই তার সামলিং বনে পথ হারানোর কথা মনে পড়ল। কিন্তু সে হাসল সঙ্গে সঙ্গে, বললে, ওয়ান কান্ট ফরগেট, ক্যান ওয়ান?

বলিন বললে, সেটা আর কি এমন মনে রাখার কথা? সে হালকাভাবে হাসল। বললে, এসো দাওআ। চলো রিনি। জানো, ডারলিং, দাওআ প্রমোশনে নুমপাই যেতে পারে যদি কর্তারা আমার মত মানেন। লোকে অবশ্য বলাবলি করবে, স্ত্রীকে খুঁজে দেওয়ার জন্যই এই একটা পোস্ট তৈরি করে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে। বলিন হাসল।

এই কথাগুলো ইংরেজিতে হল। দাওআর বোঝার কথা নয়। সে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগল।

বারান্দায় পৌঁছে দাওআকে বসতে বলে, রিনির জন্য চেয়ার টেনে দিয়ে, বলিন বললে, তুমি

একটু বসো ডারলিং, দাওআর সঙ্গে কাজের কথা সেরে নিয়ে, তোমার সঙ্গে ক্যাটালগটা নিয়ে আলোচনা করবো।

রিনির এখন কোনো কাজই নেই। ব্রেকফাস্টের পরে দু'ঘণ্টাও হয়নি। আর তারও ফরেস্টের গল্প শুনতে ভালোই লাগে। ফরেস্ট সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই মনে হয় না, যে সেখানে সব সময় কিছু ঘটে চলেছে? মানুষ শুনতে পায় না এমন শব্দে, আধোঅন্ধকারে?

নুমপাই সম্বন্ধেই আলোচনা হল। পরে বলিন দাওআকে বললে, তোমার রিটায়ারমেন্টের আর কয়েক বছর বাকি, দাওআ। এই সময়টা নুমপাইয়ে থাকা কি তোমার পক্ষে কষ্টের হবে? কাজ খুব কঠিন নয়। প্রভঞ্জনের সঙ্গে কথা হয়েছে, নুমপাইটাকে সাবরেঞ্জ করে প্রকৃতপক্ষে তার রেঞ্জেই জুড়ে দেয়া হবে। সেই দেখবে সব। রিপোর্ট ইত্যাদি সেই করবে দরকার হলে। তুমি তাকে মুখে মুখে সংবাদ দিলেই হল। মোট কথা লেখাপড়ার কাজ তোমাকে করতে হবে না। আপাতত সিনিয়ার বিট অফিসার।

দাওআ বললে, জু, সাব।

রিনি বললে, সেই গোটা উপত্যকায় নাকি একটি মানুষও নেই। তুমি বলেছিলে।

বলিন বললে, কি করে থাকবে? ধ্বসের দিকটাতেই ফরেস্টের কামলারা থাকতো। কিন্তু গোটা উপত্যকাটাকে মাঝামাঝি চিরে একটা ঝোরা আছে। আর ঝোরার ধারে অনেক পাখি, কিছু লাল বাঁদর, আর অন্তত একদল পাহাড়ি হরিণ আছে। আর অন্তত একজোড়া তিব্বতি মেষ যারা কিন্তু প্রায় তোমার পনির মতো। বোধ হয়, অনুমানই মাত্র, একটা পথ আছে, ওদের মতো, সীমান্তের ওপারে যাওয়ার। আচ্ছা, দাওআ, দ্রুক সম্বন্ধে তোমার কী মত? কেউ কি দ্রুক? দ্রুক কি কারো নাম? বলিন হাসল।

জু, সার।

আছে? বলো কী!

দাওআর ভাষা সব সময়ে সবটুকু অনুসরণ করা কঠিন। তা ফরেস্টের এক বিশেষ ভাষা। মনে হয়, ফরেস্টের বাইরের কোনো কোনো ভাষার প্রতিধ্বনি আছে। কিন্তু কোনো ভাষার সঙ্গে মেলে না। যতক্ষণ সে জু, সার, ইয়েস সার, বলছে ততক্ষণ বোঝা যায় না তার নিজের প্রকৃত ভাষাটা কী রকম দুর্বোধ্য। কারো কারো মতে তার ভাষা নাকি আসুরী, নাকি অসুরের ভাষা। নাকি এদিকের এসব বনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এমন এক ট্রাইব আছে, যারা নিজেদের অসুর বলে।

দাওআ যা বললে তা এই রকম · হাতিঘিষার কনট্রাক্টরের বাংলোয় যে ডাকাতি হয়েছে গত মাসে, তারা দ্রুকের লোক। এরকম বলছে দারোগা। ডাকাতের দলের একজন কনট্রাক্টরের লোকেদের হাতে জখম হয়েছিল, ধরা পড়েছে, তাকে দেখলে বোঝা যায়, সে এ অঞ্চলের লোক নয়। তা না হলেও দ্রুক আছে। দ্রুক থাকতে পারে।

বলিন বললে, জানো রিনি, এই দ্রুক এক মজার শব্দ। শুনে মনে হয় তা কারো নাম। তাকে কেউ দেখেনি। এরকমও হয়, পৃথিবীর সব মানুষকে দুভাগে ভাগ করলে একভাগের নেতা সে। একভাগে থাকছে স্মাগলার, পোচার, ড্রাগ-ব্যবসায়ী ইত্যাদি, অন্য ভাগে পুলিশ, ফরেস্টের লোকেরা, একসাইজের লোকেরা। অর্থাৎ যদি পুলিশ শৃঙ্খলার প্রতীক হয় তা হলে তার বিপরীতটার প্রতীক দ্রুক। মানুষ হয় না। অথচ সে নাকি অদ্ভুত ঢ্যাঙা এক পাহাড়ী, যার মাথা যে কোনো দুটো মানুষের মাথার যোগফল, যার উপরের ঠোঁটে তিন-চারটি লম্বা চুলের গোঁফ, নাক আছে বটে, কিন্তু একটা মাত্র চোখ, অন্য চোখের জায়গাটা চামড়ায় ঢাকা, নাকি সকেটটাই তৈরি হয়নি। সে নাকি এক বিকৃত মানুষই।

সত্যি? রিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

অন্তত মিথটা তো সত্যি। পাঁচশো বছরে মিথটা গড়ে উঠেছে। বলিন হাসল। চমকালে তো।

এদিকের অনেকের মতে যতদিন ফরেস্ট, আর তাদের কাছে পৃথিবী বলতে ফরেস্টকেই বোঝায়, ততদিন দ্রুক থাকবে। মিথের দ্রুক, আবার, এক অতিকায় ড্রাগন।

রিনি বললে, তুমি কি দ্রুককে ভয় কর, দাওআ?

জু, সাব।

রিনি অবাক হল। দাওআকে, বনের সেই কৌপীনসার, টাঙি-হাতে গাছের সারি থেকে হঠাৎ পৃথক হয়ে আসা মানুষকে দেখে অন্যেরই ভয় পাওয়ার কথা। সে ফরেস্টের কোনো কিছুকে ভয় পায় বিশ্বাস হয় না।

সে বললে, তুমি ভয় পাও দ্রুককে? আশ্চর্য!

বলিন ইংরেজিতে বললে, সে হয়তো অন্য ভয় , হয়তো দ্রুকের স্পর্শ-সংক্রামিত হওয়ার ভয়। এক যদি ও নিজেই না এক দ্রুক হয়ে থাকে! সে হো হো করে হাসল।

রিনি বলল, অর্থাৎ আমাদের সকলের মধ্যে যে দ্রুক থাকে?

বলিন বললে, তাই বলছো? সে হাসল, বললে, তা ইংরেজি গল্প ভেবে দেখো। এঞ্জেলদের মধ্যে সেই তো সব চাইতে দক্ষ, সাহসী, আর শক্তিমান ছিল। কিন্তু দাওআ আমাদের আলাপ বুঝছে না।

এটা বলিনের ভদ্রতা, যে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির অজ্ঞাত ভাষায় আলাপ করতে সে চায় না। দাওআর তাতে যদিও কিছু এসে যায় না। বনের বাইরে এই পরিচিত অব্যক্ত পৃথিবী তার তো অভ্যাসেই এসে গিয়েছে।

বলিন দাওআকে পাহাড়ি ভাষায় বললে, হাতিঘিষার ডাকাতির সেই দ্রুককে তো তুমি ভয় পাও না, সে তো অন্য দ্রুক।

জু সার।

তা ছাড়া, বলিন বললে, রিটায়ার করার পর তো তোমাকে কোথাও থাকতে হবে ; নুমপাই কেমন? তুমি কয়েকজন অসুর ক্যাজুয়াল লেবার যোগাড় কর। শুধু অসুররাই।

দাওআ চিন্তা করলে। সে অবাক হয়ে ডিএফওকে দেখল কয়েকবার।

লজ্জিত হয়ে ডিএফও তাড়াতাড়ি বললে, তোমাকে দাওআ, তাসিলা দিয়ে নুমপাই যেতে হবে। তোমার সেই মেয়র এখন তাসিলাতেই। কিছুদিন আগে পাহাড় থেকে পড়ে হাত-পায়ে চোট পেয়েছে। ভালোই থাকবে। জান, রিনি, দাওআই মেয়রকে এনেছিল। বোধ হয় সামলিং বনেই পেয়েছিল। তাই নয় দাওআ? (পাহাড়িটা দাওআর দ্বিতীয় ভাষা) রিনি অবাক হয়ে বললে, কেন সেও কি পথ হারিয়েছিল?

বলিন চোখ-মুখের হাসি গোপন করে বললে, দাওআ, মেয়রকে তুমি কী রকম পেয়েছিলে, তা মেমসাহেব শুনতে চাচ্ছেন। বলবে? তখন মেমসাহেব ছিলেন না।

তখন দাওআ এইরকম বললে। (সেই আসুরী মিশানো পাহাড়ি, রিনি কিছুই বুঝলে না, কিন্তু বলিনের অনুবাদ শুনতে শুনতে সে মুখ তুলে অনেক বার দাওআকে দেখতে লাগল এই ভেবে, এই অশিক্ষিত ফরেস্ট কর্মচারী কি করে তেমন অনুভব করতে পারে, যা তার গল্পে দেখা যাচ্ছে।)

দাওআ, অবশেষে তার, সেই যার নাম নেই, মুখোমুখি হওয়া স্থির করলে। কারণ অনেকক্ষণ থেকে তাকে আর গাছের মধ্যেকার ছায়াগুলোকে ঢাকতে দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে। জল মরেছে, আগাছা জন্মায়নি, মসের মতো শ্যাওলা বরং, কোথাও কাদা। শরীর দিয়ে স্যাঁতা ভাবটাকে অনুভব করলে যেন পিপাসা যাবে, এমন ভাবে লোকটা সেই কাদায় শুয়ে। পিপাসাই। তার মুখের এখানে ওখানে, বিশেষ করে ঠোঁটদুটোতে কাদা। জলের আশায় সে কাদায় মুখ গুঁজেছিল,

কাদা চুষেছিল, কাদাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সুখ বা শান্তি।

যেন ঘুম ঘুম ভাব, আবার যেন ঘুমিয়ে পড়তেই ভয়। যেন ঘুমোলে আর জাগবে না ; মাথাটাকে মাটি থেকে দু-এক ইঞ্চি তুললে, আবার তা লুটিয়ে যাচ্ছে, যেন শিরা, উপশিরা, পেশী সব থেকে মুক্ত হয়ে সে একটা আরাম পাচ্ছিল, ভয়ও হচ্ছিল। এদিকে ওদিকে শুকিয়ে ওঠা তারই পায়ের চিহ্ন কাদায়। বোঝা যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা সে পড়ে আছে এখানে, একদিনও হতে পারে, সেই ভিজে জমির ফাঁদে পড়েছে।

একটা তীব্র কেকাধ্বনি বনকে দুটুকরো করে দিল ; সেই হলুদ-হলুদ কাদাজলে ডোরা ডোরা ছোপ ছোপ আলো। অন্ধকারকে চমকে দিয়ে যেন চিতাটাই পালাল। তখনই সে দাওআকে দেখে থাকবে। তার পর কিছুক্ষণ থেকে থেকে সেই ময়ূরটার সঙ্গে সঙ্গে এপাশ ওপাশ থেকে আরো দু একটা সচকিত কেকা শোনা গেল। লোকটা কয়েকটা কাদামাখা আঙুল নাড়ল, যেন তাদের তাড়িয়ে দিতে।

তখন দাওআ এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। সে পায়ের শব্দ টের পায়নি। দাওআ যখন বনে তার পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না। ভুখ লাগলেন? উত্তর নেই। তিয়াস লাগলেন? এই তিয়াস কথাটা লোকটাকে যেন জাগিয়ে দিল। সে যেন অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল, মোর।

দাওআ তখন জিভে টাকরায় খেদের শব্দ করলে। নিচু হয়ে সেই মোরকে, যদি তা তার নাম হয়ে থাকে, তুলে বসালে। সেই সময়ে দাওয়া নিজেকে শোনাতে বলেছিল, বনের আত্মা আছেন একটা। জান-পরিচয় নেই তার সঙ্গে, অথচ এরা আসে বনে ময়ূর ধরতে! দাওআ লোকটিকে বোঝালে, এটা রিজাভ ফরেস, সামলিং ফরেস, এখানে ময়ূর, মোর ধবতে কেউ আসে না। এর পর লোকটিকে কাঁধে ফেলে দাওআ তার নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়েছিল। মাইলের পর মাইল বনের পথে হেঁটে।

যেন কিছু বুঝছে না, যেন জন্মেব থেকে দানো-পাওয়া নির্বোধ, যেন তখনই জন্মেছে এমন প্রাণী। তিন-চাব দিন পাতার বিছানায় তেমন পড়ে থেকে চোখ মেলল লোকটা।

দাওআ জিজ্ঞাসা করলে, কী নাম? কেন বনে? ফ্যালফ্যাল করে সে চেয়ে রইল। কেন বনে? বন ভালো? লোকটা মাথা নাড়লে। ময়ূর ধরতে এসেছিলি? দাওআ চুকচুক শব্দ করে আবার বলেছিল, কী আহাম্মুখ, বন চেনে না, বনের আত্মার সঙ্গে জান-পহচান নেই, বনে ঢোকে!

ইন্টারভিউ শেষ করে দাওআ চলে গেল। ড্রিংক্স আনলে বাবুর্চি। আ, এই আরামের শব্দ করে ক্যাটালগের কাগজ সরালে বলিন। তখন রিনি বললে, সেই মেয়র?

বলিন হেসে বললে, বনে অভিনব কিছু পেলে ডিএফও-র কাছে আনতে হয়। আর সে তো পোচারই যেন। কয়েক দিনে হাঁটতে পারলে দাওআ তাকে জাকিগঞ্জে এনেছিল। সেদিন এই বারান্দায় বসেই কিছু চাকরিপ্রার্থীর ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম। পাশের ঘরটায় পি এ কাগজ-পত্র দেখে দিচ্ছিল, লেখালেখি করছিল। এমন সময়ে পি এ না ডাকতেই একজন সোজাসুজি সামনে এসে দাঁড়াল। কী চাই? চাকরি? ভিখারির মতো পোশাক, জাঁকজমকের চেহারা। এভাবে কেউ এসে চাকরি চায়? তার পরে যা হল সে বেশ ড্রামাটিক।

বলিন খুব আনন্দ বোধ করলে বর্ণনা করতে। বললে, দাঁড়াও, ড্রামার মতো বলছি। ডি মানে ডিএফও ধরে নিও। ডি বললে, দরখাস্ত করেছো? করো নি? পোচার ধরতে পারবে? আচ্ছা! ওই পাশের ঘরে যাও। দরখাস্তের ফর্ম পূর্ণ করো। ডিএফও ধরে নিয়েছিল, সে চাকরিপ্রার্থীদের একজন। আর মানানসই। ছেঁড়া ছদ্মপোশাকে যেন আই পি এস। কাণ্ড!

লেখাপড়া জানো?

না।

টিপসই দেবে?

আচ্ছা, দেবো। (একটু ভেবে)

পাশের ঘরে ডিএফও-র পি এ ডিএফও-র কথায় সেই চাকরিপ্রার্থীর হয়ে দরখাস্ত পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছিল।

পি এ–পিতার নাম কী?

কেউ না। চাকরিপ্রার্থী বললে।

কেউ না! (পি এ ফর্মে লিখলে ফাদার–নিল) তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তা হলেও অন্তত মা তো একজন থাকবে। সেক্ষেত্রে মায়ের নাম লিখতে হবে।

চাকরিপ্রার্থী--বাগবাজার স্ট্রিট।

পি এ–মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করছি।

পি এ রাগ করে ডিএফও-র সামনে এসেছিল সেই অদ্ভুত কর্মপ্রার্থীকে নিয়ে। পাগলদের সাহায্য করা তার কর্ম নয় বলে, ডিএফওকে তার অসুবিধার কথা জানালে।

ডিএফও–আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করছি, কিংবা আমার সামনে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে অ্যাটেস্টেশন ফর্ম লেখো। ওহে, তোমার নাম কী?

লোকটি–ময়ূর।

ডিএফও–বা, বেশ। পিতার নাম? কে পিতা?

ময়ূর–নিশ্চয় কোনো পুরুষ।

ডিএফও–(গাল ফুলিয়ে) অ!

পি এ–মা? মা তো একজন থাকবেনই। সে তো রাতের অন্ধকার হতে পারে না।

ময়ূর–বোধ হয় বাগবাজার স্ট্রিটের সেই স্ত্রীলোকদের একজন। আপনি বরং লিখুন ফুটপাত।

ডিএফও–মায়ের নাম ফুটপাত?

ময়ূর–কিংবা বাগবাজার স্ট্রিট।

ডিএফও–ও! সাবাস্!

পি এ–আচ্ছা সেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে লম্বা গড়নের সুন্দরীপানা কেউ? তার নাম মনে করো। আচ্ছা, সেই ফুটপাতে খুব টল কোন সুন্দর পুরুষ আনাগোনা করতো?

(এই পর্যন্ত খুব সাহস করে বলে পি এ থেমে গেল ; চাকরিপ্রার্থীর ছফিট ছাড়ানো উচ্চতার দিকেও সে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করলে)

ময়ূর– দেখিনি। (তার মুখ পাথরের মতো কঠিন, চোখে যেন চকচকে এক বন্যতা একবার জ্বলছে, একবার নিবছে)

পি এ–ইমপসিবল, সার।

ডিএফও–নামটা তো বলেছে। বাকিটা নিজে তৈরি করে নাও। আর তলায় একটা টিপসই নিও। ইনট্রেস্টিং নয়? হতে পারে বাগবাজারের ফুটপাতে মানুষ। পুলিশ কী ভেরিফাই করবে, এই ভাবছো? পুলিশ ভেরিফিকেশন আজকাল উঠে গেছে। (ডিএফও তার সিগার ধরালে।)

পি এ–সরকারি চাকরি তো, সার!

ডিএফও–ওয়েল বাবু, জেলখানা থেকে খুনীদের ছেড়ে দেয়া হল, বিচার হল না। সাজা হয়ে থাকলে মকুব করা হল। তাদের কেউ এসে যদি চাকরি চায়, দেয়া হবে না? এমনকি তাদের কেউ এসে যদি বলে, আমি খুন করেছি, ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছি, রায়টে অংশ নিয়েছি, তা হলেও চাকরি না দেয়ার যুক্তি থাকে না ; কারণ ছেড়ে দেয়া মানে নিরপরাধ বিবেচনা করা। বড় জোর বলা

হবে, চাকরি করতে এসে, দয়া করে ওসব নাই বললেন। এর বেলাতেও তা মনে করলে দোষ কী? ধরে নাও না, এরও একটা পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। চেহারাটা পোচারকে ভয় পাওয়ানোর মতো নয়? ওহে পাইপগান ছুঁড়েছো কখনো? বন্দুক? ছোরাটোরা চলে? বোমা?

সুতরাং পি এ নিজের অফিসঘরে ফিরে, ফর্ম তৈরি করে, তাতে এমন-কি সেই চাকরিপ্রার্থীর পিতার নাম নিল কেটে নীলাম্বর লিখে, তেমনি কাল্পনিক এক বাগবাজারের ঠিকানা দিয়ে, ফর্মটা পূর্ণ করে, তার তলায় ময়ূরের টিপসই নেবে ঠিক করলে।

পি এ—তোমার নামটা তা হলে কী হচ্ছে?

ময়ূর—ময়ূর।

পি এ—ময়ূর?

ময়ূর—ময়ূর

পি এ-র নিজের উচ্চারণে বোধ হয় প্রাদেশিকতা ছিল। ময়ূর উচ্চারণে অসুবিধা ছিল। ইংরেজি ময়ূর বানান করতে, 'u'-এর বদলে 'o' বসিয়ে দিল, সেই অ্যাটেস্টেশন ফর্মে।

লাঞ্চের পরে ডিএফও ফিরলে, ময়ূরকে দরখাস্ত-ফর্ম-সহ নিয়ে আবার ডিএফও-র সামনে দাঁড় করানো হল।

ডিএফও ফর্মটা পড়লে। নামটার নীচে কয়েকবার লাল পেনসিলে দাগ দিলে। মনে হল সে হেসে ফেলবে। কিন্তু মুখ লম্বা রেখে সে বললে, বা, বেশ। তুমি দেখছি মেয়র। আচ্ছা, তোমাকে শহর দেখেই পোস্টিং দেবো। কাল এসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে যেয়ো।

তিন দিনের মাথায়, সেই লোকটি ময়ূর থেকে মেয়র হয়ে তাসিলায় চলে গিয়েছে। এই বলে ডিএফও হো হো করে হেসে উঠল।

হাসি থামলে বললে, তা ক্ষতি কী, যদি আমাদের তাসিলার একজন মেয়র থাকে? তুমি তো দেখেওছো। সেই মেয়রই। এবার ডারলিং, আমার মথের ক্যাটালগটা দেখো। আমি যে বর্ণনাগুলো লিখেছি সেগুলো তুমি স্পেসিমেনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নাও। আমি পড়ছি এক এক করে। এগুলোর নাম শুনলে বুঝবে, হয় তোমার কিংবা আমার নামে নাম এদের। যেমন এই ইন্ডিয়া রেড রঙের গোল পাতাটা, এটার নাম রিনি রেড। প্রথমে ভেবেছিলাম রুবি লিফ রাখি। পরে দেখলুম তোমার নামেই ভালো মানাবে। এটা দেখো। মনে হচ্ছে না নীল অতসী? আর এটা দেখো, এটা দেখো। কী গাঢ় সবুজের চুমকি! এটা বলিনস এমারেলড।

রিনি বললে, কিন্তু আমাদের নাম দিচ্ছো কেন?

বাহ্। আমার সৃষ্টি নয়? আমি এগুলো সামলিং থেকে না আনলে, কেউ জানতো যে এরকম মথ হতে পারে?

মাই গড!

তাসিলা থেকে অনেক দূরে, অন্যলোকেই যেন, জাকিগঞ্জে রিনি হাসিমুখে বললে, তোমার জন্য কি আমি গর্ব করবো? কিন্তু তুমি কখনো কখনো দারুণ সিনিক। আর আইন ভেঙে থাকো। আর সেই মেয়র হয়তো চাকরিপ্রার্থীও ছিল না।

নিল তো! তা ছাড়া ইন্টেলেক্ট-বিচ্যুত বেশ একটা পুরুষ নয়, লরেন্সের পুরুষ-সেকসের স্পেসিমেন নয়? তুমি বলো? দাওআ রিকমেন্ড করেছিল। মেয়র-বাংলোয় সেই তো সঙ্গী ছিল। লাভলি নয়? দেখো না, মেয়র হয়ে সে কী করে এখন।

বলিন মথের দিকে চোখ রেখে হাসল। আমি অন্তত মামলা তুলে নিয়ে খুনীদের মুক্তি দিই না।

রিনি বললে, মার্চতো মাসটা। বরফ দেবো একটু চায়ে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

প্রভঞ্জন দত্ত, আসলে দত্তগুপ্ত, তাসিলা ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার। সেও ডাইরেক্ট রিক্রুট, সেও বটানির ডিগ্রিধারী। বলিনের তুলনায় বছর চার-পাঁচ ছোট হবে। ত্রিশ হল। বছর পাঁচেক চাকরি।

মেয়রকে পার হওয়ার পরেই উৎরাই দিয়ে সঙ্গী ফরেস্ট-গার্ডদের নিয়ে, সে তরতর করে নেমে গেল। তার এই গতিটাই স্বাভাবিক। এমনকি চড়াই পথেও সে সাধারণের তুলনায় দ্রুতগতি। বেশ স্বাস্থ্যবান। স্থূল না হয়েও পরিপুষ্ট। মেয়রের পাশে তাকে উচ্চতায় কম দেখিয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে পাঁচ-নয় উচ্চতায়, একশো চল্লিশ পাউন্ডের ওজনে প্রশংসনীয় দেখাচ্ছে, বিশেষ তার এই হেরিংবোন সুটে। গায়ের রঙ বাদামি ঘেঁষা। কিন্তু ইতিমধ্যে তার চিবুক স্থূল হওয়ায় এবং কপাল বড় হওয়ায় বরং গম্ভীর দেখায়।

ছোট পোস্টঅফিস। মাত্র তিনটি ব্যাগ আসে, সেগুলোও বড় হয় না। পোস্টঅফিসে প্রায়ই আসে বলে, প্রভঞ্জন জানে, তিনটি ব্যাগ আসে তিন জায়গা থেকে। একটি জংশন স্টেশন থেকে আর এম এস-এর, একটি মহকুমা সদর ডাকঘরের, তৃতীয়টি, যাতে ডাকঘরের হিসাবের কাগজপত্র যাওয়া আসা করে, সেটা আসে জেলার সদর থেকে।

ছোট শহরে যেমন হতে পারে, পোস্টমাস্টাব এবং রেঞ্জারের মধ্যে একটু নৈকট্য গড়ে উঠেছে। ফলে প্রভঞ্জন জানে, এই ব্যাগগুলোর কোনটার মধ্যে কী আশা করা যায়। যেমন, সে জানে জাকিগঞ্জ ও অন্যান্য ফরেস্ট অফিস থেকে ডাক আসে আর এম এস-এর ব্যাগে। সেই ব্যাগেই আসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকাগুলো ; যে চিঠিপত্র এয়ার মেলে আসে তা থাকে জেলা সদরের ব্যাগে ; মহকুমা সদরের ব্যাগে থাকে দৈনিক সংবাদপত্র। আর সেই ব্যাগেই থাকে সেই নভেলগুলো যা পোস্টমাস্টারের স্ত্রী সুচেতনার নামে আসে, কিন্তু কখনো যার ভাগীদার প্রভঞ্জন নিজেও বটে। অবশ্যই রোজ সে বইগুলো আসে না।

প্রভঞ্জন যখন পোস্টঅফিসে পৌঁছাল, তখন গুমছে রানার দুটো ব্যাগ কেটেছে। চিঠিপত্রগুলো পোস্টমাস্টারের টেবলে তুলে দিয়েছে। হালকা একটা ভিড় হয়েছে। প্রভঞ্জন ঢুকতে ঢুকতে হাসিমুখে বললে, গুডমর্নিং সার, হাল্লো।

পোস্টমাস্টার মুখ তুলে রেঞ্জারকে দেখে বললে, গুডমর্নিং সার, হাল্লো, হাল্লো।

রেঞ্জার চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। পোস্টমাস্টারের হাতে এক বান্ডিল চিঠি ছিল। সে সেটাকে হাত থেকে সরিয়ে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললে, আজ ছুটি, পরে হতে পারবে। আরে গুমছে, ব্যাগটা থাক। বরং মেমসাহেবকে চার-পাঁচ কাপ চায়ের কথা বলে এসো।

গুমছে পোস্টমাস্টারের অন্দরের দিকে গেল। ছোট পোস্টঅফিসে যেবকম হয়ে থাকে, পোস্টঅফিস ঘরটাকে যেন পোস্টমাস্টারের বাসার বাইরের দিকের একখানা ঘর হিসাবে তৈরি করা হয়। গুমছে দরজা খুলেই অন্দর পাবে।

পোস্টমাস্টার বললে, আজ চিঠিপত্র নেবেন নাকি? সব দেখা হয়নি, কিছু আছে আপনার।

প্রভঞ্জন বললে, এসেছি যখন, নিলেও হয় ডাক। তা, মশায়, খবর আছে। আজ মেয়র, দেখলাম,

ব্রিজ পর্যন্ত এসেছে।

আজই! পোস্টমাস্টার অবাক হল। তার না মার্চের ৩০শে প্ল্যাস্টার কাটার কথা!

পোস্টমাস্টারের নাম মুরলীধর বসু। এখানে তার আট-ন মাস আসা হল, তা বলা হয়েছে। হলুদের ধার ঘেঁষা ফরসা রঙ। একটু রোগা হালকা চেহারা। গোলমুখে নাকটা একটু বেশি চোখে পড়ে। একটু দামী কাপড়-চোপড় পরতে অভ্যস্ত। টেবলে সাজানো তার কলমগুলো দেখলেও তার শৌখিনতা অনুমান হয়। বাদামীতে অ্যাম্বর রঙ মিশানো বড় ফ্রেমের চশমার পিছনে চোখদুটো চঞ্চল। চশমা খুললে দূর থেকেও বোঝা যায় চোখের কোণে কালি। দু-একটা চুল পাকা। বয়স এখনও ত্রিশের ঘরে।

পোস্টমাস্টার চিঠির বান্ডিলগুলো খুলে, চিঠি ভাগ করতে আরম্ভ করলে। চিঠির ব্যাপারে বৈচিত্র্য থাকে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চিঠিগুলোর মধ্যে, মাঝে মাঝেই ডিএফও-র নামে সরকারি চিঠি আসে। যদিও ডিএফও-র অফিস তাসিলায় নয়। এরকম হওয়ার হেতু এই যে, অনেকেই ধারণা করে ডিভিশনের নাম যখন তাসিলা, পোস্টঅফিসও তাসিলা হবে। অনেক ক্ষেত্রেই পোস্টমাস্টার সেগুলোকে রিডাইরেক্ট করে। যদি সরকারি খাম হয় অথবা আর্জেন্ট লেখা থাকে, প্রভঞ্জনের পরামর্শ নেয়। প্রভঞ্জন স্থির করে ডাকে যাবে, অথবা, স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে পাঠাবে। মেসেঞ্জার জাকিগঞ্জে ডাকের আগে পৌঁছায়।

আজও একটা তেমন চিঠি পাওয়া গেল। পোস্টামাস্টার বললে, বলিন বোসের নামেই চিঠি। কী করবেন, মেসেঞ্জার দিয়ে পাঠাবেন?

প্রভঞ্জন দ্বিধা করল, ঠিকানায় লেখা গোটা গোটা অক্ষরগুলোকে লক্ষ করলে। বললে, না, মশায়, স্ত্রীর পত্র নয়। তিনি, যতদূর জানি, ডিএফও-র সঙ্গেই আছেন।

পোস্টমাস্টার এখন বেশ তাড়াতাড়ি চিঠি সর্ট করছে। প্রভঞ্জনের একটা মনি-অর্ডার রসিদ পাওয়া গেল। সে সেটাকে হাতে নিয়ে বললে, এবারও দেরি হল দেখুন। ১ তারিখে পাঠানো, ৮ তারিখে পেয়েছে।

বাজারের চিঠি, বিভিন্ন মহল্লার চিঠি, ফরেস্ট অফিসের চিঠি, এরকম ভাবে পোস্টমাস্টার ভাগ করে করে রাখছে টেবলে। প্রভঞ্জনের খবরের কাগজ বার হল দুখানা। আজ পত্রিকা চোখে পড়ছে না এখনো। ফরেস্টের অর্থাৎ রেঞ্জ অফিসের এবং কর্মচারীদের নামের চিঠিই বেশি।

পোস্টমাস্টার চিঠি সর্ট করতে করতে মনে মনে হাসতে শুরু করলে। এরকম হাসির কারণ সব সময়ে বোঝা যায় না। অন্য ভাগগুলোর মতো একটা ভাগে ক্লটলং, এই ঠিকানায়, কিন্তু সে তো সপ্তাহেও তিনখানা হয় না। সব চিঠিই মাদার সুপিরিয়ার, ক্লটলং ইউনাইটেড চার্চ মিশনের। প্রায়ই সেগুলো ক্যাটালগ, ওষুধ, আর বইয়ের। একবার তো ল্যান্সেট নামে একখানা ডাক্তারি পত্রিকা রিডাইরেক্টেড হয়ে এসেছিল। আজকের একখানা চিঠিতে বেশ পরিষ্কার অক্ষরে লেখা মাদার জেন এয়ার, ক্লটলং, পোস্টঅফিস তাসিলা।

এই সময়ে গুমছে চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল। প্রভঞ্জন চোখ তুললে। মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায়, যেখানে পোস্টমাস্টারের বাসা এবং পোস্টঅফিস সংযুক্ত হয়েছে, সেখানে দরজাটার একটা পাল্লা খোলা, পাল্লাটার পাশে পোস্টমাস্টারের স্ত্রী সুচেতনার আধখানা শরীর চোখে পড়ল।

বাসন্তী শাড়িতে জড়ানো একটা পা, কোমরের একটা পাশ, জাফরানি ব্লাউজ যার গলার কাছে স্মক করা, তাতে ঢাকা স্তূপের গড়নের একটা বুক, যার উপরে চুলের গোছা, ফুলন্ত ঠোঁট, টিকলো নাক। গায়ের রঙ সাদায়-হলুদে। কপাল-ঢাকা চুলগুলো উস্কোখুস্কো। টানা চোখ, কিন্তু তার কোলে চওড়া কালি।

প্রভঞ্জন একা থাকলে সে নিজেই চা নিয়ে ডাকঘরে আসতো। অন্য লোক থাকায় সে দরজা

পর্যন্ত এসেছে। অবশ্যই জানতে চায়, চায়ে কিছু দরকার হবে কি না, অথবা কাপ কম পড়ল কি না।

প্রভঞ্জন আজ একটু অবাকই হল। একটু কি নতুন লাগছে? তার মনে বিষ্ণু দে-র কবিতা থেকে 'কালিমার মায়া চোখ ভুলিয়েছে' এরকম একটা শব্দ উঠে আসছিল। কিন্তু তাকে স্থানচ্যুত করে গৃহদাহের অচলার ছবি মনে ভেসে উঠল। কিন্তু তাতে সে লজ্জিত হল, কারণ, সে ছবিটা সেই সকালের, যখন অচলাকে সুরেশ—ছি ছি, ভাবলে সে, আমাদের স্নেহের পাত্রী এই চব্বিশ-পঁচিশের মেয়েটি— একটা পাপবোধ তাকে মনে করিয়ে দিলে, সে নাকি বন্ধুস্থানীয় এই ভদ্রলোকের বিবাহিতা।

সুচেতনা খুব মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, ঠিক হয়েছে চা?

গুমছে ততক্ষণে ডাক কাটতে শুরু করেছে, মহকুমা সদরের সেই ব্যাগ। ডাকটা কেটে উপুড় করতেই প্রথমেই একটা বড় প্যাকেট বার হল। যাতে ডাকটিকিট নেই। ঠিকানাও লেখা নেই। তা দেখে পোস্টমাস্টার বললে, ও আর দেখতে হবে না, গুমছে, ওটা তোমার মেমসাহেবের বই। গুমছে ব্যাগের অন্য সব চিঠিপত্র, পার্সেল পোস্টমাস্টারের টেবলে তুলে দিলে।

পোস্টমাস্টার চা খেতে খেতে বইয়ের প্যাকেটটা গুমছেকে দিয়ে বললে, দিয়ে এসো তোমার মেমসাহেবকে। হাবোল পাঠিয়েছে।

পোস্টমাস্টার চায়ের কাপ নামিয়ে অন্য চিঠিগুলোকে সর্ট করতে শুরু করলে। একটা পার্সেল ছিল চিঠিগুলোর মধ্যে। সে একটু অবাক হল। পার্সেলটার উপরে লেখা, মেডিসিন, উইথ কেয়ার। ঠিকানা, মাদার সুপিরিয়ার, ক্লটলং।

পোস্টমাস্টার চায়ের কাপে আবার মন দিলে। মনে মনে বললে, এ যে দেখছি ওষুধও আসছে।

প্রকাশ্যে বললে, আপনি কি ইতিমধ্যে ক্লটলং-এর দিকে গিয়েছেন, মিস্টার দত্ত?

প্রভঞ্জন বললে, না, কেন? বছর-খানেক আগে একবার গিয়েছিলাম। টিলাটা গোড়া থেকেই পৃথক, ফরেস্টের নয়।

ওখানে এখন একজন মাদার সুপিরিয়ার থাকে।

আচ্ছা? একটু পুরনো বাড়িটাড়ি কিছু ছিল বটে। তা, আমি তো শুনেছি, ওখানে নাকি এক সময়ে এক পাগলা সাহেব থাকতো। পাগলা ছাড়া তেমন নির্জন বাসে আর কে থাকতে পারে? কিংবা বিজনে থেকেই উন্মাদ। তা, সে তো শুনেছি, উদোম পাগল হয়ে গিয়েছিল বলে তার ভাইপো না ভাগনে, কে এসে তাকে নিয়েও গিয়েছিল। তারই কেউ এল আবার?

পোস্টমাস্টার বললে, তা আপনি ঠিকই শুনেছেন। সে তো বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। গুমছেরা দেখেছে সেই পাগল। বছর পনের আগে এখানে এসেছিল, একেবারে ফিটফাট এক ইংরেজ ফাদার। গ্রেগরী ব্রুস্টার। তার পর প্যান্টকোট ছেড়ে মোটা কর্কশ পশমের বোকু পরতে সুরু করল। স্নান করতো না, দাঁত মাজতো না, গায়ে উকুন, একমাথা চুল, একমুখ দাড়ি গোঁফ, আর তাব পর একদম নাগা হয়ে গেল, তাই না গুমছে?

গুমছে বললে, জু, সার, একদম নাঙ্গা।

পোস্টমাস্টার বললে, এখন সেখানে এক মাদার সুপিরিয়ার থাকছে।

সে কি, মশায়, মেয়েমানুষ, একলা? তরুণী না বৃদ্ধা?

যারা উপস্থিত, তাদের চিঠি দিচ্ছে গুমছে।

পোস্টমাস্টার সিগারেট ধরালে। প্রভঞ্জন তার পাইপ বার করলে।

পোস্টমাস্টার বললে, তা হলে গোড়া থেকে বলি! মাসতিনেক আগে, গুমছে তখন বাড়ি চলে গেছে। পোস্টঅফিস বন্ধ করবো। তখন হঠাৎ এক লেটফি দেয়া আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এল। কী? না, ক্লটলং চার্চ মিশনের কেয়ারটেকারকে বলছে, অ্যাটেন্ড স্টেশন টুয়েলফথ। ট্রেন তো আসে

রাত করে, যদিও আসার কথা বিকেলে। স্টেশনে একটা খোলা শেড ছাড়া কোনো ব্যবস্থা নেই। এদিকে আবার জেন। অর্থাৎ স্ত্রীলোক। কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকি ট্রেনের। কী করা যায়, ভাবতে ভাবতে নিজেই ক্রুটলং-এ চলে গেলাম। এক জঙ্গলে ঢাকা উঁচু চূড়ায় ঈগলের বাসার মতো, কাঠ আর টিনের তৈরি কয়েকটা ঘরের এক বাড়ি। আবার এক কাঠের চার্চও। কোনোকালে রঙ ছিল। টিকে আছে বটে ; অনেকদিন তার দিকে কেউ নজর দেয়নি, বোঝা যায়। শেষে এক বুড়ো পাহাড়িকে পেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কেয়ারটেকার কি না। সে বললে, তার নাম জন নামগিয়াল। জিজ্ঞাসা করলাম, আর কেউ সেখানে থাকে কি না। সে বললে, না। তখন তাকে আমিই বললাম, তা হলে তুমিই কেয়ারটেকার। তাকে টেলিগ্রাম পড়ে অর্থ বুঝিয়ে দিলে সে তো আকাশ থেকে পড়ল—মাদার সুপিরিয়ার কী অথবা কে তার কোনো ধারণাই তার নেই। যাক গে, ওদের কথা ওরা বুঝবে, এই মনে করে ফিরে আসতে আমার মনে হল, পারেও বটে এই মিশনারিরা। একা এক স্ত্রীলোক ওখানে থাকবে কি করে? না জেনে আসছে নাকি? কেউ কি কাউকে ঠকাচ্ছে এ ব্যাপারে? এর আগে যে ফাদার ছিল, সে তো পাগল হয়ে গিয়েছিল, তাও মনে হল।

আপনি তো মাদার সুপিরিয়ার বললেন, তা হলে তো আরও নান-টান থাকার কথা। প্রভঞ্জন বললে। এসব তো এতদিন বলেন নি।

অন্তত আজ পর্যন্ত আর কারও চিঠি আসে না। এদিকে দেখুন, বোধ হয় টুকটাক ডাক্তারি করে। পোস্টমাস্টার পার্সেলটা তুলে ধরে, ঠিকানাটা দেখালে প্রভঞ্জনকে। কী ভেবে মিটমিট করে হাসল। বললে, আর একটা মজা আছে এতে। এই নামটা, এই জেন এয়ার, আমার বিশেষ পূর্বপরিচিত মনে হয়।

প্রভঞ্জন রসিকতা করে বলল, তা হয় কি করে? আপনার কো-এড বলবেন? আপনি তো কোনো কালে ডাক্তারি পড়েননি। সুন্দরী নাকি? সে জন্য এতদিন বলেননি?

কিন্তু তাদের আলাপে বাধা পড়ল। তাসিলায় পিডবলুডি-র একজন মাত্র লোক থাকে। একজন রোড ওভারসিয়ার। সে আর তার তিন চারজন লোক তাসিলার পথঘাট তদারক করে। সবগুলো নয়। প্রধান দু তিনটে পথ যা কোন না কোন ভাবে ন্যাশন্যাল হাইওয়েতে যুক্ত। অন্যগুলো ফরেস্টের। ওভারসিয়ার ছুটির কথা জানতো না। কাজেই তার মনিঅর্ডার করা হল না। পোস্টমাস্টারকে বলাতে সে খাম-পোস্টকার্ড কিছু বিক্রি করলে। সেও এতক্ষণ চা খেতে খেতে পোস্টমাস্টারের গল্পের নীরব শ্রোতা ছিল। সে প্রভঞ্জনকে বললে, ছোটসাহেব, আপনার সঙ্গে দেখা করবো ভাবছিলাম। কিছুদিন আগে মেয়র একটা ব্রিজের কথা বলছিলেন। তা ব্রিজটা দেখলাম ফরেস্টের। আমাদের নয়। যদি কিছু কাঠ আর মিস্ত্রী দেন, তা হলেও, আমি দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা করিয়ে দিতে পারি।

প্রভঞ্জন বললে, বেশ তো, আপনি মাপজোখ করে বলবেন, কনট্রাকটরদের কাঠ আর মিস্ত্রী দিতে বলে দেবো।

ওভারসিয়ার চলে গেলে প্রভঞ্জন বললে, চলুন আমরাও উঠি। ছুটির দিনটার সকালে কয়েক গেম পিংপং খেলা যাক। পোস্টমাস্টার বললে, তা হলে তো গুমছেকে বলতে হয় বন্ধসন্ধ করতে। আপনার চিঠিগুলো কি আজ ডেলিভারি নেবেন?

রেঞ্জার একজন গার্ডকে দেখিয়ে বললে, আনরেজিস্টার্ড ওকে দিন, আমার বাসায় রেখে আসবে। বরং আপনার বান্ধবী জেন এয়ারের কথা শুনি।

পোস্টমাস্টার চিঠি দিয়ে প্রভঞ্জনকে বললে, আমি তা হলে বলে আসি।

দু-এক মিনিটে পোস্টমাস্টার ফিরে এল। কিন্তু গুমছেকে অফিস বন্ধ করার কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত করলে। বললে, গুমছে একটা কথা কী, পার্সেলটা ওষুধের। এদিকে যদিও আমাদের বন্ধ, ওদিকে কিন্তু কারো রোগের বাড়াবাড়ি থাকতে পারে। ক্রুটলং যাবে একবার? মেমসাহেবের ওষুধটা

দিয়ে এলে হয়।

এ সময়ে প্রভঞ্জন ভাবলে, মিশনারিদের এই একা একা থাকা আশ্চর্য ব্যাপার। সমাজ থেকে দূরেই তারা থাকে। কিন্তু ঘরের কাছে এই ক্লুটলং যার উপর দিয়ে সে ফরেস্টে যাওয়া আসা করেছে দু-এক বার, থাকতে গেলে তা কী ভয়ংকর নির্জন।

মরুক গে।

২

পোস্টমাস্টার চলে গেলে সুচেতনা ভিতর থেকে পোস্টঅফিসের দরজা বন্ধ করে দিলে। এখন আটটা বাজে, সে স্নান করতে যেতে পারে। তা ছুটির দিনে আধ ঘণ্টা ঢিলে দিলে চলে। সে তার বসবার ঘরে চলে এল। তাকে কাজে সাহায্য করার জন্য দুজন আছে। যদিও একজনের বেশি দরকার হয় না। এটাও পোস্টমাস্টারের শৌখিনতা? অবশ্য কাজের লোক এত সস্তা এখানে।

ডাকে আসা বইয়ের প্যাকেটটা সে ইতিমধ্যে খুলেছে। উপন্যাস দুখানা তার খুব পছন্দের, কিছুদিন আগে সে হাবোলকে লিখেছিল। এতদিনে পাঠাতে পেরেছে। লাইব্রেরিতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না বোধহয়। সে বইদুটোর সামনে চেয়ারে বসল।

তার মনে হল, হাবোলকে চিঠি লিখলে হয়। মনে হওয়াতে তার চোখের সামনে হাবোলের মুখটা যেন ভেসে উঠল। প্রকৃতপক্ষে হাবোল তার নাম নয়। তার একটা ভালো নাম আছে, সুবলসখা। এই নামটা সে এক সুদৃশ্য বড় নিমন্ত্রণপত্রে দেখেছে। সুবলসখার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র।

প্যাড টেনে নিয়ে সুচেতনা চিঠি লিখলে।

ভাই হাবোল, তোমার পাঠানো বই দুখানা এখনই পেয়েছি। তোমাকে ধন্যবাদ। মনে ভাবি, তোমাকে একটা মস্ত বড় চিঠি লিখি। তা বোধ হয় কোনোদিন পারবো না। আমি যদি কোনো ব্যাপারে তোমাকে নিমন্ত্রণ করি? যদি তোমাকে, মনে করো, আমাদের কাছে এসে কয়েকদিন থাকতে বলি? তুমি সাহস দিলে তা বলবো। জানো, আমাদের এই ছোট্ট শহরটা মন্দ নয়। না, হিল স্টেশন নয়। হওয়ারও নয়। তা হলে কি ব্যবসাদাররা তা এতদিনে করতো না? কিন্তু এখানে পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, শহরের মাঝখানে কালিঝোরা। ডাকঘরের নীচেই একটা প্রপাত। একটা ক্ষুদে হাইড্রোপাওয়ার হাউস। জানো, আমাদের এই ছোট্ট শহরে এক মেয়র আছে। কী তার ফাংশন জানি না। হয়তো যখন যার প্রয়োজন হয়, সে জানতে পারে। প্রাচীন দুর্গ আছে, লখনৌ রেসিডেন্সির মতো কবরখানা আছে। চোর্টেন পিকটাও দেখতে ভালো। তুমি এলে—

সুচেতনা একবার লিখলে, আমার বুকের পাষাণভার নামে। কেটে লিখলে, বুঝবো সব মিটে গিয়ে আগের মতো হল। আবার কেটে লিখলে, আমার ভালো লাগবে। তোমার সোনাদি।

৩

মেয়রভবনের দিকে যেতে যেতে পোস্টমাস্টার বললে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবি।

প্রভঞ্জন হালকা সুরে বললে, কী, জেন এয়ারের কথা? তিনি তো আপনারই বন্ধু।

পোস্টমাস্টার হেসে বললে, আপনার দেখছি রোমান্টিক মনে হচ্ছে তাকে? আসলে সে হয়তো

বা রসকষহীন, দাগ-দাগালিওয়ালা এক কড়া মুখের প্রৌঢ়া। শতহস্তেন–

তা হলে?

আমাদের মেয়রের কথা, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, কী দারুণ সহ্যশক্তি? অ্যাকসিডেন্টের পরে একেবারে দাঁত কামড়ে ছিল। একটা উঃ আঃ পর্যন্ত করেনি। সে রকম একটা ফ্র্যাকচারের ব্যথা তো সোজা নয়। যেন সহ্য করতে ট্রেনিং পাওয়া।

সহ্য করার আবার ট্রেনিং হয় নাকি মশায়? প্রভঞ্জন অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করলে।

মনে করুন, যেমন ট্রেনিং বিলেতে স্পেশাল আর্মি অফিসারদের, কিংবা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসারদের হতে পারে?

এ তো আমি কোনোদিন ভাবিনি।

আপনার হেডক্লার্ক মিত্রবাহাদুর কালই বলছিল, হয়তো এমন হতে পারে যাকে আমরা মেয়র বলছি, সে একজন বড় ইন্টেলিজেন্স অফিসার।

মিত্রবাহাদুর বলেছে? আশ্চর্য! এমন তো হতে পারে মেয়র লোকটার মধ্যে একটা ম্যাসোকিস্ট-ভাব আছে? এই বলে প্রভঞ্জন হাসল।

কিন্তু এটাও সত্যি, বন্দুক-কাঁধে ঘন কুয়াশার মধ্যে রাতের অন্ধকারে টর্চ সম্বল করে তাকে তাসিলার পথে হেঁটে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। আমি দেখিনি। সুচেতনা এক রাতে নাকি দেখেছে, বলে। অকারণে?

তা যেমন সত্যি, আবার এটাও সত্যি লোকটির নিজের শরীরের উপরে দুখদরদ খুবই কম। আপনাকে একটা খবর বলি, সদরের ডাক্তার হঠাৎ আবিষ্কার করেছে। এরকম তো হয়, আপনি শুনেছেন, ডাক্তারের কাছে এক রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে অন্য এক কঠিনতর রোগ, যা রোগী ভ্রূক্ষেপও করেনি, আবিষ্কার হল। সদরের ডাক্তার বলেছিল ওর বুকে একটা দোষ আছে। হার্ট বিট স্বাভাবিকের চাইতে দ্রুত। মাঝে মাঝে ব্যথা হওয়ার কথা, নিঃশ্বাসে অসুবিধা থাকার কথা। কিন্তু ও বললে, কোনোদিন নাকি বোঝে না সেসব।

পোস্টমাস্টার বললে, আশ্চর্য! হাঁটা চলার ভঙ্গি, বিশেষ খেলার সময়ে, অ্যাকসিডেন্টের আগে দৌড়ঝাঁপ, হাসি, গল্প, এসব দেখে কখনো মনে হয়নি তো।

প্রভঞ্জন বললে, ওর নিজেরই মনে হয়নি, তা আপনার হবে কি করে?

আমরা আজন্ম যে ব্যাধি বয়ে বেড়াই তা নিজের নিজের রিপুগুলোর মতো নিজের অংশ হয়ে যায় বলছেন? ব্যথা, দুঃখ, বিবেক-কামড়, এসব বোধ হয় বলছেন?

সর্বনাশ! রেঞ্জার হো হো করে হেসে উঠল।

একটা কথা, পোস্টমাস্টার বললে, মেয়র কিন্তু বয়সে আমাদের চাইতে অনেকটা ছোট। আমার মনে হয়, আপনি যদি বলেন, ডাক্তার দেখাতে হয়তো রাজি হবে। বুকের কথাই বললেন না?

রেঞ্জার হাসিমুখে বললে, কিন্তু সে যদি একজন আর্মি বা পুলিশের ইনটেলিজেন্স অফিসার হয়ে থাকে, যেমন আপনি বলছেন, আমার কথা গ্রাহ্য করবে কেন? যদি বলে, লেট আস নট বি সো ক্লোজ? আপনি তো ভাবিয়ে দিলেন, মশায়।

না, আপনাকে ছুটির সকালে ভাবতে বলছি না। কিন্তু আপনি কি মেয়রের গলার হারটাকে লক্ষ্য করেছেন?

প্রভঞ্জন বললে, কী একটা ছিল বটে গলায়, হসপিট্যালের ওরা ওর হাতঘড়ি আর একটা হার আমাকে রাখতে দিয়েছিল বটে। তা আজকাল আমাদের দেশের যুবকরা পরছেও তো।

আমার ধারণা বেশ দামী। লকেটটা তো বেশ দামী জেডের। রুচিটাও সফিস্টিকেটেড। ওর গলায় দেখেছি।

পিতলের নয় বলছেন? প্রভঞ্জন এই বলে ভাবলে, এসব পোস্টমাস্টারের কথা বলার জন্যই কথা বলা। কিন্তু এ রকম করেই সে চিন্তা করে থাকে। ফলে তার নিজের চাইতে অনেক পরে এলেও এই তাসিলা সম্বন্ধে অনেক বেশি খবর রাখে। এ রকম ভাবতে ভাবতেই সে কিছু আবিষ্কার করেও ফেলেছে। তাসিলা সম্বন্ধে তার প্রবন্ধগুলো তার প্রমাণ।

সামনে চড়াইটা তারা মুখ বুজে উঠতে লাগল। তখন প্রভঞ্জন ভাবলে, অথচ মেয়র ফরেস্ট থেকে নিয়মিত বেতন নিয়ে থাকে। সেখানে বেতনের খাতায় তার নাম লেখা থাকে মেয়র এফ জি তাসিলা। যদিও অ্যাকাউন্ট্যান্ট একটা পৃষ্ঠায় শুধু তারই নাম লেখে।

এই সময়ে পোস্টমাস্টার ভাবলে, এটা কিন্তু রেঞ্জারের চরিত্র যে, সে সব সময়েই সকলের সঙ্গে মিশছে, যাকে কেন্দ্র করে এখানকার সামাজিক জীবন অনেকটা বিবর্তিত, তার মধ্যেও একটা ভাব আছে যা কথায় প্রকাশিত না হলেও বুঝিয়ে দেয়, লেট আস নট বি সো ক্লোজ। ঠিক অতটা কাছে নয়। অবশ্য তার সঙ্গে পরিচয়টা ক্রমশ বাড়ছেই এখন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

গালের তলায় দুহাত রেখে রবিবারের ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে ধড়ফড় করে উঠে বসল জেন এয়ার ; রবিবার হলেও ইন্টার্নীদের ডিউটি থাকে, আর তা সকাল ছটাতেই, যেজন্য হোস্টেল-মেইড কড়া নাড়ছে ; চোখ মেলতেই কাঠের মেঝেটায় চোখ পড়লে বুঝলে সে, হোস্টেল নয়, আর এটা সেই পরিচিত লোহার খাটটাও নয়। রবিবার? বরং লম্বা নিচু বেঞ্চ যেন রেলগাড়ির। আতঙ্কিত হয়ে সে নিজের গায়ে হাত বুলাল, আর কিছু নিশ্চিন্ত হল যে তার গায়ে প্রিন্ট মসলিনের ম্যাক্সিটাই বটে, যা সে কাল রাতে পরেছিল ; দু পায়ের উপর থেকে নরম রাগটাকে সরিয়ে পা নামাতে গিয়ে সে উরু দেখে অবাক যে প্যান্টি পরেনি, এবং এটা ডিভান যাতে সে শুয়েছিল, রেলের বেঞ্চ নয় ; আর রোদ আনা কাঁচের শার্শিটা রেলের মতো চৌকোণ বটে, এটা রেলের কামরা নয়।

ঘরের মেঝেতে এসে পড়া হলুদ রোদের একটা সামন্তরিকের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে হাসল। স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে যেন স্বপ্ন দেখা। এটা তার বাংলোর একেবারের উত্তরের ঘর যাতে কিছু বই আছে। আংশিক ঘুন লাগা, শেলফে কিছু পোকা-লাগা, চামড়া বাঁধাই ক্লাসিক, কিছু ঘুনমাটি লাগা রেক্সিন বাঁধাই, কিছু ড্যাম্প-ধরা পেপারব্যাক। পর পর কয়েকদিন রোদ লাগানো ও ঝাড়ার ফলে হাত দেয়া যায়। গ্রেগরী পায়াসের উত্তরাধিকার। তার নিজের আনা বই, পত্রিকা, এসব শোবার ঘরে, হোয়াটনটে।

আ, থেনডুপ, বলে সে সাড়া দিলে থেনডুপ চাবি ঘুরিয়ে বেডটির ট্রে নিয়ে ঢুকল। সেই কড়া নাড়ছিল। সে একটা টিপয়ের দিকে ইঙ্গিত করাতে, থেনডুপ তার উপরে চা রাখলে।

কেমন আছে?

ভালো, ঘুমায়। কিছু কি দরকার ছিল?

ওতেই হবে।

থেনডুপ চলে গেলে জেন উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে আলোর সামন্তরিক, ডিভান ও তার কাছাকাছি মেঝেতে ; তা উজ্জ্বল ক্রোম হলুদ হলেও ঘরের অন্যত্র এখনো হালকা কোবাল্ট নীল।

তার পরনে কচি কলাপাতায় সাদার বিন্দু এমন মসলিনের ম্যাক্সি। তাকে সুন্দরী বলা হবে? গায়ের রঙ রক্তের লেশহীন এমন সাদা। তার প্রোফাইল স্ত্রীলোকের পক্ষে বেশি ধাবালো, গাঢ় বাদামি চুল, উচ্চতা পাঁচ-ফুট আট-ইঞ্চি অর্থাৎ সাধারণ পুরুষের চাইতে বরং বেশি, পাছা মাংসল নয় কিন্তু চওড়া, মাই ছোট, ফলে ওদেশের এল গ্রেকোর ছবিব লম্বাটে ধাঁচের আকর্ষণ আছে। সবচে চোখ, সেখানে কিছু খুঁত আছে যা অনেক সময় গ্লাসে ঢাকা থাকে।

ডক্টব জেন এয়ার ফিলজফি অথবা ডিভিনিটির ডক্টর নয়, চিকিৎসক। তার বয়স সে ত্রিশ বলে, সন্দেহ হয় কিছু কম। ইতিমধ্যে ব্রুটলং চার্চ মিশনের মাদার সুপিরিয়াব।

সে আর একবার চারিদিকে তাকাল। এই ঘরে, যাকে সে এখন লাইব্রেরি নাম দেবে কি না ভাবছে, ডিভানে হাল্কা রাগ পায়ের উপরে চাপিয়ে বই পড়তে পড়তে সে কাল রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তা, সে বই পড়তে শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছাদেব টিনে ঝমঝম শব্দ করে বৃষ্টি নেমেছিল। দু একবার কাঁচেব শার্সিতে বিদ্যুতের আকাশচেরা দেখেছিল সে। বাইরের ডালপালার ভাঙাচোরা না হলেও ব্যস্ততার সাড়া পাচ্ছিল সে। কিছু ভাঙলে কি উল্লাস হয়? কিন্তু তারই প্রতীক্ষা। বইয়ের অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে জলের বিন্দু জমছিল , প্যারাগ্রাফের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে নামছিল , তার যেন এক রকমের তৃষ্ণা বোধ হচ্ছিল, আর তা রক্তে, যা হতে পারে না কারণ রক্তই তো তরল, তার তৃষ্ণা কেমন হয়? আর বইয়ের গায়ে জলও তো কল্পনা। যেন ঘরের বাইরের পাহাড়েব টিলাগুলো, খাদগুলোর সঙ্গে তাব শরীর একাকাব, যদিও সে ঘরের ভিতরে, আর বৃষ্টি হচ্ছে বাইবে, মার্চের শুকনো শুকনো ধুলো ভিজিয়ে, রাতের অন্ধকারে, সকলের চোখের আড়ালে। অদ্ভুত সব অনুভূতি, যা মনে থেকে প্রমাণ করে, সবটুকু স্বপ্নে দেখা নয়। ঘুমের গুহামুখের অনুভূতি।

অন্য দিনের তুলনায় মুখের ভিতরটা শুকনো মনে হওয়ায়, সে স্থির করলে বেডটির আগেই কুলকুচো করবে। সে বাঁ দিকে চাইল বাথের জন্য, কিন্তু এটা শোবার ঘর নয়, আবার বুঝতে পাবলে, যার বাঁ দিকে বাথ। কিছুক্ষণ মুখে রোদ পড়েছে, আর স্বপ্ন দেখার জন্যই কুণ্ঠিত উত্তেজনায় মুখের ভিতরটা শুকনো। সে স্বপ্ন দেখছিল নিশ্চয়। একটা বিড়ালের।

আড়াআড়ি শোবার ঘর পার হয়ে সে বাথে ঢুকল। পাথরের মেঝেটা শোবার ঘরের কাঠের মেঝে থেকে আড়াই ফুট নীচে, তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে। আর এক দিকের দেয়াল দেখে তো মনেই হয় সেটা পাহাড়ের গা, যাকে কেটে কেটে মসৃণ করার চেষ্টা হয়েছিল, আর যা, সে আসার পরে, থেনডুপ লোহার ব্রুশে ঘষে ঘষে, শ্যাওলা তুলে কিছু পরিষ্কার করেছে। মেঝের কিছুটা পুরনো লিনোলিয়ামে ঢাকা। একটা প্রকাণ্ড পুরনো এনামেল করা বাথটাব। ঢুকবার দরজার পাশে, আয়নার নীচে পোর্সেলিন বেসিন। পাশে কাঠের বেঞ্চে বড় বড় কয়েকটি মাটির কুঁজোয় জল। নিচু ছাদে মরচে ধরা ঝাঁঝর। থেনডুপ ট্যাঙ্কটা সাফ করেছে। বাথটাবটার পিছনে লেগে আছে। আজ থেকে হ্যান্ডপাম্পটায় জল তুলবে ছাদের ট্যাঙ্কে। দেখা যাক ঝাঁঝরে জল এলে, তা কেমন হয়।

কুঁজো থেকে জল নিয়ে চোখে মুখে দিলে সে। সুন্দরীরা যেমন বার বার দেখে, তেমন তাকাল না সে আয়নার দিকে। বার-কয়েক কুলকুচো করল, দু হাত দিয়ে কপালের চুল সরালে। তোয়ালেতে হাত মুখ মুছে, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে এই বলে, বাথের দরজা খোলা রেখেই চায়ের কাছে ডিভানে ফিরে এল।

খুব স্বপ্ন দেখেছে সে! চা মুখে দিয়ে, সে নিজেকে বললে, চা-টা থেনডুপ ভালোই করে। এই মিশন হাউসে শিখেছে, সন্দেহ নেই। ঘুমিয়েছেও খুব। তা হলেও যত বেলা হয়েছে, মনে হচ্ছিল, তা হয়নি। সে স্বপ্নটা মনে করে হাসল আপন মনে। সে আর ইন্টার্নী কোথায়? তা হলেও এখনই একবার চামলিংকে দেখতে যেতে হবে। থেনডুপকেও কাল রাত্রিতে সে সকাল সকাল ডাকতে বলে দিয়েছিল। ভাগ্যে বাংলোর স্টোর রুমে বাড়তি লোহার খাটটা ছিল, নতুবা চামলিংকে কাঠের

মেঝেতে শুতে দিতে হতো। কিন্তু কে শুতো সেই লোহার খাটে সে এখানে আসার আগে? নামগিয়াল জন যদি হয়, কী আশ্চর্য একা থাকতে পারে লোকটা, এই একটা বাড়িতে একা কাটিয়েছে বুড়ো তিন-চার বছর কিংবা আরও বেশি। থেনডুপ তখনো হয়তো দু-এক ঘণ্টার জন্যই আসতো, এখনো সে সন্ধ্যা হলেই বস্তিতে চলে যায়।

ভাগ্যে লোহার খাটটা ছিল। এখন তাকে দেখে নিতে হবে, কোথায় কোথায় কী আছে মিশনেব। আব মাকড়সা যতই থাক, যতই দীর্ঘ উরু হোক তাদের, লাম্বার রুমেও ঢুকতে হবে। তিন মাস হয়ে গেল। রিপোর্ট ডিউ হয়েছে। মিলিয়ে দেখতে হয়, মেরামতের লিস্ট করতে হয়, নতুন কী দবকার তাও দেখে নিতে হবে। তিন মাস হল আসা তার।

থেনডুপ আবার এল। দরজায় নক করে অনুমতি পেয়ে, বললে, জ্বর এখন এক। নামগিয়াল দেখলেন।

থেনডুপের চওড়া মুখ হাসিতে চিরে দুটুকরো হল।

থেনডুপের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে কোথাও। সে তুলনায় নামগিয়াল জনের পঁচাত্তর হবে। থেনডুপেব পরনের পুরনো আধময়লা পোশাক যেমন, তার হলুদ ত্বকও তেমন, যেন এককালে তার নিজেরই ছিল, এখন আর নয়। যেন দারুণ খরায় ধুঁকছে এমন কোনো বৃষ। তার কপাল, চেরা চোখ, যার উপবেব পাতার বাইরের কোণদুটি গালের চামড়ায় কেমন সাঁটা ; উঁচু, চোখ-ছোঁয়া গালের হাড়, এ-সবই বলে দেয় সে ভোটতিব্বত গোষ্ঠীর। তার ভাষা কিছু প্রমাণ করে না। এতক্ষণ তার মুখে যে কথা দেয়া হল, তা তার কথার অনুবাদ। তার আসল ভাষা, তার মতো এখানকার অধিকাংশ মানুষের ভাষা, এমন এক মিশ্রণ যা তাসিলার বাইরে কোথাও বোঝা যায় না বলে গল্পেব পক্ষে অব্যবহার্য। এমন কি জেনেরও বুঝতে অসুবিধা হয়।

জেন চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললে, চলো।

সে শোবাব ঘরেব কোণের বইয়েব শেলফের উপর থেকে স্টেথস্কোপ হাতে নিলে। মনে মনে বললে, ইনজেকশন দেয়ার সময় হল। জ্বর নেমে থাকলে ওষুধ কাজ কবছে। পবশুদিন চাব ছিল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্লিপাবেব শব্দ কবে সে শোবার ঘর পার হল, পার্লারে অর্থাৎ রোগীর ঘবে যেতে। সেখানেই রাখতে হয়েছে বোগীকে। সে ভাবলে, মুশকিল এই, ইনজেকশনও তার বেশি নেই। এখানে কিছু নেই, এই জানার ফলে তাব সঙ্গে যে ওষুধ এসেছে, তার মধ্যে তরল ওষুধ আর ইনজেকশন অ্যামপিউলের চাইতে বড়ি, ড্রাগ, ক্যাপসুল বেশি। ভাগ্যে জলের অ্যামপিউল সহজে নষ্ট হয় না, ভাগ্যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো গুঁড়ো অবস্থায় থাকে। এখানে ফ্রিজ কখনো হবে না, যদি না নিজেদের জেনারেটর চালানো হয় ; তার অর্থ শুধু জেনারেটর কেনা নয়, তার চব্বিশ ঘণ্টার অপাবেটব নিয়োগ করাও। এমন কি মেয়র থাকলেও, তাসিলাতেও ইলেকট্রিসিটি সামান্য ; আর মিশন হাউস তো, প্রকৃতপক্ষে, সেদিক দিয়ে তাসিলার বাইরে। সেই ক্যানটনমেন্টেব সময় থেকেই প্রাইভেট প্রপার্টি।

তো, এই রোগীকে নিয়ে কৌতুকও ছিল, যদিও আশঙ্কাই বরং বেশি।

জন নামগিয়ালই প্রথমে দেখেছিল বাংলোর পথের ঢালু বেয়ে উঠতে। অত্যন্ত কর্কশ কালচে পশমের বোকু, যার কাঁধ থেকে দুখানা মোটা শক্ত অনাবৃত হলুদ অকার বাহু, আর ঝুলের নিচে বরং আরো কালচে হলুদ অকার পেশীতে ডিম তোলা, ভ্যারিকোজ ভেইনের জোঁক সমেত এক জোড়া খালি পা ; তার পিঠের উপরে শোয়ানো, কাপড়ের পট্টিতে দুজনের পেট জড়িয়ে বাঁধা, ছেঁড়া ময়লা আলখাল্লার মতো কিছু পরা এক মানুষ। ভারবাহী যে স্ত্রীলোক, তা বোঝা যায়। স্ত্রীলোক, যার বয়স চল্লিশ হবে, যার চুলের বেণী ময়লা জট, যার এক হাতে গোল মোটা এক শঙ্খ, যার মাথা আর লেজের কোণ দুটি কেটে তার মধ্যে হাত গলানো, দুই রগে পুরনো রক্তের মতো কালচে

প্ল্যাস্টিকের চাকতি আঁঠা দিয়ে সাঁটা। থেনড়ুপ ছিল নামগিয়ালের কাছে, সে দৌড়ে জেনকে ডেকে এনেছিল।

দু এক মিনিট স্ত্রীলোকটির দিয়ে চেয়ে থেকে বলেছিল, ইজ পাশাং ওয়াইফ।

অর্থাৎ (এখন জেন থেনড়ুপের এই ইংরেজি বোঝে) পাশাং-এর স্ত্রী।

ততক্ষণে স্ত্রীলোকটি তার পিঠ থেকে লোকটিকে গড়িয়ে গড়িয়ে বাংলোর সিঁড়িতে বসিয়েছে। লোকটি না বলে ছোকরা বলাই ভালো। দাড়ি গোঁফের জায়গায় কয়েকটা লম্বা লোম। হলুদ মুখ জ্বরের তাড়সে লাল।

জেন জিজ্ঞাসা করেছিল কী চায় তারা।

থেনড়ুপ পাহাড়ি ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করলে, স্ত্রীলোকটি সে ভাষাতেই কিছু বললে। তখন থেনড়ুপ ঘোষণা করল, ইজ সিক।

জেন কব্জিতে হাত দিয়েই বুঝেছিল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। স্টেথস্কোপ বুকে বসিয়েই বুঝেছিল, ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেয়া যাবে এমন রোগী নয়।

গ্রেগরীর সময়ে ইনডোর রোগী রাখার জন্যই নাকি এই আউট হাউস তৈরি হয়েছিল, সেজন্যই সেখানে মেঝের পাথরের উপরে কাঠ বসানো। কিন্তু গত পাঁচ বছর তা রাত করে থেনড়ুপের গোরু রাখার ঘর। দেয়ালের কাঠও এত ফাঁক ফাঁক যে তাতে রোগী রাখার কথা ভাবা যায় না। দেখা যাচ্ছে, মাদার সুপিরিয়ার প্রস্তুত করেনি নিজেকে। এতদিন, প্রকৃত তথ্য, কোনো রোগী আসেনি ; কেই বা জানে সে ডাক্তার এবং এর আগে যারা ছিল, তাদের চাইতে ওষুধ বিতরণে তার যোগ্যতাই বেশি?

জেন চটপট স্থির করলে কী করা উচিত। শোবার ঘর থেকে বাড়তি এক লোহার খাট, তোশক, কম্বল, আলমারি থেকে চাদর ইত্যাদি থেনড়ুপের সাহায্যে এনে পার্লারে রোগীর বিছানা করেছিল। তারপর হাতের ইশারায় জানিয়েছিল, রোগী এখন বিছানায় শোবে এবং তার বাহক স্ত্রীলোকটি চলে যাবে।

তখন থেনড়ুপ রোগীর দিকে আঙুলের ইশারা করে বলেছিল, ইজ চামলিং। হাল হাসব্যান।

জেন কিছুক্ষণ আগে শুনেছে, পাশাং ওয়াইফ। সে বললে, নট পাশাং?

থেনড়ুপ জটিল অবস্থা পরিষ্কার করতে বলেছিল, ট্রু পাশাং। হিস ব্রাদল ইজ। অর্থাৎ, পাশাং-এর স্ত্রীও বটে এবং চামলিং পাশাং-এর ভাই, তারও স্ত্রী।

সে যাই হোক, তখন রোগীকে বিছানায় নেয়া দরকার, আর সে ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ আর এক অসুবিধা দেখা দিল। থেনড়ুপ তখনো বিছানা করছে। রোগীকে একটা টুলে বসিয়ে তার বুকে স্টেথস্কোপ আর একবার বসাতে গিয়ে, জেন লক্ষ্য করলে তার পোশাকে এবং গায়েও অসংখ্য সরষের আয়তনের কিন্তু মাকড়সার চেহারার পোকা, যাদের লাল রঙ থেকে সন্দেহ থাকে না তারা রক্তপায়ী। রক্তহীন মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জেন মনে মনে 'ও লাউসি!' বলে শিউরে উঠল। ডাক্তার না হলে তাকে ছুটে পালাতে হত। গ্রেগরী কখনই পুরো হসপিট্যাল তৈরি করেনি যে রোগীর ইউনিফর্ম থাকবে। পাশাং-এর স্ত্রীকে ঘরের বাইরে যেতে বলে, থেনড়ুপের সাহায্যে রোগীকে বসনচ্যুত করে, তার উলঙ্গতাকে এক সাদা চাদরে জড়িয়ে, বিছানায় শোয়ানো হয়েছিল।

রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়াল জেন। জ্বর কমেছে, গা ঘামছে। কাল তার বেডের কাছে যে ওষুধগুলো সাজিয়েছিল, তার থেকে একটা অ্যালকালি মিকশ্চার ঢেলে নিয়ে, তাতে আর খানিকটা জল আর গ্লুকোজ মিশিয়ে, ধীরে ধীরে চামলিংকে খাইয়ে দিলে সে। তোয়ালে নিয়ে, কম্বলটা সরিয়ে সরিয়ে, আস্তে আস্তে রোগীর মুখ, গলা, বুক থেকে ঘাম মুছে দিল ; তার পর বুক দেখলে, জিভ

দেখলে। রোগী, বোধহয়, অনেকক্ষণ থেকে মুখ বুজে পিপাসা সহ্য করছিল। পিপাসার শান্তিতে সে হাসল। জেন আঙুলের ইশারায়, তাকে তার নিজের চোখের দিকে চাইতে বললে, চামলিং তার মুখের দিকে তাকাল। এবারের হাসিটা একটু বেশি ক্লান্ত কিন্তু মিষ্টি। জেন তার চোখ টেনে টেনে দেখলে, নিশ্চিন্ত হল।

ইনজেকশন তৈরি করে তার রোগা বাহুতে সূচ বসাতে গিয়ে জেনের মনে হল, দেখো, কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখো, পরশুদিনের সেই প্রৌঢ়া-প্রায় স্ত্রীলোকটির, যার বয়স অবশ্যই চল্লিশের কাছে যা নাকি তার স্বামী পাশাং-এর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ থেকেও বরং বেশি, তারই স্বামী না কি এই ষোল সতের বছরের ছেলেটিও। এই ছেলেটি—কাল নিজের হাতে যখন সে স্পাঞ্জ করে দিচ্ছিল, তখন লজ্জা পাচ্ছিল যে কোন কিশোরের মতো। কিশোর অথচ ইতিমধ্যে এক প্রৌঢ়ার সহস্বামী। অথচ দেখো, সীমান্তর ওপার থেকে, কতদূর থেকে মায়ের মতো স্নেহে নিজের পিঠে বয়ে এনেছিল সেই প্রৌঢ়া। মানুষে মানুষে সম্বন্ধের এটা এক বিচিত্র রূপ বটে।

সেই ঘরেই অন্য পাশের লোহার খাটে নামগিয়াল। সেই বৃদ্ধর হাঁপানির মতো একটা রোগ আছে। জেনের ধারণা, তা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস যার চিকিৎসা হয়নি। কাশি শুরু হওয়ার ভয়েই সে বিছানা ছাড়ছে না।

জেন তাকে বললে, এখনই সিরাপ খেয়ো না। আর একটু চা খাও। তোমার নয়, আমার চা। সে ভাবল নামগিয়ালের ওষুধের পার্সেলটা একদিনের মধ্যে আসা ভাল হবে।

ও ইয়াস। বলে হাসল নামগিয়াল।

জেন চামলিং-এর কাছে গিয়ে তার কপালে গালে হাত বুলিয়ে দিলে। তাতেই বলা হল, ডোন্ট ওয়ারি। সে থেনডুপকে বললে, মাউথ ওয়াটার, হাফবয়েলড এগ, মিল্ক, বিস্কিট ফর পাশাং ওয়াইফ হাজবেন্ড। থেনডুপ বিস্মিত হল খাদ্যের মহার্ঘ্যতা বিবেচনা করে। কিন্তু সে বুঝেছে, তা বোঝাতে মাথা দোলালে। জেন নামগিয়ালের দিকে আঙুল তুলে বললে, মাই টি ফর হিম। থেনডুপ তার ন্যাড়া মাথা দুলিয়ে বোঝাল, এটাও সে বুঝেছে।

থেনডুপ পার্লার থেকে বাংলোর বাইরের চত্বরটায় এসে দাঁড়াল। পরে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সে নিচের উপত্যকায় নামল। এতটুকু এক উপত্যকা যা থেকে চাষ-আবাদের টিলা একদিকে, অন্যদিকে মিশনের চার্চটা। চাষ-আবাদের টিলাটায় যেতে এক পাকদণ্ডি ধরে উঠতে হবে। সে বরং উপত্যকা ধরে চলে সেই আবাদ-টিলার অন্যপাশে যেতে লাগল।

রোদ উঠেছে। রাতের বৃষ্টির জন্য বাতাসে এখনও ঠাণ্ডা ভাব। ওদিকে এই বাতাস, যদি বৃষ্টির জলে মুখ ধুয়ে না এসে থাকে! তার ডান দিকের গিরিশিরার উপরের পথটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার উপরে ঘন বনের সবুজ আরও উজ্জ্বল আজ। যদিও গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে কখনও হালকা কোবাল্ট নীল। এই উপত্যকাটাও উঠতে উঠতে যেখানে আবাদটিলার শেষ প্রান্তে মিশেছে সেখানে একটা বড় গাছ। গুঁড়িটা তিন চার ফুট সোজা উঠে দুভাগ হয়েছে। তার ডালপালা পাতা হারিয়ে মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো। কিংবা সাদা রং বলে তা রূপার তারের কাজও বলা যায়। গাছটার কাছাকাছি থেনডুপের দুটো গরু। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম তাদের লালে সাদায়। কিন্তু দেখ দেখ করতে করতে দুটো মোরগ কক কক করে উপরের কিনারা পর্যন্ত চলে এল। একটি সামলাতে না পেরে জেনের পায়ের নিচের উপত্যকায় উড়ে পড়ল। জেন সরে গিয়ে হাসিমুখে উপরে তাকাল। আর তাতেই সে দেখতে পেলে। গাছটার সেই সাদা ফিলিগ্রি ওয়ার্কের মতো ডালে সবুজ সবুজ বিন্দু যেন। ও, আচ্ছা আচ্ছা। পাতা বেরোচ্ছে। এক রাতের বৃষ্টিতেই? আশ্চর্য কিন্তু। গাছপালা কী আশ্চর্যভাবে বোঝে মার্চ মাস এসেছে!

হাঁটতে হাঁটতে সে তার উপত্যকার শেষে এসেছিল। বোঝা যাচ্ছে, দূর অতীতে এক সময়ে

বন্যা হয়েছিল, ধ্বস নেমেছিল, তারই ফলে এই সব উপত্যকা, গালি, রিজ তৈরি হয়েছে। সে ফিরে দাঁড়াল। আর তার ফলে উঁচুতে তার বাংলোটাকে দেখতে পেলে সে। এর আগে একদিন কুয়াশায় সেটা উবেই গিয়েছিল। এখন দেখো, কোবাল্ট নীলের নানা শেডের আকাশ, আর ওই ক্যাম্পবেল সাহেবের লাল ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছটাকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যা বাংলোর পিছনের সীমায়।

আবার হাঁটতে শুরু করে জেন মনে মনে নিজেকে বললে, সুন্দর। তা বেশ তো, এখানেই না হয় একজন আগামী পনের বছর থেকে যাবে। এখন কিন্তু ব্রেকফাস্টের সময় হচ্ছে। তা ছাড়া রোগী ঘেঁটে সে হাত দুখানাও ধোয়নি। কাজ তো আছেই। স্টকে কী কী আছে তার লিস্ট করা। কিন্তু তারও আগে এই চামলিং-এর জন্য একপ্রস্থ পাজামা-পাঞ্জাবি কিনে আনা। এটা সেই গ্রেগরীর কী কান্ড বলো, রোগীর জন্য লালকম্বল কিনেছিল, কিন্তু হসপিট্যালে তারা কী পরবে ভাবে নি। নাকি কম্বল বলে শীতার্তদের বিলিয়ে দিতো।

তা ছাড়া চিঠিও দিতে হবে ডাইরেক্টরকে। জরুরী নয়। গত সপ্তাহের চিঠির উত্তব দিতে হয়। স্টকটা আনাতে হয়। আর ওটাও জানতে হবে, ওষুধপত্র যা লাগবে এখানেই কেনা হবে কি না, অথবা লখনৌ থেকে আসবে।

সে ভাবলে, এবারের চিঠির লেটারহেডে বোঝা গিয়েছে লখনৌয়ের ডাইরেকটর স্মোলেটের একটা ডক্টর অব ডিভিনিটি উপাধিও আছে। যদিও নামটাকে ধার করা মনে হয়। টোবিয়াস স্মোলেট, সেই অষ্টাদশ শতকের ঔপন্যাসিক। বেশ ম্যাকাবার। টোবিয়াস জানতে চেয়েছে, তার প্যাবিশেব মানুষদের কতজন প্রভুর চার্চে এল, তা জানা নিশ্চয় মূল্যবান ; তার চাইতে অনেক বেশি জরুরী তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। নতুবা সেই উপজাতিই মুছে যায়।

সংস্কৃতি শব্দটাকে ভাবতে গিয়েই জেন হেসে ফেলল। কেমন হয় টোবিকে জানালে, হিজ ব্রাদার্স ওয়াইফস হাজব্যান্ড? এটাতো তাদের সংস্কৃতিরই অংশ যে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ প্রত্যেক ভ্রাতারই স্ত্রী। এদের সংস্কৃতি তো তাকে জানতেই হবে। এদের মধ্যে থাকবে বলেই তো আগামী কয়েকযুগের জন্য এই লিভিংটাকে বেছে নিয়েছে।

বাংলোর কাছে এসে দেখলে, বারান্দা-চত্বরে থেনডুপ যেন ব্রেকফাস্ট তৈরি বলতেই অপেক্ষা করছে। এতক্ষণে তার স্নান হয়ে যাওয়ার কথা। থেনডুপ বললে, বাথে গরম জল দেয়া হয়েছে। জেন তাকে হাসি উপহার দিয়ে বললে, আটটায় ব্রেকফাস্টে বসে যাবো।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে, সে ডাক ধরতে টোবি স্মোলেটকে চিঠি লিখে এদিকের অবস্থা জানিয়ে, এখনই তার কী কী ওষুধ দবকার হবে তাও জানালে। ওষুধের লিস্ট করতেই সময় বেশি নিল।

আগেই স্থির করা ছিল, চামলিং-এর জন্য পাজামা-পাঞ্জাবি যোগাড় করতে হবে। সুতরাং চিঠি লেখা শেষ করে থেনডুপকে নিয়ে তাসিলার বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হল। থেনডুপ ও নামগিয়াল আশা দিয়েছে, অসওয়ালের দোকানে হয়তো পাওয়া যাবে।

২

পথে বেরিয়ে জেনের মনে হল, কোন কোন দিন এমন থাকে যে ক্যালেন্ডারে চোখ না রেখেই বলা যায়, কোন ঋতু এসেছে। আজ তো সকাল থেকেই মনে হচ্ছে, ঝপ করে আজ মার্চ মাস এসে গেল। ক্যালেন্ডার বরং অন্য রকম বলবে, তা হল পনের দিন দেরি করে, কারণ সে হিসাবে

আজ ষোলই মার্চ। মোট কথা, আজ অন্ধকার নেই দিনের আলোয় লুকিয়ে, যেমন ডিসেম্বরে ছিল। এমন কি একমাস আগেও, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিই সেটা, তখনও দিনের আলোকে বিশ্বাস ছিল না।

গ্রেগ অ্যাভেন্যু পার হয়ে, সেই পাগল ফাদার গ্রেগরীর তৈরি, তার নামেই রাস্তা, তাসিলায় ঢুকতে তার মনে হল, তাসিলাব রাস্তাও তার তেমন অপরিচিত নয়। সে তাসিলার উপর দিয়ে ইতিমধ্যে দুবার উঠেছে আর একবার নেমেছে। ক্লটলংএ যাওয়া আসা তাসিলাকে এড়িয়ে হয় না। তাসিলা রোড স্টেশনই তাব রেলস্টেশন, তাসিলা পোস্টঅফিসই তার পোস্টঅফিস। কিন্তু আজই সে প্রথম তাসিলাতে যাচ্ছে তাসিলার জন্যই।

আর সে জন্যই তার পোশাকও কিছু নতুন ধরনের হয়েছে। সাধাবণত মাদার সুপিরিয়ার বলতে যে রকম আন্দাজ হয সে রকম দেখাচ্ছে না তাকে। তার উচ্চতা এদিকের গড় উচ্চতার চাইতে বেশি, বলা হয়েছে। তার পরনে এখন গাউন ইত্যাদির বদলে লাল জিনের তামার রিভেটদার ট্রাউজার্স, উর্ধাঙ্গে পোলকা ডটযুক্ত সাদা শার্ট, ডান কবজিতে সোনার ব্রেসলেট ব্যান্ডে বড় আকারের ঘড়ি, পায়ে বাদামি সাদায় মিশানো অক্সফোর্ড শু, চোখে সানগ্লাস, মাথায় সাদা হ্যাট, গলার দুপাশ দিয়ে ঝোলানো স্টেথো। টুপির নিচে কাঁধছোঁয়া চুল। তাকে জ্যাক বা জন বলে মনে হতে পারে দূর থেকে। কাছে এসে বাস্ট ও কোমরের নিচের গড়ন দেখলে তবে তাকে ঠিক চেনা যায়। এ পোশাকে মার্চের প্রভাবও থেকে থাকতে পারে।

৩

সে যখন এসেছিল তখন প্রগাঢ় ডিসেম্বর। কুয়াশার সকালে পাশাং আর থেনডুপ তখন নিঃশব্দে চলেছে যথাক্রমে পনি আর ঝব্বুর নাকডোর টানতে টানতে। তাদের কখনও দেখা যায়, কখনও তারা কুয়াশায় ডুবছে। পনির উপরে সে নিজে আর ঝব্বুর পিঠে তার বাক্স, বিছানা, ব্যাগ, ওষুধের ক্রেট, বইয়ের ক্রেট। তখন তার মনে কিছু স্বস্তি, কিন্তু তা উদাস। সারা রাতের পরে তার মন অসাড়। ডাকোস্টা, কোহেন, স্মোলেট নির্জনতার কথা বলেছিল, তেমন আশঙ্কার কথা কেউ বলে নি যা সারারাত এক অন্ধকার গুহায় রেখেছিল।

শেষ জংশনেই সে জানতে পেরেছিল, তাসিলা এক ব্রাঞ্চ লাইনের শেষ স্টেশন। কুলির মাথায় সেই তার অনেক মালপত্র চাপিয়ে ব্রাঞ্চের প্ল্যাটফর্মে দুখানা সেকেন্ড ক্লাস বগিব একটা ছোট্ট ট্রেন দেখেছিল, মালগাড়ি জুড়ে জুড়ে যাকে কিছু লম্বা করা হয়েছে, যার ছোট এঞ্জিন যাত্রাব উদ্বেগে শোঁ শোঁ শাঁ শাঁ শব্দ করছে। কামরা অপরিচ্ছন্ন ও সেকেন্ড ক্লাস, তা সত্ত্বেও গন্তব্যের কাছে পৌঁছানোর হালকাভাবই ছিল মনে। এমন কি সে অন্য যাত্রীদের হিন্দি আলাপ থেকে যখন জানতে পারলে, তাসিলা পঞ্চাশ কিলোমিটার বটে, যেতে চার ঘণ্টা লেগে যায়, তখন সে ঘড়ি দেখে আন্দাজ করলে তা হলে সন্ধ্যা ছটা হবে। এমন কি কল্পনা করলে, মিশনহাউসের কেয়ারটেকারকে তার মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে, একটা আলোকিত প্ল্যাটফর্মের রেস্টুরেন্টের সাদা ঢাকনা দেয়া টেবিলে উল্টে উল্টে রাখা, রেলওয়ের নাম লেখা কাপগুলোর সামনে বসে, গরম এক কাপ স্বস্তির চা খেয়ে নেবে যাত্রার আগে। গাড়িটা ধীরে আর দুলে দুলে চলছিল। যে কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ হচ্ছিল মাঝে মাঝে, তাতে সে মনে করেছিল, তা হয় জংধরা শ্যাশি অথবা মরচে ধরা লাইনের জন্য। গাছের সারি সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে, পিছিয়ে পড়ছে, কখনও রেললাইন ঘেঁষে আসছে ; তার চলেছে পোস্টের মাথায়। কোথাও রেলপথের সমান্তরাল একটুকরো পথ বনে ঢেকে যাচ্ছে, কোথাও একটা রংচঙে বাস বন থেকে

বেরিয়ে আসছে, কোথাও বা উল্টোটা হচ্ছে। জেন স্ফূর্তি পেয়ে মনে মনে বলেছিল, দেখো, আমার গন্তব্য দেশের সীমান্ত ঘেঁষা এক পাহাড়ি শহর বটে, যাকে, যেমন ডাকোস্টা বলেছিলেন, ল্যান্ডস এন্ড বলা যায়, তা হলেই এ বনগুলো, দেখো যেন কারো ব্যাক গার্ডেনে সাজানো।

গাড়িটা, ব্রাঞ্চলাইনের মিকসড ট্রেন যেমন হয়, প্রতি স্টেশনে থামছে, মালগাড়ি খুলে দিতে বা জুড়ে নিতে শান্টিং করছে, ফলে দেরি হচ্ছে। একসময়ে জেন লক্ষ্য করেছিল, তার কামরায় যাত্রী ওঠানামা করতে থাকলেও ক্রমশ তাদের মোটসংখ্যা কমে যাচ্ছে। একসময়ে সে ঘড়িতে দেখলে, পাঁচটা বেজে যাচ্ছে, বাইরের আলো বেশ কমে গিয়েছে, সিলিংএ একটা বালব টিমটিম করছে।

গাড়িটা থেমেছিল, আবার ছাড়ল, আর তখন সে লক্ষ্য করলে, কামরায় সে ছাড়া আর মাত্র দুজন যাত্রী। গা ছমছম করে উঠলেও সে তাদের আলাপে জানতে পেরেছিল, আর দুই স্টেশন পরেই তাসিলা। যেভাবে চলেছে, তাতে তাসিলা ছটার আগে পৌঁছাবে না। একজন আর একজনকে বললে, আপনি যদি তাসিলা যাবেন, হাটবারের বাসে আসা ভাল ছিল। সন্ধ্যার পরে নারেঙ্গিহাটের বনের পথে পাহাড়ে উঠবেন কি করে? আপনি বরং আমার সঙ্গে আগের স্টেশনে নামুন। কাল বাসে যাবেন।

অন্ধকার ঝপ ঝপ করে নামছে। গাড়িটা থামলেই তারা নেমে গেল। তার বুকের ভিতরে যেন অন্ধকার ঢুকে যাবে। সে মনে মনে জোর করলে, মিশন হাউসের কেয়ারটেকার অবশ্যই আসবে, আর তারা অবশ্যই জানবে, কি করে অন্ধকার হলেও ক্লুটলং-এ যাওয়া যাবে। পরের স্টেশনই তাসিলা। গাড়িটাও গন্তব্যে পৌঁছাতে খুব জোরে ছাড়ল।

তাসিলায় ট্রেন থামল। গভীর অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে একটাও আলো জ্বালানো হয়নি। ট্রেনের কামরা দুটি থেকে যা হোক আলো পড়ছে প্ল্যাটফর্মে। দূরে একটা টেবলল্যাম্প জ্বলছে যেন। সে আন্দাজ করলে, সেটা স্টেশনমাস্টারের ঘর হবে। কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে জনশূন্য অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে চোখ চারিয়ে দেখতে গিয়ে সে লক্ষ্য করেছিল, রেলের সেই ঢাকা দেওয়া লণ্ঠন হাতে কেউ যেন, সেই অন্ধকারে একটা বড় জোনাকির মতো, স্টেশনমাস্টারের দিকে এগোচ্ছে। বিপন্ন সে, শেষ সাহস সম্বল করে, সেই আলোর দিকে দৌড়ে গিয়েছিল। কাছে পৌঁছে আন্দাজ করেছিল, তারা স্টেশনমাস্টার আর গার্ড হবে। অন্ধকারে তাদের মুখেও আলো পড়ছিল না। সে মরিয়া হয়ে বলেছিল, তাকে তাসিলা হয়ে ক্লুটলং যেতে হবে। তার লোকজন আসার কথা। কাউকে দেখছি না। তাসিলা যাওয়ার কী উপায় করা যায়?

তার মুখের ইংরেজিতেই বোধ হয় স্টেশনমাস্টারকে কথা বলাল। স্টেশনমাস্টার বললে, আপনি এদিকে নতুন মনে হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে তাসিলা যাওয়ার কোন উপায় হয় না। আপনার খোঁজে কেউ আসে নি। এলে নিশ্চয়ই দেখতাম।

তা হলে? তা হলে? এখানে ওয়েটিং রুম নিশ্চয় আছে যেখানে রাতটা কাটানো যাবে?

বৃটিশ আমলে নাকি ছিল।

এই সময়ে গার্ড বলেছিল, আপনি বরং গাড়িতেই থাকুন। গাড়ি এখন হাতিঘিষা লাইনে যাবে। সারারাত হাতিঘিষায় থেকে, কাল সকালে এখানে ফিরবে। তখন তাসিলা যেতে চেষ্টা করবেন বরং। আপনি খবর নেননি দেখছি। তাসিলায় আজকাল বাইরে থেকে যারা আসে তারা বাসেই আসে। সপ্তাহে তিনদিন হাটবারে বাস আসে নারেঙ্গিহাট পর্যন্ত।

ও!

কামরাগুলো সবই ফাঁকা। আপনার কামরায় আপনি উঠে যান। ভিতর থেকে সব ছিটকিনি ক্যাচ লাগিয়ে দিন। ওটাই সেফ হবে। হাতিঘিষা স্টেশনে একটু সুবিধা হবে। সেখানে প্ল্যাটফর্মে আলো থাকবে। আর রাতে কেউ গাড়িতে উঠবেও না।

নিঃসঙ্গ কামরায় ফিরে এসেছিল সে। কী করবে সে, ফিরে যাবে? সে তো কাল সকালে। তার আগে তো একটা পুরো রাত নিঃসঙ্গ এক কামরায় কাটাতে হবে তাকে। সে প্রথমে দরজা, পরে জানলাগুলোকে যথাসাধ্য বন্ধ করে দিতে দিতে ঠোঁট কামড়ে ধরছিল। তার মনে পড়ছিল, ডাকোস্টা, কোহেন, স্মোলেট সকলেই তাকে আসতে নিষেধ করেছিল ; নিরুৎসাহ করেছিল। স্মোলেট তার প্রস্তাব শুনে বলেছিল, মাথা খারাপ নাকি? আবেকবার ভেবে দেখুন। ওটা প্রকৃতপক্ষে একটা ছোট পাহাড়ি বস্তি, যাকে শহর বলে সেখানকার লোকেরা। একেবাবে সীমান্ত ঘেঁষা। সঙ্গী পাবেন না, কথা বলার লোক পাবেন না। ওটা এক নোহোয়ার।

কোহেন বলেছিল, আরে না, না। সে তো ল্যান্ডস এন্ড। জবরদস্ত পুরুষ সেখানে থাকতে পারে না। তা ছাড়া ওটা কি একটা লিভিং হল? এস্টাব্লিশমেন্ট কস্ট ছাড়া দুহাজার মাত্র অ্যালাউয়েন্স।

ডাকোস্টা, শোনামাত্র ডেকে পাঠিয়ে বলেছিল, কী বলছো? তুমি যাবে সেখানে? তোমাকে সেখানে যেতে দিতে পারি না। লখনৌয়ে তোমার হসপিট্যাল স্যালারির কথা ছেড়েই দিলাম। তোমার প্রাইভেট প্র্যাকটিস কয়েক হাজার নয় কি? তুমি কি সন্ন্যাসিনী হতে চাও? সে তো এখানেও হতে পাবে। পরে একদিন আবার তার কাছে এসে বলেছিল, যাবেই তবে? কী বুঝেছো জানিনা। দেখো চেষ্টা করে। কিন্তু প্রমিজ করো—অসুবিধা হওয়া মাত্র ফিরবে। ফিবে আসতে কিছুতেই দ্বিধা-লজ্জা করবে না।

সে সেই নিঃসঙ্গ ম্লান আলোর কামরায় ঠোঁট কামড়ে ধরলেও তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কিন্তু সকালেই ফিরে যেতে হলেও তাকে সেই ভয়ংকর রাতটা সে ভাবেই কাটাতে হবে।

৪

বাজারের পথে জেন আপন মনে হাসল। দিন হলে তো সবই হল। তখন তো থেনডুপ আর পাশাং এসেই গিয়েছে, ডিসেম্বরের কুয়াশা সত্ত্বেও আশাব রোদ উঠেছে। পরস্পরের পরিচয় করে নিতে কিছু সময় লেগেছিল বটে। কিন্তু ক্লুটলং-এর পথে যেতে দ্বিধা ছিল না। বরং পাহাড়ের পথে কিছু সময় উঠবার পরে থেনডুপ যখন বললে, লুক, ম্যাম, ইজ ক্লুটলং, তখন সেই রূপ দেখে সে মনে মনে বলেছিল, ওখানেই তো পঞ্চাশ বছর থাকতে এসেছি।

তখন তারা ফরেস্ট কলোনি পার হয়ে পোস্টঅফিসের সামনে দিয়ে চলেছে। জেন হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বললে, কী উপায় ছিল বলো? সে অনুভব করলে, যেন খাবিখাওয়া মানুষ যা কিছু হোক ধরতে চাইছিল। মার্কেট বোধ হয় নয়। সেই ক্রমশ কুয়াশা-সরা ডিসেম্বরের শীতে তার তাসিলাকে এক অপূর্ব সুন্দর হিলস্টেশন মনে হয়েছিল গন্তব্যে পৌঁছানোর স্বস্তিতে।

থেনডুপ, যদিও তার জামার আস্তিন হাত ছাড়িয়ে অনেক বড় নয়, তা সত্ত্বেও ম্যাণ্ডারিন কায়দায় আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে বললে, ম্যাম, ইজ মার্কেট। অর্থাৎ মহিমময়ী জননী, এটাই মার্কেট। তার মাথা উপর নিচে হতে থাকায় বোধ হয় জানালে, আপনাকে এখানে আনতে পেরে আমি কৃতার্থ।

জেন বললে, ধন্যবাদ, থেনডুপ।

সে বাজারে মন দেয়ার আগে ভাবলে, ভয়ের কিন্তু তারতম্য থাকে। ক্লুটলং-এর বাংলোতে পৌঁছেই আর ভয় ছিল না, তা কি বলা যায়? এখানেই থেকে যাবো বার্ধক্য পর্যন্ত, তা বলা সহজ। হাতের কাছেই তার অনুভূতির প্রমাণ পেলে যেন। মনে মনে বললে, এই নাকি মার্কেট! দশ-বিশ জন দরিদ্র চেহারার স্থানীয় মানুষ, কিছু ডিম, কয়েকটি মুরগি, কিছু আলু, কিছু স্কোয়াশ, কিছু শাকসবজি, কয়েক কেজি ভুট্টা নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছে। যেখানে তারা বসেছে সেটা ষাটসত্তর হাত লম্বা, বিশপঁচিশ হাত চওড়া একটা ঘাস-নির্মূল পাথুরে চত্বর। একটা গালিই যেন দুপাশের

রিজের মধ্যে। আর গালিটা উত্তর দিকে উঠে পাহাড়ের এক টিলায় শেষ হয়েছে। পূবের রিজে কয়েকটা বড় চেহারাব দোকান দোকানদারদের ঘরবাড়ি সমেত দেখা যায়। পশ্চিমের রিজ অপেক্ষাকৃত নিচু। তা থেকে পায়ে চলা পথ বাজারের চত্বরে নেমেছে। চত্বরের দক্ষিণপশ্চিম দিকে খানিকটা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামলে আর একটা চত্বর। সেটা একসময়ে হয়তো পাথরের দেয়ালে ঘেরা ছিল। এখন দেয়াল অনেক জায়গায় কাত হয়ে পড়েছে। থেনডুপ বোঝালে, সেটা সাহেবলোকদের কবরখানা।

এগুলোকে ছাড়িয়ে তারা পূবের রিজে উঠবার জন্য একটু বরং চওড়া পায়ে চলা-পথ ধরে উঠল, সেই বড় চেহাবার স্থায়ী দোকান কয়েকটির কাছে যেতে।

দোকানগুলো পাশাপাশি বটে, কিন্তু গৌরবে সবগুলি এক বকম নয়। সব চাইতে বড় দোকানদুটি অসওয়াল ও শর্মার। অসওয়ালের দোকানে চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি যেমন, তেমন লোহার কড়া, হাতা, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, দড়িদড়া বিক্রি হয়। এমন কি একদিকের আলমারিতে জামা কাপড়ও দেখতে পাওয়া যায়। শর্মার দোকানেও এসব আছে। উপরন্তু বেশ কিছু ওষুধও রাখে, সর্দিকাশি কাটাছেঁড়ার জন্য সিবাজল বড়ি আর পেটখারাপের জন্য এন্টারোকুইনল। এতেই নাকি অধিকাংশ রোগ সেরে যায়। সে যাই হোক, এটাই এই শহরের প্রত্যহের বাজার। হাটের তিনদিন শাকসবজি, মোরগ, ডিম, আলু, পরবল, স্কোয়াশের দোকান বেশ কিছু বাড়ে। একজন কসাই মাংস বিক্রি করে।

এ সবই জেন ইতিপূর্বেই কেয়ারটেকার নামগিয়ালের কাছে শুনেছে, আব এখন তো দেখতেই পাচ্ছে। আর সে নিজেও এখানে দর্শনীয় হয়ে উঠেছে, তাও টের পাচ্ছে। অনেকেই, দেখা যাচ্ছে, জানতো না তাসিলাতে একজন মেমসাহেব এসেছে। সে থেনডুপকে বললে, উপরের দোকানগুলি যদি অসওয়াল আর শর্মার হয়, ওদিকে যেতে পথ দেখাও। নামগিয়াল সেখানে যেতে বলেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

বাংলোর পিছন দিকে রান্নাঘরের দরজা খুললে একটা ছোট বাগান। কয়েকটা বড় গাছ আর ফুলের নার্সারি। নরবু সেখানে থাকবে এ সময়, এই আন্দাজ করে ময়ূর সেখানে গেল। নরবুকে বলল, ছোটসাহেব এখনই খেলতে আসতে পারেন। খেলাঘর সাফসুতরো কর। চা, কফির যোগাড় আছে তো?

নরবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেল।

নরবু এই বাংলোর কনটিনজেন্ট লেবার। ময়ূর ভাবলে, বাংলো সাফসুতরো রাখা, ফুলগাছ লাগানো এই সব কাজ তার। কখনও রেঞ্জারের সঙ্গে ফরেস্টে যায়। আশা, কালে ফরেস্ট গার্ড হতে পারবে। কত আর বয়স? আঠারো উনিশ। এ অঞ্চলেই কোথাও বাড়ি আছে। কিছুদিন থেকে বাড়ি যাচ্ছে না। কারণ মেয়রের অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে সে মেয়রের রান্না করে, দেখভাল করে। মেয়রও তাকে বলেছে, দুবার রান্না করতে হয় কেন? এক সঙ্গে দুজনের রান্না হোক।

সে তারপর রিনিমেমের কথা ভাবলে। এই ব্যাকগার্ডেনে রিনি এসে বার দুয়েক বসেছিল, একদিন বিকেলের চাও খেয়েছিল। এটা নাকি একটা ছোট বিউটি স্পট। একটা গাছের গায়ে তীরচিহ্ন আঁকা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে কালিঝোরাকে সাদা ফেনার প্রপাতে ভাঙতে দেখা যায়। এটা বাড়তি। এই

বাগানে দাঁড়ালেই যে চাপা গুম গুম শব্দ শোনা যায়, তা সেই কালিঝোরারই। শব্দে মন রেখে এগোলেই প্রপাত চোখে পড়বে।

রিনির কথা মনে হল তার। কিংবা সে মনে ছিলই। তখন প্যাকিং করছে নরবু মেমসাহেবের। ম্যাডাম বললেন, এসো মেয়র। মালপত্র কম নয়। স্টেটরুমের বড় প্রভিশনের আলমারি খালি করে ক্রেটে গোছানো হচ্ছে। তখনও সেই আলমারিতে বেশ কিছু রঙীন কৌটো বোতল। ম্যাডাম বললেন, কফি আর চায়ের টিনগুলো থাক। বাস করো। একজন মেয়রের প্রভিশনের আলমারি কি খালি থাকবে? আচ্ছা মেয়র–

ম্যাডাম।

আর কোন কথাই না। কিছু পরে ম্যাডাম বলেছিল, মদের বোতল দুটো দেখছো? সেই মদ যা একদিন খুব খেয়েছিলাম। তোমার জন্য থাক।

সে ভাবলে, ম্যাডাম চলে যাওয়ার পরে এখন তো নিজেকে মেয়রই বলতে হয়। ম্যাডামই, তার অনিচ্ছাতেই, রটিয়ে দিয়েছে সে প্রকৃতপক্ষে মেয়রই। আর কিছু নয়।

তার পোস্টমাস্টারের স্ত্রী সুচেতনার কথা মনে হল। একদিন মাঝরাতে সে দেখেছিল। সুচেতনা তার বাসার এক শার্সির কাছে বসে অবাক হয়ে যেন বাইরের অন্ধকারকে দেখছে। একটা মিটমিটে আলো তার পিছন দিকে। তার সেই চোখদুটি ডাগর। ধারে কাছে কেউ ছিল না। তাদের বাসার সকলেই হয়তো গভীর ঘুমে। অন্ধকারে কে কী দেখে? সে বুঝতে পারলে, রিনি সে রকম দেখতো বলেই সুচেতনার কথা মনে পড়ল। সে বুঝলে না, তা থেকে তার চোখের কথা মনে পড়ল। তার নান্নীর কথা মনে হল যার সেই টিকলো নাক, নীল চোখ, একমাথা খয়েরি আর সাদা চুল, হলুদ কোঁচকানো চামড়ার মুখ লাল-পাথুরে ধূলায় ময়লা। গুমছে একদিন রেলস্টেশন থেকে ডাক আনতে আনতে তাকে বলেছিল। না বললেও আন্দাজ করা যায়। বাপ গোরা লোকদের কেউ, আর মা তামার জাতের। সে কবেকার? সত্তর বছর আগেকার হবে। সে জন্যই কি তাসিলার বাইরে অতদূরে স্টেশনের কাছে বাস করে?

কিন্তু তার দাওআর কথা মনে হল। কালো, লম্বা, হাড়মাসে জড়ানো, কাঁধে লম্বা কালো হাতলের ঝকঝকে টাঙ্গি। বলেছিল, বনের আত্মা থাকে। সেই আতোমাকে না জেনে বনে ঢুকলে প্রাণ যায়। যেমন তুই মরে গিয়েছিলি। তা হলে কে আমি? বললি তো তুই মৌর। বনের মধ্যে নিঃশব্দ সেই দাওআ, যার টাঙির এক কোপে শালগাছ পড়ে যায়। যারা আজকাল স্টেন বা রাইফেল নিয়ে বনে ঢোকে, তারাও দাওআকে ভয় পায়। কারণ সে সব অস্ত্র তুলবার আগেই নিঃশব্দ একটা গাছ দাওআ হয়ে তার দুহাতের মধ্যে এসে যায়, যখন সেই সব অস্ত্রের চাইতে টাঙি বেশি কাজ দেয়। সেই বনের, গাছের, পশুদের আতোমা আছে। বনে যাওয়ার আগে তা চিনতে হয়, জানতে হয়। যেমন চিতা, যেমন হরিণ–এরা বনের আতোমাকে চেনে। তার সঙ্গে এক হও, চিতা, হরিণ, হাতি কেউ তোমাকে ভয় করবে না। হাতি তো বনের আতোমাকে চেনে, বনে কি তার ভয় নেই? চিতার কামড় মনে করো। কী বিপদ, বাতাস কি মেঘকে ভয় পায়, আলো রাতকে? আদমী জানানাকে? আর মানুষখেকো বাঘ? আরে সেতো বাঘ নয়, দ্রুক হয়ে গেছেন।

তার রেঞ্জারের কথা মনে পড়ল। তারা দুজনে, রেঞ্জার আর পোস্টমাস্টার বলেছে, বনটাই দাওআর মন। আবার সেটা ডিএফওর মন! কিন্তু তফাৎ আছে, বন ডিএফওর মনের তলায় সেই আর এক মন নাকি।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ময়ূরের, যে নাকি এখন মেয়র ছাড়া আর কিছু নয়, চিন্তা অসংলগ্ন হচ্ছে। তার একটা কারণ এই মনে হয়, সকাল থেকে যা তার মূল চিন্তা তার সঙ্গে এই চিন্তাগুলো সংলগ্ন হয়ে এক স্রোতে চলছে না। সে তো নরবুর হাত থেকে সকালের চা নিয়েই ভাবতে শুরু করেছিল,

রিনি ম্যাডাম যদি তার জীবনে এক পরিবর্তন এনে থাকে, তবে তার অর্কিড পাড়তে গিয়ে পা ভাঙার ব্যাপার আর এক পরিচ্ছেদই শুরু করেছে মেয়রের জীবনে। এটা তার মনে চাপ সৃষ্টি করছে। অ্যাকসিডেন্টটা কিছু নয়। ব্যথা নেই, আর এক সপ্তাহ এক পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে যাবে, না হলেও বা ক্ষতি কী? কতলোক পৃথিবীতে প্রতিবন্ধী। আসলে সে অনুভব করছে, সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় যখন সে হসপিট্যালে, এমনকি হসপিট্যাল থেকে পালিয়ে এই বাংলোয় শয্যাশায়ী, তখন তার নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলে অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যেন যা শক্ত পাথর, তা নরম হয়ে গিয়েছে ; একটা গাছের অথবা পাথরের, তাদের যে অংশ লুকানো থাকে, তেমন কিছু তার ছিল, তা যেন প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। পোস্টমাস্টার, রেঞ্জার সাহেব যেন একেবারে কাছে এসে পড়েছেন। পরিচয় তো ছিলই। খেলার মাঠে, বনের ট্যুরে। এখন তার রোগশয্যার পাশে তাঁরা এসে পড়ায় সে কি আর একা থাকতে পারছে? রিনি ম্যাডাম তাকে মেয়র হিসাবে খাড়া করে দিয়ে গেলেও সে তো মেয়র হিসাবে নিজের মতো নিজে চলেছিল। আর প্রশ্নও উঠছে, যেন তাকে আরও জানতে চাওয়া।

যেমন রেঞ্জার নিজেই · আচ্ছা, মেয়র তুমি হঠাৎ অর্কিড পাড়তে সেই সকালে সেই পাহাড়ে উঠলে কেন?

পাহাড়টার উপরে সুন্দর অর্কিড ছিল।

ও সব পাহাড়ের গর্তে সাপ থাকতে পারে।

তখন তো শীত গাঢ় ছিল। ফেব্রুয়ারির শীত। কুয়াশা। তখন সাপ লুকিয়ে থাকে।

যদি তেমন কুয়াশাই, অর্কির্ডকে সুন্দর দেখলে কি করে? রেঞ্জার সাহেব এরকম বলে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, তোমাকে পাহাড়পর্বত বনের ভয় দেখাতেই ডিএফও আর রিনি ম্যাডামের সামলিং বনে হারানোর গল্প করেছিলাম। ডিএফও-র মথ ধরার বাতিক, তোমার আবার অর্কিড বাতিক না হয়।

এরকম সব কথা বলা মানেই এক মন অন্য মনের কাছে যাওয়া। কারো কাছে যাওয়া মানেই তার মন বুঝতে পারা। এমনকি একটা গাছের কাছে, কিংবা উপত্যকায় নিঃসঙ্গ দাঁড়ানো এক চাঁই পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাদের গোপন মনের কোন কোন কথা শুনতে পাও।

যেমন সেই মহকুমা শহরের হাসপাতালে সার্জন তাকে দেখতে এসে বলেছিল! স্ট্রেঞ্জ। সে বুকে অনেকক্ষণ স্টেথো বসিয়ে একজন ডাক্তারকেও ডেকে এনেছিল। দুজনে একমত হয়ে ওষুধ দিয়েছিল। বলেছিল, বুকে কিছু অসুবিধা বোধ করেন না?

কিছু না, টের পাই না তো।

স্ট্রেঞ্জ!

কিন্তু একদিন রেঞ্জার তাকে দেখতে গেলে সেই সার্জন বলেছিল, আমার মনে হয় সদরে গিয়ে কার্ডিওগ্রাফ করানো দরকার।

মেয়র ভাবলে, এমন কে আছে যার বুকে ব্যথা নেই?

সেখানেই শেষ নয়। রেঞ্জারও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ব্যথা বোঝো না?

সেটা বোধ হয়, তার·ভলিবল আর ফুটবল খেলার জন্য। এ জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠের অনেক উপরে। পরে অভ্যাস হয়ে গেলে অসুবিধা থাকবে না।

আরও ভয় ছিল। পাশের বেডের সেই হাতভাঙা দাঁত-কালো পুলিশ দারোগা। সে কৌতূহলে তার দিকে অনেক সময়ে তাকিয়ে থাকতো। আর রেঞ্জ অফিসার তাকে মেয়র বলতে থাকায় কৌতূহলও বেড়েছিল তার। একদিন সে তো জিজ্ঞাসাই করলে, মেয়র? আশ্চর্য! মেয়র? তাসিলায়? সে তো কলকাতায়। অন্য একদিন সে তো নিজের বেড থেকে উঠে এসেছিল। বলেছিল, আপনাকে

কোথাও দেখেছি কি আগে? আপনার মুখটাকে খুবই পরিচিত মনে হয়। একসময়ে আলাপ ছিল এরকমই যেন।

পরের দিন বাংলোর সুবিধার কথা বলে, রেঞ্জারকে রাজী করিয়ে, সে তাসিলায় ফিরতে পেরেছিল পনি চেপে। ওটাও নিরাবরণ হওয়ার মতো। হসপিট্যালে তার ঘড়ি আর গলার হার খুলে নেয়া হয়েছিল। আর তা ফেরৎ দিতে এসে রেঞ্জার বলেছিলেন, তোমার ঘড়িটা বেশ দামি আর বিদেশি মনে হয়। পড়ে গেল অথচ ব্যালান্স হুইলটুইল নষ্ট হয়ে বন্ধ হল না। আর পোস্টমাস্টার বলেছিলেন, বাহ্, এত সুন্দর আর বেশ দামী হার। আচ্ছা তুমি কি ক্রিশ্চান মেয়র? তোমার হারের লকেটটা তো দামী পাথরের ক্রস।

ময়ূর সেই বাগানের বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল। বাংলোর ভিতর দিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে এল। রোদে একটা চেয়ার দেখে সেটাতে বসলে। এই সময়ে নরবু চা নিয়ে এসে বললে, চিয়া লিনু হোস মেয়র সার।

তার অর্থ এই হয়, রেঞ্জার সাহেবরা খানিকক্ষণ হয় এসেছেন। আর পিংপং খেলা শেষ করে চা চেয়েছেন বলে নরবু চা করেছে।

ওটাও তো একটা পরীক্ষা, নয় কি? সে ভাবলে। সেদিন বিকেলের দিকে এসেছিলেন ছোটসাহেব আর মাস্টারমশাই। সম্ভবত বাংলোর সেই আলমারি থেকে বই নিতেই। আর তারপর তাকে দেখতে তার বিছানার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। পোস্টমাস্টার বললেন, কি করে যে সময় কাটাও মেয়র, একটু একটু বই-ই না হয় পড়ো। মনে করো রবীন্দ্রনাথের একটা বড় বই। এই রোগশয্যা কোথা দিয়ে পার হয়ে যাবে টের পাবে না।

সে কি, মশাই, তাই বলে রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথের বড় বই! ছোট সাহেব অবিশ্বাস করে এরকম বললেই তাঁদের আলোচনা শুরু হয়ে গেল, যেমন তাঁরা করতে ভালোবাসেন। পোস্টমাস্টার বললেন, আমার ধারণা, যে বাঙালীর অক্ষরজ্ঞান আছে সেই রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারে। মনে করুন রেঞ্জার, একটি গাছ, একটা পাহাড়, কোন হ্রদ, তাকে বোটানিস্ট জিওলজিস্ট যেমন বোঝে, আমি কি তা বুঝবো? অথচ একেবারেই কি বুঝবো না? পণ্ডিতরা রবীন্দ্রনাথ যেমন বোঝেন, সাধারণ মানুষ কি তা বোঝে? মনে করুন, যার শুধু অক্ষরজ্ঞান আছে, সেও যদি অক্ষর জুড়ে শব্দ, শব্দ জুড়ে বাক্য এমন করে চলতে থাকে, তার কাছে কি আদিম, অসংস্কৃত, কিন্তু জোরালো এক রবীন্দ্রনাথ দেখা দিতে পারে না? ছোটসাহেব বলেছিলেন, আপনার এ থিয়োরি প্রমাণ হবে না কোন দিন।

নাই হল, পোস্টমাস্টার বললেন, মনে করুন একটি ছোট বালিকা, সে কি বাড়ির বড়দের প্রেমের সম্বন্ধে বুঝতে পারে? কিন্তু তাদের পরস্পরের ব্যবহারে, গলার স্বরে, চোখের চাওয়া থেকে কি আদৌ ধরতে পারে না সে সব মানুষের মধ্যে বিশেষ একরকমের ভাব আছে? রেঞ্জার অবিশ্বাসে মাথা নাড়লে, পোস্টমাস্টার বললে, আচ্ছা, না হয় এই চটিবইটা। ওলড ম্যান বুড়ো মানুষ আর সি মানে সমুদ্র। এক বুড়ো জেলের সমুদ্রে মাছ ধরার গল্প। এটা পড়ে দেখতে পারো মেয়র-ভায়া।

যাওয়ার আগে সত্যি সেদিন পোস্টমাস্টার খেলাঘরের র‍্যাক থেকে তাকে রবীন্দ্রনাথের কুমুর গল্প পড়তে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সে বেশ অস্বস্তি বোধ করল। তার চোখদুটিতে যে বিস্ময় দেখা দিচ্ছিল, তার উপরে এক ধারালো সতর্কতা দেখা দিল। এটা পরীক্ষাই। সে সেরকম শয্যাশায়ী আর নিরাবরণ মন হওয়াতে এরকম পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হয়েছিল তাঁদের। শয্যাশায়ী থাকার বিরক্তি কাটাতে সে বাংলা বা ইংরেজি উপন্যাস পড়তে চায় কিনা। নিরক্ষর সে। নরবু এসে জানালে, সাহেবরা খেলা শেষ করে, চা খেয়ে চলে গিয়েছেন। মেয়র দূরে দূরে থাকলেন কেন? শরীর খারাপ? এখন রান্না করতে হয়। তার আগে বাজার থেকে শাক আর ডিম এনে নিলে ভালো হবে।

ময়ূর বললে, বালিশের নিচে পয়সা আছে, নিয়ে যা।

নরবু চলে গেল। মার্চের মাঝামাঝি। রোদ বেলা বারোটার কাছে এলে সরে বসতেই হয়। মেয়র উঠে বাঁ দিকে সরে সেই বারান্দাতেই একটা ইজিচেয়ার দেখে তাতেই বসলে। হাত দিয়ে ধরে তুলে তার প্ল্যাস্টার-ঢাকা পাটাকে হাতলের উপরে রাখলে। আজই প্রথম অনেকক্ষণ সে পা নিচু করে আছে। ভার লাগছে।

২

রূপসী পাঠিকা, ইতিপূর্বে আমাদের এই উপন্যাসে ব্যবহার করা ভাষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এখানকার ব্যবহৃত সেই একরকমের পাহাড়ির মধ্যে কিছু হিন্দি, কিছু বাংলা, দুচারটি বিকৃত ইংরেজি শব্দের মিশ্রণে যে ভাষা তা উপন্যাসে ব্যবহার করলে এই পাহাড়ের বাইরে কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব হবে না। এখানে গল্পটাকে এগিয়ে নেয়ার কৌশল সম্বন্ধেই কিছু বলে নিতে চাই।

প্রথমেই একটা অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে এত সময় নষ্ট করার জন্য কিছু দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি। চরিত্রই তো প্রধান হওয়া উচিত। এরকম শোনা গিয়েছে, গল্পটাই চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসছে, এরকম দেখাতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু এখানে এই তাসিলায় যেন তা হচ্ছে না। আমরা ভেবে দেখতে পারি, আমরা কি আমাদের যার যার চরিত্র নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি? তা দুঃসহ হয়ে ওঠেনা? আবার সেই চরিত্রর উপরে পৃথিবীর অন্য অনেক চরিত্রেরও ঘটনার এমন দুঃসহ চাপ পড়তে পারে যে চরিত্র গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। একটা কৌশল আছে বটে, এগিয়ে পিছিয়ে, বর্তমান কাল আর বর্তমানে কালে ধরা অতীতকে নিয়ে যে চৈতন্যস্রোত তাতেই গল্পটাকে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। কিংবা সেই চৈতন্যস্রোতের প্রবাহই গল্প হয়ে উঠতে পারে, যাতে চরিত্রগুলো ডোবে, ভাসে।

আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের উপন্যাসের এই মানুষগুলি যেমন মেয়র, জেন এয়ার, প্রভঞ্জন, মুরলীধর, সুচেতনা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে এই তাসিলা, যা হয়তো এক পবিত্র উপত্যকা কিংবা হয়তো তাসি নামক কোন বীরপুরুষের আবিষ্কার করা গিরিপথ, সেখানে এসেছে। সুতরাং সকলেরই তাসিলার বাইরে নিজস্ব একটি করে অতীতকাল আছে। আর তাকে তারা মনে আনেও। সেই অতীতকালগুলি বর্তমানে প্রবেশ করে, এভাবে চৈতন্যর স্রোত তৈরি করার সুযোগ আছে। তারা অতীতকে স্মরণ করেও, কিন্তু কী এক দুর্বিপাকে যেন সে স্রোত অখণ্ড প্রবাহে থাকে না। এরকম তুলনা দেয়া যায়, এই মানুষগুলো যেন স্রোতে বাহিত হতে হতে সেই স্রোত থেকে নিজের দুই বাহুর তাড়নায়, এমন কি স্রোতের বিপরীতে চলেও কোন কূল পেতে চায়, কিংবা যদি কল্পনা করা যায় সেই স্রোতে ভাসমান নৌকায় আছে তারা, তবে তারা যেন নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে অন্য কোথাও যেতে চায়।

এরকমও বলা যায়, চৈতন্যস্রোতকে প্রবাহিত হতে দেয়া দূরের কথা, তারা যেন বাঁধ তুলে তাকে আটকাতে চায়, স্রোতের গতিটাকে বদলে দিতে চায়, এমন কি যখন আশঙ্কা সেই বাঁধ ফেটে যেতে পারে। যেন অতীত বিষয়ে পছন্দ অপছন্দ থাকায় তারা কিছু ভুলতে চায়। কিন্তু দেখা যায়, তারা একসময়ে ভুলে যাচ্ছে, অন্য সময়ে তাকেই সামনে এনে বসাচ্ছে। যেন কখন কী মনে করবে, তার কর্তৃত্ব ছাড়তে চায় না।

যেমন এখন এই পরিচ্ছন্ন রোদের দুপুরে একমাস আগেকার ফেব্রুয়ারি-কুয়াশায় ঢাকা সকালে এক আলোর ঝলকে নান্নীকে তার বাড়িতে দেখতে পেলে মেয়র। এটা সম্ভবত ইজিচেয়ারের চওড়া

হাতলে রাখা তার প্লাস্টার-ঢাকা পা দেখেই তার মনে আসছে। অন্যদিকে সে তাসিলা রোড স্টেশনের কাছে তখন কি করে কোথা থেকে এল, তা মনে আনলে না।

তাসিলা রোড স্টেশন থেকে বেরিয়ে নুড়িছড়ানো, আগাছা-গজানো যে চত্বর তা থেকেই জাকিগঞ্জ যাওয়ার পথ একদিকে, অন্যদিকে বাঁ ঘেঁষে নারেঙ্গিহাট হয়ে তাসিলা যাওয়ার পথ। গাড়িটা জংশনের দিকে গেল। তা হলে অন্তত সকাল সাতটা তখন। কিন্তু কুয়াশা আর শীত কাটতে চাইছে না। কুয়াশা নীল, আর গাছের মাথায় যে কচিৎ রোদ তা হলুদ। ডানদিকে স্টেশনের কয়েকজন কর্মচারীর কয়েকটা বাসা থাকার কথা, তা নিশ্চিহ্ন কুয়াশাতেই। ভরসা হচ্ছে রোদ উঠবে, অন্তত বৃষ্টি নামবে না। ফেব্রুয়ারির বৃষ্টি খারাপ, বরফ জমানো ঠাণ্ডা নামবে পাহাড়ে।

তার বেশ শীত করছিল। তার পোশাক এখনও বেশ ড্যাম্প। রোদ পড়লে দেখা যায় যে বাষ্প উঠছে।

কিছু এগোতেই স্পটলাইটের মতো রোদ পড়ল একফালি তার সামনে, আর তার মধ্যে নান্নীর বাড়িতে নান্নীকে দেখতে পেলে সে।

পুরনো, গোল, টিনের ছাদের একখানা ঘর, মনে হয় বাতিল রেলওয়ে ওয়াগনের ছাদ তুলে বসানো। পুরনো ভাঙা পরিত্যক্ত তেমন কোন রেলকামরার থেকে কাঠ নিয়ে দেয়াল, দরজা ও একটা জানালা। সেই ছাদে এখন মরচে, দেয়ালে মস, লাইকেন। ছাদের উপরে একটা টবে গাঁদা ফুল। একপাশ বাঁশে ডালপালায় ঝোপঝাড়ে কিছু অবরুদ্ধ। সেই আবরণ ছাড়া বাকি তিনদিকে খোলা। ঘরটার সামনে মাটির একফালি আঙিনা। মেয়র দূর থেকে দেখছিল, এক স্ত্রীলোক সেই উঠানে খড়-কাঠির আগুন জ্বেলে নিচ্ছে।

বনের প্রান্তে নিঃসঙ্গ তাকে দেখে মনে হয়েছিল মেয়রের, এই তবে নান্নী, যার কথা গুমছে বলেছে। গুমছে তার কাছে যেতেও মানা করেছিল। কিন্তু শীতে, কুয়াশায় আগুন টানতে থাকে। শীত, তার উপরে তার ড্যাম্প পোশাক তাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুমছে যেমন বলেছে অনেকটাই তাই, কিন্তু কিছু অন্যরকমও বটে। তোবড়ানো কালিপড়া হাঁড়ির নিচে কাঠকুঠ দিয়ে সে আগুনটাকে বড় করছে।

একটু রোদ উঠে পড়ল, আর মেয়রের পোশাক থেকে বাষ্প উঠতে দেখা গেল। নান্নী বললে, বসনু হোস, বইঠো।

তার দাঁতগুলো সুগঠিত, ধবধবে সাদা, মাথার এলোমেলো চুল বাদামি যাতে পাক ধরেছে। নাকে নোলক, যা সোনার না হলেও ঝকঝকে নীল পাথর ঝোলানো। গুমছে বলেছিল, কানে অনেক ভারি নেপালি গহনা। এখন কানে ফুটো আছে গহনা নেই। বরং কানঢাকা সাদা চুল। নোলক থেকে চোখ তুললে সরল টিকলো নাক, টানা কিছু নিষ্প্রভ নীল মণির চোখ। ময়লা, ঘাগরার মতো করে পরা শাড়ি, তার উপরে কালচে কম্বলের ছেঁড়া ছেঁড়া জামা। মুখে মাটির ময়লা, বয়সে কোঁচকানো ত্বক। বৃদ্ধাই কি?

দেখতে দেখতে মেয়রের মনে হয়েছিল, একা কি করে থাকে, স্ত্রীলোক? নিঃস্ব হলেও তার একটা কিছু চুরি যাওয়ার ভয় সব সময়ে থাকে।.

এরকম মনে করার কারণ আছে। চোখের সামনে সেই বৃদ্ধা ক্রমশ মাঝবয়সী হয়ে যাচ্ছিল। আর তার সরল নাকের হলুদ রঙের মুখে একরকম তীব্র আকর্ষণ থেকে গিয়েছে।

মেয়র ততক্ষণে বলে ফেলেছে, চিয়া পাঁউছ?

নান্নী একটা টিনের কৌটায় বেশ খানিকটা দুধ, কাগজের মোড়ক থেকে খানিকটা করে চা আর চিনি দিয়ে, হাঁড়ির ফুটন্ত জল ঢেলে আগুনে বসাল।

সেও আগুনের দিকে এগিয়ে বসল, হাতদুটোকেও আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিলে। আর তখন

তার মনে হল, গুমছে এসব কারণেই তাকে সাবধান করেছিল—নান্নীর কাছে যেতে নেই।

এক সময়ে কৌটায় ঘন ক্বাথের মতো বাদামি একটা তরল ওথলাতে শুরু করলে নান্নী একটা বড় পিতলের গ্লাসে তা ঢেলে বললে, লিনু হোস। পিও।

সেই শীতের সকালে, তখন তো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, সেই ঘন ছাগলের দুধ, যাতে চায়ের গন্ধ ও ঈষৎ তিক্ততা, মেয়রের সুস্বাদ বোধ হয়েছিল। সেই চা খেতে খেতে মেয়রের পোশাকে ভেজা ভাব দেখে রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ার কথা উঠেছিল দু-একটা। তারপরে সে পালিয়েছিল।

তাকে পালানোই বলে। সে ঝোলা থেকে একটা ধাতুর টাকা বার করেছিল চায়ের দাম দিতে। নান্নী জানিয়েছিল খুচরো ফেরৎ দিতে পারবে না। সে বলেছিল, ঘরে খুঁজে দেখো। নান্নী সে রকম খুঁজতে গেলে সে উঠে পালিয়েছিল, ঝোলা কাঁধে, রাইফেল পিঠে, দ্রুত গতিতে। পিছন থেকে সে নান্নীর ডাক শুনেছিল, সাড়া দেয় নি। খানিকটা গিয়ে দুঃখভাব এল পালাতে পালাতে তার মনে। গুমছে বলেছিল, নান্নী শুধু হাতিকে ভয় পায়। তার প্রথম স্বামীকে রেললাইনের পয়েন্টের তালার কাছেই হাতি মেরে ফেলেছিল। তারপর আরও দুজন পুরুষ, আর তাদের কেটাকেটি। সব মরেছে। এখানে এরকম একা থাকার কারণ তার পিতাজি গোরাসাহেবদের অফসর হলেও, যার কবর আছে বাজারের নিচে, মা ছিল তার বাড়ির ঝাড়ুদারনী। খুবই নিচু জাত।

সে রাস্তার মোড় ঘুরল, তার পাহাড়ের একটা জঙ্গলসমেত ছোট টিলা নান্নীর বাড়িটাকে একেবারে আড়াল করে দিল।

এই সময়েই হঠাৎ তার আশঙ্কা দেখা দিল, সে কি নান্নীকে সাক্ষী রেখে এল? খোঁজ হলে, নান্নী কি বলতে পারবে না তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে, সেরকম একজন এক সকালে ভিজে ভিজে পোশাকে বসে, রাইফেল পিঠে ছিল, চা খেয়েছিল তার কাছে। আর এদেশের সাধারণ লোক কী হিসাবে যেন দিন তারিখও ঠিক বলে দিতে পারে। সে অস্বীকার করবে কি করে তার সঙ্গে এমন সব আছে যা তার নিজের নয়?

সে সামনে পিছনে, দুপাশে দেখে নিলে, পথটা নির্জন বটে।

যেমন তার হাতের ঘড়ি। যা অনেকে দেখেছে। তা কিন্তু বেশ কয়েকমাস সে মেয়র হওয়ার পরে। যাতে বলা যায় বেতন কয়েকমাস জমিয়ে তাতে কেনা। মুস্কিল আছে। পিছনের ডালা খুললে পড়া যায়, জন্মদিনে, দিদি। বলা যায় সেকেন্ডহ্যান্ড কেনা। আর তা সত্যও হয়, কেননা হাজার চেষ্টা করলেও এই দিদিকে সে খুঁজে পাবে না।

পথের উপরে একটা ছোট ঝর্না। সে হেঁটে গিয়ে ঝর্নার ছোট লোহার ব্রিজটার উপরে দাঁড়াল। এখানে ভেবে নেয়া যায়। তার ঝোলায় একটা নতুন লালচে জিনের সুট আছে। যেটাকে দেখা যাচ্ছে না। সে রকম জিনই যা, রাধন একদিন বলেছিল, কলকাতার বাবুভায়েরা, পুরনো হলেও, হিপি হিপিনীদের থেকে দেড়-দুশোতে কেনে। যদি কোন দিন সে ব্যবহার করে, তবে সে রকম বলবে কি, হিপির কাছে কেনা? কিন্তু এই নরম কাঁচাহলুদ রঙের উলের হাল্কা রাগটা, যা ঝোলা থেকে মুখ বার করে আছে? বলবে কি, কেউ দেখে ফেললে, জংশন স্টেশনে এক হিপি টাকার অভাবে বিক্রি করেছিল? তো, আগের দিন তো তার জংশন স্টেশনে সত্যই যাওয়া হয়েছিল। নাকি বলবে, সে এক হিপিনী যে এমন নেশা করেছিল, যে কিছুই ঠিক পাচ্ছিল না কতদূর চলে এসেছে ; সঙ্গীরা তাকে একলা ফেলে পালিয়েছে কখন, তাও ধরতে পারে নি। সেই হিপি গাড়ি থেকে নেমে গেলে, এই জিন আর রাগ কামরার মেঝেতে পড়েছিল।

মেয়র সেই ব্রিজের লোহার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুঁচকু নেশা সম্বন্ধে জানতো। এমন সিগ্রেট আছে যে গাঁজার চাইতে কড়া, এমন বড়ি আছে, দুটো মুখে দিলে পৃথিবী সোনালি, নীল হয়, ফুটপাথ মনে হয় মেঘ।

কিন্তু সেও হল। কোটের বুক পকেটে বোতাম বন্ধ করে আটকানো যে মোটা লকেটদার সোনার হার? পিতল হতে হয় না। লকেটটা কী পাথর তা সে জানে না, কিন্তু তারপরে খোদাই করা ক্রস আর তাতে যিশু। এরকম সুন্দর আর সূক্ষ্ম খোদাই অনেক দাম নেয়, সুতরাং হারটা সোনার। কেউ কি বিশ্বাস করবে হারটা সেই কামরাতেই পড়েছিল, যেখানে জিন আর রাগ? তার চাইতে ঝর্নাটা যেখানে গর্তের মতো হয়ে নীল, সেখানে ফেলে দেবে কি? কিন্তু যার জিনিসই হোক, তার কাছে থাকলে দু-পাঁচ-দশ বৎসরে হলেও তাকে ফিরিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ হলেও হতে পারে, জলে ফেলে দিলে চিরকালের জন্যই গেল। কিন্তু পকেটে রাখাও বিপদ হতে পারে। অন্যমনস্ক ভাবে ধোবার বাড়ি গেল, বা পকেট থেকে কিছু বার করতে অন্যের চোখের সামনে বেরিয়ে পড়ল। সে স্থির করলে, গলায় পরে নিলে হয়। সে কবে আর কার সামনে জামা খোলে?

এরকম স্থির করে হারটাকে সে তখনই পরে নিয়েছিল। আর হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, কেন এরকম হয়ে যায়। সে নিশ্চয়ই হিপিনী, কোথায় কতদূরে বা বাড়ি, আর নেশার ঝোঁকে বা খোঁজে পাহাড়জঙ্গলে একা এসে পড়েছিল এতদূর। ওটাও দেখো, ঝুপ করে কুয়াশার অন্ধকারে কোথায় বা নেমে গেল কোন অজানা জায়গায়।

এরকম সময়েই হাঁটতে হাঁটতে যখন সে ভাবছে, শুমছে নান্নীর টানের কথা বোধহয় সবটা বাড়িয়ে বলে না ; চোখের সামনেই বৃদ্ধা থেকে মাঝবয়সী হয়ে যাওয়ার কথা ভাবো ; আবার সে ভাবছে, সেই হিপির চোখ কি চশমায় ঢাকা ছিল ; তখনই সে সেই ভঙ্গুর উইঢিবির মতো হলদে ছোট টিলাটার উপরে অর্কিডে অপূর্ব সুন্দর গাছটা দেখতে পেয়েছিল।

৩

নরবু শাক সবজির বাজার করে ফিরল। জিজ্ঞাসা করলে, কেঁদ-তরকারি আর ধাঁউসা রুটি করে নিলে এবেলা চলে কি?

শুনছ, বলে তাকে বিদায় দিয়ে মেয়র ভাবলে, এরকম গোলমাল হওয়ার কথা সে আর একটা জানে। মোরদের এরকম হয়েছিল একবার। সেই রাতে রামপুরহাট স্টেশনে তিন ছোকরা হকার আটকে পড়েছিল। তারা খবর পেয়েছিল, বৃষ্টিতে কলকাতার ফুটপাথ জলের নিচে, কোথাও শোওয়া যাবে না। ওদিকে রামপুরহাটে প্ল্যাটফর্মের অনেক অংশই মাঝরাতে ভুতুড়ে, অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেই হল।

সেখানে শুয়ে শুয়ে রাধন বললে, দুনিয়ার লোক যাচ্ছে, আমরা যাচ্ছিনে। অথচ রোজ যাচ্ছি ওপর দে।

হেঁয়ালি রাখবি শ্লা?

হেঁয়ালি কোথাকে? যাচ্ছিনে, আসছিনে বোলপুরের ওপর দে? একদিন নেমে দেখলে হয়, দুনিয়ার লোক যায় কেন, ফুর্তিফার্তি করে, দেখলে হয়।

বুঁচকু বললে, অ, সেই রবিধনা। সে তো গাড়িতেই রোজ দেখছিস। সেই সাদা দাড়িওয়ালা মাথায় ঝুঁটি, গুবগুবাগুব বাজায় আর গান করে না সে?

এই শ্লা বুঁচু, দূরে শুয়ে কেন, অন্ধকারে ভয় করেনা?

মেয়র ভাবলে, সে দিন নয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তারা বোলপুর পর্যন্ত লজেঞ্চুস বিক্রি করতে করতে, বোলপুর আসতেই বয়ামগুলো যার যার ঝোলায় পুরে নেমে পড়েছিল। বুঁচকু নিজের চকচকে লাল শার্টটা পরেছিল। রাধনকে তার নীলে সাদায় ছবি আঁকা শখের শার্টটা পরিয়ে দিয়েছিল।

একটা ভয় ছিল। কে তাদের পথ দেখাবে? দেখা গেল, মানুষজনের পিছনে চললেই দেখা হয়ে যায়। এদিক ওদিক ঘুরে যখন গরম লেগে উঠছে, পায়ের নড়া ছিঁড়ছে, তখন তারা ভিড়েব চাপে এক দোতলায় পৌঁছেছিল। সেখানে কত জিনিস, কত ছবি, এমন কি সেই রবিধরনাথের জামা, জুতো, তরোয়াল, চায়েব কাপ।

একবার জামা দেখে বুঁচকু হতভম্ব। কাঁধ থেকে ঝুলের শেষ পর্যন্ত যে মাপ, তা বুঁচকুর মাথা থেকে পায়েব পাতার মাপের বেশি। আব পাশে তাতে বুঁচকু আর রাধন একসঙ্গে ঢুকে যেতে পাবে। সাধে কি আর বড় মানুষ বলছে! একবার তো বুঁচকু লোকজনকে চমকে দিয়ে জোরে জোরেই বললে, উরিব্বাস। দেখে যা, রাদু, অ্যাববড্ডো কাপ উই, ডেরাকেজি চা ধরে, মাইরি।

জাপানী তবোয়ালটরোয়াল দেখার পর রাধনের ইচ্ছা হল, মোরকে একবাব সেই ঠাকুরের জামার পাশে দাঁড় করিয়ে দেখবে, মোর না ঠাকুর কে বেশি লম্বা। এদিকে তো প্ল্যাটফর্মে দূর থেকে সকলের মাথার উপর দিয়ে তার মাথা দেখা যায়। কিন্তু মোরকে খুঁজতে গিয়ে তারা অবাক। যে দিকটায় দেখার কিছু নেই বলে তারা চলে এসেছিল, যেখানে কাচের বাক্সে, বাক্সে হাতে লেখা হিজিবিজি বই, যার উপরে কাঁধে-ঝোলা খদ্দরজামা-পরা ভদ্দরলোকেরা ঝুঁকে পড়ে দেখছে, তাদের মধ্যেই সেই দেড়ো মোর তাদের মতোই ঝুঁকে পড়েছে।

এসব বুঁচকু আর রাধন ফেরার গাড়িতে উঠে বসে বলেছিল। বুঁচকুই একটু কথা বেশি বলে। সে বলেছিল, সেই ভদ্দরলোকদের মতো দাড়ি ছিল মোরের, কিন্তু তাদের মতো চশমা ছিল না। চশমা ছাড়া কাঁচের মধ্যে দিয়ে হাতে লেখা বই পড়তেই তখন মোবের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

আর রাধন অনেক ভেবে বলেছিল, মোর, একটা কথা বলি। তোকে শ্লা দাড়িতে আর চেহারায় ভদ্দর ভদ্দর মনে হয়। কাঁহাতক আর লজেঞ্চুস বেচবি? বই ফিরি কর শ্লা, চোখে একটা পিতলের ফক্কি চশমা লাগিয়ে নিলেই হল।

মেয়র আঙুলের ডগা দিয়ে চোখের কোণদুটি মুছে নিলে। [illegible]র রোদে মুখ রেখে বসলে চোখে জল আসবেই। এক রকম মধুর যন্ত্রণা আছেই। সে চেয়ারের হাতল থেকে আহত পা-টাকে নামালে। তো, ভাবলে সে, প্রথমে পুরনো শিশি বোতল কৌটো সংগ্রহ, পরে লজেঞ্চুসের হকার, আর সেবার থেকে হাফপ্রাইসে পূজা সংখ্যা বিক্রি করা।

৪

রাধন সেদিনই গাড়িতে কেলেঙ্কারির কাণ্ডটা করেছিল। বোলপুর থেকে ব্যাণ্ডেল স্রেফ সেই সুন্দরী মাঝবয়সী মেয়েছেলের পিছনে লেগে থাকল। মাঝবয়সী, মোটাসোটা, সোনার গহনায় সাজা, জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ, সঙ্গে নাতনি বোধহয় তিনচার বছরের, তা সুন্দরী বটে। এমন বাড়াবাড়ি যে বুঁচকুও ভয় পেয়ে যাচ্ছিল, সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যারা আছে তারা রাধনের সে রকম তাকানো, সে রকম ঘেঁষে বসার প্রতিবাদ করবে, তা হলেই লেগে যাবে। যে রাগ রাধনের! অবাক কাণ্ড! একটু গোল হলই, তার জন্যে ব্যাণ্ডেলে নেমে পড়তে হল সেই তিন হকারকে। কিন্তু যেন এক অন্য রাধন। গাড়িটা বেরিয়ে গেলে রাধন বললে, আমার মা না হয়ে যায় না।

তো, সেই ব্যাণ্ডেলেই তারও বছর দুই আগে মায়েদের কথা উঠেছিল। স্মৃতিতে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল, বুঁচকু মা বলতে শেয়ালদা স্টেশনকেই জানে। তার ওপারে আর কিছু জানা নেই। উদ্বাস্তু তো বটেই, তা নদীব এপারের কিংবা ওপারের তা জানা নেই, যেমন সে জানে না তার মা কিংবা দিদিমা প্রথম উদ্বাস্তু। সে এ বিষয়ে নিশ্চিত নাকি, যে সে যখন, তা'র দিদিমাও

থেকে থাকবে, মা ছাড়াও। এমন তো হতে পারে, যেদিন থেকে শেয়ালদা, সেদিন থেকেই তার কোন না কোন দিদিমা উদ্বাস্তু। রাধন ধমক দিয়ে ঠিকঠাক বলতে বললে, সে বলেছিল, চার নম্বর গেটের কাছে দুদল ঘুমাতো রাতে। সেই দুইদলের মাঝখানে সিমেন্টের উপরে সেও ঘুমাতো। দুই দলের কোন কোন মেয়েছেলেকে বুঁচকু দিদি, মাসী বলতো। একদিন তাড়িয়ে দিল পুলিশ, সে সময়ে সে রকম কোন দিদির পিছন পিছন হ্যারিসন রোড পার হয়ে থাকবে। রাধন বলেছিল, বাজে কথা। নিজের দিদি হলে কেউ তোকে ছেড়ে পালায়? কোন জেবনে তোর কেউ আপন ছেল না।

বুঁচকু ঢোক গিলে বলেছিল, সেই দুই দল থেকেই তো তাকে খেতে দিতো।

রাধন বললে, যে কান্না কানতিস, না খেতে দিয়ে উপায়?

বুঁচকু তেড়ে বললে, জেবনে কাঁদিনি। আসলে ছেলেরা যখন কাঁদে, জানবি মায়েরাই একবার কাছে এসে, একবার দূরে গিয়ে কাঁদায়। যে প্রথম থেকে ঠাণ্ডা শানে শুয়ে, সে গোঙায়, কাঁদে না।

তারা তিন হকারই সে রাতে ব্যান্ডেল স্টেশনে, স্ট্রাইক হয়েছে ঝড়াকসে, উত্তর দক্ষিণ কোন দিকে যাওয়ার উপায় নেই। বুঁচকু জিজ্ঞাসা করেছিল, আর তুই রাধু?

রাধন বলেছিল, আমি তো কন্নবে। আমার সেই ইশকুলে পড়া খুকী মা, যে আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল, সে এখন কত বড়লোকের গিন্নী, আর কত সুন্দরী পত্যয় যাবিনে।

ঠাকুর দেখে ফেরৎ সেদিন ব্যাণ্ডেলে নেমে পড়তে বাধ্য হয়ে, রাধনের রাগ পড়ার সময় দিয়ে, বুঁচকু জিজ্ঞাসা করেছিল, ওদিকে মেয়েমানুষের গন্ধ সইতে পারিসনে, গাড়িতে ওই মাগীর পেছনে লেগে গিয়েছিলি কেন রে?

রাধন বোকা বোকা মুখ করে বলেছিল, বুঝিস নি? ঠিক চিনেছি, ওই তো আমার মা। কতদিন পরে দেখেছি। কত স্বপ্নে বলেছে, মেয়েমানুষ থেকে সাবধানে থাকিস, বাপ।

তারা দুজনে তো অবাক। সেই আগেকার গুল যেন সত্য হতে চলেছে। বুঁচকু বলেছিল, রাগিসনি, রাধু, জন্মের সময়ে কি চোখ থাকে, নাকি তোর খুকী মায়ের গন্ধ মনে ছিল?

রাধু রাগ করেনি। সেদিন উদাস হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, তোরই তো সুবিধা, মোর, হাসপাতাল মা হওয়া সুবিধা। তার আগে তোর যে কিছু মনে নেই, তা ভালো।

কিন্তু এ সুগন্ধ নিয়েই সেবার যা হল। তখনও বুঁচকু, রাধন হকার নয়। সকাল থেকে বেড়িয়ে পথঘাট থেকে প্লাস্টিক, কাগজ কুড়োয় সারাদিন, রাতে বাগবাজার স্ট্রিটের কানাগলিতে ফিরে আসে কুড়োনো কাগজের পাইকারের দোকানের সামনে রাতে ঘুমাতে। মোর তখন শিশি বোতল কৌটো কিনে বেড়ায় সেই পাইকারের টাকায়। পাশাপাশি দুখান চট পেতে তারা ঘুমায়। কোন কোন দিন বস মোর ব'লে, তারা দোকানে তুলে রাখা ভাঁজ-তোবড়ানো কিন্তু রংচঙে টেবিলিন জামা-প্যান্ট পরে ছিনেমা যায়, ফাইটিং ছিনেমা। ততদিনে মোরের জন্যও একটা চট যোগাড় হয়েছে সেই দোকানদারের থেকে। তখন সকলের বয়সই ষোল-সতের হবে। সেদিন ফার্স্ট শো সিনেমাতে খুব এক ফাইটিং সিনেমা থাকায় তারা সিনেমা দেখে, সেখানকারই এক পাঞ্জাবি দোকান থেকে রুটি আর তড়কা খেয়ে আড্ডায় ফিরছিল। সিনেমা নিশ্চয়ই তাদের মনকে স্বপ্নরাজ্যে ধরে রেখেছিল, আর সে স্বপ্ন প্রত্যেকের বেলায় পৃথক হয়। হাতিবাগান পার হতে হতে রাধন জিজ্ঞাসা করেছিল, বুঁচকু কোথায়? রাত এগারোটা হল। বুঁচকু তবু আসে না। মোর তার চটে শুয়ে পড়েছিল, রাধন তার চটে খাড়া হয়ে বসে পথের দিকে দেখছে। অবশেষে রাত বারোটার কাছে বুঁচকু এসে নিজের চটটাকে ঝেড়ে ঝুড়ে পেতে তার উপরে বসে বললে, পিপাসা লাগিয়ে দিয়েছে, শ্লা। রাধন কথা বললে না। বুঁচকু তার জামা খুললে আর তখনই গোলমাল বাধল। তো, একটা গন্ধ মোরও পেয়েছিল, যা অর্ধেক পরিচিত, মিষ্টি মিষ্টি, ট্রামবাসের ভিড়ে ঘামের গন্ধের মধ্যে যা মেয়েদের কাছাকাছি পৃথক হয়ে থাকে।

রাধন দুম করে বললে, সেন্টপাউডার মেখেছিস শ্লা। মাখিস নি? আয়তো কাছে। তবে মেয়ে মেয়ে গন্ধ কেন গায়ে? নোংরা মেয়েদের কাছে গিয়েছিলিস?

বুঁচকু মেজাজে ছিল, বললে, তা পুরুষেই যায়।

রাধন চেঁচিয়ে উঠল, সত্যি গিয়েছিলিস?

বুঁচকু বললে, মেলা ফ্যাচাস নি। আমাকে বলে পিপাসা ধরিয়ে দিয়েছে মাগী।

রাধন ধাঁ করে চড় কষালে একটা। তারপর আর একটা, আর একটা। বুঁচকু প্রথমে বাধা দিতে দিতে চেষ্টা করলে। পরে বোধ হয় ভাবলে, বাধা না দিলে রাধন থামবে। কিন্তু রাধন ক্ষেপে গেল, আনন্দে, শ্লোগানে, কিংবা ভয়ে যেমন ক্ষেপে। অবশেষে ফুটপাতের উপরে লুটিয়ে পড়েছিল বুঁচকু। মোর জল যোগাড় করে সেই জলের ঝাপটা দিয়ে আধঘণ্টায় জ্ঞান ফিরিয়েছিল তার। ভোর ভোর রাতে মোর অবাক। বুঁচকু যেন ছোটভাই, যেন বড়ভাই-এর কোল ঘেঁষে ঘুমাচ্ছে। আর রাধনের একটা হাত আলগোছে বুঁচকুর গায়ে। অবাক কাণ্ড নয় ভালোবাসা? ভালোবাসা আর খুন করার ইচ্ছা যেন খুব কাছাকাছি থাকে।

আবার প্রত্যেকের ভালবাসা পৃথক। বুঁচকু ভালোবাসতো কড়া গন্ধের সাবান আর চকচকে জামা। রাধন ছিল সিনেমা-পাগল। আর মোর বোধহয় মোরগ ঝোল দিয়ে ভাত খেতে।

মেয়র তার চেয়ারে উসখুস করে উঠল। তার ভিতরেও ঢুকে গেল যেন সেই অস্থিরতা। সে যেন কোন চৈতন্যপ্রবাহ থেকে সাঁতরে বেরিয়ে আসতে চায়। সে নিজের প্লাস্টারে চোখ রেখে সে ব্যথার স্মৃতিতে মনকে স্থির রাখবে।

মেয়রের মুখে কপালে মার্চের শীত শীত সত্ত্বেও ঘাম দেখা দিল। এই সময়ে নরবু আসতে সুবিধা হল। সে বললে, নরবু, আজ সকাল থেকে আমরা কী বা খেয়েছি? নববু বললে (তার ভাষায়) কচুর ঝাল হয়েছে। ময়দা মাখা হয়েছে। সে মেয়রের স্নানের গরম জল করে দিয়ে ধাঁউসা নাবিয়ে নেবে। মেয়র কি আজ একেলা স্নান করতে পারবুন?

৫

চৈতন্যপ্রবাহ এড়িয়ে অন্যদিকে সবার উদাহরণই যেন, তাতে বোঝা যায় পরে যা মনে আনতেই হবে হয়তো, তা থেকে চরিত্রগুলো হঠাৎ হঠাৎ সরে যেতে চায়। তখন মোরদের দলের সেই সস্তা টেরিলিন পরা সতের থেকে উনিশের মধ্যে বয়স তিন যুবক হকার ট্রেনে ট্রেনে ঘোরে। রাতে টালিগঞ্জ স্টেশনের বস্তির ঘরে ফিরে যায়। অনেক কিছু দেখেছে তারা ট্রেনে। গমগম করা রাজকীয় শেয়ালদা থেকে রাণীর মতো দারজিলিং মেল ছাড়তে না ছাড়তে, মা আমার হার নিয়ে গেল বলে ছোট্ট খুকীকে কেঁদে উঠতে দেখেছে। আলো নিবিয়ে চারঘণ্টা লেটে চলা গয়া প্যাসেঞ্জারে চলতে চলতে ম্লান জ্যোৎস্নায় সাইডিং-এর মালগাড়ি থেকে যুবকদের ধীরে সুস্থে ট্রাকে মাল নামিয়ে নিতে দেখেছে। ছুটন্ত এক্সপ্রেস থেকে তারা দেখেছিল, গভীর কালো রাতে টর্চের আলো ছোটাছুটি করছে, হুইসিল বাজছে, রাইফেল ছুটছে, বোমা ফাটছে। একদিন তারা সব সেরা দৃশ্যও দেখে ফেললে। রানাঘাটের কাছাকাছি সেই চলন্ত ট্রেনে তিনটি যুবক অনায়াসে উঠে পড়ল। সেটা এমন কিছু নয়, ছুটন্ত মেল এক্সপ্রেসেও হকাররা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় চলে যায়। যুবক তিনটি সেই এক কামরা ভিড়ের উপরে চোখ চালিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, পেয়েছিরে, শালা। যেন খুব পুরনো কোন বন্ধুকে হঠাৎ আবিষ্কারের সুখ। সেই যুবক তিনটি সেই খুঁজে পাওয়া চতুর্থ যুবকটিকে দরজার কাছে টেনে নিল, যেন তারা পুলিশের লোক আর সেই চতুর্থ যুবক স্মাগলার

অথবা সেই যুবকটি একটা চালের বস্তা, তাতে চাল আছে কিনা দেখাতে সেই তিন যুবক ছোরা মারতে লাগল। কামরায় একটি শব্দ নেই। রক্তে একাকার। নিজের রক্তের মধ্যে দরজার কাছে সেই চতুর্থ যুবকের শরীর তখনও কাঁপছে, পা দুটো তখনও নড়ে নড়ে ঝাঁকছে। মোরের কানেব কাছে ফিস ফিস করে কে যেন বললে, রাজনৈতিক। মাত্র কয়েকদিন আগে জেল-ছাড়া পেয়েছিল। মোর বলেছিল, কিছু বললেন? যে কথা বলেছিল, সে বললে, না, আমি আবার কখন কী বললাম? ট্রেনটাব গতি কমতেই যুবক তিনটি হাসতে হাসতে নেমে গেল। ট্রেন স্টেশনে এলে বুঁচকু আর রাধনও সেই কামরায় অন্য দরজা দিয়ে এসেছিল। আর তখনই রাধনের মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, নিজের ঝোলে ঠ্যাং ছড়ানো মোবগ রে। সেই থেকে মোর মোরগ ছেড়েছিল।

আর তার প্রমাণও হয়ে গেল একমাস না যেতেই। তারা সেদিন আসামের গাড়িটায় ফিরেছে। সে গাড়িটায় এক বৈশিষ্ট্য, শিলিগুড়ি থেকে চীনা-জিনিসের হকাররা ফাউন্টেন পেন, টর্চ, ছাতা, জামার কাপড় আনে, আর কী ভিড় সেই সব হকারদের ঘিরে। যাত্রীরা সে সব কিনতে পেরে এই দুঃখের দেশ ছেড়ে অন্য কোন সুখের দেশে চলে যাচ্ছে। যেন পারিপার্শ্বিক, স্থান, কাল মনে থাকছে না। রাধনও তার লজেঞ্চুসের বয়াম কাঁধঝোলায় ভরে অবাক চোখে দেখছে। মোর তার পুরনো পুজোসংখ্যাগুলোকে হাফপ্রাইসে বিক্রি করতে রাধনের পিছনে পিছনে উঠেছিল। তখনই হঠাৎ মোর দেখলে, সেই চীনা হকারদের একজন একটা চকচকে মনিব্যাগ রাধনের ঝোলায় ফেলে দিয়ে টর্চ, লাইটার, পেন বলতে বলতে এক দরজা দিয়ে নেমে গেল। আর রাধনও হকচকিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে অন্য দরজাটা কাছে পড়ায় তা দিয়ে বেবিয়ে পাশের কামরায় উঠল। কয়েকটা স্টেশন পার হয়ে গেলে আবার রাধনের সঙ্গে দেখা হলে সেই চীনা জিনিসের হকার বলেছিল, এখানেই নেমে পড়। রেলের ক্যাটারিং-এ চল। সে রকমই হয়েছিল। গাড়িটাকে ছাড়া দরকার। বুঁচকু নেমেছিল তাদের খোঁজে। গাড়িটা ছেড়ে গেলে তিন হকার একত্র হলে তারা ক্যাটারিংএ গিয়ে বসলে রাধন মোরগ ঝোল আর ভাত চেয়েছিল। এক ফুল প্লেট মোরগের অনেক দাম, বুঁচকু এরকম বললে, রাধন বলেছিল, সেঁটে যা। না হয় সবসমেত পঞ্চাশ লাগবে। কী হল খেতে বসে মোরের? সে একদম ছুঁতে পারে নি সেই মোরগ ঝোল।

পরে রাধন বলেছিল, তিনশো দিয়েছে, দশ আর পঞ্চাশে, ব্যাগটায় দেড়হাজার মতো ছিল। সেই হাতে খড়ি। না হলে? রাধন বলেছিল, হকারদের ইউনিয়ান আছে। কেউ জানে না, কারা মালিক তার। কিন্তু যে মনিব্যাগ দিয়েছিল সে নয়, কে বললে? আর তা ছাড়া ইউনিয়ান না মানলে খুন হয়ে যেতে কতক্ষণ। অন্যদিকে দেখ, প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে এক হকারের লাগুক, গাড়ির দুশো হকার সেই কামরায় উঠে প্যাসেঞ্জারকে কাঁদিয়ে ছাড়বে। সেই প্রথম জানা গিয়েছিল, হকারিতে আর কয় পয়সা, সঙ্গে ছিনতাই শিখতে হয়।

এই খুন হয়ে যাওয়ার কথাই, ওই নিজের রক্তে নিজে ভাসাই। কী এক উপায়ে, যেন বা মন্তাজ করে, শক্তিগড়ের সেই দৃশ্যটা চোখে পড়ে গেল তার। সেই দৃশ্যে বুঁচকু, রাধনকে আবাল্য ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছিল। সকলেই তারা আবার শক্তিগড়ে মিলেছে। দুসারি মালগাড়ির আড়ালে তারা লুকিয়ে একরাত একদিন কাটিয়েছে সেখানে। সন্ধ্যার আগে ব্যাপারটা ঘটে গেল। রাধন চিৎকার করে উঠল, পালা, পালা, ভদ্রলোক শালারা বোম চার্জ করছে। চকিতে মুখ তুলে মোর দেখেছিল, রাইফেলের পাশ থেকে ভদ্রচেহারার সেই যুবকেরা তাদের দিকেই বোমা ছুঁড়ছে। দূর থেকেই সে দেখতে পেয়েছিল, দরিদ্র, ভীত, মলিন চেহারার বুঁচকু, আহত, নিজের রক্তে মাখামাখি রাধনকে সরিয়ে আনার জন্য এক ছোরামাত্র সম্বল করে প্রতিপক্ষের দঙ্গলের মধ্যে ঢুকছে।

দমবন্ধ করে সাঁতার দিয়ে মেয়র বর্তমানের আলোয় ফিরল।

নরবুও সাহায্য করলে। এমনকি চেয়ারের হাতলে তুলে রাখা আহত পা-টাকে নামিয়ে দিয়ে তাকে স্নানের ঘরেও নিয়ে গেল।

পরে তারা রান্নাঘরের লম্বা একটা টেবলে খেতে বসল। কচুর ঝাল তরকারি আর, নরবু যার নাম দিয়েছে ধাঁউসা, মোটা মোটা রুটি যা ফ্রাইং প্যান জুড়ে ফুলতে শুরু করলে তার চারদিকে মাখন দিতে থাকলে ভিতরে নরম সিদ্ধ ময়দা, আর উপরে গাঢ় বাদামি, পোড়া পোড়া একটা চেহারা নেয়।

সেভাবে খেতে খেতে সে যেন ছোটসাহেবদের ক্লাবরুমে খেলার শব্দ শুনতে পেলে। তা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়। সে শব্দ অন্য কোন ছুটির বিকেলের হবে। আর তা নিশ্চয় তার অ্যাকসিডেন্টের আগে। তখন পোস্টমাস্টার আর ছোটসাহেবে খেলা হচ্ছে আর সে নিজেও তাতে যোগ দিচ্ছে। সেদিন খেলা হয়েছিল অনেকটা সময়। পোস্টমাস্টার আর রেঞ্জার সাহেবে দুই গেম হয়ে গেলে পোস্টমাস্টাব আর রেঞ্জার তার সাথেও এক গেম করে টেবল টেনিস খেলেছিল। তা হলেও সেদিন খেলার চেয়ে গল্পও কম হয়নি। তখন ডিসেম্বরেব গাঢ় শীতই। নরবু মাঝখানে একবার চা করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় গেমের শুরুতেই রেঞ্জার বললে, আমাদের এঞ্জিনিয়ার বিরিঞ্চিবাবুকে কাল খেলার কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, একা থাকেন, মশায়, খেলাধূলোয় এলেও হয়। বললে কী জানেন? এখানে খেলাধূলা মানায় না। বললুম, বরং উলটো, এখানেই মানায়। বললে কী জানেন? যেন আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। ইংরেজি করে বললে, আশার উপরে এত উঁচুতে উঠে এই উঁচুর উপরে উঠতে উচ্চাশা তৈরি করে।

সে কী মশায়? পোস্টমাস্টার বললে, কোথায় যেন এরকম শুনেছি। দাঁড়ান, রসুন। রেঞ্জার হাতে বল নিয়ে সার্ব করতে ভুলে গিয়ে ভাবলে ধাঁধাটা। অবশেষে বললে, ধরেছি ধাঁধাটা। মিলটন না?

আমারও সেরকম মনে হয়েছিল। গদ্য করে বলছিল যদিও, হয়তো লাইন হিসাবে মনে আসছিল না। সেই–দাস বাই লিফটেড বিঅন্ড হোপ অ্যাপসায়ারস বিয়ন্ড দা হাই। মানে বলছিল, সেই নরক যেখানে পতিত দেবদূতরা কষাঘাত থেকে সেরে উঠে আবাব স্বর্গের উচ্চতায় উঠে যুদ্ধ করতে চাইছে? রেঞ্জার সার্ব করলে।

র‍্যালি শেষ করে পয়েন্ট নিয়ে পোস্টমাস্টার বলেছিল, বললুম এঞ্জিনিয়ারকে, আপনি মশায়, আমাদের চাইতেও বয়েসে তরুণ। বললে, বলুন তো, আপনার কি এখানে থাকতে ভাল লাগছে? বললুম, কাজকর্ম কম, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর, লক্ষ্য করুন বড় শহরগুলোর তুলনায় এখানে কম খরচে চলে। তা ছাড়া পোস্টটেলিগ্রাফ অফিস আছে। এখানে কাউকে না কাউকে তো আসতেই হতো। না হয় আমিই এলুম। সে তো ঠিকই, কিন্তু সেই একজন যে আপনি বা আমি, তা ঠিক করে কে? জিজ্ঞাসা করলুম, কে আবার ঠিক করবে? বললে, সেটাই ফেট, ভাগ্য, অভিশাপ। সেই নাকি কাউকে তাসিলায় পাঠায়।

পোস্টমাস্টার হাসিমুখে সার্ব করলে। কয়েক মিনিট তারা খেলা নিয়ে ব্যস্ত রইল। এই সময়ে পোস্টমাস্টারের মারটা জোর হওয়ায় বলটা রেঞ্জারের মাথা টপকে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। মেয়র বল আনতে যাচ্ছিল। রেঞ্জার, নরবু, নরবু বলে জোরে ডাকলে। সে এলে বলটা কুড়িয়ে আনতে বললে, যদি পাওয়া যায়! নতুন বলে খেলা শুরু হওয়ার আগে পোস্টমাস্টার মেয়রকে বলেছিল, তোমারই বা কী হল, মেয়র? খেলার মাঠে তোমাকে ক্রমশ কম দেখা যাচ্ছে। তুমি যে রকম খেলছিলে! নতুন বলে সার্ব করে সে বললে, খেলতে খেলতে বলের

দিকে চোখ রেখেও বলে চলল, তা ছাড়া জাকিগঞ্জে ইন্টাররেঞ্জ কম্‌পিটিশনে—ব্যবস্থার মূলেই আমাদের রেঞ্জার,—আশা আমাদের তাসিলা রেঞ্জ ট্রফিটা নেবে।

মেয়র বলেছিল, একজন না থাকলে কি খেলা হয় না, সার?

পোস্টমাস্টার খেলতে খেলতে বলেছিল, হবে না কেন? উদ্যোগী আমাদের রেঞ্জার, আর আমাদের টিমটার নামও হবে মেয়র্স ওন। বলো, সুন্দর নাম হয় না?

মেয়র ভেবে নিয়ে হেসে বলেছিল, সার, সেই যে প্রেসিডেন্টস ইলেভেন, গভবনার্স ইলেভেন খেলে তাতে তো তাঁরা খেলেন না।

রেঞ্জার, ছোটসাহেব, হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, মাস্টারমশাই এবাব হেরে গেলেন। খেলা চলতে লাগল, পোস্টমাস্টাব টেবলে চোখ রেখেই বলেছিল, জানো, মেয়র, গুণ অবহেলায় নষ্ট করার জিনিস নয়। তোমার সেই সার্ব যা নেটের ধার ঘেঁষে যায়, সেই ডিপ থেকে নেটের কাছে বল তুলে দেয়া, আর স্ম্যাশের তো কথাই নেই। আমি অনেক স্কুল, কলেজ, জেলা টিমের খেলা দেখেছি। এরকম দেখি নি। বড় বড় টিমে না খেলে থাকলে এটা তোমার ট্যালেন্ট। মেয়রের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, এরকম আপনি আগে বলেছিলেন, সার। পোস্টমাস্টার বলেছিল, কিংবা তোমার সে শুটিং মনে করো। আলো পড়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে সাপটা ফণা তুলতেই অব্যর্থ গুলি। বলো, কত প্র্যাকটিস করা থাকলেও সে রকম সহজে হয় না। রাইফেল কোথায় পাবো যে প্র্যাকটিস হবে, মেয়র তাড়াতাড়ি বলেছিল। আচ্ছা, সার, এখন থেকে মাঠে খেলার ধারে থাকবো রোজ। পোস্টমাস্টার কথা বলেই সুখী। বললেন, এ যে দেখছি, দে অলসো সার্ব হু অনলি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট।

মেয়র খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়েছিল। নরবু বললে, চিসো ভয়েক। মেয়র ধাঁউসার দিকে মন দিয়ে বললে, না, না ঠাণ্ডা হবে কেন?

সে ভাবলে, পোস্টমাস্টার হাসি হাসি মুখে বললেও, কথাগুলো যেন খোঁজখবর নেয়ার মতো। তাও ভাল, যে রেঞ্জার সাহেব হাসতে হাসতে বলেছিল, আপনাকে মশাই আজ মিলটনে ধরেছে। আপনি কি ভাবছেন, মেয়রও ঠিক করতে পারছে না, সে বিরিঞ্চির মতো ফলেন এঞ্জেল কিনা?

কিন্তু সেদিন খেলা ততো জমল না আর। রেঞ্জার আর পোস্টমাস্টার দুটি গেম শেষ হতেই ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে মুছতে চেয়ারে বসল গল্প করতে। ছোটসাহেব বলল, কত আর দাঁড়িয়ে ওয়েট করবে মেয়র? বসো। নরবু চা আনল বলে। রেঞ্জার বলল পোস্টমাস্টারকে, না হয় মিলটন ছাড়লেন। এটা যে প্রকৃতপক্ষে একটা পিনালকলোনি ছিল তাতে সন্দেহ কী? বিরিঞ্চিবাবুর মত, এখনও এটা ওপন জেইল যেখানে আমরাও।

তা মশায়, মিথ্যে বলছেন না। আপনার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে হাতে পাওয়ার আগে ওই দুর্গ তো ছিল আন্দামানের সেলুলারের মতোই। যত বিদ্রোহীকে এনে রাখা হতো। চল্লিশ বছর হয় নি, যখন দেবতার মতো চেহারার গোরা গোরা সৈনিকেরা সেই কালো কালো বিদ্রোহীদের পাহারা দিতো।

মেয়র বলেছিল, একদিন ফোর্ট দেখতে উঠে রিনিমেমসাহেব কী সব ক্ষুধিত পাষাণের কথা বলছিলেন, নাকি বিপ্লবীদের দীর্ঘশ্বাস। পরে বলেছিলেন ফরেস্টের হাতে যাওয়ার আগে, জানো, মেয়র, তোমার এই শহর ক্যান্টনমেন্টের মতো ঝকঝকে ছিল। সত্যি কি সেরকম ছিল?

ছোটসাহেব বলেছিল, তা ছিল। আর্মি অফিসার সিপাহীদের সঙ্গে তাদের ধোপা, নাপিত, মেমরা, সহিস, রাজমিস্ত্রী। আমাদের যেখানে কলোনী সেখানে পোলো খেলা হতো। তখন সেই ফোর্ট ও আর্মি এরিয়ায় কোলগ্যাসের বন্দোবস্ত ছিল, আলো জ্বলতো। আমাদের হাফ মেগাওয়াট হাইডাল ইলেকট্রিকের অনেক বেশি।

পোস্টমাস্টার বলেছিল, আরো যদি প্রমাণ চাও, মেয়র, বাজারের নিচে কবরখানা কি দেখোনি?

দেখো, ক্যাপ্টেন, লেফটেনেন্ট, আদার র‍্যাঙ্কস, কারো বাড়ি ইংল্যাণ্ড, কারো ওয়েলস, কারো বা স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড। এখন যারা আছে এখানে, ভাল করে খুঁজলে দেখবে, কারো কারো রক্তে সেই গোরারা লুকিয়ে আছে।

হেসে রেঞ্জার বলেছিল, তা হল। কিন্তু বর্তমানটা কী হল? এখন তো পিনালকলোনি বলা যায় না, মিলটনের সেই ব্ল্যাকফায়ার আর বার্নিং ব্রিমস্টোনের নরকও বোধ হয় বলা যাচ্ছে না। নাকি বিরিঞ্চির কথা মেনে নেয়া হবে? সেটাও ছিল ঈশ্বরের প্রথম জেলখানা, সেই ইডেনের উদ্যান?

বাকপটু পোস্টমাস্টার টিপট থেকে আর একটু চা ঢেলে নিয়ে বললে, একটু ভেবে নিয়ে, হিয়ার আর কুল মসেস ডীপ। অ্যান্ড থ্রু দা মস দা আইভিস ক্রিপ। অ্যান্ড ইন দা স্ট্রীম দা লং লিভেড ফ্লাওয়ার্স উইপ। অ্যান্ড ফ্রম দা ক্র্যাগি লেজ দা পপি হ্যাঙ্গস ইন স্লিপ।

ও মশায়, ও মশায়, তাহলে কি গার্ডেন অব ইডেন মনে হচ্ছে? নাকি বাকিটাও বলবেন?—ইজ দেয়ার এনি পীস এভার ক্লাইম্বিং আপ দা ক্লাইম্বিং ওয়েভ।

ময়রের হঠাৎ অনুভবে এল, এই পাহাড়েও তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে, শান্তি কি পাও সেই তরঙ্গে তরঙ্গে উঠতে?

কিন্তু হঠাৎ ময়রের মুখ বিকৃত হতে থাকল। সে আঙুলের এঁটো সত্ত্বেও দু হাতে মাথার দুপাশ চেপে ধরলে। দুঃসহ ব্যথায় সে হাঁপাতে থাকল। কে ভেবেছিল, ওই ইংরেজি শব্দগুলো মাথার নরম অংশে গেঁথে গিয়েছিল?

নরবু তার নিজস্ব ভাষায় বললে, সে কী, তিনখানার মধ্যে দুখানা ধাঁউসা পড়ে থাকল! শরীর খুব খারাপ করছে কি?

এক মিনিট পরে ময়র বললে, ঘুমের পপির কথা শুনলি তো।

খই? কো ভনেক ছ?

নরবুর মুখে, কই, কে বললে? শুনে ময়ূর সম্বিত পেল। তা হলে নরবু শব্দগুলোকে শোনে নি। বললে, আচ্ছা, নরবু তিমরো বাগানমা পপি ছ কি ছই না?

পপি ছ, হলিঅক, ডালিয়া পনি ছ।

বা, তোর পপি, হলিহোক, ডালিয়া সবই যদি থাকে, তো জল দিচ্ছিস না কেন? মার্চের গরম।

হিজু বিহানমা দিয়েক ছু রোজ দিনছু কি?

নরবু বাংলোর সামনের পিছনের লনে, গার্ডেনে সকালেই জল দিয়েছে। রোজই দেয়।

কিন্তু ভাবলে ময়ূর, দুজনের সদয়তার প্রমাণগুলোই বেশি মনে আসে। সেদিনই সে সব আলাপের সময়েই রেঞ্জার বলেছিল, রসো ময়র, আমার একটা ট্রানজিস্টার আছে। সেটা আপাতত আমার কাজে লাগছে না। ব্যাটারি বদলে তোমাকে দেবো। তুমি যখন খুশি, যত খুশি, বিবিধ ভারতী আব লতা মুঙ্গেশকরের গান শুনতে পারবে।

তা শুনে পোস্টমাস্টার বললে, তা হলে খুব ভালোই হয়, ময়র হয়তো টোটাল রিভলিউশনের শেষ খবরগুলো জানতে পারেনি। মোরারজি জগজীবনকে হারাতে পারবে কি না, অথবা চরণসিং, রাজনারায়ণ তাকে ল্যাং মারবে কিনা—এসব আপটুডেট দিল্লির খবর পেয়ে যাবে। ময়ূরের মনে পড়ল, রেঞ্জার সাহেবের ছবি আঁকার বসবার ঘরে মখমলের খাপে ঢাকা বড় একটা রেডিও আছে বটে। কিন্তু খাপের উপরে জমা ধূলো প্রমাণ করে তা ছমাসে একবার ব্যবহার হয় কিনা। দুখানা খবরের কাগজের পড়ে নেয়ার পরে বোধ হয় আর শুনতে আগ্রহ থাকে না।

কিন্তু, যেমন স্বভাব তাদের, পোস্টমাস্টার বললে, আচ্ছা, মশায়, তখন যারা এখানে জেলে ছিল, তাদের কি ট্রানজিস্টার ব্যবহার করতে দিতো?

তখন কি ওটা আবিষ্কার হয়েছে? আর হলেও বা তা ব্যবহার করতে দেবে কেন? বর্তমান

সময় আর সমাজ থেকে পৃথক করে দেয়াই তো তাদের শাস্তি। খবরকাগজ সেন্সর করে দিতো কিনা কে বলবে?

তারা হয় খেলায় ব্যস্ত হয়েছিল, কিংবা গল্প করতে করতে চলে গিয়েছিল সেদিন।

মেয়র খাবার টেবল থেকে উঠে পড়ল। আঁচানো শেষে গামছায় হাতমুখ মুছতে মুছতে সে মনে মনে হাসল। এখানে আসার মাস দুয়েকের মধ্যেই, তখন রাত দশ সাড়ে দশ হবে, সে ববিজানের বাড়ির সামনে পিচরাস্তার উপরে ছিল। হঠাৎ কারা যেন জোরে জোরে ইংরেজিতে কথা বললে, আর তার পরেই–। সে চমকে সরে দাঁড়িয়েছিল। একটা ট্রেন জোরে হুইসল দিয়ে ঝকঝক করে সেই পথের উপরে এসে পড়েছে লেভেল ক্রসিংএ। তা অবশ্য হয় না। তাসিলা স্টেশনের শব্দও সেখান থেকে শোনার কথা নয়। ওটা শেয়ালদার কাছেও নয়। ববিজানের রেডিওটা নিশ্চয় দামি, আর বোধ হয় রেডিওয় নাটক হচ্ছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

মাদার সুপিরিয়ার জেন এয়ার তার রোগীর জন্য রেডিমেড পাজামা-সুট সংগ্রহে তাসিলায় এসেছিল। অসওয়ালের দোকানে একরঙা পাঞ্জাবি-পায়জামা পেয়ে, যদিও মাপমতো হয়নি, থেনডুপকে দিয়ে তা বাংলোর পাঠিয়ে দিয়ে ঘড়ি দেখলে। সাড়ে এগারো হয়, সতেরই মার্চ, লাঞ্চের দুঘণ্টা দেরি। আবহাওয়া না-ঠাণ্ডা না-গরম। সে স্থির করলে, তাসিলা একটু ঘুরলে হয়। জেন আশৈশব লখনৌ থেকেছে, সম্ভবত কলকাতায়ও, আর নিশ্চিত, সে সিমলা ও দেরাদুনে একাধিকবার থেকেছে, তার কাছে এই তাসিলা, দু একটি পিচের পথ, অধিকাংশ মাটির গলি, আর কয়েকটি উঁচু নিচু টিলায় রিজে ওঠানামা করা তাসিলা, দর্শনীয় হয়না। উপরন্তু সেই ডিসেম্বর থেকে এই মার্চ সে তাসিলা রোড স্টেশনে একবার যেতে ও দুবার আসতে নিশ্চয়ই তাসিলা দিয়ে তা করেছে।

তার প্রথম কৌতূহল হল, বাজারের নিচে সেই হেলে পড়া প্রাচীরের নিঃশব্দ সেই কবরখানায়, ভূমির সঙ্গে নানা কোণে খাড়া কয়েকটি দেবদারুর ছায়ায় সেই স্মৃতিফলকগুলোকে দেখতে। একসময়ে সবগুলোই লম্বভাবে ছিল, এখন যেন সেগুলোর সেই নব্বুই ডিগ্রিতেই আপত্তি। শ্যাওলায় ও ঝরাপাতায় ঢাকা, কিন্তু অনুমান কোন কোনটি মার্বল পাথরের, একটা অন্তত পিংকমার্বল। বাজার আর কবরখানার মধ্যে হাত চারপাঁচ চওড়া ফাটলটাকে পার হতে হয়েছে বাজার থেকে একবার উঠে গিয়ে, পরে পাকদণ্ডিতে নেমে। সোজা আসা যায় না। হেলেপড়া প্রাচীরের লোহার গ্রিলের গেটও খাড়া নেই। সেই প্রাচীর বরাবর চলতে গিয়ে একটা মার্বল প্লাক তার চোখে পড়ল। গাছটা মুচকুন্দ, ফুলের সুঘ্রাণ, ঝরে পড়া ফুল সে কবরে। টিনিয়া অগিলভি, বর্ন ১৮৭০। ডায়েড ১৮৯৯। অ্যাওয়েট মিলাভ। ইওর টিয়ারফুল বেব। আর এস পি। পরে ব্যাকেটে লেখা, মেজর জন ব্যাবিংটন অগিলভি। থার্ড স্কটিশ হাইল্যান্ডার্স। আর একটু চেষ্টা করলে আরও পড়া যেতো হয়তো।

এসব কার বা তত্ত্বাবধানে? ক্লুটলংএর অধিকারে নেয়া গেলে ভালোভাবে রাখা যেতো।

কিন্তু কেমন সব অনুভূতি হয় না? প্রায় আশি বৎসর আগে শতাব্দীর শেষ বৎসরে সেই যার আদরের নাম টিনিয়া, যার বয়স প্রায় উনত্রিশ মাত্র, এখানে, তাসিলায়, শেষবারের মতো নিঃশ্বাস নিয়েছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল? কিংবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল? নাকি নিজের চলে যাওয়া বুঝতে পেরে

নিঃশব্দে জল পড়ছিল চোখ দিয়ে।

সে নিজের মনের মধ্যে দেখে, মনে মনে বললে, সে কি সাশ্রু বেবের জন্য দুঃখ করবে? আর সে নিজে তো সেই ভয়ের উনত্রিশ দুবছর আগেই পার হয়েছে। ভাবপ্রবণ হলে চলে কি? তা ছাড়া এখন তো জিনের ট্রাউজার্স, পোলকাডট হাত-গুটানো শার্ট, অক্সফোর্ড শু, আর সানহ্যাটে তাকে কি বরং টেডিবয়ের মতো দেখাচ্ছে না? যদিও খুব কাছে এলে বাস্ট আর সিটের গড়নে—সে তো আর লোকজনের ভিড়ে যাচ্ছে না।

কবর দেখতে গিয়ে যে পথে থেনডুপ তাকে এনেছিল, সেটা ছেড়ে দেয়ায় মিনিট পনের কাঁচা পথে ওঠানামা করে একটা পিচ পথ পেলে সে, যা আবার বাজারের দিকে একটা বড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য, অন্য দিকটা উঁচু নিচু হয়ে ক্রমশ নিচের দিকেই চলেছে। সে পথের ডানদিকে পাহাড়ের ভাঁজগুলো, আর বাঁদিকে খাদের মতো ত্রিশ চল্লিশ, একশো ফুট নেমেছে। এখানে ট্রাফিক আইন বোধ হয় এই, যদি ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠতে কিংবা দিশেহারা হয়ে নামতে হয়, তবে উঠবার সময়ে বাঁ হাতের আর নামবার সময়ে ডান হাতের দিকে পাহাড় ঘেঁসে চলবে।

কিন্তু সে তো ক্লুটলংএর পথ, আর সে তো তাসিলাতেই যেতে চাইছে। মিনিট পাঁচেক চলে, এক পথসংযোগে এসে, সে অনুমান করলে ডানদিকেরটা বোধহয় তাসিলার অন্তঃকরণে ঢুকেছে। পাহাড়ের উপরে কিছু পরস্পর ঘনিষ্ঠ ঘরবাড়ি। অন্তঃকরণ মানে ডাউনটাউন, যদি এটাকে টাউনই বলতে হয়। সে মনে মনে হাসল। ঘাস আর আগাছায় ঢাকা, যার কোন কোনটিতে ফুল, পাহাড়ের গা, যাতে কোথাও কোথাও গাছ বড় বড়। ছোট ছোট পায়ে চলা পথ উঠে সেই সব গাছপালার আড়ালে যাচ্ছে, যাতে অনুমান হয়, সে সবের পিছনে বাড়িঘব আছে। আর সেই পথগুলো কোথাও পাথরের ধাপ, কোথাও কুচিপাথর আর মাটির। সে সব পথের রং কোথাও গেরুয়া, কোথাও তার চাইতে বরং লালচে। বিচিত্র আর সুন্দর বটে এ দৃশ্য।

সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেটা কিছু উঁচুতে হওয়ায় তার সামনে তিন দিক থেকে তিনটি রিজ এগিয়ে ক্রমশ কোথাও মিলতে যাচ্ছে যেন। এরকম হলে মনে হয় জলের পথ। জল এইসব রিজ থেকে নেমে সামনে কোথাও কোন ধারায় মেশে। আর রিজগুলোতে নানা উচ্চতায় বাড়িঘরও চোখে পড়ছে, যার কোন কোনটির ছাদ রঙিন টিনের। কিন্তু তিনটি রিজেই পথের চিহ্ন খানিকটা করে চোখে পড়ে। কোনটাকে অনুসরণ করলে সে সেই ব্রিজটাকে বা পাবে যা পার হয়ে সে ইতিপূর্বে যাতায়াত করেছে? সে যে রিজটাকে ধরেছে সেটা সবচাইতে উত্তরের আর সব চাইতে উঁচু। বরং সব চাইতে দক্ষিণেরটা বেয়ে যে পথ তার উপরে মানুষজন বেশি দেখা যাচ্ছে। যদিও তার এই রিজটাতে বাড়িঘর আছে। দক্ষিণের ঢেউটার গা পেরিয়ে যে রাস্তা তার উপরেই পুতুল পুতুল পুরুষদের পরনে চুড়িদার পায়জামা, পাঞ্জাবি, তার উপরে কোট, মাথায় টুপি। দুএকজন এমনও আছে যাদের ঢিলে আলখেল্লা কোমরবন্ধে গোটানো, মাথায় গোল ভুটিয়া টুপি। ঘাগরার মতো করে শাড়ি আর আস্তিনওয়ালা ব্লাউজ পরে কয়েকজন স্ত্রীলোক। সে স্থির করলে, সব দক্ষিণের ওই পাহাড়টায় গা বেয়েই সে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকবারই যাতায়াত করেছে। এই সময়েই সে লক্ষ্য করলে, সে যে পথে চলেছে সেটা থেকে একটা পাথুরে পথ রিজটার মাথার দিকে উঠেছে। তা হলে বোঝা যায় মাথার উপরে পথ আছে। সে নিজের উরু ও নিতম্বের সবল পেশিগুলোর সাহায্যে রিজের মাথায় উঠে একটা কাঁচা কিন্তু বেশ চওড়া পথ দেখে খুশি হল। সেখান থেকে সে লক্ষ্য করলে, জলধারাটা অনেক নিচে রিজটার গোড়া ছুঁয়ে যেন বয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এপথে চললে সেই ঝোরা যার উপরে ব্রিজ, তা পার হতে হয় না। আর সামনে কিছু দূরে ওটাই কি পুরনো ফোর্টের ধ্বংসাবশেষ? এটা একসময়ে হয়তো ফোর্টে যাওয়ার পথ ছিল যদিও এখন প্রধান পথ নয়। পথটা নিচে নামতে শুরু করলে, সে লক্ষ্য করলে সূর্যটা এখন তার গালে আর ঘাড়ে লাগছে।

সে টুপিটা ঠিক করে বসালে। আর মনে মনে বললে, এতো তাসিলা পার হয়ে চলে যাওয়া নয়। বরং ভিতরে ঢুকে দেখা। অবশেষে রিজটা নিচু হচ্ছে, পথটাও নামছে, বরং যেন সমতল কিংবা একটা উপত্যকা ছোঁবে। এরকম সময়ে তার মনে হল, খানিকটা নিচু থেকে উঠে আসা জলের শব্দ শুনছে সে। জল তো থাকবেই নতুবা মানুষ থাকতো কি করে? বাতাসেই পাহাড়টাকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে দিতো। অবশ্য জলের বাড়াবাড়ি থাকলে রিজগুলো ধ্বসে যেতো। অনুভূতিটা মনের মধ্যে এক মিনিট মতো থাকতেই সে হেসে ফেললে। এই দেখো, স্যালাইন ড্রিপের ডাক্তারি হচ্ছে।

কিন্তু কোন পথ পেলেই এই রাস্তাটা থেকে নেমে পড়তে হবে। এত উঁচুতে থাকার জন্য সূর্যটা বেশি লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে রকম এক পথ পেলে বটে। আর সে পথটা কয়েক সারি গাছের পাশ দিয়ে একটা উপত্যকার দিকেই নামছে।

প্রকৃতপক্ষে সে ফরেস্টকলোনির দিকে তখন নামছে, যা অবশ্যই তার জানা ছিল না।

২

পথটা পাথরকুচি মিশানো লালচে গেরুয়া মাটির। আর নামেও খুব ধীরে। গাছগুলোর সারি পার হতেই সে অবাক, সেখানে যেন এক খেলার মাঠ। আর তার পিছনে বেশ সুদৃশ্য বাড়িঘর। আর দশ মিনিট ক্রমশ নিচে নেমে, গাছের সারি বাঁচিয়েই যেন পাক খেয়ে নামছে রাস্তা, সে ওই বাড়িঘরগুলোর কাছে পৌঁছে যাবে।

তো, স্টেশনমাস্টার আর গার্ড তো বলেই খালাস। জেনের মনে পড়ল, সেই মিটমিটে আলোর নিঃসঙ্গ কামরাতেই ফিরে এসেছিল সে। জানালা-দরজার ছিটকিনি বসিয়ে ক্যাচ তুলে, সেই ঈশ্বরপরিত্যক্ত কামরায় স্লিপিংব্যাগে ঢুকে মাথার উপরে ঘোলাটে বালবটার দিকে চেয়ে রাতটা কেটেছিল। গাড়িটা ঘুর ঘুর করে চলেছে, যেন একই পথে একাধিকবার, শান্টিং করছে, থামছে, চলছে। বোঝা যাচ্ছে, সেই গাড়িতে রাতে কেউ ওঠেনা। সকালে যখন এই পথে ফিরবে তখন যদি ওঠে। কী করবে সে? সে তো ব্রিজ পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

জেন ভাবলে, কী জানি জন্মের সময়েও মানুষের তেমন কষ্ট হতে থাকে কিনা। তেমন চোখের জল আসে কিনা। হয়তো নিঃশ্বাস নিতে চায়, নাকানিচোবানি খেতে থাকে। হয়তো গায়ের ভিতরে হলুদ ঘোলাটে আলো ঢুকতে দেখে জন্মের কষ্টের চাইতে আতঙ্কেই আর্তনাদ করে ওঠে।

তখন তো কামরার বাইরে ডিসেম্বরের শীত আরও অন্ধকার। জেন নিজেকে বললে, আবার ডাক্তারি? তা দেখো, জন্মের কষ্টের চাইতে অপরিচিত পৃথিবীতে আসার ট্রমাই বোধ হয় বরং।

আমরা তো বুঝতেই পারছি তাসিলায় সে প্রতিবেশী হিসাবে, অথবা যেন ট্যুরিস্ট হিসাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে চাইছে, আর সে জন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য, পথঘাট যেমন চোখে পড়ছে, তেমন তার মন চৈতন্যস্রোতে হিল্লোলিত হচ্ছে।

সে তখন, না জেনেও, ফরেস্টকলোনিতে নেমে পড়েছে। তার ডান হাতের দিকে সেই খেলার মাঠ যার উপরে ভলিবলের নেট টাঙানো। আর তার পরে তার কিছু পিছনে একটা পিচরাস্তা ধরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রঙীন টিনের, কাঠের রং করা দেয়ালের, বাড়ি। তার মধ্যে দুচারটে দোকানও যেন। এটাও অবশ্য যাকে ডাউন টাউন বলে তাই হবে, যদি কোথাও থাকে তা। সে অবাক হয়ে গেল, দেখো বিস্ময়, এখানে স্ট্রিটলাইটিং, পোস্টের উপরে তার চলেছে।

সেই ডিসেম্বরে, জেন মনে মনে হাসল, তার চোখের উপরে সূর্যের আলো পড়েছিল, যেন টর্চ জ্বেলেছে কেউ। আর কুয়াশার মধ্যে সেই আলোয় সেই অদ্ভুত চেহারার ষাঁড়টাকে দেখেছিল,

যার নাম পরে জানা গিয়েছিল, ঝব্বু। কালো সাদা উলে তৈরি সেই ষাঁড়টার গলায় কড়ির মালা, আর মাটি ছোঁয়া মোটা পশমি লেজে রিবন বাঁধা। আর তারই পাশে কালো গাধা-প্রমাণ পনিটার পিঠে মরচে ধরা লোহার রেলিংদার পুরনো স্যাডল।

তাদের কোন অসুবিধা হয় নি। দুই প্যাসেঞ্জার কামরার গাড়ি, তার একটির দরজা খুলে একজন মেমসাহেব দাঁড়িয়ে আছে দেখে, তারা তাদের ঝব্বু আর পনি, যা ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্মে, দরজার গোড়ায় এনে বলেছিল, ক্লুটলং ম্যাম, ক্লুটলং।

ঝব্বুর পিঠে তার সুটকেস, বেডিং, ট্রাঙ্ক, কাঠের ওষুধের ক্রেট, বইয়ের ক্রেট, দুপাশে ভার সমান করে বাঁধা হলে, তার ফোম ক্রোকোডাইল লেদার ভ্যানিটিও তার চূড়ার মতো করে বাঁধা হয়েছিল। আর থেনডুপের ধরে থাকা স্টিরাপে পা দিয়ে থেনডুপের কাঁধে আর পাশাংএর ধুলোমাখা চুলের মাথায় হাত দিয়ে, সেই পনিতে উঠে সে মরচে ধরা রেলিং চেপে ধরেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝব্বুর নাকাডোর ধরে থেনডুপ, আর পনির লাগাম ধরে পাশাং, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতে শুরু করেছিল।

সূর্য উঠছে, তা হলেও কুয়াশার কুণ্ডলী। কখনও আলো আলো ভাব, কখনও পনিব নাকের সম্মুখে দুহাত পর্যন্ত লাগামটা চোখে পড়ছে। ঝব্বু আর মানুষদুটো অদৃশ্যই তখন। সে কি নতুন পৃথিবীর দরজা? কিন্তু তখন যেন নির্বাসনও ফোঁপায়, আতঙ্কে বুক ধকধক করে। কোন ভবিষ্যতে অপরিচিত পথে দুই অপরিচিত পুরুষ সেই আধোঅন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে? অথচ কোহেন বলেছিল—তখন সে লখনৌ ইউনাইটেড চার্চ মিশনের চেয়ারপার্সন মাদার সুপিরিয়ার ডাকোস্টার কাছে বিদায় নিয়ে ল্যান্ডিংএ—দেখো, কিন্তু, জেন, আমরা ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত তুমি রিট্র্যাক্ট করবে। আর তার আগে, যখন সে লিভিংটা অ্যাকসেপ্ট করে অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছে, তখন ডাকোস্টা ডেকে পাঠিয়েছিল। সেই সেই ঘরে স্মোলেট ছিল, কোহেন ছিল। ডাকোস্টা যার বয়েস সত্তর, যার সুন্দর বাঁধানো দাঁত, একমাথা সাদা চুলের পরচুলা বেশ শৌখিন আর প্ল্যাটিনাম রঙের, যার মাথা এখন মৃদু কাঁপে, বলেছিল, তুমি কি নিজের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করেছো? অ্যাডভান্স নিয়েছো? তা ফেরৎ দিতে পারো। তখন জেনের মনে দুর্বলতা ঢুকছিল, সে দেখছিল ডাকোস্টার ঠোঁটের প্রান্ত কাঁপছে, যে ডাকোস্টাকে আর সকলে মাদার বললেও, সে, জেনই একা, আর কেউ উপস্থিত না থাকলে এখনও মম বলে। সেই মম বলেছিল, ছোটবেলায় যেমন বলতো, তুমি বড় জেদি হচ্ছো, জেন, অন্তত ক্রিস্টমাস থেকে যাও এখানে, বরং জানুয়ারিতে যেয়ো। কিন্তু সে মাঝ-ডিসেম্বরের অন্ধকাবেই চলে এসেছিল।

৩

সে সেখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলে। যে পথ দিয়ে এখানে নেমে এল, সে দিকে চাইতে গিয়ে তার ডান দিকে হলদে-সাদা, গ্র্যানিট বলে ভুল হয়, এমন পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে পেঁচিয়ে এক-দেড়শো ফুট উঠেছে এক চ্যাটালো টিলায়, যার উপরে ভাঙা মিনারেট, প্যারাপেট সমেত এক বিধ্বস্ত বাড়ি চোখে পড়ল তার। এটাই তাসিলা দুর্গ? ট্যুরিস্টের মতোই হাসিতে তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হল। আর পরনে ট্রাউজার্স শার্ট সত্ত্বেও হ্যাটের নিচে ঠোঁটের হাল্কা গ্লস ধরা পড়ল: সে সোজাসুজি সেই ডাউনটাউনের দিকে না চেয়ে রাস্তাটা ধরে মুখ উঁচু করে হাঁটতে শুরু করলে।

এসময়ে সে ভাবলে, ডাকোস্টা কেন, সব মমকেই কি একসময়ে সেরকম, যতই কেঁপে কেঁপে উঠুক, ছেড়ে দিতে হয় না মেয়েকে? সেতো সেই কবে থেকেই হচ্ছে। আচমকা কী হল, যে মেয়ে

লন্ডনের বাইরে যাওয়ার কথা ভাবে নি, হয়তো সেও ডাউন আন্ডার যায়, টাসমানিয়া চলে গেল। যায় তো? তারপর আর একা থাকে না। হয়তো বা রোজই কোন এক সময়ে হোমসিক হয়। আর তাও তো বাইবেলের রুথের সময় থেকে।

তার বাঁহাতের দিকেও একটা বনে ঢাকা টিলা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। গাছগুলো বেশ অর্নামেন্টাল যেন। অর্নামেন্টাল নয়, বরং ল্যান্ডস্কেপিং করে লাগানো। একটু দূর থেকে জলের শব্দও আসছে। এ দুটোই তার দৃষ্টি সেই টিলাটার দিকে টানলে। এটা বিশেষ কিছুই বটে। সে যে পথে চলেছে তার থেকে কয়েকধাপ পাথর-সিমেন্ট-জমানো সিঁড়ি গাছগুলোর মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সে দিকে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে সে বেশ অবাক হল আবার, সে ল্যান্ডস্কেপিং পার হতে না হতে বেশ এক সুদৃশ্য বাংলো দেখতে পেল। সেই ডাউনটাউনে ঢুকতে একটা-দুটো বাংলো সে দেখেছে বটে। কিন্তু এই গোলাপি টিনের ছাদের শহরের দেয়ালের ঝকঝকে কাচের দরজাজানালা সমেত বাড়ি এখানে আশাই করা যায় নি। পথটা সেই টিলাকে ঘুরে চলেছে বলেই, সে বাংলোটার অন্য পাশের কিছু দেখতে পেলে, আর তখনই দুপুরের সূর্যের আলোয় বাংলোটা ঝলকে উঠল।

এক স্থানীয় বৃদ্ধা টিলার ঢালু গায়ে কিছু কুড়াচ্ছে। শাক সংগ্রহ করছে কি? হিল স্টেশন হলে বলা যেতো, বাংলোটা এক দামী হোটেল। কৌতূহল চাপতে না পেরে, সেই বৃদ্ধাকে, থেনড়ুপরা যে রকম হিন্দি বলে তাতেই জিজ্ঞাসা করেছিল জেন। বৃদ্ধা বললে, মেয়র-বাংলো ছ, কি। মেয়র-বাংলো। আবার অবাক হল জেন। আশ্চর্য, মেয়র? মেয়রেব বাংলো। সে দারুণ রকমে অপ্রতিভ বোধ করলে। যেন এই নিরক্ষর বৃদ্ধার চাইতেও কম জানে, এ জন্যই অপ্রতিভ, আর তাতে গাল লাল হয়ে উঠল। একি সম্ভব এই শহরে সত্যি মেয়র আছে! সে বরং তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, ক্লুটলং যাওয়ার পথ কোন দিকে। বৃদ্ধা কথা বুঝতে সময় নিলে। পরে ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই ইঙ্গিত করলে। কিন্তু জেনের মনে পড়ল, ক্লুটলং থেকে তাসিলায় আসতে জলস্রোত, আর ব্রিজে সেই স্রোত পেরোতে হয়। সে সুতরাং সেই ফরেস্ট কলোনি, অর্থাৎ যাকে সে ডাউনটাউন বলেছে, পার হয়ে যে পথ পশ্চিমে গিয়েছে সেটাকে ধরলে, কারণ তার মনে পড়ল আসবার সময়ে তার মুখে রোদ পড়ছিল।

খানিকটা যেতেই সে বুঝলে, সে ঠিক পথই ধরেছে। অন্য পথগুলো যেখানে পাহাড় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে, এই পথটা একটা রিজ বরাবর, ফলে দুদিকেই পাহাড় চালু হয়ে নেমেছে, দুদিকেই বন। একসময়ে পথটাকে বাঁধানোর চেষ্টা হয়েছিল, এখন পাথরকুচি আর মাটির। অবশ্যই পথটা খুব নির্জন। কিন্তু ক্রমশই তার কাছে স্পষ্ট হল, এটাই পথ, এটাকেই থেনড়ুপ গ্রেগ অ্যাভেনু বলেছিল।

পথ বরাবর দেখছিল সে, সে দেখতে পেল দুপাশের সারিবদ্ধ গাছের মধ্যে একটা অল্পবয়সী মেয়ে হাঁটছে আর থেমে দাঁড়িয়ে কিছু কুড়াচ্ছে। সে সানগ্লাসটাকে ঠিক করে বসিয়ে, টুপিটাকে বরং পিছন দিকে হেলিয়ে, সেই মেয়েটার কাছাকাছি যেতে তাড়াতাড়ি হাঁটল।

লালচে কর্কশ পশমের জীর্ণ বোকু পরা এক আদিবাসী মেয়ে, যার বুকের উপরে জড়িয়ে ধরা হলুদ-সাদা একটা বিড়াল। মেয়েটির রং ফর্সা, শরীরে তেরচৌদ্দোর কমনীয়তা সদ্য লেগেছে। তেলের অভাবে পাটকিলে চুলের অর্ধেকটা চোখ আর গাল ঢেকে, অর্ধেকটা এক বেণীতে পিঠে। লম্বা রোগা গড়ন। বুক উঠি উঠি করছে।

এক হাতে বিড়াল জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে পথের ধারে কিছু কুড়াতে দাঁড়াল আবার। তার ফলে জেন তার পাশে এসে গেল।

কী কুড়াও?

হরতকি।

কী হয়?

আচার।

এপথ ক্লুটলং যাচ্ছে সত্যি?

হুঁ।

তারা প্রায় পাশাপাশি চলতে শুরু করলে।

কিন্তু এ সময়েই একটা ঘটনা ঘটল। পথের ধারের জঙ্গলে মাঝে মাঝে কাঠবিড়ালি চোখে পড়ছিল। একবার একটা দৌড়ে তার গাছ থেকে নেমে পথে এসে বসল। সম্ভবত কাঁচা হরিতকি খেতেই। বিড়ালটাও মেয়েটার কোল থেকে একলাফে রাস্তায় গিয়ে পড়ল, বোধহয় কাঠবিড়ালি ধরতেই। মেয়েটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়ে, পরে তার বিড়ালকে ধরতে তার পিছনে ছুটল।

পথটার এক বৈশিষ্ট্য, দুপাশেই বন। দুপাশের বন সমান উঁচু নয়। তার কারণ বোধহয়, ডাইনের চাইতে রিজের বাঁয়ের ধার নিচু। সে দিকের বনের মাথা নিচু দেখায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুপাশের ডালপালা এগিয়ে কোথাও কোথাও পথের উপরে একত্র হয়েছে। ঝরাপাতা এত যে পায়ের তলায় শব্দ হচ্ছে। মাটির পথ ছিল, এখন মাঝে মাঝে সিমেন্ট কংক্রিটের চিহ্ন চোখে পড়ছে। হ্যাঁ এটাই সেই গ্রেগের তৈরি অ্যাপ্রোচ আভেন্যু যার কথা নামগিয়াল বলেছে। কয়েক পা গিয়ে একটা কাঠের সাঁকো। সাঁকো কিন্তু কোনদিকে রেলিং নেই। তা ছাড়া দুঃস্বপ্নে যেমন, পা দিলেই সাঁকোর মেঝে উপরে নিচে দুলতে থাকে। অথচ তার উপর দিয়ে মেয়েটা দৌড়ে চলে গেল। এখন? তখন থেনড়ুপ সঙ্গে ছিল। সাঁকোর উপরে পা দিতেই সেটা দুলে উঠল আর জেনের সাদা মুখ আরও সাদা হয়ে গেল। সে মনে মনে বললে, এই বনে ভয়ই করে, বাপু। যেন জিম করবেটের দেশ। কিন্তু এই সাঁকো! মেয়র আছে জানা গেল, এই সাঁকোটাকে ঠিক করা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না?

গ্রেগের জিম করবেটের একটা কালেকশন আছে। আর তার এই ব্রিজটাও ভালো নয়। আর তখন তো ফেব্রুয়ারি মাস, দু মাস হয়েছে তার ক্লুটলং-এ আসা। তখন ডিসেম্বর জানুয়ারির সেই অন্ধকার কমেছে, তা হলেও বিকেল পাঁচটাতেই ঘরের আলো জ্বেলে নিতে হয়। ক্লুটলং-এ আর কোথায়?

জেনের মনে পড়ল :

প্রথম সপ্তাহটা তার বাংলোর ধুলো ঝাড়তে, কাচ মুছতে, মাকড়সা তাড়াতে গিয়েছিল। সে যে কী বড় বড় বিচিত্র রকমের মাকড়সা! (জেন শিউরে উঠল) ধুলো ঝাড়া হলে, দেখা গেল দেয়ালে, দরজা, জানালায় অনেক মেরামত দরকার। সাতদিন কাজ করলে কাঠমিস্ত্রিরা। জানুয়ারিতে এসে যখন উত্তেজনা থিতিয়েছে, তখন নির্জনতাকে বুঝতে পারা গিয়েছিল। থেনড়ুপ সন্ধ্যা হতেই বাড়ি চলে যায়। নামগিয়াল বুড়ো রাতের খাওয়া পর্যন্ত থাকে। তারপরে চার্চের ট্রানসেপ্টে ঘুমাতে চলে যায়। টেবলল্যাম্পের আলোর নির্জন বাংলোটায় জেন সকাল পর্যন্ত একা। আর দুদিনেই জানতে পেরেছিল, সে আর তত দূরে থাকা বুড়ো নামগিয়াল ছাড়া ক্লুটলং-এও মানুষ নেই।

সারা দিনমানে এমন কোন কাজ নেই যাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা যায়, সেই স্তব্ধতাকে আর নির্জনতাকে দূরে রাখা যায়। নামগিয়ালকে সে হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করতো, এ অঞ্চলে কি কেউ ক্রিশ্চান নেই? কেউ কি আসবে না তোমার চার্চে? পরে সে নিজেই বুঝেছিল, চার্চের জরাগ্রস্ত বাড়িটায় উঠে কিছু বলার মতো কোন ক্লার্জি নেই গ্রেগ চলে যাওয়ার পরে।

সুতরাং তার একমাত্র সান্ত্বনা সঙ্গে আনা ক্রেটের বইগুলো। তার বই পড়া দেখে একদিন

নামগিয়াল বলেছিল, ফাদার গ্রেগও বই পড়তো। তার কিছু বই লাম্বাররুমে বন্ধ করা আছে। তখন সেই লাম্বাররুম—স্টোররুমের চাবি খুলেছিল নামগিয়াল। দুএকদিন বাতাস চলাচল হলে, বড় বড় মাকড়সা আর ইঁদুরের ভয় কাটিয়ে নামগিয়ালকে নিয়ে জেন সেই লাম্বাররুমে ঢুকেছিল। উন্মাদ গ্রেগকে তার আত্মীয়রা নিয়ে যাওয়ার পরে, গ্রেগের যা পড়েছিল তা সবই নামগিয়াল সেই ঘরে জমা করেছিল। ধুলোঢাকা বড় বড় চামড়া আর পিতলের তৈরি ট্রাঙ্ক। একটা খুলে তার ভিতরে কালো বনাত আর সার্জের সুট, ক্যাসক, লিনেন শার্ট ইত্যাদি দেখা গেল।

কিন্তু ঢুকতেই যেন এক মুণ্ডহীন মানুষ দেয়ালে ঝুলে আছে। পোকাধরা, মথের কলোনি, মোটা কর্কশ বাদামি পশমের এক বেশ বড় ক্যাসক। তা কালো ছিল, ধুলোয় বাদামি হয়েছে, কিংবা বাদামিই তার আসল রং, তা বলা যায় না। এসব সেই মুণ্ডহীন শরীরের আতঙ্ক কমলে ভাবা গিয়েছিল।

সে ঘরে কয়েকটা আলমারি যাতে, নামগিয়াল বলেছিল, কিছু কম্বল, বেডশীট ইত্যাদি আছে। একটা র‍্যাকে কিছু বই, যা ধুলোয় ঢাকা, ড্যাম্পধরা, একপাশে উই ধরেছে। দেয়ালের গায়ে শেলফে অনেক পুরনো খবর-কাগজ। ঘরের এক কোণে কোদাল, কুড়ুল, গাঁইতি, একটা জোয়ালও, যা মাঠে গোরুর কাঁধে দেখা যায়। জেন জিজ্ঞাসা করেছিল, সেটা কী? নামগিয়াল বলেছিল, সেটা ক্রস। জেন জানতে চেয়েছিল চার্চের ছিল কিনা সেটা। নামগিয়াল তখন কিছু বলে নি।

কয়েকদিনের চেষ্টায় সেই র‍্যাকটাকে আর র‍্যাকের বইগুলোকে উদ্ধার করতে পেরেছিল সে থেনডুপের সাহায্যে। এখন সেগুলোকে সে তার বসবার ঘরে নিয়ে সেই ঘরটারই নাম দিয়েছে লাইব্রেরি। আর একদিন সাহস করে দেয়ালের কোণ খালি করতে পুরনো খবর-কাগজগুলোকে নামানো হয়েছিল। বেশির ভাগই পুরনো টাইমসের আর পাঞ্চের তাড়া, আর তাতে চাপা দেয়া জিম করবেট আর এডগার ওয়ালেস, কোনান ডয়েল। সেই ফাদার গ্রেগরী ক্রুস্টার তা হলে একসময়ে এসবে মন দিতো। র‍্যাকের বইগুলোর অধিকাংশই দর্শন আর ধর্মের, কিন্তু সর্বত্রগামী শেক্সপীয়াব, আর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের কিছু উপন্যাস। কিন্তু দেখো, সবই স্টোররুমে চোখের আড়ালে রাখা, যেন যতদূর সম্ভব সে সব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা। এটা কিন্তু ভালো, এসব দেখলে সেই নিঃসঙ্গ ফাদার গ্রেগরীকে রক্তমাংসের মানুষই মনে হয়। সেও তার মতো একাই থাকতো এই বাংলোয়। গ্রেগরী সবে যাওয়ার পাঁচ বছরে কী আর পরিবর্তন হয়েছে?

৫

সেদিনটাও ছিল (ঘড়ি দেখল জেন, একটার কাছে বেলা। তারিখটা সতেরই তা আবার চোখে পড়ল।) ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি। জেন ভাবছে, নিঃসঙ্গতা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু সেই কাজকর্ম, যা একটা পুরো জীবন-স্থায়ী কাজ হবে, কাজ, হবি, প্যাশন। হ্যাঁ ক্রিশ্চান-প্যাশন। সে অবশ্যই নান নয়। নান হতে তো লখনৌ-এই সম্ভব ছিল। না, নান নয়। যদিও কনভেন্ট-শিক্ষিত, পরে মেডিক্যাল কো-এডদের সঙ্গে পিকনিকেও যেত। টেনিস খেলেছে, সাহিত্য পড়েছে, হসপিট্যালে ডাক্তারি করেছে। পরে সে আদিবাসীদের খুঁজে নেবে যাদের মধ্যে তার কাজ হবে। একশোটি তেমন পরিবারকে সুস্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনা, তাদের নিরক্ষরতা দূর করা, বুঝতে দেয়া মানুষ এখন চাঁদে যেতে পারে, আকাশে তারা দেখো, তার মধ্যে মানুষ আকাশে ছুঁড়েছে এমন নকল উপগ্রহ আছে। এই তো কাজ। হোক নির্জন, হোক নিঃসঙ্গ, এখানে শান্তি থাকতে পারে। আর নিঃসঙ্গই বা কেন? স্বাস্থ্যের খোঁজে যারা আসবে, শিক্ষার লোভে যারা আসবে, তারা নিঃসঙ্গতাকে রাখবে না। ডাকোস্টার কথা ভাবো। তার নিঃসঙ্গতা দূর করে তার হসপিট্যাল, তার স্কুল ও কলেজ। নতুবা লখনৌ তাকে

কী দেয়? তখন জেনের মনে বরং ক্লুটলং আর সংলগ্ন তাসিলাকে আরও জানতে ইচ্ছা করছে। সে আশা করছিল, ক্লুটলং-এর গাছগুলো যেমন নিঃসঙ্গ শিকড় ছড়িয়ে এই পাহাড় থেকে রস নিয়েই সুস্থির, তেমন সেও হতে পারে ক্রমশ।

তো, কোন কোন তারিখ ভোলা যায় না। সেদিন ষোলই ফেব্রুয়ারি ছিল। ডিসেম্বর তেরোতে সে এসেছিল তাসিলায়। ষোলই ফেব্রুয়ারির তখন বেলা দুটো। লাঞ্চ শেষ হয়েছে। একই টেবলে সে আর নামগিয়াল মুখোমুখি। থেনডুপ কফি দিয়ে রান্নাঘরে নিজে খেতে বসেছে। ক্লুটলংএ একটা ডিসপেনসারি, যেখানে রোগী দেখে ওষুধ দেয়া হবে—তার পরিকল্পনা নিয়ে তারা আলাপ করছে।

ফেব্রুয়ারির দুপুরে যেমন হয়। টেবলের চারদিকে আলোটা সাদা থেকে অন্য রং নিচ্ছে। শীত শীত ছিল। হিটার বা আগুনের আংটা হলে ভাল হয়। তারা, পশ্চিমপ্রান্তের সেই ঘর যাকে জেন লাইব্রেরি বলছে, সেখানে শার্সি দিয়ে আসা রোদে বসেছিল, জেন সোফায়, বুড়ো নামগিয়াল টুলে।

আচ্ছা, নামগিয়াল, তারপরে?

নামগিয়াল শুকনো মুখে বললে, ছমাসের মধ্যে যেন ক্রমশ অন্যরকম হয়ে গেলেন। কোটপ্যান্ট ছেড়ে ওই মোটা খসখসে ছাগলের লোমের ক্যাসক পরতে আরম্ভ করলেন। কখনো কখনো মাঝ-রাতেও অর্গানের বাজনা শুনে মনে হতো, সারারাত আজ প্রার্থনা চলবে। এক সময়ে ওই ভারি কাঠের ক্রস তৈরি করালেন, পরে নিজেই কাঁধে বয়ে বেড়াতেন সারাদিন। মাঝে মাঝে ক্যাসক সরিয়ে আমাকে দেখতে বলতেন, কাঁধে যথেষ্ট কষ্টের ঘা হয়েছে কিনা। ক্রমশ স্নান করা, দাঁত মাজা ছেড়ে দিলেন। বলতেন আমাকে আর ফাদার ব্রুস্টার বলবে না। ব্রাদার গ্রেগরী বলবে। তারপর, তখন এরকম ফেব্রুয়ারি হবে, চুলদাড়িতে মুখ ঢাকা। একদিন বললেন, ভগবান আবরণ দিয়েছেন তার চাইতে বেশি পোশাক দাম্ভিকতা, অন্য পক্ষ থেকে চুরি করা। ক্যাসক খুলে ফেলে—

বুঝেছি, বললে জেন।

না ম্যাডাম, সে বোঝা যায় না না দেখলে, একেবারে নাঙ্গা হয়ে গেলেন।

হোক তাসিলা ছোট একটা শহর, হোক ক্লুটলং তার এক নির্জন কোণ, তাই বলে চল্লিশ-পার এক উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ ধার্মিক মানুষ উলঙ্গ হয়ে পথে পথে ঘুরছে, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে না? অথচ তিনি সে সবই করতেন, যা সে নিজেও করতে চাইছে। রোগী দেখে চিকিৎসা, তাসিলাতে একটা স্কুল, সংবাদপত্র পড়তেন, ইংল্যান্ডের সাহিত্য পড়তেন, থ্রিলার পড়তেন, রসিক ছিলেন বলেই পাঞ্চ আসতো। সত্যি সেন্ট হয়ে যাওয়া? নাকি ঘোর উন্মাদ? হতে পারে তাঁর স্মোলেট, স্টার্ন ইত্যাদি উপন্যাসে প্রীতি ছিল, বিশেষ প্রীতিই ছিল, কিন্তু তাতো বড় জোর অষ্টাদশ শতকে পিছিয়ে যাওয়া। আর পোপ, ফিলডিং, স্টার্ন, স্মোলেটের যুগকে বরং বুদ্ধিদীপ্ত, সাট্যায়ারিক, সিনিক ও সফিস্টিকেটেডই বলতে হয়। পরের রোমান্টিক যুগেই বরং ভাবালুতা। সেই পড়ুয়া মানুষ কি চতুর্দশ শতাব্দীতেই যেতে পারে, যে সেন্ট ফ্রান্সিস হবে? এটা তো বিংশ শতাব্দী।

নামগিয়াল এসময়ে একটু শুয়ে নেয়। সে চলে গেলে জেন একটা বই নিয়ে বসল। এই বইগুলো, কে আর এমন নির্জনতায় সঙ্গী এই প্রাচীন মানুষগুলো ছাড়া! বই পড়তে পড়তেই মনে হল তার, কে যেন বলেছিল, নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হলে সে কিছু বই অন্তত নিয়ে যাবে।

দেখো, মানুষ কোন সময়েই আত্মরক্ষার কথা ভোলে না। নিজেকে সব অবস্থাতেই বাঁচাতে চেষ্টা করতে হয়। সাতদিনের মাথায় আশৈশব লখনৌ ছেড়ে আসার সময়ে, সেই সাতদিনে ডাকোস্টা, কোহেন, স্মোলেটের উপরোধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করে, এখানে চলে আসার সময়ে সে নিজের বইগুলোকে এনেছিল। মনে রেখেছিল, ক্লুটলং-এ কথা বলার মানুষ নেই। এক কাঠের ক্রেটে যত বই ধরে, এনেছে সে। নিজের ডাক্তারি বইগুলো তো বটেই, কে আর সেগুলোকে হাতের কাছে রাখতে চায় না? যে সব কবিতা, উপন্যাস নাটক তার প্রিয়, আর যেগুলো পড়ার ইচ্ছা

ছিল, এতদিন পড়া হয় নি। তার সৌভাগ্য, গ্রেগ ক্রস্টারের কিছু বইও পড়ার মতো অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে।

জেনও বই পড়ছিল। ক্যালেন্ডারের হিসাবে তখন ঠিক দুমাস হয়েছে তার এখানে আসা। বই পড়তে পড়তে গ্রেগেরও একমাত্র সঙ্গী ছিল বই—এই বাক্যটা প্যারাগ্রাফের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ছিল। এমনকি দুটো বাক্যের মাঝেও উঁকি দিতে শুরু করলে চকচকে মুখে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিল সে, আর তাতেই এক বুকে হাঁটা পোকার মতো বই থেকে তার কোলে গড়িয়ে পড়ল সেটা। বরং উঠে পড়ল, বরং হলদেটে সিপিয়া আলোয়, যদিও তখন দুপুরই বেলা, হযতো তা বিকেলের দিকে গড়াচ্ছে। অদ্ভুত কালো নয? যেন তা পুরনো আলো, সে দিনের নয়। সে পা টিপে টিপে এঘব থেকে ওঘরে যেতে চেষ্টা করলেই সেই বাক্যটা একটা দড়ি হয়ে তার কাঁধে, গলায় পড়তেই তার দম বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। আর তখন দরজাটার কাছে, যা কিনা সেই লাম্বাবরুমের, যেখানে সেই বাদামি ক্যাসক, সে খলখল করে কাউকে হাসতে শুনলে। সে বললে, না, না, সে সেন্ট হতে পারবে না। সে আধঘণ্টার মধ্যে নাইটব্যাগে টুথব্রাশ নিয়ে, তখন বিকেল অন্ধকাব হয়ে উঠছে, ক্লুটলং থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল। আর তখনই একটা কর্কশ পশমের পোকাখাওয়া বাদামি ক্যাসক তাকে তাড়া করতে শুরু করলে। সে হাসির শব্দও শুনতে পেলে, তখন সে দৌড়তে শুরু করলে। কেবল মনে রাখতে হবে, নামার পথে ডানদিকে খাদ, বাঁয়ের পাহাড় ঘেঁষে ছুটতে হবে। আরও জোরে। তখন সে শুনতে পাচ্ছিল, দাড়িগোঁফে মুখ ঢাকা উলঙ্গ এক পুরুষ হো হো কবে হাসতে হাসতে তার পিছনে নামছে। তাকে সিস্টার বলে ডাকছেও।

৬

জেন চোখ তুললে। ভাবলে, এত তাড়াতাড়ি হাঁটছে কেন সে। বুকে ধুকধুক করছে। সে রুমাল বার করে ঘাম মুছলে।

এখন তো মার্চ, তার দুপুবের আলো। আর ওই তো বিড়ালটাকে আবার কোলে নিয়ে সেই মেয়েটা হাঁটছে। যেন ডানপাশের জঙ্গল থেকে উঠে এল। জেন হাসল। তা হলে হুটোপুটি করে বিড়ালটাকে ধরেছে আবার!

মানুষ কিন্তু কখনও আত্মবক্ষার কথা ভোলে না। গলায় যখন ফাঁসের মতো জড়াচ্ছে সেই নিঃসঙ্গতা, সে দম নেয়ার চেষ্টা করছে, তখন সেগুলো বুদ্ধিমানের মতো আত্মরক্ষার চেষ্টাই হচ্ছিল। সে নতুন লালচে ডেনিমের সুটটা পবেছিল আর টার্টলনেক সোয়েটার। পায়ে রবারদাঁত-সোলের ক্যানভাস জুতো। অনেকটা স্ত্রীপরিচয় ঢাকতে। গার্ডলবেল্টে টাকা নিয়েছিল। তাড়াতাড়িতে নাইটব্যাগে কী কী নেবে স্থির করতে পারে নি। টুথব্রাশ, টর্চ একটা, রাতে পরার জন্য একটা প্রিন্ট কিমোনো এসব নিয়েছিল। পরে দেখেছিল, আন্ডারগার্মেন্ট আর রুমাল নেয় নি। আরও তাড়াতাড়ি করতে করতে, লাম্বাররুমে নড়াচড়ার শব্দ আর প্রথম হাসির আভাস কানে আসছিল। স্লিপিং ব্যাগের স্ট্র্যাপ দুই বগলের তলা দিয়ে কাঁধে আটকে সেটাকে পিঠে নিয়ে, তার উপরে কোহেনের বিদায়-উপহার ক্রোমহলুদ হালকা সেই রাগটাকে চাপিয়ে নিয়েছিল। আর হাসি সত্ত্বেও শোবার ঘরের টেবলে একটা স্লিপে লিখে এসেছিল, অল বিলংইংস টু বি সেন্ট টু ডাকোস্টা, লখনৌ ইউনাইটেড চার্চ।

এটাই কিন্তু আশ্চর্য, সে ভাবলে, যে এখন এই মার্চে সে ক্লুটলং মিশনের দিকে হেঁটে চলেছে, সে ক্লুটলং-এ চামলিং নামে রোগী থাকা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গ এখনও। সেখানে এই ৭৯-এর মার্চের

মাঝামাঝি এই দুপুরে কেউ হাহাহা করে হেসে উঠবে না—তা একেবারে নিশ্চয় বলা যায় না।

বাহ্, পায়ের তলায় এই পাতাগুলোর রং দেখো। পাতাগুলোর উপরপিঠ এত অদ্ভুত ইন্ডিয়া রেড যে আপেলের কথা মনে হয়। অনেক দূর পর্যন্ত পথটার উপরে আপেল ছড়ানো আর তার মধ্যে সে আর ওই মেয়েটা হেঁটে চলেছে। আপেল? জেনের ক্রিশ্চান মন থমকে গিয়ে, পরে মিটমিট করে হাসল। অথচ দেখো, আপেলের মতো সুস্বাদ আর কিসে?

এক রকমের ছোট চোট হলদেটে সবুজ ফলও। পিঠের উপরে লেজ তুলে মৃদু চিকচিক শব্দ করে কালো ডোরাকাটা একটা কাঠবিড়ালিও দেখা দিল আবার। দেখে মেয়েটির বুকে জড়িয়ে ধরা বিড়ালের আবার উত্তেজনার কারণ ঘটল। জেন মনে মনে ওই আর একটা বলার সঙ্গে সঙ্গে, বিড়ালটা কোল থেকে লাফিয়ে নামল আবার। কাঠবিড়ালি অবশ্যই ক্ষিপ্রতর, একটা ডোরাকাটা লাইন টেনে গাছে মিলিয়ে গেল। বিড়ালটা যখন ম্যাও করে পৃথিবীর এই অব্যবস্থায় নালিশ জানিয়ে গাছটার কাছে পৌঁছেছে, আর একটা আরও বড় মোটা কাঠবিড়ালি চিক শব্দ করে, বিড়ালটার গায়ের উপর দিয়ে রাস্তা পার হয়ে ডানদিকের জঙ্গলে গেল। হতে পারে, প্রথম কাঠবিড়ালি স্ত্রী-জাতীয়, আর পরেরটি পুরুষ। প্রথমটিকে বাঁচাতেই দ্বিতীয়টি তেমন সাহস করলে। বিড়ালটার বেশ অপমান হয়েছে। সে কাঠবিড়ালকে তাড়া করে বাঁয়ের জঙ্গলে ঢুকলে।

জেনের ঠোঁট হাসিতে ফাঁক হল। কিন্তু তার একরকম ভয় ভয়ও করল। সে দিকে খাদও, গাছের মাথা দেখে তার গোড়ার খাদ কত নিচে বোঝা যায় না।

কিন্তু সেই মলিন চেহারার আদিবাসী মেয়েটি হাসল না। মরেও—মরেছে কিংবা মর পোড়ামুখী, —এরকম কিছু বলে হাঁটতে শুরু করলে।

তোমার ভয় করে না? জেন জানতে চাইল। বিড়ালটা যদি হারায়? কিংবা ওটা কি বিড়ালি? মেয়েটি অবহেলায় বললে, যাবে। পরে বললে, হারায় তো না।

তা কি হয়? জেন ভাবলে, সত্যি করে কিন্তু কারো পোষা বিড়াল চিরকালের মতো হারিয়ে যেতে পারে। বললে, অনেক মেয়েই তো বিড়াল ভালবাসে। আর তা হারায়ও। তোমার বাড়ি কোথায়?

ওই দূর।

বাড়ি থেকে এতদূরে কেন?

আমলকি। মেয়েটি পথের বাঁদিকে দেখালে।

জেন দেখলে, কিছু দূরে সামনে, পথের বাঁদিকে পাহাড়ের গা ক্রমশ নিচু হয়ে গিয়েছে। আর একটু এগিয়ে দেখলে, ঢালটা খাঁজে খাঁজে অনেক নিচে একটা খাদে নেমে যাচ্ছে। সেই ঢালের গায়ে কিছু গাছ, কিছু ঝোপঝাড়, দু-একটা ঝোপ, শুকনো ঘাস। খাদের নিচে পর্যন্ত দেখা যায় না। অনুমান সেখানে বন। কেমন একটা হালকা কোবাল্ট রং খাদের শেষটা একটা সমতলে ছড়িয়েছে। একটু রোদ পড়েছে খাড়া দুপুরে এখন। সূর্য পশ্চিমে হেললে আরও রোদ পাবে কি ওই উপত্যকা? উপত্যকা বলবে কি? ওটা হয়তো অনেক নিচের কোন অখ্যাত বন্য গ্রাম। কিংবা তাসিলারই বেজমেন্ট ফ্লোর।

কয়েক পা চলে মেয়েটি পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এটা ওটা ধরে নামতে লাগল। জেনের গা শিরশির করে উঠল। দাঁড়িয়ে তাকালে মাথা ঘুরে যাবে। অথচ তের-চৌদ্দ বছরের রোগা রোগা মেয়েটি যেন ভয়কে আমলই দেয় না। হয়তো পাহাড়ি ছাগলের মতো নিশ্চিত দক্ষতা। কিন্তু ওখানে নেমে গেলে এই পথে দাঁড়িয়ে কেউ ওকে আর দেখতে পাবে না।

জেন হাঁটতে হাঁটতে ভাবলে, তা ছাড়া একজন স্ত্রীলোক তো বটে। সে ভয় নেই? ওই আদিমের মতো নির্জনতায় কি কোন পুরুষ থাকতে পারে না? না কি সে দিকে পরোয়া নেই এখনও?

অথবা, না জেনে তেমন কারো সঙ্গে দেখা হওয়ার দিকেই এগোচ্ছে মেয়েটি? বলবে কি যৌবনেব সঙ্গে দেখা করতে চলেছে? সে তো এক পুরুষই হতে পারে, যার কথা মনেও আসে নি। ওই আমলকি বনে কি ও বুঝবে সে যুবতী নয়, কিন্তু সে রকমই বয়স যখন বালক থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ভাগ্য না বললেও, যখন ঘটে যায় তখন কিন্তু সব বদলে যেতে পারে। মনে করো, মেয়েটি উঠে আসতেই পারল না। তারপর সেই পুরুষটিকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত রেখে, যেমন এক খণ্ড জমি যাযাবরকে কৃষক করে, মেয়েটি নিজের অতীতকে ভুলে যায়, ভবিষ্যৎই থাকে।

তা হলেও দেখো, রাস্তাটা এখনও জায়গায় জায়গায় ভালো। ধন্যবাদ সেন্ট গ্রেগরীকে, যে রাস্তাটা করেছিল।

কিন্তু সেই ফেব্রুয়ারিতে. .

ছুট ছুট ছুট। নারেঙ্গিহাট পৌঁছানোর আগেই সন্ধ্যা হয়েছিল। গাঢ় অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে। ঠিক সাতটা থেকে সাড়ে সাতের মধ্যে সেই রেলগাড়ি তাসিলা রোড স্টেশনে। ঘর্মাক্ত ক্ষতযুক্ত পায়ে সে ছুটছিল। জীবনে কেউ সেরকম একবারই ছোটে। সে গাড়ি হয়তো বেশি দূরে যাবে না। সে তো জানতোই রাতে বড়জোর পঁচিশ কিলোমিটার দূরের হাতিঘিষায় পৌঁছে সারা রাতের জন্য থেমে যাবে। পরের সকালে তার দক্ষিণে যাত্রার সময় হবে। কোন রকমে গাড়িটায় উঠে বসা চাই। অন্য কোথাও তো বটে। ক্লুটলং-এ নয়। সে সেন্ট হতে পারবে না।

ছুটতে ছুটতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে, কে তাকে টিকেট কাটার সময় দিচ্ছে, প্রায় চলেছে এমন অবস্থায় ট্রেনটার শেষ কামরায়, যা গার্ডের কামরারও পরে, উঠে পড়েছিল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। তখন চারদিকে মধ্যরাতের মতো অন্ধকার। চাঁদ ঢাকা পড়েছে কুয়াশায়, তা সে যে তিথিরই হোক। কালোর মধ্যে ঘোলাটে হলুদ রং এমন ঘন আলোর একটা কামরা, যাতে সে একা। যেমন ডিসেম্বরে ছিল তেমনই আবার। জেন, গাড়ি চলতে থাকলে উঠে জানালা-দরজাগুলোতে ছিটকিনি আর ক্যাচ লাগাতে গেল। সে চমকে উঠল, বাঁ দিকেব দরজায় ক্যাচ নেই। তা হোক, গাড়ি চলছে। আর তখন সব চাইতে স্বস্তি, সেই উন্মাদ গ্রেগ ব্রুস্টার হাসছে না।

কেউ ভাবতে পারে, লাইন বদলে বদলে চলেছে গাড়ি, কখনও লাইন বদলানো শান্টিংএর জন্যও হতে পারে। কিন্তু হঠাৎ এমন হয়, কোন কোন রাতে অন্ধকাবের মধ্যে গাড়িটা কোন এক কামরাকে কোন বাফারলাইনে ফেলে চলে যেতে পারে। এসব আগে থেকে বলতে পারলে জীবনকে অনিশ্চিত ভাবা হবে কেন? শান্টিংই বা কেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

বেলা একটা হতে চলে। পোস্টমাস্টার রেঞ্জারের কোয়ার্টার থেকে পোস্টঅফিসে, সুতরাং, নিজের কোয়ার্টারের দিকে, ফিরছিল। আজ ছুটির দিন নয়। পোস্টঅফিস খোলা। তা সত্ত্বেও মার্চ শেষের মধুর রোদে আয়েসী ভঙ্গিতে সুবেশ পোস্টমাস্টারকে ভ্রমণশীল দেখা যাচ্ছে।

তার পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিস, যেখান থেকে টেলিফোন করা যায়, ৬টা-৯টা, ১২টা-৫টা কাজ করে থাকে। কাজ অবশ্য খুবই কম। দিনে দুচারটে মনি-অর্ডার, দুচারটে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা. তাও হয় সকালে যখন তারা ডাকের চিঠির খোঁজে আসে, কিংবা বিকেলে যখন তারা চিঠি দিতে আসে ডাকে। এটাও মাসের প্রথম দিকে। পরে দিনে একখানা মনি-অর্ডার, দুদিনে একটা সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা তোলা, একটা টেলিগ্রাম হয় কিনা সন্দেহ। এখানে এমন কেউ নেই যে পোস্ট অফিসে এসে মনি-অর্ডার করতে না পারলে বিরক্ত হবে। টাকা আর ফর্ম হয়তো গুমছেকে দিয়ে বলবে, মাস্টারমশাই এলে দিও। টেলিগ্রামের বেলায় একটু কড়াকড়ি হয়। পোস্টমাস্টারের নির্দেশ, তাকে যেন গুমছে বা তার বাড়ির কাজের লোক ডেকে আনে।

ফলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা, আবহাওয়া সুখপ্রদ থাকলে, পোস্টমাস্টার বেরিয়ে পড়ে। হয়তো বাজারে গিয়ে নতুন শাক-টাকের খোঁজ নেয়। নয়তো রেঞ্জারের খোঁজে রওনা হয়। রেঞ্জার ট্যুরে না থাকলে, হয় তার অফিসে নতুবা বাংলোয় থাকবে। দুঘণ্টা গল্প করে নেয়া যায়। সে ট্যুরে থাকলে বাজারের স্থায়ী দোকানদাররা তখন পোস্টমাস্টারের সঙ্গী। আজ সে রেঞ্জারের বাসা থেকে এখন ফিরছে। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ। এখনই গরম পড়ার সময় নয়। রোদটাকে আর এলোমেলো বাতাসটাকে. যা একটু শীতভাবও আনে আবার, তাকে উপভোগ করতে কোট খুলে সেটাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়েছে।

এই সব বন্দোবস্ত অস্বাভাবিক এবং আইন-বহির্ভূত। একই বিষয় নানা দিক থেকে দেখা যায়। তাসিলা ঘুরে এসে কেউ যদি বলে : অ্যান্ড ফ্রম দা ক্র্যাগি লেজ দা পপি হ্যাঙ্গস ইন স্লিপ/দা ফোলডেড লিফ ইজ জেন্টলি উড ফ্রম আউট দা বাড ইত্যাদি. যেমন পোস্টমাস্টার নিজেই বলেছিল একদিন, তা হলে সে মিথ্যা বলবে না।

এই উৎসাহ বনের মাথার দিকে, মেয়র-বাংলোর বাগানের দিকে, অথবা পাহাড়ের গায়ের ঝোপগুলোর দিকে চাইলেও বাড়তে পারে, কিন্তু কিছু দিনেই বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন কারণে দুঃসহ মনে হতে পারে, এমন কি নীতিগতভাবে তাসিলার রূপে নিমজ্জিত হওয়া ঘৃণ্য মনে হতে পারে কারো বা।

আজ ছুটির দিন নয়, সুতরাং রেঞ্জারের তো অফিস থাকবে। কিন্তু তাকে তার অফিসে অথবা বাংলোয় পাওয়া যাবে, যদি না আগেই ট্যুরে গিয়ে থাকে। বিশেষ তার বাংলো আর অফিস একই উপত্যকায়।

পোস্টমাস্টারের এরকম যাওয়া এই দ্বিতীয় বার।

২

মাস তিনেক আগে তখন বেলা দশটা হবে। রেঞ্জারেব অফিসে তাকে না পেয়ে পোস্টমাস্টার তার বাংলোয় গিয়েছিল। দেখতে পেয়েছিল, বাংলোর বারান্দার রেলিংএ লাগাম-জড়ানো একটা পনি অপেক্ষা করছে। পোস্টমাস্টার বাংলোর বারান্দায় উঠেছিল। সে জানতো বারান্দার দুকোণে দুটি বসবার ঘর যথাক্রমে অফিসের কাজেব জন্য ও গল্প কবার জন্য। বারান্দা বরাবর যে লম্বা ঘবটা হল হিসাবে তৈরি হয়েছিল, সেটাকে রেঞ্জার লিভিংরুম হিসাবে ব্যবহার করে , বাংলোয় থাকলে সেটিতেই অধিকাংশ সময়ে থাকে রেঞ্জার। সেই ঘরের মেঝেতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বাখা ক্যানভাস দেখে বোঝা যায়, বেঞ্জার ছবি আঁকাকে হবি করে নেয়ার চেষ্টায় হয়তো। সেই ঘরের এক পাশে একটা ব্যাচেলার খাটের বিছানা, যেন ঘবটিকে নতুবা ন্যাড়া দেখাতো।

কাচের বড় বড পানেল দেয়া দরজার পাশেই কলিংবেল। পোস্টমাস্টার তা টিপতেই, ভিতর থেকে রেঞ্জার বলেছিল, কাম ইন।

কিন্তু কলিংবেল টেপাব আগের মুহূর্তে দরজার উপরেব দিকের কাচের প্যানেল দিয়ে পোস্টমাস্টারের চোখ ঘরের ভিতরে পড়েছিল। পর্দা থাকলেও তা সরে গিয়ে থাকবে। সে সেই মুহূর্তে, দুহাতে তুলে ধরা খবরকাগজেব আড়ালে পুরো পোশাক পরা রেঞ্জারকে তাব সোফায় এবং সেটাই অবাক করার মতো, রোজাকে সেই সরু খাটটার ধবধবে সাদা বিছানায দেখতে পেয়েছিল। বোজাকে সে চিনতোই। রেঞ্জারের হাউস কিপাব। মোটাসোটা এক রকমেব সুন্দরী সেই মাঝবয়সী হাউসকিপার অনেকবার তাদের আড্ডায় চা বা কফির পেয়ালা দিয়েছে। রোজার স্নান হয়ে থাকবে। পিঠে ছড়ানো খোলা চুল। সেখানে তখন শীতের একফালি বোদও বটে। কিন্তু আশ্চর্য, যদি হাউসকিপার কর্তার সামনে তাব বিছানায় বসে কোলে এক পা তুলে তাতে আলতা পরতে থাকে!

পোস্টমাস্টার ঘরে ঢুকবার আগেই রোজা তার আলতা নিয়ে চলে গিয়েছিল। মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে পোস্টমাস্টাবকে দেখে উৎফুল্ল রেঞ্জার তাকে স্বাগত করেছিল। পোস্টমাস্টার বলেছিল, কোন কাজই নয়। জাস্ট গল্প করতে। আপনি কি ট্যুরে? রেঞ্জার বলেছিল, রোড স্টেশনের ওপারে জঙ্গলে কারা হরিণ মারতে ঢুকেছিল কাল রাতে।

পোচার?

যখন পোচিং হয়েছে তখন তাই বলতে হবে। দলে ভারিই ছিল। অনুমান তত হুঁশিয়ার নয়। ফরেস্ট গার্ড অনেকগুলির শব্দ শুনেছে রাতে। গুলি লেগেছিল একবার। একটা ছোট হরিণের মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

তা হলে আপনাকে তদন্তে যেতে হয়।

দুঘণ্টা পরে গেলেই বা কী ক্ষতি? ফরেস্ট গার্ড বলে, সন্ধ্যা থেকেই একটা বেলকামরা স্টেশনের বাইরে পড়েছিল। সেই কামবা সকালের গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছে। পোচার বাফারলাইনে রাখা গাড়ি।

হতে পারে রেলের বাবুদের কেউ কেউ নতুন বন্দুক কিনে একটা অ্যাডভেঞ্চার করে গেল। রেঞ্জার হেসে বললে, পাপ মনে করছেন? অরণ্য, পোচিং, কাল, পাপ, এসব নিরবধি।

তারপর ঘণ্টা দুয়েকের আড্ডা হয়েছিল। রোজা বৃদ্ধ-সকালের কফি এনেছিল। তখনই জানা গিয়েছিল, রেঞ্জার ট্যুরে বেরুলে ব্রেকফাস্ট করে বেরোয়, সঙ্গে লাইট লাঞ্চ থাকে গ্রেট কোটের পকেটে, অন্য পকেটে তার রিভলবার। টর্চও থাকে, সেই বড় টর্চ, কোমরের সঙ্গে বাঁধা। তখন জানুয়ারি, কাজেই ওয়াটারপ্রুফ হয় জ্যাকেট।

আজ পোস্টমাস্টার এখন তার পোস্টঅফিস ও রেঞ্জারের বাংলোর মাঝামাঝি এসে পড়েছে। অন্যমনস্ক ভাবে পাম্পহাউস আর ব্রিজ পার হয়ে তার মন কখনও রেঞ্জারের বাংলোয় ফিরেছে, কখনও সুচেতনার কথা ভাবছে।

এখন সুচেতনা কী করছে বা, আর দেখো, কাল রাতেও ঘুম ভাল হল না।

আজ, অবশ্য, রেঞ্জারের দরজায় পর্দা টানা ছিল। বারান্দা থেকেই রেঞ্জারের গলা পাওয়া যাচ্ছিল, সে কার সঙ্গে আলাপ করছে।

পোস্টমাস্টার বললে, যুদ্ধাবস্থা উপস্থিত নাকি?

বিরিঞ্চি বললে, জলের সঙ্গে।

রেঞ্জার বললে, আমাদের কাজের কথা হয়ে গিয়েছে। ডাঙুয়াধারা চা বাগান দিয়ে বনের পথ যেখানে তার উপরে কাঠের ব্রিজ দিয়ে ভারি ট্রাক চলে না। হাতিঘিষার ডলোমাইট আর ডাঙুয়ার চা এখন চওড়া মজবুত পথ চাইছে। তাদের মতে, দুটো ছোট ব্রিজের জন্য তাদের অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। পিডব্লুডির মত, ব্রিজ তৈরি করার চাইতে অ্যাকুইডাক্ট করা সুবিধা। আর বর্ষাবাদল ছাড়া লেল্যান্ড ট্রাকও চলবে। তাই বনের মধ্যে পথ ডাইভার্ট করে কী কতদূর করা যায় তার গবেষণা।

ম্যাপটা গুটিয়ে তুললে রেঞ্জার। সে পোস্টমাস্টারকে বললে, যুদ্ধ নয়, শান্তি। এঞ্জিনিয়ারকে বললে, বুঝতেই পারছেন ডিএফওর মত ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। জাকিগঞ্জে যেতে হবে আপনাকে। আমি এখনই যাচ্ছি সেখানে। আপনার অসুবিধা না হলে আমার সঙ্গেই যেতে পারেন। আর বনের পজিশন আমি বরং ভাল বোঝাতে পারবো। তখন কীভাবে একত্র যাওয়া হবে তার আলোচনা হল। এঞ্জিনিয়ারের পনি নেই। রেঞ্জার তাকে পনি যোগাড় করে দিতে রাজী হল। তার নিজের পনি ছাড়াও, ফরেস্টের আরও পনি আছে তাসিলায়। সেখানে রেঞ্জারের অনতিদূরে এক সুবেশ সুন্দর যুবক বসেছিল। রেঞ্জার তাকেই এঞ্জিনিয়ারের জন্য পনি ঠিক করতে সহিসদের আড্ডায় পাঠালে। এঞ্জিনিয়ারকে বললে, আপনি দুপুরের খাওয়া সেরে আসুন। তার দুজনে চলে গেলে, রেঞ্জার পোস্টমাস্টারকে বললে, বেশ ছেলেটি। রোজার ছেলে। হাতিঘিষায় ডলোমাইট ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছে। ওর একটা ছবি আঁকার কথা ভাবছি।

পোস্টমাস্টার একটু অপ্রতিভ বোধ করছিল। ওরকম না বলে কয়ে ড্রপিং ইন অপর পক্ষকে তার কাজের মধ্যে বিব্রত করে।

পোস্টমাস্টার সুতরাং ওঠার কথা বললে।

রেঞ্জার বললে, খেপেছেন! ব্রিজ, অ্যাকুইডাক্ট, দুপুরের খাওয়া, এসব তাড়াতাড়ি হয়? আমার জাকিগঞ্জ যাওয়া মানে সারাদিনই ডিউটি। নো অফিস। আপনি বরং ডিউটি সত্ত্বেও অভাগাকে স্মরণ করেছেন। কি করে যে সম্বর্ধনা জানাই। হ্যাঁ মশাই বিয়ার চলবে?

বিয়ার?

চলুক না একদিন এক গ্লাস। কারো দিব্যি দেয়া নেই তো?

ততক্ষণে রোজাকে ডেকে বিয়ার আনতে বলা হয়ে গিয়েছে।

রোজা তা নিয়ে এলে প্রভঞ্জন বললে, আমি তেমন খাইনা। রোজারই না হলে চলে না। তা মশাই, এটা দেখুন, সেই ফোরেন। ভালো বলেই বলছি।

পোস্টমাস্টার কথার পিঠে কথা বলতে বললে, তা হলে পেলেন কি করে?

ও মশায়, ও মশায়, যেখানে সকলে পায়। আর সব কিছুই সব জায়গায় চক্ষুষ্মানরা পেয়ে থাকেন। রেঞ্জার হাসল।

পোস্টমাস্টারও হেসে বললে, জিজ্ঞাসা করতে নেই, বুঝলুম।

এক গ্লাস বিয়ার খেয়েছে পোস্টমাস্টার। রেঞ্জারও এক গ্লাস খেয়ে বাকিটা রোজাকে দিয়ে বললে, স্নানের আগেও শেষ করতে পাবো। রাখলে নষ্ট।

পোস্টমাস্টার ভাবলে, যদি সত্যি বিদেশি হয়ে থাকে তবে অবশ্যই স্মাগলড, নতুবা অনেক দাম পড়ে।

তা হলে সুচেতনারও এতক্ষণে স্নান হয়ে গিয়েছে।

তো বিয়ার খেতে অনেক হাসিঠাট্টাও হয়েছিল। পোস্টমাস্টাব বলেছিল, এঞ্জিনিয়ার তো ব্রিজ নিয়ে ব্যস্ত, আজ আর খেদ করেন নি তো?

না, প্রভঞ্জন হেসে বলেছিল, মুস্কিল দেখুন, এঞ্জিনিয়ার ভাবছেন উনি বিতাড়িত নির্বাসিত। সে তো ক্রিশ্চান ভাবনা। ওদিকে গুনি যোগ অভ্যাসও করেন নাকি স্বাস্থ্যেব জন্য।

অনেক ধর্মেই পৃথিবীকে ভবযন্ত্রণা বলে।

ওদিকে রবিঠাকুর নাকি বলেছে, স্বর্গের চাইতেও স্নেহশীলা।

পোস্টমাস্টার বললে, ও মশায়, এমন তো হতে পাবে এটা ইডেনই, ভগবানই বরং রেগেমেগে পালিয়েছেন আপেলের আধিক্য দেখে।

এইসময়ে হাসতে হাসতে উঠে প্রভঞ্জন বলেছিল, আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো।

দেয়ালে হেলানো ক্যানভাস একটা, যা দেযালেব দিকে মুখ কবেছিল, সেটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে সে বললে, কাল রাতে শেয করেছি। ছবি বলে মনে হয়? অরিজিন্যাল নয়, কপিও নয়। এক ফরাসীর আইডিয়া, মনে পড়ছে না কার।

ছবিটা এক পুষ্টাঙ্গী, বযসী, পিছন ফিরে বসে আছে এমন স্ত্রীলোকের ন্যুড। ছবিটা মনে এল পোস্টমাস্টারেব। আইডিয়া যারই হোক, ছবিটায় জোর আছে। ন্যুডে কখনও কখনও যে আড়ষ্টতা থাকে, যার ফলে নোংরা মনে হয়, তা নয়। মাথায় খয়রা চুল সবুজ চেক রুমালে, যেন জল থেকে বাঁচাতে, চূড়া করে বাঁধা। মুখটা নিচু বলে ঘাড়ের উপরে কিছু পশম যেন খাড়া। একহাতের কনুইয়ের উপরে পোশাকের কিছু অংশ তখনও লেগে আছে। আর সেই পোশাকেব, যার রং সিপিয়া ঘেঁষা অ্যাম্বার, তার উপরে বসে থাকা উজ্জ্বল হলুদে মাংসরঙের প্রশস্ত নিতম্ব, দৃঢ় পিঠ, ন্যুড। নিতম্ব, পিঠ, কান, কাঁধ। বাঁয়ের স্তনাগ্র চূড়ার আভাস কিন্তু তা ব্যাকগ্রাউন্ডে বিলীয়মান ছায়া হেতু।

পোস্টঅফিসের পাশ দিযে ঘুরে বাসায় ঢুকতে ঢুকতে একসঙ্গে অনেক কথা মনে হল তার, একসঙ্গে হওয়ায় যা অস্পষ্ট। নির্বাসিত, মানে বাইবেলের গল্প, যাকে পতনও বলে। দেখো, রেঞ্জার যে দর্শন, বিশেষত মনস্তত্ত্বের বই পছন্দ করে, ডাকে আসা বইগুলোই প্রমাণ, বলছিল, ছবি সে রাতে আঁকে। দিনে সময় কোথায়? খেলা, গল্প, অফিস, ট্যুর। বরং যন্ত্রণা অন্ধকাব এসব মেলে রাতেই।

পোস্টমাস্টাব ভাবলে, এবকম বলে বটে—যন্ত্রণা থেকে ছবি। সে হাসল, তা হলে কিন্তু রেঞ্জার নিজের ফাঁদে পড়ে। এক যন্ত্রণা থেকেই মুক্তি পেতেই এই ন্যুডও। কেমন কিনা।

কিন্তু নিজেকে ছবি সম্বন্ধেই সাবধান করলে। না, না ছবি সম্বন্ধে সে কিছু জানে না, তা মনে থাকে যেন।

এ সময়ে তার বাসায় সে ও সুচেতনা ছাড়া আর কেউ থাকে না। দশ-বারো বছরের যে ছেলে ও মেয়ে দুটোতে তার বাসায় কাজ করে, তারা সকাল থেকে সে যতক্ষণ অফিসে, ততক্ষণ কাজ-কর্মে সুচেতনাকে সাহায্য করে। সকালের অফিস শেষ হলে তার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। পোস্টমাস্টার স্নান, খাওয়াদাওয়া করে বিকেলের অফিস খুললে তারা আবার আসবে। খাওযাদাওয়া করবে। সুচেতনাকে সাহায্য করবে। পোস্টমাস্টার খেলতে বা বেড়াতে বেরিয়ে গেলে, তারা আবার আত্মপ্রকাশ করবে। তখন হই হই করে কথা বলবে, গান গাইবে কাজ করতে করতে। সন্ধ্যার আলো জ্বলতে থাকলে, যখন পোস্টমাস্টারের ফেরার সময় হচ্ছে, তারা মিলিয়ে যাবে আবার। তখন তারা সারা রাতের জন্যই বাড়ি চলে যায়।

বন্দোবস্তটা সুচেতনার। এত কাজ নেই যে তার দুজন দাসদাসী লাগবে। পোস্টমাস্টার বাসার ভিতরে থাকার সময়ে কোন না কোন কৌশলে, যা তোবা স্নান করে আয়, যা তোরা দেখে আয় এখন কাপড়চোপড়গুলো ঝোরায কাচা যায় কি না, কিংবা যা তোরা একটু রোদ্দুরে গিয়ে বেড়া।

সমতলে হলে তাদের নাম ইন্দ্রনাথ আর শুভময়ী হতো, এখানে তাদের নাম ইন্দ্রবাহাদুর আর পুষ্পমায়া। পোস্টমাস্টার বেড়াতে, খেলতে, অফিসে যখন, তখন সুচেতনার সংসারে ঢুকলে দেখা যাবে, সে দাঁড়িয়ে থেকে হয়তো বা তাদের নিজেদের কাপড়জামা কাচিয়ে নিতে শিখাচ্ছে, হয়তো বা তাবা তিনজনে তিনকাপ চা আর রুটি নিয়ে কোথাও কাঠের মেঝেতে চা খেতে, কিংবা স্রেফ গল্প করছে মুখোমুখি বসে, যদিও কাছে তরকারির ঝাঁপি আর বঁটি থাকায় মনে হতে পারে, তারা সংসারের কাজ করছে। মনে হয়, একজোড়া হরিণশিশু যাদের সুচেতনা মানুষ করে। ল্যাচকি দিয়ে দিয়ে অফিসের পাশের প্যাসেজ দিয়ে বাসায় ঢুকতে ঢুকতে পোস্টমাস্টার থমকে দাঁড়াল। মহিলাদের আড্ডা বসেছে। দুই মহিলা আধুনিক সমাজে মহিলাদের স্থান নিয়ে বেশ উঁচু গলায় কিছু আলোচনা করছে, অন্য কেউ হুঁ হুঁ করছে। পোস্টমাস্টার ভাবলে, সে কি অফিসে গিয়ে বসবে? কিন্তু দু-এক মিনিটে সে বুঝলে, এটা কলকাতার মহিলামহলের প্রোগ্রাম। আজ কোন কারণে সুচেতনা রেডিও চালিয়েছে।

পোস্টমাস্টার যেখানে দাঁড়িযেছে, সেটা তার কোয়ার্টারের বসবার আর শোবার ঘরের মধ্যে একটা প্যাসেজ, যা রান্নাঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই রান্নাঘরের উত্তর প্রান্তে এই প্যাসেজের মুখোমুখি একটা বড় জানালা যা দিয়ে এই রান্নাঘরে ও এই প্যাসেজে আলো বাতাস আসতে পারে। আগেকার পোস্টমাস্টারের আমলে এটা সাধারণভাবে কয়লা, ঘুঁটে, ছেঁড়া জুতো, ঝুলিয়ে রাখা ময়লা কাপড় ইত্যাদির আশ্রয় ছিল। সুচেতনা তাকে ডাইনিং স্পেস বানিয়েছে, যেখানে তার ছোট সরু ডাইনিং টেবল, যার উপরে ভাসে ফুল থাকে, সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার উপরেই এখন রেডিওটা।

পোস্টমাস্টার দেখলে, সুচেতনা সেই প্যাসেজের দরজায় দাঁড়িযে উত্তর মুখের সেই বড় জানালা দিয়ে কিছু দেখছে। ওখানে পাহাড়ের গা আর পোস্টঅফিস বাড়ির মধ্যে কয়েকটি ফুলগাছ আছে বটে। এমন অন্যমনস্ক হয়ে, যে সে মুরলীধরের পায়ের শব্দও শোনে নি। বোঝা যাচ্ছে তার মাইলি আর কাঞ্ছাকে দুএক ঘণ্টার জন্য খেলাধূলোর ছুটি দিয়েছে। রান্নাও হয়তো শেষ, কিন্তু খাওয়াব টেবলে বসার পোশাক পরেনি এখনও। হয়তো একটা রান্না বাকি, সে জন্য বান্নাঘর থেকে দূরেও থাকা যাচ্ছে না। তাই রেডিও।

সুচেতনার গড়নটা হালকা। পোস্টমাস্টারেব মনে পড়ে গেল, তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হল। চার বছর হল বিবাহ হয়েছে। সে সময়ে ছাত্র-অবস্থা ছিল। প্রমাণ, বিয়ের পরে পরীক্ষা দিতে তিনমাস

বাপের বাড়িতে ছিল। সে ডিবেট ও কলেজের অভিনয়ে পুরস্কার পেয়েছে, ছাত্র-আন্দোলন করেছে। কিন্তু এই হালকা গড়নের জন্য টাটকা, সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত মনে হয়।

তার নিজের বয়স উনচল্লিশ। অর্থাৎ সুচেতনা তার চাইতে বারো তের বছরের ছোট। কিন্তু তাতে অস্বস্তি বোধ হবে কেন? অতি আধুনিক, ইংরেজ সমাজেই মনে করো, স্বামীর তুলনায় স্ত্রী বিশ বছরের ছোটও হয়ে থাকে। অথচ সকালে একটা অস্বস্তিবোধ ছিল না কি? আর সেজন্যই কি সে অবেলায় রেঞ্জারের বাংলোয় যায় নি?

পোস্টমাস্টার সুচি বলে ডাকলে, সুচেতনা দরজার কাছ থেকে ডাইনিং টেবলটার কাছে এসে দাঁড়াল। রেডিওটাকে বন্ধ করলে।

বলো।

আচ্ছা, সুচি, সিজন চেঞ্জের সময়, তোমার শরীর খারাপ যাচ্ছে না তো?

না। সুচেতনার মুখে হাসির ভাব দেখা দিল।

বাড়িতে এসেছি এরকম একটা অনুভব করতে কাঁধ থেকে কোটটাকে সরালে পোস্টমাস্টার। সুচেতনা হাত বাড়িয়ে কোটটা নিলে সে শার্টের বোতামে হাত দিলে। এখন স্নানের আগে পোশাক বদলাতে শীত করে না। সে শার্ট খুললে সুচেতনা কোট ও শার্ট নিয়ে শোবার ঘরে হ্যাঙ্গারে তা রেখে এসে, লুঙ্গি, চাদর, চটি নিয়ে এল। পোস্টমাস্টার এভাবেই খেতে প্রস্তুত হয়।

তোমাকে একটু চা বা শরবৎ দেব কি?

এইমাত্র প্রভঞ্জনবাবুর ওখানে এক রকম শরবতই খেলুম।

সুচেতনা কিছুই বললে না।

পোস্টমাস্টার তার এই সুন্দরী স্ত্রীকে আপাদমস্তক দেখে নিলে। বললে, খাওয়ার আগেই তোমাকে একটা গল্প বলতে পারি।

সুচেতনা সেরকম করে দাঁড়াল, যাতে রান্নাঘরের দিকেও চোখ থাকে। বললে, বলো।

পোস্টমাস্টার বললে, তুমি কি রোজাকে দেখেছো? রোজা মানে আমাদের রেঞ্জারের হাউসকিপার। নাকটা ছাড়া, তাই বা কেন, তাকে সুন্দরীই বলতে হয় এখনও। মসৃণ হলুদ ঘেঁষা উজ্জ্বল ফর্সা রং যে মনে হতে পারে ইউরেশিয়ান। বেশ ঘন চুল মাথায় এখনও, যদিও মনে হয় তার দুএক খেই, সেই খয়েরি চুলে, রুপোলি হচ্ছে। এক কথায় পাকা আপেল জাতীয় পুষ্টাঙ্গী, গিন্নিবান্নি হলে মানায়।

সুচেতনা তো পোস্টমাস্টারের মুখের দিকেই চেয়ে আছে। তার চোখ দুটি বিশেষ বড়। সে চোখের নিচে কিছু নীলাভ কালিমা। কী বলা হবে? সে কিছু বললে না।

পোস্টমাস্টার বললে, জানো, প্রভঞ্জনবাবু একটা ন্যুড এঁকেছেন। পিছন ফিরে বসে স্ত্রীলোকটি স্নানের যোগাড় করছে। বুক, পেট, এসব নয়। কিন্তু কাঁধ, পিঠ, কী বলে নিতম্ব। আর কিছু বাদামি ঘেঁষা ঝকঝকে হলুদ রঙের শরীর বেশ পরিপুষ্টই। মেট্রনলি বরং।

সুচেতনার চোখের পলক পড়ল একবার।

পোস্টমাস্টার বললে, জানো, মানুষকে কিন্তু পিছন থেকেও চেনা যায়। ঘাড়ের গড়ন, কানের গড়ন, কাঁধ কিভাবে রাখে এসব দিয়ে। আমার কিন্তু মনে হল ন্যুড আমাদের পরিচিত।

সুচেতনা বললে, ওমা, তাই?

মিনিটটাক চুপ করে থেকে মুরলীধর উঠে পড়ল।

সুচেতনা বললে, তুমি তো চা-টা কিছু খাবে না। আমার কিন্তু আধঘণ্টা দেরি হবে। একটু ফ্রায়েড রাইস করছি। কুকার হুইসিল দিলে...তুমি কি আজ ছোটমাসীকে চিঠি দিতে পারবে?

মুরলীধর চাদর চটি পরে অফিসে গিয়ে বসল। সে ভাবলে সুচেতনার ছোটমাসীকে চিঠিটা লিখে

নিতে হয় এখন। প্যাড নিয়ে বসে তার হঠাৎ মনে হল, আজ এই বিশেষ রান্না কেন? আজ কি কোন তিথি যা সে ভুলে গিয়েছে? এই দুশ্চিন্তা তাকে কয়েকমিনিট ব্যাকুল রাখল। নাকি সে আয়োজন ইন্দ্র আর পুষ্পার জন্য? আহা, তা হোক। অন্যায় হয় না, যদি সুচেতনা তাদের জন্য তেমন করে। কিন্তু এ চিন্তাটা উদারতার সুখের বদলে প্রশ্ন নিয়ে এল। সুচেতনা কি এখানে এত একা যে ওই দুটিই তার নির্ভর? না, না। সুচেতনার এটা কি জীবনের আর্ট হতে পারে না? সুচেতনার গৃহিণীপনার কে খুঁত ধরবে? সুচেতনা ওই কিশোরকিশোরীকে ভালবাসে।

সে মনে করলে, সে একদিন সুচেতনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার এই হরিণদুটোকে কি তুমি লেখাপড়াও শেখাবে, সুচি? কেন যেন সুচেতনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তখন। সে বলেছিল, লেখাপড়া কি ভাল? কালচার কি ভাল? যদি লেখাপড়া ছাড়াই ওদের আবেগ সুস্থ আর মধুর হয় বরং? কী একটা তিরস্কার ছিল সুচেতনার সেই শান্ত কথায়!

তখন তো পোস্টঅফিস খোলাই। একজন কাস্টমার এল। সেভিংস ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখলে। সে চলে গেলে, মুরলীধর ছোটমাসীকে চিঠি লিখতে সুরু করলে। ছোটমাসীকে কী লিখলে ভাল হয়, তাও বলেছে সুচেতনা। তাসিলার বহিঃপ্রকাশ নিশ্চযই সুন্দর। এঞ্জিনিয়ার নির্বাসন ইত্যাদি যাই বলে থাকুক। সুচেতনার কথা মেনে লিখতে গেলে তাসিলাকে শাংরিলার মতোই সুন্দর বলতে হয়। চিঠিতে তাসিলাকে শান্তি ও সৌন্দর্যের বাসভূমি করতে হয়। কিন্তু সুচেতনা কি তাসিলাকে ততটাই ভালবেসেছে? সে কি সুখী এখানে? নাকি সে তার সব আত্মীয়স্বজনকে জানিয়ে দিতে চায়, এখানে আসাটা তার সার্থক হয়েছে?

প্যাডটা শূন্যই। মুরলীধর নিজের চিন্তায় অবাক হল এইজন্য, যে সে সুচেতনাকে সন্দেহ করছে তার ছোটমাসীকে এই জানানোর ব্যাপারে। এটা কি সুচেতনার মনের ছদ্মবেশ পরা? তাতে কি অস্বস্তিই বাড়ে না?

গুমছে এসে গেল। কাজকর্ম শুরু করলে। তাকে তো ঘণ্টা দুযেকের মধ্যে ডাক নিয়ে নামতে হবে। দরজার কাছে এসে সুচেতনা জানালে, এখনই খেতে দেবো। সুচেতনা ইতিমধ্যে খেতে বসার জন্য পোশাক পালটেছে। খুব একটা পরিবর্তন না। হয়তো মুখ-হাত ধুয়েছে, হয়তো শাড়ির রং বদলে গিয়েছে। টেবলে বসা যদি একটা আর্ট হয়, নতুন কিছু রান্না যদি আর্ট হয়, তবে শাড়ি পালটানোও তা। কিন্তু দেখো, মহকুমা-সদর ডাকঘরে কিন্তু এসব দিকে এতটা ভাবতো না। এখানে সময়ের ফাঁকগুলোকে এসবে ভরে নিতে হয় কি?

না, না, তা কেন? ভিড় থেকে দূরে দুজন দুজনকে আরও ম্যাচিওর ভাবে পাওয়া হতে পারে।

খেতে বসে পোস্টমাস্টার বললে, জানো, সুচি, একমাত্র একদিন, সেই রোজাকে একদিন দেখেছিলাম, জানো, রেঞ্জারের সাদা ধবধবে বিছানায় বসে, তখন বোধ হয় স্নান সেরে উঠেছে, পিঠময় খোলা চুল, তার ক্রোমহলুদ এক পা এক হাতে কোলের কাছে উল্টে ধরে লাল আলতা পরছে।

সুচেতনার চোখ দুটো আর একটু বড় হল, সে বললে, ওমা তাই?

কিন্তু কী ঠাণ্ডা ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করা!

পোস্টমাস্টার বললে, মানে যত ভালো গৃহকর্ত্রী হও, সাহস পাও কেউ, তেমন করে আলতা পরতে?

যদি—পোস্টমাস্টারের মনে হল, সুচেতনার ঠোঁটদুটি যেন বা হাসিতে ফাঁক হল, কিন্তু তার গালে বা কানের পাশে এতটুকু লালচে ভাব দেখা গেল না।

মুরলীধর তাও বললে, এখন তো বোঝাই গেল, সেই ন্যাডের পরে, অথচ আমার তো মনে হয়, রোজা রেঞ্জারের চাইতে অন্তত দশ বছরের বড়। রেঞ্জার তো ত্রিশের প্রথম দিকে।

সুচেতনা আবার বললে, ও, মা, তাই! একটু পরে বললে, ভালো হয়নি রান্না? আর একটু পরে যেন অসংলগ্নভাবে বললে, এখানে রেঞ্জার কিন্তু আমাদের দাদার মতো যদিও তোমার বয়সে ছোট।

খাওয়া চলতে লাগল। পোস্টমাস্টার সুচেতনার, তার স্ত্রী তো সে, দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলে। বললে, আচ্ছা, সুচি, তুমি কি আমার উপরে রাগ করেছো?

ও, মা, ছি-ছি, তা কেন? কেন রাগ করবো? বললে সুচেতনা। সে টেবলের উপরে ভাসে রাখা একটা ফুলকে সোজা করে দিলে। বললে, একটু অবেলায় খাওয়া হল। ডেকচেয়ারটাকে অফিসে নিয়ে একটু হাতপা ছড়িয়ে নেবে? আমার দুপুরের ঘরে আছে সেটা।

বাঁহাতি শোয়ার ঘরটার পাশে যে একটা ছোট কুঠুরি, যার একটা কাঁচের জানালা সদর রাস্তার উপরে খোলে, যাতে একটা ছোট খাট পাতা, ছোট মাপের একটা ড্রেসিং টেবল, যার পাশে একটা র‍্যাকে কিছু উপন্যাস, যে ঘর সুচেতনার দুপুর কাটাবার। সে ঘরে একটা ডেকচেয়ার আছে, যার উপরে সুচেতনার দুপুর কেটে যায়। আর তা স্নানের পরে বলে তার জবাকুসুম আর মহীশুর চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে, মৃদু হলেও। কারো কারো রুচি কেমন বহুযুগ ধরে স্থির থাকা এক রুচিতে মেলে। সেজন্য সে চেয়ারে বসলে, মুরলীধরের তেমন অভিজ্ঞতা আছে, সেই সুগন্ধে মগ্ন হলে তো মনেই হয়, যে তা সুচেতনায় মুখ গুঁজে দেয়া।

কিন্তু কানটা পুড়ে উঠল পোস্টমাস্টারের। যেন রোজা আর তার ন্যুড ছবির কথায় সুচেতনা নিঃশব্দে বলেছে, নোংরা কথা বলছো।

অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা। আর সুচেতনা তো হাসতেও জানে। আর সে বিখ্যাত সব ন্যুডের প্রিন্টও দেখেছে।

তখন খাওয়া শেষ হচ্ছে, পোস্টমাস্টার বললে, তোমাকে কি জেন এয়ারের কথা বলেছি সুচি? জেন এয়ার?

বোঝাই যাচ্ছে, সুচেতনা অবাক হয়ে গেল। চামচটা মুখ আর প্লেটের মাঝামাঝি উচ্চতায়। কথা বলার জন্য ঠোঁট খোলা।

তখন পোস্টমাস্টার যেন শুনতে পেলে, সুচেতনা মৃদু, তার স্বাভাবিক স্বরে বলেছে, আচ্ছা দেখো, তুমি সব সময়েই অন্যের কথা নিজের মনের মধ্যে, যেন তার উপরে চাপিয়ে কেন রাখো?

ভোজবাজি নিশ্চয় নয়। মুরলীধর যেন স্পষ্ট সুচেতনার শব্দহীন বক্তব্যটাকে বুঝলে। সুচেতনা বড় বড় চোখদুটি এরকম বলতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

প্রভঞ্জন রেঞ্জার তখন তাসিলার দিকে ফিরছে।

ডিএফও চটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সে আর বিরিঞ্চি গিয়ে দেখেছিল, ডিএফও তার বাংলোতে বারান্দাতে, গভীর মনোযোগে, তার সামনের টেবলে রাখা, লোহার র‍্যাকে বসানো টেস্টটিউব কয়েকটিকে দেখছে। তার সেই টেবিলে একটা মাইক্রোস্কোপ, শিশিতে কয়েক রকমের অ্যাসিড ও ক্ষার। সাধারণত যেখানে বসে সে তাব মথ-চর্চা করে, তা থেকে কিছু দূরে বরং কাচের জানলার সামনে। মনোযোগটা তখন গভীর ছিল। প্রভঞ্জন এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরে, ডিএফও মুহূর্তের জন্য মুখ তুললে, প্রভঞ্জন তাড়াতাড়ি বলেছিল, গুড আফটারনুন, সার। সয়েল টেস্টিং?

ডিএফও মুখ তুলে তাদের দেখে নিয়ে, আরে, বসুন বসুন, গুড আফটারনুন, বলে চেয়ার দেখিয়েছিল।

বিরিঞ্চির কাজের কথায় পনের মিনিটও লাগল না। এঞ্জিনিয়ার অবাক হল। তাকে ম্যাপ খুলতে হল না। বলিন বললে, বুঝতে পেরেছি। নিমতিঝোরার ে উত্তরপূর্বের ঝর্নাটার খাতেই, যখন অ্যাকুইডাক্ট বলেছেন। আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারের প্রস্তাবও এসেছে। কিন্তু স্পটে দেখতে যাবেন, ফাইন্যাল কথা কার সঙ্গে হবে?

যখন এঞ্জিনিয়ার বললে, তা অবশ্যই ডিস্ট্রিক্টে এঞ্জিনিয়ারই বলবেন, তখন ডিএফও বললে, তা হলে এই ভাল হবে, আগামী সপ্তাহে তিনি আসুন। এক সঙ্গে বনে ঢুকে কতটা ডাইভার্শান কোনদিকে চান, স্পটে দাঁড়িয়ে আলাদা করা যাবে।

বিরিঞ্চি তখন বলেছিল, তা হলে সে ডিস্ট্রিক্টে লিখবে। বলিন বললে, যেমন সে অস্থির হয়ে বলে, চিঠি? আপনি কি সদরে যাবেন? আজই যেতে প্রস্তুত কি? লাকিলি আমাদের একটা ট্রেলারভ্যান ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সদরে যাচ্ছে। এখানকার যে রেলরোড! আর বাস তো তিনদিন পরে বোধ হয়। প্রভঞ্জন, তোমার কি সদরে কেনাকাটার কিছু আছে?

প্রভঞ্জন জানিয়েছিল, সে তাসিলায় ফিরে যাবে। এঞ্জিনিয়ারের পনি এখানকার স্টেবলে থাকবে। ফেরার পথে পাবেন।

এঞ্জিনিয়ার রাজী হয়ে বিদায় নিলে প্রভঞ্জন উঠতে যাচ্ছিল, ডিএফও বললে, বসো। কীসে ফিরবে? পনি এনেছো? ড্রিংকস নাও। অন্তত বিয়ার।

প্রভঞ্জন বিয়ারের ব্যাপারে ভেবেছিল, অতটা ভাল হবে না। পোস্টমাস্টারের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাত্রার আগেই হয়েছে। সে বলেছিল, এখন থাক।

বলিন অত সহজে ছাড়ে নি। তখন লাঞ্চের সময়, প্রভঞ্জনকে লাঞ্চে বসতে হয়েছিল। লাঞ্চের পরে বলিন বলেছিল, নুমপাই-এর সয়েল পাঠিয়েছে দাওআ ; যে জন্য ডেকেছি তাই বলা হয়নি। তাসিলার নানা অঞ্চলের নানা টিলার স্যাম্পেল দরকার। পৃথক পৃথক এনভেলপে নাম লিখে লিখে। তুমি বটানির মানুষ, মাটির রং, সাব বুঝবে। অ্যাফরেস্টেশন নাকি, জিজ্ঞাসা করেছিল প্রভঞ্জন। ডিএফও বলেছিল, ফলের গাছ কী দোষ করলে? বসো গল্প করে নি, চা খেয়ে যাবে। গোরুমারার পথে নারেঙ্গিহাট হয়ে আড়াইঘণ্টায় পৌঁছে যাবে। চারটেতে চা খেয়ে রওনা হলেই যথেষ্ট। টচ আছে তো? সুতরাং চায়ে বসতে হয়েছিল। আর রিনিম্যাডামের চা হাইটি হওয়াতে পৌনে পাঁচে শেষ হয়েছিল।

টর্চ অবশ্যই আছে। তখন পনির স্যাডল হুকে, এখন গ্রেটকোটের বেল্টের হুকে। আর তা অবশ্য বনে শিকারের উপযুক্ত। প্রভঞ্জন গোরুমারার পথেই এসেছিল, তারপর সেই বন দিয়ে নারেঙ্গিহাটের দিকে আরও শর্টকাট করছে। জানা থাকলেও সে গ্রেটকোটের ডান পকেট চাপ দিয়ে দেখে নিল রিভলবারটা যথাস্থানে কিনা।

জাকিগঞ্জের ডিএফও বাংলো থেকে প্রায় একঘণ্টাই চলা হল। সাড়ে পাঁচ বাজে। গোরুমাবার আধখানা পথ সে পার হয়েছে, বাকিটায় বেশি সময় লাগবে, বুনো পথ উপরে উঠবে খাদ বাঁচিয়ে। নারেঙ্গিহাটে পৌঁছালেও সহজ হবে না পথ। হয়তো সেখান থেকে তাসিলা পনির লাগাম ধরে হাঁটতে হবে। তার এই পনিটা জন্মাবধি পাহাড়ে পনিট্রেলে অভ্যস্ত। তা হলেও ঝুঁকি নেয়া যায় না।

মার্চের শেষ দিকে, সাড়ে পাঁচে, খোলা জায়গায় আলো ভাব, কিন্তু বনে ঢুকে পড়ায় সন্ধ্যার মতোই লাগছে। চায়ে দেরি হয়েছে বটে কিন্তু বেশ প্লিজিং হয়েছে। ডিএফওর মথের ক্যাটালগের ছবি আঁকতে ডিএফওর পরিচিত এক আর্টিস্ট আসবে এপ্রিলের মধ্যেই। রঙ আর আকারই তো আসল কথা। অ্যাকিউরেট না হলে? ভালো আর্টিস্ট ছাড়া ফোটাতে পারবে না। আয়তনে এনলার্জড করে আঁকবে। ক্যাটালগে তো ঠিক মাপ দেয়া থাকবেই। ভালো ছবি না হলে ব্লকে কি উঠবে?

প্রভঞ্জন বলেছিল, আমার ভয় হচ্ছিল সয়েলকেমিস্ট্রিতে সরে যাচ্ছেন।

ডিএফও হেসে উঠে বলেছিল, যাচ্ছিনা বটে। তোমার কথার এই উত্তর হয়, তা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ফুলের মতো ওই মথগুলো থেকে ন্যাসপাতি, জলপাই, ধরো বা পীচ—ফলে মানুষের সরে যাওয়ার ঝোঁক হয় না? কী বলো রিনি?

ভারিপায়ে পাতা মাড়ানোর শব্দে ঘোড়াটা কানখাড়া করলে। কোন ভারি প্রাণী তো বটেই। সে লাগাম কষে যতদূর সম্ভব দেখে নিলে। আর কোন শব্দ না থাকায় সে স্থির করলে, বেপরোয়া বাইসন হবে। এদিকের জঙ্গলে বাইসন বেড়েছে বটে।

ও, রিনির কথা। ডিএফও রিনিকে বলায়, সেও রিনির দিকে চেয়েছিল। সে লক্ষ্য করেছিল, ম্যাডামকে আগের মতো হালকা মনে হচ্ছে না। রিনির মুখে অরুণাভা দেখা দিয়েছিল যেন। দেখো, তাহলে ম্যাডাম কি অন্তর্বর্ত্নী! প্রভঞ্জন বেশ মজা পেলে। ডিএফওকে সেটাই প্রভাবিত করেছে মথ থেকে ফলের অনুভূতিতে সরে যেতে? এরকম মনের পরিবর্তন বেশ একটা মিথের মতো।

প্রভঞ্জন লাগাম দিয়ে তাকে পনিকে মৃদু তাড়না করলে। এই শর্টকাটটা পার হতে কি তার বেশি সময় লেগেছে? হতে পারে, বনের অলিগলিতে গিয়ে সার্কিটটাকে ব্যাসে দুএকশ মিটার বড় করে ফেলেছে। কিন্তু পনিকে বেশি তাড়না করা ভালো নয়। বরং তার ইনস্টিংক্টকে কাজ কবতে দেয়া ভাল। পথের নির্দেশ দেয়ার পর তাকেই চলতে দাও। তাকে মাঝে মাঝে ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাকে শব্দ করতে দিতে হবে, কান দুটোকে খাড়া করতে দেয়া চাই, আর পথের কোন ধার দিয়ে চলবে সেটা টর্চ জ্বেলে দেখার চাইতে তাকেই বাছাই করতে দেয়া ভালো।

ডিএফও তাকে মৃদু লজ্জায় ফেলেছিল। সেই ফলের কথা হতে হতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, কলকাতায় চিঠিপত্র দিচ্ছো তো? প্রভঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ দিচ্ছি, বলতে পারে নি। তখন ডিএফও একটা এনভেলাপ দিয়েছিল তাকে আর তা খুলে সে অবাক। চিঠি ছিল্ না। একটা টেলিগ্রাম ডিএফওকে করা, আর ডিএফও তার উত্তরে যে টেলিগ্রাম করেছিল তার কপি। প্রভঞ্জনের চিঠিপত্র না পেয়ে তার খোঁজ নিতে ডিএফওকে করা টেলিগ্রামের উত্তরে ডিএফও টেলিগ্রাম করেছে, হি হিজ কোয়াইট ওয়েল। মেট হিম দা আদার ডে। ডিএফওর টেলিগ্রামে এক উদ্বিগ্ন মহিলাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা ছিল।

প্রভঞ্জন অবাক হল। এমন লজ্জার ব্যাপার আর সে ঘটতে দেবে না। আর জানাজানিও যেন।

তা হলে এজন্যই কি ডেকেছিল ডিএফও? ডেকে পাঠিয়ে হাতে হাতে এনভেলপটা দিয়ে বোঝানো, ব্যাপারটাতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে? প্রভঞ্জন একটু অবাকই হল। অন্ধকার হতে না হতে পথ হারানোর মতো ব্যাপার? সে আপন মনে হাসল—তারই রেঞ্জে, সে পথ হারিয়েই বা কতদূর যাবে? হয়তো নারেঙ্গিহাটে রাত হবে, তার তাসিলায় হেঁটে হেঁটে টর্চের আলোয় পৌঁছাতে রাত দশটাই হবে। সে লাগাম টানলে। কাণ্ড! এত অন্যমনস্ক হয়েছিল সে? পথ হারানোর আগে সে যা ভাবছিল তা মনে আনলে চেষ্টা ক'রে। বনে গাছের ফাঁকে ম্লান আলো দেখে তা ছবিতে ধরা যায় কিনা, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয়েছিল, তা মানুষের অবচেতন মন কি এরকম হতে পারে?

মন্দ নয় এ অভিজ্ঞতাও। তা ছাড়া, সে অম্লান মনে হাসল, যে হেতু সে কোন নির্দিষ্ট পথে চলছে না, পোচার বা স্মাগলারদের কোন দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। হলেই শুট আউট হয় না। হলেই বা কী করছো? তোমারই রেঞ্জ। আর স্মাগলাররাই তারা যারা ফরেন বিয়ার ইত্যাদি আনে।

এসব ভাবনা প্রকৃতপক্ষে অনুভূতি। বাস্তবে সে কি আর পথ হারাচ্ছে? সমুদ্রের লোক চাঁদের হিসাব রাখে। বনের লোককেও তা রাখতে হয়। একটুখানি পাতলা হয়েছে গাছের ভিড়, তাতেই সেই ঘোলাটে আলোটা পথে পড়ল। সেও কি আর চাঁদের খোঁজ রাখে নি?

এটা কি ভাল হচ্ছে, এই চিঠি না দেয়া? নির্দয়তার মতো নয়? অবশ্য পোস্টমাস্টারের ডিপার্টমেন্টেরও দোষ আছে। মনিঅর্ডারটা পৌঁছাতে একুশ দিন লেগেছিল। রসিদ শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পোস্টমাস্টারই লেখালেখি করে পেইড রিসিট এনে দিয়েছিল। মনিঅর্ডার না পৌঁছে থাকলে তার কুপনে লেখা আমি ভালো আছি এই শব্দ তিনটিও পৌঁছায়না।

প্রভঞ্জন অন্য গলিতে নিল পনিকে। তো, এখানে বাঘ নেই। আপনমনে হাসল সে আবার। চায়ের টেবলকে গুঞ্জরিত করতেই যেন বাঘ। এখানে আবার তা কেন? রিনিমেম এরকম বললে প্রভঞ্জন নিজে বলেছিল, বনে অন্ধকার হলেই বাঘ মনে আসে। ডিএফও বলেছিল, এখানে তা হলে বা ক্ষতি কী? বাইসন আর হরিণের সংখ্যা খুব বেড়েছে। প্রচুর জল, প্রচুর বনও। চিতারা বেশ আছে। বাঘের আর কী কষ্ট হবে? কিন্তু বাঘের কথা কেন?

প্রভঞ্জন নিজেকে শোনালে, অন্ধকার আর ভূত, বন আর বাঘ, স্মৃতিতে ছোটবেলা থেকে এমন জড়ানো যে বনের লোকের মনে বাঘের কথা আসতেই পারে।

কথার পিঠে কথা, চায়ের আসরকে রসস্থ রাখতে কথা, প্রভঞ্জন নিজে বলেছিল, জিম করবেটের দেশের মতো এখানে পাহাড় ও বন একত্র। কিন্তু বাঘের সুবিধা আর মানুষের সুবিধা দুরকম নয়?

তা কেন? বলেছিল ডিএফও জিম, করবেটের দেশে চাষী ছিল, পশুপালক ছিল।

এই সময়েই ডিএফও বলেছিল হাসতে হাসতে, তোমার তাসিলা তো এখন শুধু ইকোলজিকে ডিস্টার্ব করে। আমরা যদি তোমার রেঞ্জ হেডকোয়ার্টারকে নিচে আনি, যানবাহন ইত্যাদিতে তোমার সুবিধা, ওদিকে তাসিলা চার-পাঁচশো মানুষের এক ছোট বনের গ্রাম হয়। ক্ষতি কী? করবেটের গ্রাম হয়।

কথাটা হঠাৎ মনে হল প্রভঞ্জনের। দেখো, এ আবার আর এক রকমের সয়েলটেস্টিং নয়তো? পনিটা এবার একটু জোরে চলেছে। পথটা ধরে ফেলেছে। এটা সেই রিজটাই যা গোরুমারা আর নারেঙ্গিহাট বনের মধ্যে কর্ড। পাহাড়টার গা বেয়ে চলেছে রাস্তা। ডানদিকে পাহাড়ের গা, বাঁ দিকে খাদ। সেজন্য মগ্ন চাঁদের ঘোলা ঘোলা আলো পড়ছে পথটায় মাঝে মাঝে। তা হলেও আরো আধঘণ্টা দেরি করিয়ে দিল ফরেস্ট আজ।

এরকম আলোর এরকম পথ শুধু জিম করবেটের দেশের তুলনা হয় না। অন্য অনেক কিছুর তুলনা হতে পারে। প্রভঞ্জন আপন মনে হাসল আবার। চিন্তাটা আবার ফিরল তার মনে। যে বনকে

ডিএফওর অবচেতনের সঙ্গে তুলনা দেয়া হয়েছে একদিন, তা নিশ্চয় গভীর অন্ধকার নয়। তা হলে তুলনা হয় না। তা বরং এই পথটায় মনে হতে পারে। পোস্টমাস্টারকে বলতে হবে তো। অবচেতন কি এরকমই নয়? কিছু দেখো অস্পষ্ট আলোয়, ভয় থাকে, স্পষ্ট দেখতে পাওনা, নতুবা অবচেতন কাজ করে কীভাবে?

২

এখন সে নিশ্চিন্ত। পথটা অবচেতন হোক না হোক, পনি তাকে নারেঙ্গিহাটের কাছেই নিয়ে চলেছে। পথটার সঙ্গে চিন্তাটাও ঘুরে এল। সে ভাবলে, সে তো নিয়মিত পয়লা তারিখেই দুখানা মনি অর্ডার করে। বেতনকে মোটামুটি তিন ভাগ করে, মুকুলকে দেরাদুনের স্কুলে এক ভাগ, এক ভাগ কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। পরিবারে তিনজন, তার আয়কে তো তিনভাগেই খরচ করছে সে। চিঠি না দিয়ে এভাবে টাকা পাঠানোর মধ্যে কি অবজ্ঞার ভাব আছে? না, সে হতো, যদি কলকাতায় ইচ্ছামতো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে প্রয়োজন হলেই টাকা তুলে নেয়ার উপায় না থাকতো একজনের।

আসলে মনস্তত্ব, দর্শন, এসবে কিছু গোলমাল আছেই। যেমন ধরো, একদিন বনকে ডিএফওর অবচেতন বলে রসিকতা করার ফলে এখনই গোরুমারা থেকে উঠে আসার পথটাকেই অবচেতন মনে করা হচ্ছিল। এখন থেকে হয়তো বোসসাহেবকে দেখলেই একথাটা মনে উঁকিঝুঁকি দেবে।

তা স্বাভাবিক, যেমন ধরো, ভূতের গল্প করতে করতে মানুষ ভূত দেখে ফেলে।

কিছুক্ষণ তার মন আরও তুলনা খুঁজতে থাকল। হঠাৎ তার পনি ফোঁৎ করলে বেশ জোরে। সে দেখলে সেই ম্লান আলোতে একটা ছাগল চলেছে। তা হলে সে লোকালয়ের কাছে। নাকি এটা ভেঁরুল, বুনো ছাগল। সে বললে, ভাগ, যা। ভেঁরুলটা লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের গায়ে উঠে গিয়ে, চোখা চোয়াল লম্বা করে তাকে দেখলে সেই ম্লান আলোয়।

আর তাতেই যেন তুলনাটা তার মনে হল। বেঁচে থাকার কী অদম্য শক্তি! নাকি অদম্য ইচ্ছা? সে ভাবলে, আচ্ছা কৌতুকের ব্যাপার তো এসব এই ম্লান আলোর বিপজ্জনক পথে। আচ্ছা, মনে করো, কেউ শোপেনহাউআরে বিশ্বাস করে সেই অন্ধ কামনাকেও বিশ্বাস করেছে, যা জগৎকে চালায়। এটায় বিশ্বাস এসে গেলে কি মনে হয়না, সেই ইচ্ছা ঘাড়ে চেপে আছে? ও, সেই সিন্দবাদের বুড়োর মতো! নাকি সেই বুড়োই লিবিডোর মতো প্রাচীন, যা চালায় মানুষকে? ওটাও কিন্তু কৌতুকের। ওনীল ঈশ্বরের পরিবর্তে অবচেতনকে মানুষের সব সাধনের বিশিষ্ট ব্যবহারের উৎস মনে করেছিল। ঈশ্বর তখন তো মিথ্যাই প্রমাণিত।

আর সত্যই তা যদি হয়, এমনও হতে পারে, অবচেতনে বিশ্বাস করতে থাকলে ঝাঁপিতে ঢাকা কোন অনৈসর্গিককে মুক্তি দেয়া হয়। হয় কি?

তো, সে শুকনো মুখে হাসল। এখানে এখন বোঝা যাচ্ছে, পথটা চওড়া হয়ে ক্রমশ নারেঙ্গিহাট ফরেস্ট বিটে ঢুকছে। এখন সে তাড়াতাড়ি চলতে পারবে। নারেঙ্গিহাটে পৌঁছে বোঝা যাবে, পনিটা যদি ক্লান্ত হয়ে থাকে সেখানে তাকে বিট অফিসারের বাসায় রেখে অন্য একটি নেয়া যাবে। নারেঙ্গিহাটের আলো চোখে পড়ছে, দেখো উঁচু উঁচু টোঙের মাথায় আলো। বন্যজন্তুকে ভয় দেখাতে। বনে ডোবা ছোট ছোট ক্যাজুয়াল লেবার কলোনি।

আচ্ছা, চিঠি না লেখার মূলে কি বিদ্বেষ? কেউ একজন তোমার উপরে নির্ভর করে, তাকে কষ্ট দেয়া? তখন একজন বিএসসি পড়ছে, ফাইনালের কিছু আগে তার মায়ের মৃত্যু হল। জানাই গিয়েছিল, তা ঘুমের ওষুধ বেশি খেয়ে ফেলে। তুমি জানো না, ঘুম না হওয়ার কী কষ্ট। তখন

সে সব ওষুধের মাত্রা বাড়িয়েই যেতে হয়। হয়তো মনে হয়, যা ঘুম আসতে দিচ্ছে না, তাকে চিরকালের মতো হারিয়ে দেবো। আর সেই মৃত্যুর পরে তিনচার মাসের মধ্যে, সেই বনানী নার্স, বনানী মাসী বলা হতো, সিঁদুর পরে, অলঙ্কার গায়ে, মা হয়ে এল, তার তিনচার মাসের মধ্যেই মুকুল এসেছিল। আর তার ছমাসের মধ্যে আর এক মৃত্যুতে সকলের যত প্ল্যান ভেসে গেল। শুধু পিতা এই শব্দটা বনের হাতিকে ভয় দেখানোর টোঙের আলোর মতো ধোঁয়াতে থেকে গেল।

হ্যাঁ, কথাটা বলা ভাল হয় নি। যেন রবীন্দ্রনাথের ফেবারিট থিমের গল্পটা শেষ হল। কী কথা সে, বোঝা যায়, দশ বছর পরেও নিজেরই মনে আছে। সে পিতার শ্রাদ্ধের দিন বিকেলেই বলেছিল, ভালো হল, গল্পটার শেষ হল।

তা শুনে অন্যজনের যেন পক্ষাঘাত হল। বলেছিল, এরকম করে বলো না, বাবা প্রভঞ্জন। এখন এই আধ-অন্ধকার নির্জনতায়, যা নিজেই যেন অতীত, অতীতকে দেখতে সুবিধা হয়, আর কেউ শুনতেও পায় না। দুএকদিন পরে সেই নতুন মা বলেছিল, এখন কী হবে, বলো।

দেখছি পিতা টাকাপয়সা ফ্ল্যাট সবই দুজনকে জয়েন্টলি দিয়ে গিয়েছেন। সমদর্শী ছিলেন। আর মুকুলকেও দেখার শর্তও দুজনকেই মানতে হবে। কর্তব্যজ্ঞান ছিল বলতে হয় না? কেবল বুঝতে পারেন নি, ভিতরের কোন কোন যন্ত্র বেশ খারাপ। শীতের পরে বসন্ত হয় না।

আর বনানী বলেছিল, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এরকম ঠাট্টা নেই, বাবা প্রভঞ্জন।

সে তো মুকুলকে দেখছেই। দেরাদুনের দামি স্কুলে রেখেছে। সে তো প্রতিসপ্তাহে দাদা বলে চিঠি না লিখে থাকে না। সে নিজেকে পিতৃহীন মনে করে না। না, তা হতে দেয়নি সে। নতুন সেই ভদ্রমহিলাকে ফ্ল্যাটে একা থাকতে হয় কলকাতায়।

ইদানীং অবশ্য সেই মুকুলের মা এক চিঠিতে লিখেছে, সব ফ্ল্যাটেই মাইনর মেরামতি হয়, চুনকালি ফেরানো হয়, তোমার ফ্ল্যাটে হচ্ছে না। দুএক সপ্তাহের জন্য এলে হয় না? ইদানীং বলতে অবশ্য ছমাস আগে।

বাহ্, বেশ কথা, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়ে সে সব করালে হয়। নিজেকে বললে প্রভঞ্জন।

দূর দূর। প্রভঞ্জনের গলার শব্দটা শুনে পনিটা মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে সুরু করলে, যদিও পথটা নারেঙ্গিহাট থেকে চড়াই উঠছে। ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই। দেখো কাণ্ড! নিজের ক্লান্তি পনিকে দিচ্ছিলে? তা বলে নিজের রেঞ্জে তিন-সাড়েতিন ঘণ্টায় ক্লান্ত হবে?

তা ততবড় চার কামরার ফ্ল্যাটে একা থাকতে হয়তো কারো কষ্ট হতে পারে। তাই বলে প্রতিবেশী ফ্ল্যাটের কেউ তো সিঁড়ি জবরদখল করে নি, নিশ্চয় ল্যান্ডিংএ আবর্জনার ক্রেট জমা করে নি। যদি বা সে তেমন শক্ত প্রৌঢ়া নয় এখনও। কত হবে বয়স? চল্লিশের দিকে যাচ্ছে? তার নিজের চাইতে পাঁচ-সাত বৎসরই বেশি হোক।

কিন্তু, ভাবো, অবচেতনের থিয়োরি যদি সত্য হয়? না ডিএফওর অবচেতন নয়। সে অবচেতনে না হয় আপেল, পীচ, ন্যাসপাতি, আর গভীরতর বাঘের বন, কিন্তু পোচারকে বাঘের পেটে দেয়ার মতো যা হালকা আলো থেকে ক্রুর অন্ধকারের পথও—তা নয়। অবচেতনকে নিশ্চয়ই দেখা যায় না। কিন্তু মনোবিশ্লেষক যদি কারো আরোগ্য আনে, অবচেতন প্রমাণ হয়ে যায় কি? সে হাই তুললে। সে পকেট থেকে পাইপ বার করে দাঁতে কামড়াল। তামাকের পাউচ বার করতে করতে নিজেকে বললে, আচ্ছা চিঠিতেই লিখে পরামর্শ দেবো।

রেঞ্জার পনিতে থেকেই পাইপে তামাকে ভরতে শুরু করলে। সুগন্ধ, সুস্বাদু, আর চালানি তামাক। তাই বলে ধরো একটা কেস—জাতবিদ্বেষ আর মলিন দুর্বার আকর্ষণ একত্র প্রবাহিত হয় চ্যানেল করে নিয়ে? সে অবচেতনকে একরকম ঠাট্টা করতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে

তামাকের বিলাসিতায় মগ্ন হতে চেষ্টা করলে। সে স্থির করলে, গতমাসে আসা মনস্তত্ত্বের নতুন বইটা এখনও সে পড়ে নি। তা গত একমাস রাতের খাওয়ার পরে ঘুম না পেয়ে গেলে সে ছবি এঁকেছে। বই পড়ে নি। ছবিতেও মনই কাজ করে। তা কিন্তু বই পড়ার মতো ঝকঝকে মন নয়।

ছাই, ছাই। সে তো তাসিলাতেই এসে গেছে। উজ্জ্বল জায়গাটা। হাটের উপরে শর্মা, অসওয়াল। ওদের বাড়ির আর দোকানের আলো। বন পার হয়েছে যে। কিছুক্ষণে ফরেস্টকলোনির স্ট্রিটলাইটিং দেখা দেবে। নাই বা হল ভেপারল্যাম্প। তা হলেও ঝকঝকে।

নবম পরিচ্ছেদ

১

আজও চামলিংকে স্পাঞ্জ করিয়ে দেয়া দরকার ছিল। এখানে লখনৌ হসপিট্যালের সেই নার্স কোথায়, যে নিউমোনিয়া থেকে ওঠা রোগীকে তার হাতে দেয়া যাবে? থেনড়ুপ জল গরম করে দিতে পারে, তোয়ালে এগিয়ে দিতে পারে বড় জোর। তা ছাড়া উকুনগুলোকেও আরও কমানো দরকার। বিছানার চাদর আর পোশাক রোজ বদলানো হচ্ছে, নতুবা উকুনমুক্ত করা যাবে না। উপরন্তু ভয়, ওরা হাঁটতে হাঁটতে থেনড়ুপ আর নামগিয়ালকে আশ্রয় করেছে কি না।

কিন্তু কী রোগা হয়েছে ছেলেটি! এখন তো অন্তত সপ্তাহ দশদিন এখানে রাখতে হবে। ওষুধ আর পথ্য যোগানো দরকার। প্রাণ যেতে বসেছিল। জেন অনুভব করলে, যা হসপিট্যালে সে কখনও করেনি। সেখানেও তার ওয়ার্ডে কঠিন রোগ থেকে প্রাণ ফিরে পায় রোগী কিন্তু তা যেন অ্যাসেমব্লি লাইনের ব্যাপার, এখানে কিন্তু তাকে একা এক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

লাঞ্চের সময় হতে এখনও এক ঘণ্টা। চামলিং এখন কম্বলের সুখদ উত্তাপে ঘুমিয়ে পড়ার মতো শান্তভাবে শুয়ে আছে। জেনের মনে হল, এখানে কিন্তু আমি বারবারই বলতে চাই, বিদ্যা, সংস্কৃতি, উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির চাইতে বেশি দরকার ওষুধ, আর বোধহয় রুটি অথবা যে কোন খাদ্য। চামলিংরা সকলেই হয়তো নিরক্ষর, আর সংস্কৃতি তো! জেন হাসল। এই পলিঅ্যান্ড্রি- ভিত্তিক সংস্কৃতি রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে স্মোলেটকে যা সে লিখেছিল, তার উত্তরে স্মোলেট এদের এই অদ্ভুত বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে একটা বই পাঠিয়েছে। ইংলিশ গবেষণা। নাকি পশুপালক নোম্যাড সমাজব্যবস্থাই মূলে, এক পরিবারের সব কটি ভাইয়ের একই সঙ্গে গৃহে থাকা সম্ভব নয় বলে, একটি গৃহিনী হলেই চলে। সে বইয়ের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বিশ্বাস করলেই বা এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার কী যুক্তি? একটাই নাকি ভালো এই সমাজব্যবস্থায়, যে প্রস্টিটিউট নেই।

কিন্তু লক্ষ্য করো, আজও যখন সে স্পাঞ্জ করে দিচ্ছিল, নিরক্ষর, ক্ষুধাপীড়িত, হাজার বছর পিছিয়ে থাকা সংস্কৃতির চামলিং-এর চোখ কৃতজ্ঞতায় ছলছল করছিল।

কিন্তু এসব নয়। লাঞ্চের আগের সময়টা তাকে বেশ ভালো করে স্নান করে নিতে হবে। কার্বলিক সাবানই, তা ছাড়া আর কী পাওয়া যাবে উকুনের বিরুদ্ধে?

থেনড়ুপ জানিয়ে গেল বাথটাবে গরম জল দেয়া হয়েছে।

জেন দেরি করলে না। বরং উকুনের কথা মনে করে শিউরে উঠল। সে তো জানেই তার মাকড়সাকে খুব ভয়, এখন আবার এই নতুন ভয় না ধরে যায়। এগুলোকে দেখতে মাকড়সার মতোই যদিও লাল সরষের মতো ছোট। সে নিজের হাত দুখানাকে উলটে পালটে দেখে নিলে।

সে গোড়া থেকেই স্থির করে রেখেছে, রোগীকে স্পাঞ্জ করে দেয়ার পরে তার গাউন, আন্ডার গার্মেন্ট সবই গরম জলে ফুটিয়ে ডেটল আর ডিটারজেন্টে কেচে নিতে হবে। রং জ্বলে যায়, যাবে। সেগুলোকে সবই, সুতরাং, বাথরুমের ঝুড়িতে রেখে সে সাবান নিয়ে বাথটাবে নামল। থেনডুপকে ধন্যবাদ কিন্তু, যে সে লেগে থেকে অনেক ডিটারজেন্টের সাহায্যে টাবের এনামেলিংকে নতুনের মতো ঝকঝকে করে ফেলেছে।

উষ্ণ জলেব নিশ্চয়ই পৃথক আরাম আছে। তার মনেও চামলিং-এর আরোগ্য আরাম দিচ্ছে। সে স্থির করলে টাবের জলে স্নান হলে ওডিকোলন মিশিয়ে জাব থেকে কয়েক মগ জল গায়ে ঢেলে নেবে। এরকম ধরনের ব্যবস্থা একটা সে হসপিট্যালেও রেখেছিল। রাউন্ড শেষে ডরমিটরিতে ফিরে ডিসইনফেকট্যান্ট সাবানে হাত ধোয়ার পর ওডিকোলন কনুই পর্যন্ত না মেখে নিলে অস্বস্তি হতো।

নিজেকে আকণ্ঠ ঈষদুষ্ণ জলে ডুবিয়ে দিতে দিতে তার মনে হল, বাথটাবটা চীনামাটির হলে ভালো হতো। তা বলে এটাও কি আশা করেছিলে? ভালো বলতে হলে তো বলাই যায়, মেঝে আর দেয়ালে টালি হলে ভাল হতো। ট্যাপে ঠান্ডা আর গরম জল এলে ভাল হতো। শাওয়ারটা কাজ করলে ভাল হতো। ওদিকে কিন্তু রবিনসন ক্রুসো অনেক কিছু পেয়েছিল, কিন্তু পা ছড়িয়ে দেয়া যায় এমন বাথটাব পায় নি। তা বলতে হলে (জেন হাসল) ডিফো নিজেই স্নান করতো কিনা কে জানে। ক্রুসো কি করে বাথটাব পাবে?

হঠাৎ মনে হল তার, কে যেন আর স্নান করতো না? কথাটা মনে হতেই তার গা শিউরে অনুভূতি হল, তাকে সে অবস্থায় কেউ কি দেখছে যে অস্নাত? সে মুখ ঘুরিয়ে দরজাটাকে বন্ধ দেখে সাহস ফিরে পেলে। নিজেকে বললে, যার বাথটাব সে এখন নিশ্চয় ইংল্যান্ডের কোন অ্যাসাইলামে। তা ব্যতীত আর যাই হোক, গ্রেগ নিশ্চয় মেয়েদের বাথে ঢুকে পড়বে, এমন ছিল না। বুকের সেই ভাবটা কমাতে সে বাঁ বুকে হাত রাখলে।

এসব ভাবলে অবাক হতেই হয়, যার শৌখীন বাথটাব, থেনডুপই বলেছে তার জন্য ফোর্সপাম্পে ছাদের ট্যাঙ্কে জল তুলতো যাতে শাওয়ারে জল আসে ; এ ঘরের কোণেই ছিল বয়লার যাতে জল গরম হতো। কী হল, শেষে সে কখনই আর স্নান করতো না।

অবশেষে সে সাবান মাখতে শুরু করল, যেন ডান হাতে সাবান, আর বাঁ হাত তেমন বুকে রাখা লক্ষ্য করে।

শরীরে যেন পৃথক স্মৃতি থাকে, এরকম ভাবে সে অনুভব করলে, একদিন সে এমন শুয়ে থেকে খুব ভিজেছিল। শরীরের স্মৃতির তরঙ্গ সম্ভবত খুব ছোট দৈর্ঘ্যের। সে সুতরাং মনে করলে, দূর, সেটা স্বপ্ন। মার্চের প্রথম বৃষ্টির রাতে বই পড়তে পড়তে ঘুমঘুম আবেশে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে পাহাড়গুলো ভিজছে, পাহাড়, উপত্যকা সবই—ভাবতে ভাবতে সে রকম স্বপ্ন দেখে থাকবে। আর মার্চের বৃষ্টিতে তত কষ্ট হয় না।

খুব স্বপ্ন দেখা যা হোক। কাল আবার স্বপ্নে এক বিড়াল এল কোথা থেকে। সে তো বৈজ্ঞানিকও, সুতরাং ব্যাখ্যা করলে—সেটা সেদিনের সেই মেয়েটির খাদে নেমে যাওয়া বিড়াল থেকেই। ভাবতে জেনের গালে খানিকটা রং লেগে গেল। কী দুষ্টু, যেন চুক চুক করে মাই চুষছিল! স্বপ্নই। তার আগে পরে মনে থাকে না।

বিড়াল নিশ্চয়ই নয়। তা ঘুমের কবোষ্ণ আরাম। কারণ দেখো, সে আড়চোখে মাইটাকে দেখে নিশ্চিন্ত হল, দাঁতের দাগ নেই।

আর ওটাও কিন্তু একরকমের ফুলফিলমেন্ট, আজ কাজে এসেই থেনডুপ বলেছে। থেনডুপ কাল বিকেলে চিনিটিনি কিনতে অসওয়ালের দোকানে গিয়েছিল। সে চলে আসার সময়ে দোকানের

পিছন দিক, অর্থাৎ অসওয়ালের বাড়ির পাশ থেকে একটি স্ত্রীলোক হাতের ইশারায় থেনডুপকে বলেছে, সত্যি কি ডাক্তার? আমার বড় দরকার।

সে উঠে পড়ল টাব থেকে। কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে। বড় তোয়ালেতে গা মুছতে শুরু করলে। না, সে এখনি যাচ্ছে না সেই মহিলার খোঁজে যে গোপনে ডাক্তারের খোঁজ করছে। এদিকে দেখো চুল ভেজেনি তেমন। কালই তো শ্যাম্পু করেছে উকুনের ভয়ে। তাহলেও সে ভালো করে গা মুছবার আগেই চিরুনি নিয়ে আয়নার সামনে গেল। ব্রাশ ইট ফাইন। তাতেই নিজের মুখটা চোখে পড়ল, কোমরে জড়ানো ছোট টাওয়েলটার উপরে নিচে শরীরটাও। সে ভাবতে গিয়ে, হেসে ফেলতে গিয়ে নিজেকে শুধরে দিলে। ওটা এতদিন বোকামি ছিল, নিজের মুখ আয়নায় ভাল করে না দেখা। তোমার গায়ের রঙ, চুলের রঙ আর কপালের উপরে পাক, নাক যা একটু উঁচু, ঠোঁট যা কিছুটা ভলাপচুয়াসই আর গ্লসও থাকে না, এমন কি চোখ—এসবের জন্য তুমি দায়ী নও। আর চোখেও কম দেখো না। বরং সাধারণের বেশি। প্রমাণ সেই ব্রেন অপারেশনে বিশেষজ্ঞ ম্যাকডুগাল সার্জন, যে তিনজনকে সাহায্যের জন্য ওটিতে নিয়েছিল তারমধ্যে প্রথম নাম ছিল এমডি জেন এয়ারের। মেডসিনকে সে রিপ্রেজেন্ট করেছিল।

তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। ড্রায়ার থাকলে ভালো ছিল। লাঞ্চের দেরি আছে। আজ রোগী চামলিং তাদের লাঞ্চের সব আইটেমই খাবে। তা ছাড়া, অসওয়ালের বাড়ির সেই মহিলা যে গোপনে ডাক্তারকে কল দিয়েছে, তাকে দেখতে বিকেলের আগে যাওয়া যাবে না। বিচলিত হওয়ারও কিছু নেই। আলো আসছে স্কাইলাইট থেকে, যেখানে মানুষ উঁকি দিতে পারে না এত উঁচুতে, দরজাও বন্ধ। সে বড় টাওয়েল র‍্যাকে রেখে, কোমরের ছোটটিকে সরিয়ে প্যান্টি হাতে নিলে।

তার এই অসাধারণ লম্বা পাদুটোকে দেখো। সত্যি দেখো, প্রশংসার যোগ্যই বটে, অথচ এখানে আসার পরেও এই প্রথম দেখছে, আর লখনৌতে তো দেখার অবশ্যই রেওয়াজ ছিল না। রোম্যান ক্যাথলিক আর কনজারভেটিবও বটে। চিরকালই সে নিজের শরীরকে অবজ্ঞা করে এসেছে। হয়তো সব কলেজ আন্ডারগ্রাজুয়েটদেব সেন্স অব দি কমিক (কী বলবে, হালকাভাবে বলা) থাকা উচিত। কোন মেয়েই নিজের পা দুখানাকে নিয়ে কবিতা লেখে না।

প্যান্টির পরে ড্রেসিংগাউন গায়ে দিতে দিতে তার কো-এড আন্ডারগ্রাজুয়েটদের কথা হাসতে হাসতে তার মনে ঢুকল। কিন্তু তাদের মুখগুলো যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

যাকে র‍্যাবিট বলা হতো, সে আর বি টিরানা, যাকে যশলার বলা হতো, সে-ই যশলোক দ্বিবেদি, মালহোত্রার নাম ছিল মুলাটিয়ার। যাকে এমন কি প্রফেসারও কমেডিয়ান বলতো, তার নাম কী ছিল? ও, এসমাইল ম্যাকব্রাইড। ছ ফুট ছাড়িয়ে সাতের দিকেই বরং। কপাল ঢাকা কালো কোঁকড়া চুল, হাস্যময় দুই চোখ, কিছু মোটা নাকের নিচে তখনই চিবুক-ছোঁয়া ঝোলা গোঁফ। গোল পেঁয়াজ রঙের মুখ, যাতে টোলও পড়ে। উচ্চতা কারো কারো বিড়ম্বনা হতে পারে।

...এইতো সেদিন একজনের...

একদিন সেই প্রফেসর গাইনোর ক্লাসে কমেডিয়ান ম্যাকব্রাইড দাঁড়িয়ে গেল।

সার...

ইয়েস?

সার, শুড প্রেগনেন্ট উইমেন ইট্‌ ব্যাম্বুশুটস?

ক্লাস হতভম্ব, প্রফেসর হতবাক।

ক্রুদ্ধ প্রফেসর ফেটে পড়লেন, হোয়াট্ ডু ইউ মিন, ব্যাম্বুশুটস?

ওয়েল, মাই মাদার প্রব্যাবলি ফরগট দি অ্যাডভাইস। এই বলে সে নিজের ছফুট ছাড়ানো দৈর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ক্লাসে পিন পড়ার শব্দ শোনা যাবে। প্রফেসর গাইনোর কঠিন তিতো মুখ বিষ খাচ্ছে মনে হল। পরে বেলুনটা ফাটল। এমনকি সেই প্রফেসরের, ওজিম্যানডিয়াস কিং অব কিংস, মুখ থেকে শুশু করে হাসি লিক করলে, অট্টহাসির ঝড়ে ক্লাসটাই ভেঙে গেল সেদিন। কমেডিয়ান বলতে চাইছিল, জেন সায়েন্টিফিক্যালি ভাবলে, গর্ভিনী বাঁশকোড়ার তরকারি খেলে পুত্র ছফুট ছাড়িয়ে নানা বিড়ম্বনায় পড়ে। সে তো বলতোই, বিয়ে করার জন্য বাচ্চা টেরোড্যাকটিল খুঁজছে, এ গুড রাইড, ইভন স্কাইহাই। অবশ্য লম্বা গলার ডাইনোসরও বেশ গ্রেসফুল।

সেই কমেডিয়ান মেডিক্যাল কলেজের শেষ বছরে একদিন গার্লস হোস্টেলের ঘরে এসেছিল। তখন দুপুরের কিছু আগে হবে। তার তিনতলার সকলে ও অন্য দুইতলারও অধিকাংশ ছাত্রী পিকনিকে। তারা অবশ্য কিছু স্যান্ডউইচ ইত্যাদি ও এক পাঁইট বিয়ার রেখে গিয়েছিল তার অংশ হিসাবে।

ব্যালকনিতে একা দাঁড়িয়েছিল সে। ব্যালকনিতে আসার দরজার ওপারেই ওয়াশিং জমা করা আছে। আর সকলে যখন পিকনিকের আনন্দে, সে জামাকাপড় ধোলাই করার কর্তব্য বেছে নিয়েছিল। কিন্তু মন উদাস হয়ে যায়।

সে হঠাৎ দেখলে রাস্তা দিয়ে ম্যাকব্রাইড কমেডিয়ান চলেছে। কিন্তু না ভেবেই তেতলা থেকে দোতলা ও একতলার সিড়িগুলোকে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে পার হয়ে একতলার গেটে রাস্তার উপরে ধরতে পেরেছিল কমেডিয়ানকে। বলেছিল, এসো কমেডিয়ান, বিয়ার আর স্যান্ডউইচ খাই। তুমিও পিকনিক এড়িয়েছো?

প্রায় একঘণ্টা তারা মুখোমুখি বসে স্যান্ডউইচ বিয়ার খেয়েছিল। কমেডিয়ান সত্যিই গুড কম্পানি। একসময়ে সে কিন্তু জেনের জ্যাকেটের গলার হুকে হাত বাড়িয়েছিল। এসব ফ্লার্টিং হালকা হয়ে যায়, যদি একপক্ষ তা লক্ষ্যে না আনে। সে নিজে সেজন্য সেই হাতের থেকে অন্যদিকে চোখ রাখতে কমেডিয়ান টেবলে যে প্যাটার্ন তৈরি করেছিল, সে দিকে চোখ নামিয়েছিল। কমেডিয়ান স্থির থাকতে পারে না। টেবলে রাখা ব্রিক অ্যা ব্র্যাক, ক্লিপ, পেপারওয়েট, ফ্লাওয়ার ভাস, কলম, জটার, এসব একজায়গা থেকে অন্যদিকে সরিয়ে সরিয়ে প্যাটার্নটাকে কমেডিয়ান ভাঙছে গড়ছে। হঠাৎ সে ধরতে পারলে ব্যাপারটাকে। কমেডিয়ান তার চোখের দিকে চাইছে আর টেবলের জিনিসগুলোকে এধার থেকে ওধারে নিচ্ছে, যেন পরীক্ষা করছে তার কোনগুলি তার চোখের ফোকাসের বাইরে যায়। তার চোখের চাহনিকে নিয়ে খেলা, তার বাঁ চোখ খানিকটা টেরা তা নিয়ে মজা করা। হুক ভাঙা স্প্রিংএর মতো উঠে দাড়িয়েছিল সে। জ্যাকেটের গলার নিচে স্মকিংটা কিছু ছিঁড়ে গিয়েছিল, ধরা ছিল সেখানে ম্যাকব্রাইডের হাতে হুকটা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মেরেছিল সে কমেডিয়ানের মুখে, যেন সহপাঠিনীর জ্যাকেটের হুকে হাত দেয়ার ইতরতার শাস্তি। তার ঠোঁট তখনই ফুলে উঠছিল। সে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। দিন সাতেক পরে ম্যাকব্রাইড, তারপরে সে আর কমেডিয়ান রইল না, কলেজের করিডরে বলেছিল, ফরগেট ইট, জেন, ডু।

না, এটা কিমোনো নয়, লুজ বাথরোবই। এখন কবোষ্ণ অনুভব আসছে, আর ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। কিন্তু কমেডিয়ান তার স্বরূপ ফিরে পেয়েছিল। তারা তখন ইনটার্নশিপ শেষ করেছে, চাকরির জন্য দিগন্ত খুলছে। এক আড্ডায় বসেছিল তারা। আর সেখানে সেই এসমাইল ম্যাকব্রাইড বলেছিল, কঙ্গোতে যাচ্ছে সে। কে বললে, বেতন কি ততটাই ভালো? ম্যাকব্রাইড কমেডিয়ান বললে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকই প্রমাণ, সেদেশে মহিলারা সাতফুট, ফুটবল—ব্রেস্টেড।

জেন বড় টাওয়েলটাকে নিয়ে বাথরোবের ধার সরিয়ে সরিয়ে উরু, হাঁটু, কাফ আর একটু ড্রাই করে নেবে স্থির করলে।

এক পিকনিকে কিন্তু গিয়েছিল জেন কো-এডদের সঙ্গে, বোধহয়, সেকেন্ড ইয়ারে। আরো আগে

সেটা। আর সেখানেই সে শুনেছিল, আর সেজন্যই পরের কোন পিকনিকে যায় নি। অনেক দৃশ্য, পুরনো প্রাঙ্গন ইত্যাদি দেখার পর তখন তারা ছোট ছোট দলে, কোথাও মিক্সড কম্পানি, কোথাও গার্লস স্বতন্ত্র গ্রুপে। মেয়েদের দুটো চক্র, ছেলেদের সেরকম গোটা কয়েক। যোগাযোগের ফলে জেনদের চক্রের পাশেই ব্যাবিটদের সার্কল, ব্যাবিট, যশলার, মুলাটিয়ার, কমেডিয়ান।

হঠাৎ কানে গিয়েছিল জেনের। তার পিঠের দিকে কমেডিয়ানরা। মুখ দেখা না গেলেও পরিচিত গলার স্বর থেকে বক্তা চেনা যায়। সে নিজেদের চক্র নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, পাশের চক্রটার কথাও কানে যাচ্ছিল। চড়ুইয়ের ধুলোস্নানের মতো ছেলেরা কখনও কখনও প্রোফেন, এমন কি নোংরা কথাও বলে। কাউকে তারা আলোচনায় এনেছে, এমন শুনতে পাচ্ছিল সে, অবশ্যই তার সঙ্গিনীরাও।

ব্যারিট : ও সাচ লাবলি প্রোফাইল।

মুলাটিয়ার : ডরিক, আই সে।

ব্যাবিট : অ্যান্ড সাচ লং লেগস।

যশলার : ম্যাগনিফিশেন্ট। টু বিউটিস আই বেট।

মুলটিয়ার : অ্যান্ড হোয়ার দোজ বিউটিস কনফার!

এই সুন্দর লম্বা পাদুটো যেখানে কানাকানি করে? তার নিজের গা শির শির করে উঠেছিল ছেলেদের সেই দুঃসাহসের সীমা দেখে।

কমেডিয়ান : সুটস মি।

ব্যাবিট : টু মি শি লুকস আক্সেন্স।

সে ভাবলে, সেদিন কি তারা কমেডিয়ান ম্যাকব্রাইডের বক্রদৃষ্টি আর তার নিজের চোখের স্কুইন্ট নিয়ে মজা করেছিল? এসব শোনার পর সে আর পিকনিকে যেতে চায় নি, কিন্তু পিকনিকের দিনে ম্যাকব্রাইডকে বিয়ারে ডেকে নিতে আগ্রহ বোধ করেছিল। এসব কি করে ঘটে তা বলা যায় না। দুঃসাহস? অন্ধ ইনস্টিঙ্কট?

সে চিরুনি দিয়ে চুল ঝাড়া শেষ করে আয়নার সামনে মুখ রেখে দুহাতে চুলগুলো উপর দিকে তুলে কপালের দুপাশে সরালে। এটাই তার অভ্যস্ত রীতি ছিল, আয়নাকে এড়িয়ে চিরুনি আর আঙুলের সাহায্যে চুল ঠিক করা, ফলে এক বিশেষ আনকেমপট ভাব হয়েছিল, যা কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করতো আরও বেশি।

সাচ এ প্রোফাইল। এমন ডরিক নাকমুখ। তার সামনে আয়নাটা হেসে উঠল। এসব কারণেই সে স্পেশাল eye-র ক্লাস করতো। এমন কি মুলাটিয়ারকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, স্ট্র্যাবিসমাস টেরাচোখ বংশ ধরে চলে কি না। সে কিন্তু অনেক পরে। আর তখন আই ডিপার্টমেন্টের হেড সেই এম এস ডক্টর মালহোত্রা বলেছিল, আমি ববি, মানে, মিসেস মালহোত্রাকে নিয়ে ভালো আছি। কিন্তু মাই ডিয়ার জেন, তখন তুমি তো সামান্য হিন্টসও দিতে পারতে। ডক্টর মালহোত্রা সেদিন স্পষ্ট করেই বলেছিল, একজনের সবুজ চোখদুটির একটিতে কিছু স্ট্রাবিসমাস ভাব থাকলেও, প্রশ্রয় কিছু পেলেই সে একজনকে স্ত্রী করে নিতে উৎসুক ছিল।

বাথ থেকে বেরিয়ে জেন, হে থেনডুপ বলে শোবার ঘরে গেল, আর সেখান থেকে হাউসকোট ও স্ল্যাকসে বেরিয়ে লাঞ্চ টেবলে গিয়ে বসলে। সে উলটিয়ে রাখা প্লেটে আঙুল ছুঁইয়ে তা গরম আছে দেখে সুখী হল। থেনডুপ প্লেটগুলোকে উষ্ণ করেছে। দরজায় থেনডুপের মুখ দেখা যেতেই তার মনে পড়ল, চামলিংকে ট্রে পাঠাতে হবে লাঞ্চের। তা মনে করিয়ে দিলে সে থেনডুপকে। থেনডুপ যখন চামলিং-এর লাঞ্চের ট্রে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে বলে দিলে নামগিয়াল জনকে খবর দিতে। জনকে বলো, আমি টেবলে বসেছি। এখনি আসুক সে।

লাঞ্চ শেষ হলে বসবার ঘরে বই নিয়ে বসেও জেনের আবার মনে হল বিড়ালটার কথা। একটা বিড়ালকে সে কয়েকবার স্বপ্নে দেখছে, শেষবার কাল রাতে, তার কারণ এই হতে পারে তার একটা বিড়াল ছিল, হয়তো অতিশৈশবে, আর তা হারিয়ে গিয়েছিল একদিন, এরকমই তার ধারণা, আর পরে কোনদিনই পাওয়া যায় নি।

তা না হোক। সে হাসল। একবার এক বিড়াল ধরতে সে কিন্তু তার পিছন পিছন প্রথমে প্রাচীরের মাথায়, পরে সেই কনভেন্ট স্কুলের গ্যাবেলড রুফে উঠে পড়েছিল। আর তার ফলে ডাকোস্টার চেম্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিরস্কার নিতে হয়েছিল। ডাকোস্টা খুব রাগ করে, তিরস্কার করে, তার অনুশোচনাপত্র লিখিয়ে নিয়ে পরে হেসে ফেলে বলেছিল, টমবয়। মাদার ডাকোস্টা, মম, তার জেনির শরীরে শক্তি ফিরতে দেখে মনে মনে খুশী হয়েছিল বোধহয়।

কিছুক্ষণ সে বই পড়ল। বেলা তিনটে হতেই সে স্থির করলে, সে চার্চে যাবে। এতদিন যাওয়া হয় নি। বাইরে থেকে দেখা আর কাছে গিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখা এক নয়। এখন তো সে এখানে স্থিতই। তারই চার্চ।

চার্চ বলতে যা মনে আসে, তা অবশ্যই নয়। কাঠের পাটাতনের মেঝে, সিলিং, দেয়াল, সবুজ টিনের ছাদ—এমন এক লম্বাটে উঁচু ঘর। তিন দিকের ঢাকা বারান্দায় সাদা রং করা সারি-সারি কাঠের পিলারের উপরে সামনের দিকে ত্রিভুজাকার ছাদ থাকায় গ্রীক স্থাপত্যের ভাব মনে আসতে পারে। সম্মুখের সেরকম প্রবেশ পথের উপরে একটা ক্রসও। জেনের একবার মনে হল, কী কৌশলে বা আটকেছে, যে ঝড়ঝাপটায় পড়ে যায় নি।

ভিতরে বেদিটা কালো পালিশ করা কাঠেরই হবে। বেদির সামনে সারি সারি পিউয়ের বদলে পিঠতোলা, দুই সারিতে, কয়েকখানা বেঞ্চ। কিন্তু ধুলো নেই। তাতে অনুমান হয়, নামগিয়াল জন দিনে অন্তত একবার ঝাড়পোঁছ করে। বেদির পিছনে দেয়াল জোড়া একটা পর্দা। পর্দা না বলে টাপেস্ট্রি বলা ভাল। রেশমের উপরে রঙিন রেশম কেটে কেটে বসিয়ে সেলাই করে একটা ক্রুসিফিকশনের ছবি। ধুলোয় ম্লান, এখানে ওখানে ফুটো, তা সত্ত্বেও ছবিটার ঔজ্জ্বল্য আকর্ষণ করে। জেন দেখতে দেখতেই একটা পাঁশুটে মথ উড়ে আবার বসল সেটার গায়ে। জেন মনে মনে বললে, ও, মথ—ইটন্। মানুষের চাইতেও বড় আকারের যিশু ক্রসে আবদ্ধ। যিশুর গায়ের হলুদ, ক্রসের রঙ বাদামি। টির মতো সরল না হয়ে ক্রসের ভূমি-সমান্তরাল বাহুটি যেন যিসাসের যন্ত্রণার ভাবে নুয়ে এসেছে। বেদনাতেই যেন যিশুর শরীর, বিশেষ তাঁর হাত পা, দুমড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব চাইতে দর্শনীয় যিশুর মুখ। কপাল, মুখ, চিবুকের এক থোবা বাদামি দাড়ি, সব মিলে যেন দীঘল তিব্বতীয় পুরুষ, যেমন ছবিতে দেখা যায়। আশ্চর্য হালকা নীল রেশম কেটে তৈরি যিশুর চোখ। প্রথমে মনে হল জেনের, যেন যন্ত্রণায় মরনোন্মুখতা ; চেয়ে থাকতে থাকতে জেন যেন আবেশে দেখলে, শান্ত, স্তিমিত, সরু সেই চোখদুটিতে যন্ত্রণা নেই ; বুদ্ধের ছবিতে যেমন থাকে, তেমন ক্ষমা। তার মনে হল, এটা নিশ্চয় এমন কারও করা, যে বোধিসত্ত্বের এরকম ছবি করতে অভ্যস্ত। তা হলে গ্রেগরীর সঙ্গে সীমান্তগুলির ওপারের যোগাযোগ প্রমাণ হয়। এই বেঞ্চগুলোতে কি একসময় বৌদ্ধদেরও আকর্ষণ করতে পেরেছিল গ্রেগরী?

বেদির ডান দিকে চার-সাড়েচার ফুট উঁচু একটা টুল পশমের ঝালরদার ঢাকনায় ঢাকা। তার উপরে, জেন এগিয়ে গিয়ে দেখলে, একটা বড় আকারের বাইবেল। আর তার উপরে শোয়ানো রূপার ক্রস। এই ক্রস তুলে কি ফাদার গ্রেগরী তার ফ্লককে আশীর্বাদ করতো?

বেদির বাঁ দিকে খানিকটা দূরে দুটো কাঠের থামের উপরে সিলিংটাকে পৃথক ঢালে ভেঙে

পৃথক একটা ক্লয়স্টারের ভাব আনা হয়েছে। তার নিচে গ্রেগরীর অর্গ্যানটাকে দেখতে পেলে জেন। সুদৃশ্য মাঝারি আকারের সেটা। জেন এগিয়ে গিয়ে ডালায় আঙুল ছোঁয়ালে, ধুলো নেই। হুক খুলে ডালা তুললে। চাবির দাঁতগুলো সাদার চাইতে বরং হলদে হয়ে এসেছে, কয়েকটি থেকে হাতির দাঁতের পাতগুলো উঠে গিয়েছে। দাঁত হারানো এক বুড়োর মুখ, হঠাৎ এরকম মনে হওয়ায় সে আবার শিউরে উঠল। সে প্যাডলের একটিতে পায়ের আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে চাবিতে হাত দিতেই, ঝং করে একটা শব্দ হল, খানিকটা ধুলো উড়ল, একটা বড় মথ পত পত করে উঠে পড়ল। বোধ হয় চামড়ার বেলো খাচ্ছিল। এত সব একসঙ্গে ঘটে যাওয়ায়, পুরনো কাল আসতে দেখে ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল।

খানিকটা হাসিহাসি, খানিকটা ভীতমুখে, সে বরং বেদি আর যিশুর থাংকার দিকে সরে যাওয়া নিরাপদ মনে করলে।

কিন্তু সে থমকেও দাঁড়াল। প্রায় বেদিতে উঠে পড়েছিল সে। তার মনের মধ্যে এক ক্রিশ্চান স্ত্রীলোক নিজেকে সেরকম দেখতে পেয়ে, ফিসফিস করে বললে, সকলে ম্যাগডালেন হয় না কিন্তু।

তা ছাড়া ওটা যুক্তির হতো না। সে কখনই ফাদার হতে পারে না, প্রিস্টও নয়। বরং স্ত্রী-মানুষ সে, এই অনুভূতি মন থেকে বাইরে এসে তার ত্বককে বেশ রক্তাভ করে দিলে।

কিন্তু কৌতুকের দেখো, ফাদার গ্রেগরী যদি এই পুলপিটে দাঁড়িয়ে প্রিচ করে থাকে, প্রার্থনা করে থাকে, তবে কনগ্রিগেশনে কারা ছিল? কারা বসতো বেঞ্চগুলোতে? হয়তো নামগিয়াল নিয়মিত, হয়তো থেনডুপ কখনও বা, তা ছাড়া কেউ কি চার্চে আসতো? অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দশ বৎসর ধরে গ্রেগরী শূন্য চার্চে তেমন চার্চসার্বিস করতো। বৌদ্ধরা এসে বসতো—সে তো এক অদ্ভুত কল্পনা, পাখিরা এসে বসতো কল্পনা করার মতোই। সে কি অর্গ্যান বাজিয়ে একা গান করতো? সে কি ব্যারিটোন ছিল, যে তার অর্গ্যানে আর গলার স্বরে শূন্যতা কিছু ভরতো? সে কি একা দাঁড়িয়ে বাইবেলের টেকস্ট পড়া শেষ করে ক্রস এগিয়ে ধরে শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতাকে ব্লেস করতো?

কেমন একটা আতঙ্ক হয় না ভাবতে? না, না, সে নিজেকে ভরসা দিলে, নামগিয়াল জন নিশ্চয়ই থাকতো, তার নামই প্রমাণ করে সে ক্রিশ্চান, থেনডুপ ক্রিশ্চান না হলেও চার্চসার্বেন্ট, সেও আসতো। আর হয়তো থেনডুপ কাউকে কাউকে যোগাড় করে আনতো ফাদারের সেই সব বক্তৃতা আর গান শুনতে, সে প্রবোধ দিলে নিজেকে।

কিন্তু তা হলেও, এমন নিঃসঙ্গতায় ধর্মচর্চা করলে ধর্ম কি মনের গভীরে ঢুকে যায় না? বড় বেশি গভীরে?

অথচ জানা যাচ্ছে, প্রমাণ আছে, গ্রেগ সাহিত্য ভালবাসতো। শুধু শেক্সপীয়ারের নাটক নয়, উপন্যাস পড়তো ; দুষ্প্রাপ্য মাইনর ক্লাসিক স্মোলেট, স্টার্ন ; অক্লাসিক কনান ডয়েল, জিম করবেট ; মাইনর পোয়েটস। কনান ডয়েল আর জিম করবেট খবরকাগজের স্তূপে লুকিয়ে রাখলেও পড়েছে তো। স্মোলেট, স্টার্ন আর অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীর অপ্রধান কবিদের অ্যানথলজি সাধারণ পাঠকের সংগ্রহে থাকে না অবশ্যই।

জেন থাংকাটাকে দেখছিল। হঠাৎ সে পিছন ফিরল। দেখো কাণ্ড! কে আবার বাজাবে ওই ফুটো বেলোর অর্গ্যান? এরকম অলৌকিক ভয় পাওয়া যুক্তির নয়। সে বরং সাহস করে যিশুর চোখদুটোতে মন স্থির করলে।

হঠাৎ তার একটা বিস্ময় বোধ হল। এমন কি এতটুকু সম্ভাবনাও আছে যে গ্রেগরী সত্যি পাগল হয়নি, অন্য কোন রকমের কিছু হয়েছিল? নামগিয়াল যেমন বলে, বোধ হয় পাগল নয়। দুইদুই বার মহাযুদ্ধের পরে, অ্যাটম বোমায় জাপান হেরে যাওয়ার পরে, ভিয়েতনামের যুদ্ধে অ্যাসিড

ঢেলে প্রকৃতিকে পুড়িয়ে দেয়ার খবরের পরে, পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করার নিশ্চিতির প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও কেউ কি সেন্ট হতে পারে? যেমন সেন্ট ফ্রান্সিসের ইটালির বরফঝরা শীতে উলঙ্গ শরীর তুষারসাদা হয়ে যেতো। তেমন উলঙ্গ এক পাদরি। অবাক কাণ্ড তো!

বিনা কারণে জেন ক্লান্ত হয়ে উঠল। স্পোর্টসে হেরে গেলে দুঃখ থাকে, কিন্তু উত্তেজনাও থাকে। কিন্তু স্পোর্টসের জন্য নির্বাচিতই হওয়া গেল না, এরেনার বাইরে বসে থাকতে হল, এ অবস্থায় সকলের পরাজয়ের চাইতে নিজেকে বেশি পরাজিত মনে হয়, চেষ্টা করেছি বলার সান্ত্বনাও নেই। তার ডাক্তারি–সিদ্ধ মন এ রকম থিয়োরি খাড়া করলে, বদ্ধ গ্যাস নয়, তা হলেও বাতাসটা টাটকা নয়। নামগিয়াল চার্চ খোলে, ঝাড়পোঁছ করে, কিন্তু রোজই টাটকা হয়ে উঠবে এরকম ভালো বাতাস পায় কি?

বদ্ধ বাতাসের ফলেই যেন ক্লান্ত ভঙ্গীতে বাংলোর দিকে চলতে চলতে সে ভাবলে, এর পর থেকে চার্চে যদি আসা হয় তবে জন নামগিয়াল যখন থাকে, তখনই আসা ভাল হবে। সে অন্তত এই উনআশি বৎসরের মানুষ।

বাংলোর বারান্দায় পা রাখতে পেরে সে ভাবলে, মানুষের মনে কিন্তু ভয়, হিংসা, লোভটোভ তেমনই আছে, যেমন সেই অনেক আগে সেই সেন্ট ফ্রান্সিসের সময়ে ছিল। মানুষের এখনও তেমন ফোড়া, বাত, পক্ষাঘাত হয়ে থাকে, আগে যেমন হতো ; তা হলে মানুষের কি সেই একটা দিকও থেকে যেতে পারে, যেমন সে সময়ে ছিল? কী অদ্ভুত! মানুষে কি এখনও তেমন সেন্ট হওয়ার বীজ থেকে গিয়েছে?

সে দেখলে, থেনডুপ বারান্দায় লণ্ঠন, টেবল ল্যাম্প ইত্যাদি ঘষে-মেজে ঠিক করছে। যদিও বেলা এখন আগের চাইতে বড়। জেন বললে, এখন কি চা হবে থেনডুপ? থেনডুপ চায়ের জন্য প্রস্তুত ছিলই। সময়টা তখন চায়েরই। থেনডুপ লণ্ঠন ইত্যাদি তুলে নিয়ে চায়ের যোগাড় করতে চলে গেল।

জেন চামলিংএর ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললে, আধোআধো ভাবে পাহাড়ি ভাষার শব্দ, জেন এই কয়েকদিনে যা শিখেছে, তার সাহায্যে যা হয়।

সে তার লাইব্রেরির ডিভানে গেল। সেখানেই থেনডুপ চায়ের ট্রে আনলে। সে নিজের চা করে নিয়ে বললে, এবার তোমরা নাও গে। চামলিংকে দেবে।

থেনডুপ চলে গেলে চা খেতে খেতে সে স্থির করলে, এখনও বই পড়ার আলো আছে। ভাবলে, মন্দ হয় না আবার স্টার্ন কিংবা স্মোলেট পড়ে দেখলে। স্কুলে স্কিমিং করে পড়া হয়েছে। এখন ভিতরে ঢুকে দেখা যেতে পারে। অতি যত্নে চামড়ায় বাঁধানো ভল্যুমগুলো গ্রেগরীর, কিন্তু সে তো ডিনারের পরে, রাত্রি অন্ধকার হতে থাকলে পড়া ভালো হবে। তার আগে, থেনডুপ আলো আনলে, ডাইরেক্টর স্মোলেটকে চিঠি দিতে হবে। তার প্রস্তাবটা জানিয়ে দিতে হবে। সব ওষুধ লখনৌ থেকে না কিনে এখানে প্রয়োজন মতো কিনে নেয়া ভালো, কখন কী এমারজেন্সি হবে, তা বলা যায় না। এটাই যুক্তিসঙ্গত, রোগ ল অব অ্যাভারেজেস মানে না। তা ছাড়া কয়েকটা অপারেশনের যন্ত্র দরকার। অ্যানাস্থেশিয়ার সাহায্য লাগে এমন অপারেশন নয়। তা হলেও, মনে করো, দাঁত তোলার, অ্যাবসেস কাটার, মনে করে কোন স্ত্রীলোক সে রকম বিপন্ন হলে, গাইনোর কয়েক রকম যন্ত্র...। তা ছাড়া এবার সে বেশ স্পষ্ট করে লিখবে, লেখাপড়া শেখানোর চাইতে চিকিৎসাই এখানে দরকার। এটা এথনোলজির গবেষণার জায়গা নয়। টোবি স্মোলেট সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র্যের কথা যতই বলুক, কেন যে চামলিংদের সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে, তা সে বুঝতে পারছে না। তারা লেখাপড়া শিখলে, বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এলে নিজেদের সংস্কৃতি বদলে নেবে। অধ্যাপক আর গবেষকদের সুবিধা হবে বলে, অ্যাবরিজিন, ইনডিজেনাস, আদিবাসী যাই বলো, তারা সময়ের, ক্রমশ জল শুকিয়ে যাওয়া,

কুয়োতে থাকতে চায় না।

এই সময়ে কৌতুকের ব্যাপারটা আবার হল। থেনডুপ আলো নিয়ে আসাতেই সে যেন দেখতে পেলে। আর দেখে অবাক হয়েও গেল। তাদের ডাইরেক্টরের নাম টোবিয়াস স্মোলেট। এদিকে দেখো, তার হাতের এই উপন্যাসের অষ্টাদশ শতকের লেখকের নামও তাই। সে হাসল। একই লোক দুই শতাব্দী চলে আসছে? বংশধর? তা হলে ছদ্মনাম ওটা ডাইরেক্টরের? টোবি তা হলে...

সে অবাক।

দশম পরিচ্ছেদ

১

কিছুদিন পরেই হবে। মনে হচ্ছে তখন এপ্রিল। কিন্তু সেদিনই দাওআ তাসিলা হয়ে নুমপাই যাচ্ছিল, যা থেকে মনে হয়, দিনটা মার্চের শেষ কয়েকটি দিনের একটি। এরকম হওয়ার কারণ, প্রকৃতি সেবার মানুষগুলোকে ভ্রূক্ষেপ না করে, মার্চ এনেছিল দেরি করে, আর এপ্রিল এনেছিল এগিয়ে। ফলে নরবুকে স্টিরাপ পাম্প আর নল দিয়ে বাংলোর বাইরের লনে জল দিতে হচ্ছে। জলের অভাবে লিলি ইত্যাদির আসতে দেরি হয়ে যায়।

নুমপাই যাবে বলে আগের দিন সন্ধ্যার মুখে দাওআ তাসিলায় এসেছিল, রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করেছিল। সেখানে কথাবার্তা শেষ হতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রেঞ্জার তাকে মেয়র-বাংলোয় রাতের জন্য থাকতে পাঠিয়েছিল। তার সঙ্গী দুজন। একজন শর্কি যে নাকি ফরেস্ট গার্ড, অন্যজন লেবার হবে। তার নাম লাকপা। তারা নুমপাইকে আবার ডিএফওর শাসনে আনতে যাচ্ছে।

তখন তো সেই এক নম্বর বাংলোয় পিকনিকের মতো ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। চায়ের গেলাসগুলোকে হাতে ধরিয়ে দিয়ে নরবু যখন বললে, তা হলে সে তাড়াতাড়ি আর কয়েকটি চাপাটি বানিয়ে নেবে, তখন দাওআ বললে, চলো হাতে হাতে বানাই সকলে।

তার আগেই মেয়র জেনে ফেলেছে, খুব সকালেই দাওআ রওনা হবে। অনেকটা পথ যেতে হবে তাদের। হয়তো বড় ফাটলটার উপরে দুএকটা আস্ত গাছ ফেলে বিরিজ করে নিতে হবে। ডিএফও বলেছে, তাসিলা থেকে অন্তত এক হাজার ফুট উঠলে, সেই উপত্যকাটাকে পাওয়া যায়, যেখানে একটা ঝর্না থাকায় মানুষ বাস করতে পারবে।

সেই রান্নাঘরে দাওআ, তার সঙ্গী দুজন, মেয়র, নরবু মেঝেতে বসে সেই পিকনিকের মতো ব্যাপারটা শুরু করলে। প্রথম মিনিট পনের-বিশ দাওআর সেই সঙ্গী শর্কি আর নরবু যোগাড় করে নিতে ব্যস্ত রইল, গল্পে যোগ দিতে পারলে না। খান দশ-বারো চাপাটি ভাজা হলেই তারা খেতে শুরু করলে, গল্পেও যোগ দিলে। তখন এমন হল, যার দরকার সে উঠে গিয়ে উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে চাটুতে পাহাড়ী গোরুর ঘিয়ে একখানা করে চাপাটি উলটে পালটে নিচ্ছে, আর সেটা পোড়া হোক, আধকাঁচা হোক, হাতে নিয়ে গল্পের মধ্যে এসে বসছে। চাপাটির অনুপানের অভাব কী? এক বড় প্লেট বোঝাই মুলো, টম্যাটো, পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা কুচানো আছে। কেউ অতিথি নয়, কেউ অতিথিপরায়ণ গৃহস্থও নয়। আর মুখ চলছিল যতটা খেতে, ততটাই গল্প করতে।

গল্পেরও সংলগ্নতা ছিল না। এবং গল্পের অনুষঙ্গে অন্য এক, যার যা মনে এসে যাচ্ছে। কখনও বা পাশাপাশি দুটো গল্প চলছে। শ্রোতা যারা যখন, তারা এক গল্প শুনতে শুনতে অন্য গল্পে কান

দিয়ে সেই গল্পের দিকে সরছে।

দাওআর প্রথম সঙ্গী শর্কি, সে কতপুরুষ থেকে বনবাসী, তা তার নিজেরই ধারণা নেই। বনের মধ্যে বনের কাছে পাওয়া ছোট জমির টুকরো চাষ করে, তার বিনিময়ে বন পাহারা দেয়, বনের ক্যাজুয়াল লেবার হয়। কোন পূর্বপুরুষ হয়তো তামাং উপজাতির ছিল, পরে মায়ের দিকে কত উপজাতির রক্ত মিশেছে তা কেউ বলতে পারে না। বনের মধ্যে, হয় এ বন, না হয় অন্য বন, সে রকম বনের চাষীদের মধ্যে নিজের উপজাতি খুঁজতে গেলে, বিবাহ যোগ্য যুবকযুবতী পাওয়া যাবে না। চেহারা দেখে সন্দেহ হয়, শর্কির মা হয়তো লেপচা ছিল। বহু প্রজন্ম বনের ক্যাজুয়াল লেবার থাকার পর যুবকটি ফরেস্ট গার্ড হতে পেরেছে। দাওআর অন্যসঙ্গী লাকপাকে দেখলে অন্য উপজাতির বলে চেনা যায়। শর্কির রং যদি হলুদ, লাকপার রং সাঁওতালদের মতো কালো। যেন সাঁওতালই, তেমন মুখ চোখ। কিন্তু উচ্চতায় সাঁওতালদের ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু টিকলো নাক, আর চোখদুটিও যেন শেষ হিসাবে সাঁওতালদের তুলনায় বেশ বড়, ফলে মনে হয় খয়রা মণিদুটোকে ঘিরে অনেকটা করে সাদা রং। মনে হয় এই নতুন পরিবেশে সন্ত্রস্ত। কিন্তু সেই চোখ দুটিই আবার। কখনও তাতে খুব ধারালো ভাব, কখনও তা স্তিমিত ; মনে হতে পারে বাঘ, চিতা, ঈগলের মতো তার চোখ বিশেষভাবে তৈরি। মনে পড়ছে, চোখ নিয়ে এরকম আর একটা গোলমাল এ অঞ্চলে লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিশেষভাবে তৈরি নয়। বরং মেয়রের সেই চোখদুটিতে মেঘের ছায়া পড়ে নীলজাতীয় হয়ে থাকে, মেঘ সরে গেল চকচক করে ওঠে, মেঘের ছায়া সবটা জুড়ে না পড়লে এরকম মনে হয় আড়চোখে সরছে।

সে যাই হোক, লাকপার কুড়ি-একুশের কালো মুখের বাঁদিকে একটা শুকনো বড় ক্ষতচিহ্ন যা বাদামি হয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে, লাকপা আলাপের ভাষাটা জানে না। সে কথা বলছে বটে, তা শুধু দাওআর সঙ্গে, সম্পূর্ণ অন্য রকম এক ভাষায়। দাওআও সে ভাষাতেই উত্তর দিচ্ছে। মেয়র লক্ষ্য করলে, শুধু গালে নয় লাকপার হাতে পায়েও তেমন সব ক্ষতচিহ্ন, যা কিছুদিন আগেমাত্র শুকিয়েছে, এমন মনে হয়।

মেয়র জিজ্ঞাসা করলে, চিতা ধরেছিল নাকি?

দাওআ বললে, মাস তিনেক হয় বিয়ে করেছে।

দাওআ হাসল। তখন এই গল্পটাই প্রধান হল। দাওআ যা বললে, তা এই রকম। অসুর, অসুর। বিয়ের মেয়ে আনতে গিয়েছিল। এসব বউয়ের চুমু।

নরবু বললে, তা হলে বউটা কি চিতানি, যে মেয়ে সেজেছিল?

দাওআ বললে, খুড়শ্বশুর, দুই শালা, তাদের কয়েকজন প্রতিবেশী টাঙি দা, তীরে এইসব দাগিয়েছে। এরকম চুমুর ভয়েই আজকাল অসুররা মদেশিয়া, মুণ্ডা বিয়ে করে চাবাগানি জাতি হচ্ছে। অসুর থাকছে না।

নরবু সব চাইতে কম বয়সী। সে বললে, বিয়ে করতে প্রাণই যদি যায়–

এর তো যেতেই বসেছিল।

এরকম বিয়ে না করাই ভালো।

তা ভাল। হলে আরও ভালো। ওর ছেলেরা চিতাই থেকে যাবে। ওর বহু মনে রাখবে প্রাণকে কিরিয়ামে লিয়া হুয়া। সেও নিজের আতোমাপ্রাণ আর কাউকে দেবে না।

মেয়র ভাবলে, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার বটে। স্ত্রীলোকের জন্য মানুষ এমন বিপদের ঝুঁকি নেয়। এ জাতটাই মরে যাবে।

এই গল্প শেষ হতে না হতে, দাওআ বললে, মৌর, তোমার পা ভাঙা দেখছি।

তা হলে, রেঞ্জার সাহেব যেমন বলছিলেন, তুমি নাকি অর্কিড দেখে তা পাড়তে বুড়ি পাহাড়ে

উঠেছিলে? অর্কিড তো বনে অজস্র। পাহাড়ে উঠতে হয় কেন? অর্কিড সুন্দর বটে নৌটঙ্কীর মেয়ের মতো। নেশা ধরাতে পারে। কোনদিন ফল হয় না। শর্কি বললে, দাওআজু, মেঁইঅরের নাশসা লেগেছিল। আপনার সেই নিমতিঝোরার নাশিলি হিপিনীর মতো।

নরবু জিজ্ঞাসা করলে, সে কী রকম?

দাওআর অভিজ্ঞতার কথা শর্কি নিজেই বললে। নিমতিঝোরা জঙ্গলে দাওআজু টের পেয়েছিল বিকেলেই বনে মানুষ ঢুকেছে। খুঁজে খুঁজে চলে নিমতিঝোরার উপরে যে বড় আর পুরনো কাঠের সাঁকো, সন্ধ্যার আগে আগে সেই মানুষকে দেখা গেল। তারা সেই রকম হিপি আর হিপিনী যারা নেশার ঘোরে এসে কিংবা নেশা পাচার করতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে। নিমতিঝোরার জঙ্গলে বনের মানুষরাই পথ হারায়। বাইরের লোকরা কী করবে? তার উপরে তখন ঝপঝপ করে অন্ধকার নামছে। তারা ভয়ও পেয়েছে। সাঁকোর উপরে ঘেঁষাঘেঁষি বসে সিগ্রেট টানছে। দাওআজু বললে, নো টাইগার, লেপার্ড ইজ, ইজ। বনের আতোমা চেনো যে এখানে এসেছো? তারা শুনে হাত নেড়ে বললে, টা টা। ব্যস? দাওআজু অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভীত মুখে নরবু জিজ্ঞাসা করলে, আর দাওআজু বনে ছেড়ে দিলেন তাদের? শর্কি বললে, দোষ তো তাদের। দাওআজু কী করবে? তারা তো ভেবেছিল সাঁকোয় যখন উঠে বসেছে, আর ভয়ের কিছু নেই। রাত আরো গভীর হলে, সেই সাঁকোব উত্তর মুখের কদমগাছটার সঙ্গে মিশে থাকলেন সকাল পর্যন্ত দাওআজু। গল্পটা চমকে দেয়ার মতোই। মেয়র বললে, আমি কিন্তু নেশা করিনি সেদিন। সে হাসল, তোমাদের কি মনে হয় নান্নীর চায়ে নেশা মিশানো থাকে?

নান্নী? কোন নান্নী?

তাসিলা রোডের।

কী খেলে? কেন খেলে?

চা। খুব শীত ছিল। জামাপ্যান্ট ভিজে ছিল।

কসরী? কত পয়সা দিলে?

এক রুপিয়া।

শর্কি জিজ্ঞাসা করলে তাকে কি অর্কিডের মতো সুন্দর লাগছিল?

মেয়র বললে, সুন্দরী এক রকম। কিন্তু খুব গবীব আর দুঃখী।

দাওআ কিছুক্ষণ ভাবলে, সকলেই তখন তার মুখের দিকে চেয়ে।

মেয়র ভাবলে, সেই কুয়াশায় আর শীতে চা খুবই ভালো লেগেছিল। স্ফূর্তির মতো কিছু বোধ হচ্ছিল বটে মনের নিচে কোথাও, কিন্তু তাকে নেশা বলে না।

দাওআ বললে, ওটা তাসিলার মানুষ গল্প বানিয়েছে। নান্নীর আতোমাকে না চিনে বলে। তাদের নেশা লাগতে পারে। নান্নী যদি কাউকে কিছু খাওয়াতো, তুমি কি উঠে আসতে? আর মৌর, তুমি তার আতোমাকে চিনেছিলে ঠিক। ভয় কি তোমার?

তখন আতোমার কথা উঠে পড়ল। নরবু জিজ্ঞাসা করলে, সব জিনিসের কি আতোমা থাকে? আর দাওআ যাতে গল্পেই মন রাখে, সেজন্য তাড়াতাড়ি একটা চাপাটি ভেজে তার হাতে দিলে। দাওআ বললে, বনের আতোমা না বুঝে বনে, পাহাড়ের আতোমা না বুঝে পাহাড়ে, একই রকম হয়। ধোঁকা লেগে যায়। দাওআ হারিয়ে যাওয়া পথে, না দেখা এক বন্য উপত্যকায়, এই প্রথম চলেছে। তার সঙ্গী দুজন এখনও যুবক, যাদের বন ও পাহাড় সম্বন্ধে এখনও উপদেশ দেয়ার আছে। সে সুতরাং এই আতোমার ব্যাপারটার উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে ইচ্ছা করলে। মাঝে মাঝে থেমে, লাকপা যে পাহাড়ী ভাষা বোঝে না তাকে আসুর ভাষাতেও বুঝিয়ে দিতে লাগল। সে প্রথমেই লাকপাকে বললে, জেনানার আতোমা না বুঝে তার জন্য টাঙি আর ধনুক নিয়ে এগোনো যেমন

বেকার। হাতের কাছে পা-ভাঙা মেয়র, তাকেই সে উদাহরণ করতে চাইলে আতোমা না চিনে পাহাড়ে উঠলে. বনে ঢুকলে কীরকম হতে পারে। সে মেয়রকে এক চোখে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললে, বর্ষায় মৌর মৌরীকে ডাকে, নাচে। শীতে? শীতে যদি মৌর ডাকে তবে বলে, চিতা, সাবধান। যদি একলা এক হরিণ ডাকে তাহলেও বুঝবে চিতা। শীতে যদি মৌরের ডাক শুনতে কেউ বনে আসে, বিপদ হবেই।

দাওআ দেখেছিল, তিনদিন থেকে একটা লোক বিট অফিসের এক মাইল গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, কোনদিকে এগোতে পারছে না। রাতে কোন গাছে ঘুমাচ্ছে। সকালে উঠে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছে। তখন তো সেই ঝোরা শুকিয়ে উঠছে, দু আঙুল জল কোথাও, কোথাও এক হাত। দুপুরে গতি কমে যাচ্ছে। গাছ তলায় জিরিয়ে নিচ্ছে। সেই শুকিয়ে ওঠা ঝোরার ময়লা বিস্বাদ জল খাচ্ছে। আর কিছু খাচ্ছে না। পাবে কোথায়? মৌর ডেকে উঠলে কান খাড়া করে শুনছে। উঠে তাড়াতাড়ি চলছে যেন কোথাও পালাবে। কিন্তু হঠাৎ যেখানে বনের মাটি নরম, সেখানে কোথাও গভীর, কোথাও হালকা মানুষের পায়ের ছাপ দেখে ভয় পেয়ে অন্যদিকের বনে ঢুকতে চেষ্টা করছে, ভয়ে সেই পায়ের ছাপ এড়াতে চেষ্টা করছে। দাওআ জানছিল, সেই পায়ের ছাপ সেই লোকটারই, যা সে বুঝতে পারছে না। দাওআ বুঝতে পারছিল, সে লোকটা মৌর ধরার চেষ্টা করা দূরে থাক, মৌরের কথাই ভুলে গিয়েছে। ধোঁকা পুরা। পায়ের ছাপগুলোকে সে কখনও নিজের মনে করে তা ধরে চলেছে, কখনও অন্য কারো তা মনে করে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছে। কিন্তু পায়ের ছাপে ছাপে যে ঘের তৈরি, তার বাইরে ছুটে পালাতে গিয়ে সেখানেও পায়ের ছাপ দেখে ঘেরের মধ্যে ফিরে আসছে। বুঝতেই পারছে না, সেই আগের দিন পালাতে গিয়ে সেই ছাপগুলো তৈরি করছে। সে আর যাই করুক, ঝোরার সেই কাদাকাদা ধারাটাকে ছাড়তে পারছে না। কিন্তু দ্বিতীয় দিন রাতে সে গাছে উঠতে পারলে না। ভুখে তো আছেই, তিয়াসের কষ্ট আরো বেশি। যে ঝোরাকে ভরসা করছে, তারও এমন অবস্থা, আঙুল দিয়ে তার বুক খুঁড়লে পনের মিনিটে এক আঁজলা জল হয়। সে রকম করে দুপুরে একবার সে জল খেলে। তৃতীয় দিনের সকালেও তাকে সেখানে সেরকমই দেখে দাওআ অবাক হল। দ্বিতীয় দিনেই সে ভেবেছিল, সেই পোচার বনের কিছু নেবে না, নিজের প্রাণ নিয়ে পালাবে।

আসলে সেই পোচার যদি বনকে জানতো, তবে জানতো, তার গণ্ডির মধ্যে গাছ থেকে ঝুলে এমন তিনটে লতা আছে, যাকে একটা কোপেই দু টুকরো করা যায়। আর তা করলে পাঁচ মিনিটে তার থেকে এক গেলাস ঠান্ডা জল পাওয়া যায়, একটু কষ্ট আছে, কিন্তু পোষ্টাইও। লোকটার কোমরে তো তখনও একটা ছোরা যা দিয়ে অনায়াসে হরিণের ছাল ছাড়ানো যায়। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যার আগে লোকটা ঝোরার কাদায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। নরবু বললে, দাওআজু, তিমি তিনদিন দেখলেন কিছু পনি করলেন না! লোকটা তিমিকে না দেখলে? তিমি তাকে পাকড়া কবলে বাঁচে যেতো।

সে ভয়ে ভয়ে দাওআর দিকে তাকালে। আর তখন হঠাৎ লাকপার সঙ্গে দাওআর কিছু মিল আছে এরকম মনে হল। দাওআও অসুর নাকি? কোন দয়া নাই!

শর্কি বললে, বনে দাওআজুকে কেউ দেখতে পায় না, বাদামি হলুদে হাঁটু তক পায়জামা, কালো খালি গা, হাতে টাঙ্গি, গাছ আর ছায়ায় মিশে যায়।

দাওআ হাসল। আর কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করল। সে সস্নেহে যেন লাকপাকে দেখে নিল।

বললে, তখন সনঝা হল। মৌর ডাকছে। বোঝা যাচ্ছে, মরা মনে করে চিতা এগোচ্ছে পায়ে পায়ে। বাঁচা, দাঁড়ানো মানুষকে সে এড়ায়, কিন্তু সে রকম পড়ে থাকা মানুষের শরীরকে ভয় কী? কিন্তু দাওআ বুঝেছিল, তা হতে দেয়া যায় না। একবার সে রকম খেলে চিতাটা মানুষখেকো হয়ে

যাবে। সে জন্য মৌরটা আর একবার ডাকলেই, যখন সে বুঝলে, চিতাটা আরও এগিয়েছে তখন দাওআ গাছ থেকে আলাহিদা হয়ে, সেই লোকটার পাশে গেল। কাদায় মুখ গোঁজা, এক হাত খানিকটা বাড়িয়ে মাটির ভিজে জায়গাটাকে ছুঁয়ে আছে। নড়ছে না। মৌরটা তীব্র স্বরে ডেকে উঠলে, সে যেন অন্য হাতের দু একটা আঙুল নাড়ল, যেন মৌরকে তাড়াবে। দাওআ ঝুঁকে কথা বলতে গেল। বনে কেন এসেছে, ভুখ কি না, তিয়াস কি না। দাওআর মনে হয়েছিল, সেই আঙুলগুলো ক্ষীণ ভাবে নড়ল। ক্ষীণ স্বরে যেন মোর যা মোর যা বলে মৌর তাড়িয়ে স্থির হয়ে গেল আবার।

শর্কি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বললে, চিতাকে খেতে দিলে?

তা দেয়া যায় না। গার্ডের ঘরে নিয়ে যেতে হয়। খড়ে শুইয়ে খড়ে ঢাকতে হয়। নিশ্চিত হতে রকসি মিশানো গরম দুধ চামচে খাইয়ে দেখতে হয় আস্তে আস্তে। পরে পাছে মনে হয় বাঁচানোর চেষ্টা করাই হয়নি। তা মনে হলে কষ্ট।

মেয়রের মনে হল, কেউ মরলে দুঃখ নেই। যে মরে সে তো নিজেই মরে। বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়নি এরকম ভাবলেই শুধু কষ্ট। আচ্ছা, এ রকমের চিন্তা কি কোন জাতির বৈশিষ্ট্য? দেখো, দাওআ পাকা চুল আর বিট অফিসরের নতুন পোশাক সত্ত্বেও লাকপার মতোই যেন।

এইভাবে রাতের খাওয়া শেষ করে তারা শুয়ে পড়েছিল। আর তাও এখন ভাবতে গেলে কৌতুক বোধ হবে। খাওয়া শেষ হতেই রকসি–মদ বেরিয়েছিল। বাচ্চা নরবুও তাতে যোগ দিয়েছিল। মেয়র একবার ভেবেছিল, সেও রকসি খেয়ে এদের সঙ্গে মিশে যাবে। কিন্তু তখনি কেউ তাকে মনে করিয়ে দিল, বেহুঁশ অবস্থায় কেউ তাকে দেখবে–এরকম হতে দেয়া যায় না। ঘরের মেঝের কাঠের প্ল্যাঙ্কিংএ যে যেখানে বসেছিল, সেখানেই শুয়ে পড়ল।

খুব সকালেই উঠে পড়েছিল দাওআর দল। নরবু গরম চায়ের গ্লাস নিয়ে বসে ডাকাডাকি করলে মেয়র দরজা খুলে বাইরে এসেছিল। নরবু অনেক আগেই উঠেছে। গতরাতেই সে মেয়রের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিল, তাদের যাত্রার আগে ভাল করে খাইয়ে দিতে হবে, সঙ্গে কিছু ধাঁউসা দিতে পারলে, আরও ভালো। নরবুর চাল, ডাল, পিঁয়াজ, লঙ্কা একসঙ্গে ফুটানো হয়ে গিয়েছে। মেয়র নরবুর পিছন পিছন রান্না ঘরে গেল। নরবু ময়দা মাখা শেষ করেছে, ধাঁউসার আগে সে দাওআদের তিনজনের চা করে দিলে, মেয়র তাদের চা পৌঁছে দিতে গেল।

বাইরের দিকের বারান্দায় তখন দাওআর দল। ইতিমধ্যে তারা দীর্ঘযাত্রার জন্য প্রস্তুত। বড় বড় পিতলের গ্লাসে তাদের হাতে হাতে চা দিয়ে মেয়র একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের পিঠঠু সাজানো দেখছিল। তখন একটা কৌতুক দেখতে পেলে সে। একটা বেতের পিঠঠুতে, সেটাই সব চাইতে বড়, অনেক গাছের চারা। চারাগুলোর গোড়ায় মাটির বর্তুল পাতা দিয়ে বাঁধা। দাওআর সঙ্গী শর্কি একটি একটি চারাকে সাবধানে বার করে যেন তাদের স্নান করিয়ে 'নিচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে যত্নে আর কোমল করে তা সে করছে যেন চারাগুলি সত্যি শিশু। লাকপা হাত গুটিয়ে বসে আছে। তার পিঠঠু গোছানো হয়েছে। বাঁশের মজবুত পিঠঠু। সম্ভবত তার নিজের আর শর্কির জামাকাপড়ের বোঝাগুলোর সঙ্গে কোদালের ফলা, দায়ের ফলা ইত্যাদি নিয়েছে। সেগুলো পিঠঠুর জালি গা দিয়ে চোখে পড়ছে বটে। পিঠঠুর মাথায় সব উপরে একটা ধনুক, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধা গোটা চারপাঁচ তীরও দেখা যাচ্ছে। বিট অফিসার দাওআর পিঠঠুটা খাকি ক্যানভাসের।

যাত্রীরা খেয়ে এলে, নরবু কাগজে জড়িয়ে ধাঁউসা এনে সেগুলোকে দাওআর পিঠঠুতে ভরে দিলে।

রোদ চড়া হওয়ার কথা নয় তখনও। বরং কুয়াশাই, তা যতই হালকা হয়ে যাক ইতিমধ্যে। তা সত্ত্বেও আকাশের দিকে তাকিয়ে, বেলা হয়ে যাচ্ছে অনুভব করে শর্কিকে তাড়াতাড়ি করতে বললে। মেয়র জিজ্ঞাসা করলে, শর্কি বললে, চারাগুলো, ন্যাসপাতি, সন্তরা আর জলপাইয়ের। দেখা

যাবে ওখানে, নুমপাইতে, হয় কিনা।

বোঝা যাচ্ছে, বিট অফিসার দাওআ পরীক্ষা করবে এসব গাছ নুমপাইতে হবে কিনা।

দাওআর সঙ্গে সঙ্গে মেয়র খানিকটা দূর গেল তার প্লাস্টার-ঢাকা পা নিয়ে। তার এরকম এক মতি হল, সেই নুমপাইতে যেখানে আর কেউ থাকে না ফরেস্টের লোকেরা সেই ডলোমাইট দুর্ঘটনার পরে, সেখানে এরা থাকবে, এদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে এদের সঙ্গে মিশে থাকা যায় যদি?

কিন্তু দাওআ বললে, মৌর এবার ফের। এখনই উপরে চড়বো। পায়ে চোট লেগে যাবে। মেয়র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, পথের বাঁকে তাদের অদৃশ্য হতে দেখলে। তার মনে পড়ল, দাওআ বলেছিল, বনে মরে লাভ কি যদি বন মা না হল? তার আতোমাকে চিনলি, সে খেতে দিল। বনের নোকরি কর। বুনো হয়ে যা।

২

কিন্তু শর্কি হেসে উঠেছিল। দাওআ তাকে না হেসে পথ দেখতে বললে, সে বলেছিল, তাই বলে যদি অর্কিড পাড়তে পাহাড়ে উঠে কেউ আছাড় খায়, মানুষ হাসবে না? মেয়র বলেছিল, সাদার মধ্যে লাল দাগ সে অর্কিড খুব সুন্দর ছিল, যেমন ভালো দেখতে, গন্ধও তেমন সুন্দর।

শর্কি বলেছিল, সকালেই আবার সেই নেশা লাগছে নাকি?

ফিরতে ফিরতে মেয়র ভাবলে, রাতে ঘুমের আগে দাওআ কিন্তু আতোমার কথা বলেনি। মেয়রের পা সেট করতে ডাক্তার, সার্জন এদের সাহায্য লেগেছে তা শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, তখনও ব্যথা আছে কি না। তা নেই, কিন্তু রেঞ্জারের কথায় সাবধানে চলে, সে এরকম বললে, দাওআ বলেছিল, সহি বাত। রেঞ্জারের কথা শোনা উচিত।

পরে মেয়র দাওআর গন্তব্যস্থলের কথা চিন্তায় আনলে স্বভাবতই। এই লোকগুলি সেই নির্জন নুমপাই বনে চলেছে। বলিন সাহেবেরও তিন দিন লেগেছিল তাসিলা থেকে সেখানকার পথ খুঁজে পেতে। দাওআ অবশ্য রেনফরেস্ট সামলিং বনেই মানুষ। কিন্তু তা হলেও নিমতিঝোরার সাঁকোর কাছে বিট অফিস ছিল একটা সেই বনে। কিন্তু জনমানবশূন্য আর এক দুর্গম নির্জন রেনফরেস্ট নুমপাইয়ে যেতে দাওআ ছাড়া আর কেউই রাজি হতো না। হয়তো পথ খুঁজে বার করবে, হয়তো ফাটলে গাছ ফেলে সাঁকো করবে, যাতে তিনদিনের পথ একদিনের পথ হয়।

মেয়রের মনে পড়ল, রেঞ্জার একদিন দাওআর মনকে বনের সঙ্গে তুলনা করেছিল। সে ভাবলে, তা বোধ হয় নয়। দাওআ এখন চিতার মন, ময়ূরের মন, গাছের মনের কথা শুনতে পায়।

বাংলোর কাছে ফিরে এসে মেয়র নিমতিঝোরার সেই নির্জন কাঠের সাঁকোটা দেখতে পেলে। দেখো, সেই কাঠের ব্রিজটা চারদিকের সন্ধ্যার লালফেনা-ভাসা কালচে সবুজ অন্ধকারের থৈ থৈ সমুদ্রে একটা নৌকা যার উপরে সেই হিপিরা উঠে বসেছিল। হিপিদের তো দেখলেই চেনা যায়। বিলাইতি সাহেবমেম সব, কটা চুল, ময়লা, অনেক রঙের তালিমারা জামা প্যান্ট, রুখু শুকনো মুখ, পিঠে বিছানার ব্যাগ, যেদিকে চোখ চলে চলে যায়।

রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে শর্কির মুখে শোনা গল্পটা আবার শুনতে চেয়েছিল দাওআর কাছে। তখন দাওআ বলেছিল, জকশন সে ডাঙুয়া যায়েকে নিমতিকা বিরিজকা উপর। ই তরফ পাঁচমিল, উ তরফ রিজাভ ফরেস। তিনজনমে এক জানানা ভি। ওহি হিপি সকতান।

মেয়র আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই ব্রিজের উপরে রাত কাটানোর কথা ভাবছিল নাকি? পথ হারিয়েছিল নিশ্চয়।

আমি তো পুছলেন। তো হাসিয়ে আমাকে বললেন, বায় বায় বায় বায়, বলে দাওআ হাসল। নরবু জিজ্ঞাসা করলে, আর তিমিও হাস করে চলে আইলেন। শর্কি বললে, কখনো না। দাওআ সেই পেড় পে রাত গুজরালেন কি।

মেয়র এখন ভাবলে, কী আশ্চর্য! তারা পোচার স্মাগলারদেব হাতে মরতে পারতো। সেই বনে মহিষ-বাইসন-খাওয়া চিতাও আছে। দাওআ সারাদিনের ক্লান্তিকে ঘুমিয়ে পড়ার আগে হাই তুলে বলেছিল, মেয়রের মনে পড়ল, কা কিযা যায়। আপনা আপনা ডরসে জানবারকে ডররোখা করতেন। কোন চিতা মানুষ খাওয়া হইয়ে যেতেন, ফরেস খেপিয়ে যেতেন।

মেয়র বাংলোর বারান্দায় রোদ দেখে একটা চেয়ারে বসলে। এখনও কুয়াশার দরুণ বেশি দূরে দেখা যায় না। কাল রাতের গল্পে নান্নী, অর্কিড, হিপিদের কথা মিশে যাচ্ছিল। সে হাসল। সেদিন হয়তো আর একটু বেশি কুয়াশা ছিল সকালে, তা সে তো ফেব্রুয়ারিতে, তেমন তখন হতেই পারে। আর এমন হতে পারে, সেই কুয়াশা আর রোদের এগোন পিছনোর জন্য নান্নীকে কখনও গরীব বৃদ্ধা আর কখনও মাঝবয়সী এক সুন্দরী মনে হতে পারে কারও।

কিন্তু সেই হিপিরা, কলকাতার মিউজিয়ামের সামনে ঠাঠা রোদে পাগল পাগল দুজনকে দেখে রাধন যেমন বলেছিল, নেশা। সেই সব ইনজেকশন আর বড়ির নেশায় নাকি পৃথিবী বদলে যায়। ভয়ডর ঘেন্নাপিত্তি কিছু থাকে না। তুমি কে মনে থাকে না।

বুঁচকু বলেছিল, কী লাভ বা? নেশা কমজোরি হতে থাকলে মনে পড়ে যাবে তুমি কে। আর তখন নিজেকে আচমকা চিনে ভয়ও করে উঠতে পারে। ভুলতে নেশা করে কী লাভ?

আর রাধন বলেছিল, বলেছিস! আমাদের ভোলারই বা কী ছিল কবে?

হঠাৎ কুয়াশাটা বেশ খানিকটা দূরে গেল, আর তার ফলেই মেয়র নরবুকে দেখতে পেলে। সে দেখলে, নরবু সামনের লনে এখানে ওখানে ঘাস উপড়ে ফেলছে যেন। যেন কিছু হারিয়েছে, লম্বা লম্বা ঘাস তুলে ফেলে খুঁজছে।

মেয়র কৌতূহলে চেয়ার থেকে উঠলে, সেই কৌতূহলেই নরবুর কাছে চলে গেল। সে দেখলে, নরবু যেখানে ঘাস তুলে ফেলেছে সেখানে একটি দুটি করে সবুজ রঙের উদ্ভিদ, যেন মাটি ভেদ করে ক্ষুদে ক্ষুদে সবুজ তীরের ফলা।

মেয়র জিজ্ঞাসা করলে, ফুলগাছ নাকি? এরকম করে ঘাসের মধ্যে লাগানো হচ্ছে যে?

আমি লাগালাম নাই। উহি লাগল। আইরিস, লিলি। নরবু বুঝিয়ে বললে, তিনদিন আগে রাতে যে বৃষ্টি হয়েছিল, সে জন্য মাটির নীচে যে আলু ছিল তারাই মাথা তুলছে। সময় ঠিক বুঝে নেয়।

মেয়র ভেবে দেখলে, লনের সামনের দিকে ফুলের পরিচর্যা করতে এই প্রথম দেখছে সে নরবুকে। বাংলোর পিছন দিকে কাঠ আর জালের তৈরি সেই ঘরের চালার নিচে নরবু টবে অনেক ফুল গাছ লাগায়। তা তো বটেই, নতুবা রিনিমেমসাহেব এলে ফুল কোথায় পাওয়া যেতো।

মেয়র বললে, তা হোক চলো, এখন আর একবার চা খেয়েনি। সারা দুপুর পড়ে আছে ঘাস ছিঁড়তে।

নরবু চা করতে গেলে, ঠিক মুখে রোদ পড়ছে বলে সে সরে বসতে গেল, আর তার ফলে পায়ের প্ল্যাস্টারটা চোখে পড়ল। আরও আটদশ দিন, এমাসের শেষ পর্যন্ত, ডাক্তারের নির্দেশ মানলে, রাখতে হবে। ব্যথা সাতদিন পরেই ছিল না। আর ব্যাপারটা হাসির যদি শর্কির কথা মনে রাখো। ফেব্রুয়ারির শেষেই সে সুস্থ হয়েছিল, কিন্তু এ যেন গুটিতে আটকে থাকা, সময় না হলে কেটে বেরোবে না। তুলনাটায় সে নিজেই অবাক হল। গুটি মানে তো যাতে শুঁয়ো ঢুকে প্রজাপতি হয়। অর্থাৎ নতুন জন্ম, না মরে।

সে নিজের এই আবিষ্কারকে ঠাট্টা করে হাসল। কিন্তু মনের মধ্যে হাতড়ে এক তুলনা যোগাড়

করে সে অবাকও হল। নরবুর লিলি আর আইরিস যেন।

নরবু চা নিয়ে এসে মেয়রকে চা দিয়ে নিজের গ্লাস নিয়ে মেয়রের চেয়ারের কাছে বারান্দার মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল রোদে।

নরবু চা খেতে খেতে বললে, দাওআ তিমিকো মৌর বলছে, আর শর্কি বলছে মোর।

মেয়র সন্দিগ্ধ চোখে নরবুকে দেখে নিয়ে পরে বললে, তুমি বা কি ভাল বলতে পারো? তুমি তো মেইয়ার বলো। আর লাকপা কোন ভাষাই বলতে পারে না।

কিন্তু চা খেতে খেতে নরবু শিউরে উঠল। এরকম, যে মেয়র জিজ্ঞাসা করলে, কী হল?

নরবু তার পাহাড়িতে বললে, চিরকাল বিয়ে না হলেও সে লাকপার মতো বিয়ে করতে চায় না। মরতেই বসেছিল, এক চুলে বেঁচেছে।

মেয়র বললে, জখমের চিহ্নগুলো সে রকমই বটে। কিন্তু অন্য অন্য জাতের মেয়েদের তুলনায় লাকপার বউরে ভালোবাসাও হয়তো অন্যরকম।

কথাটা সে হালকাভাবে বললে, কিন্তু ভাবতে হল তাকে। আর ভাবতে গিয়ে সে অবাকও হল। কোন কোন ভালোবাসা কি এত গভীর যে অনেক দিনের পুরনো পৃথিবীর গভীর থেকে ওঠে? নাকি তা বনের ছায়া ছায়া আধ-অন্ধকারের নৃসংশতা, ভয়, আতঙ্ক, বিস্ময়–এসবে মিশে এক গভীর স্বাদের হয়? মনের নিচে নিচে যে আর এক মন, যদি তা থাকে, যেমন পোস্টমাস্টার বলেন, তেমন গভীর হতে পারে? কিংবা মনে করো, নেশা ছেড়ে যাচ্ছে, ভয় করছে, নেশা টানছে, যেমন রাধন বলেছিল, হিপিদের তখন যে ভালোবাসার দরকার। দরকারই তো, নতুবা হিপির দলে স্ত্রীলোকেরা কেন? সে ভালোবাসাও হয়তো নেশাই যা আরও গভীর।

নরবুও কিছু ভাবছিল, যেন অর্ধস্ফুট স্বপ্ন। সে তার পাহাড়িতে বললে, বউ আনতে গিয়ে পুরুষটাই যদি মরে, কিংবা যাকে নিয়ে পালাচ্ছে সেও যদি সঙ্গে সঙ্গে মরে? জাতটাই লোপ পায়, যেমন ওরা হচ্ছে।

মেয়র বললে, তা বোধহয় নয়রে, নরবু। খুব কষ্ট ওদের। তবু অন্যাকে দেখে বদলায় না। যেন হরিণ হরিণই থাকবে, চিতা চিতাই থেকে যেতে চায়। আমার মনে হয়, ওরা এক কোন বড় যুদ্ধে হেরে গিয়ে, এখন এরকম।

এ সময়ে রোদ সরে সরে যায়। মেয়রকে আবার সরে বসতে হল। আর তার ফলে ভোরে যেখানে শর্কি বসেছিল, সেখানে কয়েকটি চারাগাছকে যেন পড়ে থাকতে দেখলে। সে নরবুকে ডাকলে। নরবু এলে তাকে দেখিয়ে বললে, দেখ, শর্কি ভুলে ফেলে গিয়েছে।

নরবু ঝুঁকে দেখে বললে, ভুলে যায়নি, কমজোরি তাই ফেলে গিয়েছে। সন্তরা মালুম হোতা।

খুব চিনিস! কমলার বলছিস এই চারা?

জু।

মেয়রের কৌতূহল বাড়ল। একটা চারাকে হাতে নিয়ে দেখলে। একটা ডাল ভাঙা, পাতা মিইয়েছে, গোড়ার মাটির বর্তুল ভেঙে যাওয়াতে কচি শিকড় চোখে পড়ছে। সে বললে, আচ্ছা নরবু লাগিয়ে দেখবি? যদি বাঁচে।

নরবু বললে, কমলার গাছ বেশ বড়ই হয়। যত বড় হয় শিকড় তত নিচে নামে, সেখানে জল না পেলে ফল হয় না। চামুর্চিতে থাকার সময়ে সে দেখেছে।

ভারি জানিস! বাংলোর পিছন দিকে যে ইউক্যালিপটাস, অর্জুন, এসবের চাইতে বড় হয় কমলা? তোর মাটির নিচে মরে থাকা আলু থেকে যদি লিলি হতে পারে, এই গাছগুলো তার চাইতে কম মরেছে। লাগিয়ে দিই চল। এখানে পাহাড়ে তত মাটি কোথায়? কিন্তু শিকড় নিচে যায় না, ডাল ভাঙা গাছও এখানে ব্যাঁকাত্যাড়া হয়ে বাঁচে। দু-একজন ছাড়া কার বা শিকড় এখানে মাটি পায়?

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে নরবু আবার তার লিলি আর আইরিসের খোঁজে গেল। মেয়রের ইচ্ছা হল, কেন সে জানে না, সেই সবুজ ত্রিভুজগুলির ভূমি ভেদ করে ওঠা দেখতে। সেও তেমন দু-একটি করে মাটি থেকে সদ্য উদ্ভিন্নতা দেখে তাদের নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে থাকলে। অবশেষে বললে, একরাতের বৃষ্টিতে যদি এরকম হয়ে থাকে, স্টোররুম থেকে আগুন নিবানোর স্টিবাপ পাম্প আর নল নিয়ে এসে, বৃষ্টি করে দে। সেই আঠারো উনিশের নরবু তো সব সময়েই নতুন কিছুকে খোঁজে, সুতরাং প্রায় এক ঘণ্টা ধরে লনটার উপরে কৃত্রিম বৃষ্টি করলে।

দুপুর যখন শেষ হচ্ছে, তখন তার মনে হল হাটে যাওয়া দরকার। আজ তাসিলার হাট। সে রকম বলে সে মেয়রের কাছ থেকে টাকা নিয়ে হাটে গেল।

বারান্দাটা সারা দুপুর রোদ পেয়েছে। শীত নেই সেখানে আর। মেয়র সোজা রোদ না বসে বারান্দায় রাখা পুরনো ইজিচেয়ারটার উপরে বসল।

তার চোখের সামনে বাদামিতে, বেগনিতে, সবুজে আঁকা পাহাড়ের গায়ে সেই রূপালি ব্রিজ। দৃশ্যটা অল্পপরিসরে সুন্দর। একটা অনেক রঙের সিল্কের কানাত যেন, যার এপাশে সে আরাম করতে পা ছড়ালে, তাতেই প্লাস্টার কাস্ট বলো, গুটি বলো, চোখে পড়ল। সে তার মনটাকেও সেই কানাত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল। তার মনে হল, এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা, যে সে আর এই নির্জন বাংলো কানাতটার এপারে। চারদিকে হাত পঞ্চাশ করে গেলেও আর একজন মানুষও নেই।

তার এই অ্যাকসিডেন্ট বরং তাকে যেন অনেক মানুষের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। যারা এখন নেই, পোস্টমাস্টার, রেঞ্জার। যেন সে তার ফলে অন্য আর এক রকম হয়ে যাচ্ছিল। যেমন বই পড়া। সে আশ্চর্য হল, তার বই পড়া!

একদিন বই পড়া নিয়ে পোস্টমাস্টার বেশ মজার মজার কথা বলেছিল। একদিন কেন? সেই আদিম রবীন্দ্রনাথের কথা বলার পাঁচ-সাতদিন পরে আবার একদিন তার বই পড়ার কথা তুলেছিল। বলেছিল, একটা সাত আট বছরের ছেলে যার প্রাইমারি জ্ঞান আছে, অথচ ব্যাকরণ বাকবিধিতে যে অজ্ঞ, সেও কি আবেগগুলিকে চেনে না? বলবেন, সেগুলো অস্ফুট। যাকে ফুটে ওঠা বলা হয়, সে তো ভাষার কাজ।

তখন রেঞ্জার তার পুরনো যুক্তি দিয়েছিল, যে অন্য অনেক বই পড়েনি, সেকি উপন্যাস পড়ে বুঝবে, তাও কুমুর চিন্তা আর আবেগ?

কিন্তু পোস্টমাস্টার ছাড়ার লোক নয়। বললে, মা কাকে কী বলছে, সাত আট বছরের একটি মেয়ে কি সব কিছু বুঝে নিতে পারে? তা হলেও বুঝতে পারে, মায়ের কণ্ঠস্বরের তারতম্যে ধীরে ধীরে বাড়ির কোন পুরুষের সঙ্গে তার মায়ের কী রকম সম্বন্ধ। তাই বা কেন? নো বডি ইজ এ হিরো টু হিজ ভ্যালে। ভ্যালেরা লেখাপড়ায়, সংস্কৃতি সফিস্টিকেশনে তার নিয়োগকারীর অনেক পিছনে থাকে, তা সত্ত্বেও সে কি এক সময়ে গৃহকর্তার লাভ-অ্যাফেয়ার্স সব বুঝে ফেলে না?

হ্যাঁ, অন্তত কথা বলতে পারে পোস্টমাস্টার। সেই যে তারও এক রকমের গাছ চিনতে পারা ; যদিও সে চেনা রেঞ্জারের, যে বৈজ্ঞানিক, তার চাইতে অন্য রকম চেনা।

মেয়র, তাকে তো কাল রাতে দাওআ মৌর বলেছে, আর শর্কি বলেছে মোর। অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। সে বুঝতে পারছে না, পাহাড়গুলো যে কানাতের দৃশ্য সৃষ্টি করেছে তাতেই বইয়ের কথা মনে আসছে কি না। খোলা বইয়ের পাতা কানাতের মতো কিছু তৈরি করে যায় যার পিছনে লুকানো যায়, লুকিয়ে ভাবা যায়। সেদিনই সেই হলুদ মলাটের চটি ইংরেজি বইটা এনেছিল আবার পোস্টমাস্টার। এটাতো উপন্যাস আর সোজা করে লেখা। দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী, মাছ ধরার

গল্প। আর দেখো রিনিমেমসাহেবের নাম ফ্লাইলিফে।

সে ভাবলে, আর সে কিনা হদ্দবোকার মতো পোস্টমাস্টারের জেরায় বলে ফেলল, কুমুর দুঃখ হয়তো সব মেয়েমানুষেরই। কেমন যেন আটকে পড়ে যায়, আর তারপরে তাদের সন্তানদের মানুষও করতেই হয়। নিজের কথাটা এখন মনে ফিরিয়ে এনে সে অবাক হল। যা বলেছিল, তা কি সত্যি?

কিন্তু, সে আরও অবাক হল, কে বলেছিল কথাটা? তা হলে শুঁয়োপোকার মতো, যখন দেখা যাচ্ছে না, তখনও সে জীবিত। কিংবা নরবুর আইরিস-লিলির মতো মাটির তলায় ঘুমন্ত আলু হয়ে থেকে যায় কেউ।

তার বুকটা দ্রুত চলতে লাগল। নিশ্বাস নিতে হাঁপাতে হল। সে ডান হাতটাকে বুকে রাখলে। সেজন্য সে জামার নিচে সোনার হারটাকে টের পেলে। বোতামটা খোলা ছিল। সে সোনার চিকচিকও দেখতে পেলে।

৪

বোমাটা ফাটল, যেমন করে বোমা ফাটে। আর রাধনই চিৎকার করে উঠল, পালা পালা, মোর, লোম চার্জ করছে ভদ্দর লোকেরা। আর সেও সেই বোমা এড়াতে গড়িয়ে গড়িয়ে গেল। চারিদিকে ধোঁয়া। গুড়গুড় একটা শব্দও। তাহলে আর একটা বোমা? সে স্প্রিং-এর মতো মাথা উঁচু করলে। মাথার পিছন দিকটা ফেটে গিয়েছে?

ঠং ঠং। ওহ। কাপলিং লাগল গাড়ির। তাই বলে, একেবারে দুঃস্বপ্ন বলা যাচ্ছে না। মাথার পিছন দিকটায় বেশ লেগেছে, সে জন্যই ধোঁয়া ধোঁয়া। নতুবা শীত-কুয়াশার সকালে কামরার জানলাগুলো বন্ধ থাকলে যেমন হয়। বরং কম। দরজাটা এপাশে, দেখো, আধখোলা, তা দিয়ে বরং সকাল সকাল ভাব।

কিন্তু দরজাটা? রাতে তা হলে বন্ধ করা হয়নি নাকি? কী সর্বনাশ! চুরি গিয়েছে নাকি? রাইফেলটা? যা নাকি কনস্টেবলের গায়ে লোহার চেনে বাঁধা থাকলেও চুরি যায়। উঠতে গিয়ে--এসব কিছু ঘটে যেতে দু তিন সেকেন্ডের বেশি দরকার হয় না, সে লক্ষ্য করলে, তার কোমরে সাদায় বেগনিতে দাগটানা বেশ বড় একটা তোয়ালে লুঙ্গির মতো জড়ানো যা পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে, আর এক হলুদে পশমী কম্বলও তার গা থেকে খসে পড়ছে। সেই কম্বলও তার নিজের নয়। বেঞ্চের উপরে, যেন হাওয়াতে মেলে দেয়া, তার কোট প্যান্ট। মোটা সার্জের ফরেস্টের কোট আর ট্রাউজার্স। তার পাশে তার কাঁধে ঝোলানো ঝোলা যার উপরে তার রাইফেলটা। ভয়ে সে স্তম্ভিত হতেও ভুলে গিয়েছিল। রাইফেলটাকে ছুঁতে পেরে সে অবাক হল যেন।

কিন্তু তারই বা কী উপায় যে সে অবাক হয়ে ভাবে। গাড়িটা নড়ে উঠে তার শরীর আর মনকে কর্মঠ করলে। জামা আর প্যান্ট পরে ফেললে সে তাড়াতাড়ি। শীত করে ওঠে এমন ড্যাম্প তখনও সেগুলি। (তখন তো মাঝ-ফেব্রুয়ারির শীতের সকাল ছিল, ভাবলে এখন মেয়র, বুকে সর্দি বসার সম্ভাবনা ছিলই।) কিন্তু রাইফেলটাকে কাঁধে ঝোলালে সে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতেই। সে ভেবেছিল, কম্বল আর টাওয়েল কামরাতেই ফেলে যাবে! টাওয়েল ঝোলায় গেল। রাগটাকে ভাঁজ করে কাঁধঝোলার উপরে দুপাশ দিয়ে ঝুলিয়ে ঝোলাটাকে কাঁধে তুলেছিল সে।

ততক্ষণে পায়ের তলায় গাড়ির মেঝে শিরশির করছে, থৈ থৈ করছে, গুড়গুড় করছে। পয়েন্ট পার হয়ে গাড়ি স্টেশন ছেড়ে যাবে কি? ঘড়ি দেখলে, সাড়ে সাত। ট্যাং ট্যাং করে ঘণ্টা বাজল।

স্টেশনে ঢুকে পড়ছে কি গাড়ি? পিঁ পিঁ গার্ডের হুইসিল, আব জোরদার এঞ্জিনের ভোঁ। ট্যাং ট্যাং করে আবার ঘণ্টা। তা হলে গাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে স্টেশন। স্টেশনে প্যাসেঞ্জার না থাকায় লেট করা ট্রেনকে থ্রুপাস দিচ্ছে নাকি?

কামরার খোলা দরজাটার কাছে গিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল। যেন দেখবে, সে কিছু ভুলে ফেলে যাচ্ছে কি না। সে নিচু হয়ে বেঞ্চদুটোর তলা দেখে নেয়ার চেষ্টা করলে। অবাক! চকচকে লালচে কী একটা ওদিকের বেঞ্চের নিচে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, নতুন জিনের স্যুট। সুতরাং সেই জিনকে ঠেলেঠুলে কাঁধঝোলায় ভরে দরজায় এসে, এমন কি হ্যান্ডেল ধরে পাদানিতে পা দিয়েও আবার তাকে ফিরতে হল। সে খুব তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আগে লক্ষ্য করেনি। যেখান থেকে জিনটা নিয়েছে তার কিছু বাঁ দিকে ওটা কি একটা অত্যন্ত চকচকে সোনার হার নয়? সোনার? বেশ মোটা চেইন আর অল্প আলোতেও চকচক করছে। সে হারটাকে হাতে করে প্রায় চিৎকার করে উঠল। সোনার? সে কোটের পকেটের ঢাকনা খুলে তার ধুকপুক বুকের উপরে হারটাকে লুকিয়ে ভাবলে, কার এটা? কামরায় দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে স্টেশনের বাইরের কোন জোড় পার হচ্ছে গাড়ি। দুলছেও। এবার বোধ হয় আরও স্টিম দেবে। গতি বাড়বে। বাড়ছেই। তখন কি ভাবার সময় কার সেই হার হতে পারে, মনে সন্দ সন্দ ভাব আসলেও? বাঁয়ের বুক পকেটে, ধুকপুক করছে বুক, তার উপরেই হারটাকে রেখে ছুটন্ত গাড়ি থেকে নামার ব্যবস্থায়, ঝোলা আর বন্দুক দুই কাঁধে, হ্যান্ডেল ধরে পাদানিতে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল সে প্ল্যাটফর্মের অনেক বাইরে। সেখানে নেমে পড়ার জন্য সমতল জমি চাই।

আর মনের মতো সমতল পেতেই অভ্যস্ত কৌশলে কেমন আলতো, সেই ছুটন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে।

তখন তো দু-পাই সুস্থ। ঝাঁকি লাগার ভয় ছিল না। তাকে কেউ দেখল না, এমন নয়। রেললাইনের পাশে পাশে পায়ে চলা পথ দিয়ে চলতে চলতে সে মুখ তুলে দেখেছিল ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পয়েন্টের মুখে সবুজ ফ্ল্যাগ হাতে সেই পোর্টারকে, যার লিকলিকে গলার উপরে করোটিহেন মুণ্ডুতে কদমকেশর-হেন সাদা চুল, যার সাদা ঝোলা গোঁফ, যার নাম ঘষিরাম আদক।

সে কাছে এলে ঘষিরাম আদক বলেছিল, নাশশা গরেগ থিয়ো কি?

উত্তরে হাই তুলে সে হাঁটতে শুরু করেছিল।

নাশশা সে নিশ্চয় করে নি। তার চাইতে অনেক বড় ব্যাপার। সে যখন ঘষিরামকে দেখেছে, তার কথা শুনেছে, তখন ব্যাপারটাকে আর স্বপ্ন বলে ভাবা যায় না।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। সামনে সে আর দিনের আলোর কানাত দেখতে পাচ্ছে না। বরং যেন এক পড়ে যাওয়া আলোয় একটা পুকুর। তার অর্থ এই হয়, নরবুর সেই লিলি আইরিসের লনে এখন আর আলো নেই, আবার তার অর্থ এই যে সূর্য বাংলোর পশ্চিমের সেই সাজানো বনের বড় বড় গাছগুলোর ওপারে গিয়েছে, হয়তো বা আরও পশ্চিমের সেই উঁচু রিজটার ওপারে নেমে পড়ছে।

আশ্চর্য, এমন কী ভাবছিল সে? কী কী বিষয়ে এত ভাবনার ছিল এতক্ষণ, যে দিনের এমন বদলে যাওয়া বুঝতে পারেনি। নরবুর সেই আইরিস আর লিলির মরেও না মরার কথা! নাকি হিপি আর তাদের ভয়ঙ্কর কোন জায়গায় আশ্রয় ভেবে আটকে পড়ার কথা! অথবা লাকপাদের সে আদিম গভীর ভালোবাসার কথা!

সে দেখলে, কী ভাবছিল তা খুঁজে বার করতে গেলে, আবার তো গোড়া থেকেই ভাবতে হয়। বরং পুকুরটা...

...বারহারোয়া রেল স্টেশনের বাইরে সেই জল কমে যাওয়া পুকুরটার পাশে তিন হকার। সেই কাদারঙের জলে ছোট ছোট ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা ঝুপ ঝুপ করে পড়ছিল আর পানকৌড়ির মতন সাঁতরাচ্ছিল। সেই হকাররা পুকুর দেখেছে, কিন্তু কখনও জলে নামেনি। কলকাতার পথের হাইড্রান্টে জল পেলে, কিংবা খুব সকালে ট্রেনের ট্যাপে, কিংবা ক্বচিৎ কখনও গাড়িতে জল দেয়ার ওয়াটার কলামে অনেক রাতে, স্নান হয় তাদের। একবুক জল কাকে বলে, তা যদি জানতো! তো রাধনই জিজ্ঞাসা করলে, জলে তো ডোবার কথা, ভাসছে কি করে? বুঁচকু বললে, খুব সোজা। যেখানে ডুবতে যাচ্ছো সেটা পার হলে, আবার ডুবছো, আবার পার হলে। যে পইন্টে ডোবার, বারবার সেটা পার হয়ে যাচ্ছো না? রাধন বললে, খুব বলেছিস, নাম স্লা জলে, বোঝা, পইন্ট কাকে বলে?

মেয়রের মুখে হাসি দেখা দিল। কিন্তু নিমেষে সে হাসি সন্দিগ্ধ হল। জলের ব্যাপারে বুঁচকুর কথা মিথ্যা হতে পারে, বর্তমানের মধ্যে কিন্তু তেমন সব পইন্ট থাকে, যেন হাঁ করা সব ফাঁক, যা পার হতে না পারলে, তলিয়ে যেতে হয়, কত গভীরে তা তুমি জানো না।

৫

সে উঠে পড়ল। লনটা সত্যি এমন কিছু পুকুর নয়। সে তার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ব্রিজে গিয়ে দাঁড়াল। ব্রিজের ওপারের রাস্তাটা ক্রমশ বাজারের দিকে উঁচু হয়ে চলতে থাকায়, সেখানে এখনও আলো আলো ভাব। বলতে পারো, রাস্তাটার উচ্চতার জন্য ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলো পাচ্ছে, যেমন গাছের মাথায় এ সময়ে আলো থাকে, গোড়ার দিকে নীল নীল অন্ধকার হয়ে গেলেও। তাই বলে রাস্তার ওপারের ছোট বড় কোন বাড়িতেই এখনও কেউ আলো জ্বালেনি।

সে ভাবলে, পইন্টে পইন্টে বর্তমানের মধ্যে ফাঁকগুলো পার হয়ে হয়ে গেলেই হয় না। রাধন, বুঁচকু কেউই ধরতে পারে নি, বর্তমানের গায়ে সে ফাটল থেকে নিচেকার কালো উঠে পড়ে অতীতের। তা স্বাভাবিকই। নৌকার ফাটলে জল উঠবেই।

যেমন বুঁচকু, রাধন, মোর সকলেই যেন সেই নৌকায় উঠে বসে।

বুঝে দেখো, সে নিজেকে বললে, মোর কি মরেছে? যতই মোর যা, মোর যা, বলে থাকুক কেউ মরে যেতে যেতে, যেমন দাওআ তার গল্পে বলেছিল, মোর একেবারে মরে যায়নি। সে যদি মরে গিয়ে থাকতো, তবে সেদিন কে শুনেছিল সেই সকালের রেলগাড়ির কামরায়, বোমচার্জ করছে, পালা মোর, আর কে তা শুনে সতর্ক হয়ে সেই বোমচার্জকে এড়াতে গড়িয়ে গিয়েছিল বেঞ্চ থেকে।

সে একটু হাঁপাল। তার মুখ তত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বলে বোঝা যাচ্ছে না তার চোখের তখন কীরকম চেহারা হয়েছে।

সে হাসবার চেষ্টা করলে, মরবে কি করে যদি মাটি ভেদ করে গতবৎসরের মরা আইরিস আর লিলি আবার বেঁচে ওঠে?

যাক, তা হলে বাড়িগুলোতে একটা দুটো করে আলো জ্বলছে, তা হলে ফরেস্টকলোনির স্ট্রীটলাইটিং জ্বলে বর্তমানকে এনে ফেলবে।

ওটা দূরে রাস্তার বাঁধারে মনবাহাদুরের দোকান মাদার গাছটার নিচে ; সে গাছে ইতিমধ্যে দিনের বেলা লাল লাল ফুল দেখা যায়।

ওখানেই সেই ব্যাপারটার সূচনা।

তখন ডিএফও আসছেন রিনিমেমসাহেবকে নিয়ে তাসিলায়। তাসিলার ফরেস্ট কর্মচারীদের নতুন ইউনিফর্ম ইস্যু করা হচ্ছে। চেহারায় স্মার্ট হতে বলা হচ্ছে। মেয়রের বেলায় একটু বেশি হয়েছিল। রেঞ্জার বললেন, তোমাকে মেয়র, হয়তো সাহেব আর মেমের কাছে কাছে থাকতে হবে বাংলোয়। তোমার চুলদাড়ি এ বারোমাসে হিপিদের মতো হয়েছে। এখানে আমরা কেউই বড় চুলদাড়ি রাখি না। তখন সে মনবাহাদুর নাপিতের কাছে গিয়েছিল। আর তার দোকানের বাইরে বসে চুল ছোট করতে করতে কাঁধের উপরে উঠলে, মনবাহাদুর বলেছিল, দাড়িগোঁফ বিলকুল বাদ তো? সকলেই সেরকম করছে। তখন মেয়র বলেছিল, না একটু ঢাকা থাক। তখন মনবাহাদুর বলেছিল, ছবির মতো করে দিলে হয়। সে একটা ক্যালেন্ডার এনেছিল। তা দেখিয়ে মনবাহাদুর বলেছিল, কানের কাছে থেকে এক আঙুল হয়ে নেমে চিবুকে দু-আড়াই আঙুল চওড়া হয়ে আবার সরু হতে অন্য কানে উঠবে। ইম্পিরিয়াল বলে। সেটাই মনে ধরেছিল মেয়রের। রিনি চলে যাওয়ার পরে ব্যবস্থাটার অসুবিধা ধরা পড়েছিল। সেই ইম্পিরিয়ালের নতুন চেহারা ঠিক রাখতে দুদিন পরপরই মনবাহাদুরের কাছে গিয়ে বসতে হয়। সে তখন স্থির করেছিল ইম্পিরিয়ালও নয়, হিপিও নয়, আর পালিয়ে বেড়ানো সেই মোরের মতোও নয়। একেবারে নতুন চেহারা করে নেবে সে। মাস দুমাসে একবার চুল ছেঁটে, আর রোজ নিজে দাড়ি চেঁছে নিলে চলে যাবে। সেও এক নতুন চেহারা হবে। সে আশ্চর্য হল। কী অদ্ভুত ব্যাপার যে সেই হিপি হিপি চুল দাড়িতে সে মোর হয়ে যাচ্ছিল, তা সে নিজে ধরতে পারে নি। আয়নার সামনে দাঁড়াতো না তখন, সে জন্য?

অন্ধকারের মধ্যে থেকে নরবু দেখা দিল।

এত দেরি যে?

হাটে অনেক নতুন মানুষ, গপসপ ভয়েক কি।

আচ্ছা, আলো জ্বাল গে। আচ্ছা নরবু, অনেকদিন রেঞ্জার সাহেবের কাছে যাসনি। কাল ভোলি বিহানে যাস। আর জিজ্ঞাসা করিস, মেয়র এখন বাইরে বেড়াতে পারে কি না। পায়ে ব্যথা নেই! বুটের বদলে স্যান্ডাল পরবে, হাতে লাঠি থাকবে, কাঁধে রাইফেল, আর পিচপথ ধরে বাজার পর্যন্ত যাবে আসবে।

তেস্ত হুন্দই না।

কেন এরকম হবে না?

তিম্রো খুট্টাকে পট্টি কাটনু পড়ছ।

পায়ের প্লাস্টার কাটতে এখনও দিন দশেক দেরি। অ্যাকসিডেন্ট থেকে গুণে গুণে ৪৫ দিন রাখতে হবে। নরবু চলে গেলে মেয়র ভাবলে। ব্রিজে সে দেখতে থাকল, স্ট্রীটলাইটিং জ্বলল, অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে গায়ে মিটমিট আলো জ্বলে প্রমাণ করছে, সেখানে কারো না কারো বাড়ি।

অনেক ঘুরেছে মেয়র রাতের অন্ধকারের আধ-অন্ধকারের তাসিলায়। তখন তাসিলা ঘুমিয়ে থাকে। ফরেস্ট অফিস, কলোনি, এদিকে পোস্টঅফিস হয়ে বাজারে ওঠার রাস্তার অনেকাংশেও স্ট্রিটলাইটিং, কুয়াশার মধ্যে দূরে কোন রেলস্টেশনের মতো দেখায়।

অন্য রকমও হয়। মৃদু স্ট্রিটলাইটিং থেকে সরে গেলে, সীমা নেই এমন অন্ধকার চারিদিকে। কোথায় তুমি আন্দাজ করাও যায় না। উপরে কালচে আকাশ। গাঢ় এত, যেন ভেলভেটের সামিয়ানা। তাতে কাচের বলের মতো তারা সব, হলুদ, নীল এমনকি দুধসাদা। সেদিকে চেয়ে থাকতে নিজের কথাও মন থেকে চলে যায়। কারণ, সেই আকাশ মনের মধ্যে ঢুকে যেখানে যত ফাঁক সব ভরে দিতে থাকে।

সব রাত সেরকম হয় না। বনের মধ্যে গাছের ফাঁকে ম্লান হলুদের আভাস লাগা ফিকে কালো অন্ধকার থাকে, কখনও পাতাকাটা ছায়া পড়ে পায়ে। আবার অল্প আলোর ছাই রঙে ছেয়ে গেলে

মনে হয় উপত্যকা জুড়ে একদর্শ জন্তু পা গুটিয়ে, ককুদ জাগিয়ে বিশ্রাম করে নিচ্ছে। আর এক রাতে কুয়াশা আর আলোর তারতম্যে উপত্যকাটাকেই বাদামি-হলুদ, খয়েরি হলুদে আঁকা প্রান্তর মনে হচ্ছিল, আর সে প্রান্তরে শুয়ে থাকা বসে থাকা, মাথা হেঁট করে খুঁজছে কিছু, ক্লান্তিতে হাঁটুতে মুখ গুঁজেছে—এমন কোন পুরুষের পিঠ, কোন স্ত্রীলোকের উন্মুক্ত উরু, কোন শিশুর কান্নায় প্রসারিত মুখ—এসব দেখেছিল। সে রাতে সে অনেক উপরে উঠেছিল। রোপওয়ে যাকে ঘিরলিং স্টেশন বলে, যা তৈরি হতে হতে হয় নি, সেখানকার সেই প্রকাণ্ড তিব্বতী সিংহটার কাছে উঠেছিল। আর সেই রাতে এমন হয়েছিল, তার মন বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে তার চোখের সামনেই চুঁইয়ে, ছড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

নরবু অনেক আলো জ্বেলেছে। তার আভা মেয়রের গায়ে এসে পড়ল। সে বাংলার দিকে ফিরল। আর তার মনে হল, এখন আবার সে মেয়র হয়ে যাচ্ছে। দাওআর সেই জঙ্গলের মৌর, ময়ূর নয়। কিংবা ওরা সে যেরকম উচ্চারণই করুক, বর্তমানের যে উপত্যকায় সে, তাতে সে নিজের মনে তো ময়ূরই, পিকক বলতে পারে।

কিন্তু বর্তমানের এই উপত্যকাও কিন্তু সবজায়গায় এক রকম নয়। একরাতে ফরেস্ট কলোনির স্ট্রিটলাইটিং এর নিচে যেমন হয়েছিল—হঠাৎ মনে হয়েছিল, ময়ূরেরও পায়ের ছাপ পড়ছে, যেমন মোরের নাকি পড়েছিল সামলিং-এর বনে, যা দাওআ দেখেছিল। পায়ের ছাপ পড়তে থাকলে মনে হয়, কেউ তোমাকে অনুসরণ করছে।

সে বিষণ্ণভাবে হাসল, মনে মনে বললে, তো ময়ূর, এখন বাংলোয় যেতে হয়। চা খেতে হয়। রান্না করতে হয়। ভাবতে হয়, চাকরির বা কী হল।

নরবু ইতিমধ্যে চা করেছে। মেয়রের রান্না করার কথায়, সে বললে, নেহি মৌর সার। এস্ত হুন্দই না। আইলে পোস্টমাস্টার সাহেবলাই ভেটেক। তিয়ো ভন্নু ভয়ো কি মেইয়র সাহাব কো আঁখাপে রাখছস।

কী বললি? মেইঅরকে চোখের উপরে রাখতে বলেছে? তুই এক রকম ভাষায় কথা বল। কেন, পোস্টমাস্টার সাহেব কি মনে করেন মেয়র হাওয়া হতে যাবে?

মেয়র চা নিয়ে নিজের শোবার ঘরে চলে এল। নরবু ইতিমধ্যে আলো জ্বালিয়েছিল। ঘরটা বাংলোর পশ্চিমদিকে হওয়ার সেদিকের সেই বন আর তার পিছনের স্ট্রিটলাইটিং-এর আলোও চোখে পড়ে কাচের বড় জানালাটায়। মেয়র ঘরের আলোটাকে বরং নিবিয়ে দিল। আর তার ফলে সেই বনের গাছগুলোও এগিয়ে এল, আর কয়েকটি পল্লবের ছায়া জানলার কাচে পড়ল। যেন বনটাই ঘরে ঢুকে পড়তে চাইছে। কাচটা আর কতক্ষণ আটকাবে!

তো, পায়ের ছাপ পড়ে বটে, আর সে এক বাধা হয়ে দাঁড়ায় শেষে। প্রথমে হয়তো উদ্দেশ্য থাকে, পায়ের ছাপ মুছে মুছে চলা, যাতে অনুসরণকে এড়ানো যায়। ফলে এমন হতে পারে, এক পায়ের ছাপের ধাঁধায় ঢুকে, যখন ফেরার চেষ্টায় সেই নিজের পায়ের ছাপে পথ চিনতে চাও, তখন অজস্র সেই পায়ের ছাপের মধ্যে কোনটা যে ধাঁধার মুখ তো বোঝা যায় না। দাওআই প্রমাণ। সে নিজের চোখে দেখেছে। কয়েকদিন থেকেই সে লোকটিকে গভীর বনে দুএক মাইলের গণ্ডির মধ্যে নিজেও পায়ের ছাপের মধ্যে পাক খেতে দেখেছিল। অসংখ্য পদচিহ্ন, সংখ্যায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় যা বাড়ছিল, কোনটা বা টাটকা কোনটা বা পুরনো, বোঝা যাচ্ছিল না। কোনটা সেই পাকের মুখ তাও বোঝা যাচ্ছিল না।

সে ভাবলে, কিন্তু উপায় ছিল কি? বোঝাই যাচ্ছে, সেই রিজার্ভ ফরেস্ট আড়াআড়ি পার হওয়া নতুন লোকের পক্ষে, বিশেষ সে যদি অন্য মানুষদের এড়িয়ে চলতে চায়, আরও বিশেষ সে যদি বনের আত্মাকে না চেনে, যেমন দাওআ বুঝেছিল, সে এক অসম্ভব চেষ্টা।

উপায় ছিল না। জংশন স্টেশনে মাঝরাতেব আধ-অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে ঘুরতে ঘুরতে, তখন তো সে গোঁফদাড়ি কামিয়ে, ক্রিকেট টুপি কপাল পর্যন্ত টেনে নামিয়ে, নতুন লাল ডোরাদার শার্ট পরে, যাত্রীরা যেখানে আধ-ঘুমন্ত রেলের বেঞ্চগুলোতে, তার থেকে দূরে দূরে দরজা বন্ধ করে রাখা অফিসগুলোর সামনে সামনে ঘুরছিল। আর তখনই হঠাৎ ফটোটা মোরের চোখে পড়েছিল।

দেয়ালের গায়ে কাচের বাক্সের মধ্যে, যাব গায়ে রিফ্লেকটার দিয়ে আলো ফেলা হয়েছে, সারি সারি ফটো। সেই বন্ধ দরজা রেলপুলিশের বটে। একই গ্রুপ ফটো। কী আশ্চর্য! ওরা ভাবে নাকি, সেই ফটোগুলোর কেউ ফটোর মুখোমুখি হয়ে নিজেই এগিয়ে গিয়ে বলবে, অনেক হয়েছে ছুটোছুটি, নিন মশায়, আমিই আপনাদের লোক! নাকি যাত্রীরাই এসব ঘুরে ঘুরে দেখে, আর ফটোর লোকদের কাউকে দেখতে পেয়ে জিআরপিতে হাজিব কবে বলবে, নিন, মশায, আপনাদেব হারানো লোক, এখনই জেলেই পাঠান কিংবা বাড়িতে, আপনাদেব ইচ্ছা।

উপায় ছিল না মোরের। প্যাসেঞ্জার না চিনুক, সে তো চিনতে পেরেছে। আর কী আশ্চর্য এতদূর এসে গিয়েছে সেই ফটো!

মোরদের সেই দর্জি যার কাছে গোড়া থেকে হকারির ডালা, ইদানীং বাব কয়েক মেয়েদের বাহারি ঝোলানো ব্যাগ, দু একটা হাত ঘড়িটরি জমা রাখতো, সেই বলেছিল, পালা তোরা রাধন, পুলিশ তোদের সেই গুরুপ ফটো পেয়ে গেইচে আমার ঠেঁয়ে। আর তারা সেই রাতেই গা ঢাকা দিতে এক একজন এক এক দিকে সটকে পড়েছিল।

তৃতীয় দিনেই মোর বুঝতে পেরেছিল, সে পথ হারিয়ে ফেলছে সেই অগম্য বনে। সব কিছুই ভার লাগছিল। বনে ঢুকতে গিয়েই তার মনে হয়েছিল, বনে ক্রিকেট টুপি বেমানান। তখনই সেটাকে ত্যাগ করেছে। তা সত্ত্বেও সব কিছুই ভার লাগছে তার তখন। পরের দিন তার শখের ক্রিকেটারদেব মতো সোয়েটার যার দুই হাতা স্টাইল কবে গলায় পেঁচানো ছিল, তাও এক ঝর্নার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। তার বাহাদুরি ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। আটচল্লিশ ঘণ্টায় সে শুধু ঝর্নার জল খেয়েছে। কিন্তু এ কী বন? পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত গিয়েছে নাকি? অথবা সে কি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে?

পথ হারানো আবার কী কথা? পথ জানা থাকলেই তবে তাকে হারানোব কথা বলা যায়। সে তো পায়ে চলা পথ যা কয়েক ফুট গিয়ে মুড়ে যায়, তার ধোঁকাদারি। তা ছাড়া, ক্লান্তি, হতাশা, বনের ধোঁকাদারি ছাড়াও আবও শত্রু আছে। সেই দর্জিই, কখনও যার নাম এছমাইল খলিফা, বলেছিল, সে পুলিশেব কাছে শুনেছে, অন্য হকার আব কোন কোন প্যাসেঞ্জার নাকি বলেছে, দলটা ছোরা বার করলে, দলের নেতা নাকি হাত তুলে উৎসাহ দিচ্ছিল, বাধু, রাধা, এমন কী নামে ডেকে, যেন ফুটবল কোচ, সেই নেতা নাকি বেশ লম্বা। কোচের মতো উৎসাহ দেয়া দূরের কথা, সাউথ সেকশনেব সেই মাঝরাতের ট্রেনে মোর রাধনকে ছোরা চালাতে নিষেধ করছিল। মোব, বোধ হয়, সেই বনে পথ হারিয়ে বুঝতে পাবছিল, সে সেদিন আতঙ্কে রাধনের নাম না করলে, পুলিশ তাদের রাধনের দল বলে চিনতে পারতো না।

ছমাস পরে তাবা আবার একত্র হয়েছিল। রাধনের কথায়, দু-তিনদিন হয় সে খালি গাড়ির সাইডিংএ ভাঙ্গাচোরা মালগাড়ির আড়ালে ভিখারির মতো বাস করছে। কী চেহারা! এক মুখ দাড়িগোঁফ, ছেঁড়া জামাকাপড়, চোখ গর্তে বসা। তৃতীয় দিনে বুঁচকু আসতে দল পূর্ণ হয়েছিল। সে নাকি এরই মধ্যে অন্য দুজনের খোঁজে এই স্টেশনে, আর সাইডিংগুলোতে দুতিনবার এসেছিল আরও। সেখানেই রাধন শেষবারের মতো রসিকতা কবে বলেছিল, তুই শ্লা, মোর, এই ভদ্দরলোকের শরীল দিয়েই ডোবালি। বুঁচকু বলেছিল, সে খুব ভেবে দেখেছে, আগে অ্যাকটিনি না করে ছোবা ধরাই ভুল। আর তারপরের দিন সেই মালগাড়ি এসে পাশের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তেই, সেই ভদ্রলোকের মতো যুবকেরা এসেছিল। আর তাবপর সব শেষ হল। মোর পরে অনেক ভেবেছে।

তার ধারণা হয়েছিল, পোলটিকস আর পোলিংএ কাজ না করে হকারি টকারি করে সুবিধা নেই।

ঠিক সন্ধ্যায় সেই ভদ্দরলোকের ছেলেরা এসেছিল কাপলিং টপকে টপকে, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাশ থেকে টর্চ জ্বেলে, হুইসিল বাজিয়ে রেল পুলিশ। ঠিক যেমন দিনের বেলায় শাসিয়ে গিয়েছিল। রাধন কয়েক পা ছুটে পজিশন নিতে গিয়ে, পুলিশ দেখে, চিৎকার করে বললে, বাঁয়ে কাট শ্লা। কয়েক পা সেদিকে গিয়ে আবার বললে, বোম চার্জ করছে, মোর, পালা শ্লা। মোর চিৎকার করেছিল, হার মান রাধু, পারবিনি, ওরা পোলটিকসের ভদ্দরলোক। গুলি চলছে পুলিশের। বোম চার্জ হচ্ছে। সেই সময়ে ছুঁড়ে দেয়া বোম টপকে রাধনকে সাহায্য করতে ছুটেছিল বুঁচকু।

নরবু এল। ঘরে আলো জ্বলছে না দেখে, আলো জ্বালবে কি না শুনে নিয়ে, সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। জিজ্ঞাসা করলে, আইলে খানে কি?

কেনরে? এত রাত হয়েছে নাকি? আচ্ছা তুই টেবিলে রাখ। আমি যাচ্ছি।

নরবু চলে গেলে ময়র ভাবলে, কী যেন দুঃখ হচ্ছিল তার? রাঁধন আর বুচকুর কথায় দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু সে তো এক রকমের সুখই। ফুটপাতের ধুলোয় তৈরি। এখন ভোজবাজির শেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরের টেবলে মুখোমুখি খেতে বসে মোর বললে, তুই তো দাওআর গল্প শুনেছিলি। সেই যে যে লোকটা মোর যা, মোর যা, বলতে বলতে কাদায় মুখ গুঁজল, সে—কী সে? ও, না। আসলে, তোকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম কে ফোটায় তোর লিলি?

মাহিনা। নরবু কিছুক্ষণ ভেবে বললে।

মাস? জল নয়? সময় বলছিস?

নরবু একমত হয়ে মাথা দোলালে।

কিন্তু আবার, দেখ, মাসকে ফুটো করেই ওরা ওঠে না? বর্তমানকে ফুটো করে গতবছর থেকে আসছে না?

নরবুর সন্দেহ হল, সে বুঝতে পারছে না এই বাংলা কুরা, হুনছ বলে, চুপ করে যাওয়া ভালো।

ময়র কিছু পরে বললে, আসল কথা নরবু, কাল সকালে রেঞ্জারের কাছে যেতে হয়। অফিসে যেতে হয় কিনা, জিজ্ঞাসা করতে হয়। বেতনের কী হবে, জানতে হয়। জানতে হয়, এই প্লাস্টার কয়েকদিন আগে কেটে নিয়ে রাতে রাতে আবার পথে বেরোন যায় কি না। কাল সকালে নিয়ে যেতে পারবি না? তা ছাড়া আবার চুলদাড়ি কেটে নিতে হয়। মুখে কেমন ঝোলা গোঁফ না? আবার আগের মতো ইম্পিরিয়াল করে নিতে হয় না? না বুঝে হুনছ বললেই হবে না। এসব মিলেই যা হয়, তাকে বর্তমান বলে।

৬

পরের দিন সেরকমই হয়েছিল। চা খেয়েই, কুয়াশা একটু কমলেই, ময়ূর আর নরবু রেঞ্জারের কাছে গিয়েছিল। রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা হতেই, ছুটির কথা, অফিসে যাওয়ার কথা, পায়ে প্লাস্টার থাকার অসুবিধার নানা কথা বললে তাকে। রেঞ্জার কোথাও যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন। সে শুনে বললে, ডাক্তারের মত নেয়া দরকার, বোধ হয় ডাক্তারকে দিয়েই কাটিয়ে নিতে হয়। আর কাটার আগে এক্সরে করে নেবে কিনা সেই সার্জন, তা আমি জানি না। আজকের দিনের এক সুবিধা আছে। আমি জংশনে যাচ্ছি। নারেঙ্গিহাটে ট্রেলার জিপটাকে থাকতে বলেছি। তুমি এখান থেকে নারেঙ্গিহাট পনিতে যেতে পারবে? ভেবে দেখো। সার্জনকে তোমার স্নানের অসুবিধা, প্লাস্টারের

মধ্যে চুলকানোর কথার সঙ্গে, তোমাকে জংশনের হাসপাতালে নেবার গাড়ি যোগাড় করার অসুবিধার কথা বলেও, সার্জনকে সময়ের চার পাঁচদিন আগে প্লাস্টার কাটতে রাজি করানো যাবে কি? মিথ্যা বলছো না তো?

আস্তাবল থেকে দ্বিতীয় পনি আনিয়ে নিয়ে মেয়রকে সঙ্গে নিয়ে রেঞ্জার রওনা হয়েছিল। পথে জাকিগঞ্জে থেমেছিল তারা। মিস্টার ও মিসেস ডিএফওর কৌতুহল ছিল। তারা নিচে নেমে এসেছিল মেয়রকে দেখতে। রেঞ্জারের কাছে শুনতে রিনি বসু বললে, এটা খুব ভালো কাজ হচ্ছে রেঞ্জারের, দেখো তো, কী রকম রুগ্ন দেখাচ্ছে সেই ময়ূরকে। কিছু মনে করো না, মেয়র। তুমি মেয়র বটে কিন্তু সন্দেহ করি, তোমার ভোটের বয়স হয়েছে কি না।

এ সবই হয়তো প্লেজেন্ট ননসেন্স, সেই নিস্তব্ধ নিস্পৃহ বন্য জগতে নিজেদের মতো একটা শব্দের জগৎ তৈরি করে নেয়া। কিন্তু রিনিমেমসাহেব সেই ট্রেলার জিপে কেক আর এক ফ্লাস্ক কফি তুলে দিয়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে তারা তাসিলায় ফিরেছিল। ডিএফও নাকি রেঞ্জারকে বলেছে, মেয়রের চাকরির অবস্থায় আর্নড লিভ আর অ্যাডভান্স মেডিক্যাল লিভ দেয়া যায়।

রাতের খাওয়ার পাট চুকতে রাত নটা হল। নরবু শুতে যাওয়ার আগে খোঁজ করতে এসে দেখলে, মেয়র ওভারকোট পরেছে, রাইফেল আর টর্চ পাশে। লাঠিটাও অদূরে।

সে জিজ্ঞাসা করলে, মেয়র আজই বেরুচ্ছে কিনা রউন্দে। মেয়র বললে, খুব সাবধানে অল্পসময়ের জন্য, আর বুটের বদলে চপ্পল পরবে সে।

মেয়র হেঁটে দেখেছে সার্জনের ঘরে, এমনকি সার্জন তাকে মেঝে থেকে চেয়ারে দাঁড়াতে আর চেয়ার থেকে সোজা মেঝেতে নামিয়ে পরীক্ষা করেছে, ব্যথা লাগে কিনা। তা হলেও সে ব্রিজ থেকে নেমেই স্থির করলে পিচের সোজা পথ ধরে যতদূর যাওয়া যায়। বেশি নয়।

সেভাবে সেই অন্ধকারে চলতে গিয়ে সে ভাবলে, মেয়রের মধ্যে সব সময়েই যেমন এক ময়ূর থাকে, এই অন্ধকারে এই এক সুবিধা, অতীতের মতো অন্ধকার আবার বর্তমানও। এমন নয় বর্তমানকে বিদীর্ণ করে অতীত আসে।

আমরা বলতে পারি, এটা আমাদের একুশ বছরের এক ময়ূরের, যাকে মেয়র করা হয়েছে, সেই চেষ্টা, যখন সে অতীত, অন্ধকার চৈতন্যস্রোতে নিজেকে সমর্পণ না করে, সাঁতরে এক তরঙ্গ-বিক্ষোভ থেকে নিজেকে পৃথক করতে চায়।

সেই তরঙ্গবিক্ষোভটা, যাকে সে আসতে দেখছে দুর্নিবার ভাবে, তা এক ক্লাস নাইনের ছাত্রের, যার নাম ছিল মুরারিকৃষ্ণ, মুরারিকৃষ্ণ রায়।

মেয়র তখন হাঁটতে হাঁটতে পোস্টঅফিসের সামনে এসে পড়েছে। এতক্ষণে একবার মাত্র টর্চ জ্বেলেছে। সে নিজেকে বললে, কেউ মরে না। বাগবাজারের সেই নতুন ডাক্তারকে রাধনই ডেকে এনেছিল। সেই যাচ্ছিল আর জি করের দিকে, আর সে দেখে বলেছিল, এখনই হসপিট্যালে নিয়ে এসো, ভরতি করে নেবো। যাকে দুহাতে গলা টিপে ধরে এক ঝটকায় মেরে ফেলা যাবে মনে হয়েছিল, দিন সাতেকে হসপিটালের সেই মুরারিকৃষ্ণ বেডে উঠে বসলে, রাধন আর বুঁচকুই বলেছিল, থালে শ্লা মোর বেঁচে গেল, মাইরি।

বেডে উঠে বসা পর্যন্তই। আর জি করের জেনারেল ওয়ার্ডে তখন বেলা আটটার আলো ঢুকছে নানা বিচিত্র দুর্গন্ধ নিয়ে। একেবারে দেয়াল ঘেঁষা বেডে উঠে বসেছিল সে। তখনও ডিহাইড্রেশন। নিশ্চয় হলুদ রং। আর কিছুই মনে পড়ছে না। সে দেখছিল, বেডের পায়ের দিকে তার বয়সেরই দুজন কিছু না বলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছেও। যেন তাদের সঙ্গে যেতে বলছে। তখন তার মনে হয়েছিল— সে নিজে কে? ওয়ার্ডমাস্টার বলেছিল, এ কে? কী এর নাম

ঠিকানা? পুলিশের কেস কি? এসব না জানলে ছাড়ছি না। আর তখন রাধন সাহস করে বলেছিল, বডিটা তো আমরাই পেয়েছি। আমরাই এনেছিলাম ঠেলায়। পুলিশ কোথাকে এর মধ্যে? রাখতে হয় রাখুন। খাওয়ান, পরান। কিন্তুক বডিটা আমাদের।

কিন্তু সেই ডাক্তার এসেছিল দশটায়। সে বলেছিল, ছেড়ে দিন। কতদিন বেড আটকে রাখবেন? টেম্পোরারি অ্যামনেশিয়া। কংকাশানের দরুন বিপদ নেই আর। যেতে দিন। সে ভেবেছিল, ডাক্তার তার রক্তহীনতার কথা বলছে। তখন ওয়ার্ডমাস্টার আধঘণ্টার মধ্যে তাকে বেশ নির্দয়ভাবেই চলে যেতে বলেছিল। যে নিজেকেই ভুলে গিয়েছে সে কি এ জীবনে আর বেড ছাড়বে? ওয়ার্ডমাস্টারই রাধনদের ফিরিয়ে এনে বলেছিল, নিয়ে যা তোদের বডি। আর তারা বলেছিল, ওই মরা আমাদের কে বললে? আর ওয়ার্ডমাস্টার চোখ গরম করে বলেছিল, দাঁড়া, পুলিশকে ফোন করি, পুলিশ এসে বুঝবে বডিটা কাদের? রাধন আর বুঁচকু ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল আর সেও বুঝেছিল, কী হয়েছে কে জানে, কাকে সে খুন করতে গিয়েছিল, পুলিশের হাতে পড়ার চাইতে পালানো ভালো। তার তো মনে পড়ছেই, কাউকে সে খুন করতে চেষ্টা করছিল।

সে রাধন আর বুঁচকুর পিছনে হাঁটতে শুরু করেছিল। বুঁচকু বলেছিল, দেখো, মরাটা ঠিক পিছনে আসছে।

রাধন বলেছিল, আসুক। পাঁচমাথার ফলপট্টিতে ঢুকে কোন চায়ের দোকানে বসিয়ে দিয়ে কাট। পাঁচমাথার নটা-দশটার ভিড়ে ওই মরা কাউকে খুঁজে পায়!

সে রকম হয়েছিল। তার হাতে একটা আপেল ধরিয়ে দিয়ে, ফলপট্টির ভিতরে পালিয়েও রাধন দেখেছিল, সে তাদের পিছনে ঠিক আসছে। বুঁচকু বলেছিল, ওকে কোন খাওয়ার দোকানে বসা। খেতে থাক। আমরা কাট করি। সে রকম হয়েছিল। রাধন চাওয়ালাকে রুটি আর চা তাকে দিতে বলে দাম মিটিয়ে দিয়ে কাট করেছিল।

চা খেয়ে সে ফলপট্টির গোলকধাঁধায় সে কিছুক্ষণ তাদের খুঁজেছিল, তারপর সে বুঝেছিল দুর্বল শরীরে বেশি চলতে পারবে না। ক্রসিংটা পার হতে হতে কিন্তু তার সুবিধা হয়েছিল, তার মনে পড়ল এই দিকেই সে জায়গাটা, পৃথিবীর সবচাইতে ভালো জায়গা। যেন তার সব কষ্ট সব যন্ত্রণা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছিল, যেন তার শরীর হালকা হয়ে যাচ্ছিল, যেন নিজের পায়ে না দাঁড়ালেও সে কোথাও সুন্দর একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে।

সে জায়গাটার খোঁজে হাঁটতে লাগল আপেল কামড়াতে কামড়াতে।

রূপসী পাঠিকা, সেই মুরারিকৃষ্ণ সেবার তো সব বিষয়ে প্রায় নব্বুই পার্সেন্ট মার্কস পেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। আর সে দিনটা ছিল তার প্রাইজ। হেডমাস্টার বলে দিয়েছেন, যারা প্রাইজ পাবে তারা যেন সকাল আটটার মধ্যে স্কুলে পৌঁছে যায়। পড়া আর স্পোর্টের প্রাইজ তো বটেই, ষোলর নিম্নের ছাত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদেহী বলেও একটা প্রাইজ পাবে সে। শিক্ষকেরা বেশ গর্বিত। তারা বলাবলি করে, অনেক দিন বাদে তাদের এক ছাত্র, আবার হয়তো কেউ, পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে দাঁড়াতে চলেছে। এসবই সেই ছাত্রের গত এক বৎসরের অমানুষী পরিশ্রমের ফল। পরিশ্রম আর মনঃসংযোগ। ব্যায়াম শুরু করতেই মাস্টারমশাইদের মধ্যে সব চাইতে টল অঙ্কের টিচার সুখেন বাবুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভলির চাপ মারতে, বাস্কেট বলে স্কোর করতে পেরে, সহপাঠীদের সকলকে ছাড়িয়ে লম্বা হয়ে যাওয়ার অস্বস্তিটা নেই।

সুতরাং সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে, তার ক্ষুদে পড়ার ঘরে বেঞ্চের মতো সরু কাঠের চৌকিটায় তার সেই শতরঞ্চি আর বালিশের সংক্ষিপ্ত শয্যা গুটিয়ে তুলে, তার গেমস টিচারের ভাষায় স্ট্রেচিং, বেনডিং আর সাইডিং করে নিয়েছে, যতক্ষণ না ঘামে নেয়ে উঠেছে সে। গেমস টিচার কোন সময়ে এ ডিবিশনের প্লেয়ার ছিল বটে, কিন্তু মুরারি জানতো তখনই, কোমর না ভেঙে

ডাইনে বাঁয়ে কাৎ হয়ে মাটি ছোঁবার চেষ্টা কবাকে সাইডিং বলে না। ওটা একেবারেই মনগড়া শব্দ।

মেয়র পোস্টঅফিস ছাড়িয়ে টর্চ ফেলেছিল, আর সে জন্যই পোস্টঅফিসের উপরের রিজে ওঠার পাকদণ্ডিটাকে দেখতে পেলে। উঠতে উঠতে সে ভাবলে, বয়স্ক লোকেরা কত ভুল করে বেশ গম্ভীর মুখে, তা কিন্তু সব সময়ে, ছোটদের দৃষ্টি এড়ায় না ; যদিও বয়স্ক লোকেরা ভাবে, তাদের ভুল ধরা পড়ছে না।

বয়স্কদের ভুল, তাদের অন্যায় ছোটদের চোখে ধরা পড়ছেই। মুরারিকৃষ্ণেরও পড়তো। কিন্তু এরকম চিন্তার এক রকমের ঢিলেমি থাকে, যা থেকে সব সময়েই দূরে সরে যেতে চাইতো। কারণ ঢিলে দিলেই মনে নানা রকম চিন্তা ঢুকে যায়। ক্লাস এইটের গোড়া থেকে, এমন কি ক্লাস সেভেনের পুজোর বন্ধর পর থেকেই, পড়া, পড়া, আরও মনকে সব দিক থেকে গুটিয়ে এনে এক লক্ষ্যে বাখা, যেমন পড়ার বাইবে গিয়েও ভলির বলটাকে, বাস্কেটবলের বাস্কেটের গোল ফাঁদকে, রাইফেল শুটিংএর টার্গেটে বেঁধে বাখা। কিন্তু পড়া, নয় ব্যায়াম, নয় প্রফেশ্যনালদের মতো স্পোর্টসের সাধনা। আশ্চর্য, যন্ত্রণা কেমন এক প্রাইজের সার্থকতা আনে।

সে, সুতরাং, আলো ফুটতে না ফুটতে কলতলায় গেল তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধোয়া, স্নানটান সেরে নিতে। সূর্যের টাটকা আলো চাবদিকে ছড়াচ্ছে তখন। আর সে আলোয়, কলকাতায় সে তার গোঁসাইদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে। গোঁসাই দা, মহীগোঁসাই, যে কম্পানির ফোরম্যান, যে নাকি মুরারিকৃষ্ণব পিসির ছেলে। সেও হাত মুখ ধুতে এসে থাকবে ঘুম থেকে উঠে। মুরারিকৃষ্ণ ভাবলে, আজ তাবই দরকাব বেশি, সেই আগে কলতলাকে ব্যবহার করবে।

কিন্তু হঠাৎ মুরারি থেমে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। যেন সে স্টপার ব্যাক, খেলার শুরুতে বিপক্ষের আক্রমণ বুঝে নিতে চেষ্টা করছে। তার পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক ভঙ্গি। কারণ ফুটবল সে ক্বচিৎ খেলে। গোঁসাইও দাঁড়িয়ে রইল।

গোঁসাইদা. .

বলো।

সেই মহীগোঁসাই এর মুখ হাসি হাসি, যেন মধুর ভাষায় কোন ধন্যবাদ আশা করছে। যেন নিজেও সে মধুর হওযার চেষ্টা কবছে। তার শরীরটা নিশ্চয় সুন্দর, সোজা, বেশ টল, ছ ফুটের উপরে, চল্লিশেও মোটা নয়, গায়ের রং সুগৌর, টিকলো নাক। ভালো মাইনা পায়। প্রমাণ, গায়ের ফাইন সিল্কের গেঞ্জি, কোমরে জড়ানো মস্ত সুদৃশ্য বাথটাওয়েল। এ বাড়ির খোলা কলতলায় মানায় না।

মুরারি একেবারে তাব মুখোমুখি, তার চোখে চোখ রেখে, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টোপা টোপা ঘাম যা ব্যায়াম শেষে একবার মুছে ফেলেছিল সে, তা আবার এখন তার মুখে কপালে ফুটছে। পাঠক, মুরারি তখন দেখছে না, সেও সোজা, বেশ টল, ছ ফুটই প্রায়, হালকা পেটা শরীব, সুগৌর রং, টিকলো নাক। তার খালি গাযে বুকের চামড়া থেকে থেকে লাল হয়ে উঠছে।

সে কেমন করে যেন হাসল, কেমন নিস্পৃহ গলায় যেন বললে, তোমাকে আজ একসপেক্ট করিনি, অন্তত আজ, প্রাইজের সকালে।

গোঁসাই বললে, সে জন্যই তো। প্রাইজ বলেই, তোমাব জন্য নতুন জেনুইন জিনের স্যুট আনলাম তামার বিভেট দেয়া। আসতে অনেক রাত হয়ে গেল কিনা তাই...

অনেক রাত হযেছিল বুঝি আসতে, তাই ফেরার গাড়ি পাওনি? স্বরটাকে অদ্ভুতভাবে নামিযে আনলে মুরারি। সে স্বব সঙ্কুচিত হয়ে আরও শক্ত হল।

সে নিজের কানেই চটাস কবে চড়ের শব্দটা শুনতে পেলে, কিন্তু নিজের ডান হাতটাকে বাঁ হাতে চেপে ধরে চড়টাকে থামালে, বললে, তোমার লজ্জা করে না, মহিন, অনেক রাতে ফেরার

ব্যবস্থা ছিল না আজও?

লজ্জা কেন? গোঁসাই হে হে করে হাসল পর্যন্ত।

মুরারি তাড়াতাড়ি করে ঘরে চলে এল। ঘরের ঠিক মাঝখানে, যেন বা পথের জোড়ে পথ না পেয়ে, দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পথ খুঁজে না পেয়ে হাঁপাতে লাগল।

মুরারিকৃষ্ণ শুনতে পেলে, অদ্ভুত এক চেরা গলায় রান্নাঘরের দরজায় দাড়িয়ে মহী নালিশ করছে, তাই বলে, লতা, তোমার ছেলে আমাকে অপমান করবে? কী ক্ষতি আমি করেছি আমি তাদের?

সে শুনতে পেলে, তার মা বলছে চাপা গলায়, কাল রাতেই বলেছিলাম, ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে এখন, রাতে থেকো না, ওদের মনে কিছু হতে পারে।

তার মা দৈ আনিয়ে রেখেছিল পুত্রের শুভযাত্রার সময়ে টিপ পরিয়ে দিতে, সে এক হাতে মুরারির জলখাবার, অন্য হাতে দৈ-চন্দনের বাটি নিয়ে মুরারির ঘরে ঢুকে দেখেছিল, মুরারি তার পুরনো জামাকাপড়ে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত হচ্ছে।

ফ্যাকাশে মুখে মা বললে, প্রণাম কর, আশীর্বাদ করি, আজ একটা দৈয়ের টিপ দিতে হয় কপালে।

কী অদ্ভুত, কী অবাক, কী যে তা বলা যায় না। মুরারি কি কেঁদে উঠবে? এতদিন, এ দেড়-দুই বৎসর, সে স্কুলে যেতে মায়ের দুপায়ে ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসে মা এই শব্দটাকে উচ্চারণ করেছে। আর তাইতে তার রাইফেলের টার্গেটে বলো, তার পড়ায় বলো, শূন্য দিয়ে উড়ে আসা বলে নির্ভুল আঘাত করায় বলো—সবেরই মনঃসংযোগ। তার সঙ্গীরাও জেনে ফেলেছে। ম্যাচের খারাপ অবস্থায় বলেছে, সামাল মুরারি, নয়তো মা বলে চাপ মারিস।

মুরারি প্রণাম করতে না পারলেও, তার মা তার কপালে দৈয়ের টিপ দিয়েছিল, আর তখনই মুরারির মনে হয়েছিল, কী আশ্চর্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা মেয়েমানুষ, যার চোখদুটি বড় হতে পারে, যার গায়ের রং চল্লিশেও সোনালি হতে পারে, কিন্তু যার পাছা কী নির্লজ্জভাবে স্ফীত আর স্থূল, কী নির্লজ্জভাবে এক স্ত্রীলোক।

হাতের পিঠে কপালের দৈ-চন্দন মুছে ফেলে মুরারি তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কোন প্রাইজের সময়েই বার বার তার নাম ডেকে, মাইকে ঘোষণা করেও পাওয়া গেল না তাকে।

সুন্দরী পাঠিকা, এখানে আবার আপনাকে কিছু বলা দরকার। একদিক দিয়ে দেখলে, আমার চরিত্রগুলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করা হচ্ছে। মুরারিকৃষ্ণের জননী তো অতীতের কথা—বলা যায় বর্তমানে লুকিয়ে থাকা বুঁচকুর সেইসব পইন্ট যা পার হয়ে যেতে না পারলে তলিয়ে যেতে হয় অতীতে, সেই বর্তমানের নরম তুষার হালকাভাবে পার হতে না পারলে তলায় যে কালো, কষ্টের, দমবন্ধ করা অতীত তাতে ডুবে যেতে হয়। সুতরাং চরিত্রগুলো যখন তাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে, তখন তার কথা বলা কেমন হবে? বিশেষ এসবই তো তাদের চৈতন্যস্রোতের অন্তঃস্রোত যা এড়াতে তারা প্রাণপণ করে। যেমন মেয়র এই রাতে রাইফেল কাঁধে, প্লাস্টার-করা পায়ের দরুন লাঠি হাতে, ধীরে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই দিয়ে চলেছে, তখন একবারও সে অতীতে যেতে চাইছে না। তার সামনে কালো সিল্কের পর্দা যার গায়ে গভীরতর কালো দিয়ে, হলুদের কয়েক বিন্দু দিয়ে যেন ছবি আঁকা, সিল্ক না বলে কামদার ব্রোকেডও বলা যায়, তারই পর্দা। তা দেখেই সময় কেটে যায়।

অন্যদিকে এটা এক রকম আধুনিকতা। সত্যের বিভ্রম তৈরি না করে উপন্যাসের চরিত্রগুলোর কোথায় দড়ি সুতো বাঁধা আছে, যার টানে তারা চলাফেরা করে, তা জানিয়ে দেয়া।

অসকার ওয়াইল্ডের ধারণা ছিল, সাহিত্যের কলাকে জীবন অনুসরণ করে। আপাতত এটিকে প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপরীত মনে হয়, কারণ এরকম হওয়াই সঙ্গত যে জীবন ও সমাজের প্রতিবিম্ব হয় কলা। আবার জীবন যদি সাহিত্যকলাকে অনুসরণ নাই করবে, তবে সমাজনেতারা কেন সে

প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে নির্দেশ দেবেন, যা পাঠ করে উন্নততব মানুষ-সমাজ তৈরি হবে। তারা সাহিত্যের চরিত্র অনুসরণে মানুষের জীবন হবে, এরকম আশা করেই তো এরকম নির্দেশ দেন।

আমাদের এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের এরকম এক উপন্যাস আছে, যা নিজেই বিখ্যাত ছিল বলে তাকে সিনেমাও করা হয়েছিল। সেই উপন্যাসে কলকাতার উপকণ্ঠে বাসকারিনী এক শিক্ষিতা ও সুন্দরী নায়িকা ছিলেন। সম্ভবত তিনি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। সেই উপকণ্ঠেই একদল বেকার যুবকও ছিল। অর্থাৎ উপন্যাসের সেই নগর উপকণ্ঠ সে রকমই যেখানে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার বাস করে, উপকণ্ঠটিকে বস্তি বলা যায় না, কারণ বাড়িঘরগুলি ইট ও সিমেন্টের, পথগুলি সংকীর্ণও হলেও পাকা, যেখানে কিছু লোক চাকরি করে, কিন্তু অনেক বেকার যুবকযুবতীরাও থাকে। এই বেকার যুবকদের বর্তমান সমাজকে বদলানোর প্রবল ইচ্ছা ছিল, কারণ সমাজ তো তাদের প্রতারিতই করছে। কিন্তু সব সময়েই উন্নতমানের চিন্তা ধরে রাখা যায় না। সুতরাং বেকার যুবকেরা অবসর সময়ে উপকণ্ঠের সুন্দরী যুবতীকন্যাদের টিজও করতো, বিরক্ত করতো, অশালীন মন্তব্য ছুঁড়ে মারতো। আমাদের স্কুলের সেই শিক্ষিকাকেও এরকম উত্যক্ত করা হতো। কিন্তু তাঁর এক মহৎ আদর্শ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সব মানুষের মধ্যেই মহত্বের বীজ থাকে। তিনি স্থির করলেন, সেই উত্যক্তকারী বেকার যুবকদের দলপতিকে তিনি ভালোবাসবেন, বিবাহ করবেন, এবং সে ভাবে তার মনে যে মহত্ব আছে তার বিকাশে সাহায্য করবেন। সেবকম করেছিলেন বলেই উপন্যাসের আর সেই উপন্যাসভিত্তিক সিনেমার খ্যাতি।

মুরারিকৃষ্ণের জননী সুলতা উপন্যাসের নায়িকাকে অনুসরণ করেই যেন, নগরের এক উপকণ্ঠে বাস করতো, সেই উপকণ্ঠকে ইট কংক্রিটের বস্তি না বলে সাবার্বিয়া বলতে হয় কারণ তার এক বিদেশ-ঘেঁষা ইংরেজি নাম ছিল, কিন্তু সে সাবার্বিয়া অবশ্যই এমন নয় যে প্রশস্ত পথের ধারে কমপক্ষে এক একর বাগান, কৃত্রিমবন, লনের মধ্যে পৃথক পৃথক বাড়ি। বরং কলকাতার কাছেই যেমন হয়, প্যাঁচ খেয়ে চলা অল্প পরিসর রাস্তার ধারে নানা বয়সের ঘেঁযাঘেঁষি বাড়ি। সেই উপকণ্ঠে চাকুরে স্ত্রীপুরুষ দুপুরে কলকাতায় চাকরি করতে গেলে কিংবা বিদ্যার্থী-বিদ্যার্থিনীরা বিদ্যালয়ে গেলে উপকণ্ঠ শান্ত হতো। সকাল ও সন্ধ্যায় বোঝা যেতো সে উপকণ্ঠের লোকসংখ্যা কী পরিমাণ। এত বাঙালি একত্র থাকলে কালীপূজা হবেই। এই উপকণ্ঠে দুটি পূজা হতো। তার মধ্যে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে যে পূজা হতো, তার ছবি টিভিতে প্রচার হতো। সেই পূজা কমিটির স্থায়ী সভাপতি ও সম্পাদক ছিল সুবলকৃষ্ণ ও তার ভাগিনেয় মহীগোঁসাই। এমন কি সে পূজাকে সুবলকৃষ্ণর পূজা বলা হতো। সুবলকৃষ্ণ ও তার ভাগিনেয় দুজনেই তখন বয়সে তরুণ, ত্রিশ থেকে নিচে, ছাব্বিশ সাতাশের মধ্যে। আর তারা বেশ বিখ্যাতই ছিল। বাসরুট থেকে যে অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা উপকণ্ঠের অন্তঃস্থলে যেতে উত্তরমুখো চলতে চলতে পূবে বেঁকেছে, সেখানে একটি একতলা বাড়ির একটা ছফুট চওড়া বারান্দা আছে। একতলা এক সাধারণ বাড়ির তত বড় পথের ধারের রোয়াক থাকার বোধ হয় এই কারণ যে কাছেই একটা স্ট্রিটলাইটিং-এর পোস্ট আছে। বাড়ির কর্তা বোধহয় কল্পনা করেছিল, চাকরিতে যাওয়ার আগে আর চাকরি থেকে ফেরার পর সরকারি আলোর নিচে বারান্দায় হাওয়াতে বসে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করবে। তা হয়তো করতো। কিন্তু পরে সেই রোয়াক সুবলকৃষ্ণ আর ভাগিনেয় মহী ও তাদের সহচরদের সকাল সন্ধ্যায় বসার জায়গা হয়েছিল, পুব থেকেই আসুক আর পশ্চিম থেকেই আসুক, বাসরুট ধরতে সেই রোয়াকের পাশ দিয়েই উপকণ্ঠের ছাত্রছাত্রী, মহিলা-পুরুষের যাওয়ার পথ। তাই বলে সুবলকৃষ্ণ ও তার ভাগিনেয় একেবারেই বেকার তা বলা যায় না। কালীপূজাও সারা বছর থাকে না। সুবলকৃষ্ণ, তার ভাগিনেয় বা তাদের দলবল দুপুর রোদের রোয়াকে বসতো না। সে জন্যই লোকের ধারণা তারা চাকরি করতো।

বারোটা পর্যন্ত সেই রোয়াকে বসে উপনগরীর যাদের যাওয়ার, তারা কলকাতায় চলে গেলে সুবলকৃষ্ণরাও উঠে পড়তো। লোকে বলে, সুবলকৃষ্ণ হাওড়ার এক বালতি তৈরির কারখানায় আর তার ভাগিনেয় কলকাতা করপোরেশনে চাকরি করতো। কিন্তু তারা ভেবে পেতো না, বারোটা পর্যন্ত রোয়াকে বসে থেকে আবার বিকেল পাঁচটাতেই সেখানেই ফিরে এসে বসলে চাকরিটা কোথায়, কেমন হয়। কিন্তু তারা চাকরি করতো, তার প্রমাণ আছে। বৎসরে কয়েকবার কলকাতা করপোরেশন কনজারভেন্সি শ্রমিক সংঘ এবং হাওড়া লৌহ হস্তশিল্প শ্রমিক সংগঠনের মিছিল জুলুস বেরোতো। সামনে যথোপযুক্ত ফেস্টুন, জুলুসের সর্বত্র পতাকা, একই স্লোগান—মজুতদারী কালোবাজারী খতম করো, কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও। ফেস্টুন ও জুলুস পৃথক, কিন্তু কনজারভেন্সি শ্রমিক সংঘ অথবা লৌহ হস্তশিল্প শ্রমিক সংগঠন যাই হোক, জুলুসের মানুযেরা সেই কালীপূজা কমিটির সভ্য, আর জুলুস যাদেরই হোক ফেস্টুনের আগে সব সময়ে সুবলকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় মহীগোসাইকে দেখা যেতো।

সুলতা রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিল। সে তার পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পরে বিধবা মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে আমাদের এই উপনগরীতে কাকার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ব্যবস্থা ভালোই হয়েছিল। সুলতা, তার নাবালক ভাই ও বিধবা মায়ের দুবেলার আহার ও সাধারণ বস্ত্র ছাড়া কিছুরই দাবি ছিল না। সুলতার কাকিমা কয়েকটি সন্তান প্রসব করে নানা রোগে রুগ্ন, ওদিকে সুলতার বিধবা মা স্বাস্থ্যবতী, কাজে তার ক্লান্তি ছিল না, এবং ছোট জায়ের প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধও ছিল। সুলতার কাকা হৃদয়হীন ছিল না। তার সংসারে খিটিমিটি কমে যাওয়ায় সে সুখীও ছিল। বাজার করে, নটায় অফিস করে বিকেলে ক্লান্ত হয়ে ফিরে চা আব ক্রসওযার্ড পাজল নিয়ে বসে যেতো। তাকে আলাদা করে বাসগামী কলকাতাবাসীর মধ্যে চিনে নেয়াও অসম্ভব। সেই কোলকুঁজো, পাথর-চাপা পাতার মতো রংহীন কলকাতা-রং, অম্বলের দরুণ চোখেমুখে বিরক্তি। হয়তো এসবই রুটিন-বাঁধা দ্রুতগতি কনভেয়ার বেল্টে চড়ে বসা কলকাতার জীবনেব ফলে। কিছুই করতে হয় না, সেই মহাবেল্ট থেকে পড়ে না গেলেই হল। নিজের জন্য ক্রসওয়ার্ড পাজল, তৈল-ও স্ত্রী-সেবন নিয়মিত চলে। সুলতাব মা দেখে থাকে যথাকালে যথোপযুক্তভাবে, স্ত্রী শয্যাশায়ী থাকলেও ভদ্রলোক কনভেয়ার বেল্টে প্রত্যহ সকাল নটায় স্থাপিত হয়।

সুলতা যখন এই উপনগরীতে এসেছিল, তখন সে কলেজে পড়ছে। তার কৈশোর রূপ যৌবনসম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু তখন সে যে রোয়াকের বিশেষ লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি এবং এম এ ক্লাসে উঠেই সে যে রোয়াক দলপতি ও কালীপূজা কমিটির সভাপতির ইভটিজিং এর টার্গেট হল, তার কারণ অলৌকিক নয়। বি এ পড়বার সময়ে সুলতা সদ্য পিতৃহীন ও সদ্য পরের আশ্রিত হয়েছিল। বিষণ্নমুখ, শোক ও সঙ্কোচে আরও অবনত, যত্নহীন অনুজ্জ্বল পোশাক কারও চোখে ধরতো না। তা ছাড়া কলেজে যেতে পশ্চিমের পথ দিয়ে কিছুটা বেশি হেঁটে গেলে ট্রেনে যাওযা যায়। পরিশ্রম বেশি কিন্তু বাসের চাইতে পয়সা কম লাগে বলে সে রোয়াক পর্যন্ত আসতো না। বি এ তে বিশেষ ভালো ফল করায়, ততদিনে শোকের ভার কমেছে, সে কিছু মুখ উঁচু করে চলে, দৃষ্টিকে নিজের চারিদিকে ফেলতে পারে। সাদামাটা পোশাক ও অযত্নের প্রসাধন সত্ত্বেও তার আত্মবিশ্বাসী রূপ ও যৌবন যেন হঠাৎ আকর্ষণীয় হয়ে উঠল, ইংরেজিতে যাকে পয়েজ বলে তা দেখা দিল। তার গ্রীবা সুন্দর হতে দেখা দিল। তারা নাসাগ্র মৃদু কম্পিত হতে লাগল, চোখে জ্যোতি দেখা দিল। তা ছাড়া বাসে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কাছে হয় বলে রোয়াকের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে তখন।

তার সৌভাগ্য বা আদর্শ নিষ্ঠার ফল, এম এ তে ভাল ফল করার ছমাসের মধ্যে সে স্কুলের শিক্ষিকাও হল, যদি স্কুলটা অনেকটা দূরে। কিন্তু তাতেই তাকে সাহসিকা করল। এম এর দুটো

বৎসর রোজ সকালে আর বিকেলে কুৎসিত রুচিহীন কথা ও অঙ্গভঙ্গি, ভ্রূক্ষেপ করবো না স্থির করলেও, তার সুগৌর মুখকে রক্তাভ করে দিতো, সে সেগুলিকেও অগ্রাহ্য করতে লাগল। এমন কি পথ আটকে দাঁড়ালেও সে স্পষ্ট ভাষায় দু একবার বললে, পথ ছেড়ে দাঁড়ান, আমাকে চাকরিতে যেতে হবে। এই ভাবেই মামা, ভাগ্নে ও সুলতার কথা শুরু হল।

কিন্তু এটা সুলতার উপন্যাস নয়। বরং সে তো পূর্বলিখিত উপন্যাসকে অনুকরণ করেছিল। সে তো সুবলকৃষ্ণের স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল চেহারা ও শ্রমিক সংঘ নিয়ে চলাচল দেখেছিল। নিজে চাকরি করায় সে নিজেকে কারো চাইতে হীন মনে করতো না, এ অবস্থায় সে স্থির করেছিল সুবলকৃষ্ণ আর তার ভাগিনেয়র মধ্যে যে মহত্ব থাকতে পারে ভালবাসা পেলে তা অঙ্কুরিত হতে পারে।

সেবার পূজার কিছু আগে সুলতার সঙ্গে সুবলকৃষ্ণের বিবাহ হয়ে গেল। আর সুবলকৃষ্ণ ও তার ভাগিনেয়র বাসায় সুলতা সুন্দর সংসার পেতে বসল। এ বিষয়ে তার বিধবা নিঃসম্বল জননীর কিছু বলার ছিল না।

সুলতার কাকা কাউকে কাউকে বলেছিলেন, কী উপায় বলো মেয়েটির? ওই রোয়াকের পাশ দিয়েই যাওয়া আসা। ওখানকার রাস্তার আলোটার বালব প্রায়ই ভাঙা থাকে, মেয়েটির চাকরি সেরে ফিরবার সময়ে প্রায়ই লোডশেডিং থাকে। মামাভাগ্নে সেই কোন অন্ধকার সন্ধ্যায় মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তুলে নিয়ে গেল কী করা যেতো!

কিন্তু সব গল্প একরকম থাকে না শেষ পর্যন্ত। আশ্বিন মাস পড়ছে তখন। পনের দিন, তিন সপ্তাহ হয়েছে বিবাহের, পূজা বোনাসের সময় এসে গেল, মজুতদারদের কালো হাত ভাঙবার, ঘেরাও, বন্ধ, লক আউটের মরশুম এসে গেল। হাওড়ার লৌহ হস্তশিল্প শ্রমিক সংঘের জুলুসটাই আগে শুরু হল। কারণ বালতি কম্পানির ক্যাপিট্যালিস্ট যার বাৎসরিক লাভ সাতাশি হাজার টাকা সে তাব পঁচিশজন শ্রমিককে চল্লিশ হাজার টাকা পূজা বোনাস দিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, বরং তালা মারবে বলে শাসাচ্ছে, সুতরাং শালাকে ঠিক করতে হয়, পুঁজিপতি হওয়া ঘুচিয়ে দিতে হয়। সুবলকৃষ্ণ তা করে ফেললে। লোহার স্প্যানারের এক বাড়িতে মানুয তেমন মরে যায়, মাথার ঘিলু বেরিয়ে পড়ে, তা বোধ হয সুবলকৃষ্ণ জানতো না। সকলের উপস্থিতিতে ব্যাপাবটা ঘটে যাওয়ায় সুবলকৃষ্ণ সেই সন্ধ্যা থেকে বাড়িতে ফিরল না। ফেরারি ফৌজ হয়ে গেল।

সে অবস্থাতেও মেয়েটিকে বাড়িতে আনলেন না? এরকম প্রশ্নের উত্তরে সুলতার কাকা বলেছিল, পুলিশ যখন তখন, রাতবিরেতে এসে কথা বলতে চায়, খোঁজ নেয়, এরকম একজনকে নিজেব পরিবারে রাখি কি করে, আমারও তো অবিবাহিত মেয়ে আছে, ছেলেবা আছে। বাড়িটারই বদনাম হয়ে যায় না? আর পুলিস তো খোঁজ করবেই। ফেরারি হওয়ার এক বছর বাদে পুত্র জন্মালে বোঝা যায় না সে ধারে কাছে আছে?

সুলতার গল্প আরও জটিল হল। পুত্রের জন্মের দুতিন বৎসর বাদে তার এক সুন্দরী কন্যা জন্ম নিলে। ফেবারি যে, তার তবু পুত্র হওয়া সম্ভব, কিন্তু যে তখন ধরা পড়েছে, বিচার হয়েছে, বিশ বৎসরের মেয়াদে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আছে, তার কন্যা জন্ম নিচ্ছে এরকম অলৌকিক ব্যাপার, পুরাণের যুগের বাইরে কেউ বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাকে স্কুলের চাকরি ছাড়তে হল, কেননা কর্তৃপক্ষ যারা ফেরারি ফৌজের আদর্শ জানতেন, স্কুলের শিক্ষিকারা যারা ফেরারি ফৌজকে আদর্শ ও রোমান্সের আধার মনে করতো, তারা আলিপুরের মেয়াদি আসামীর পিতৃত্ব মানতে রাজি হল না।

ওদিকে সরকার জেলের মেয়াদ মকুব করতে অন্তত বছর পাঁচেক সময় নেবে এরকম মনে হচ্ছে। তার আগে মকুব হলে সরকারকে নির্লজ্জ বলে না? সুতরাং সুলতাকে উপকণ্ঠ উপনগরীও ছেড়ে যেতে হল।

সে কোথায় গেল, তা ভেবে নিতে বেশি সময় লাগে না। আমাদের দেশে রেললাইনের ধারে, নতুন সড়কের ধারে এরকম জায়গা আছে যেখানে গর-ঠিকানা মানুষ, পাসপোর্ট ছাড়া মানুষ নিজেদের খুশিমতো বসে যেতে পারে। তাদের পরিচয়, তারা কোথা থেকে এল বা, এসব খোঁজ করা হয় না। সুলতা সেখানে তার পুত্র কন্যা নিয়ে বাস করতে লাগল। আর খুব একটা অসুবিধাও হল না। কন্যা তিনবছরের হতে সুলতা হস্তশিল্প নিগমের সেলসগার্লদের একজন হয়ে যেতে পারল, তাও সিনিয়ার গ্রেডে। অবশ্য এ বিষয়ে ভাগিনেয় মহী গোঁসাই যে করপোরেশনের চাকরি ছাড়াও হস্তশিল্প নিগমের মার্কেট একজিবিউটিব ছিল তার প্রভাবই কাজ করেছিল।

. আর দিন খারাপও চলছিল না। বুড়ি এক ঝি ও পুত্র মুরারিকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে দুতিন বৎসরের কন্যাকে রেখে সুলতা তার নতুন চাকরি যোগ্যতার সঙ্গেই করতে লাগল এবং আমাদের মুরারিকৃষ্ণের গল্প শুরু হওয়া পর্যন্ত করছে। ভাইবোন দুজনেই স্কুলে পড়ে। আর বোন যে তার তিনবছরের বড় দাদার কোলে কোলে থাকতো, যাকে তার দাদা বলতো পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দরী, যার নামই সে রেখেছিল সুন্দরী, সে তার চৌদ্দ বছর বয়সে কিছু গম্ভীর হয়েছে, কিন্তু দাদার কথাতেই চলে, দাদার আড়ালে দুর্ভাগ্যের ঢিল আর তীরের আঘাত কাটায়, তার কাছে মুরারিকৃষ্ণ তো সব দিক দিয়েই হিরো সেই সতের বছর বয়সেই, যার দুহাত ছড়ানো ঘেরের মধ্যে তার শান্ত নিরালা।

কিন্তু এসব বলে আমার চরিত্রদের সঙ্গে বিশ্বাসহানি ঘটানো হচ্ছে। কেউ এসব মনে আনতে চায় না।

যেমন আপেল কামড়াতে কামড়াতে সে যখন তার অনির্দিষ্ট গন্তব্যর দিকে চলেছে, তখন এসব কিছুই মনে হচ্ছিল না তার। অনির্দিষ্ট গন্তব্য এজন্য যে সে জানে না স্থানটি কোথায়, কিন্তু তার মনে পড়ছে স্থানটি এমন যে সেখানে সব ভালো হয়, কষ্ট থাকে না, শান্তি আসে। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে তার গন্তব্যে পৌঁছেছে, এরকম মনে হয়েছিল তার। আর তাকে সমর্থন করেছিল রাধন আর বুচকুর উপস্থিতি।

দুপুরের পরে রাধন আর বুঁচকু তখন হোটেলে না গিয়ে শালপাতার ঠোঙায় রুটি নিয়ে বসেছে আর বুঁচকু তাকে দেখেই চমকে উঠেছিল। রাধনকে ইশারায় দেখিয়েছিল তাকে।

রাধন বলেছিল, মোরাটা দেখছি। রাধন বলতে চাইছিল মরা, কিন্তু অভ্যাসে প্রথম অ-যুক্তবর্ণ থাকলে সে তাকে ওকার-যোগে বলে।

বুঁচকু বলেছিল, তোরই দোষ। তুই বডি বডি বলছিলি। বডি মানে তো লাশ। সে জন্য মরা এখানে এসেছে। তোর বডি বলেছিলিস। তোর কাছেই এসেছে।

তখন তার রক্তহীন মুখ, দৃষ্টিহীন চোখ, ধীর গতিতে তাকে জীবিতের তুলনায় বরং মৃতই মনে হচ্ছিল। সে দেয়ালটার কাছে রাস্তার উপরে বসে পড়েছিল। সে তখন রাধন কিংবা বুঁচকুকে লক্ষ্য করছে কিনা সন্দেহ। এমনকি সে লক্ষ্য করছে না, দেয়ালের গায়ে আর পথের উপরে রক্ত শুকিয়ে আছে। এত রক্ত যে সাতদিনের ধুলো ময়লায় পায়ের ঘষায় তা মুছে যায়নি। সেখানেই তার ভাল লাগছিল। সে বুঝতে পারছিল না, তত রক্ত যাতে ধুলো পড়েছে সে তারই। তার বরং একরকমের শান্তি অনুভব হচ্ছে শরীরে আর মনে। একটা এই তুলনা দেখা যায়, মাথায় যেন ক্যানসার অথবা টিউমার ছিল, তা আর নেই। তার তখন মনে পড়ছে না, সে কে কোথা থেকে এল। মনে পড়ছে না, সে নিজে কে। আর জি করের ডাক্তার বলেছিল, কিছু কংকাশন হয়েছে ব্রেনে, টেম্পোরারি অ্যামনেশিয়া হতে পারে।

কিন্তু রাধন আর বুঁচকু ব্যাপারটা গোড়া থেকেই দেখেছিল। পাগলের মতো চেহারা, অন্তত বেশ কয়েকদিন খায়নি, ঘুমায়নি এমন চেহারার তাদেরই বয়সী একজন দেয়ালটায় মাথা ঠুকছে। যেন ব্যথা পাচ্ছে না। যেন সে মানত করে রেখেছে মাথা গুঁড়োবে কারো অসুখ সারাতে। তখন

মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত মুখ বেয়ে গা বেয়ে, গড়িয়ে পথে জমছে, তখনও মাথা কুটছে।

রাঁধন বুচকুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন রে, পাগলটা কি মাথা থেকে পাগলামির পোকা বার করতে চায়? কিন্তু সেই পাগলের মতো দেয়ালের গায়ে মাথা কোটা বন্ধ হয়েছিল। সেই পাগলটা রাস্তার উপরে নিজের রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

সে, অবশ্য, মুরারিকৃষ্ণ, প্রাইজের দিনের তিনদিন পরে। মনে করতে না চাইলেই কি মন থেকে অতীত দূর হয়? অতীত দূর করতে মাথা ঠুকে মস্তিষ্ককে, স্মৃতিকে, যন্ত্রণাকে দূর করার চেষ্টা করেছিল। মুরারিকৃষ্ণের মৃত্যু হয়নি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু টেম্পোরারি অ্যামনেশিয়া হোক না হোক, দেখা যাচ্ছে সে কিছুটা অতীতকে ভুলতে পারছে।

রাধন এসে বললে, কী রে, রুটি খাবি, মোরা?

বুঁচকু বললে, তোর নাম কী রে?

সে বললে, মোরা বললে যে।

বুঁচকু হাসলে, মোরা তোর নাম?

এই ভাবে মরা থেকে মোরা, পরে মোরের জন্ম হল বাগবাজারের গলিতে।

দেয়ালে মাথা কুটে স্মৃতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি হয় কিনা, টেম্পোরারি অ্যামনেশিয়া হয় কি না, কিংবা বুঁচকু রাধনের সঙ্গে প্রথমে পুরনো বোতল, কৌটো, খবর কাগজের ব্যবসা, পরে হকার হয়ে শরীরের উপরে জমা কলকাতার ধুলোয় নিজের চেহারার মতো মনকেও হারিয়ে ফেলা যায় কি না, এসবই বিজ্ঞানের প্রশ্ন। মোরেব প্রায় দুবছর লেগেছিল জানতে যে মুরারিকৃষ্ণের মৃত্যু হয়নি। সেই রাতে বুঁচকু খারাপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়ে ফিরলে, রাধন যে নাকি তার কিশোরী অবিবাহিত জননীর স্বপ্নে শিহরিত হয়, কিন্তু দেহ-ব্যবসায়ী স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করে, সে বন্ধু বুঁচকুকে যখন মারতে মারতে অজ্ঞান করে দিয়েছিল, যখন বুঁচকুর নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল, তখন সেই রক্তপাত দেখে, সেই দুশ্চরিত্রা স্ত্রী লোকদের উদ্দেশ্যে গালাগালি শুনতে শুনতে, মোরের অ্যামনেশিয়া টুটে গিয়ে মাথার যন্ত্রণা হয়েছিল আবার। কিন্তু ততদিনে লজেন্স বিক্রির বক্তৃতা দিতে দিতে অতীতকে ভুলে থাকাই অভ্যাস হয়েছে তার।

মেয়র দেখলে, গিরিশিরা নিচের দিকে নামতে নামতে ছড়াচ্ছে একটা ছোট উপত্যকায়। সেখানে একটা বস্তি আছে। মহল্লাও বলা যায়। সে ভাবলে, কেউ মরে কি? মুরারিকৃষ্ণ মরতে পারেনি, তার প্রমাণ তো কারো উপন্যাস পড়ে বুঝতে পারা, কুমুর কষ্ট অনুভব করা। কতদিন ছিল মোর সেই হাসপাতালে? সেদিন সেই বেডে উঠে বসলে ডাক্তার বলেছিল, তোমাকে এখন ছেড়ে দেয়া হবে। আর নিজের সমবয়সী নোংরা নোংরা চেহারার দুজন একগাল হেসে বলেছিল, আয় মোরা, তোকে নিতে এসেছি। আর মোরও তাদের সঙ্গে, তারাই পরে বুঁচকু আর রাধন, চলে গিয়েছিল। এটা ঠিকই, মোর তখন বুঝতে পারছিল না প্রকৃতপক্ষে কে সে।

মেয়র জানে বস্তির কাছাকাছি এলেই পায়ের শব্দেই এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে দু একটা করে কুকুর ডাকতে শুরু করবে। সেগুলো দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু মাঝারি বড় আর বিশেষ শক্তিশালী। তাদের শরীরের গঠনে যেন কোথাও কোথাও অসঙ্গতি থেকে গিয়েছে। দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যে রকম ইচ্ছা করেছিল, তেমন না হয়ে কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাতির বাইরে থেকে ধার করে আনা। তিব্বতি ম্যাস্টিফ, সেকালের গোরাসাহেবদের নানা কুকুর, সে সময়ের এখানকার দেশি কুকুর, সব মিলে তারা বর্তমানে এই তাসিলা জাতের কুকুর। এগুলি সাধারণত ভিতু জাতের মনে হয়, কিন্তু কখনও কখনও নিজের বাড়ির কাছাকাছি খুব হিংস্র হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে এদের নিয়ে মেয়রের খুব অসুবিধা হতো। সঙ্গে সঙ্গে মহল্লার সীমা পর্যন্ত চলতে চাইতো। এখন সে কাছে গেলেও উঠে দাঁড়িয়ে দু একবার ডেকেই যার যার দরজায় কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে আবার।

কিন্তু এই পাহাড়ে যেমন হয়, কেউ কোথাও সামান্য উঁচু গলায় কথা বললে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে যেন কোলাহল সৃষ্টি হয়, তেমন একটা দূরাগত কোলাহল যেন সে শুনতে গেল।

একদিন রাধন বলেছিল, এবার শ্লা, তোর মায়ের কথা বল। সে তো বাগবাজার। ধুস্ শ্লা, সেদিনই তো তোকে দেখলাম বাগবাজারে। সেখানে হামা টেনেছিস যে বাগবাজারকে মা বলবি? আমাদের সব ন্যাংটো করে জেনে নিজেকে নুকোচ্ছিস।

লুকনোর কিছু নেই। এক ছোকরার সঙ্গে খুব হয়েছিল। তাকে খুন করে হাসপাতালে ছিলাম। কী হয়েছিল কে জানে। তোরা ডাকলি, তোদের সঙ্গে এসেও তো বাগবাজারে সেই গলিই দেখেছি।

মেয়র আজ একটু অবাক হল। কুকুরগুলোর আজকের ডাকাডাকি অন্য দিনের মতো নয়, আজ যেন ক্ষেপে গিয়েছে, ক্রুদ্ধ কিংবা ভীত, কিংবা দুই-ই। আর গজ বিশেক গিয়ে মেয়র টর্চের আলো ফেলতে শুরু করলে। ছোট একটা উৎরাই নামতে নামতে একটা ভাঙা ভাঙা বাড়ির কাছে এক রডোডেনড্রন ঝোপের পাশে আলো ফেলতেই সে চমকে উঠল। তৎক্ষণাৎ টর্চটাকে নিবালে সে। এক মুহূর্ত। আগে যেখানে আলো ফেলেছিল তার কিছুটা বাঁয়ে আবার আলো ফেললে। এবার আরও স্পষ্ট দেখা গেল। দুটো মুখ, দুটো ঘাড়, খানিকটা করে পিঠ, এক জোড়া চিতা। চোখ আলো পড়ায় থমকে গিয়েছে, যেন আলোর উৎসের উপরে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। প্রাপ্তবয়স্ক নয়। ভাই বোন হতে পারে, দুই ভাই হতে পারে। যেন খয়েরি গুলদার সোনার ব্রকেড। চিতাদুটো পিছিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে আর একটা বড় ঝোপের দিকে উঠে যাচ্ছে। মেয়র আলো নিবিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে তাদের কালো সিলুয়েট লক্ষ করতে লাগল। কী সুন্দর না? অথচ পেশী, দাঁতে, থাবায় এমনকি চোখের পান্না ঠিকরানো আলো কী ধারালো, কী যেন একটা কবিতা।

কিন্তু কুকুরগুলো ক্ষেপে যাওয়ার মতো ডাকছে, মহল্লার বাড়িগুলোর কোন কোনটার ঘুম ভেঙে গিয়েছে, কোন কোন বাড়ির সামনে ধোঁয়ানো মশালের আলো। চারদিকে যার ফরেস্ট সেখানে চিতা উঠে আসা অস্বাভাবিক নয়। মেয়র ধোঁয়ানো মশালের আধো-আলো অন্ধকারে বস্তির লোকদের সঙ্গে কথা না বলে হাসি মুখে তাদের পার হয়ে যেতে লাগল।

সেই লাল মশালের পিছনের অন্ধকার থেকে একজন বললে, মেইঅর ছন্ কি?

হো।

খারাবি ছ কে?

হৈ না।

খারাপ কিছু হয়নি এই আশ্বাস দিয়ে একটা পাকদণ্ডি পেতেই নিচে নামতে শুরু করলে সে। আধঘণ্টা চলে বাজার থেকে আসা পিচ-পথে নেমে পোস্টঅফিস মহল্লার দিকে চলতে লাগল। এখান থেকে পোস্টঅফিস পার হয়ে কালিঝোরার ব্রিজ ও পাম্প হাউস যেতে বিশ মিনিট, সেখান থেকে বাংলোর ব্রিজে যেতে আরও পনের মিনিট।

এখন আকস্মিকতা, সমাপতন, দুর্বিপাক ইত্যাদিকে গল্প থেকে দূরে রাখা হয়। বরং দেখানোর চেষ্টা করা হয় সবই চরিত্র-প্রসূত, চরিত্রের বাইরে কিছু নেই, অন্য চরিত্রও নেই। কিন্তু জীবনে যেহেতু কোন মানুষই সম্পূর্ণ একা নয়, আকস্মিকভাবেই সমাপতন, যোগাযোগ এসবই ঘটে চলেছে। ফলে জীবনটা পূর্বে নির্দিষ্ট চরিত্রনির্ভর না হয়ে, অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে।

মেয়র পোস্টঅফিস মহল্লার কাছাকাছি এসে ভাবলে, বর্তমান হয়তো এক তা কাগজের মতো পাতলা, তা সত্ত্বেও কী সব ব্যাপার ঘটে যায়, যাকে আশ্চর্য মনে হতে থাকে। তা যে কী, তা ভেবে বোঝা যায় না। সময় অনেক গভীর হলে যা হতে পারতো, বর্তমানেও সে রকম ঘটে যায়। পরে কিন্তু বর্তমান তত পাতলা বলেই হয়তো সে সবের কোন অর্থ থাকে না। ভেবে কোন লাভ হয় কি? কিন্তু শব্দটা, বোধহয়, অনির্বচনীয়।

মেয়রের মনে হল, হঠাৎ যেন অন্ধকার হয়ে এল। সে চলতে চলতে উপরে দেখলে। মেঘ করেনি। কুয়াশা আরও পরে নামতে শুরু করবে। সে এদিক ওদিক লক্ষ্য করে বুঝলে এদিকের স্ট্রিটলাইটিং নিবে গেছে। সে অবাক হল। এতরাতে এ পথে কেউ চলে না বলে, নিবিয়ে দেয় নাকি রোজ? আর রোজই সে এ সহজ সমতল পথটুকু চলতে অন্যমনস্ক থাকে বলে এত দিনেও লক্ষ্য করেনি। সে পাম্প হাউসের উপরে মৃদু লাল আলো, আর তার পিছনে দূরে ফরেস্টকলোনির স্ট্রিটলাইটিং-এর আলো আলো ভাবটাকে দেখতে পেলে। সে টর্চ জ্বেলে পথ চলতে লাগল।

একবার তার মনে হল, সামনের কোন বাড়িতে কেউ আলো জ্বালালে। পরে সে বিচার করলে, আলোটা বাঁকের আড়ালে ছিল বলে, সে রকম মনে হল সে বাঁক ঘুরেছে বলে। তারপর সে নিজেকে বোঝালে, আলোটা চৌকোণ মতো দেখাচ্ছে যখন, তখন ওটা কোন আলোকিত শার্সি। আর এদিকে পথের ধারে শার্সিদার আর ইলেকট্রিক কানেকশনওয়ালা বাড়ি শুধু পোস্টঅফিস। সে মনে মনে হাসল। পণ্ডিত হওয়ার খেসারত দিচ্ছেন পোস্টমাস্টার, এই শীতের রাত জেগে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। কিন্তু কাছাকাছি এসে সে বুঝলে, আলোটা পোস্টঅফিসে জ্বলছে না। পোস্টঅফিসের এপাশে যে বসবার ঘরের একটা জানলা রাস্তার দিকে, তাতেই আলো। সে স্থির করলে জেগে আছেন যখন পোস্টমাস্টার, থেমে দাঁড়িয়ে গুডমর্নিং জানিয়ে বুঝিয়ে দেবে নাকি, মাঝরাত অনেকক্ষণ পার হয়েছে?

কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল। পোস্টমাস্টার নয়। আলোর সামনে ছোট একটা টেবলের উপরে ছড়িয়ে রাখা হাতের উপরে মাথা রেখে, মুখের একপাশ চুলে ঢাকা, আলুথালু শাড়ি চাদরে একজন স্ত্রীলোক। পোস্টমাস্টারমশায়ের স্ত্রী ছাড়া আর কে হবে? কিছু বুঝতে না পারলেও মেয়রের মন ভার হয়ে গেল। এই শীতের মাঝরাত পার হয়ে গেলে, শয্যার বাইরে জানলার কাছে কেন একজন থাকে? সে কি আগে কখনও এরকম দেখেছে? তা যদি হয়েও থাকে, তা হয়তো এত রাতে নয়, এত শীতে নয়। আশ্চর্য কিন্তু, যদি বর্তমানেও এমন মনোভার থাকতে পারে। সে নিঃশব্দে বাংলোর দিকে চলতে লাগল।

সে যখন কালিঝোরা ব্রিজের কাছে, তার মনে হল ফরেস্টকলোনির স্ট্রিটলাইটিং একটা দুটো ফিউজ হয়ে গেল যেন। না, সে বুঝলে ঠিক তা নয়, কেউ, কোন মানুষই নাকি, তার আগে আগে খুব তাড়াতাড়ি চলেছে। এই শীতের রাতে কার দরকার পড়েছে তেমন পথ চলার? সে নিঃশব্দে টর্চ নিবিয়ে চলতে লাগল। এমন কি হতে পারে, যা সে দেখছে তা ছায়া? সে বাংলোর ব্রিজের কাছে এসে পড়েছিল। চোখ তুলতে সে অবাক হয়ে দেখলে, কেউ ব্রিজ পার হয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাংলোর ডানপাশের দিকে চলেছে। সে নিজে ব্রিজে উঠে দেখলে, সেই সিলুয়েট বাংলোর পিছন দিকে মিলিয়ে গেল।

সেও বাংলোর সামনের দিকে দরজা না খুলে বরং পিছন দিকের আলো জ্বালাতে গেল। তার বেশ কৌতূহল হয়েছে ততক্ষণে। সেরকম অন্ধকারে, মুখ দেখা না গেলেও, সিলুয়েট দেখেও মানুষ চেনা যায়। ব্রিজের উপর থেকে যে সে ভাবে নেমে গেল তার হাঁটার ভঙ্গি কি তার পরিচিত নয়? নরবু? কী করছিল এত রাতে নরবু?

বাংলোর পিছনের দরজা খুলে সে রান্নাঘরে গেল। আলো জ্বালালে। আর তাতে নরবুর ঘুম ভাঙল যেন। সে তার মেঝেতে পাতা বিছানায় কম্বলের নিচে পাশ ফিরলে যেন। কম্বলটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলে।

ঘুম-ভারি গলায় বললে, মেইঅর ছন কে?

হো। আমি কফি করে নিচ্ছি এক কাপ। তুই ঘুমা, রাত দুটো কখন পার হয়েছে।

কফি করতে করতে মেয়র ভাবলে, কী সন্দিগ্ধতা এই বর্তমানেও!

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

জেন শিয়রের দিকে চোখ তুলতেই ছোট সুদৃশ্য টাইমপিসটাতে রাত দুটো দেখতে পেলে। আলোটা উজ্জ্বল, টাইমপিসটার পাশেই। ইলেকট্রিকে যুগে এরকম সুদৃশ্য পেট্রলল্যাম্প সহজে পাওয়া যায় না। শিকারের ক্যাম্পে কখনও কারো দরকার হতে পারে। একটা সুন্দব ঘেরাটোপও আছে যা পরিয়ে দিলে আলোটা না ছড়িয়ে একটা ছোট আলোর সামন্তরিক তৈরি করে। যেমন এতক্ষণ বইটা, বই ধরা হাতটা, গা ঢাকা রাগের খানিকটা থেকে শুরু করে তার বালিশে রাখা মাথা ঘিরে রাখা চূর্ণকুন্তলে পড়ছিল।

এই টাইমপিস ও পেট্রলল্যাম্প মুলাটিয়ারের বিদায় উপহার। সেই ডক্টর মালহোত্রা, সহপাঠী আর সহকর্মী হিসাবে পঁচিশ বছর পরিচিত তার। ছয় থেকে বারো বালকবালিকাদের একসঙ্গে কনভেন্টের জুনিয়ার সেকশনে পড়ার ব্যবস্থা, বোধহয় মনস্তত্ত্বের নির্দেশ। বাড়িতে ভাইবোনদের একত্র থাকার পরিবেশ রাখার চেষ্টায়। বারো থেকে ছাত্রছাত্রীরা ছেলে ও মেয়েদের সেকশনে পৃথক হয়ে যায়। মেডিকোর্সে আবার সহপাঠী তারা, সে, ব্যাবিট, মুলাটিয়ার, কমেডিয়ান। আর তারও পরে মুলাটিয়ার আর সে মিশন হসপিটালেই সহকর্মী আবার। এসব ভেবে নিতে দু-এক সেকেন্ড যথেষ্ট। জেন তাও ভাবলে না। আলোটা আর মৃদু টিকটিক করা টাইমপিসটা উষ্ণতা, আশ্বাস-এমন আবেগ আনলে মনে। আলোটাকে আজই প্রথম জ্বালানো হয়েছে। এদিকে কিন্তু রাত দুটো।

সে তার শোবার ঘরের নরম রাগের আরামদায়ক উষ্ণতায় গ্রেগরী ক্রস্টারের ব্যবহৃত জিম করবেটের বইয়ে চিতার গল্প পড়ছিল। গ্রেগরীর, তাতে সন্দেহ নেই। ফ্লাইলিফে পেনসিলে লেখা জি ক্রস্টার এম এ ডিডি। এটা কিন্তু স্বাভাবিকের বাইরে, যে কেউ নামের সঙ্গে বইয়ের ফ্লাইলিফে নিজের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন লিখে রাখে। যেন জানানো, শুধু মাস্টার অব আর্টস নয়, ডক্টর অব ডিভিনিটিও। এটা বোঝা যাচ্ছে, সে এই নির্জনতায়, পৃথিবীর আলোকহীন কোণে, ধর্মব্যাপারে লেখাপড়া করে এক্সপার্ট হয়েই এসেছিল। কিন্তু তা এভাবে লিখে রাখতে হয় কেন? হঠাৎ অনুমান হল জেনের, তা কি নিজেকে মনে করিয়ে দিতে? তা হলে, তার মনের অন্য অংশে কি গোলমাল হচ্ছিল সেই জিম করবেট কিনে পড়ার পর্যায়েও, আর নিজেকে স্মরণ করাচ্ছিল সে অক্সফোর্ডের লোক?

হ্যাঁ, জেন ভাবলে, শিকারকাহিনীর উত্তেজক ভয়ের গল্পের মধ্যেও মাঝে মাঝে গ্রেগরীর ভয় এসে যাচ্ছিল। আর সেজন্যই চোখ ক্লান্ত হয়ে আসতে আসতেও ঘুম আনতে পারে নি।

আজকের দিনটা, কিংবা রাত দুটো এখন, গতদিন বলাই ভাল, অন্যদিনের থেকে পৃথক ছিল। চামলিং নামে সে রোগীকে তার দাদা পাশাং আজ সকালেই নিয়ে গিয়েছিল। দুপুরের ডাকে স্মোলেটের চিঠি এসেছিল। সেই সঙ্গে রেলওয়ে রিসিট। সে যেমন চেয়েছিল, রেলওয়ে পার্সেলে তিনটি ক্রেটে ওষুধ, অপারেশনের যন্ত্রপাতি, অবশ্য সেসব বিনা অ্যানাসথেসিয়ায় যা করা হয় সে রকম, ফোড়াকাটার, দাঁতভোলার, মিডওয়াইফ্রির। অর্থাৎ একজন ডাক্তারের পক্ষে মিনিমাম বলা যায়। সেই ক্রেটগুলোকে আনতে ঝব্বু নিয়ে থেনডুপের যাওয়ার কথা। কিন্তু সে নাম সই

করতে পারে না বলে নামগিয়াল জনও গিয়েছে তার সঙ্গে তাসিলা রোড স্টেশনে। নামগিয়াল পরামর্শ দিয়েছিল, এখন বিকেলে গেলে রাতে ফেরা যাবে না। কাল ভোরে রওনা হলে দুপুরের মধ্যে ফেরা যাবে। আর তা শুনে জেন বলেছিল, তা কেন? ফাদার গ্রেগরীর সময়ে এমনকি জংশন স্টেশনের শহর থেকে প্রভিশন আনতে হতো না তোমাকে? নিশ্চয়ই একদিনে ফিরতে না। আমি তো ভাবছি, বারবার পাহাড় থেকে ওঠা নামা তোমার পোষাবে না। তুমি কলের ময়দা, মোটা দানার চিনি, চা, কফি, দু তিন বোতল পোর্ট মদ, এসব নিয়ে এসো জংশনের শহর থেকে। এখন না গেলে আগামী কাল ভোরের ট্রেন তাসিলায় ধরবে কি করে?

অবশ্য বলতে পার বাংলোটায়, সম্পূর্ণ ক্লুটলং-এই বা, সম্পূর্ণ একা হওয়া, আর সঙ্গে বুড়ো হাঁপানি রোগী নামগিয়াল থাকা, কিছুই তফাৎ নেই।

বিকেল শেষ হওয়ার আগেই জেন বাংলোর সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল। সন্ধ্যা হতে না হতেই, সব ঘরে একটি করে আলো জ্বেলেছিল। থেনডুপ ডিনার ঠিক করে রেখে গিয়েছিল, তা গরম করে, আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে ফেলেছিল। তারপরে আবার সে বাংলোর সব দরজা জানালার ছিটকিনি, বোল্ট, বার, সব দেখতে বেরিয়েছিল। তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল তাব, সে ভুল করেছে : সব ঘরে আলো থাকলে বাইরে থেকে মনে হবে বাংলোর অনেক লোক আর তারা জেগে আছে, তা নাও হতে পারে। বরং আলো সেরকম থাকলে জানলার কাচ দিয়ে, দরজার টপ প্যানেলের কাচ দিয়ে, দেখতে পাবে বাংলো একেবারে নির্জন, একটিমাত্র স্ত্রীলোকের কথা ছেড়ে দিলে। তখন সে পেট্রল ল্যাম্পটা ছাড়া সব আলো নিবিয়ে দিয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না স্থির করে, সেই আলোটাকে নিয়ে যে ঘরটাকে সে লাইব্রেরি বলে, সেখানে বই খুঁজতে গিয়েছিল। শোবার ঘরে বিছানায় গেলে ঘুম এসে যেতে পারে। তা ছাড়া এই সুবিধা, এই ঘরের চৌকোণ বড় শার্সিতে যদি কেউ চোখ রাখে, দেখবে, একজন জেগে লেখা পড়া করছে। বই খুঁজে সে ঠিক করলে, উদারিং হাইটস্ পড়বে আজ। আবহাওয়ার সঙ্গে মিলছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তার মনে পড়ল, সেই কঠিন উপন্যাসটায় এরকম এক জানালা দিয়েই একরাতে এক অলৌকিক হাতকে ঢুকতে চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছিল। যে পিছন ফিরে জানালাটার দিকে তাকাল। ভাবলে, দেখো, আজ করি কাল করি করে জানালাটার স্ক্রিন করা হয়নি। যুক্তি এই ছিল, ওদিকে জঙ্গল। আর তার পরেই তার উপত্যকা সে দিকে শেষ। ওটা পথ নয় লোকচলাচলের, তা সত্ত্বেও সে উদারিং হাইটস রেখে, জিম করবেট হাতে নিলে, আর ভাবলে, অন্তত এদিকের ট্রেনের কামরার জানালায় বা দরজার, কাচ ঢাকতে স্ক্রিন থাকে না, আর এই কাঠের দেয়ালে চৌকোণ জানালাটা রেলকামরার জানালার মতোই।

সে স্থির করলে, জিম করবেট বরং শোবার ঘরে নিয়ে যাবে, এখানে এখন মাঝরাত পর্যন্ত সেলাই করলে হয়। এরকম মনে হওয়ার কারণ, অবশ্যই, সেই ঘরে ডিভানের উপরে রাখা তার সেলাইয়ের ঝুড়িটায় চোখ পড়া। বিকেলেই সে জানালা দিয়ে আসা রোদে বসে শেমিজটাকে সেলাই করছিল। কালচে সবুজ সিল্কের সেই রাত-শেমিজটা এখনই শেষ করে নিতে পারে। এখানে অবশ্যই সেই শেমিজে তাকে দেখার মতো কেউ নেই। শোবার ঘরের অল্প আলোতে সে কালচে সবুজ শেমিজ থেকে, অবশ্যই, হলুদ ত্বক হলে সেই হলুদ ফুটবে। খুব অন্ধকারে অল্প আলোতে সেরকম হলুদ মুখ যেমন ফোটে।

দশটা রাতের মধ্যে সেলাই শেষ হয়েছিল। বই, আলো, আর সদ্য তৈরি হওয়া শেমিজটা নিয়ে সে শোয়ার ঘরে এসেছিল। শোবার ঘর আর রেলকামরার মতো লাইব্রেরির মাঝের কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই জামাটার রংই অল্প আলোয় দেখা বনের মতো নয়?

কিন্তু তখনও তো সকালের আলো আসতে অনেক দেরি, তার প্রাঙমুখর মন চিন্তা করলে, এখনই বিছানায় যাওয়া যায় না, যদিও হটওয়াটার ব্যাগে নিচের আর উপরের কম্বলের মধ্যে বিছানাটা

এখন স্লিপিং ব্যাগের চাইতে ভালোই, সময়টাকে ভরে তুলতে সে সদ্য শেষ হওয়া শেমিজকে ট্রায়াল দিতে নিতে পারে।

খাটের মাথার দিকের টেবলে আলো আর বই রেখে সে শেমিজ নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালে। আর শেমিজ তো নেকস্ট টু স্কিনই পরতে হয়। সে সেরকম করে ট্রায়াল দিতে গিয়ে ব্রীড়ায় অল্পক্ষণই আয়নায় চাইতে পারলে। কিন্তু সিল্কই দেখা যাচ্ছে, সেরকম স্বচ্ছ। এখানে কেউ দেখছে না বটে। তা হলেও বিছানায় যেতে সে হাত বাড়িয়ে লাল কেপটাকে নিলে। সেটা পশমী আর তাতে বুক থেকে পিছন অবধি ঢাকে। যদি হঠাৎ বিছানা থেকে উঠতে হয়!

সেই লাল কেপটা, যা কাঁধ থেকে ছড়িয়ে উরুর চার পাঁচ ইঞ্চি ঢাকে, বিছানার পাশে রাখতে গিয়ে তার আবার মালহোত্রার কথাই মনে পড়ল। মালহোত্রাই তাকে চাকরি থেকে রিলিভ করে চার্জ বুঝে নিয়েছিল। কেউ না জানে এমনভাবে বিদায় উপহার দেয়ার সেই সুযোগ নিয়েছিল মুলাটিয়ার। আর উপহারগুলি বিদায়ের প্রতীক, তা অনুভব করে সেই ডরমিটরিতে মুখ শুকিয়ে আসছিল তার নিজের। সে সময়ে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতেই যেন, সে মুলাটিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মুলাটিয়ার তোমার কি লেখাপড়ার কথা মনে আছে?

কোন লেখাপড়া?

ডাক্তারির আগের লেখাপড়া যে অনেকদিন গুলে খেয়েছো, তা জানি। সাধারণভাবে আই তো পড়েছিলে এক সময়ে।

সাদা এপ্রন কোটের হাত খুঁজে পেয়ে তাতে হাত গলাতে গলাতে মালহোত্রা বললে, হুম্ হে, জেনসেন, তাই বলে আইরিস, কর্ণিয়া, এসব শব্দও মনে নেই? আচ্ছা, মালহোত্রা...বলো, মালহোত্রা কোটের বোতাম লাগানো শেষ করে ঘড়ি দেখলে, সিগারেট ধরালে ; রাউন্ডের সময়, আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট দেরি তখনও।

জেন নিজে বলেছিল, আমি সিরিয়াস।

ডক্টরস আর অলওয়েজ সো। মালহোত্রা জেনের চেয়ারের হাতলে বসেছিল।

আচ্ছা, মালহোত্রা, স্ট্র্যাবিসমাস কি বংশগত হয়?

মালহোত্রা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। জেনের মুখের দিকে স্পষ্ট করে চাইল। বললে, এ সম্বন্ধে পড়িনি। বোধহয় কখনও হয়, কখনও হয় না। আমাদের পাড়ার এক বৃদ্ধের আর তার মেজছেলের চোখ একই রকমে ট্যারা, কিন্তু অন্য ছেলেমেয়ের তা নয়। কিন্তু, জেন, তোমার এটাকে কি তুমি স্ট্র্যাবিসমাস বলো? বলা উচিত নয়, ক্যাডের মতো শোনাবে। আমরা ছ বছর বয়স থেকে কো-এড, এখনও কলিগ। তুমি মিরান্ডাকে দেখেছো। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে সুখী, ফুলফিলড। কিন্তু শোনো, সে সময়ে যদি এতটুকু প্রশ্রয় দিতে, তা হলে তোমার এই ফিগার, এই টেম্পারামেন্ট, আর উইট, মানে অবশ্যই তুমিই মিসেস মালহোত্রা হতে। দেখো, বলি, সেই স্কুলের সময় থেকে আমার অনেক স্বপ্নে তোমার যাতায়াত ছিল।

জেনের মেঘলা মুখে হাসি দেখা দিল। তার মনে পড়ল সে বলেছিল, সে সব স্বপ্ন ভিজে হতে পারে। স্কুলে যত ঘুষি খেয়েছো, আর চুলটানা খেয়েছো, ঘুমে কাঁদা সম্ভবই তো।

আয়নায় নিজেকে দেখে যেমন মুলাটিয়ারের কথা, যেমন মুলাটিয়ারের কথায় আবার আয়নায় নিজেকে দেখে নেয়ার ইচ্ছা। তারপর সে বিছানায় গিয়েছিল। তখন তার মনে হয়েছিল, লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি, এদের কিন্তু রাইফেল থাকতো সঙ্গে। এরকম এক নির্জন, যেন অন্ধকারের শূন্যে ঝোলা কামরায় রাইফেল থাকতে হয়।

সে বই পড়েছিল। চোখ ক্লান্ত হলে, চোখ বুঁজেছিল। কিন্তু মনের একটা পাশ জেগে ছিল। নতুবা ঘড়ির টিকটিক শব্দ কানে যাবে কেন?

সে ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে শুনলে, বহুদূরে যেন কোলাহল হচ্ছে, যেন অনেক কুকুর একসঙ্গে ডাকছে। এসবই রাত্রির অন্ধকারে তার ভয় বাড়াতে চেষ্টা করছে। সে নিজেকে প্রবোধ দিলে, তাই বলে ওসব নিশ্চয়ই কাছে নয়। ওসব আর তার এই শোবার ঘরের মধ্যে কত রিজ আছে, বলতে পারো না। শব্দটা রিজগুলোকে ডিঙিয়ে বাতাসের পথে সোজা আসতে পারছে বলে কাছে শোনায়। রিজ টপকে হেঁটে চলতে দু এক মাইল হতে পারে।

ঘুম না আসুক, এই শীতের শেষ রাতে বিছানা ছাড়াও যায় না। জেগে থাকতে হলেও শুয়ে থাকতে হবে। কিন্তু, এই তার ভাগ্য, ভালো করে শুতে গিয়েই সে শিউরে উঠে চিৎকার করতে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিলে। তার পায়ের দিকে দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা, তার লোমশ সবগুলো পা ছড়িয়ে তাকেই যেন দেখছে। আর তার পেটের নিচে বড় একটা সাদা বোতাম। শুকনো ঠোঁটদুটোকে শক্ত করে একত্র করে সে নিঃশব্দে শুয়ে রইল। ওটাকে জানতে দেয়া যাবে না, সে ঘরের আসবাব, দেয়াল, রাগ এসব ছাড়া জীবিত কিছু।

সে ভাবলে, আশ্চর্য কিন্তু। এটা এক অদ্ভুত জায়গা। মেয়র-বাংলো আছে। মেয়র কি সত্যি আছে? আর থাকলেও, তাকে ফোনে পাওয়া যায় কিনা জানো না। যদি বা মেয়রের ফোন থাকে তার অন্য প্রান্ত কি পোস্টঅফিসে? আর ফোনে কাউকে পেতে হলে, কী আশ্চর্য, সব চাইতে কাছের মানুষও হয়তো তিন মাইল দূরে।

জেন ঘড়ি দেখলে। রাত দুটোর পরে এতক্ষণে দু মিনিট হল।

ভয়ে ভয়ে মাকড়সাটাকে আবার এক চমক দেখে নিয়ে ভাবলে, প্রকৃতপক্ষে ছাই রঙের ওই মাকড়সাটা মাদার ডাকোস্টা তো নয়ই, এমনকি তাঁর প্রতীক ভাবাও উচিত হয় না। হিংস্র হওয়া দূরের কথা, কঠোরও নয়। বরং মায়ের মতোই। মতোই কেন, মা-ই। ডিমের থলিটাকে রক্ষা করার জন্যই তেমন স্থির হয়ে আছে। হয়তো খাদ্য সংগ্রহও করে না। জেন হাসল সেই আধ-অন্ধকারে। খুব বিবর্ণ হল সেই হাসি।

রাউন্ড দেয়ার সময় পার হয়ে গেলেও, মালহোত্রা টেবলের কফিপট থেকে দুই কাপ কফি নিয়ে এসেছিল। জেনের মনে পড়ল, সে-ই মুলাটিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, একটা কথা মুলাটিয়ার, বিফোর উই পার্ট। তোমার কি কখনও মনে হয়েছে, মানে মাদার ডাকোস্টাকে কি কখনও মাকড়সা বলে মনে হয়েছে? সে বোধ হয় তখনও হেসেছিল।

জেন ভাবলে, সে হাসিও নিশ্চয়ই ম্লান ছিল।

মাকড়সা? কী যে বলো জেন! তা, ডাকোস্টার চেম্বারে অনেক ধুলো বটে, ফার্নিচারগুলো, মানে হিসাব জানলে দেখবে, সেগুলোকে চল্লিশ বছর ব্যবহার করছেন। ঝাড় পোঁছ করলেও দারুণ ফেডেড মনে হয় না? আর তা ছাড়া, তাঁর চেম্বারের পিছনের সেই অ্যান্টিরুমে, তোমার আমার তো বটেই, আমাদের বিশ ত্রিশ বছরের সিনিয়ার যারা এই কনভেন্টে, কলেজে, স্কুলে পড়েছে, সকলেরই পার্সোনাল ফাইল জমে আছে বোধ হয়। জীবনের কোন কীর্তি অকীর্তি সেই রেকর্ডকে এড়ায় না। সেই ঘরে নিশ্চয়ই মাকড়সা থাকবে। তাই বলে আমাদের সকলের জীবনই ডাকোস্টার জালে জড়ানো তা ভাবা উচিত নয়। হেসেছিল মুলাটিয়ার।

মুলাটিয়ার, কফি শেষ হলে, বোকা বোকা হেসে, বিদায়ের আবেগকে সুযোগ না দিতে, বাই বাই বলে রাউন্ড দিতে চলে গিয়েছিল।

জেন ঠিক করলে সে এক কাপ কফি করে খাবে। সে রাগ সরিয়ে বিছানা থেকে নামলে। কেপটাকে শেমিজের পিঠ দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে, ল্যাম্প হাতে কিচেনের দিকে চললে, যেতে যেতে আয়নাটা তাকে টানলে। তা এক মুহূর্তই। বুকের গড়ন, সে ডাক্তার, জানেই, অন্য রকম হতে পারে না, যদি শেমিজটার জন্য সে রকম না-দেখিয়ে থাকে।

২

কফি নিয়ে শোবার ঘরে আসতে আসতে সে ভাবলে, মশারিটা গোটানো বলেই। ওটাকে ফেলে, গুঁজে নিলেই মাকড়সাটার কথা আর ভাবতে হয় না।

ওদিকে, দেখো, এখানে আসার পর মাদার ডাকোস্টাকে চিঠি না দেয়া ভালো হয়নি। তিনমাস হয়ে যায়। কোহেন আর স্মোলেটকে লেখা চিঠিতে খবর পাচ্ছেন, তা বললে কিন্তু হয় না।

হ্যাঁ, তখন কী এক অদ্ভুত পেটের রোগ, আর তোতলাও হয়ে যাচ্ছিল সে। তো, পঁচিশ বছর আগে হবে, সে বারই, মাদার ডাকোস্টার তখন সেই অনুপাতে বয়স চল্লিশের ঘরে হবে। ডাকোস্টা আউটিং-এ যাওয়ার সময়ে, অন্য সকলে তো তার আগে ছোট ছোট দলে নানা দিকে চলে গিয়েছে, স্থির করলেন, তাকে নিয়ে যাবেন। ডাক্তাররা তখন, বোধহয়, তার চোখ, তোতলামি আর অজীর্ণ রোগের জন্য লস্টকেস মনে করছে। ভয়ে সে তো অন্য ঘরে একা শুতেই পারতো না। সেই দেরাদুনে সেবারই, রীতিবিরুদ্ধভাবে, ভয়ে অন্ধকারে চেয়ে থাকা তাকে ডাকোস্টা এক রাতে নিজের বিছানায় নিয়ে গিয়েছিলেন, নিজের কম্বলের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। একটা হাত তার হাড় জিরজিরে শরীরে রেখেছিলেন।

এসব কেমন স্পষ্ট মনে থাকে, ভাবলে জেন। আর সেই রাতেই, বিস্ময়ই তো, সে ডাকোস্টার মাইয়ে, তাঁর নাইট গাউন গলিয়ে তার রোগা, রক্তহীনতায় ঠাণ্ডা একটা হাত ভয়ে ভয়ে রেখেছিল। আর তার পরদিন থেকেই সে, আর সকলের মতো ডাকোস্টাকে মাদার না বলে, মম বলে ডাকতে শুরু করেছিল।

আর, কী আশ্চর্য, তার পরেই সুস্থ হতে শুরু করেছিল সে। তোতলামি সেরে গেল, তেরচা করে তাকানো কমে গেল, আর পরের সাত বছরের মাথায় সে স্কুলের জুনিয়ার টেনিস চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। নিশ্চয়ই, ইদানীং, বিশেষ ডাক্তার হওয়ার পরে কমই দেখা হত তাঁর সঙ্গে। তবু শেষ দেখার সময়ে, যখন আর কেউ কাছে ছিল না, সে তো তাঁকে মমই বলেছিল।

তাঁকে চিঠি না দেয়া হৃদয়হীন কাজ হয়েছে। অন্তত ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে, পালিয়ে গিয়েও, যখন সে আবার এখানে থাকতেই ফিরে এসেছিল, লজ্জায়, বেপরোয়া সাহসে, তখন চিঠি লেখা উচিত ছিল। সে অবাক হল, সে কি এতই হৃদয়হীনা?

সে কফি নিয়ে বিছানায় বসে অবাক হল। সেই রেলের কামরার মতো জানালাটা দেখা যাচ্ছে না। তা হলে? তখন তার মনে পড়ল। লাইব্রেরির আর শোবার ঘরের মধ্যে দরজাটা সে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তা হলেও, চারিদিকে থেকে আবার শোনা গেল, কারা বলাবলি করছে, কী একা তুমি!

সে যেন তাদেরই বললে, ভয়? ভয় কী তা তোমরা জানো না। ডাক্তার হতে গেলে অনেক ভয়কেই বাদ দিতে হয়। মর্গের ভয়, ডিসেকশন নিয়ে যে সব গল্প, তার ভয়, সেসব গল্পই প্রমাণ করে, কারো ভয়ের থেকেই সেগুলো তৈরি। হ্যাঁ, ডাক্তারকে ভয় বাদ দিতেই হয়।

সুতরাং জেন নিজেকে বললে, একটু লজ্জিতই হল তার মুখ ল্যাম্পের আলোতে, হয় তো ডাকোস্টা মাদারও কিছু আরোগ্য লাভ করে থাকবে। সেই নিঃসন্তান অবিবাহিত প্রায়-প্রৌঢ়ার সেই স্তনবর্তুলের কী এক ক্ষরিত হওয়ার, কোমল আকুল ঠোঁটের স্পর্শ পাওয়ার নিজস্ব এক সাধ থাকে না?

তার পরও তারা দুজনে আউটিং-এ গিয়েছে। আর ঘরে দুটো বিছানা করা থাকলেও জেন জানতো বড় খাটখানাই মম আর তার।

সেবার তখন তার চৌদ্দ হয়েছে, জুনিয়ার কেমব্রিজ দিতে হবে, আউটিং-এ সেই দেরাদুনেই,

এক খাটে শুয়ে জেনের ঘুম হল না।

আর পরের দিন ব্রেকফাস্টে ডাকোস্টা বলেছিলেন, এখন তুমি বড় হচ্ছো, জেন, আগামী বছর সিনিয়ার সেকশনে যাবে। দেখবে চাকররা, আয়ারা মিস বলবে।

ব্রেকফাস্টেই তো। আর তখন উজ্জ্বল হলুদ আলো ধবধবে টেবলক্লথে, নীলের লেশ লাগা ক্রোকারিতে। টোস্ট, ডিম, ইত্যাদি থেকে টাটকা ভাজা ধোঁয়া আর সৌরভ। তা হলেও সে যেন চোখে রোদ লাগার ভয়ে চোখ আড়াল করেছিল। অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, যেন ডুবে যেতে যেতে, আমি আর মম বলবো না?

তা বলো। নিশ্চয় বলবে।

তখনই তো সে বুঝতে পারছিল, এমন হতে পারে না যে ডাকোস্টা প্রকৃতপক্ষে তার মা। এই কল্পনাই ভুল, যদিও তা জেন নামে একটি মেয়েকে নিরাময় করেছিল। নতুবা সেই মর্যাদাময়ী পুণ্যচরিত্রা অবিবাহিতা মাদার সুপিরিয়ারের সঙ্গে কোন পুরুষের গোপন পাপসংস্রবের কথা ভাবতে হয়।

৩

গরম কফির কাপ ঠোঁটে, তা সত্ত্বেও সে শিউরে উঠল। সে নিজেকে বোঝালে কেপে উপরের অংশ ঢাকা থাকলেও সিল্কের শেমিজ ভেদ করে পায়ের দিকে থেকে শীত উঠছে। তা ছাড়া শীতের শেষ রাতে টেম্পারেচর কোথায় নামছে কে বলবে? সে পা গুটিয়ে বিছানায় বসে রাগ টেনে নিয়ে স্থির করলে, কফি শেষ হলেই শুয়ে পড়বে।

ডাক্তারকেও ভয় পেতে হয়। সে অন্ধকার লাইব্রেরির দরজার দিকে তাকাল। যেন সেদিক দিয়ে কিছু আসবে, যদিও তা হতে পারে না।

তার মনে ছবি হয়ে আসছে সেই ভয়ের বাত। যা চারিদিক কাচে ঘেরা থাকলেও

লখনৌ ব্রাদারহুড অব মিশনস পরিচালিত জেনারেল হসপিট্যালের রেসিডেন্ট অফিসার জেন এয়ার। রাত আটটাতে ডিউটি শুরু। সে সাতটা পঁয়তাল্লিশে, সেখানে যেমন নিয়ম, ইন করে আটটার পাঁচ মিনিট আগেই পোশাক, অর্থাৎ ডেনিম বেলবটম ট্রাউজার্স ও জ্যাকেটের উপরে সাদা ডাক্তারি জোব্বা পরে স্টেথো গলায় ঝুলিয়ে রাউন্ডে বেরিয়েছিল।

ফার্স্ট ফ্লোরটা তার চার্জে। সেখানে ওয়ার্ড ও কেবিনগুলো একটা সেন্ট্রাল রেকট্যাঙ্গলের চারিদিকে। রেকট্যাঙ্গলটার তিনদিকে আড়াইফিট সিমেন্ট দেয়ালের উপর থেকে কাচ ও অ্যালুমিনিয়ামের দেয়াল, জানালা, দরজা। সে কাচের বৈশিষ্ট্য এই যে বাইরে থেকে ভিতরে দেখা যায় না, ভিতর থেকে যে প্যাসেজগুলো তাকে ঘিরে, দিনে রাতে তা স্পষ্ট দেখা যায়। দিনের বেলা সে দেয়াল অস্বচ্ছ দুধ-সাদা কাচকড়া, রাতে প্লাস্টিক স্কোয়ার, যার ভিতর থেকে আলোর আভা আসছে।

রেকট্যাঙ্গলটাকে চওড়ার দিকে ভাগ করে অপারেশন থিয়েটার, তার স্টোর, ডাক্তারদের ডরমিটরি। শেষেরটা ভাগ করে পিছন দিকটা ডাক্তারদের বাথ। নার্সদের স্বতন্ত্র ডরমিটরি অন্যপ্রান্তে, সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের পিছনে।

সে রাতে কোন রোগী ইনটেনসিব কেয়ারে ছিল না, অকসিজেনেও কেউ নয়। পিসফুল রাত। কেউ মৃদু কাতরাচ্ছিল, কেউ কেউ ঘুমাতে পারছিল না। অধিকাংশ নিশ্চিন্ত ঘুমে। রোগীদের শিয়রে দেয়ালের প্যানেলে মৃদু আলো জ্বলছে। ডাক্তার রাউন্ড শেষ করে এগোবে, নার্স পিছন পিছন সেগুলোকে নিবিয়ে দিতে থাকবে, পরে ওয়ার্ডটায় মৃদু শান্তির নীল আলোর প্রলেপ থাকবে শুধু।

নিঃশব্দে চলে, ঘুমন্তকে ডিস্টার্ব না করে, শুধু শিয়রের কেসহিস্ট্রি পড়ে, কখনও নার্সের সঙ্গে মৃদুস্বরে আলোচনা করে, যে রোগী ঘুমাচ্ছে না তাকে ঘুমাতে অনুরোধ করে, কখনও চিন্তাকুল মুখে কোন রোগীকে নাড়ীতে, স্টেথস্কোপে দেখে, একটা ঘুমের ওষুধ লিখে, নার্সকে তখনই তা দিতে বলে, মেডিক্যাল ওয়ার্ড ও মেডিক্যাল কেবিন কয়েকটি শেষ করে সে সার্জিক্যালে ঢুকেছিল।

সেদিন সেখানে ঠিক বারোজন, দুজন নার্স পাহারায়। সার্জনরা প্রয়োজন মতো সিডেটিব দিয়ে দিয়েছে। তবু দুজন ছিল যারা অস্বস্তি বোধ করছে, ঘুম হচ্ছে না। একজনের দুদিনের আগের অপারেশন। তার নাড়ী দেখলে, বুক দেখলে, প্রেশার নিলে। হেসে বললে, সব নর্ম্যাল। এখনই ঘুমিয়ে পড়বেন। চিন্তার কিছু নেই। অন্যজনের সেদিনই মাইনর অপারেশন হয়েছে, কিন্তু রোগীও মাইনর। একা বোধ করছে। হয়তো একই ঘরে ভাই বা বোনের সঙ্গে ঘুমাতে অভ্যস্ত। তার কাছে দাঁড়িয়ে সে বললে, কালই খেলতে চাও? তা হবে না। ঠিক সাতদিনের মাথায়। এখন ঘুমাও। সিস্টারকে বলে যাচ্ছি, তোমার দু হাতের মধ্যে বসবেন।

কেবিনগুলোকে দেখতে গিয়ে প্রায় একই রকম ফল হল। কিন্তু দুটো কেবিনে দুজন ছিল, যাদের অপারেশন কাল হবে। তারা দুজনেই জেগে ছিল। প্রথম জেগে থাকা রোগী, একজন মাঝবয়সী পুরুষ। সে আধশোয়া অবস্থায় সিলিংএর আলোর দিকে চেয়ে আছে। সে ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপনি বেশ ভাল আছেন। শেভ করেন নি কেন? লোকটি তার হাত তুলে ধরলে। সে হাত বাড়িয়ে নাড়ী ছুঁলে তার, ততক্ষণে কেসহিস্ট্রি পড়ে নিলে, হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, শুয়ে পড়ুন, ওষুধ দেয়া আছে, ঘুমিয়ে পড়বেন।

ফিমেল কেবিনের কেসটিকে দেখে মনে হল, ঘুমিয়ে আছে। চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। তার কাছে পৌঁছাতে রাত দশটা বেজে গিয়েছে। শিয়রের কেসহিস্ট্রিতে দেখা গেল, টিউমার অপারেশন, ডান কানের তিন ইঞ্চি উপরে ব্রেনে। মেজর তো বটেই। এখনই দেখো, ড্রিপ, অক্সিজেন ইত্যাদি দেয়াল ঘেঁষে জড়ো করে রাখা ; এই সেই মেরিয়ান, মেরিয়ান রয়, যার অপারেশনের জন্য ম্যাকডুগাল আসছেন কাল সকালে। ডাক্তার হলেও বা, এরকম সব অপারেশন ভাবতে ভারি হয়ে যায় না মন? পঞ্চাশ পার হওয়া বয়স। কালো চুলের ইউরেশিয়ান মনে হয়। ঘরের আলো কমিয়ে দেয়া– এমন যে গা ঢাকা চাদরের, রাগের ছোট ছোট ভাঁজগুলো মধ্যে কোমল ছায়া, সেই রকম ছায়ার মধ্যেই হলুদ ক্লান্ত মুখ।

হেঁট হয়ে তার মুখটাকে দেখতে গেল জেন। ম্যাসিব সিডেশন। তাও ঘুমায় নি। যেন নিঃশব্দে পড়ে থেকে ডাক্তার নার্সদের পায়ের শব্দ শুনছে, তাদের নড়াচড়া দেখছে। এসব কেস তো যন্ত্রণা কমাতেই সিডেটিবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রোগিনীকে আশ্বস্ত করতেই সে তার নাড়ী দেখার জন্যে তার কবজিটাকে ছুঁতে গেল। তখনই সেই রোগিনী, যার নাম কেসহিস্ট্রিতে মেরিয়ান রয়, সেই অদ্ভুত কাজটা করলে। ডাক্তারের হাতের মধ্যে হাত তুলে দেয়ার বদলে, নিজের রোগা রোগা আঠা আঠা হলুদ আঙুল দিয়ে ডাক্তারের কবজি চেপে ধরেছিল।

রোগিনীর মাথার দুপাশে বালিশ উঁচু, খাঁজে মাথা, যে চোখটা বালিশের কাছে তাতে যেন জল এসে যাচ্ছে। আর তা কি গোপনে মুছে নিতে চেষ্টা করছে? অথবা তা কি সেই টিউমারের যন্ত্রণা? এমন নীরব ভঙ্গি অনেক কান্নার চাইতে মর্মন্তুদ হয়। আহা, সেই টিউমারে বাঁ চোখের মণিও বাঁ পাশে সরে গিয়ে ফিকসড ট্যারচা হয়ে আছে। এসব রোগী নিশ্চয়ই শুনে ফেলেছে, কী ধরনের অপারেশন, কত তার রিস্ক। নিশ্চয় শুনেছে তার জন্যই সেই বিখ্যাত সার্জন ম্যাকডুগাল এসেছে। সে সংবাদ হয়তো আশ্বস্ত না করে আরও ভীত করে, অজানা আতঙ্কে আচ্ছন্ন করে। সব চাইতে পুরনো ভয়। রুগ্ন হোক, যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হোক, তবুও তো মাটির উপরে, আলো বাতাসে– সবই এক অন্ধকারে ডুবে যাবে সেটাই ত্রাস।

সে রোগিনীর মুখের উপরে ঝুঁকে প্রথমে ইংরেজিতে, পরে লখনৌই উর্দুতে বললে, কিছু বলবেন?

রোগিনীর যে হাত তার কবজি ধরে আছে তা যেন উষ্ণ। টেম্পারেচর? আর তা ছাড়া একেই কি হোলডিং হ্যান্ডস বলে যাতে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে সকলেই আশ্রয় চায়—যেন সেই যাত্রার সময়ে সাহস চাওয়া।

রোগিনী কিছু বললে না, কিন্তু সে সময়ে জেন সেই স্থির সবজে টেরচা বাঁ চোখ দেখতে পেয়েছিল আবার।

সে মুখে হাসি এনে বলেছিল, রাত দশ হল, ঘুমান, কালই তো অপারেশন। ভয় করবেন না। পিসফুল থাকুন।

ডরমিটরিতে ফিরে সে খুব ভাল করে হাত ধুয়ে নিয়েছিল ডিসইনফেকট্যান্ট সাবানে। এপ্রনকোটটা খুলে সাবান নিয়ে সে একটু বাড়াবাড়িই করেছিল সেই রাতে। আর তা মেরিয়ান রয় নামে রোগিনীর ঘামা ঘামা আঙুলের জন্য বললে ক্ষতি কী?

হাত ধুতে ধুতে সে বেসিনের উপর আয়নায় নিজের মুখটাকে দেখেছিল। এপ্রনকোট হ্যাঙ্গারে তুলতে বুকখোলা জ্যাকেটে, যা পুষ্টস্তনে সুদৃশ্য, যার কলারের নিচে চিকচিকে সোনার চেনের আভাস, নিজেকে সে রোগীদের তুলনায় জীবনদীপ্ত অনুভব করে থাকবে।

সে প্রথমে টেলিফোন তুলে নাইটকলের নিশানা দিয়ে ইনচার্জ সার্জনকে ডেকে তুললে, তখন রাত এগারো হচ্ছে। যে রোগীটা দুদিনের আগের অপারেশনের পরে ঘুমাতে পারছে না, তার কথা আলাপ করে, ওপারের মত শুনে নিয়ে বলেছিল, তা হলে আবার বারোটায় দেখে নেবো।

তারপর স্লিপার পরে, ঢিলেঢালা হয়ে, চেয়ারে ডেকচেয়ারে, এমন কি চাদর বার করে খাটে বিছিয়ে তাতেও গা ঢেলে দেয়া যায়। নতুন বেডশীট বার করে নিলেই হল। কারণ যেটা পাতা থাকে তাতে পুরুষ কলিগদের সিগার, সিগারেটের গন্ধ থাকে। উল্টোটাও হয়। গত সপ্তাতেই টমলিনসন বলছিল, মাঝে মাঝে চাদরে এমন কসমেটিক মেয়ে গন্ধ থাকে যে ঘুম হয় না। আর সে বলেছিল, সে ভালো। ইনচার্জ মেডিক্যাল অফিসার ঘুমাবে, তা উচিত নয়।

সুতরাং সে হাত ধুয়ে চেয়ারে বসে বিয়ার মাগ ও বিয়ার বার করেছিল, সেই এম ডি, এম এস জেন ডাক্তার। আলোটা কমিয়ে স্তিমিত করলে, সে অবস্থায় ঘরেব আলো নীল, আর ভিতরের দিকে প্যাসেজে ঝোলানো আলোগুলো হলদে বলের মতো দেখায়।

সেই বিয়ারে কয়েক চুমুক দেয়ার পরই সে মুখ উঁচু করেছিল। আর তখনই স্তম্ভিত হতে হল। হসপিট্যালে অনেক মৃত্যু হয়, অনেক ক্ষুব্ধ আত্মাও এখানে অবলম্বনশূন্য হয়ে যায়। সে দেখতে পেলে, কাচের দেয়ালের গায়ে সাদা শ্রাউডে ঢাকা একটা শরীর ডরমিটরির নীলাভ আলোর সীমায় ভাসছে, যার হলদে কপাল, মুখ, গলা উপর থেকে নিচে আঁকা বাঁকা এক ফাটলে ফাটা। আর সেই চোখদুটি। জেন এক দৃষ্টিতে সেই চোখদুটিকেই দেখছিল, যেন তার প্রভাবে বাঁধা থেকে। যেন চোখদুটি উদভ্রান্ত, আগ্রহী যেন সেই কাচ ভেদ করে দেখতে, যেমন মাইক্রোস্কোপের উপরে হতে পারে। সোজাভাবে, বাঁকা করে, কিছু খুঁজছে, পাচ্ছে না, এগিয়ে পিছিয়ে তীব্র হচ্ছে। ভয়ে বিন বিন করে ঘাম ছুটে ছিল তার।

সে তার গরম কফির কাপ মুখ থেকে নামালে। আলোটা টেবলে রাখায় তা আয়নাতে প্রতিফলিত। যাতে তার শ্বেতপাথর মুখের লালচে ফ্রেকল যুক্ত একটা পাশ, একটা দীর্ঘপক্ষ চশমা খুলে রাখা বিস্ফারিত চোখ, কেপ ও সেই সবজে শেমিজের নিটোল বাস্ট। কিন্তু সেসব তার চোখে পড়ল না। সে ভাবলে, ভয়কে ভাবলে, টুকরো টুকরো করে দেখলে, তা কিন্তু আর থাকে না। দেখো, ক্রিশ্চান কালচারে, অন্তত অবচেতনে প্রেতাত্মা থাকতে পারে, শেষ হিসাবে ভয় কিন্তু

ইর‍্যাশনাল, অন্তত ডাক্তারের কাছে।

তার পরে, তার মনে পড়ল, সে বিয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল। চিনতেই পেরেছিল। বাইরে গিয়ে স্বর নিচু রেখে দৃঢ় ভাবে বলেছিল, ছি ছি, কাল আপনার অপারেশন, এমন করতে হয়! রাত এগারোটা হচ্ছে। তা ছাড়া অন্য রোগীরা ডিস্টার্বড হচ্ছে। নার্সরাই বা কী করে? আসুন, আসুন, শোবেন।

সে ভাবলে, গরম কফিটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খেয়ে এই শীতের রাতের তিনটেতে এমন ঘেমে উঠেছে। তো, ভয়কে অ্যানালাইজ করলে তা থাকে না। তো সে তখনই সেই মেরিয়ান রয়কে তার কেবিনে নিয়ে নার্সের সাহায্যে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। এখন তো বোঝাই যায়, সে বিছানা থেকে ডরমিটারির কাছে আসতে বিছানার চাদরে গা ঢেকে নিয়েছিল। তার মাথার ফাটলটা, মুখে কপালে এসে পড়া তার চুলের খেই, যা কাচের ওপারে সে রকম দেখিয়েছিল। হাঁটুর দিক থেকে পা পর্যন্ত সিমেন্ট দেয়াল বলে, শূন্যে ভাসছিল মনে হয়েছিল। ভয় তো ইর‍্যাশনালই, সব আবেগও তাই, এমন কি ভালোবাসাও।

৪

রাত তিনটে হল। সে সাইকোলজিস্ট নয় ; তা হলেও, সকলেই জানে, স্বপ্নে যেমন ঘটনা থেকে ঘটনায় চলে যেতে হয়, গভীর স্তরের আবেগও তেমন ভয়ে, হতাশায়, ভালোবাসা প্রকাশিত হয়ে নাম পাওয়ার আগে একই থাকে, পরে বদলে যায়, যেন স্বপ্নের ঘোরে ; কখন তা তুমি বলতে পারো না।

সে নিজেকে বোঝালে, ওবা সকলে বলেছে দুঃস্বপ্ন, নাইটমেয়ার সবই ঘুমকে নিশ্চিত করতে। তা যদি হয়ে থাকে, তার এই ভয়ের চিন্তাগুলোর পরে এখন তার নিশ্চিন্ত একটা ঘুম হওয়া উচিত। তা ছাড়া, দেখো, মাকড়সাটা তার এত নড়াচরা সত্ত্বেও দেয়ালে আঁকার মতো স্থির। সে বালিশে কনুই রেখে রাগে গলা পর্যন্ত ঢেকে পায়ের দিকের সেই মাকড়সার দেয়ালের দিকে তাকালে।

হ্যাঁ, একদিন আবার সে ডাকোস্টার প্রাইভেট চেম্বারে গিয়েছিল। সেটা তো স্বাভাবিকই। সে নিজের সঙ্গে তর্ক করে যখন বুঝে নিয়েছিল সেই পুণ্যচারিণী ব্রহ্মচারিনী তার জননী হতে পারে না ; তার পরও ডিসিপ্লিনের খাতিরে সকলের মতো তাকে মাদার বলে চললেও, জনান্তিকে মুখোমুখি হলে সে তাকে মমই বলে এমনকি ডাক্তার হওয়ার পরেও ; এখন সে আর ছাত্রী নয়, ছাত্রীস্থানীয়ও নয় ডাকোস্টার। তা ছাড়া সুযোগ পেলে তার জন্য সামান্য কিছু ফাইফরমাস খাটা, না বললেও, প্রয়োজন না থাকলেও তার চেম্বারের ফার্নিচার মুছে দেয়া, ফাইলের ধুলো ঝেড়ে দেয়া। সে সবই যেন ওই মম বলার লুকানো অধিকারের মতো।

নিজে সে বললে, তুমি করিয়ে নেবে, মম, তা হলেই হয়েছে।

তখন সে অ্যান্টিরুমের অজস্র ধুলোভরা ফাইলগুলোর কথা জানতো। এমন সব পুরনো ফাইল যার উপর দিয়ে মাকড়শা জাল বুনে গিয়েছে।

সে তো কনভেন্ট ছাড়ার, ডাক্তারি পড়ার, মেডিক্যাল অফিসার হওয়ার, এমনকি সেই মেরিয়ানের ফেটাল অপারেশনেরও পরে।

মাদার, মম।

সত্তরের প্লাটিনাম চুলের নিচে ডাকোস্টার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়েছিল। বসো ডারলিং, কেমন আছো? অনেকদিন পরে এলে।

তা, এখানে না হলেও, চার্চে, হসপিট্যালে, বাজারে, মাঝে মাঝেই তো দেখা হয়ে যায় আপনার সঙ্গে।

তা তো হবেই, সে ভাবল এখন, ডাকোস্টা যেমন সেই মিশন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, হসপিট্যালের অন্যতম ভিজিটার, কনভেন্ট স্কুল ও কলেজের ডীন, এমেরিটাস অধ্যাপক, মাদার সুপিরিয়ার। সবদিকে ছড়ানো তার বাহু।

তার মনে পড়ল।

সে তার হ্যান্ডব্যাগের ক্ল্যাম্পটাকে বারবার খুলতে আর বন্ধ করতে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, মম, তুমি তো এখনও সিনিয়ার মেয়েদের, যারা কনভেন্টের, এখনকার নাম তো কলেজ, সেখানে পড়ে, তাদের কি ডিসকভারি পড়াও না?

ডিসকভারি? কীসের ডিসকভারি? ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া? ডাকোস্টা হাসল।

তার সে হাসি, ভাবলে সে এখন, হয়তো মনে মনে এই বলা, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর থেকে মেয়েটিকে ভিতরে বাইরে চিনি। চালাকি করে কিছু বলছে। হাসতে হাসতেই ডাকোস্টা বললে, তবে? সাহিত্যের ডিসকভারি? আচ্ছা! এখনও অ্যারিস্টটল ভাবতে সময় পাও, ডাক্তার?

আর সে বলেছিল, অ্যারিস্টটলে ছিল, না? তা এখনো আমাদের সময়ের সিনিয়ার কোর্স কি এখানকার কলেজে পড়ানো হয়?

না, যারা এম. এ পড়ে তারা কখনও কখনও পড়তে আসে, তাও যারা গ্রীক লিটারেচর নেয়। বেশির ভাগ কিন্তু এখন আমেরিকানে ঝুঁকছে। এ বছরে আমাদের ছাত্রীদের একজন মাত্র গ্রীক নিয়েছে। তা তোমার নিশ্চয় মনে আছে, ওটা যাকে তুমি মাদার ডাকোস্টা বলে জেনে এসেছো, সে প্রকৃতপক্ষে মিস্ ফ্রাদারিং হ্যাস–এরকম নয়। যাকে শত্রু ভাবতে প্রকৃতপক্ষে সে মিত্র, এরকম নয়। যে জীবনকে তুমি পূর্ণতার, আনন্দের বলে জানতে, সে জীবন এক নিদারুণ ঘৃণার, এরকম আবিষ্কারই সেই ডিসকভারি। তোমার মনে আছে? যেমন অয়দিপৌসে।

তুমি সেরকমই পড়াতে বটে, মম। কিন্তু কী ধুলো তোমার ঘরে। আর ওই ফাইল ঘর তো অগম্য। জেন র‍্যাকে রাখা একটা ফাইলে হাতের তেলো ঠুকতেই ধুলো উড়ল। সে বলেছিল, ছি, মম, এখনও ধুলো ঝাড়ার লোক হল না তোমার?

কেন থাকবে না। জোয়াকিম ঝাড়ে মাঝে মাঝে, তুমিও ঝাড়তে আগে।

তা হলে তুমি বাইরে যাও, আমি কিছু ঝেড়ে দিই আজ।

তার চাইতে বসো, গল্প করি। আজ কি ছুটি? জোয়াকিমকে বলো, তুমি এখানে লাঞ্চ করবে আজ। ডাকোস্টা বেল বাজিয়ে জোয়াকিমকে ডেকে নিজেই বলে দিয়েছিল লাঞ্চের কথা। আর সে নিজে এখন ডাকোস্টাকে মেরিয়ান রয়ের কেসটা, ডাকোস্টা জানে কিনা, জিজ্ঞাসা করেছিল।

জানবো না কেন? তার জন্যই তো ম্যাকডুগালকে আনিয়েছিল মিশন অত টাকা দিয়ে। স্যাড! কেন স্যাড? মৃত্যু বলেই কী?

যে ফাইলটা থেকে জেন তার আগে ধুলো উড়িয়েছিল সেটাকে হাতে নিলে ডাকোস্টা, আর সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে একটা সরু, কালো, কিন্তু নিঃসন্দেহে একটা মাকড়সা বেরিয়ে টেবিলে হাঁটতে শুরু করলে।

আর সে নিজে তো তখন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেয়ার ছেড়ে–

ডাকোস্টা বরং হেসে বলেছিল, তোমার বুঝি মাকড়ফোবিয়া? আমার আবার বিড়ালে অ্যালার্জি। মনে হয় পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে সর্দি হবে। ডাকোস্টা হাসল।

সে নিজে চেয়ারে ফিরে বলেছিল রাগ করে, আচ্ছা এতসব ফাইল রাখো কেন বলো তো?

কী হয় ওই ঘর বোঝাই ফাইলে তোমাদের মিশনের?

কিছুই না। আমাদের একটা স্টাইল। আমাদের মিশনের ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবস্থা থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত খোঁজখবর রাখা বলতে পারো। স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাদের চিঠিপত্র আসে, কার্টেসিতে, প্রয়োজনে। সেসবও থাকে ফাইলে। সব ফাইল থাকে না। মৃত্যুর পরে কারো আত্মীয়স্বজন চাইলে দিয়ে দেয়া হয়। যেমন তোমার ফাইলটা। ছুটির দরখাস্ত পেয়ে উপরে রাখা হয়েছে। আউটিং-এ তা হলে যেতে ইচ্ছা হয়েছে এতদিনে? কালই তোমাব ফাইলটা এনেছি এখানে। যা তোমাকে এখন দিয়ে দেয়া যায়, আলাদা সার্ভিস ফাইল খুলে। এই ফাইলে তোমার নিজের হাতের লেখা বড় বড় অক্ষরে তোমার সেই বিড়াল ধরাব ব্যাপারটা আছে। মনে আছে? কার না কার বিড়াল, তা ধরতে সাত আট বছরের অতটুকু মেয়ে ডানডাস হস্টেলের গ্যাবেলড রুফে উঠেছিল। কী? না, আই অলওয়েজ লাভ ক্যাট।

বেশ ইনট্রেস্টিং তো! আমি লিখেছিলাম? আচ্ছা মম, মেরিয়ানের কেস স্যাড কেন?

ওই তো ফাইলটা। সব চাইতে পুরনোগুলোর একটা। একেবারে বাল্যের কথা নেই। আমাদের কাছে উঁচু ক্লাসেই এসেছিল। তখন এদিকে মেডিক্যাল পড়ার তত সুবিধা না থাকায়, কলকাতায় গিয়েছিল। ফাস্ট লাইফ ভালোবাসত। তখন কলকাতা সাদা-কালো আর্মিতে ভরা। ওয়াকাই হয়েছিল পড়া ছেড়ে। উইমেন অকজিলিয়ারি। বছর দু-একের মধ্যে একটা জুয়েলারির গোলমালে চাকরি যায়। আমাদের সাহায্য চায়, কনফেস করে। আবার মিশন তাকে নার্স ও ড্রাগিস্ট কোর্সে পড়তে সাহায্য করে। নার্স হওয়ার পর আবার উধাও। পরে বিয়ে করে। ফিপটি-এইটে। তখন আবার লিখেছিল চিঠি। এক প্রাইভেট ক্লিনিক করেছিল। সে কথা তুলে কী হবে? কালপেবল হোমিসাইড এর জন্য লাইফ হয়। আনএথিক্যাল অপারেশনে স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটিয়েছিল। ক্রাইম এগেইনস্ট আনবর্ন লাইফও। জেলে হসপিট্যালাইজড হওয়ার এক দেড় বছর আগে হেলথ গ্রাউন্ডসে ছেড়ে দিয়েছিল।

শুনতে শুনতে সে নিজে একেবাবে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। সে বোধহয় বলেছিল, তবু তার জন্য দশ হাজার দিয়ে ম্যাকডুগালকে আনা অপারেশন করতে?

বা, সে তো কনফেস করেছিল। সাহায্যের জন্য অ্যাপীল করেছিল। অমন যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল। চলো দেখিগে, জোয়াকিম লাঞ্চের কী করছে।

৫

দেখো, সে নিজেকে শোনালে, দশটায় বই নিয়ে শুয়েছিলে, তার পরে পাঁচ ঘন্টা হয়ে গেল। নাকি মনের এক অংশ তখনই স্থির করেছিল সে ঘুমাবে না, সজাগ রাখবে নার্ভস, যাতে সেরকম সিচুয়েশন দেখা দিলে কথা বলে বলে সেই সিচুয়েশন থেকে বেরিয়ে আসার মতো সফিস্টিকেটেড আর ডিজআর্মিং রাখতে পারে কথা আর হাসিকে। যাকে এই কথা বলা হয়েছিল, সেই যেন এতক্ষণে উত্তর দিলে, বাহ্, এই কফি খাওয়ায় নার্ভস শান্ত হলে, এক ঘুমে দিনের আলোর টাটকা আটটা বাজবে না? ভেবে কী হয়? ছোট বড় তরঙ্গ আসতে থাকে, তার মধ্যে কোনটার ট্রফে তোমার তোমার নৌকা ডুবে যাবে বলতে পারো?

আশ্চর্য দক্ষতা ম্যাকডুগালের, মানুষের স্কাল খুলে, তাকে জীবিত রেখে মার্বেল মাপের একটা টিউমার ব্রেন থেকে সরানো। ম্যাকডুগালকে সাহায্য করতে, নিজেরাও অভিজ্ঞতা লাভ করতে, দুইজন মেডসিনের, তিনজন সার্জারির স্পেশালিস্ট, মিশন হসপিট্যাল আর সরকারি হসপিট্যাল থেকে

উপস্থিত ছিল। সে তো এম ডি আর এম এস--সে হিসাবে ম্যাকডুগালের স্পেশাল চয়েস ছিল। অপারেশন শেষ হলে, সেই বিখ্যাত সার্জন ম্যাকডুগাল, কী ফ্যাকাশে এখন, সেই গুরু দায়িত্বের চাপে আর পরিশ্রমে, সে বলেছিল, ভালো সহ্য করেছে। জ্ঞান খুব ধীরে আসবে, সময় নেবে, অজ্ঞান থেকে কোমার মতো, পরে জ্ঞান আসবে। ওয়াচ তো রাখতেই হবে, অন্তত দুজন একসপার্টকে সময় ভাগ করে নিয়ে। তাই হয়েছিল।

সে, জেন নিজে আর টমলিনসন যে এম এস আর এফ আর সি এস, দুজানেই সে ভার নিয়েছিল।

কিন্তু মেরিয়ানকে বাঁচানো গেল না। জ্ঞানটাই যেন আগে এসে গেল। রাত তখন এগারোটা। অপারেশনের পরে বারো ঘণ্টা হয়েছে। অ্যাটেনড্যান্ট নার্স তাকে এসে বলেছিল হাসিমুখে, জ্ঞান হচ্ছে, মনে হচ্ছে। কবজি তো বিছানায় বাঁধা, ড্রিপে আটকানো। তা হলেও আঙুলগুলো নড়ছে বিছানায়, কী খুঁজছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখেছিল, শুধু আঙুল নাড়াই নয়, চোখদুটো পিটপিট করছে। সে তাড়াতাড়ি টমলিনসনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আর দুজনেই স্থির করেছিল, রোগিনী খুবই ডিসটার্বড, উত্তেজিত। ই সি জি গ্রাফ দেয়ালে তাই সমর্থন করছে। টমলিনসন ফিসফিস করে বললে, দেখো, চোখে জল, কিছু বলতে চেষ্টা করছে। উত্তেজনা বাড়তেই লাগল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, কিছু বলতে চাইছে। টমলিনসন ম্যাকডুগালকে ফোন করেছিল। ম্যাকডুগাল এসেছিল। সব রকম বুদ্ধিবিদ্যা দিয়ে রোগিনীর প্রশ্ন, চোখের জল, শেষে উঠে বসার চেষ্টা বন্ধ করা গেল না—থামল মৃত্যু এলে। সে নিজে রোগিনীর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, সব নরম্যাল, কিছু হারায়নি। তাতে তার অশ্রুকাতর, ব্যান্ডেজের আড়ালের বাইরে যতটুকু দেখা যায় সেই মুখের ভয়ের ভাব, উত্তেজনার ভাব কমেনি। এমনকি বিদ্যুৎ যখন ফেইল করছে, ম্যাকডুগাল এই অবস্থায় কী সিডেটিব দেবে, দেবে কি না ভাবছে, সে সেই রোগিনীর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বলেছিল, সেই চঞ্চল আঙুলগুলোকে তার নিজের গালে ছুঁইয়ে বলেছিল, সব নর্ম্যাল, কোন ভয় নেই। এই যে আমি, জেন, একজন ডাক্তার আর সার্জনও।

পরে সে ম্যাকডুগালকে জিজ্ঞাসা করেছিল। শিশুরা স্ট্রাবিসমাসকে ভয় পায়। রোগিনীর পক্ষে কি তা ঘটতে পারে?

ম্যাকডুগাল বলেছিল, তা কেন হবে? ব্রেনের ব্যাপার তো, ফেটাল হয়ে যায়ই। হয়তো সামান্য ইনটার্নাল হেমারেজে, কোন নার্ভে চাপ পড়েছিল, সেজন্য মুখে তেমন একসপ্রেশন, হয়তো মস্তিষ্কের যে অংশে স্মৃতি তা হয়তো পিনের মাথার সমান একটা ক্লটে উত্তেজিত হয়েছিল, হয়তো কোন সিমিলারিটি থেকে তোমাকে বা টমকে পূর্ব পরিচিত মনে হচ্ছিল। টিউমারটাকে সরাতে গিয়ে, কত নার্ভ জড়ানো ছিল, দেখেছিলে তো, হয়তো স্মৃতির সঙ্গে, পার্সোন্যালিটির সঙ্গে যুক্ত কোন নার্ভে চোট লেগেছিল। তার ফলে পার্সোন্যালিটি চেঞ্জের মতো কিছু অনুভব হতে পারে, খণ্ড খণ্ড ভাবে অতীত মনে আসছিল, যে অতীত তত ভাল ছিল না। সেই অতীত লোপ পেতে থাকলে ভয় হচ্ছিল। আসলে ব্রেন সম্বন্ধে আমরা এখনও সব কিছু জানি কি?

এখন শুয়ে পড়া ভাল, তখন লখনৌতে ভয়গুলো তরঙ্গের পর তরঙ্গ হয়ে আসছিল। সেগুলো ছোট বড় ছিল। তাদের মধ্যে শান্ত ট্রফ ছিল। কিন্তু সে ট্রফে নামতে গিয়ে নৌকার গলুই জলে ঢুকে গেলে নৌকা আর ওঠে না।

তো ভয়ই, কিংবা হতাশাই বলো, মেডসিনের স্পেশ্যালিস্ট, যে এম. ডি এবং এম এসও বটে, তার লখনৌ ত্যাগ করে এই এখানে আসার অন্য কারণ থাকতে পারে না। ডাকোস্টা, স্মোলেট ও পেছনের অনুরোধ উপেক্ষা করে। আর ভয়, হতাশা, যে কোন আবেগ, ডেথউইশ,—সবই তো ইর্‌্যাশনাল। সে তো—দুই তরঙ্গের মধ্যে শান্ত ট্রফে নামতে গিয়ে গলুই-এর অর্ধেকটা জলের তলায় গেলে নৌকা আর তোলা যায় না।

জেন রাগে গলা পর্যন্ত ঢেকে বই হাতে নিল। আসল কথা, এখন ঘুমাতে হয়। চারটে বাজতে চলেছে মার্চের এই রাতে। বইটা পেজমার্ক অনুসারে খুললে সে। চোখে ঘুম জড়িয়ে এলে ঘেরাটোপটাকে ঘুরিয়ে দিলেই আলোটা চোখ থেকে সরে যাবে।

ম্যানইটারটাকে মড়ি দিয়ে, মোষ দিয়ে, কোন রকমে কায়দা করা যাচ্ছে না। অন্যান্য বাঘ এসে মোষ খেয়ে যাচ্ছে, মড়ি উধাও হচ্ছে। একটা বাঘিনীও বিরক্ত করছে। অথচ ম্যানইটারটা যে বয়স্ক, খুঁড়িয়ে চলে এমন পুরুষ, সন্দেহ নেই। মরিয়া শিকারী স্থির করেছে, সেই ভৌতিক চাঁদের আলোর জঙ্গলে বাঘিনীর মতো ডেকে ম্যানইটার বাঘটাকে নিজের কাছে টেনে আনবে। সে বাঘিনীর মতো করে ডাকছে। আর দূর থেকে একটা বাঘ সাড়া দিয়ে এগোচ্ছে।

দেখো, এই ভয় ভয় ভাব, ভাবলে সে, আবার একরকম সুখও। অ্যাড্রিনাল স্রাবের ফলেই বোধ হয় সুখটা হয়। নতুবা গ্রেগ ক্রুস্টারও কেন জিম করবেট কিনে পড়ে? ওদিকে বলে, দুঃস্বপ্নও ঘুমকে নিশ্চিত করতেই, তা হলে এত ভয়ও তার ঘুমকে নিশ্চিত করতে পারে। তা ছাড়া, সে নিজেকে বললে, ভেবে দেখো, এই শীতে তাসিলা স্টেশনের অন্ধকারে বুড়ো নামগিয়াল আর থেনডুপ গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছে। কাল দিনে এগারোটায় জংশনে পৌছাবে। রেল পার্সেলগুলো নিয়ে বাজার করার পর বেলা একটার গাড়ি ধরতে পারলে, কাল সন্ধ্যায় তাসিলার পৌঁছাবে, তার মানে পরশুদিন দুপুরে পৌছাবে তারা এই বাংলোয়। আর যদি বাজার করার পর ট্রেন ধরতে না পারে, কালকের রাত জংশনে কাটিয়ে পরশুদিন রওনা হয়ে তারও পরের দিন দুপুরে বাংলোয় আসতে পারে। আরও তিনরাত আর পুরো দুটো দিন তাকে একা থাকতে হতে পারে। এমন হতে পারে না? যার জন্য ওরা ওষুধের ক্রেট, অপারেশনের যন্ত্রের ক্রেট, কলের ময়দা, কফি, মশলা, পোর্টের বোতল আনতে গিয়েছে, এসে দেখবে সে নেই।

সে রকম হয় না? অনাগত কাল, দিনের বেলাটার কথাই ভাবো, রাত দূরে থাক, সেই কী নির্জন। সে রকম নির্জনতাই যেখানে বাঘও এক চোখ খুলে এক চোখ বন্ধ করে যেন ঘুমায়। আর এখন তো লোকে জেনেই গিয়েছে, একজন ক্লুটলং-এ থাকছে। পোস্টমাস্টার পার্সেল, চিঠিতে নাম দেখছে। অসওয়াল, শর্মা তাকে মহিলা বলেই জানে। হাটের লোকেরাও তাকে দেখেছে। তারা নিশ্চয় আন্দাজ করছে, সে একা এখানে। আর ক্লুটলংটাও তার নিজস্ব এলাকা। বাঘিনীও তার নিজস্ব এলাকা চিহ্নিত করে নেয়। জিম করবেটই প্রমাণ। সে স্থির করলে, কাল দিনের বেলায় সে তার স্বাভাবিক পোশাকেই তাসিলায় ঘুরবে। মাদার সুপিরিয়ারের মতো স্টেটলি গাউনটা পরবে, মাথায় সাদা হ্যাট থাকবে।

কী আশ্চর্য, রাত চারটেতে অন্তত ঘুমাতে হয়। সে আপন মনে হাসল। উলটো দিক থেকে দেখো। জিম করবেটের হাতে শক্তিশালী রাইফেল, আর টর্চও। ওদিকে বাঘিনীর তো দাঁত আর থাবা। তাও বাঘিনী কিন্তু লড়াই না করে মরে না। হঠাৎ তার চোখের কোলে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। চোখ মুছে সে বিছানা থেকে নামল। কিচেনে গিয়ে স্টিলের চোখা মাথা পোকারটা আনলে। সেটাকে বিছানায় রেখে সেই ধারালো বিষয়টার ভরসায় ঘুমানোর জন্য তৈরি হয়ে আলোর সামনে বই নিয়ে শুয়ে পড়ল।

ওদিকে দেখো, পালানোর কারণটা কি সেই একটা অপারেশন? সে বইয়ে চোখ রেখে, নিজের মনের মধ্যেও দেখতে চেষ্টা করলে। সে কী সেই অপারেশনকে প্রতীক ভাবতে শুরু করেছিল? আর তার ভয়েই, যদিও সে স্থির হয়ে বিবেচনা করলে বোঝে, সেই অপারেশন নিশ্চয়ই কারো পার্সোন্যালিটি থেকে পাপ অতীত ছেঁচে ফেলা নয়। পাপ অতীত তুলে ফেলতে গিয়ে সময় কাল যে-ধুলোর প্রলেপ দিয়েছিল সেই অতীতকে, তা সরিয়ে রক্তাক্ত দগ্ধ স্মৃতিকে জানিয়ে দেয়াও হয় না। সে তো একটা টিউমার। অথচ সেই ভয়েই, নিজের মুহ্যমান বিবেচনাশক্তিকে বাঁচাতেই সে

কি এখানে পালায় নি? শহর জীবনের সুবিধা, স্বস্তি, বাস, ট্যাক্সি, কার, সব, অর্থাৎ বর্তমান কালকে পিছনে ফেলে? আর সে এখানে থাকবে বলেই স্থির করেছিল, তার প্রমাণ তো এই শেমিজের সিল্কপিসটা, যা এখানে বসে তৈরি করার জন্য লখনৌ থেকে এনেছিল, অর্থাৎ ক্রমশ জরার দিকে এগোনো সন্ন্যাসিনী হবে। নাকি রেসপ্লেনডেন্ট একজন নারী এবং ডাক্তার হিসাবে নিজস্ব, মার্কড আউট, এই ক্লুটলং-এ বাস করবে বলেই কি চেয়েছিল সে?

৬

তা কিন্তু সহজ নয়। সেই মরা চাঁদের আলোয় যে রেসপ্লেনডেন্ট বাঘিনীর অভিনয় করছে করবেট, সে নিশ্চয়ই বাঘের অভিজ্ঞতার ফলেই ম্যানইটারের এলাকার উপর দিয়ে যাওয়া আসা করে। নতুবা ম্যানইটার যেভাবে নিজের এলাকা চিহ্নিত রাখে, সেখানে কেউ আসে না।

সেদিনও জেন ভাবছিল, বিকেল হচ্ছে, বিকেল হচ্ছে। যার পরে সেই কুয়াশা অন্ধকারকে সাহায্য করবে নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গ রাত নামাতে। তখন সেই হাল্কা স্লিপিং ব্যাগ পিঠে দুদ্দাড় করে পাহাড় থেকে নামার আগে কী কী প্রয়োজনীয় নেবে সঙ্গে, তাও স্থির করার সময় ছিল না। কারণ কাঁধে জোয়াল নেই বটে, কিন্তু ধূসর ভালুক এক যেন হা হা করে হাসতে হাসতে পিছনে আসছে তখন। আর তাই নয় শুধু, অন্ধকার অন্ধকার হয়ে উঠতেই সেই ক্যাসকও নেই আর, এক উন্মত্ত উলঙ্গ পুরুষ আর বিকট স্বরে হাসছে যে।

ছুট ছুট, তুমি বলতে পারোনা, ক্রুদ্ধ, দুপায়ে ছুটে আসা সেই ভালুক অথবা লোমশ, অস্নাত, উলঙ্গ গ্রেগ, কে বেশি ভয়ঙ্কর। ওদিকে আবার লখনৌ-এ সেই মেরিয়ান রয়, যার স্মৃতি থেকে সব পাপ ছেঁচে ফেলার চেষ্টায় স্মৃতিতে আগুন জ্বালা ঘা করা হয়েছিল। তা হলেও, লখনৌ এক গর-ঠিকানি মেয়ের সেই আশ্রয় ছিল, বোধহয়, নিজের মনের অগোচরে ; নতুবা আমার সব কিছু মাদার ডাকোস্টা লখনৌ মিশনে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ রেখেছিল কেন টেবলে?

পাঠক মহাশয়, জেন ডাক্তার, বিদেশিনী বটে, কিন্তু এক মাতৃহীনা অভিমানিনী কন্যা কল্পনা করুন। রূপসী পাঠিকা, জেন তো শেষ হিসাবে একজন স্ত্রীলোক, যে বনে বিচ্ছিন্ন টিলার নির্জন বাংলোয় দিবসান্তে কখনও এপাশে কখনও ওপাশে, কখনও পাশের ঘর থেকে কাউকে হাসতে শুনছে। বুঝতে পারছে, যে হাসছে সে সেই নির্জন বাংলোয় থাকতে গিয়েই উন্মাদ হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারির সেই বিকেলে জেন নারেঙ্গিহাটের বনপথ পার হতে না হতে অন্ধকার। অন্য সময়ে সঙ্গী থাকলেও সেপথে সে রকম অন্ধকারে যেতে রাজি হবে না সে। অন্য সময়ে সে রকম চার পাঁচ ঘণ্টা ছুটতে তার হার্টও থেমে যেতো। সাতটাতে তাসিলা রোড। তখন গভীর কুয়াশায় রাত্রি এক প্রহর, হিম গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে ঝরছে। যেন অন্য কোথাও প্রাণকে নিতে নিজের ফুসফুস আর হার্টকে বাজি রেখেছে। ভাবার, টিকেট করার, জিজ্ঞাসা করার সময় তখন থাকে না। গার্ডের গাড়িরও পরে একটা কামরার হাতল ধরতে পেরেছিল। আর সে সেই কামরায় উঠে বসতেই ঠং ঠং করে লোহার রেল পিটিয়ে, ফরর করে গার্ডের হুইসিল বাজিয়ে, ক্যাঁ করে ভেঁপু দিয়ে, গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল। তখনও অন্ধকারে কামরা। ঠিক বাইরে উলঙ্গ সেই গ্রেগ খুঁত খুঁত করে হাসছে, হাঁপাচ্ছে। যদিও অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, সেই নর্ডিক অকসোনিয়ান তখন উলঙ্গ কিনা। তখন জেন বেঞ্চে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে গাড়িটা রেলে না চলে, তার বুকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

তারপরে চোখ খুলে সে দেখলে, সিলিং এ নিষ্প্রভ হলদে এক বালবের নিচে সে একা। কামরার দরজা-জানালাগুলো খোলা। গাড়ির গতিতে নড়ছে, শব্দ করে পড়ছে, হু-হু করে হিম আর হিমেল

বাতাস ঢুকছে আর রাত্রির অন্ধকার। সে তাড়াতাড়ি উঠে জানালাগুলোকে, দরজা চারটেকে বন্ধ করতে গিয়ে দেখলে, তার বাঁ হাতের দিকের একটা দরজায় ক্যাচ নেই, বাইরে থেকে চাবি মোচড়ালেই খুলে যাবে। তা হোক।

সে তো ডিসেম্বরের আসার সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানতো, গাড়িটা পঞ্চাশ কিমি পেরিয়ে হাতিঘিষায় যেতে দুলে দুলে ক্যাচ ক্যাচ করে, শান্টিং করে করে মাঝরাত পর্যন্ত চলবে, সারা রাত হাতিঘিষায় থেকে কাল সকালে আবার তাসিলায় ফিরবে। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়াই একমাত্র কাজ। তার তো অভিজ্ঞতাই আছে, দুমাস আগেকার ডিসেম্বরের। গাড়ির কামরাই সেফ, বলেছিল সেই গার্ড। শরীর প্রশ্ন তুলতে চেষ্টা করছিল, একটু জল খাবে কি না, রাতে স্লিপিং ব্যাগে ঘুম হবে কি না। কিন্তু সে যাকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া বলে শরীরকে, তা করে শরীরকে শুনিয়ে দিলে, হাঁপ ছেড়েছে, বুকটা চলছে, এই যথেষ্ট মনে করো।

জনশূন্যতা, অন্ধকার, শীত, এ সবেরই পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। মাথার উপরের হলুদ বালবটার কখনও নিস্তেজ হয়ে লাল কয়েকটি রেখা হয়ে যাওয়া, পরে আবার হলুদ হয়ে যাওয়া—তাও পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানা ছিল। সেবার সবগুলো জানালায় কাঠের শার্সি ছিল। এবার ডানদিকের একটায় শুধু কাচ। তার প্রায় কালো গায়ে, টিভির স্ক্রিনে যেমন, বনের সিলুয়েট, দু একবার আলোর বিন্দু, কখনও লাল, কখনও তা সবুজ, ফুটছে। তার অর্থ শান্টিংএ এগোচ্ছে পিছোচ্ছে গাড়ি।

এখন দুই বেঞ্চের মধ্যে তার স্লিপিং ব্যাগটাকে বিছিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে সে। শুতে গিয়ে সে অনুভব করলে, বুকের তান্ডব থেমেছে, কিন্তু ঘুমাতে হলে জিন ছেড়ে, কিমোনো পরে নিলে ভাল হবে। তা করতে গিয়ে সে বুঝতে পারলে, সে আন্ডার গার্মেন্টসের চেঞ্জও আনে নি।

সে ব্যাগে ঢুকে শুয়ে পড়ল। এই সময়ে শার্সিতে শব্দ করে বৃষ্টি নামল। অন্ধকারে ছাই রঙের শার্সিতে বাইরের বনের কালো সিলুয়েট কেঁপে কেঁপে সরে যাচ্ছে। একেবারে তলিয়ে গিয়ে মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘুমিয়ে পড়া ভাল। একটু স্বস্তি তো বটে। কাল সকালে গাড়ি চলবে তখন সে ক্লটলং থেকে দূরে।

পনের মিনিটেই ঘটাং করে শব্দ হল। গুড়গুড় করে চলার শব্দটা থমকে দাঁড়াল। শান্টিং, এই ভাবলে সে। মাথার উপরে হলুদ আলোটা দপ করে নিবে গেল। অ্যাকসিডেন্ট নয়, সে আস্ত আছে। গাড়ি চললেই আলো আসবে। একটা মুক্তির স্বাদ যেন, নয়? সে কি সত্যি লখনৌ ফিরবে? না, বোধহয় না, বোধহয় না। একটা ফোঁপানি উঠল তার মনে। অন্য কোথাও।

গাড়ি চলার শব্দ হল। হারানো সৈনিকের যা কিছু, নেকস্ট অব কিনের কাছে পৌঁছে যায় কিন্তু। সে রকম নির্দেশ কি সে রেখে আসে নি? কিন্তু আলো আর জ্বলছে না। এখন কামরায় এক মাত্র কাচের শার্সি দিয়ে যে ঝাপসা আলো ভাব। কী আশ্চর্য, তার এই কামরা তো পাথর, নড়ছে না, কাঁপছে না। তিন মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট। একটা ভেঁপু বাজল। তা কিন্তু অনেক দূরে।

সে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুললে। অন্ধকাব বন, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে দূরে, বাঁয়ে, তা এক ক্রোশ দূরে হবে, আকাশে লাল এক আলোর বিন্দু। দরজায় ঝুঁকে শুধু তাই দেখা গেল। সম্ভবত কোন স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগন্যাল হবে। ডাইনে প্রায় তত দূরেই গার্ডের গাড়ির লালপুচ্ছ বাঁকে অদৃশ্য হল। দরজা দিয়ে যতদূর সম্ভব ঝুঁকেও গাড়ির আর কিছু দেখা গেল না।

তা হলে তার এই কামরা কোথায়? মৃত্যুর পরে? নির্জনতা, অন্ধকার, অসহায়তা, উপায়হীনতা—এসবের আক্রমণে অভিভূত, ভীত, বুদ্ধিহীন, পাথর হয়ে সে দরজা আর স্লিপিং ব্যাগের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পড়ল। সে কী চিৎকার করে কাউকে কিছু বলবে? সে তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগের

কাছে গেল, যেন তখনই তা গুটিয়ে নিয়ে কামরা থেকে নেমে পড়বে। মনে মনে বললে, বোঝাই যাচ্ছে, গার্ডের কামরার পরে এই কামরাটা কোন বাফার লাইনে পরিত্যক্ত হবে বলেই তেমন জোড়া হয়েছিল। সে কামনা করলে, তার মনের চারদিকে দেয়াল হোক চিন্তার পথ বন্ধ করে। কিন্তু এমন নয় সে অন্ধকার, যা সে বাইরে দেখেছে, শার্সিটা যার ছবি হয়ে আছে, যে দেয়াল হবে। বরং কালো, হাল্কা কালো, সবুজ কালো মিশিয়ে বন আর প্রান্তর, যার দিকে চাইলেই তা ছড়ায় আর গভীর হয়।

ভাববো না বলা সোজা, বরং উলটোটা হয় বললে। সে যে তাসিলা থেকে হাতিঘিষার পথের টপোগ্রাফি সম্বন্ধে এত শুনেছে খেনডুপ আর নামগিয়ালের কাছে, তাই সে জানতো না। ম্যানইটার বাঘ নেই, চিতা আছে, ভালুক ও বাইসন আছে, হাতি আগের চাইতে কম, কিন্তু নুমপাই ধ্বংসের ফলে একটা দল এদিকে আটকে পড়েছে, যারা মানুষের আধিক্যে বরং উত্যক্ত, ক্রুদ্ধ। উপরন্তু এটা স্মাগলারদের পথও, রাজপথই বলতে পারো। আর তারা হিংস্র, বেপরোয়া, সশস্ত্র, আর দলবদ্ধ হয়ে থাকে। দরজার ক্যাচ বন্ধ না করেই, পালানোর পথ রেখে, সে স্লিপিং ব্যাগের কাছে বেঞ্চে বসল। বুকের ভিতরে টিপ টিপ করছে। মৃত্যু শব্দটা আসতে লাগল মনে। উপরন্তু ডাক্তার হওয়ায়, সেবকম অনেক বড়ি একসঙ্গে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর কোনদিনই না জাগার লোভ এল তার মনে।

সে সময়েই সেই বেঞ্চে বসে নিজেকে সে শোনালে, মনেরই তো আতঙ্ক। ইংরেজি, উর্দু, বাংলা এসব তো মনের জামার মতো, খুলছি, পরছি। ডাক্তারি? শব্দটার চারদিকে, তা যেন ব্যাগে জমানো সঞ্চয়, ঘুরল তার মন। ফেলে দিতে কষ্টই হয়। সে নিজেকে বুঝতে বললে, তোমার এই কেসটা একটা ম্যাসিব সিডেটিবের। তোমার মন ঘুমিয়ে না পড়লে শকেই প্রাণ যাবে। সে সেই ম্লানের চাইতেই ম্লান অন্ধকারে নিজেব হাতদুটোকে দেখলে। এই শরীর যা উষ্ণ। আর সেই শরীর তখন কী এক ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে থাকল।

কোথায় যেন একটা আর্ত চিৎকাব উঠল। ভয়ের? স্মাগলার? তাদের মধ্যে মারামারি? দুপ দাপ করে পা ফেলে কারা যেন কামরাটার দিকেই আসছে ছুটে। জেন মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে কামড়ে ধরলে। নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে শুনতে পেলে, বাইরে কে হাঁপাচ্ছে, নিজের সঙ্গে কথা বলছে বোধ হয়। কে যেন বললে রাত দশটা। তা হলে এর মধ্যে দুঘণ্টা সে এই কামরায় বন্দী?

কিছুক্ষণ আগে সে যে দরজাটা খুলেছিল, সেখানে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। ধীরে ধীরে কালো দরজাটা তার দিকে এগিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত হালকা কালো রেকট্যাঙ্গল তৈরি করলে। একটা পুরুষের প্রকাণ্ড কালো সিলুয়েট যেন সেই রেকট্যাঙ্গলের মধ্যে পাতাল থেকে উঠে আসছে। জেন ঠোঁট কামড়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে বিপরীত দিকের দরজার কালো কোটটার কাছে মিশে যেতে চেষ্টা করলে। সেই ভয়ঙ্কর সবজে কালো পুরুষ সিলুয়েট কামরার ভিতরে বোধ হয় দেশলাই জ্বালার চেষ্টা করছে। সে রকম শব্দ। জ্বলল না। বোধহয় দেশলাইটা ফেলে দিয়ে বললে, এটাও ভিজেছে, শ্লা। পা-টা খোঁড়া হল কিনা কে জানে। মাইরি শ্লা, শেষ পর্যন্ত ভূত।

এই দুঃস্বপ্নের ব্যাপারগুলো দু-চাব সেকেন্ড ধরে ঘটতে থাকলে মানুষের গলার শব্দই যেন জেনকে সক্রিয় হওয়ার সাহস দিল। সে চাপা আতঙ্কের শব্দ করে সেই বিপরীত দিকের দরজার ক্যাচ খুলে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে বাইরের অন্ধকারে, আউটার ডার্কনেসে। সেই অদ্ভুত সবজে কালো পুরুষ-সিলুয়েটও কামরায় দ্বিতীয়কে আশা করেনি, তা ছাড়া সে তো কিছুক্ষণ আগেই ভয় পেয়েছে, ভূতের কথা বলছিল। সেও আতঙ্কবিকৃত গলায় শব্দহীন চিৎকার করে উঠল। কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে ক্যাচ খুলতে আরও কয়েক সেকেন্ড লাগল জেনের। ফলে সেই বিভীষিকা, যে

ভীতও বটে, ফলে নিষ্ঠুরও, জেন দরজা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পড়তে, যেন বাতাসে উড়ে এসে, ভলিবল লোফার মতো, জেনের দুই কাঁধ ধরে একটু ঝুঁকেই, জেনের লাফানোর ঝোঁকটাকে সামলে নিয়ে, তাকে শূন্যে তুলে কামরার মধ্যে ছুঁড়ে দিলে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সেই আগন্তুক, ইডিয়েট। বাফার লাইনের ওদিকে দুতিন ফুটের পরেই খাদ। পাতালে পৌঁছাতে এতক্ষণে।

দেয়ালে মাথা ঠুকে গিয়েছিল জেনের। কাঁধে লেগেছে, ঝন ঝন করছে ব্যথা, জোড়টায় কিছু ভেঙেছে কি না কে জানে।

আত্মরক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে আতঙ্ক কাঁপা বিকৃত গলায় বললে,হু? হু? হু আর...?

'মি? মিন্ মি? মেয়র।

মেয়র। ওয়েল আই নেভার... হোয়াট ডুউ মিন মেয়র?

মেয়র তাসিলা। এই বলে এখানে সেই সিলুয়েট, যার মাথা কামরার সিলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল, সে নিজের উরু চাপড়ে দিলে।

ঢিপ ঢিপ করছে জেনের বুক। পড়ে গিয়ে যে ব্যথা পেয়েছে, তাও সে বুঝতে পারছে না। বরং সেই শীতে আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলে সে।

আগন্তুক দুটো দরজাই বন্ধ করলে, ক্যাচ তুলে দিলে। সে কামরায় তখন দুটি প্রাণীর অবস্থান অনুমান হয়, দুই রকমের অসমান ছন্দের কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

তারপর সেই ভয়াবহ আগন্তুক বললে, কী তুমি জানতে চাই না। অবশ্যই স্মাগলারদের একজন হবে। এখানে নতুন। প্রমাণ, কামরার ওপারে খাদের কথা জানতে না। এই কামরা এভাবে এখানে থাকা দেখে সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। আমরা সঙ্গে রাইফেল আছে। আমি ভাল শুটার। দাওআর মতো না পারলেও, অন্ধকারে কিছুটা দেখতে শিখেছি। তুমি আমাকে যদি সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে দাও, তুমি দ্রুক হলেও কিছু বলবো না।

দ্রুক?

হা হা করে হাসল সেই আগন্তুক। বললে, এখানে, এখানে এই কামরায়, আর দ্রুক চেনো না? হাসার পরের মুহূর্তে সে অসম্ভব রেগে গেল। দ্রুক শব্দটাই যেন কারণ। দ্রুক ওয়ান-আইড, রেপিস্ট, স্পয়লার। ন্যাকা। সত্যি কথা বলো। সত্যি ছাড়া, সবটুকু সত্যি ছাড়া কিছু বলো, আর আমিও তোমাকে এক শটে ছাতু ছাতু করে দিয়েছি।

অন্ধকার ঝড়ে পড়া বাসা ভাঙা পাখীর অবস্থা কী রকম হয়? জেন বললে, কাইন্ডলি শুট করবেন না। আমি দ্রুক চিনি না।

শাট আপ।

মানে, জানেন, সেইন্ট, মানে র, নেকেড গড, আমাকে তাড়া করে এখানে পৌঁছে দিয়েছে। আমার দোষ নেই, জানেন? সেই উলঙ্গ, নিষ্ঠুর, পাগল, আমার পাপ, মানে মেয়েলি চিন্তাকে তাড়া করেছিল।

আবার মিথ্যা?

জেন প্রায় কেঁদে ফেলার স্বরে বললে, বিশ্বাস করুন, হাসছিল হা হা করে।

অ। তা হলে তার কাছে এলে কেন?

জানেন। মাকড়সা। আর ফাইল। আর সেখানে ছুরি দিয়ে মগজ থেকে পাপ, পার্সোন্যালিটি, সব চেঁছে ফেলে। আর ফাইলও সেখানে, সব লেখা থাকে। গোড়ার দিকে পাতাগুলো ভয়ে পড়াই যায় না, এমন কিছু সেখানে লেখা আছে যার সম্বন্ধে যে–

আগন্তুক চট করে কাছে সরে এল। বললে, দেখো, তুমি যেই হও, ভয় দেখিও না।

ও, না, না।

কী?

এত কাছে সরে এলেন কেন? না, আপনি কেমন করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন না?

তাতে তোমার কী? তোমার কোন গল্প শুনতে চাই না। সত্য, মিথ্যা কিছু না।

আচ্ছা, এখানে কি স্মাগলার আসে?

শাট আপ। আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দেবে? আমিও স্মাগলার হতে পারি। ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে রাইফেলটা ছুটে যেতে পারে।

এক মিনিট দু মিনিট। আগন্তুকের নিঃশ্বাসে সমতা আসছে। জেন মরিয়া হয়ে ভাবতে শুরু করলে। যেন মাথার চাকাটাকে ঘুরতে অনুরোধ করলে। যেন তার ডাক্তারি বিদ্যাটাকে এখন খরচ করা উচিত। সে বুঝলে, এই ভয়াবহ আগন্তুক সর্বজ্ঞ নয়, তা হলে তাকে স্মাগলার ভাবতো না। আর তা ছাড়া ভয়ও পায় কোন কোন ব্যাপারে। এই চিন্তা তাকে আরও একটু চিন্তার সাহস দিল। সে ভাবলে, যেমন সোসাইটিতে অভ্যস্ত হতে হয়, স্টিকি সিচুয়েশনে ভয়ের হেতু পুরুষকে ভিজে করা যায় কথা বলে বলে।

শুনুন।

আবার কথা। দেখো, দিনের আলো দরকার। দিনের। এখনই তা পাচ্ছো না। দশটা হল, আটঘণ্টা আরও এখানে কাটাতে হবে দুজনকেই। আমি চাই না...

কী চান না? জেন ভাবলে, ওপক্ষকে কথা বলাতে শুরু করলে অন্যমনস্ক হবে না?

তোমার কী তাতে?

মানে, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কি না।

তাতে তোমার কী হল?

মানে, একজন দাঁড়িয়ে থাকলে শোওয়া যায় বুঝি? আমি তো রোগী নই। আর তা ছাড়া অন্য রকমেও ভাবা যায় কিন্তু। মানে সায়েন্টিফিক্যালি। মানে সেই যে ছুরি দিয়ে চাঁছা, সেটাকে ব্রেন অপারেশনও বলা যায়। রোগীর ভালোর জন্য। সব সময়েই কি একই রকম মনে হয়? আর সেই সব পার্সোন্যাল ফাইলের গোড়ায় যা থাকে, তাতো যতদূর জানতে পারা গেছে, তাই লেখা হয়েছে, একজনের যদি সেটা জানতেই ভয় হয়, মানে নিজের জীবনের গোড়ার কথা—তাতে ফাইলের দোষ কী? তা তো ভৌতিক কিছু নয়।

তুমি থামবে, তুমি—না কি নেমে যাবো?

না, না, রাগ করবেন না। বলছিলেন, লাইনের দুফিট বাইরে পাতাল—খাদ। আর তা ছাড়া কী জানেন, সেই র, উলঙ্গ গড যাকে একবার মনে হয়, ভেবে দেখলে বোঝা যায় সে হয়তো উন্মাদ, আর মানুষই।

মেয়র যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সরে দূরে গেল। বললে, গডস সেক। ওটাই বুঝি তোমার বিছানা। যাও শুয়ে পড়ো গে।

হুঁ।

দীর্ঘ এক মিনিট নিস্তব্ধতা আবার।

আপনি ঘুমাবেন না?

ঘুম আসে ঘুমাবো, নতুবা জেগে থাকবো।

আচ্ছা...

আবার কী?

আপনি বসছেন না, চলে বেড়াচ্ছেন।

কী যন্ত্রণা! বসলাম। সেই আগন্তুক জেনের থেকে দূরে একই বেঞ্চের কোণে বসল।

কিন্তু ঠিক তখনই অন্ধকার চিরে একটা প্রচণ্ড তুরীর শব্দ হল। একটা নয় বেশ কয়েকটি। জেন ভয়ে বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠে, বরং সেই মেয়রের দিকটায় সরে গেল। ও কী? ট্রাম্পেট বাজিয়ে আসছে না? ক্রুক নাকি, যেমন বলেছিলেন?

হাতি।

হাতি? বুনো?

জঙ্গলে বুনোই হয়। সার্কাস ভেবেছো নাকি?

আচ্ছা, হাতি এই কামরা ভাঙতে পারে?

অন্তত উল্টে খাদে ফেলতে পারে। আলো না থাকলে, সাড়া না পেলে, খাদ্যের খোঁজে অন্যদিকে চলে যাবে।

গন্ধ পায় না?

ঘুমাও গে, যাও।

আচ্ছা, স্মাগলারদের কথা বলছিলেন। তারা কি সত্যি এই পথে...মানে তারা কি নির্দয় হয়?

আমার জানা মতো এটাই তাদের পথ। এমনকি তারা হয়তো জানে এই কামরাটা আজ এখানে তাদের জন্য রাখা হবে। এই কামবার মেঝেতে কিংবা দেয়ালে দেয়ালে তাদের মাল লুকানো আছে। ন্যাকামি হচ্ছে? জানো না?

অ্যাঁ?

আর সে জন্যই তোমার মতো...তুমি তো উওম্যান। তোমাদের গন্ধই আলাদা।

একটা নতুন রকমের ভয় জেনকে চমকে দিয়ে তার পা বেয়ে উঠে কোমরের গার্ডলের তলা দিয়ে শিরশির করে তার বুক চেপে ধরলে যেন। সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল।

এই সময়েই তাকে চমকে দিয়ে দূরে এক কোন প্রাণী ডেকে উঠল।

ও কী?

হরিণ।

ওরকম ডাকে?

চিতা দেখেছে। রিজার্ভড ফরেস্ট চারদিকে।

অ্যাঁ। জেন আবার সেই মেয়রের দিকে দুপা সরল।

আধমাইলের মধ্যেই হবে। হয়তো ঝর্নাটার ধারেই, তুমি থামবে?

জেন পিছিয়ে অন্য বেঞ্চটায় বসল।

শুয়ে পড়ো এবার, ঘুমাও।

কাঠ তো, কাঠের শক্ত বেঞ্চ, জেন যেন সে জন্যই ঘুমাতে পারছে না। এই নিচে এটা যদি তোমার বিছানা, এখানেও শুতে পার।

জেন অন্ধকারে তার স্লিপিং ব্যাগটাকে দেখলে। সেটা তো এই পুরুষটার একহাতের মধ্যে।

আবার খানিকটা চুপ করে থেকে সে বললে, শুনছেন? আপনি, মানে, আপনি কে যদি সত্যি বলতেন।

তুমি কি স্থির করেছো, নিজেও ঘুমাবে না, আমাকেও ঘুমাতে দেবে না? আমি তো মিথ্যা পরিচয়ও দিতে পারি।

গুডনেস সেক। তা দেবেন না। আপনি যদি মেয়র, এই অন্ধকাব বনে তবে...আর তাসিলা এত ছোট যে তার মেয়র...

কাঁদছো? আচ্ছা পরে ভেবে দেখবো মেয়রের কথা।

বললেন না?

ভারি বিপদ তো! মেয়র না হয়ে ময়ূর হলে কি আপনার সুবিধা হয়?

ময়ূর? পিকক?

পিকক? ও, হ্যাঁ, শুনছো? আমি প্রকৃতপক্ষে ময়ূরও নই হয়তো। একজন মানুষ তো। আমি খুব কৃতজ্ঞ হবো, যদি বাকি রাতটুকু শান্তিতে থাকতে দাও। আমার বুকে একটা কষ্ট হচ্ছে। আমারও তো কিছু ঘটে থাকতে পারে। মনে করো, কিছুক্ষণ আগে আমি আমার মৃতদেহ জলে ভেসে যেতে দেখেছি।

জেন শিউরে উঠে, যেন এই আগন্তুকের বাধ্য হতে, বেঞ্চটার কাঠে শুয়ে পড়ল।

শুনছো?

জেন সাড়া দিল না।

জেন সাড়া দিলে না। ভেবে ভেবে সে তার গলার লকেটদার মোটা সোনার চেনটাকে গলা থেকে খুলে বেঞ্চের তলায় হাত বাড়িয়ে ফেলে দিলে। তাতে সেই নিস্তব্ধতায় বেশ শব্দ হল।

কী হল? কিছু পড়ে গেল? নাকি রিভলবারটা বার করাব চেষ্টা করছো? ক্লিপ ভরছো? দেখো, ফেরেব্বাজি করো না। আমি তোমাকে বলছি, আমি ভাল শুটার। আমার রাইফেলটাও ভাল। গুলিগুলো কয়েক ঘণ্টা আগে কেনা, আর জল থেকে তা বাঁচাতে গিয়েই পায়ে ব্যথা পেয়েছি। ছুটবার আগেই একটা নতুন ক্লিপ ভরে নিয়েছিলাম, মনে আছে! ও কী? ফোঁপাচ্ছো?

আচ্ছা, দেখুন, আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে, দশ বারো হাজার হবে। তাড়াতাড়িতে গুণি নি। নেবেন?

পরীক্ষা করছো? আমি তত ভাল মানুষ না হতে পারি...

ও, না, না, তা বলি নি।

দেখো, তুমি হয়তো স্মাগলারদের একজন না হতে পারো। হয়তো পাগলী হিপি—কথা দিচ্ছি, তোমার টাকায় আমার লোভ নেই।

বলছিলাম, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, যদি আপনার দরকার হয়...টাকাটা আমার জামার নিচে গার্ডল পাউচে আছে।

যদি দরকার হয়, খুন না করে, তোমার সেখান থেকে নেবো, এই তো? আগন্তুক খিকখিক করে হাসল।

সেই কামরাটার অন্ধকার যেন এক রকমের মেঘ। যা তখন নড়ছে, স্বচ্ছ হচ্ছে, গাঢ় হয়ে উঠছে। শার্সির সেই রেকট্যাঙ্গলে কিছু হলদে ভাব হচ্ছে কখনও। মনে হচ্ছে তার ওপারের গাছপালা নড়ছে। দম নেয়া যাচ্ছে কখনও কখনও। কখনও বুকে চেপে বসছে।

শুনুন।

আবার কী হল?

আপনাকে একটা অনুরোধ...

এভাবে হয় না। ঘুমাতে হবে। ঘুম ছাড়া ভয় এড়ানো যায় না। ঘুমাও এবার।

কেন বার বার আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে বলছেন। কেন ভয়ের কথা বলছেন?

ভয় হলে তার কথা বলা যাবে না? শুনেছি, মানুষ ঘুমের জন্য ওষুধও খায়। বোঝো না, অন্য কারো ঘুমের দরকার থাকতে পারে? আমাকে, দেখছি, এই কামরা ছাড়তেই হচ্ছে।

না, না। সে কী? বলছিলেন এটা দ্রুকের কামরা হতে পারে, স্মাগলারদের মাল আছে।

আছে নয়। থাকতে পারে। সেই আগন্তুক উঠে দাঁড়াল?

উঠছেন আবার...

ঘুমাতে দিলে কোথায়? নিজের অস্বস্তি, তার উপরে সেই থেকে কথা বলে যাচ্ছো।

দেখুন, আপনি যাবেন না। শুনুন...যদি দরকার হয়, যদি আপনার মনে হয়, আমার কাছে এগিয়ে এসে একটা মাত্র গুলিতে আমাকে মেরে ফেলবেন। আপনাকে অনুরোধ, দরকার হয় বুকে চোং লাগিয়ে—আর তারপর, তারপর বডিটাকে এই স্লিপিং ব্যাগে জড়িয়ে সেই পাতাল খাদে মাটির গভীরে পুঁতে দেবেন। কিন্তু যাবেন না। চারদিকে অন্ধকার আর বিপদ...

তখন জেনের গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

অদ্ভুত, কী অদ্ভুত সেই কামরার মাঝ-ফেব্রুয়ারির শীতের বাদলা বাদলা অন্ধকার। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন আতঙ্কের রাত। কখনও গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কখনও শীতে সারা শরীর থর থর কাঁপছে, সিল্কের কিমোনোতে শীত আটকাবার কথাও নয়। আর সেই কামরা জুড়ে সেই দানব-আকার এক ময়ূর, পিকক, মেয়র, অস্বস্তিতে নিজে ঘুমাচ্ছে না, ওদিকে বলছে ঘুমাও, ঘুমাও। উঠছে, বসছে, দাঁড়ালে কামরার সিলিংএ মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাইরে পশুগুলো ডাকছে। হয়তো স্মাগলাররা ওঁত পেতে আছে।

জেনের মুখের একপাশে বইয়ে সেই পেট্রলল্যাম্পের আলো। জিম করবেট অবশেষে বাঘিনীর মতো ডেকে বাঘটাকে কাছে আনার চেষ্টা করছে। জিম আর একবার ডাকতেই বাঘটা সাড়া দিয়ে দৌড়ে আসছে যেন। সেই নির্জন মরা চাঁদের বনের অন্ধকারে আর কেউ নেই। শিকারী নিজেই বলছে, তখন ইনস্টিঙ্কট ছাড়া আর কেউ সহায় নেই। বাঘের ইনস্টিঙ্কটের বিরুদ্ধে শিকারীর তেমন।

সেটাই আদিম অন্ধকার। সে নিজে, জেন, বোধ হয় বলেছিল, জল খেতে পেলে ঘুমাতে পারতাম, কতক্ষণ তখন হয়েছে সেই পরিত্যক্ত কামরায়, যা যেন পাহাড়ের গায়ে এক আদিমগুহার মতো হয়ে মনে আছে? আধঘণ্টা? তারও কম? জেন ভাবলে, বইয়ের দিকে চোখ রেখে, সেই শীতার্ত, আতঙ্কিত, সময়জ্ঞান-রহিত, যার বাইরে স্মাগলার, চিতা, হাতি, গ্রেগ ওঁত পেতে আছে, যা বোধ হয় এমন অন্য-কোথাও, যেখানে ভাষাজ্ঞান, সংস্কৃতি, ডাক্তারি বিদ্যা কিছুই থাকে না সহায় হয়ে। তুমি স্ত্রীলোক, হয়তো, তা কিছুটা মনে থাকে। কিন্তু এসবই তো যাকে ওয়াইজ আফটার দা ইভেন্ট বলে। আর সেই অন্ধকারে চিন্তা তৈরি হওয়ায় আগেকার অনুভূতি মনের?

জেন বলেছিল, তাড়াতাড়ি পালাতে ওয়াটার বটল, ফ্লাস্ক কিছু আনি নি। আর সেই সবজে রঙের মেয়র-ময়ূর বলেছিল, তিন-চারশো গজ দূরে ঝর্না আছে। জল খাওয়া যায়। কিন্তু বলে রাখছি পালাতে চেষ্টা করো না, খাদে পড়ে হাড়গোড় ভেঙে পড়ে থেকে হায়েনার খাদ্য হবে। নতুবা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা হাতি পিষে দেবে। আর ঝর্নাটাও খুব ভাল নয়। তোমাকে টেনে নিতে থাকবে। রসো, ঘুমানোর জন্যই তোমাকে জল খাইয়ে আনবো। জল খেয়ে ঘুমাবে তো?

কাঁধে রাইফেল নিয়ে কামরার বাইরে চাঁদের মরা আলোয় নেমেছিল সেই পুরুষ আর জেনকেও নামতে বলেছিল। সে কি তখন পালাতে চেষ্টা করেছিল? সেই ময়ূর খপ করে তার হাত চেপে ধরেছিল। এমন যে হাত ভেঙে যাবে।

সেই অস্পষ্ট অস্পষ্ট বনের নানা ফাঁকে তখন জানা রকমের অন্ধকার আর আলো কখনও। খাদের অন্ধকার ঘেঁষে ঘেঁষে, কখনও কিছু উৎরাই, কখনও চড়াই কিছু, আর সবাই ঘোলাটে ডেজড। বনের নিরবচ্ছিন্ন সারির কাছে যেতেই, তারা ঝর্নাটার কাছেও গিয়েছিল, যে ঝর্না কলকল ঝরঝর গুমগুম, নানা শব্দ করে, নিজেকে সেই বনের চাপা স্তব্ধতায় সাহস দিতে দিতে চলেছে। এমন সময়েই একটা হরিণের আর্তরব উঠল।

জেন ভয়ে লোকটির কাছে ঘেঁষে এল। বললে, হাত ধরেছিলেন। হরিণটার কি প্রাণ গেল?

এই যে হাত, ধরো।

শীত লেগেছিল। লাগবার কথাই। সিল্কের কিমোনোতে, বিশেষ তখন ঝর্নার ধারে। মাঝরাতের

চাইতে হালকা, শেষরাতের চাইতে ঘন অলৌকিক এক বাদামি–সাদা প্রবাহ দেখেছিল। কিন্তু আগে তীব্র শীতের বোধ, ভয়, না জল খাওয়া, তা মনে পড়ছে না। সেই মেয়র তখন বলে থাকবে, এই ঝর্না পার না হলে ওই বন দিয়েও পালানো যায় না। আর ওই বনও মানুষকে পাগল করে দিতে পারে।

না, না, ঝুঁকো না। ঝর্নাটারও কুমৎলব আছে। টের পাচ্ছো না, টানছে। কিছুক্ষণ আগেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে প্রপাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, যেখানে মুহূর্তে মৃত্যু। এমনকি আমি ভেবেছিলাম, স্মাগলারই ধাক্কা দিয়েছে। নিচু হয়ে জল তুলতে পারবে? আচ্ছা, আর এক পা এগোও, আমি অঞ্জলি করে জল তুলে দিচ্ছি, অঞ্জলি করো। এই দেখো, হাত কাঁপতে থাকলে অঞ্জলি হয়? ধরো, আমার হাত থেকে খাও। না ঘুমাতে পারলে মরে যাবো।

ময়ূর কয়েকবার অঞ্জলি ভরে জল তুলে তার ঠোঁটে ধরলে জল খাওয়া হয়েছিল। তখন মেয়র আবার বললে, হাত ধরে ধরে চলো। তোমাকে একটা কথা বলি, এই ঝর্নাটাকে বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো পচা কাঠের গুঁড়ি। কিন্তু আমাকে দেখালে তা একটা পচা মৃত দেহ। স্রোতে উল্টে গেল আর দেখলাম, সেটাকে আমি চিনি। আমারই শরীর। ওকি? কিছু দেখলে? মেয়র তার গা ঘেঁষে এসেছিল।

বলেছিল, আমি শুনেছি, মানুষ যখন পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে, ওসব অলৌকিক অশরীরী কাছে আসে না। ওই ঝর্নায় তখন পড়ে গিয়ে নিজের পোশাক ভিজিয়েছি।

তারা সেই কামরায় ফিবে এসেছিল। আর সে বলেছিল, যে নিজেকে তাসিলার মেয়র বলেছিল, ছুঁয়ে থাকো। দেখে নিও, ভিতরে কেউ ঢুকেছে কিনা। লক্ষ্য রেখো, তোমার সেই কাঁচা নাকি উন্মাদ, ভগবানও ঢুকে না পড়ে। এবার ঘুমাতে হবে। এখনও দিন হতে সাত ঘণ্টা তো বটে। না ঘুমিয়ে বসে থাকলে শীতেই বুক জমে যাবে। তুমি তো শীতে কাঁপছো। তোমার বিছানায় ঢুকে পড়ো না কেন?

স্লিপিং ব্যাগে? ক্ষতি নেই। কিন্তু ছুঁয়ে থাকা যাবে কি করে? বলছিলেন না তখন। তা ছাড়া, ঘুমিয়ে পড়লে আপনার সেই ফ্রক যদি–আপনি ঘুরে বেড়াবেন নাকি? আচ্ছা আপনার পোশাক তো ভিজে, আমার একটা ডেনিম জিনের ট্রাউজার্স আছে পরবেন? না হয়, একটা বড় বাথ টাওয়েল আছে, নেবেন?

সে নিজে কি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল? সেই ভয়ানক শীত কি তাকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছিল? অথবা সেই নানা কষ্ট, আতঙ্ক, তাকে কি বেপরোয়া করে দিচ্ছিল? সে নিজে বলেছিল, এরকম হয় না যে একজন বুকের কষ্ট নিয়ে অস্থির হয়ে ঘুরবে আর অন্য কেউ ঘুমাবে। রাগ করবেন না কাইন্ডলি, আপনি বুকের ভিতরে কষ্টের কথা বলেছিলেন।

তারপরে সে দেখেছিল সেই মেয়র তার আরও কাছে এসে দাঁড়াল। আতঙ্কভরা চোখে সে বোধহয় বলেছিল, কী? কী? কেন? টাকাটা নেবেন? আমি দিচ্ছি খুলে। সে কিমোনোর নিচে হাত চালিয়ে গার্ডল পাউচটা খুলতে যাচ্ছিল, সেই মেয়র বললে, আপনার টাওয়েলটা দিন, তাতে শীত কমবে, হয়তো ঘুমানো যাবে। আর তখন সে স্লিপিং ব্যাগ হাতড়ে বাথ টাওয়েলটা বার করে দিয়েছিল। মোর সেটা কোমরে জড়িয়েছিল। বলেছিল, এবার বোধ হয় ঘুমানো যাবে।

আচ্ছা, তুমি কি হিপি? তোমার কি এমন কোন নেশা আছে যাতে মানুষ নিজেকে ভুলে যেতে পারে?

সে সময়ে তার মনে হচ্ছিল, সহ্য করার সীমা আছে, যা সে পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এক সেকেন্ডেই সে উৎকর্ণ হল। সেই মেয়র তখন বললে, জানো, দারুণ শীতের মতো কিছু, জানো সেই রক্তকণিকা, না কি বলো, তাও কাঁপছে যেন। আচ্ছা, আছে তোমার সেরকম কোন নেশা জামার তলে লুকোনো, যাতে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে?

আর সে তখন বলেছিল, মানে আপনার চোখদুটো, সেই ঝর্নার ধারে, যেখানে আলো ছিল।

না, না, এসব বলো না। বলে ময়র জেনের গা ঘেঁষে বসল। তার গালে হাত ছোঁয়ালে। মোম আছে? দেশলাইটাও ভিজে গেছে। রাগ করে কোথায় যে ফেললাম। আচ্ছা, দেখো, সেই তোমার ফাইল, ভগবান যে ব্রেন থেকে পাপ চেঁছে ফেলে, তুমি স্ত্রীলোক বলে সে বোধহয় এই গুহায় ঢুকতে পারেনি। দেখো, প্রমাণ করা যায়। এই বলে সেই কালচে সবুজ ময়র তার বুকে হাত রাখলে। এবার ঘুমাও, কাইন্ডলি। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ো। বুঝতে পারলে, আমি বুঝেছি তুমি মেয়ে?

কিন্তু আপনার হাত বরফ। জামাও ভিজে। আর আপনি বলছিলেন, মানুষ মানুষকে ছুঁয়ে থাকলে...একটা কথা বলি। আমার স্লিপিং ব্যাগটায় বেশ ফারলাইনিং। আমি তো কিছুটা লম্বা। আর তাতে আপনি ড্যাম্প জামাটাও খুলতে পারবেন। আচ্ছা। আপনি তার পরে দ্রুক-টুক কাউকেই আব আমাকে ছুঁতে দেবেন না তো?

সেই ময়র ফিস ফিস করে বললে, আচ্ছা তুমি কি বিশ্বাস করো একই মানুষ বারবার মরতে পারে? আবার বেঁচে ওঠে?

জেন বললে, আপনি কিন্তু বেশ সুন্দর টল। আর কালচে সবুজের মধ্যে আপনার মুখ। দেখো, আমি কী রকম কাঁপছি শীতে। মনে হচ্ছে ঢেকে গেলে কষ্ট কমে।

ময়র হাত রাখলে কিমোনোর ক্লাস্পের কাছে। তাই তো, কাঁপছোই তো।

আমার খুব ভয়ও করছে, কেমন যেন ভয়, আর তাতেই কাঁপছি। ছুঁয়ে থাকো। হয়তো স্লিপিং ব্যাগে এত কাঁপবো না। জেন বললে, সেই ময়ূর, নাকি রাজহাঁস, ঝুপ করে এক মেয়ের উরুতে বসেছিল, কিন্তু এত বড় এমন ডানা মেয়েটিকে একেবারে ঢেকে দিয়েছিল, আর কেউ মেয়েটিকে দেখতে পায় নি। এসো, ভিতরে এসো। ঢেকে দাও আমাকে।

লাইব্রেরির সেই শার্সির গায়ে বিদ্যুৎ ঝলকে থাকবে, তার চমকানি বেডরুমের দরজাতে চমকাল, চমকে চমকে বেডরুমের ভিতরেও আলোর লেশ ঢুকছে। দূর থেকে তার শব্দ, শার্সির গায়ে মুখর বৃষ্টিরও। আর ছাদের টিনে ঝিম ঝিম করে জল নামল।

জিজ্ঞাসা করলেও এখন সে নিজে বলতে পারবে না, ময়ূর কখনো উঠে মোমবাতি জ্বেলেছিল কিনা। কিংবা তখন রাত শেষ হয়ে সেটা ভোরের আলোর উঁকি কিনা। সে বোধহয়, হঠাৎ চোখ মেলে নিজের মুখের উপরে সেই ময়রের মুখ দেখতে পেরেছিল আবার। আর ময়র, বোধহয়, বলেছিল, আমি রাগ নিয়ে বেঞ্চে গিয়ে শুলে এক জনের ঘুম ভাল হয়। তাকে দোষ দেয়া যায় না। সিঙ্গল সাইজ স্লিপিং ব্যাগে তার তত বড় শরীরটা ধরাই কঠিন। হয়তো তার ঘুম ভাঙার ভয়ে ঘুমায় নি সে।

সে সবই ঘুমের ঘোরে যার স্মৃতি স্পষ্ট হয় না। সেই স্লিপিং ব্যাগে ময়ূর খিলানের মতো হলে তবেই সে নিজে ঠিক করে শুয়েছিল নিচে।

ভোর রাতেই ময়ূর উঠে গিয়েছিল, কারণ সকালে চোখ মেলেই কাঠের বেঞ্চে কম্বল গায়ে তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। কী লম্বা আর শীতে হিম মাকরানা পাথরের অ্যাডামই যেন। কম্বলের বাইরে বেরিয়ে থাকা একটা হাত, আর একটা পা, যেন ঠাণ্ডায় নীল। মুখ দেখা যাচ্ছে না। নিজে জেন কম্বলটাকে টেনে টেনে তাকে ভাল করে ঢেকে দিতে গেলে এক ফোয়ারা রক্ত উঠে মুখ লাল হয়েছিল তার নিজের।

তার আগে কিন্তু কামরাটা গুড়গুড় করে চলতে শুরু করেছে। কী ঘুমই সে ঘুমিয়েছিল, যে কখন সেই কামরা ট্রেনে জুড়ে গুহার বদলে ট্রেনের আধ ময়লা আধ পুরনো কামরা হয়েছে, তা বুঝতে পারেনি। শার্সিটায় সাদা কুয়াশার সকাল পার হয়ে যাচ্ছে। এঞ্জিন ক্যাঁ করে ভেঁপু বাজালে।

তা হলে বোধ হয় তাসিলাই এসে গেল। সে তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি সেই কিমোনোকে মসৃণ করে, কেপটাকেও কাঁধে পিঠে ছড়িয়ে দিলে। তাসিলা স্টেশনে লোকজন থাকা সম্ভব। তাদের সামনে একা এক পুরুষের সঙ্গে এক কামরায় রাত কাটিয়ে নামা যায় কি? হয়তো তারা অপরিচিত, কিন্তু একসময়ে পরিচিত হতে পারে। আর সে, যত ছোটই হোক, এক চার্চ মিশনের মাদার সুপিরিয়ারও বটে। তখন স্লিপিং ব্যাগটা গুটিয়ে পিঠে তুলে নেয়ারই শুধু সময় আছে। তাসিলার স্টেশনে গাড়ি থামার আগেই স্পিড কমতে না কমতে সে নেমে পড়বে, যাতে কোন কামরায় ছিল সে রাতভোর, গাড়ি থেকে তাকে নামতে দেখেও কেউ মনে রাখতে পারবে না। চলতি গাড়ি থেকে নামার জন্য প্রস্তুত হতে হতে, একসময়ে সে তো শহরেরই ডাক্তার, ডাকাবুকো, সফিস্টিকেটেড, ভাবলে, দেখো, মনে ছিল না, পাগলা সেই গ্রেগ ক্রুস্টার এখন ইংল্যান্ডের কোন অ্যাসাইলামে। তাও কি সে এখানে হাসতে পারে?

আর তার পরে ছোটা। ছুটতে গেলে আর শীত থাকে না। রোদ উঠে সব কিছুকে দৃশ্যমান করার আগেই তাকে অন্তত তাসিলায় পৌঁছে যেতে হবে। অন্তত চার পাঁচ ঘণ্টার পথ। পারবে কী? ফলে সেই দ্রুত গতির ফলে, ছুট ছুট, কিমোনোর হেম ঢেউ এর মতো উঠে পড়ছে, স্টকিংএর গার্টার চোখে পড়ছে কখনও, চুলের রাশ উড়ছে কেপের পিঠে।

বইয়ে আবার মন ঢোকাতে চেষ্টা করলে জেন। জানা গল্পই। কিন্তু এমন সেই টপোগ্রাফির ডিটেইলস যে প্রত্যেকবারই সেই অরণ্য আর তার পথগুলো নতুন আর মিস্টিরিয়াস হতে থাকে। শিকারী বাঘকে নিজের প্রয়োজন মতো কাছে আনতে পারলে না। তার বাঁ দিকে সিকি মাইলের মধ্যে সত্যিকারের বাঘিনী ভোর ভোর আলোতে ডেকে উঠতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল। তার কাছেই, হয়তো একশো গজের মধ্যেই, সেই ম্যানইটারও মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বন কাঁপিয়ে ডেকে উঠল। কী বলবে? বুদ্ধি? বুদ্ধির নিচে আনকনশাস? কিংবা শুধুমাত্র ইনস্টিঙ্কট? না, বোধহয়, ওকে বাঘের হৃদয় বলতে হয়, যা বনের হৃদয়ের সঙ্গে এক। আর তখন বোধহয় সেই বাঘিনী, তারও তো ইনস্টিঙ্কট মাত্র সম্বল, যা বাঁচায় ; ভাবে না, সেই বাঘ নতুন কোনো যুবক, কিংবা বিবর্ণ-পশম বৃদ্ধ কোন ম্যানইটার।

রাত চারটে পার হয়ে গেল।

আর কোথায় যেন, লরেন্সে নাকি, সে পড়েছে তারপর বাঘিনী নিজের লেজ দিয়ে উদরে আঘাত করে করে সদর্পে নিজের এলাকায় ঘুরে বেড়ায়।

এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ হবে না। শেষ রাত তো হলই। বই রেখে, জেন কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে, ঘেরাটোপ ঘুরিয়ে আলোটাকে আড়াল করে, কোমল স্বপ্ন স্বপ্ন আলো করে, ভাবলে চোখ বন্ধ করার আগে, ওটা কিন্তু সত্যি হতে পারে ইভের মিসেস হওয়ার পরে সেন্ট হওয়ার ভয় ছিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

দু-একবার এমন হয়, শরীর ও মন বিশ্রামের জন্য তৈরি হলেও, তাকে সাহায্য করতে সুস্বাদ উষ্ণ কফি যোগাড় করে নিলেও ঘুমটা নিশ্ছিদ্র হয় না। এমন হয়, জেগে আছে কিংবা ঘুমিয়ে, তা খেয়াল থাকে না, ঘুমিয়ে আছে অথচ যেন শার্সিতে বৃষ্টি শুনছে।

ময়ূর, তার শোবার ঘরের ইজিচেয়ারে, যার চওড়া হাতলের উপরে তখনও কফির কাপটা, যা সে কিছু আগে শেষ করেছে, ভাবছিল সে ঘুমিয়ে আছে আর স্বপ্ন দেখছে। তার সামনে বাঁ-হাতি শার্সিটা কি করে বা খোলা, হয় তো ছিটকিনি বসিয়ে দেওয়া হয় নি, যার ফলে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তার স্বপ্নে সেই ছায়াটাও যাকে সে তার আগে আগে চলে ব্রিজের উপরে দাঁড়াতে দেখেছিল, সে যেন এই ঘরে ঢুকেছে।

তা হলে ওটা চোখের ভুলই যার সঙ্গে কেউ লড়াই করে না।

এমন সময় নিঃশব্দ হলুদ বিদ্যুৎ চমকাল, শার্সিটা যেন তার চাপেই খুলে গেল, যা সত্য হতে পারে না। আর তখন সেই ছায়া যে এক বাদামি সিলুয়েট হয়ে খয়েরি খয়েরি অন্ধকারে ঘুরছিল, সে একটা হলুদ হাত বার করে শার্সিটাকে টেনে এনে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলে। তখন বিদ্যুতের শব্দ হল। চমকে ময়ুর অনুভব করলে, তা হলে সে বসেই আছে। স্বপ্ন দেখছে না।

পানি আউন্দাই ছ।

জল আসছে? ঘুমাস নি? নরবু নাকি? ময়ূর সোজা হয়ে বসল।

রাতি সাড়ে তিন চারি হুনছ আইলে...

এখন রাত চার হলে কী?

নরকু কথা না বাড়িয়ে হাই তুলে চলে গেল। খুবই স্বাভাবিক। বৃষ্টির সম্ভাবনায়, সে জানালা দরজার বাতাসে নড়াচড়ার শব্দে তাকে বন্ধ করতে উঠে থাকবে। সে বাতাসে শব্দ করা জানালাটা হয়তো এ ঘরেই, তাই বন্ধ করে দিয়ে গেল। হাসল ময়ুর।

ঘুম না হওয়ার ক্লান্তিতে হাই তুলে ময়ূর বিছানায় যাবে স্থির করলে। দেখো, কী বকম চোখের ভুল হয়। হ্যাঁ, তা তো...

ব্যাপারটা কিন্তু দাড়ি কামানোর মত সাধারণ ব্যাপার থেকে। কাল যেমন আবার মনবাহাদুরের কাছে ইম্পিরিয়াল ঠিক করতে বসেছিল। তো, নাপিত বললে, আয়নার সামনে ঘরে গিয়ে দেখুন কেমন হল। ময়ুর বললে, তুমি তো ভালই দেখছো, তা হলেই হয়েছে। কী হবে আয়নায়? এই রোদই ভাল লাগছে।

সেই মোরকে কিন্তু এক সময়ে এসব নিয়ে চিন্তা করতে হতো। বুচকুদের সঙ্গে তখন বছর পাঁচেক হবে, মোরের চুলদাড়িতে ঢাকা আধুনিক যুবকদের মুখ দেখে বুঁচকু বললে, মাইরি আমরাও রাখি তা হলে। রাধন বলেছিল, হ্যাঁ, মোর, তুই শ্লা লজেঞ্চুস ছাড় মাইরি, বই-এর হকারি ধর ; বেশ বিদ্দেন লাগছে তোকে। সেই দাড়ি কামিয়ে নেয়া ফটো। সেই শক্তিগড়ের শেষ জমায়েতের আগে আবার চুলদাড়িতে মুখ ঢাকা। তখন তো গর্তে বসা চোখ, ভাঙা তোবড়ানো গাল, হাড়গোড়

বার করা শরীর। সে তো সেই গ্রুপ ফটো থেকে পৃথক হতেই। সেই মাল রাখার দর্জিচাচা বলেছিল, ভালো করেছিস চুলদাড়ি রেখে। তোদের সেই চুলদাড়ি কামানো গ্রুপটা পুলিশ জবরদস্তি নিয়ে গিয়েছে। পালা।

কিন্তু এদিকে এই উত্তরে পালাতে পালাতে জংশনের সেই গ্লাসকেসে হারানো নিরুদ্দেশ দাড়ি-গোঁফ কামানো সেই ছবি।

বিছানায় গিয়ে বসল ময়ুর। হাতঘড়িটা খুলে সময় দেখলে চারটে বটে রাত। ঘড়িটাকে বিছানার শিয়রের ছোট টেবিলটায় রাখলে। তো, তখন মোরের দাড়িগোঁফ আবার মুখ না ঢাকা পর্যন্ত জঙ্গলে পালানো ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ তখন তো মিসিংদের মধ্যে গোঁফদাড়িহীন ছবিই দেখেছে ; আর তারপরে ডিএফও-র তাসিলা আসার উপলক্ষে সেই ইম্পিরিয়াল, যা মনবাহাদুরের পরামর্শে, যা দেখে রিনি বসু, বোধহয়, বলেছিল, বাহ্, বাহ্, কেমন ছবি ছবি ইম্পিরিয়াল, আর ডিএফও বলেছিল, ওই তো আমাদের মেয়র। রিনি চলে গেলে দু-এক মাসেই ইম্পিরিয়াল ঠিক রাখতে মনবাহাদুরের কাছে রোজ রোজ মুখ বাড়িয়ে বসা অসহ্য বোধ হয়েছিল, আবার দাড়িগোঁফে মুখ ঢেকে যাচ্ছিল।

তখন ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হয়েছে, শীত আর অন্ধকার তো তখন খুবই এদিকে, যেমন স্বাভাবিক। জংশন থেকে রেঞ্জারের জন্য ওষুধ, রাইফেলের গুলি, টর্চের ব্যাটারি ইত্যাদি কিনতে গিয়েছিল সে। কেনাকাটা শেষ করে, চা-টা খাওয়া শেষ হলে জংশনের বাজারে ঘুরতে ঘুরতে একটা চকচকে নতুন বড় সেলুন দেখে, সে স্থির করলে চুল ছেঁটে নিলে হয়। তার এ রকম মনে ছিল, তাসিলায় বড় বড় চুলদাড়ি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, আলোচনার বিষয় হচ্ছে, সেখানকার রেঞ্জার, পোস্টমাস্টার, হেডক্লার্ক কেউ-ই চুলদাড়ি বড় রাখে না।

সে সেলুনদারকে চুল ছোট করে ছেঁটে দিতে বলেছিল। তা হলে দাড়ি? একটু ভেবে সে বলেছিল, একেবারেই বাদ।

এই সব সামান্য সামান্য রোজকার ব্যাপারে কী যে হয়ে যায়!

সেলুনদারের কাছে অবশ্য ব্যাপারটা সামান্য নয়, সে এ-সব ব্যাপারে মিছিমিছি তিন টাকা রেট করে নি, তার কাজ নাকি শিল্প। সেলুনওয়ালা সিনেমা স্টারের কপালঢাকা সিঁথিছাড়া চুল দেখালে সেটাকে সে পছন্দ করেছিল। সেই বলেছিল, আগে দাড়ি কামিয়ে নিয়ে, মুখের কাট দেখে চুলে হাত দেবে। দেয়াল ছেড়ে আয়না। এমন কি দিনের বেলাতেই ছোট ছোট বালব জ্বলছে যেন এখানে ওখানে তার শিল্পকর্মে আলো ফেলতে। তখন দাড়ি কামানো হয়েছে, তার পরে গোঁফও। ক্ষুর রেখে সেলুনদার তখন পর্যবেক্ষণ করছে, ময়ূরকে দেখছে, আয়নায় তার প্রতিবিম্বকেও লক্ষ্য করছে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বাঁ-পাশের আলো নিবিয়ে ডান-পাশের আলো জ্বাললে, যেন ফটো স্টুডিওতে পোর্ট্রেট নেওয়া হবে।

সেই সময়ে ময়ূর হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল, নির্ভুলভাবেই দেখেছিল, জানলার ওপার থেকে সেই মুরারিকৃষ্ণের সেই গোঁসাইদাদা তাকে দেখছে, দেখে অবাক হচ্ছে, ভ্রু তুলছে। এমন কি সে চোখ সরালে মহীগোঁসাইও চোখ সরালে। বোঝা গেল, এই গোঁসাই-ই জংশনের জি আর পির বাক্সে ছবি রাখার মূলে।

আর তখন তো ময়ূর আর গোঁসাই দুজনেই এমন দেখাতে চেষ্টা করছে যেন কেউ কাউকে কখনো দেখে নি। পরস্পরকে টেরচা চোখে দেখছে। একবার তো মনে হল, গোঁসাই তার দুর্বলতার সন্ধান করছে। তখনই কোন বেয়াড়া প্রশ্ন করবে মুরারিকৃষ্ণ সম্বন্ধে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে, এই যে এই যে বলে, সেলুনদারের হাতে একটা পাঁচটাকার নোট গুঁজে দিয়ে, ভয়ের কোন কারণ ঘটেছে তা বুঝতে না দিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং নিজের কাণ্ডজ্ঞান বজায় রেখে, ঝোলা

আর বন্দুকের কথা না ভুলে, সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে সে প্রথমে সেলুনের, পরে বাজারের বাইরে, অবশেষে জংশন শহরের বাইরে এদিক ওদিক চোখ রেখে, পিছু হটে হটে চলে এসেছিল। শহরের বাইরে ফাঁকা মাঠ পেতেই ন্যাড়া ধানখেতের আল ধরে, আড়াআড়ি মাঠ পেরিয়ে সে দৌড়তে শুরু করেছিল।

ময়ূর দেখলে, ঘুমাতে গিয়েছে বিছানায়, অথচ তখনও তার গায়ে বাইরে বেরোনোর পোশাক। জামাটাকে খুলে সে চেয়ারের উপরে ছুঁড়ে দিলে। প্যান্টটাও জামাকে অনুসরণ করল। কী গভীর আশ্চর্যের ব্যাপার যে এমন হতে হল! কিছুতেই সেই গভীরতার শেষে যাওয়া যায় না, এমন কি কোনো উপায়ে মনকে বাইরে এনে তাকে চিরে চিরে দেখার ব্যথা সহ্য করেও কারণটা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে আর সে আশ্চর্য হবে না। আজকে রাতের পরিক্রমাটা বৃথা হবে কিন্তু ঘুম না হলে।

কখনো বনে ঢুকে, কখনো রেললাইনের সমান্তরাল পথ ধরে সে ঠাই ঠাই করে হাঁটছিল ; অনুভব করছিল, বুক মোচড় খেয়ে গলার কাছে উঠে এসেছে। তার খেয়াল ছিল, কেউ অনুসরণ করলে একই ভাবে চলা ভালো নয়। পায়ের ছাপের সারি ভাঙতে সে একটা স্টেশনে গেল, টিকেট কেটে গাড়িতে উঠল। ঘণ্টাখানেক গাড়িতে চলে এক স্টেশনে উল্টো দিক দিয়ে নেমে আবার রেল-সমান্তরাল পথে চলে এল। এক ঘণ্টা সেই পথ ধরে ছুটে, আবার এক স্টেশনের সিগন্যাল পোস্টে সিগন্যাল নামানো দেখে স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলে শান্টিং-এ দেরি হওয়ায় সেই গাড়ি এতক্ষণে আগের স্টেশন থেকে ছেড়েছে, এখনই আসবে। সুতরাং আবার টিকেট কেটে আবার গাড়িতে উঠল সে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে, ঘড়িতে সাড়ে পাঁচ হয়। তাসিলার এক স্টেশন আগে গাড়ি থামতেই, কামরায় দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না, গোপনে পিছনের দরজা খুলে নেমে, স্টেশনের তারের বেড়ার ফাঁক গলিয়ে, আবার হাঁটতে শুরু করেছিল। তখন সুযোগ পাওয়া মাত্র সে বনে ঢুকে পড়েছিল, তাসিলা তখন পাঁচ কিমি হবে। কেউ যদি বনের পথ ধরে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে চায়, তবে তাকে আড়াআড়ি চলতে হবে, ছোটখাট ঝর্না-ঝোরাকে গ্রাহ্য করলে চলবে না, চলাচলের পথ ছেড়ে বিপথে চলতে হবে। ওদিকে ফেব্রুয়ারি মাস মাঝামাঝি, অন্ধকার হচ্ছে। অন্ধকার বনের গলি, শুঁড়ি ধরে পা চালিয়ে চলতে চলতে সে মনে মনে হেসেছিল—এখানে আর তাকে খুঁজে পেতে হচ্ছে না। কিন্তু আশ্চর্য তো! ধৈর্য বলবে? ধৈর্য না হলে কেউ পাঁচ বছর ধরে অনুসরণ করে? অথচ সে জানতেও পারে নি যে এভাবে অনুসরণ করা যাচ্ছে। আর ঠিক চিনেও ফেলেছে, এতদিনের এত দাড়িগোঁফের নতুন নতুন মুখোশ কোনো কাজে এল না।

ময়ূর দু-পা বিছানায় ছড়িয়ে, রাগটাকে গত কয়েকদিনের অভ্যাস মতো ভাঙা পাকে বাঁচিয়ে টানতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ রকমভাবে সে কি কখনো নিজের শরীরকে দেখেছে? কেমন মনে হয় না, সে বেশ আলাদা থেকে, পা-দুখানার গড়ন, রং এসব দেখছে!

তখন রাত দশটার কাছাকাছি সেই ফেব্রুয়ারির। সেই বড় ঝর্নাটা যার একটা নাম পর্যন্ত আছে, মিতাং, যা তাসিলা রোডের দিকে আসতে বিশ ফুট খাড়া এক প্রপাতে ভাঙে, আবার তাসিলা রোডের দিকে এগোয়, ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের একশো গজের মধ্যে ঘোড়া-খুরের বাঁক নিয়ে হাতিঘিষার দিকে যায়, তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেখানে গাছের সারিতে ফাঁক, অর্থাৎ বর্ষায় ঝর্না কুল ছাপায়, বড় গাছ উপড়ে ভাসিয়ে নেয়। গাছগুলো নিরবচ্ছিন্ন নয় বলে ফাঁকে ফাঁকে কালচে-সবুজ এক অলৌকিক আলো। ঝর্নাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল, সেই দুপুর থেকে রাত দশ হতে যায়—একদিনের পক্ষে অনেক ছুটেছে সে, এখন এই জলে পিপাসা মিটিয়ে নিলে হয়, খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে হয়। কারণ তার সঙ্গে এই বনের পথে গোসাঁইকে আর

পারতে হয় না। আর তা ছাড়া সে যে মুরারিকৃষ্ণ নামে একটি পনের ষোল বছরের স্কুলেব ছাত্রকে খুন করেছে, তা প্রমাণ করা কঠিন।

ঝর্নাটাকে পার হওয়ার একমাত্র উপায় জল থেকে জেগে থাকা শ্যাওলা-পিছল পাথরে পাথরে পা রেখে রেখে চলা। টর্চের আলোতে দূরত্ব আন্দাজ করে, কখনো লম্বা পায়ে, কখনো লাফ দিয়ে পরের পাথরে পৌঁছে চলতে হবে।

মুশকিল এই, টর্চের আলোয় পাথরগুলোর দূরত্ব, কোনটা কতটুকু পিছল, জলটা কতটা গভীর তা বোঝা যাচ্ছে না। অথচ টানটা বোঝা যাচ্ছে, থেকে থেকেই পাথরের বাধায় জল কলকল করে ডেকে উঠছে। সামনের দিকে এমন পাথর চোখে পড়ছে না যাতে সে লাফিয়ে পৌঁছতে পারে। ফিরেও কি যাওয়া যাবে? এখন কি আর মনে করা সম্ভব, দূরে দূরে জলে পিঠ ভাসিয়ে রাখা কাছিমের মত কালো-ধূসর পাথরগুলোর মধ্যে কোনটা তাকে সাহায্য করেছিল, কোনটা বিশ্বাসী, কোনটা সরে গিয়েছে? তখন এই অদ্ভুত চিন্তা মনে এসেছিল, দিন হওয়া পর্যন্ত, একটানা আট-ন ঘণ্টা দু-ফুট চওড়া এই পাথরটায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ঘুম এসে যেতে পারে। কী হয়, একবার যদি পরের পাথরটায় পৌঁছতে না পারে, কী হয় পড়ে গেলে? প্রপাতটার ক্রুদ্ধ কোলাহল তো কানে আসছেই...

এই সময়েই সেই হতভাগ্য মুরারিকৃষ্ণের গোঁসাইদাদাকে আবার দেখতে পেয়েছিল ময়ূর। সেই মহীনদা।

ময়ূর নিজেকে বললে, দেখো, আর দুঘণ্টার মধ্যে দিনের আলো এসে যাবে, এখন তো মার্চ শেষ হয়। সে বিছানা না ছাড়লেও, এক কাঁচের গ্লাস ভরা ধোঁয়ানো চা এনে ঘুমের নিকেশ করে দিলে নরবু। সে নিজেকে মনে করিয়ে দিলে, চোখের ভুল কত রকমের হয় তা তুমি বলতে পারো না। সে ফ্যাকাশে মুখে হাসলে। তা নিশ্চয় অলৌকিক কিছু হতে পারে না। সত্যি যদি কিছু চোখে পড়ে থাকে তবে তা হয়তো একটা গাছের গুঁড়ি যার বাকলায় পচন ধরেছে। মনস্তত্ত্ব না বুঝলেও এটা সে বোঝে, তা চোখের ভুলই হবে।

ময়ূর দেখতে পেয়েছিল সেই অল্প আলোতে সেই পাথরটার উপরে দাঁড়িয়ে, জলের খুশিমতো সেই শরীরটা উপুড় হয়ে চিৎ হয়ে নড়ছে, পাক খাচ্ছে। সে চোখ সরিয়ে নিতে গেল। আর ঠিক তখনই একটা পাকের কাছে চিৎ হয়ে গেল শরীরটা আর সে চোখ মেলে স্পষ্ট দেখতে পেলে ইতিমধ্যে পচা ফোলা বিকৃত সেই মড়াটা সেই হতভাগা মুরারির গোঁসাইদা। সে খুশি হয়েছিল। চালাকি করে তার পথ আটকাতে গিয়ে জলে ডুবে মরেছে।

ময়ূর অবশ্যই তখন আর সেই পাথরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। লাফিয়ে দূরের পাথরটায় পৌঁছতে গিয়ে এক-কোমর জলে পড়েছিল, পায়ে চোট পেয়েছিল, টর্চটাকে ভেঙেছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে ভাগ্যগুণে মিতাং পার হতে পেরেছিল রাতের অন্ধকারে। আর তখনই এক পাথরে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের দিকে চাইতেই নিজের মৃতদেহটাকেও তার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকতে দেখেছিল। পারে উঠে দূরে বাফার-সাইডিংএ ট্রেনের নিথর কামরাটা চোখে পড়েছিল তার, আর যেহেতু সে মানুষের সংশ্লিষ্ট কোনো আশ্রয় চাইছিল এক অলৌকিক ভয় থেকে বাঁচতে, তা কোনো পরিত্যক্ত কুটির বা গুহার গহ্বর হোক, আর্তনাদ করে সে কামরাটার দিকে ছুটেছিল। অযৌক্তিকভাবে তার এক জঠরের কথা মনে হয়েছিল হয়তো। কামরাটা ওখানে কেন, কতদিন থেকে আছে, কারা রেখেছে এসব ভাবার সময় ছিল না ; যতক্ষণ তার ছাদ আছে, দেয়াল আছে, তাকে তা চারিদিকে ঘিরে ফেলতে পারে তার জঠরে, গভীরে আর আড়ালে যেতে দিতে পারে, ততক্ষণ তা তার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

এটা যদি অন্যের শরীরও হয়, তাহলেও কিন্তু আসলে মৃত্যু নিষ্কৃতি নয়, মরা চলে না। অন্তত

এখন এভাবে, কারণ সেই মৃতদেহটা একেবারে সেই গোঁসাই-এর মত দেখাবে। সে তো পরে বুঝতেই পেরেছে ঝর্নার মৃতদেহদুটি আর সেলুনের প্রতিবিম্ব তারই।

ভোর হতে চলে বোধ হয়। কাল সকালের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে হয় না?

শার্সির ওপারে বৃষ্টির ধারা আর শেষরাতের অন্ধকার তাকে আয়নার মত করেছে। তাকে এড়াতে ময়ূর বালিশে মাথা রাখল।

তা ছাড়া, অন্যদিকে দেখো, ভেবে কী হয়? সে অবশ্যই নেশার ঘোরে চলা কোন হিপি ছিল, যে কোন কারণে সেই রাতে খুব ভয় পেয়েছিল সেই আশ্রয়ের আধ-অন্ধকার কামরায়।

যেমন আশা করা যায়, মস্ত এক টামলার চা নিয়ে ময়ূরের গায়ে আঙুলের খোঁচা দিয়ে তবে মোঙ্গলীয় মুখ অজস্র হাসিতে ভরে নরবু বললে, আপ্রিল আকো ছ।

যাঃ। ময়ূর উঠে বসল, তখন তার এক ঘণ্টা ঘুম হয়েছে কিনা সন্দেহ, হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা নিয়ে তাতে তারিখ দেখে বললে, এখনো পুরো এক পক্ষ দেরি।

নরবুর দুহাতে ভরা গরম চায়ে ভরতি টামলার, সেই পূর্ণ অঞ্জলি, যা তার যুক্তকরে তৈরি, তা দিয়ে জানালার দিকে ইঙ্গিত করলে। ময়ূর দেখতে পেলে জানালা দিয়ে গোলাপি আলো আসছে। তাসিলার এপ্রিলের এই রংটাই বৈশিষ্ট্য—লাল আর তার নানা রকমের হালকা গাঢ় মিশ্রণ। লিলি, আইরিস, ব্লিডিং হার্ট, ক্যাসিয়া, মাদার... লাল, গোলাপি, কমলা, কমলা—হলুদ, বেগনি-লাল। তাসিলার বসন্ত ঋতু, তার অবস্থিতি ও আবহাওয়ার জন্য, দেখা যাচ্ছে, মার্চের শেষে শুরু হয়ে গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

ক্যালেন্ডারটা কোন দেশি বিলাতিমদ প্রস্তুতকারকের। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তারিখের উপরে যে ছবিটা ছিল তা সমুদ্রের কুয়াশাযুক্ত ঝড়ে পড়া এক জাহাজের। দুরকম নীল আর তার হালকা এবং গাঢ় অনুপাত, পোড়া অ্যাম্বার আর সিয়েনার ছোঁয়ায় আঁকা ছবিটা। তাতে তাসিলার শীতঋতুর সামঞ্জস্য যেন ছিল কোথাও। ছবিটার নিচে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা ছবির পরিচয় সে পড়েনি। একবার কুমুর বই পড়ে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, পড়লে দেখতো জাহাজটার নাম ব্যাটলশিপ পোটেমকিন। তা হলেও ছবির নীল তাকে তৃপ্তি দিতো। এপ্রিল থেকে জুনের ছবিটায় লাল-হলুদ ইত্যাদি রং-এর প্রাবল্য, তার মধ্যে পোড়া সিয়েনা, সিয়েনাও ব্যবহার করা হয়েছে। এটাও তাসিলার লাল ও হলুদের প্রাবল্যের সঙ্গে মেলে। নরবুর টবের ফুলে যা ডালিয়া, হলিহক, লনের ফুলে যা লিলি, আইরিস, পপি, পাহাড়ের গায়ে গায়ে আগাছায় ফোটা ফুলে, আগাছার মতো ফোটা মেরিগোল্ডে। এ ছবিটারও একটা নাম আছে, ফল অব বার্লিন। মৃদু লাল আর হালকা নীলে লেখা অক্ষরগুলোও বেশ কৌতুকের। কেউ সোজা আড়ষ্ট, কেউ বিনয়াবনত, কেউ মুচকে হাসছে। মার্চের পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে ময়ূরের একটা অদ্ভুত অনুভূতিও হল। তিন তিনটে মাস তার রঙে কত গভীর মনে হতো। কিন্তু এখন, দেখো, উল্টো দিকে সেই গভীরতা একটা পাতলা কাগজের।

এ রকম হতেই পারে। এ রকম মনে হয়, রেঞ্জার অথবা পণ্ডিত পোস্টমাস্টার বলতে পারতো, দেখুন, ক্যালেন্ডারের তারিখগুলো যা নানা উৎসব আর রিচুয়াল সূচনা করে, মনে হয় তা সব

আমাদের যার যার সময়স্রোতে নৌকা, কিন্তু তা হয় না। ছবিগুলোর নাম পড়ে বলতে পারতো, ছবিদুটোও মানুষকে আশ্রয় দেয় নি।

সে যাই হোক, প্রকৃতির নীল-সবুজের প্রাবল্য ফেলে লাল-হলুদের প্রাবল্যে ফেরাকে এক রকমের অ্যাটাভিজম বলেছে কেউ কেউ। অনেক অতীতে পাতা নাকি সবই লাল ছিল, এখন যেমন সবুজ। অ্যাটাভিজমের ফলেই সব কচি পাতাই লালের ভাবযুক্ত। মানুষও সে জন্য প্রকৃতিতে লালের প্রাবল্য দেখলে উৎসব করে, আর সে উৎসবে আদিমতার অনুপ্রবেশ হয়। তাসিলায় এপ্রিলে একপক্ষকাল উৎসব হয়। পোস্টমাস্টারের অনুমান, এখনও প্রমাণ যোগাড় হয়ে ওঠে নি, গ্রেগরী ব্রুস্টার ইস্টার উৎসব উপলক্ষ্যে এই মেলা সূচনা করে থাকবে। ইস্টার, গুড ফ্রাইডে মার্চের শেষের দিকের পূর্ণিমার সঙ্গে এগোয়, পিছোয়। এই উৎসব কিন্তু এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষে বসে, কোন কোন বৎসর মেলা চলতে চলতে গুডফ্রাইডে এসে যায়।

সে যাই হোক, এই দুসপ্তাহের মেলাকে একটা উৎসব বলা যায়, যাতে মানুষ তার প্রবীণতার, বিচক্ষণতার, নিষেধের, বাধার অবদমন থেকে মুক্ত হয়। পোস্টমাস্টারের মতে, দোলের মতোই, পিচকিরি দিয়ে রাঙানোই শুধু নয়, কাদামাখাও।

পয়লা এপ্রিল থেকেই ফোর্টের নিচের খেলার মাঠে, মাঠ ছাড়িয়ে গিয়ে পথের ধারে দোকান বসতে শুরু করল। দোসরাতে একটা ম্যাজিকের তাঁবু, দু'তিনটে জুয়ার তাঁবু বসে গেল। যেগুলো চায়ের দোকান হিসাবে বসেছিল, দেখা গেল তাতে ঘরে তৈরি রকসি মদ প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। জামাকাপড়, খেলনা, কাচ ও রোল্ডগোল্ডের চুড়ি-হারের দোকান না থাকলে তো মেলাই হয় না। বেশ কয়েকটা দোকান ফরেস্ট অফিসকে নজরানা দিয়ে ইলেকট্রিক কনেকশন নিয়েছে। এ অঞ্চলের এটাই একমাত্র মেলা, কাজেই সীমান্তের এপারের পনের-বিশ মাইলের মধ্যে বনাঞ্চল থেকে লোকজন আসে, সীমান্তের ওপার থেকেই। মেয়েদের ভিড় যদি জামাকাপড় চুড়ি-হারের দোকান এবং খাবারের দোকানে, পুরুষদের ভিড় চায়ের দোকানগুলোতে যেখানে প্রচুর সস্তা মদ, এবং জুয়ার দোকানগুলোতে যার নেশা মদের চাইতে তীব্র।

কে দোকান দেবে, কে দেবে না, তা বলা যায় না। অসওয়াল, শর্মারা তো যোগ দেয়ই, তাদের দোকানে কাপড়-জামা, বালতি, কড়া, অ্যালুমিনিয়ামের বাসন। ববিজান খাঁ, যে নাকি কনট্রাক্টর, সে একটা ডার্ট অ্যান্ড স্কিল নামে জুয়ার দোকান দিয়েছে। রোজার দোকানের নাম ব্লু মুন রেস্টুরেন্ট। দোকান সাজাতে সে রেঞ্জারকে দিয়ে কিছু ছবি আঁকিয়ে নিয়েছে। প্ল্যাকার্ডগুলো সবই কাগজে রঙ লেখা। একটা দোকান আছে যাতে দশ পয়সার বিনিময়ে এয়ারগানের সাহায্যে তিন বার দেয়ালে সাজানো বেলুন ফাটানো যায়। এবারকার মেলায় সব চাইতে আকর্ষণীয় সেই তাঁবু, যেখানে কাচের আড়াল থেকে তিন-মাথাবিশিষ্ট মানুষ, চারহাত-চারপা-ওয়ালা মাকড়সা মানুষ, এক মাথায় শরীরযুক্ত এক নারী এক পুরুষ ইত্যাদি, বিশ পয়সার টিকেট কাটলেই পনের মিনিট ধরে দেখা যায়।

দুজন পুলিশ কনস্টেবল একটা তাঁবুতে আছে মেলার প্রান্তে। একসাইজের দুজন লোক মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সরকারের প্রতিভূ বলে যদি কাউকে সেই মেলায় প্রায় সব সময়েই দেখতে পাওয়া যায়, তবে সে মেয়র। পুরো পোশাক পরা, পিঠে ঝোলানো তার রাইফেল, হাতে লাঠি। তার একটা যুক্তি এই, দোকানগুলো থেকে রোজ খাজনা আদায় করার ভার এবার তার উপরে পড়েছে।

অন্য একদিকেও এই মেলার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, মেলা না হলে জানা যেতো না এত নরনারী তাসিলায় আছে, এতগুলো সুন্দর চেহারার নরনারী তাসিলায় থাকতে পারে। সুন্দরের তালিকায় মেয়রকেও ধরতে হবে। কিন্তু সুন্দরের মাপকাঠি কী? এবার সেই মেলায় একজনকে দেখা যাচ্ছে,

যার পরনে উজ্জ্বল গাঢ় সামুদ্রিক নীল গ্যাবার্ডিন স্যুট, অত্যন্ত পুরু সোলের প্রকাণ্ড চেহারার চকচকে জুতো, মাথায় বোলার হ্যাট, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ গড়ন, উচ্চতায় যে মেয়রের ছ ফুট তিন ইঞ্চি ছাড়ানো উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যায়, যার মোঙ্গলীয় মুখে আট-দশটি পশমের লম্বা লম্বা গোঁফ। চোখে চশমা, যার একটা পরকলা সবুজ কাগজে ঢাকা। বাঁ কানে দামী পাথরের ইয়ার ড্রপ ঝলমল করে। সে পোস্ট অফিসে টেলিগ্রাম করতে গিয়েছিল। তাকে দেখে পোস্টমাস্টার ইতিমধ্যে তার নামকরণ করেছে, মোশে দায়ান।

মেলাটা সকালের চাইতে বিকেলের দিকে বেশি জমে, বিকেল থেকে রাত এগারোটাও পার হয়ে যায়। রাত গভীর হতে থাকলে মেয়েদের ভিড় কমে যায়, পুরুষদের ভিড় বাড়তে থাকে। তখন কাপড়-চোপড়ের দোকানগুলো বন্ধ, মনোহারি পণ্য এমন কি গৃহস্থালীর পণ্যের দোকানগুলোতে ঝাঁপ পড়ে যায়। অলৌকিক শক্তির আধার ম্যাজিকের তাঁবু, অবচেতনের দুঃস্বপ্ন সেই বিকৃত-দেহ নরনারীর কাচঘর তখন বন্ধ। প্রায় চায়ের মত সস্তা মদের দোকানে দোকানে তখন উচ্ছ্বাসের তরঙ্গভঙ্গে জাগ্রত চেতনাকে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে, অজেয় ভাগ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার তীক্ষ্ণ, তীব্র নেশায় জুয়ার দোকানে দোকানে পুরুষেরা ভিড় করে।

তাই বলে দিনেও বিচিত্র ঘটনা ঘটে না এমন নয়। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনে, তখন সকাল নটা হবে, ময়ূর তিনটি সুবেশা স্ত্রীলোককে পাওয়ার হাউসের সামনে পথের ধারে বসে গান গাইতে শুনেছিল। তাদের কণ্ঠস্বর মদবিবশ, তাদের সামনে তখনো একটা পাঁট বোতল খাড়া, তাদের গানের কথাগুলো এমন যে অন্য সময়ে তারা হয়তো নির্জনেও উচ্চারণ করবে না।

একদিন, রাত তখন গোটা নয়েক, ময়ূর রাতের পরিক্রমার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছিল, সঙ্গে নরবুও ছিল। সে নাকি ঘুমানোর আগে এক গ্লাস চা খেয়ে নেবে। অর্থাৎ এক টামলার সেই তীব্র দেশি মদ। রোজার ব্লু মুন তখন বন্ধ। তার পাশের চায়ের দোকানের দিকে যেতেই একটা চেঁচামেচির শব্দ তাদের কানে গেল। দরজা পেরোতেই তারা দেখলে, তাদের ফরেস্টের সহকর্মী কেরানিবাবু রিমপোচে একটা টেবলে বসে বেশ উত্তেজিত ভাবে তার নিজের ছোট তরোয়ালটাকে ধার দেয়ার ভঙ্গিতে টেবলের ধারে ঘষছে।

রিমপোচের পরনে তখন ভুটিয়া আলখিল্লা, এমন কি তার এক কানে মাঝারি বড় একটা ইয়ারিং। এসবে যেমন, তেমন কুকরির পরিবর্তে কোমরে বাঁধার ছোট তরোয়ালটা যেন প্রমাণ করছে উৎসবের সুযোগে সে উৎসে ফিরেছে, আদিতে সে ভোটতিব্বত গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। টেবলে-টেবলে অর্ধেক খালি পাঁট বোতলে, বোঝা যায়, দেশি মদ যার শতকরা ত্রিশ ভাগ বিশুদ্ধ অ্যালকোহল, বোতলের পাশে টামলার। তার থেকে কিছু দূরে চার-পাঁচজন খানিকটা যেন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে, মজাও করছে।

একজন বললে, রিমপোচে, তোমার ছেলেমেয়েকে রোজার দোকানে বসে হটডগ খেতে দেখলাম।

রিমপোচে বললে, তা খাবে। রোজার কাছে দুজনেই আংরেজি পড়ে। ক্যাট মানে কুত্তা, এসকাই মানে চান্দ, হর্স মানে পনি। সে স্বগতোক্তি করলে, রোজা সব ছাত্র-ছাত্রীকেই সাদা ধবধবে হটডগ টমাটর কেচাপ দিয়ে খাওয়ায়, পয়সা নেয় না। কিন্তু অন্য সকলের গলা কাটে, পান টাকার এক বোতল ত্রিশ টাকা, এক চপ এক টাকা।

আর একজন বললে, তোমার ছেলেমেয়েরা বাড়িতে গেল, আমি দেখলাম যেন।

রিমপোচে—বাড়িতে যাবে না, কোথায় যাবে? যাদের বাড়ি আছে তারা যায়, (স্বগতোক্তি এবং মদবিবশ হাসি) পুরুষ পাখিরা বাসা বাঁধে।

অন্য একজন—রিমপোচে, তোমার জানানাকে পরশুদিন রাত নটায় জুয়া খেলতে দেখেছিলাম।

তাকে নতুন বোকুতে সুন্দরী দেখাচ্ছিল। মুখচোখ লাল ছিল, চোখ ঝকঝক করছিল। তুমিও তো সঙ্গে ছিলে।

রিমপোচে—আমার জানানা আলবত খেলবে। যে তাকে সুন্দরী না দেখে তার চোখ খুবলে দেবো। (তরোয়াল শানাল) তার কান কেটে দেবো।

প্রথম জন—তা তোমার জনানার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে, এমন কিছু ছোকরি নয়।

রিমপোচে—যে তাকে বুড়ি বলে সেই ভূতের বাপের নাক কাটি।

দ্বিতীয় জন—তুমি বলছো তিন দিন দু রাত বাড়িতে যায় নি, হয়তো মেলাতেই কোনো দোকানে নেশা করে ঘুমাবেই।

রিমপোচে—না ভাই, না, মেলায় সূচখোঁজা খুঁজেছি।

প্রথমজন—সে এতক্ষণে বাড়ি চিনে ফিরেছে।

রিমপোচে—না ভাই, না, আমি আধঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে আসছি। (মদের শূন্য টামলারটা তুলে উল্টে পাল্টে শূন্য দেখে, টেবলের উপরে টক করে রাখলে।)

তৃতীয় জন—আমার মনে হয়, হয়তো কাল সকালে ঘুম ভেঙে দেখবে, তোমার জানানা তোমার চা করছে। এখন বরং বোতলটাকে শেষ করো।

রিমপোচে মদবিবশ হাসিহাসি মুখে খানিকটা চিন্তা করে নিয়ে বললে, ঠিক আছে। তোমরাও আ যাও।

ময়ূর বললে, রিমপোচে, তরোয়ালটা খাপে না ভরলে কেউ তোমার কাছে যাচ্ছে না।

নতুন গলা শুনে রিমপোচে চোখ তুলে ময়ূরকে দেখে নালিশে ভেঙে পড়ল। তার চোখে জল দেখা দিল। সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, মেবো জনানা, মেইঅর...সে নালিশটাকে শেষ করতেও পারলে না।

নরবু বললে, ও কিছু না। গতবার শর্কি লামার, এবার তোমার। সুন্দরী স্ত্রীরা বিপদ ঘটায়।

প্রথম জন—তা বৈকি। বরং প্রমাণ হল রিমপোচের স্ত্রী এখনো সুন্দরী এবং জোয়ান।

রিমপোচের খেয়াল হল, তার সামনে তখনো আধখালি পাঁট বোতল। সে আদর করার ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে সেটাকে কাছে নিলে। তার মন সাময়িকভাবে হারানো স্ত্রী থেকে নেশায় ঢুকল। তার লাল হয়ে ওঠা হলুদ মুখে বিবশ ঘর্মাক্ত হাসি দেখা দিলে, ময়ূর নরবুকে বললে, চল, জুয়ার খেলা দেখি।

ময়ূরের কৌতূহল হওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার সত্য কি না, রিমপোচের স্ত্রী ফিরবে কি না।

নরবু বললে, গত বছর লামার স্ত্রী দিন পনের পরে ফিরে এসেছিল। ছেলেমেয়েদুটির কথা মনে হলেই রিমপোচের স্ত্রী ফিরবে, সে আজ রাতেই হতে পারে। কিংবা নতুনের নেশা কাটতে আরো দু-এক রাত লাগবে।

কাঠের ব্যবসায়ী কনট্রাক্টর ববিজানের জুয়ার দোকানটা মজবুত করে তৈরি। কাঠের খুঁটির উপরে টিনের চাল। কাঠের তক্তার দেয়াল। ফোর্টের টিলার ধার ঘেঁষে, এমনকি বলা যায়, প্রবেশপথের বিপরীত দেয়ালটা টিলার গায়ে লেগে আছে।

দেয়ালের ভিতর দিক কাপড় দিয়ে মোড়া, মেঝের খানিকটায় গালিচা না হোক পুরু শতরঞ্চ বিছানো। পনের হাত চওড়া, বিশ হাত লম্বা একটা হল যেন। ঢুকেই বাঁদিকে খেলোয়াড়দের জন্য টেবল। টেবলের মাঝখানে গোলাকার একটা রঙের ছক। সেই ছকের চারদিকেই অনেকটা করে জায়গা থেকে গিয়েছে টেবলে, যার উপরে মদের, কফির অথবা চায়ের সরঞ্জাম রাখা যায়। টেবল ঘিরে চেয়ারে তখন ববিজান ছাড়াও পাঁচ ছ-জন। তাদের পোশাকে চেহারায় প্রমাণিত যে তারা

তাসিলার পক্ষে বেমানান রকমে ধনী। ডানদিকে একটা কাঠের রেলিং প্রবেশপথের কাছাকাছি। তার বিপরীত দেয়ালের গায়ে টেবলের উপরে রাখা রঙের ছকের মতো একটা গোল ছক মৃদু গতিতে ঘুরছে, কয়েক পাক দিয়ে এক মিনিটের জন্য থামছে, আবার ঘুরতে শুরু করছে।

ময়ূরের এসব সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকায় সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নরবু তাকে ফিসফিস করে বললে, আমি এরকম খেলা দেখেছি। টেবলের ছকে টাকা রাখবে, তার পর একজন রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে ডার্ট ছুঁড়বে দেয়ালের ছকে। টেবলের ছকে যে রঙে টাকা, দেয়ালের ছকের সেই রঙে ডার্ট বিঁধলে জিত। তিনটে ডার্ট ছোঁড়ে। ঠিক রঙে একটা বিঁধলে ডবল, দুটো বিঁধলে চৌগুণ, তিনটে বিঁধলে আটগুণ।

ময়ূরের হকচকিয়ে যাবার অন্য কারণও ছিল। যারা বসেছিল, তাদের দু তিনজনকে সে কাঠের ধনী ব্যবসায়ী বলে চেনে। অন্যান্যদের পোশাক দেখেও তাদেরও সেই ব্যবসায়ী কনট্র্যাকটরদের সমপর্যায়ের বলে বোধ হয়। তাদের বসার ভঙ্গি, পানাহার দেখেই অনুমান হয় তারা পরস্পরের পূর্বপরিচিত। সকলের পরনেই সাহেবি পোশাক। কেউ মদ খাচ্ছে, কেউ কফি, কেউ ওরই মধ্যে ক্ষুধা মিটিয়ে নিতে আপেল কামড়াচ্ছে। নরবু ফিসফিস করে বললে, শর্মা। ময়ূর দেখলে তাসিলার সেই দোকানদার শর্মাও আছে বটে খেলোয়াড় হিসাবে।

কিন্তু খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চাইতে জমকালো চেহারা, কী পোশাকে, কী আকৃতিতে, এক ভুটিয়া ভদ্রলোকের। প্রকাণ্ড হলুদে-লালে মিশানো মুখ। উপরের ঠোঁটের উপরে পাঁচ-ছটি লতানো চুল গোঁফের কাজ করছে, চোখে এই রাতেও হালকা রঙের সানগ্লাস যার একটা পরকলায় সবজে প্যাচ। মাথায় টুপি, পরনে ঝকঝকে বাদামি গ্যাবার্ডিনের ইংরেজি পোশাক। বাঁ কানে সাদা পাথর বসানো ঝলমলে ইয়ারড্রপ। সে হাসলে দেখা গেল, তার উপরের পাটির কয়েকটি দাঁত সোনা-বাঁধানো।

ময়ূর ঢুকতে না ঢুকতে যেন এক মুহূর্তের জন্য তাদের আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়েছিল, যেন বা খেলাটাও থমকে গিয়েছিল। ময়ূরের অনুমান হল, যা ভুল হতে পারে, যেন অনেকগুলো ঠোঁট মেয়র শব্দটাকে প্রায় নিঃশব্দে উচ্চারণ করলে। তারপর ববিজানের বাঁ-হাতি ধন সিং আপেল তুলে নিয়ে তাতে কামড়ালে, শর্মা কফি পট থেকে ঢেলে নিতে ধোঁয়া উঠল। আর সেই ভুটিয়া ভদ্রলোক একটা মদের বোতল খুললে, যার শব্দ হল, ফেনা বুজবুজ করে উঠে বোতলের গা বেয়ে গড়াতে লাগল। বোঝা যায়, এ মদ তাসিলার তৈরি নয়।

গ্লাসে সেই মদ ঢেলে, ফেনায় ভরা গ্লাস মুখে তোলার আগেই, পকেট থেকে দু-তিনখানা একশো টাকার নোট টেবলের ছকের হলুদ রঙে রেখে হাসতে হাসতে বললে, পিলা হো, পিলা। কিন্তু ববিজান পাঠান নোটগুলো তাকে ফেরত দিয়ে বললে, বটনসে, জি।

তখন সেই ভুটিয়া ভদ্রলোক সেই হলুদ ঘরে তিনটে সাদা বোতাম রাখলে। অন্য খেলোয়াড়রাও ছকের নিজের পছন্দমতো রঙের ঘরে একটা দুটো তিনটে করে বোতাম রেখেছে, ববিজান তা লিখে রাখলে। ময়ূর লক্ষ্য করলে, অধিকাংশ খেলোয়াড় ভুটিয়া খেলোয়াড়ের হলুদ ঘর এড়িয়ে বোতাম রাখলে, শর্মা ভুটিয়াকে অনুসরণ করল।

ময়ূর লক্ষ্য করলে, ছকের সাতটা রঙের মধ্যে তিনটেতে কেউ বোতাম রাখে নি ; লাল, নীল, হলুদ আর কমলায় যা দেখা যায়, কিছু বোতাম। নরবু ময়ূরের কানের কাছে বললে, এবার শুটিং। ডার্ট বসাবে। সব চাইতে বেশি টাকা যে বাজি ধরেছে কিংবা সব প্রথমে, সেই শুটিং করবে দেখো।

ময়ূর লক্ষ্য করলে, সেই ভুটিয়া ভদ্রলোক একটা এয়ারগান নিয়ে উঠে রেলিংটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ববিজান একটা সুইচ টিপতেই দেয়ালের গায়ের সেই ছকটা বনবন করে ঘুরতে লাগল। ভুটিয়া ভদ্রলোক এয়ারগান তুলে দাঁড়াল। উৎকণ্ঠায় সব খেলোয়াড়ের চোখ সেই চাকায়। কট শব্দ

করে চাকাটা থামল, সঙ্গে সঙ্গে সে ট্রিগার টিপল। এয়ারগান থেকে মাথায় পালক বাঁধা একটা ছোট তীর ছুটে গিয়ে চাকাটায় বিঁধল। খেলোয়াড়দের মধ্যে গুঞ্জন উঠল—পিলা। আবার চাকা ঘুরল। আবার মুহূর্তে তেমন থামল। আবার শুটিং হল। খেলোয়াড়দের মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠল—পিলা। তৃতীয়বার চাকা ঘুরে থামল, এবার ডার্ট এমন একটা রঙে বিঁধল যাতে কেউ বোতাম রাখে নি।

ববিজান পিলার ঘরের বোতামগুলো গুনে গুনে ভুটিয়া ভদ্রলোককে আর শর্মাকে যতগুলো করে বোতাম তারা রেখেছিল তার চারগুণ করে ফেরত দিয়ে, ছকের বাকি সব বোতাম কুড়িয়ে নিয়ে নিজের সামনে রাখলে। অন্য খেলোয়াড়দের কেউ নিজের ঠোঁট দাঁতে কামড়ালে, কেউ বোকার মতো হাসল, কেউ রুমালে কপালের ঘাম মুছলে।

ময়ূর বললে, তুই যে বলছিস টাকা বাজি ধরেছে, এ তো বোতাম।

নরবু বললে, আমার ধারণা প্রত্যেকটা বোতামের দাম কম করে একশো, এক হাজারও হতে পারে। ববিজানকে টাকা দিয়ে বোতাম কিনেছে এরা। এসব খেলায় তাই নিয়ম।

আবার খেলা হল। আবার টেবলের ছকের রঙে রঙে বোতাল রাখলে খেলোয়াড়রা। এবার কে শুটিং করবে তা নিয়ে কথা হল। ববিজান সেই ভুটিয়া ভদ্রলোককে বললে, বার বার তিনবার, এবারও আপনি। অন্য খেলোয়াড়রা রাজি হল।

জুয়ার বোধ হয় এই এক বৈশিষ্ট্য, জেতায় যেমন নেশা ধরায়, হারেও তেমন নেশা আছে। কেউ কেউ বলে শেষেরটি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্যুকামের মতো দারুণ উষ্ণ উত্তেজনা।

চাকা ঘুরল। তিনবার শুটিং হল। সকলের মুখেই যেন ছাই মেখে গেল। টেবলের পাঁচটি ছকে বোতাম ছিল, কী আশ্চর্য তীরগুলো সেসব রংকে বাদ দিয়ে অন্য দুটি রং, সাদা এবং কালোতে বিঁধেছে। ববিজান টেবলের ছকে জমা প্রায় বিশটি বোতাম নিজের কাছে টেনে নিলে। নরবুর কথা বিশ্বাস করলে, এই দানে সে দুহাজার অথবা বিশ হাজার লাভ করলে।

ময়ূর বললে, এ তো বেশ মজা, যে রঙে বোতাম পড়েছে সেটা না মারলেও চলে।

খেলোয়াড়রা নিজেদের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, এতক্ষণ শুধু পরস্পরের গলা শুনেছে। ময়ূরের কথায় তাদের সুরকাটার মতো অনুভব হল।

ববিজান বললে, কিছু বলছেন?

ময়ূর বললে, না, না, তেমন কিছু নয়। বলছিলাম টেবলে যে যে রঙে বোতাম, চাকায় সে সে রঙে না মারলেও চলে।

সে কি ইচ্ছে করে কেউ পারে? স্কিল আর চান্স দুটোই আছে। আর তা ছাড়া তাতে কার লাভ?

ময়ূর হেসে বললে, এইমাত্র যার হল।

সেই ভুটিয়া ভদ্রলোক মদের গ্লাস থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কী বলছে?

ববিজান ভুটিয়াকে ভোট ভাষায় বুঝিয়ে দিলে। তখন সেই ভুটিয়া ভদ্রলোকের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললে, মেয়র কী মনে করে সে ইচ্ছা করে এবার মিস করেছে?

ময়ূর বললে সে তা বলে নি। একটা সম্ভাবনার কথা বলছিল।

ভুটিয়া বললে, তুমি একবার সম্ভাবনাকে সত্যি করে দেখাও তো।

ময়ূর বললে, আমি সে প্রস্তাবও করি নি। তা ছাড়া আমি এই খেলার বন্দুক কখনো ছুঁড়ে দেখি নি। ভুটিয়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার কোটের তলা থেকে মুহূর্তে একটা বড় সার্বিস রিভলবার বার করে বললে, এটা? এটাকেও কী খেলার বন্দুক মনে করো?

ময়ূরের একটু রাগ হয়ে গেল এই অভব্য ব্যবহারে। সে রাগ চাপতে চেষ্টা করলে। ফলে তার সুন্দর মুখের বাঁ পাশটা কথা বলার ও না-বলার মাঝখানে ফাঁক হয়ে গেল, তিনটে সাদা দাঁত

ঝকঝক করে উঠল। ভুটিয়া ঠাট্টার সুরে বললে, তোমার পিঠেও তো এক বন্দুক, ওটায় হয়?

হতে পারে। কিন্তু এ গুলি লাগলে বোর্ডটা আস্ত থাকবে না। ভুটিয়া হো হো করে হেসে উঠল, বোর্ড? বোর্ড ববিজানের তিনটে আছে। তোমার কি তিনটে গুলি আছে?

এ সব ব্যাপারে. কী কী পরিণতিকে নিয়ে আসে, তা বলা যায় না। হয়তো, মোরের সেই রাধন মুহূর্তের জন্য তার রাগ নিয়ে তার স্মৃতিতে দেখা দিল, হয়তো দীর্ঘদিন থেকে তার মনে বয়স্ক কোন প্রতিষ্ঠাকে কঠিন আঘাতে পরাজিত করার ইচ্ছা ছিল ; সে অনুভব করলে যেন—এই শরীরটা নানা দোষে বিকল, হয়তো অবজ্ঞার হতে পারে, তাই বলে এই শেষ—আমাকে অপমান করলে সয় না। তার চোখদুটো ছোট বড় হতে থাকল পর্যায়ক্রমে, ইম্পিরিয়ালের উপরে তার পাথুরে সাদা গালদুটো লাল হয়ে উঠল। সে কাঁধ থেকে রাইফেল হাতে নিয়ে রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে। বললে, বিশ হাতে রঙিন ডাকটিকেট বেঁধা খুব একটা কিছু নয়। তা হলে ছকে যে বটমগুলো থাকবে, সব আমার।

খেলা শুরু হল। টেবলের ছকের চারটে রঙে কয়েকটা করে বোতামও জমে গেল। দেখা গেল সবুজ, সাদা, আর কালোয় বোতাম পড়ে নি। চাকা ঘুরল। ময়ূর শুট করলে। খেলোয়াড়রা সমস্বরে বললে, সাদা। আর চাকা ঘুরে থামলে, ময়ূর শুট করলে কপালের ঘাম আঙুলে মুছে। খেলোয়াড়রা আবার সমস্বরে বললে, সাদা। তৃতীয়বারে চাকা ঘুরল না। বোর্ডটা ফাটুক না ফাটুক তার পিছনের কোন তার গুলিতে ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে। ততক্ষণে ময়ূরের বুকের মধ্যে রক্ত ছলছল করছে, সে মৃদু মৃদু হাঁপাচ্ছে। সে বললে, হোস সাহাব, মো জানছু। তার ফ্যাকাশে মুখে হাসিটা একেবারে সাদা।

পিছনে ববিজান বাটন নেয়ার কথা কিছু বললে, কিন্তু ততক্ষণে সে দশ বিশ গজ চলে এসেছে।

বাইরের অন্ধকারে বাতাস বেশ ঠান্ডা। সেটা তার মুখে কপালে আরাম দিলে সে ভাবলে, কাজটা খুব অন্যায় হল, ফরেস্টের গুলি এ ভাবে খরচ করা। বোধহয় এখনই রেঞ্জারকে বলা উচিত হবে। কিন্তু এখন বরং মেলার বাইরে শহরটা এক পাক ঘুরে আসা ভাল। কিছুদূর গিয়ে সে নরবুকে বললে, তুই বাংলোয় যা। মেলায় দরুন বাইরের লোক এসেছে শহরে। আমি একটু ঘুরে আসি।

২

পরের দিন সকালে ময়ূর প্রভঞ্জনের কাছে যেতে, সে-ই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলে, কাল রাতে দশটা নাগাদ রাইফেলের শব্দ ময়ূরও শুনেছে কিনা, সে সে-বিষয়ে কিছু জানে কিনা, তার চোখে পড়েছে কিনা কিছু। ময়ূর তাকে বলতেই গিয়েছিল, কাজেই পূর্বাপর কিছু বাদ না দিয়েই ঘটনাটাকে বর্ণনা করলে। রেঞ্জার শুনলে ; খুব একটা সাধারণ ঘটনা, এবং সে হিসাবে যাক, তাতে আর কী হয়েছে বলে ব্যাপারটাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ তার মন থমকে গেল ; বোঝা যায় না, তা হলেও কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে, প্রতীকরূপা হতে চেষ্টা করে ঘটনাটা।

রেঞ্জারকে ভাবতে হল। শেষে সে বললে, তুমি কি চা খেয়েছো মেয়র? রোজা তো তার দোকানেই গেল। চলো, আমরাও এক কাপ করে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি, অথবা না খেয়েই, ডাকটাও আনবো, মেলাতেও ঘুরে দেখবো কাল রাইফেলে তুমি কী ভাঙতে পেরেছো। এই কথাটা বলতে রেঞ্জারের দু-তিন মিনিট সময় লেগে গেল।

মেলার মাঠ পার হয়ে পোস্টঅফিসের পথ। মেলার প্রান্ত দিয়ে পোস্টঅফিসের দিকে গেল তারা। সকালটা আলোয় ঝলমল করছে, যেন কেউ কোথা থেকে এক প্রকাণ্ড রিফ্লেকটারের সাহায্যে রঙিন আলো ফেলছে আকাশে, ক্যাসিয়ায়, মাদারে, লিলিতে, আইরিসে, পাতা-পল্লবে। অথচ সে

আলোতে চোখ তেমন ধাঁধায় না। বরং প্রভঞ্জনের চোখদুটি লোভে কিছু বিস্ফারিত হতে থাকল, মাঝে মাঝে, এ আমি পারি না আঁকতে—এরকম এক ব্যর্থতাবোধে, তার চোখ নিজের মধ্যে ফিরে যেতে লাগল, এবং দুই-ই তার অজ্ঞাতসারে।

মেয়র-বাংলোর সেই রুপালি-ব্রিজের কাছে এসে প্রভঞ্জন বললে, মেয়র, আমি পোস্টঅফিসে যাই। তুমি সরকারি ইউনিফর্ম আর রাইফেল রেখে অন্য পোশাকে সেখানে এসো, এখন আমরা মেলায় ঘুরবো। ময়ূর ভাবলে, কাল রাত্রির ব্যাপারটায় প্রতিকারের এটাই বোধ হয় প্রথম পদক্ষেপ, যা রেঞ্জার নিচ্ছে। সুতরাং সে দ্বিধা না করে ব্রিজ পেরিয়ে বাংলোয় ফিরলে।

প্রভঞ্জন চলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে অবাক হল। মনে মনে বললে, এই দেখো, এটার কী দরকার ছিল? চলতে শুরু করে সে চোখ তুললে, আর তখন আবার তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। ভয়ের ভাবটা মন থেকে চলে গেল। সে দেখলে, আকাশের নীল একটা কুঞ্চিত আবেষ্টন রেখার মধ্যে চোর্টেন পিক গোলাপি হয়ে উঠেছে। চলা শুরু করে সে ভাবলে, কোথাও দেখেছি। মন হাতড়ে হাতড়ে, যখন সে পোস্টঅফিসের কাছাকাছি, তখন তার মনে হল এই রং টাহিটিয়ান সেই নারীযুগলের ছবি থেকে নেয়া না হয়ে যায় না, সেই উন্মুক্ত-বক্ষসী নারীযুগল, তাদের স্তনাগ্রবৃত্ত গগ্যাঁ গোলাপিতে চুবিয়ে দিয়েছে।

পোস্টঅফিসে পৌঁছে প্রভঞ্জন দেখলে, পোস্টমাস্টার অনুপস্থিত। ভিতরে থাকতে পারে ভেবে সে গলা তুলে ডাকলে, সুচেতনা বরং অন্দরের পর্দা সরিয়ে দেখা দিল।

সে-ই বললে, পোস্টমাস্টার ডাক খুলে রেখে মেলায় গিয়েছে। মিসেস রোজা কাল বলছিলেন, আজ সকালে গরম জিলেপি ভাজাবেন, কোন এক কারিগর নাকি পেয়েছেন। এখানে এই প্রথম। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে চা খাবে বলে আনতে গেল। এমন হতে পারে, আপনার বাংলোতেই আপনাকে ডাকতে গিয়েছে। আপনার চিঠিও আছে, আপনি বসুন, আমি একটু কফি করি।

যতক্ষণ এ কথাগুলো সুচেতনা বললে, তার হালকা গোলাপি ঠোঁটদুটো চমকাল, ফুলে ফুলে উঠল ; কথা বলতে সে মৃদু মাথা দোলায় বলে তার মুখের ডানপাশকে বেষ্টন করে বুকের উপরে নামা খোপাখোলা চুলের খেই চোখে ভাসে, বুকের গড়নটা স্পষ্ট হয় ; আর প্রভঞ্জন আবার লক্ষ্য করলে, যা হয়তো বিষ্ণু দে-র কবিতার ফলেই, সুচেতনার চোখের কোলে, যা হয়তো প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালো মাসকারা, কালিমার কালো।

সুচেতনা কফি আনার কথা বলে দাঁড়ায় নি। প্রভঞ্জন জানে কোথায় চিঠি থাকবে। সর্টিংকেসে রেঞ্জার লেখা খোপই আছে একটা। উঠে গিয়ে সে চিঠি বার করে আনলে। বেশির ভাগই অফিসের চিঠি, তাদের মধ্যে একটা তার নামে যার প্রেরক কনজারভেটর অফিস। কোন জরুরি বিষয়ই হবে নতুবা একধাপ নেমে এমন ডি. ও. আসে না। একটা দেরাদুনের, তার ভাই মুকুলের হাতের লেখা প্রমাণ। উপরন্তু এবার খামের উপরে নামের শেষে পাঠ লিখেছে দাদামশাই। প্রভঞ্জনের ঠোঁট নিঃশব্দ হাসিতে ফাঁক হল। ওকে এ নিয়ে ঠাট্টা করতে হবে। ঠাকুরপরিবারে সেকালে বলতো বলে সব গুরু সম্বোধনের শেষে মহাশয় যোগ করা সুবিধার ব্যাপার নয়। তৃতীয় চিঠিটা, মৃদু খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলে রেঞ্জার, এটা এক বিশেষ ধরনের দামি খাম। খামের পরিচিত চেহারা আর ঠিকানা লেখা থেকেই সে ধরতে পারে এটা কার। ভিতরে একটা ছোট চিঠি যার মধ্যে কিছু টাকা-পয়সার হিসাব থাকবে। প্রভঞ্জন ভাল আছে, এই আশা, আর চিঠির শেষে তোমাদের বনানী। না দেখেও রেঞ্জার বলতে পারে, শেষ অক্ষরগুলো যেন কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত। পরের চিঠিখানার ঠিকানা কিছু হদিশ দিল না, বেশির ভাগ চিঠিই তা দেয় না। আপন মনে খামটা উলটে দেখতে গিয়ে সে স্বগতোক্তি করলে (কারণ উলটোপিঠে প্রেরকের নাম-ঠিকানাসহ রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ), আরে, এযে দেখছি দেওদার পাইন, দেওদার রোড। কলকাতা। তার চোখদুটো যেন কী মনোভাব প্রকাশ

করবে বুঝতে না পেরে নিষ্প্রভ অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেক চিঠি আজ তার। কিন্তু তখনই সুচেতনা এসে বললে, কফি দিয়েছি, আসুন।

পোস্টমাস্টারদের ছোট্ট বসার ঘরটায় বসল প্রভঞ্জন। ছোট টেবলটার বিপরীত দিকে সুচেতনা বসল। এ ঘরটার আলো সাদা নয়। কাচ দিয়ে আলো এসে ভায়োলেট বার্ণিস করা আসবাব কয়েকটিতে পড়ায় আলোটাকে বেগনি জাতের, গভীর আর বিস্তারবিশিষ্ট মনে হয়, যে বিস্তার তন্ময় হলে আহ্বান করে।

বাংলোয় ফিরে ময়ূর ভাবলে পোশাকের কথা। অবশেষে স্থির করলে, গাড়িতে কুড়িয়ে পাওয়া জিনটাকে আজ পরখ করলে হয়। সেই জিনের সঙ্গে তার আগুন-লাল শার্টটা মানাবে কি? কিন্তু তখন তত ভাববারই বা সময় কোথায়? জিনের ট্রাউজার্সটা পরতে গিয়ে দেখলে কোমরে বেশ চাপা, বটমে কিছু আলগা, উরুতে অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু ঝুলে পায়ের পাতা পর্যন্ত না নেমে জুতোর অ্যাঙ্কেল ঢাকছে। যার সে জিন তার কোমর তুলনায় সরু, পিছনটা তুলনায় চওড়া, কিন্তু উচ্চতায় সে অবশ্যই চার পাঁচ ইঞ্চি খাটো। কিন্তু এই মিস-ফিট তামার চকচকে রিভেট এবং জিনের দামি মেটেরিয়াল পুষিয়ে দিচ্ছে। সেই হিপিরই তাতে সন্দেহ কী? তো, এরকম সে শুনেছে, এরকম সব জিন বড় শহরের বাবুভায়ারা দু-আড়াইশোতে কেনে হিপি হয়ে যাওয়া মানুষদের কাছে।

সে ব্রিজ পর্যন্ত গিয়েই দেখলে, পোস্টমাস্টার আসছে। বেশ দেখাচ্ছে, বেরোচ্ছো? কাজ না থাকে চলো, রেঞ্জারকে ডেকে আনি। তার পর রোজার দোকান থেকে গরম জিলেপি নেবো। একা খেয়ে সুখ নেই। ময়ূর যখন বললে প্রভঞ্জন ইতিমধ্যে পোস্ট অফিসে গিয়েছে উপরের পথ ধরে, পোস্টমাস্টার বললে, তা হলে ভালই হয়েছে, চলো জিলেপি সংগ্রহ করি। ও ছাড়া মেলা হয় না, আর আজই প্রথম ওটা হচ্ছে এখানে।

তারা যখন রোজার ব্লু মুনে ঢুকল, তখন সেখানে ভিড় না হলেও দু-তিনখানা টেবলে ভদ্র চেহারার কয়েকজনকে দেখতে পেলে। ময়ূর দেখলে, তারা সেই জুয়ার ঘরের কনট্রাকটারদের দলই, এমন-কি গতরাত্রির সেই ভুটিয়া ভদ্রলোকও আছে।

এই মেলায় ব্রেকফাস্ট জাতীয় কিছু এক এখানেই পাওয়া সম্ভব। তারা তিনটে টেবলে বসেছে। সব টেবলেই মদের বোতল এবং গ্লাস, প্লেটে প্লেটে খাদ্য।

একটা অস্থায়ী বারের পিছনে রোজা উঁচু চেয়ারে, তার পিছনে কাগজের গায়ে আঁকা একটা সুন্দর অর্কিডের ছবি। এ ছবি যদি কেউ এঁকে থাকে এখানে তবে সে রেঞ্জারই হবে। রোজার অনেকগুলো আংটিপরা একটা হাতে ধরা একগ্লাস সাদা পানীয়। তার বাঁ দিকে ঘেরা জায়গার মধ্যে, জিলেপি ভাজা হচ্ছে যেমন, চপও তেমন। রোজাও বোধহয় এইমাত্র কিছু রান্না করছিল। আগুনের আভায় তার মুখ লাল, তার কামিজের হাতা গুটানো। রোজার ছেলে পরিবেশন করছে।

সেই ভুটিয়া ভদ্রলোকের টেবলে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসা মিত্রবাহাদুরকেও তারা চিনতে পারল। আর তখনই রেস্তোরাঁয় নানারকম ভাজার সুগন্ধ ছাপিয়ে মদের গন্ধটাও তাদের নাকে এল।

রোজাকে জিলেপির অর্ডার দিতে পোস্টমাস্টার বারের কাছে দাঁড়াল। রোজা তাকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে কারিগরকে নতুন করে ভেজে দিতে বললে। রোজা পূর্বপরিচিতই বটে। কাজেই দোকান কেমন চলছে, লাভ থাকবে কিনা এসব আলাপ শুরু করলে তারা।

ঠিক এক সময়েই কাণ্ডটা ঘটল। হেডক্লার্ক মিত্রবাহাদুর টেবল থেকে উঠে এসে বার ধরে দাঁড়াল। সে টলছে না, তবে তার মুখ থেকে তো বটেই পোশাক থেকেও মদের গন্ধ ছড়াচ্ছে। চোখে মুখে খুব গোপনীয় কথা ইশারায় বলার ভঙ্গি তৈরি করে সে বললে, গিয়ালপো বলছে...

কে গিয়ালপো? রোজা জিজ্ঞাসা করলে। মিত্র আঙুল দিয়ে, যার চশমার এক পরকলা কাগজে ঢাকা সেই ভীষণ লম্বা ভুটিয়া লোকটিকে দেখিয়ে দিলে।

তো কী বলছে আবার?

ভেবে দেখতে।

এখন যাও তো। এখনই জিলাবি দেবে, খাও গে।

মিত্র বললে, বিশ হাজার। তুমি যাওয়ার আগেই তোমার নামে এখানকার পোস্টঅফিসে বিশ হাজার জমা পড়বে।

ভেবে দেখবো। যাও। রোজার মুখ লাল হয়ে উঠলেও সে গম্ভীরভাবে বললে। আর খেয়ো না রকসি।

মিত্রবাহাদুর তার টেবলের দিকে ফিরল। রোজা এক চুমুকে তার হাতের গ্লাসটাকে খালি করে চেয়ার থেকে নেমে পোস্টমাস্টারের জিলেপি আনতে গেল। সদ্য ভাজা এবং রসে চোবানো গরম জিলেপির ঠোঙা নিয়ে আবার বারে ফিরল রোজা।

পোস্টমাস্টার দাম চুকিয়ে রওনা হচ্ছে, এমন সময়ে মিত্রবাহাদুর যে রোজার বার আর তার নিজের টেবলের মাঝামাঝি জায়গায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রোজাকে দেখছিল, আবার এগিয়ে এল।

রোজা পোস্টমাস্টারের পয়সা নিয়ে থ্যাঙ্ক ইউ বললে, ঝাড়নে হাত মুছলে, মিত্রবাহাদুরকে বললে, কত হেরেছিস জুয়ায় ওদের কাছে?

মিত্রবাহাদুর বললে, ভাবা হল? তিন মাসে আশি রাত, বিশ হাজার...

রোজা শুনতে না পাওয়ার ভান করে তার কারিগরকে ডেকে বললে জিলেপি ভাজা তখন আধঘণ্টা বন্ধ রেখে সামোসার যোগাড় করুক সে।

পোস্টমাস্টার আর ময়ূর তখন দরজার কাছে এসে পড়েছে, শব্দে পিছন ফিরে দেখলে, রোজার সামনে কিছু ঘটেছে। রোজার হাতে একটা গ্লাস এমন ভাবে ধরা যে তা থেকে তখনই যেন কোন তরল পদার্থ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, আর মিত্রবাহাদুর চোখে দেখতে না পাওয়ার ভঙ্গিতে দুহাতে চোখমুখ ঢেকে টলছে, তার মুখ, চুল ভিজিয়ে রকসি গড়াচ্ছে, তার জামার সামনের দিকে ভিজে। যারা টেবলে খাচ্ছিল, তাদের কেউ কেউ হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে গেল। অ্যালকোহলের গন্ধে বাতাস ঝাঁঝালো।

ময়ূর ভাবলে, মিত্রবাহাদুর হেডক্লার্ক। এটা কি এপ্রিলের রসিকতা আর একটা?

মুরলীধর কিছুক্ষণ এখন কি কিছু আলোচনা করা ভালো, এই ভাবতে ভাবতে চলল। তার পর আলাপের বিষয় তার চোখে পড়ে গেল। সে বললে, বা মেয়র, বেশ সুন্দর হয়েছে তোমার এই জিন, বেশ দামি আর ফরেন মেটেরিয়াল মনে হচ্ছে।

তাই নাকি? বিলেতি?

পোস্টমাস্টার মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ময়ূরকে দেখলে। বললে বানালে নাকি? না কিনলে? কী রকম খরচ পড়ল?

বিনা খরচে, পড়ে পাওয়াই।

সে কী, কত? জলের দাম বলছো? তা হলেও অন্তত দু-আড়াইশো তো বটেই। যে রকম নতুন দেখছি, এবং স্টাইল!

কুড়িয়ে পাওয়াই বলতে পারেন।

কুড়িয়ে পাওয়া? আশ্চর্য! কোন হিপির কাছে কিনেছো? নেশায় কাণ্ডজ্ঞান হারানো কোন ট্যুরিস্ট?

হতে পারে হিপির, এক ট্রেনের কামরায় কুড়িয়ে পাওয়া।

ভাবতে হল পোস্টমাস্টারকে। অবশেষে বললে সে, আচ্ছা, মেয়র, তুমি কোন স্মাগলারের

ফাঁদে পড়ো নি তো? এমন কি হতে পারে, এই জিনের প্যান্টটায় তোমার চোখ ধাঁধিয়ে অনেক অনেক দামি জিনিস সে তোমার চোখের আড়াল করেছিল? সোনার বিস্কুট, সোনার বার, পাউন্ড পাউন্ড হাশিশ কিংবা কোকেন?

ময়ূর ভাবতে সময় নিল। ফলে পোস্টমাস্টারও ভাবলে, মদের হোলি দেখছি। রোজার ওস্তাদি আছে দেখো। কিন্তু বিশ হাজার টাকা কেন? আর তিন মাস, আশি রাতেই বা কী? শব্দসমষ্টির সংযুক্ত অর্থ বোধ হতেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এটা কি কোন প্রস্তাব?

৩

ওদিকে প্রভঞ্জনকে কফি এনে দিয়ে সেই বেগনি বেগনি আলোতে সুচেতনার প্রাঙমুখর মন অনুভব করলে, একা কিন্তু সে একেবারে। আর অক্ষত বলিষ্ঠ সৌম্য এই পুরুষ, আর দুজনে একা। সে ভাবলে, এখন কী নিয়ে বা আলাপ করা যায়? বললে, কফিতে আর একটু দুধ দেব কি?

প্রভঞ্জন বললে, ছ মাস থেকে চিনি, এই প্রথম আলাপ হচ্ছে। সে অনুভব করলে, মুখের গড়ন চৌকোণ। সুন্দরী তো বটেই। বললে, বসুন।

দু এক মিনিট গড়িয়ে গেল। কফি ধীরে ধীরে খেলে যা হয়, উপরি-তলে হালকা সর পড়ার প্রক্রিয়ায় মৃদু সূক্ষ্ম নড়াচড়া হতে লাগল।

ভাবলে সুচেতনা, এখন কী নিয়ে... ইনি তো ছবি আঁকেন। তাঁর মনে পড়ল, পোস্টমাস্টার বলেছে, রেঞ্জার রোজার ন্যুড ছবি এঁকেছে। সে মুখ নিচু করলে। তার গাল লাল হল। সে মুখ তুলে বললে, এখন আবহাওয়াটা বেশ।

ভালো। নিশ্চয় ভালো। আর আপনি লক্ষ্য করেছেন, কেমন রঙিন। হ্যাঁ। সুচেতনা ভাবলে, ইনি চিত্রী, এঁদের চোখে রংগুলো কেমন বা ধরা পড়ে! একটু শির শির করে না গা? তার মনে পড়ল, মা বলতেন, পুরুষদের সামনে কিছু একটা কাজ নিয়ে বসা ভালো। সে বললে, আপনাকে বনে বনে ঘুরতেও হয়।

হ্যাঁ। তা তো বটেই। প্রভঞ্জন হাসল। চাকরিটাই তাই। আসছি, এক মিনিট, বলে সুচেতনা উঠল। তার উলের ঝাঁপিটাকে নিলে প্রভঞ্জনের পিছনের ড্রেসিং-টেবল থেকে ; আয়নাতে চকিতে নিজেকে দেখে নিলে। আর সেই মুহূর্তে তার মনে এল, তা রোজাকে অন্তত নিরাবরণ দেখতে হয়... টেবলে ফিরে সে বললে, একদিন আপনার বনের গল্প শুনলে হয়। হাসল সে।

ভারি সুন্দর কফি হয়েছে। বললে রেঞ্জার। বাহ্, বেশ রংটা তো উলের। প্রিমরোজ; এপ্রিলের রং। হাসল সে। বললে, পোস্টমাস্টারের না আপনার?

দেখুন না এপ্রিল হয়ে গেল। শর্মাকে বলেছিলাম সেই নভেম্বরে, এদিকে তো পিওর উল পাওয়া যায় না। দার্জিলিং থেকে আনিয়ে দিন পনের আগে পৌঁছে দিয়েছে। এ সীজন তো চলেই গেছে। আমিও ধীরে বুনছি আগামি শীতের জন্য।

সুচেতনার হাতের কাঁটাদুটো টুকটুক করে মৃদু শব্দে চলতে শুরু করলে তার প্রাঙমুখর মন অনুভব করলে, আর হয়তো পনিতে চেপে, যাকে দেয়াল মনে করো, তাকে ভেঙে ভেঙে, তখন তো দরজা খোলার মতো গাছগুলো সরে যায়, আর এই পুরুষটা ঢুকে যেতে থাকে। সে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বনের ছবি আঁকতেও ভালবাসেন নিশ্চয়?

প্রভঞ্জন ভাবলে, শান্তি, সুখ, তৃপ্তির আভাস নয়? ওটা দেখো, মাসকারার মতোই দেখায়। সে কফিতে চুমুক দিলে। তার মনে পড়ল, সাইকায়াট্রিস্ট দেওদার পাইন চিঠি লিখেছে। কোন বিল

কি তার পাওনা আছে? সে বললে, আপনি মেলায় কী দেখলেন? আপনি সত্যিকারের বনের ভিতরে যান নি কখনো?

সুচেতনা বললে, না। সে অনুভব করলে, কিন্তু পরপুরুষ। বললে, আপনার অন্ধকার-অন্ধকার লাগছে না? প্রভঞ্জন ভাবলে, সুগৃহিণী বৈকি, নতুবা এপ্রিলে আগামি শীতের উল? বললে, এপ্রিলের কিন্তু একটা রং থাকে। প্রভঞ্জন কফি শেষ করে বললে, আবার ধন্যবাদ। আমাদের পোস্টমাস্টার সৌভাগ্যবান।

সুচেতনা উঠে দুটো জানালার পর্দা টেনে টেনে সরিয়ে দিলে ঘরে এপ্রিলের বেলা আট নয়ের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল। কিন্তু শার্সির কয়েকটা কাঁচ রঙিন হাওয়ায় খানিকটা লম্বাটে রঙিন আয়তক্ষেত্রে, টেবলে, মেঝেতে সেই আলোর মধ্যে পৃথক হয়ে রইল।

সুচেতনা ভাবলে, একদিকে বোঝা যাচ্ছে বয়সটাও এমন কিছু নয়। ত্রিশ হয়েছে। বললে, মনে হচ্ছে পোস্টমাস্টার স্পেশাল জিলেপি ভাজাচ্ছে। সে হাসল। বললে, আপনাকেও আমরা মনে মনে ধন্যবাদ দিই। আমাদের বিপদে আপনার উপরে ভরসা রাখি। কিন্তু আপনি এপ্রিলের রঙের কথা..

রং আছে না? নইলে পোস্টমাস্টার গরম জিলেপি আনতে যান, আর আমি তার লোভে বসে থাকি? এই বলে প্রভঞ্জন হো হো করে হেসে উঠল। এখন এমনিতে দোকানে বসে জিলেপি খেতে লজ্জা করে না? সে তার পাইপ-পাউচ বার করলে। ধরানোর যোগাড় করতে লাগল। কিন্তু তার আগেই পোস্টমাস্টার এসো মেয়র, এসো, বলে জিলেপি নিয়ে ঢুকলে।

এপ্রিল কিংবা তার মেলা জিলেপির আসর বসালে বটে, কিন্তু তাকে দীর্ঘস্থায়ী করার উপায় ছিল না। মেলার দরুন ডাকঘরের কাজ বেড়েছে। বাইরে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। রেঞ্জারকেও অফিসে যেতে হবে। ঘড়ি দেখলে সে, জিলেপি আর চা শেষ হতে না হতে।

পোস্টমাস্টার পোস্টঅফিসের বারান্দা পর্যন্ত প্রভঞ্জনের সঙ্গে এল। কয়েকজন মাত্র লোক কাউন্টারে। পোস্টমাস্টার একটু দ্বিধা করলে। অবশেষে বললে, আপনারা পাঁচ মিনিট যদি অপেক্ষা করেন। তারাও বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আসুন মাস্টারমশাই।

রেঞ্জারের সঙ্গে রাস্তায় এসে পোস্টমাস্টারের মনে এই ইতস্তত ভাব দেখা দিল, রোজার রেস্তোঁরার ব্যাপারটা রেঞ্জারকে বলা উচিত কি? সে স্থির করলে, রোজা রেঞ্জারের কাছের লোক তো বটেই। বললে, আপনার হেডক্লার্ক মিত্রবাহাদুরের সঙ্গে রোজার একটা ঝগড়া হয়েছে মনে হয়। রোজা তার মুখে বিয়ার কিংবা দেশি মদ ছুঁড়ে মেরেছে। হয়তো মিত্রবাহাদুর কোন অনুচিত প্রস্তাব করেছিল।

প্রভঞ্জন এক মিনিট ভাবলে, পরে জোরে জোরে হেসে উঠলে। ঠিক তাসিলার এই বসন্তমেলার উপযুক্তই বটে।

পোস্টমাস্টার তার অফিসে গেলে প্রভঞ্জন নিজের কোয়ার্টারের পথে চলতে চলতে রোজার মদ ছোঁড়ার দৃশ্য কল্পনায় দেখে হাসিমুখে ভাবলে, তো, রোজা তাসিলার অতিবিকশিত ডালিয়া, লিলির মতোই নয় কি? বসন্তই বলতে পারো। স্থূল, ম্যাচিওর, সুন্দরী, অনির্দেশ্যা, নাকি আদিমও।

অনির্দেশ্যতার কথায় সুচেতনাও মনে আসে। পোস্টমাস্টার রেঞ্জারকে নিয়ে সেরকম যখন পাশাপাশি বেরিয়ে যাচ্ছে, সুচেতনা যেন উষ্ণতা, যেন বসন্তের রোদের অভাব অনুভব করলে। রোদের খোঁজে অফিসঘর আর কোয়ার্টারের একফালি প্যাসেজের কাচের জানালাটার দিকে সরে গেল। তাতে পথের খানিকটা দেখা যায়। সেখানে ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সুচেতনা ভাবলে, প্রায় একই রকম বয়স, একই রকম উচ্চতা, পোস্টমাস্টারের গড়নটা হালকা। পোস্টমাস্টার অফিসের দিকে ফিরলে, প্রভঞ্জনও একমিনিট থেমে, পরে চলতে শুরু করলে। সুচেতনা যে জায়গাটা দেখছিল সেটা খালি হয়ে গেলে, তার মনে পড়ল, তার সংসার আছে। সে অবাকও হল। তুলনা করছিলাম

কেন দুজনকে? এই সহজ প্রশ্নটার উত্তর না পেয়ে সে লজ্জিত হয়ে উঠল।

৪

খেলার মাঠের সীমা পেরিয়ে নিজের কোয়ার্টারের দিকে চলতে প্রভঞ্জন অনুভব করলে, একটা বেশ খুশির কারণ ঘটেছে। মেলার দৃশ্যগুলোকে পেরিয়ে তার মন খুশির কারণ খুঁজতে, অন্য কথায় খুশির হেতুগুলোকে আবার উপভোগ করতে চেষ্টা করলে। ওই সেই গোলাপি চোর্টেন পীক। লক্ষ্য করো, এর আগে, গত এপ্রিলেও নয়, পীকটা তেমন চোখে পড়ে নি, আজ যা পড়েছে। ছবিতে কারো স্তনকে অ্যামারাষ্থ রং দিয়ে তাকে কি শান্তির আশ্বাসও করা যায়?

সে মন বদলালে। হতে পারে ভাল লাগার কারণ, সুচেতনার মতো স্লিম আর গ্রেসফুল কোন আঁকার মতো মহিলা। সে পাশে ময়ূরকে দেখে বললে, বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখো কাল রাতের ঘটনা কতদূর গড়ায়। তুমি বাংলোয় ফেরো।

সে আবার মন বদলালে। ও, মুকুলের চিঠি। তো, মাই ডিয়ার মুকুলের এবার বোধ হয় তেরো হল। তা হবে, যদি তার একত্রিশ হয়ে থাকে। আর তা হলে বনানীরও পঁয়ত্রিশ হয়ে যাবে। মুকুল কিন্তু একা সেই দেরাদুনের স্কুলে। এটা দরকারও যদি পুরুষকে পরে নিজের পক্ষে নিজেই যথেষ্ট—এরকম হতে হয়। ফলে পৃথিবীর কোন জায়গাতেই নিজেকে গৃহহীন মনে হবে না। তো, শান্তিনিকেতনে দেয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু দেরাদুনই বরং, যা সেই সাত বছরের একটি ছেলের পক্ষে অনেক দূর, আর খরচও অনেক সেই রেসিডেনশিয়াল স্কুলে, স্থির করা হয়েছিল। এখন মুকুল ছুটিতে নিজেই চলে আসে কলকাতায় তার জননীর কাছে।

একবার কিন্তু কলকাতায় যেতে হবে। দেখতে হবে পাশের ফ্ল্যাটগুলোর অধিবাসীরা বনানীকে কী অসুবিধায় ফেলেছে। মুকুল একবার লিখেছিল, মাকে একবার দেখে যেও তো। সেইবারই লিখেছিল, মা লিখেছেন, আমি যেন, বাবাকে যেমন মানা উচিত, তোমাকে মানি। দেখো, আমাকে এরকম না বললে, আমি যেন তা করি না।

তো সে আর মুকুল কিন্তু পৃথিবীতে পরস্পরের সব চাইতে আপন, হোক বৈমাত্র ক্ষুদে ভাই। প্রভঞ্জনের মুখ হাসি হাসি হল, কল্পনায় সে মুকুলকে আলিঙ্গন করলে।

কিন্তু বনানীকেও দূরে রাখা যায় কী চিরকাল? যাই বলো, তারা তিনজনে কী এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনে!

এখন চিঠি তিনটি পড়ার সময় হবে না অফিসের আগে। এটা যোগাযোগ হয়ে উঠল, তিনটি চিঠি একসঙ্গে আসা। ঠিক তা নয় অবশ্য, ভাবলে সে, মুকুলের চিঠিটা সাপ্তাহিক চিঠির আর একটি, বনানীর এটা এমাসের চিঠি, যেগুলোতে সে কলকাতার ফ্ল্যাটের খবর দেয়। দুটোই প্রত্যাশিত। ডক্টর পাইনের চিঠিটা আসাতেই যোগাযোগ হয়ে গেল।

সে হাসল। ভদ্রলোকের পিতামাতা ভাবতে পারে নি যার পদবী পাইন, তার নাম দেওদার রাখলে হাসির কারণ হতে পারে। সহপাঠী থেকে শুরু করে বর্তমানের সমজীবীরা দেওদার দেওদার বলতে পারে, অথবা পাইন পাইন বলে ঠাট্টা করতে পারে। পিতারা চিন্তাভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে এমন কিছু করতে পারে, যার ফল পুত্রকে সারাজীবন ভোগ করে যেতে হয়। অথচ ভদ্রলোক নিজের চেষ্টায় প্রকৃতই একজন হাইলি কোয়ালিফাইড চিকিৎসক। শুধু এক স্ট্রিমে না থেকে, মানসিক রোগেও স্পেশালাইজ করে এসেছেন ভিয়েনা থেকে।

সাইকায়াট্রিস্টরা বেশ অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে। তুমি টডের রাজস্থান পড়েছিলে? ছোট ভাইয়ের

নাম মুকুল রেখেছো, দেখছি। তা, তাদের কাছে গেলে প্রশ্ন করবেই। বাড়ি বয়ে এসে করে না। আর তাদের সেই ফিজিশিয়ানও বলেছিল সাইকায়াট্রিস্টের কথা। বনানী বলেছিল, তাই ভালো, এম এস সি পরীক্ষা দিতে হবে না? কে মুকুলের মতো আশার সঞ্চার করে, কার এমন মধুর করুণ হাসি? কে শুকিয়ে যাবে, এমন ভয় হয়? মুকুল নাম আমরা ঠিকই রেখেছি, বলেছিল বনানী, মুকুলের মা।

ডক্টর পাইন বলেছিল, আসলে সেই গল্পে দ্বিতীয় ভীষ্মের মতো চণ্ডও আছে তো। আর সকলেই জানে, চণ্ডই মুকুলের জননীর প্রার্থিত ছিল।

তখন পাইন এরকম সব অদ্ভুত প্রশ্ন করতে থাকলে ডক্টর পাইনের ফরাসি গোটি দেখে তার হাসি পেতো, আপনাকে ডক্টর দেওদার দেওদার বললে কী খুব ভাল হয়?

তো অবশেষে সে বলেছিল– এখন সে কী লিখেছে কে জানে– তার কী নিয়ম আছে, বছর দুএকে একবার অন্তত পুরনো রোগীদের আরোগ্য স্থায়ী হয়েছে কিনা জানতে চিঠি লেখা। প্রভঞ্জন ভাবলে এখন কোয়ার্টারে গিয়ে লাভ নেই, অফিসেই যেতে হয়। লাঞ্চের রান্না রোজার রেস্তোরাঁতেই হবে, আর তা তার ছেলে কোয়ার্টারে নিয়ে আসবে। তো ডক্টর পাইন অবশেষে বলেছিল : মিস্টার দত্ত, মানুষ স্বার্থপর হলে মন্দ হয় না। মুকুলকে নিশ্চয় দেখবেন আর সেই সৎমাকেও, যাকে বনানী বলেন। কারণ পৃথিবীতে আপনারা পরস্পর ছাড়া আপনাদের কেউ নেই। কিন্তু স্বার্থের দিকেও তাকাতে হয়। আফটার অল সৎভাই আর সৎমা। মৃদু নেশাটেশা করুন, হবিটবি কিছু ধরা যায় কিনা দেখুন। ও, সেটা কিন্তু এম এস সি পরীক্ষার পরে, যখন সে বাড়িতে আবার সেই আর্থ্রাইটিসকে আশঙ্কা করছে। বাড়ির বাইরেও যাচ্ছে না।

কিন্তু তাকে কোয়ার্টারেই ফিরতে হল। পোশাক বদলাতে হবে। সে অনায়াসে নিচু হয়ে তালা খুললে। উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধদুটোকে নড়িয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করলে কিছু। নিজের বোকামিতে হাসল। বললে, আর্থ্রাইটিস টু হেল।

ঘরে ঢুকতেই রংটা তার চোখ পড়ল। ইজেলে চাপানো ক্যানভাসে রঙটা এখনো কাঁচা। সিলিং থেকে ঝোলানো, আঁকার সুবিধার জন্য নিচে নামানো বালবটা এখনও জ্বলছে। কাল রাত দুটো পর্যন্ত ছবি এঁকেছে সে রোজা রেস্তোরাঁর কাজ শেষ করে এলে। পাশে মোড়ায় বসে রোজা হিটারে গরম করে বিয়ার খেয়েছে আর কেশেছে। গরম বিয়ার নাকি কাশিতে ভালো।

কিন্তু ছবিটা যদি কিছু হয়ে থাকে! ব্যর্থতার প্রমাণ যেন কিছু। মিনিট দশেক বসে, পাইপ ধরিয়ে, সেটাকে শেষ করে, সকালের পরা আচকান-চুড়িদার বদলে, কোট-প্যান্ট-টাই-এ নিজেকে ঢেকে সে তিনশো গজ দূরের অফিসে অফিস করতে গেল। তার এরকম অনুভব হল, সে ভঙ্গুর কাচের উপর দিয়ে হাঁটছে। এমনকি পায়ের নিচে সে জন্য সেরকম শব্দ হচ্ছে কিনা তা শুনতে চেষ্টা করলে। না বোধ হয়, পাইন কোনই হবে।

কথাটা অবচেতন, যা নিয়ে পাইনের কারবার। আর যা নাকি সকলেরই আছে। তা কি সেইরকম যা এই মেলায় অনেকে প্রকাশ করে ফেলেছে? অবশ্যই তা দেখা যায় না। নাকি তার কাজের সক্রিয়তার ফল দেখা যায়, যদি দেওদার পাইন আর তার ফরাসি গোটিকে বিশ্বাস করো। অবশ্যই অবচেতনের নামে মামলা করা যায় না কোন অপরাধের। প্রভঞ্জন অবিশ্বাসে হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলালে। বিয়ার কি নেশা? রোজার তেমন ছবি আঁকা কি নেশা, না হবি? দূরে বনের চাকরিতে আসা কি স্বার্থরক্ষা করা যে জন্য আর্থ্রাইটিস সারে? সেই দেওদার দেওদার যেমন বলেছিল?

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১

কী যেন কাজ আছে, এই মন নিয়ে সেদিন ঘুম ভাঙল ময়ূরের। রাত পুইয়েছে, পায়ের কাছে শার্সি কালো থেকে ধূসর হয়ে ওঠাই তার প্রমাণ। কাল রাতের সেই আকস্মিক বৃষ্টির পরে শার্সিতে এখন আর এতটুকু মেঘ চোখে পড়ছে না। এরকম বৃষ্টি হয় বটে পাহাড়ে। কেউ খেয়াল করেনি, দুশো গজ লম্বা পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা কালচে বাদামি মেঘ কি করে কতটুকু রাতের আকাশের তারা ঢেকেছিল। হঠাৎ মিনিট দশেক ঝমঝম করে পাহাড়ের একটা অংশে বৃষ্টি হয়ে গেল।

বাইরের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এলেও ঘরের কোণগুলিতে, করিডরের দূর প্রান্তে তখনো অন্ধকার লেগে আছে। ময়ূর কিচেনে গিয়ে সুইচ টিপলে আলো জ্বলল ; পাঁচটাও বাজে নি ; আলো চোখে পড়ায় নরবু তার বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসল, আর তাকে দেখে ময়ূরের মনে পড়ল, ঘুম ভাঙতেই যা মনে হয়েছিল, তা নরবু সম্বন্ধেই। নরবুকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কাল অত রাতে বৃষ্টির মধ্যে কোথায় গিয়েছিল সে।

নরবু তাকে দেখে, উঠে, চায়ের জোগাড় করতে স্টোভ ধরালে।

কিন্তু প্রশ্নটা করা সহজ নয়। ময়ূর বরং মুখহাত ধোয়ার অছিলায় দূরে সরে গেল। মেলা শেষ হয়নি। দশ দিনের হয়েছে। ভালো বিক্রি হলে দু-একদিন বাড়তে পারে। তাসিলার হাটের দিন পর্যন্ত থাকলে কিছু বেশি বিক্রি হবে। ম্যাজিকে কিছু ভিড় হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা যায়, একটানা সেই উচ্ছ্বাসে কিছু ক্লান্তি এসেছে। দেখাশোনার বিষয় হওয়ার চাইতে বরং আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। একটা বিষয় এই, যেমন কাল অফিসে যোগেন গায়েন বলছিল, এবার ডার্ট অ্যান্ড স্কিল গেমে কন্ট্র্যাকটাররা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। এ কয়েকদিনে তারা সকলে মিলে প্রায় ষাট সত্তর হাজার টাকা লোকসান দিয়েছে। ধনা সিং তো মুখ কালো করে জাকিগঞ্জেই ফিরে গিয়েছে।

পাম্পিং হাউসের ঋষিমশায় অন্য একটা দিক লক্ষ্য করেছে। এই আট-নয় দিনে খুব কম করেও আট-নশো বোতল বিলাইতি মদ বিক্রি হয়েছে। প্রতি বোতলে দশ টাকা করে হলেও কেউ এ কয়েকদিনে আট-ন হাজার টাকা ঘরে তুলেছে।

অন্য রকম সংবাদও আছে। তাসিলার একটাই স্কুল। তাতে দুজন পড়ায়, শর্মা পণ্ডিত আর রোজা গাড়ওয়ালি। অফিসের যে ঘরটার নাম ক্যান্টিন, কাল বিকেলে সেখানে যখন চা হচ্ছে, তখন দ্বিতীয়বার কথাটা উঠে পড়েছিল। প্রথমবার তো এখানকার নিয়ম অনুসারে, সেই বেলা এগারোটার চায়ের সময়েই। স্কুল আর কি করে থাকছে? রোজা আবার বিয়ে করে চলে যাচ্ছে তাসিলা থেকে। আবার বিয়ে? এই তৃতীয়বার হবে, আর এত বয়সে যখন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে আছে! এটা এক মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়েছিল। কী নিতে এসে, অ্যাকাউন্টেন্ট ধ্বজবীর বলেছিল শুনে, কেউ কেউ আছে, বিয়ে না করে থাকতে পারে না। রেঞ্জসাহেবের জন্য আরেক হাউসকিপার খোঁজ করতে হয়। একজন জিজ্ঞাসা করলে, কত বয়স হবে, সার? ধ্বজবীর বললে, আমাদের হেডক্লার্কের যদি চল্লিশ হয়, তবে তারও কম হবে না।

ময়ূর মিনিট পনের পরে হাত মুখ ধুয়ে, রাতের পোশাক পালটে, চাদর গায়ে কিচেনে গিয়ে

দেখলে, নরবু দু গেলাস ধোয়ানো চা নিয়ে অপেক্ষা করছে। চা নিয়ে ময়ূর ভাবলে, কথাটা জিজ্ঞাসা করা কিন্তু সহজ নয়। সে ববং আর একবাব রাতের গোটা ব্যাপারটাকে নিজের মনে ফিরিয়ে আনলে।

মেলা বসার পব থেকেই সে বাতের পরিক্রমায তেমন বার হচ্ছিল না। কাল রাত যখন বারোটা পার হয়েছে, সে অনুভব করেছিল ফবেস্ট কলোনি থেকে ফোর্টের নিচে মেলাব মাঠ আলোময়। কিন্তু বাকি তাসিলা অন্ধকারে। অন্ধকারটাকে ভেলভেটেব মতো নরম মনে হয়েছিল। ওদিকে একবাব দেখে আসা যাক, বলে সে বেরিয়ে পড়েছিল।

কোথাও কোন সাড়া ছিল না। যেন এপ্রিলের উৎসব ক্লান্তিতে ঘুমোচ্ছে ; শীত কম, অন্ধকারটা আরামদায়কভাবে উষ্ণ। একটা সৌরভ আসছে যা অবশ্য কোন মদেব হতে পারে। আকাশ নীলাভ, অনেক তারা সেখানে। শস্যদানা ছড়ানো প্রাঙ্গণ, যার মাঝখানে খানিকটা জায়গা যেন শস্যমুক্ত করা হয়েছে।

নিচের পথ দিয়ে চলতে চলতে যখন ময়ূর ভাবছে, এবার ফিরলে হয়, হঠাৎ কুকুরের ডাকে মুখ তুলে সে অবাক হয়েছিল। বেশ বড় একটা মশাল জ্বলছে যেন তার বাঁ হাতের দিকে উপরে। দু-এক মিনিট সেটাকে মূল্য না দিয়ে চলে, হঠাৎ তাব এই আশঙ্কা হল, আগুন নাকি? সর্বনাশ, যদি আগুন হয়! এই রাতের অন্ধকারে! এই পাহাড়ে সব বাড়ি প্রায় কাঠের। জলেব বন্দোবস্ত খুবই অপ্রতুল। সে তাড়াতাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে লাগল।

আগুন, তাতে সন্দেহ নেই। দু-তিনশো ফুট উপরে উঠে পথটা যেখানে ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের মতো ভাগ হয়েছে, সেই জোড়ের মুখে একটা বাড়ি জ্বলছে। বাড়িটা অন্যান্য বাড়ি থেকে পৃথক একটা ছোট টিলাব উপরে, নিজেব বাগানের মধ্যে। অন্ধকারের মধ্যে আগুনের আলোয় বাড়িটাকে সবটুকু চেনা যায় না। তখন হঠাৎ তার মনে হয়েছিল, এরকম কোনো জায়গাতেই রোজাব নিজের বাড়ি, এমন সে শুনেছিল। আশ্চর্য, একটা লোক কোথাও নেই। কী করবে সে, কি করে আগুন নেভাবে? যত জোরেই সে চলুক, ওখানে পৌঁছতে অন্তত দশ মিনিট লেগে যাবে।

কিন্তু সেই দশ মিনিটেই আগুন নিবে গেল। কেউ তা হলে আগুন নিবালে। তবু সে বাড়িটার কাছে ওঠার জন্য আর একটা পাকদণ্ডি ধরলে, আর ঠিক তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টিটা নামল। সে যখন পৌঁছাল, বাড়িটার সামনে তখন আগুনে জল ঢাললে যে পোড়া সোঁদা সোঁদা গন্ধ হতে পারে, তাই মাত্র ছিল। টর্চ ফেলে সে দেখলে, বাড়িটার এক পাশের দেয়ালে পাঁচ-সাত ফুট ব্যাসের একটা অংশ আগুনে পুড়ে গহ্বর। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে সে বংলোর দিকে ফিরতে শুরু করলে।

কাল দেখা যাবে, এই ভাবছিল সে ফিরতে ফিরতে। সে তখন বাংলোয় আসার ব্রিজের ষাট গজ নিচে ও দূরে, হঠাৎ সে আবার দেখতে পেলে। বৃষ্টির ভারি হওয়া বাতাসে যেন একটা ছায়া তার আগে আগে চলেছে। তার নিজের ছায়া কি? ব্রিজে উঠে সে যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। টর্চ জ্বালতেই, সেই আলোতে জালে পড়ার মতো যে মানুষটা ব্রিজ এবং বাংলোর মাঝামাঝি থমকে দাঁড়াল, সে নরবু।

চায়ের গ্লাস হাতে বারান্দায় এসে ময়ূর দেখলে, জলে ধোঁয়া পরিষ্কার আকাশে এরই মধ্যে লাল আর সোনালির ছোঁয়া লাগছে, ব্রিজের উপরে কমলা আলো চকচক করছে। সকালের রোদের টানে সে ব্রিজের সেই জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল চায়ের গ্লাস হাতেই। যা ভেবেছিল তার চাইতেও ভালো ; হলুদ, লাল আর তাদের নানা মিশ্রণে পুবদিক তো বটেই, আকাশের মাঝখানে গলা মাখনের মতো মেঘগুলোও রঙিন।

নরবু এসে দাঁড়াল বাংলোর সামনে, লনে। টর্চের আলোর মতো ধক করে এক ঝলক হলুদ আলো গিয়ে পড়ল তার গায়ে, ময়ূর ভাবলে : জিজ্ঞাসা যে করবো, রাত করে তুমি কোথায় যাও,

যদি এমন হয় কাউকে সে ভালোবাসে?

সে বললে, আজ ভোরে উঠে ভালো হয়েছে, নরবু, তোর ফুলগাছগুলোর চারিদিকের ঘাস তোলা আজ শেষ করতে পারবি। তুই তো পাকাপোক্ত মালিই হয়ে যাচ্ছিস।

মেলার মাঠের আলোগুলো চকচক করে নিবল। তাহলে ভোর পাঁচটা হল এখন। সূর্য উঠি উঠি করছে। নরবু চায়ের খালি গ্লাসদুটো নিয়ে চলে গেলে, সে ভাবলে, চারিদিকে কিন্তু এপ্রিলের তাসিলা ফুটে উঠছে। ঠিক এমন সময়েই তার হঠাৎ মনে এল, রোজার বিয়ের সংবাদ, সেদিনের রেস্তোরাঁর সেই বিশ্রী কথাগুলো এবং ঘটনাগুলো। রোজার বাড়িতে আগুন লাগা এবং নিবে যাওয়া–যেন একটা ভীতি অথবা আশঙ্কার স্পষ্ট হয়ে ওঠা। আর নরবু? সে-বিষয়টা থেকে মন সরিয়ে নিতে সে এদিক ওদিক চাইল। সে কি চোর্টেন পীকটাকে দেখবে? সব চাইতে ভালো ভিউটা নেয়ার জন্য, কয়েক পা সরে দাঁড়িয়ে তার মনে হল ব্রিজের উপরের রিজে, বরং উত্তর দিকে, যেন ছোট ছোট হলুদ প্রজাপতি পৎ পৎ করছে। একটু ভালো করে দেখে সে বুঝলে, সেগুলো প্রদীপ। আর একটু সরে সে প্রদীপের কাছে মানুষ দেখতে পেলে। সে নিজেকে শোনালে, তাহলে কারা চোর্টেন জননীর পূজা করছে। হয়তো চার-পাঁচজন মাঝবয়সী অথবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, অনুমান তারা রঙিন পোশাক পরে থাকবে। এ থেকে তার আগ্রহ হল তারিখটাকে জানার। সে ঘড়িতে দেখল, তেরই এপ্রিল। তার মনে পড়ল, তার ক্যালেন্ডারে তারিখটা লালকালিতে ছাপা। তার মন প্রজাপতির মতো পৎ পৎ করে উড়ে এতক্ষণে তারিখটাকে পেয়ে বসতে পারল যেন। চায়ে মন দিল সে। কিন্তু তাকে চমকে উঠতে হল। বেশ জোরে, আর বেশ স্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলে, দুটো বন্দুকের শব্দ হল পর পর। তাসিলার মধ্যে তো বটেই, আর এই প্রশান্ত সকালে, যখন পাঁচটা বেজেছে কি না বেজেছে।

শব্দটা তার বাঁ হাতের দিকেই। সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে গিয়ে সে দেখলে, ফোর্টের ধ্বংসাবশেষের উপরে ধোঁয়ার মতো কিছু বৃত্ত আঁকছে যেন। তাসিলার সীমার মধ্যে এরকম ঘটা স্বাভাবিক নয়। পোচার? একবার এক একলা হরিণ দিনের আলোয় ভড়কে আটকে পড়েছিল বটে। কিংবা কথাটা তার শরীরের মধ্যে শিরশির করে উঠল–স্মাগলার? তারা খুনোখুনিও করে বটে। নিজেদের মধ্যেও। কিংবা জুয়ার হারজিৎ? সে দৌড়ে ঘরে গেল। ঘর থেকে রাইফেল আর গুলির ক্লিপ নিতে যেটুকু সময় লাগে, তার পর দুর্গের দিকে যাওয়ার জন্য সে ছুটতে লাগল।

এই সময়েই আবার বন্দুকের শব্দ হল। ছুটতে ছুটতে সে চিন্তা করে নিলে, তিনটে গুলি হয়েছে। একাধিক লোক ছুটতে থাকতে পারে। ধরতে গেলে হঠাৎ পিছন থেকে যেতে হবে। কিন্তু ফোর্টের টিলায় উঠতে একটাই সিঁড়িপথ, অন্য পথ অনেক ঘুরে তাসিলার বাইরে সেই বিরিক ব্লক থেকে। তা ছাড়া ওরা ওপরে। এদিক দিয়ে অলক্ষ্যে এগনো যায় না। চিৎকার করেও যে থামানো যাবে, দূরত্ব তার চাইতে বেশি। অথচ তিনটি গুলি, সে যারই হোক, যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকবে। সে স্থির করলে ধরার চাইতে, আরো বেশি ক্ষতি করার আগে, ভয় পাইয়ে থামানো দরকার। বোঝানো দরকার, সশস্ত্র কেউ তাদের চ্যালেঞ্জ করছে।

ময়ূর ছুটতে ছুটতে মেলামাঠ পার হতে হতে পর পর শূন্যে দুবার রাইফেল ছুঁড়লে। ছুটতে ছুটতে বেদম হয়ে দুর্গের টিলার ধাপ ধরে উঠছে, তখন আর একবার গুলি ছুঁড়লে। তখন খানিকটা উঠে পড়েছে সে, সে অন্য পক্ষকেও দেখতে পেতো। তারা যেন আত্মগোপন করতে কিংবা পজিশন নিতে ধ্বংসাবশেষে গজানো একটা লতাঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লে।

ওদিকে তখন অন্যরকম ঘটছে। সে রাতেও রেঞ্জ অফিসার প্রভঞ্জন শেষ রাত পর্যন্ত ছবি এঁকে যখন শুতে যাবে, মনে হল তার, রাতই আর নেই। তার মনে পড়ল, অনেকদিন আগে কথায় কথায় পোস্টমাস্টারের সঙ্গে এরকম কথা হয়েছিল, যে যদি কোনোদিন সূর্য ওঠার আগে ঘুম ভাঙেই সে পোস্টমাস্টারকে নিয়ে পাখি শিকারে যাবে। বাদলা বাদলা শেষ রাতে, সে কথা মনে করে, পশমের গ্রেটকোট পরে, যাতে ভিজলেও গায়ে জল না লাগে, পোস্টমাস্টার মুরলীধরকে নিয়ে সে বনমোরগ শিকারে পরিত্যক্ত দুর্গের টিলায় এসেছিল।

বনমোরগ তো বটেই, ফেজ্যান্টও। পোস্টমাস্টারকেই সুযোগ দিতে হবে, নতুবা তাকে এনে লাভ কী? কিন্তু আনাড়ি পোস্টমাস্টার তিনবার গুলি করেও একটা পাখি পায় নি। বরং পাখিগুলো ভয়ে উড়ছে। অগত্যা শিকার নিজে নেয়ার জন্য রেঞ্জার বন্দুক হাতে নিয়েছে, তখনই ময়রের শব্দভেদী গুলির শব্দগুলো শুনতে পেয়েছিল। এলোপাথাড়ি গুলি চলছে, অথচ দিক ঠিক করা যাচ্ছে না, এ অবস্থায় তারা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপনে বাধ্য হল।

সিঁড়ির শেষে ময়ূরের মাথা জাগা মাত্র, রেঞ্জার ধমকে উঠল, কে গুলি করছে আনাড়ির মতো? চাদর জড়ানো ময়ূরকে তখনই চিনতে না পারলেও, ময়ূর যখন রাইফেল তাক করে, সন্তর্পণে টিলার উপরে এগোচ্ছে তখন চিনতে পেরে, রেঞ্জার আরো জোরে ধমকে উঠল, কী হচ্ছে এসব, হে ময়র?

এবার ময়ূরও গলার স্বর বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি, সার?

প্রভঞ্জন উঠে দাঁড়াল। সে বেশ ক্রুদ্ধই তখনও, বললে, কে তোমাকে অমন এলোপাথাড়ি রাইফেল চালাতে শিখিয়েছে?

ময়ূর বললে, আমি তো ভাবলাম পোচার কিংবা স্মাগলার, ভড়কে দিতে শূন্যের দিকে...

প্রভঞ্জন কী বলবে খুঁজে পেল না, অবশেষে বললে, পাখিগুলোকে তাড়ালে তো! এমন হয়েছো তোমরা সব! সে নিজের কোট আর ট্রাউজার্স থেকে ভিজে ভিজে মাটি ঝাড়বার চেষ্টা করলে।

পোস্টমাস্টারও তখন উঠেছে। ধুলো ঝাড়তে গিয়ে বললে, আ, মশায়, হাঁটুটা থেঁতলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। প্রভঞ্জন বললে, তা আমি তখনই বুঝেছি। অত জোরে কেউ শোয় মশায়?

সে আরো কিছু ধমকাতে যাচ্ছিল ময়ূরকে, কিন্তু হো হো করে হেসে উঠল।

ময়ূর বললে, কয়েকটা ফেজ্যান্ট ফিরে বসছে দেখছি, আপনার শটগানে ট্রাই নেবো সার?

থাক, সার। প্রভঞ্জন বললে।

কথায় দড় মুরলীধর বললে, ও আর হবার নয় ময়র। অর্ধেক আমি উড়িয়েছি, অর্ধেক সেন্ট গ্রেগ।

সেন্ট গ্রেগ, সার?

নইলে কে তোমাকে পাঠালে রূপালি ফেজ্যান্টদের বাঁচাতে?

সারারাত ছবি আঁকলাম, তা তো হওয়া উচিত নয়। প্রভঞ্জন বললে, চলুন, এখন কফি-টফি জোটে কিনা দেখা যাক।

তারা টিলার চওড়া ধাপ দিয়ে নামতে লাগল। মাঝামাঝি এসে প্রভঞ্জন আবার হেসে উঠল। ময়ূর বললে পোস্টমাস্টারকে, আপনার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে, সার, হাঁটতে? প্রভঞ্জন বললে, না, না, আমি ওঁর হাঁটা দেখে হাসছি না।

ততক্ষণে ঝকঝকে আলো চারিদিকে। গত রাত্রির বৃষ্টির জল কোথাও কোনো পাতার পল্লবে, কোথাও পাহাড়ের প্রান্তে ঘামের ফোঁটার মতো, কোথাও বা ঢালু জমি পেয়ে ছবিতে আঁকা একটা

ঝর্নার স্কেচ। কিন্তু ভিজে ভাবের চাইতে ঝরঝরে ভাবটা বেশি।

প্রভঞ্জনের বাংলো সব চাইতে কাছে। সে আপত্তি শুনলে না। বললে, এমন দারুণ অভিযানের পর আমরা কফি, বিয়ার, বিয়ারযুক্ত কফি, যে কোনোটা, অথবা সবকটাই দাবি করতে পারি।

বাংলোয় ঢুকতে ঢুকতে সে প্রায় চিৎকার করে বললে, লিন্ডা, দুষ্টু বালকেরা এসে গিয়েছে, কফি ইত্যাদি দিতে থাকো, কেক ইত্যাদি আনতে থাকো, সকলের আগে সব চাইতে আহত আমাদের পোস্টমাস্টারকে দেখো।

রোজা তখন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। সবে ছ-টাই তো। মুখ বার করে রেঞ্জারদের দেখে, সে স্টোভে জল চড়িয়ে দিয়ে সে ঘরে এল। পোস্টমাস্টারের আপত্তি সত্ত্বেও তাকে ডিভানে বসানো হল; ট্রাউজার্সের ডান পা গুটিয়ে দেখা গেল হাঁটুতে খানিকটা সত্যি কেটেছে। রোজা আয়োডিন, তুলো, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি রেঞ্জারের ফার্স্টএইড বকস থেকে জোগাড় করে, ডিভানের পাশে বসে বেশ একটা সুন্দর ব্যান্ডেজ বেঁধে ফেললে।

প্রভঞ্জন হাসিমুখে বললে, বাহ্, বেশ সুন্দর আর বড় হল। তোমার তো অ্যান্টি-টিটেনাস কিছু নেই লিন্ডা, না? কিন্তু মাস্টারমশাই, রোজার পটুত্ব আপনাকে স্বীকার করতেই হবে, যা থেকে প্রমাণ হয়, সেন্ট গ্রেগকেও সে এরকম অনেক ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে থাকবে।

রোজা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমন নিঃশব্দে কফি আনতে চলে গেল। প্রভঞ্জন বললে, এক মিনিট, এ পাউচটায় কিছু নেই দেখছি। সে পাইপের তামাক আনতে ভিতরে গেল।

রেঞ্জারের লিভিংরুম, ড্রয়িংরুম এমন-কি কখনো কখনো আঁকার স্টুডিও মিলিয়ে সেই ঘরখানা আলোকিত, উজ্জ্বল। সকালে বাদলা বাদলা ভাব থাকায় হিটারও জ্বলছে, শার্সিতে শার্সিতে রোদও, ফলে ঘরটা আরামদায়কভাবে উষ্ণ।

পোস্টমাস্টার পায়ের ব্যান্ডেজের স্থিতিস্থাপকতা পরখ করতে উঠে পায়চারি করলে। তার ফলে ঘরের কোণ ঘেঁষে রাখা ইজেলের ছবিটা তার চোখে পড়ল। সেটা চোখ টানার আর একটু কারণ ছিল। সিলিং থেকে নেমে আসা শেড ছাড়া বালবকে কখনো কখনো হাউই মনে হয়। তেমন একটি শক্তিশালী বালব যা দিনের আলোতেও হলুদ না হয়ে প্রায় সাদা ; তাকে নিভাতে ভোলা হয়েছে, সেই আলো ক্যানভাসের কাঁচা রঙে ঝিলমিল করছে। ইজেলের গোড়ায় উত্তাপে গোলাপি হয়ে যাওয়া হিটার। হিটারের কাছে কয়েকটা খালি বিয়ার ক্যান, দুটো ময়লা মাগ।

ছবিটাও সুতরাং দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পোস্টমাস্টারের। একেবারেই নতুন, ডান দিকের নিচের অংশে এখনও রং পড়ে নি। চার ফুট মতো উঁচু ক্যানভাসে তিন ফুট এক পুরুষ ন্যুড। তিন-চতুর্থাংশ সম্মুখীন করা নিরাবরণ পুরুষটির শরীর নিখুঁত, পেশীগুলি পরিস্ফুট, যথাযথ, কিন্তু শীর্ণ। অ্যানাটমিকে ছাপিয়ে রেখার নিজের একটা ছন্দকে ধরা হয়েছে। এক মাথা ঝাঁকড়মাকড় তামা রংয়ের চুল কাঁধ পর্যন্ত ; দাড়ি, নাক আর চৌকো চোয়াল পরিস্ফুট। গায়ের রং বিস্কুটের মতো, পায়ের দিকে কোথাও বা গোলাপি হয়ে ওঠায় ঘা বলে মনে হয়। বাঁ হাত দুলছে, তাতে পাতা-সমেত একটা হলুদ আপেল, ডান হাতটা শরীরের মাঝামাঝি বরং সামনের দিকে তোলা, চলতে চলতে হঠাৎ স্ন্যাপশটে ধরা পড়লে যেমন হয়। বাঁকা হয়ে কিছু দেখাচ্ছে। মুখটাই আসল, পোস্টমাস্টার ছবির সামনে গিয়ে দেখে মনে মনে বললে, দারুণ নর্ডিক চোয়াল আর নাক, কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য চোখের মণি। যেন কাচপোকা লাগিয়ে দিয়েছে। যেন আলো ছড়াচ্ছে, ভিজে আলো। একেবারে কাঁচা রং, গন্ধ উঠছে। সব মিলে যেন বিস্ময় ছবি, কিংবা পাগল।

প্রভঞ্জন এসে পোস্টমাস্টারকে ছবির সামনে দেখে হেসে বললে, ছবি দেখছেন? রোজা বললে, বিস্কুট গরম হলেই কফি আসবে। সে পাইপ ভরতে শুরু করলে।

পোস্টমাস্টার ছবিটার কাছাকাছি সোফায় বসে বললে, কিসের ছবি মশায়?

প্রভঞ্জন বললে, ছবি হবে কিনা সন্দেহ। ব্যাকগ্রাউন্ড যা ভেবেছিলাম তা মানাচ্ছে না। কেমন আইকনের মতো হয়ে যাচ্ছে। মনে করুন একটা পুরুষ ন্যুড। মনে করুন ইভের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে অ্যাডাম।

তাই? পোস্টমাস্টার ছবিটাকে দেখতে লাগল। বললে, না মশায়। তা হলে হাতে ওটা কি আপেল নয়? তত পাকা আর লাল না হতে পারে, কিন্তু তাই বা সে ইভের আগে পাবে কোথায়?

ওটা তো ফিগ লিফ। লজ্জা নিবারণের শিল্পকৌশল। প্রভঞ্জন হাসল।

পোস্টমাস্টার ছাড়লে না, বরং আরো ভালো করে সেই ন্যুডের বাঁ হাতের অবস্থান দেখে বললে, হতে পারে। তাই বলে আপনার এই ন্যুড ভিকটোরীয় শালীনতায় ভুগছে না। চাঁপার কলির মতো করে যে শিশ্ন এঁকেছেন, তাতে লজ্জা নেই ; না, মশায়, এটা কোন বিস্ময়, কোন ক্ষ্যাপা, কোমরে ওটা কি শিকল?

প্রভঞ্জন পাইপ ধরিয়ে নিলে। ছবি আঁকতে যে কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ সে পেয়ে থাকবে, তাই ফিরে এল তার মনে। বললে, তা একটু পাগলাটে তো হতেই হয়, আমার তো মনে হয়, সব ট্র্যাঙ্কুলাইজারেরই দাম দিই আমরা।

তার মানে? পুরুষ নেশায় বিবশ বলছেন?

বলুন, দাম দিতে হয় না, যদি তেমন শান্তি চাই?

পোস্টমাস্টার হেসে বললে, মন্দ বলেন নি, মন্দ বলেন নি, পাইপের তামাক, ঘুমের বড়ি, এল এস ডি, হাশিশ সবেরেই দাম দিয়ে হয়, কিন্তু কোমরের ওই ডোর দেখে আমার অন্য কথা মনে হচ্ছে। পাগলাগারদ পালানো যদি না হয়, তবে, দাঁড়ান, হ্যাঁ সেই যে লোহার শিকলদুটি সোনা হয়ে ওঠে ফুটি—না কি সেই রকমই কিছু? শিকলটা স্পষ্টই তো।

প্রভঞ্জন হো হো করে হেসে উঠল। বললে, রবিবাবুর সেই পরশপাথরের ক্ষ্যাপা? ও, মশায়, আপনি তো ভয় ধরিয়ে দিলেন দেখছি, আর তুলি ছোঁয়াব কি? আমি তো ভেবেছিলাম, নেশাভাঙ করে যারা নিজের কাছ থেকে পালাতে চায়, এমন হিপি-টিপি, অথবা বড়জোর প্রিমিটিবে ফিরে গেছে, সেজন্য কাঁচা অখাদ্য আপেল সংগ্রহ করে সুখী, এমন কিছু...আসলে কোমরের ওটা কিন্তু শিকল নয়, বিনুনি করে পাকানো কর্কশ পশমের গার্ডল, যা থেকে লইন ক্লথ ঝোলানো যায়।

কিন্তু তখনই রোজা ট্রেতে করে কফি ও বিস্কুট নিয়ে এল।

প্রভঞ্জন বললে, আসুন, মাস্টারমশায় আসুন। বোঝো, রোজা, তোমার এই ছবিকে মাস্টারমশায়ের কী বলছেন! না কি পরশপাথর খোঁজা এক ক্ষ্যাপা।

রোজা পোস্টমাস্টার এবং ময়ূরের সামনের কাপগুলোকে সাজিয়ে দিয়ে দাঁড়াল।

প্রভঞ্জন গরম কফিতে চুমুক দিয়ে আরামের শব্দ করে বললে, মে হিজ ট্রাইব ইনক্রিজ! কিন্তু, রোজা, সারারাত যে ভক্তিভরে তাঁর ছবি আঁকলাম, ফলে তিনি, কিন্তু, দয়া করলেন ফেজ্যান্ট আর বনমোরগদের। একটা শিকার যদি পেয়ে থাকি! ধন্য তোমার সেন্ট গ্রেগ! পোস্টমাস্টারই সাক্ষী, তিনি নাকি মেয়রকে পাঠিয়েছেন ফেজ্যান্টদের বাঁচাতে।

রোজা হেসে বললে, হুন ছ, হোবে। আজু গুডফ্রাইডে ছ। পরখিনুস, একছিনমা ব্রেকফাস্ট রেডি হুন ছ। রোজা অন্দরের দিকে যেতে যেতেও, ধরা না পড়ে যতটুকু পারা যায়, তেমন করে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

পোস্টমাস্টার বলতে গেল, আবার ব্রেকফাস্ট কেন, কিন্তু গল্পের গন্ধ পেলে সে, বললে, দাঁড়ান, মশায়, দাঁড়ান। কী যেন বলছেন, আপনি? এটা কি তা হলে সেই গ্রেগরি ক্রুস্টারের ছবি? যাক, আজ ছুটি আছে।

তা না হলে আর বলছি কী? ছেলেখেলাও বলতে পারেন। যাকে কখনো দেখি নি, অন্যের

মুখে তার বর্ণনা শুনে ছবি আঁকা।-ভরসা আছে, ফটো-টটো না থাকায় রোজা নিজেও বলতে পারবে না, ডিটেইলসে কতটা গরমিল।

পোস্টমাস্টার বললে, আশ্চর্য, গ্রেগরী ক্রুস্টার, সেই যে. যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। পোস্টমাস্টার কফি কাপ হাতেই ইজেলের সামনে উঠে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবিটাকে দেখলে। প্রভঞ্জন আবার হাসল, বললে, সেও এক পাগলামি মশায়। রাত বারোটায় রোজা এসে বসলে হিটারের পাশে। বললে, ঘুমাতে পারছে না। ইজেলের গোড়ায় বসে, তার পর, সারা রাত বিয়ার গরম করলে আর খেলে। আমি গ্রেগরীর মুখে চারকোল লাগাই আর পুঁছি, রোজার কথামতো। ইঞ্চি ইঞ্চি করে তবে এক মুখের আদরা এল।

কফি শেষ করে প্রভঞ্জন নতুন করে পাইপ ভরতে শুরু করল। রাতভোর ছবি আঁকা, অবশ্য, এই প্রথম নয়।

পোস্টমাস্টার বললে, ও, সেজন্যই আজ রোজাকে এমন অসুস্থ দেখাচ্ছে।

তা হতে পারে। তো, সেই সেন্টের পায়ে গুঁতো-গাতা লেগে তো ঘা-টাও ছিল। রিয়ালিস্টিক করার জন্য একটু লাল ছুঁইয়েছি পায়ে অমনি রোজার চোখে জল এসে গেল।

পোস্টমাস্টারও সিগারেট ধরাল। সে হাসতে গিয়ে পারলে না। বরং কৌতূহলে উঠে বসল, জিজ্ঞাসা করলে, মিস্টার দত্ত, মিসেস রোজা কি তাহলে ক্রিশ্চান? গ্রেগের শিষ্যা-টিষ্যা?

প্রভঞ্জন বললে, না ক্রিশ্চান নয়।

শিষ্যা না হোক পরিচয় ছিল?

তা তো নিশ্চয়ই। প্রভঞ্জন বললে, একাত্তরের যুদ্ধে দ্বিতীয় স্বামীকে হারিয়ে রোজা যখন তাসিলায় ফিরেছিল. তখন গ্রেগের স্কুলেই শিশুদের পড়ানোর চাকরি পেয়েছিল। গ্রেগ এখন থেকে চলে যাওয়ার আগে অন্তত বছর পাঁচেক পরিচয় হওয়ার সুযোগ ছিল তাদের।

পোস্টমাস্টার গল্পের মেজাজে এল। সে বললে, আচ্ছা মিস্টার দত্ত, গ্রেগ সম্বন্ধে ঠিকঠাক খবর কে দিতে পারে মনে করেন? মানে গল্প নয়।

অনেকেই পারে, তবে রোজা কিছু বিশেষভাবে পারে। ওর কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা অন্য কারো আছে বলে মনে হয় না। প্রভঞ্জন বললে, যেমন সেই এক রাত। তখন রাত আটটা-নটা কম করেও, অন্ধকার, শীতকাল, বৃষ্টি হচ্ছে যা বরফশীতল। রোজা তার বাড়িতে রাতের খাবার করছিল উনুনে। কী একটা আনতে কয়েক মিনিটের জন্য শোবার ঘরে গিয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে, কিংবা রান্নার দিকেই মন ছিল তার। উনুনের কাছে এসে দু এক মিনিট কাটার পর হঠাৎ সে শুনতে পেয়েছিল : ও নেভার এনডিং সুইটনেস, ও আনডাইং ফ্লো...। এমন সব কিছু। রোজা চমকে উঠে দেখেছিল, উনুন আর দেয়ালের মধ্যে যে অন্ধকার সেটা মানুষের আকৃতি নিচ্ছে। আর সেই বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজি। রোজা তখন বছর পঁয়ত্রিশ, একা এক বিধবা সেই তার বাড়িতে। তার ছেলে তখন হাতিঘিষায়। সে চোর পালালে বুদ্ধিমান হয়ে যে নিচু চৌকোণ জানালা দিয়ে মানুষটি ঢুকে থাকবে, তা বন্ধ করে দিয়েছিল। কে কে বলে ভয়ে চেঁচামেচি করেছিল। কিন্তু সেই শীতের বৃষ্টির অন্ধকারে রাতে পথে কেউ থাকলে তো শুনবে। বাড়িটাও একান্তে।

পোস্টমাস্টার বললে, তার পর?

ময়ূরও গল্পটা শুনছিল। এই জায়গায় তার মনে হল, সে কি অন্যায় করেছে না? সে কি গোপন করে ভালো করছে? রেঞ্জার কি ইতিমধ্যে জেনেছে, রোজার সেই বাড়িতে কাল রাতে অদ্ভুতভাবে আগুন লেগে আবার অদ্ভুতভাবেই নিবেছে। তার কী রকম একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। এই দুঃখের খবর দিলে কি রেঞ্জার আর পোস্টমাস্টারের এই গল্প করার সুখ নষ্ট হয়ে যায়?

রেঞ্জার বললে, আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন, সে গ্রেগ। আমার কাছেও গল্পটা টাটকা। কালই রোজা

বলছিল প্রথম। আসল ব্যাপার হচ্ছে গ্রেগের সেই কথাগুলো, যা রোজা যেন লিখে মুখস্থ করে রেখেছে কবিতা বা মন্ত্রের মতো, অন্তত কাল রাত্রিতে নির্ভুল ইংরেজি আর উচ্চারণে উদ্ধার করছিল। আর গ্রেগের তখনকার চেহারা? কুপিটা তুলে ধরে রোজা দেখেছিল, একেবারে উলঙ্গ, চুলদাড়ি বেয়ে তো বটেই, গা বেয়েও জল গড়াচ্ছে, রোগা, বিশেষ করে পেট যেন পিঠের সাথে, চোখের নিচে ঘুম না হওয়ার কালি, অন্ধকারে পড়ে গিয়ে হাত-পায়ের নখ ফেটে রক্ত। গ্রেগের আগুন পোহানো হয়ে গিয়েছিল। সে সেই ক্ষয়হীন মাধুর্যের এবং অন্তহীন দয়ার প্রবাহের স্বাদ নিয়ে সেই অন্ধকার এবং ববফ-শীতল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যেতে তৈরি হল। তখন যা ঘটল, তা রোজা না হলে ঘটতো না। জানালা তো আগেই বোকামিতে বন্ধ করেছিল, এবার চালাকি করে, দরজার দিকে গ্রেগ অগ্রসর হতেই, ভিতরের শিকল তুলে তালা দিয়ে দিলে। গামছা এনে গা মুছিয়ে দিলে, টিনচার আইডিন ছিল, তা দিয়ে কাটাগুলোকে পুড়িয়ে ন্যাকড়া দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলে।

পোস্টমাস্টার বলতে পারলে, আশ্চর্য তো, কিছুক্ষণ আগে যা ভয়ের ছিল।

প্রভঞ্জন পাইপে টান দিয়ে, মুখ থেকে তা সরিয়ে, হেসে বললে, একটু ভেবে দেখলে মনস্তত্ত্বের দিকে দিয়ে তেমন অস্বাভাবিক বোধ হয় না। অর্থাৎ পুরুষে অভ্যস্ত কিন্তু তখন স্বামীবিচ্যুতা রোজার যৌনত্রাস ছিল না। বরং হয়তো নিজেরও অজ্ঞাতসারে তা ছিল নগ্ন পুরুষের সান্নিধ্য লাভ। বিজ্ঞান এরকমও বলতে পারে। সে নিজের একমাত্র পোশাকী কালো ভেলভেটের বোকু এনে তাকে পরিয়ে দিলে। রোজার বাড়িটা খুবই ছোট। বসার জায়গা বলতে, শোবার ঘরের বিছানায় সেই বোকু পরা গ্রেগকে বসাল। মস্ত এক বাটি, কাপ নয়, চা করে এনে খাওয়ালে। গ্রেগকে বলে গেল, বসুন, আমি খাবার নিয়ে আসি। রোজার মতে এই চা খাওয়ানোটা ভুল হল। সে বলেছে, ভাত ডাল তৈরি ছিল, দু তিনটে চাপাটি আর কয়েকটা ডিম ভাজতে পনের মিনিটই লাগুক, সে ঘরে গিয়ে দেখেছিল, গ্রেগ বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

ময়ুরের আবার রোজার আগুন লাগা বাড়ির কথা মনে হচ্ছিল। গল্পটায় বারবারই বাড়িটা এসেছে। পোস্টমাস্টার বললে, ভারি অদ্ভুত গল্প তো।

প্রভঞ্জন বললে, রোজা একবার ভাবলে ঘুম ভাঙিয়ে খেতে দেবে। কিন্তু নিবন্ত উনুনের পাশে বসে ভেবে নিতে গিয়ে তার ভয় ভয় করল। জাগানো কি ঠিক হবে, পুরুষ তো বটে? কিন্তু শীতের লম্বা রাত। কাঁহাতক বসে থাকা যায় নিবন্ত উনুনের পাশে? অবশেষে আলোয়ান জাতীয় কিছু একটা গায়ে দিয়ে সন্তর্পণে বিছানার এক পাশে পা তুলে বসেছিল। পা দুখানা শীতে কটকট করছে। লেপটা তো গ্রেগের গায়ে। কিন্তু শীত বাড়তে বাড়তে তাকে বাধ্য করেছিল সেই লেপের একপ্রান্তকে প্রথমে নিজের ঠান্ডায় জমা পা-দুখানার উপরে, পরে ক্রমশ আধখানা তার নিজের গায়ের উপরে ছড়িয়ে দিতে।

এসব কি রোজা নিজে বলেছে আপনাকে? পোস্টমাস্টার জিজ্ঞাসা করলে।

গল্প না করলে সারা রাত জেগে ছবি আঁকা চলে না। রোজার গল্প আর বিয়ার একসঙ্গে চলেছিল। তা ছাড়া তার এই পয়েন্ট ছিল, সেই হিম-শরীর, যা তার বুকের উত্তাপে ক্রমশ উষ্ণ হয়েছিল জীবনের মতো তা কিন্তু চামড়ার তলায় ঠান্ডা-দুধের মতো ঠান্ডা।

তারপর?

সকালে ঘুম ভেঙে রোজার ভয় হয়েছিল, সে কি নিথর ঘুম, নাকি মৃত্যু? সে আরেক মস্ত বাটি চা করে এনে ডাকলে গ্রেগকে। গ্রেগ উঠে বসে, গ্রেস পড়ে সেই সুস্বাদ উষ্ণ পানীয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলে। তখন হিন্দু রোজা, এখনও বোধ হয় সে তাই, গ্রেগের পায়ের উপরে মাথা রেখেছিল। পা দুটোকে জড়িয়ে ধরেছিল নিজের বুকের মধ্যে।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। ময়ূর ঘড়ি দেখলে। প্রভঞ্জন হেসে বললে, ঘড়ি দেখছো কি মেয়র,

শুনলে না আজ গুড ফ্রাইডে? ও-সবে রোজার ভুল হয় না, নাকি তোমার ঘড়িতে এসব তিথিও থাকে? ব্রেকফাস্ট এল বলে। কাচের গ্লাসের শব্দ পাচ্ছো? পোস্টমাস্টার বললে, তার পর রোজার আর দেখা হয় নি গ্রেগের সঙ্গে?

হয়েছে বৈকি। আরো দুএকবার ধরে টিনচার আইডিন লাগিয়েছে, আর একবার অন্তত এক কাপ চা খাইয়েছিল নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে।

গল্পটা থেমে গেল। মিনিটখানেক পরে পোস্টমাস্টার জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কাকে ঠাট্টা করলেন মনস্তত্ব, না রোজাকে? কিন্তু মুরলীধর চিন্তা করলে। একটু তন্ময়ই হল। সে বললে, আচ্ছা মশায়, এমন তো হতে পারে গ্রেগের চেষ্টা ছিল আমাদের কনজিউমার সভ্যতার নিচে এবং দূরে নিজেকে, মুখোশহীন নিজেকে, খুঁজে পাওয়া? সেন্ট-ফেন্ট কিছু নয়। সেই নিজেকে, বসনহীন নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অবস্থায় যদি কেউ পৌঁছায় আমাদের চোখে সে কি পাগল?

প্রভঞ্জন উত্তর দিতে পারলে না। তার আগে বড় ট্রেতে তিনজনের ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে নিয়ে রোজা এসে গেল। একটা টিপয় টেনে আনল ময়ূর। তার উপরে ট্রে রেখে মেঝের গালিচায় হাঁটু পেতে বসে রোজা তিনজনের প্লেট গ্লাস সাজালে। অল্প সময়ে সে মন্দ আয়োজন করে নি। অমলেট তখনও ধোঁয়াচ্ছে। টোস্টের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে মাখন গলায়।

কিন্তু পোস্টমাস্টারই প্রথম লক্ষ্য করলে, রোজার যে হাতে প্লেটগুলো সাজাচ্ছে তা যেন হলুদ দেখাচ্ছে। তার মনে হল সে জিজ্ঞাসা করবে, রোজা অসুস্থ কিনা। ততক্ষণে প্রভঞ্জনও লক্ষ্য করলে রোজার মাথা-মুখ জড়িয়ে একটা আলোয়ান, রোজা যেন একবার শীতে শিউরেও উঠল। সে বলল, এই দেখো, রোজা, অত রাত জাগার ফল। হয়তো বিয়ারের অ্যালার্জিও হতে পারে। জ্বর জ্বর লাগছে না তো? অ্যানালজেসিক খাবে কিছু?

পোস্টমাস্টারও বললে, গোড়া থেকেই আজ চোখ মুখ বসা। তার মধ্যে এত সব।

রোজা হাসল, বললে, দু একটা বড়ি খেলেই শীত যাবে। কিন্তু তার হাসিটা বিবর্ণ দেখাল।

ময়ূর বললে, কফি মো বনাই দিন ছু। তপাই আরাম লিনুস।

রোজা মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

গৃহকর্তার ভূমিকায় প্রভঞ্জন বললে, কিন্তু তাই বলে ব্রেকফাস্ট সদ্ব্যবহার না করে ঠান্ডা হতে দিলে রোজার কষ্টের সার্থকতা থাকে না। আমার মনে হয়, রোজা, একটা অ্যানালজেসিক আর কিছু হুইস্কি তুমি ব্যবহার করো। তুমি কি রাতে কিছু খেয়েছিলে? কিছু খেয়েও নাওগে, আসুন, আসুন আমরা শুরু করি।

ব্রেকফাস্টটা খারাপ হল না। প্রভঞ্জন এই হঠাৎ এসে পড়া সংকোচ কাটাতে সকালের শিকারের গল্পে ফিরল। হেসে বললে, মেয়র সে অবস্থায় তুমি ভালই করেছিলে, ভেবে দেখলাম। সেই অবস্থায় কোনো পোচারকে ধরতে হলে, ফোর্টের টিলাটাকে ঘিরতে হতো, যা একা পারা সম্ভব নয়। তার চাইতে ফাঁকা গুলিতে তাদের পিলে চমকে দেয়া মন্দ নয়। বুঝতে পারছেন মাস্টারমশায়, মেয়রের পারমিশন না নিয়ে, তাসিলায় ফেজ্যান্টে হোক কিংবা বনমোরগে লোভ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

পোস্টমাস্টারও কথায় কম যায় না। বললে, আর কিছু না হোক, ভোরের অন্ধকারে তাসিলা তো দেখা হল। আর সেই কাঁটাগাছে হলুদ আর পিংক ফুল যার ডালে ঝকঝকে রূপোলি ফেজ্যান্ট ছিল।

রোজা আরাম নিতে যায় নি। ধোঁয়ানো কফিপট ইত্যাদি রেখে গেল।

প্রভঞ্জন বললে, মেয়র, তুমি আমাদের দশ বছরের ছোট, সুতরাং কফি বানাও। আচ্ছা মাস্টারমশায়, আপনি ভেবে দেখুন, বেলা আট বাজতে চলেছে। আজ রোজাকে ধন্যবাদ মনে করিয়ে

দেয়ার জন্য, গুড ফ্রাইডের বন্ধ. সুতরাং পরে একটু বিয়ার হোক। হ্যাঁ, মশায় হ্যাঁ, রিয়াল বিয়ার গার্ডেনের বিয়ার। মেয়র বরং সুচেতনাকে খবর দেবে, আপনি হারিয়ে যান নি।

কিন্তু সেদিন ব্রেকফাস্টের পরে রেঞ্জারের বিয়ার নিয়ে বসা হল না। সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে পোস্টমাস্টার। সেই সুযোগে মাঠে ফুটবল নামানোর কথা আলোচনা হল আবার। সে আলোচনা-শেষে প্রভঞ্জন তার বাংলোর বারান্দায় এক খণ্ড আরামদায়ক রোদে দাঁড়িয়ে পোস্টমাস্টারের পা নিয়ে মৃদু সস্নেহ রসিকতা করে তখনকার মতো আড্ডা ভাঙলে।

৩

রেঞ্জারের বাংলো থেকে কিছু দূরে এসে মেলার মাঠ দিয়ে চলতে চলতে ববিজানের ডার্ট অ্যান্ড স্কিল গেমের দোকান পার হল। পোস্টমাস্টার বললে, মেয়র নাকি জুয়ার আড্ডায় ববিজান আর তার পার্টনারকে খুব ঠুকেছে? ময়ূর ভাবলে, গল্পটা কেমন ছড়ায়! রোজার ব্লু মুন রেস্তোরাঁর সামনে তার ছেলে এবং কারিগরকে গত রাত্রির বৃষ্টিতে যে ময়লা তা দূর করতে দেখা গেল। যেন সেই অনুষঙ্গে ময়ূরের মনে এল, সে বললে, জানেন, কাল রাতে বৃষ্টির ঠিক আগে আগে তাসিলায় একটা আগুন লেগেছিল। যেমন লেগেছিল তেমন নিবেও গিয়েছিল। মিসেস রোজার বাড়িতেই, একটা দেয়ালের খানিকটা পোড়ার পর আগুনটা নিবে গিয়েছিল।

পোস্টমাস্টার সংবাদটায় একেবারে অবাক হল। সে বললে, কই, তুমি তো ওখানে বললে না।

ময়ূর বললে, কয়েকবার মনে হয়েছিল বলি। পরে মনে হল মিসেস রোজাকে এমনি অসুস্থ দেখাচ্ছে। আগুন যেটুকু ক্ষতি করার করে নিবেও গেছে, পরে বললেই হবে রেঞ্জারকে। তা ছাড়া হয়তো তাঁরা খবরটা পেয়েছেন। সে জন্যই মিসেস রোজাকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল।

পোস্টমাস্টার বললে, বলাই দরকার, মেয়র, এখানে বেশির ভাগই কাঠের বাড়ি। আগুন নিবানোর জল পাওয়াও কঠিন। এ ব্যাপারে তোমার রেঞ্জারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

ব্রিজের কাছে এসে পোস্টমাস্টার তার অফিসের দিকের পথ ধরলে ময়ূর ব্রিজ পার হয়ে তার সেই বাংলোর দিকে গেল।

বাড়িতে আগুন লাগা সব সময়েই একটা ভয়ানক সংবাদ, বিশেষ এই পাহাড়ে যেখানে সব বাড়িই প্রায় কাঠের, উপরন্তু যেখানে কম জায়গাতেই জলের ব্যবস্থা। বরং অধিকাংশ জায়গাতেই দূরের ঝর্না থেকে জল আনতে হয়। কেন আগুন লাগে ফাঁকা বাড়িতে? দুর্দৈব নাও হতে পারে। রোজা তো রেঞ্জারের বাড়িতে আর তার ছেলে ছিল দোকানে। মুরলীধরের চিন্তা আগুনটার চার দিকেই ঘুরপাক খেতে থাকল। আশ্চর্য লোক এই মেয়র! এত বড় সংবাদটা সে কেমন চেপে রইল। আবার ওদিকে দেখো, যেখানে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা সেখানেই সে উপস্থিত। আবার তার সন্দেহ হল, যা দেখো, তা নয়। ওর সেই অ্যাকিসিডেন্টের সময়ে দেখেছো, এখানে দেখো, কী রকম ঠোঁটচাপা। মনে হয় না, এসব ব্যাপারে ট্রেনিং পাওয়া? কিংবা এই কি তার ইনভেস্টিগেশন শুরু এই আগুনের ব্যাপারে? এতক্ষণ রেঞ্জার আর রোজার রিঅ্যাকশন দেখে এসে, এখন তার রিঅ্যাকশন দেখলে? আশ্চর্য, আশ্চর্য! হতে পারে পাপ আছে, সেই পিডবলুডি এঞ্জিনিয়ার যেমন বলে, পাপ ছাড়া কেউ তাসিলায় আসে না, তাই বলে সে কি এত পাপী, যে মেয়র তাকে এই ভাবে পরখ করে?

কয়েক পা গিয়ে তার মনে হল, দূর কী ভাবছে এই সকালে! আসল ব্যাপারটা আগুন লাগা আর নিবে যাওয়া। আচ্ছা! পোস্টমাস্টার যেন ধাঁধার উত্তর পেলে। তা হলে এই দুর্ঘটনার কথা

কী রোজা রাতেই জানতে পেরেছিল্ল, আর তারই ফলে সে অসুস্থ? তাই বা কি করে হয়? রেঞ্জার বলছেন, সারা রাত রোজা ইজেলের পায়ার কাছে বসে বিয়ার খেয়েছে। রাত থাকতে উঠে রেঞ্জার শিকার করতে বেরিয়ে গেলে কারো মুখে খবর পেয়েছে? ওদিকে দেখো, রোজার ছেলে যে ভাবে রেস্তোরাঁয় কাজ করছে, মনেও হয় না এতবড় সংবাদটা সে জেনেছে।

কিন্তু কী করে লাগল আগুনটা? রোজার বাড়িতে সে নিজে ছিল না, প্রমাণ রেঞ্জারের পাশে সারা রাত ছিল সে। তার ছেলেও তো মেলার কয়েকদিন, অবশ্যই, রেস্তোরাঁয় থাকে পাহারা দিতে। না, একে গৃহস্থালির আগুন বলা যায় না।

অদ্ভুত তো! একি শত্রুতার ফল? রোজার মতো একজনের কে শত্রু? মুরলীধরের হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা, মিত্রবাহাদুর? হেডক্লার্ক? তাকে রেস্তোরাঁয় লোকজনের সামনে রোজা জব্দ করেছিল বটে। মনে হতে পারে, মুখে সেই মদ ছুঁড়ে দেয়া ছেলেদের রঙ দেয়ার মতো উচ্ছ্বাস, কিন্তু এক্ষেত্রে তা বোধ হয় নয়। মিত্রবাহাদুরের সেই মদবিবশ চেহারাটা মনে এল তার। অদ্ভুত সেই প্রস্তাবের কথা। মিত্র হয়তো মদের ঘোরে ভাবছিল, সে খুব চালাকি করে ইশারায় কথা বলছে, যা রোজা ছাড়া অন্যে বুঝবে না। অথচ সেই বিশ হাজার টাকার প্রস্তাব, তা যদি উৎসবের রসিকতার বেশি কিছু হয়, নিতান্তই কুৎসিত। দেখো কাণ্ড, সে তো ভাবতে আরম্ভ করেছিল, দোলের সময় যেমন আদিরসাত্মক রসিকতা কোথাও কোথাও হয়, মিত্রবাহাদুরের সেই প্রস্তাবও হয়তো তা ছিল। সে তো ভাবতে চেষ্টা করেছিল, মিত্রবাহাদুরের সেই রসিকতায় এই স্বীকৃতি ছিল যে কারো কারো চোখে রোজা চল্লিশেও অসামান্য রূপবতী। এখন? কিন্তু মিত্রবাহাদুরের নিজের বাড়িও তাসিলায়, আর তা কাঠের।

তা হলে একি সেই গিয়ালপো নামে লোকটার কাজ? মিত্রবাহাদুর গিয়ালপোর হয়েই প্রস্তাব দিচ্ছিল বটে। বোঝাই যাচ্ছে—একটাই উদ্দেশ্য, ভয় দেখানো। যেন দেখানো, সর্বনাশ করতে পারি, এখনও সময় আছে। ছেলেমানুষি শয়তানি, নাকি আদিমতা? নিজের এই চিন্তায় পোস্টমাস্টার অবাক হয়ে গেল। আর এসব জানে বলেই কি রোজার তেমন চেহারা হয়েছে এক রাতে? না, ওটা রাত জেগে বিয়ার খাওয়ার ফল হতে পারে না। বিয়ার কি আর সে একা খেয়েছে? তার পাশে সারারাত যে ছবি এঁকেছে সেই রেঞ্জারকে তো বরং স্বাস্থ্যপূর্ণ, উদ্যমী এবং টাটকা দেখাচ্ছিল। বিয়ার নতুন নয় তাদের। খুবই সম্ভব এমন ছবি আঁকার রাত তারা আগেও কাটিয়েছে।

মুরলীধরের কৌতূহলপ্রবণ গবেষণাদক্ষ মন তন্ময় হয়ে গেল। রোজার মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সাধারণত যা রক্তাভ, টোলযুক্ত, ঈষৎ মেদযুক্ত, তা বিবর্ণ, বরং হলুদ ছিল, রেখা চোখে পড়ছিল, চোখের নিচে কালি, যেন ঝড়ে পড়েছিল। এমনকি হাতখানাও যেন হলুদ। না, তা বিয়ারের ফল, এমনকি উদ্দাম লালসার ফলেও হতে পারে না। শিউরে উঠেছিল রোজা ব্রেকফাস্ট সাজাতে, সে কি শীতে নয়, ভয়ে? সেখানে তিনজন পুরুষ তার এক হাতের মধ্যে এবং যারা, (সে কি আর জানে না?) নিশ্চয়ই তার পক্ষের।

হঠাৎ যেন সমস্যার তলদেশ দেখে স্তম্ভিত হল পোস্টমাস্টার। তা হলে কি বিয়ারের রাতটা গ্রেগের ছবির ইজেলের গোড়ায় একটা দারুণ যুদ্ধে কেটেছে? বিশ হাজারের প্রস্তাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে রোজার মন?

ময়ূর ব্রিজ পার হয়ে আলোয় আর ফুলে উজ্জ্বল বাংলোর টিলায় পা দিলে। জানালাগুলোর উপরে অজস্র আলো পড়ায় সেগুলো গলিত রুপোর মতো ঝকমক করছে। তার চোখের সামনে আলোর বৃত্তের মধ্যেই যেন নরবু তার আইরিস গাছ একটার যত্ন করছে। এই কয়েকদিনে এমন রঙের সমারোহ সৃষ্টি করতে পারে এই টিলা! আর চারিদিকেই রঙ! বিশেষ করে কাল রাতেব বৃষ্টি যেন যেখানে যতটুকু কালি-ময়লা-ধুলো ছিল সব ধুয়ে নিয়ে বাতাসটাকেও এমন মধুর করেছে যে শ্বাসযন্ত্র উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

ময়ূর অগ্রসর হল, সে ভাবলে, নরবুকে জানিয়ে দেবে আজ গুড ফ্রাইডের ছুটি।

কিন্তু হঠাৎ সে একটা পাথরের বাঁধে ধরা পড়া ঝর্নাকে দেখতে পেলে যেন। যেন কয়েকটা কালো কালো ছায়া নড়ে উঠল। সুন্দর স্বচ্ছ কাঁপা কাঁপা জলের ঝর্না। যার উপরে ঝুলন্ত ফুলেল লতার ছায়া এমন যে লতার হলুদ পাতার সবুজ, ফুলের সাদা রং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট মৌরলা মাছ খেলা করছে রুপোর সরু সরু কাঠির মতো, নিচে শ্যাওলাধরা পাথর, শ্যাওলাধরা লম্বা গোলালো গাছের ডাল। মাছগুলো জলের উপরে খেলা করতে করতে নিচের দিকে নামতে শুরু করলে, আর ঠিক তখনই সেই গাঢ় বাদামি ডাল কয়েকটি নড়ে উঠে হাঁ করে গিলতে লাগল সেই ছোট মাছগুলোকে। তার পর ময়ূর বুঝতে পারলে, ডালগুলো সারাক্ষণই ধীরে ধীরে নড়ছিল।

পাহাড়ী ট্রাউটগুলোর কাণ্ডকারখানায় গা ছমছম করে। দম বন্ধ হয়ে আসে না? সে থমকে দাঁড়াল। ও, দূর! সে তো নিমতিঝোরার কাছে। এখানে কোথায়?

অবাক হয়ে ময়ূর ভাবলে, দেখো কান্ড, ওই তো নরবু তার আইরিস গাছটার গোড়ায় মাটি উঁচু করে দিচ্ছে।

দুএক মুহূর্ত নিজের মনের বোকামিতে অবাক হয়ে থেকে, সে সম্বিত পেয়ে বেশ জোর করে মনকে শুনিয়ে দিলে, ওটা হঠাৎ মনে পড়ল বটে, তাই বলে কি আর এপ্রিলের এই উৎসবের নিচে নিচে সত্যি রাক্ষুসে পাহাড়ি ট্রাউট নিঃশব্দে চলে বেড়াচ্ছে?

সে তাড়াতাড়ি বললে, হো নরবু, রেঞ্জারকো ঘরমা মইলে রামরোরি ব্রেকফাস্ট গরেক ছু। আজু গুড ফ্রাইডে ছ নি। আজ গুড ফ্রাইডে তাই রেঞ্জারের বাড়িতে ভালো ব্রেকফাস্ট করেছি, নরবুকে এই বলে ময়ূর রাইফেল আর চাদর রাখতে শোবার ঘরে চলে গেল। রাইফেল আলমারিতে আটকে, চাদর আলনায় রেখে ময়ূর ভাবলে, দেখো, ক্যালেন্ডারের তারিখটা কাল রাতেও দেখেছিল সে, কিন্তু গুড ফ্রাইডে তা লক্ষ করে নি। লাল রঙের অঙ্কটার নিচে গুড ফ্রাইডে তো বেশ স্পষ্টই লেখা। সে হাসল। কী কাণ্ড! সে বেশ খুশি মুখে ক্যালেন্ডার আর তার ছবিটাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে। এখন? আসলে, ময়ূর দীর্ঘশ্বাস ফেললে, সেই ভয়ঙ্কর রাতের সেই কালো ঝর্নার কথা ভোলা যায় নি। হয়তো বারসই-এর সেই পুকুরটার কথাও মনে এসেছিল, যেখানে প্রতি পয়েন্টে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা, সে জন্য সেই পয়েন্টগুলো থেকে সরে সরে যেতে হয়। সে জন্য নিমতিঝোরার ট্রাউটঝোরার কথাও মনে এসেছে।

এখন সে অনায়াসে কোথায় রোদটা মিষ্টি তা খুঁজে নিয়ে বসে ছুটির বেলা কাটাতে পারে। তার মনের একাংশ তাকে চুপিচুপি বললে, বসন্ত, বসন্তকালই। আর মেলাও। রোজার অসুখ করেছে কিনা, কেউ একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করেছে কিনা, তার বাড়িতে আগুন লাগা, এসব ভাবতে তলায় নামা কেন? সে কে ভাবার? আগুন লাগার কথা বলছো? রেঞ্জার বলামাত্র যে কোন কন্ট্রাকটর আগের চাইতে বরং ভালো করে, দেয়ালটাকে নতুন করে দেবে।

ময়ূর বাংলোর পিছন দিকে চলে গেল। সেখানে বড় বড় বিদেশি গাছগুলোর কাছে গার্ডেন

বেঞ্চটার উপরে রোদ আছে। সে বেঞ্চটায় বসলে। ডানদিকে চাইতেই শব্দটা তার কানে গেল। সে এর আগেও লক্ষ্য করেছে, ওই বেঞ্চ থেকে কালিঝোরার দিকে চোখ রাখলেই তার মৃদু কল্লোলটা শোনা যায়। রিনিই প্রথম এই বেঞ্চে বসে ব্যাপারটা তাকে দেখিয়েছিল। দেখো, কতটুকু বা বৃষ্টি কিন্তু তাতেই যেন নাচ আর গান বেড়েছে। তার মুখে ঝর্নার আনন্দের কিছু যেন ফুটবে এরকম মনে হল।

খুশিমুখে সে এদিক ওদিক দেখতে গিয়ে দেখলে হটহাউস থেকে নরবু যে কয়েকটা টব বার করেছে, তার একটায় লাল লাল ফুল ফুটেছে। কেমন যেন অপরিচিত আকার সেই ফুলগুলোর, যেন অন্য কিছু, ফুল নয়। কিন্তু অনেক হয়ে গাছটাকেই জ্বালিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ যেন দেখতে পেলে, পাশাপাশি কয়েকটা ছোট গাছে বেশ রোদ পড়েছে। যার ফলে কচি পাতাগুলো প্রায় হলুদ দেখাচ্ছে। একটা প্রজাপতি ডানার কসরতে একেবারে পাতার ডগায় বসছে। একটা পাতার ডগা থেকে অন্য একটা গাছের ডগায় গিয়ে বসছে তেমন করে, মৌমাছি হলে বলা যেতো, পরাগ থাকলে বলা যেতো, মধু খাওয়া হচ্ছে।

হঠাৎ বিস্ময়ে তার মন গান গেয়ে ওঠার মতো হল। আরে! এগুলো তো সেই কমলার চারা। তা হলে, সে গবেষণা করলে, ফল হতে যার অনেক দেরি, ফুলও হয় নি, তার পাতায় কি কোনো বিশেষ গন্ধ থাকে? লেবুর পাতায় যেমন লেবুর, কমলার পাতায় তেমনি কমলার? নাকি রোদে উত্তেজিত ক্লোরোফিল নিচ্ছে প্রজাপতিটা?

সে খুশি হয়ে ভাবলে, এই সব তিথি-টিতি ঋতু-টিতুর খোঁজ রাখা ভালো। সে ঘড়ি দেখলে। নীল অক্ষরে ডায়াল কেটে তেরো এপ্রিল ফুটে আছে, ক্যালেন্ডারে অক্ষরটা লাল বটে, কিন্তু তার তলে পরিষ্কার লেখা গুড ফ্রাইডে। আর সে কি না তা লক্ষ্যে আনে নি! সে নরবুকে বললে, আজ ছুটি, অফিস নেই জানিস তো। দুপুরে চাপাটি আর উরুদ ডাল বানাস। টমাটর দিস ডালে।

তার পরে সে গুড ফ্রাইডেতে মন স্থির করে বসলে। গুড ফ্রাইডে, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, আর তা অনেকদিন পরে, মাস্টারমশাই বলেছিলেন, এটা এখন সকলেই নাকি স্বীকার করছে, ইস্টার প্রকৃতপক্ষে অখ্রীস্টানদের বসন্ত উৎসব। হয়তো একদিন স্বীকার করা হবে, খ্রীস্টের পুনরুত্থানের এই উৎসব সূর্যের বিষুববলয় পার হওয়ারই পরিবর্তিত রূপ, যেমন খ্রীস্টমাস হয়তো দিন বড় হওয়ার সূচনায় আনন্দ। কে আবার? খগেনবাবু। সেই মোটা চশমাচোখে সোশ্যাল স্টাডিজের মাস্টারমশাই।

দু এক মিনিট যেন এক ক্লাসরুমে মন চলে গেল তার। তার পর সে হাঁপিয়ে উঠে দাঁড়াল, দু হাতে মাথার দুপাশ চেপে ধরলে। না, না, না। একী সর্বনাশ! সে নরবুর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাড়াতাড়ি তার কাছে উঠে গেল। কী সর্বনাশ! এখনই আবার! আবার সে জলের তলায়। এটাই ডোবার বিন্দু যা থেকে সরতে হয়। সে তাড়াতাড়ি করে বললে, এগুলো কী রে নরবু? এগুলো কী ফুল?

নরবু বললে, বিলডিং হার্ট।

কী বললি? ব্লিডিং হার্ট। ও, হ্যাঁ, তাই তো, হার্টের মতোই তো, আর লালও।

সে পিছোতে লাগল গাছটার দিকে চোখ রেখে। তার চোখ ছোট বড় হয়। যা কখনো কখনো পাশের লোককে অভিভূত করে দেয়। এখন তাকে কেউ দেখলে তার মনে হতে পারতো, নীল রঙে ব্রাশ চুবিয়ে, এক কান থেকে আরেক কান তার সেই চোখদুটোকে ঢেকে কে একটা দাগ টেনে দিয়েছে।

বাংলোর বাইরের বারান্দায় এসে বসে সে ব্রিজটার দিকে চাইল। অনুভব করলে, তার মুখটা বিকৃত হচ্ছে। সে নিজেকে নিয়ে গবেষণা শুরু করলে। সে নিজেকে শোনালে, দেখো, ওই

ব্যাপারগুলো তার মনকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। মনের তলায় ডুবিয়ে দিচ্ছে তাকে। রোজার ব্যাপারটায় তার মন নিচে নামার ফলে নিচে নিচে চলে এমন কী মুরারিকৃষ্ণর স্কুলে পৌঁছে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ সে দম ধরে বসে থাকল। ভাবলে, আমি জানি, তিন মাসে বিশ হাজারের সেই প্রস্তাব কী ভয়ংকর আঘাত দিতে পারে। কিন্তু কেন ভাববো? সে কঠোর হয়ে স্থির করলে, কী বোকা, কী বোকা। মেলার দৃশ্য, রং, শব্দ, গল্প এসবের নিচে ওরকম দারুণ আঘাত থাকতেই পারে, কিন্তু সেখানে কেন নামা? বাহ্, বেশ কথা। সে যুক্তি দিলে কথা খুঁজে নিয়ে, মনে করো গ্রেগের সেই ছবি যা নিয়ে অত কথা হল, তার ক্যানভাসের পিছনে কোনো আকার থাকা দূরের কথা, রঙের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রেঞ্জারের মতো বুদ্ধিমান লোক তা সত্বেও ও নিয়ে রাত ভোর করতে পারে, তাহলে আজ থেকে, এখন থেকে, এই স্থির করা উচিত হচ্ছে, দৃশ্য, রঙ, শব্দ, গল্পের নিচে নামবে না। সেই কুড়ি-একুশের ময়ূর আঙুল দিয়ে দুচোখের কোণ মুছে ফেললে।

৫

দু-তিনদিন পরে, কিংবা সেদিনই ইস্টার হবে, যোগাযোগ হল একটা। ময়ূর নিজেকে শক্ত করে বসেছিল বাংলোর বারান্দায়। অফিসে সে শুনেছে, সেই গিয়ালপো, যে নাকি এ কয়েকদিন ববিজানের কাঠের কারখানার টেরাসে সুইস তাঁবু খাটিয়েছিল, তার পাঁচ-ছজন সঙ্গীকে নিয়ে খুব ভোরে পনি করে চলে গিয়েছে আগেরদিন। নাকি কনট্রাকটররা হিসাব করে দেখেছে, নানা রকমের জুয়ায় এবার তারা অন্তত একলাখ হেরেছে সকলে মিলে। ববিজান তো পথে বসেছে। জুয়ার দোকান বন্ধ।

বেলা তখন নটা হবে। অফিস যাবার আগে। নরবু একটু বেলা করে বাজারে গিয়েছে। সে এলে রান্না হবে। ময়ূর শুনতে পেলে, কিছু দূর থেকে সার বলে ডাকছে কেউ। আলোছায়া অনেক সময়ে কৌতুক সৃষ্টি করতে পারে, যদি চোখ মেলে দেখি। নরবুর সব চাইতে সেরা আইরিসটার কাছে তেমন আলো, আর তার মধ্যে এক দুধওয়ালী। মেটে রঙের কর্কশ লোমের বোকু, তার তলায় হলুদ হলুদ রোগা রোগা খালি পা। কপালের উপরে ফিতে, তা থেকে পিঠের উপরে ঝোলানো হাত দুয়েক লম্বা মোটা একটা বাঁশের চোঙ। ওতেই দুধ থাকা সম্ভব। এই বোকু হয়তো এক সময়ে মোটামুটি উজ্জ্বল ছিল। এখন পায়ের দিকে বর্ডারের কাছে খানিকটা খাবলা দিয়ে ছেঁড়া। জামার আস্তিনের শেষে রোগা রোগা হলুদ হাত। তেলের অভাবে বাদামি, এমন রুক্ষ চুল। সেগুলিকে মাথার পিছনে একটা রাঙা পাড়ে জড়িয়ে বাঁধার চেষ্টা হয়েছে। হলুদ জাতের ফর্সা মুখ। রঙ সব জায়গায় একরকম নয়। কোন কোন জায়গায় ময়লা লেগে থাকায় তার অন্য রঙ। ভ্রু দুটো স্পষ্ট, তার নিচে চোখদুটো গভীর, নাক টিকলো না হলেও স্পষ্ট, চিবুকটা গোলালো না হয়ে বরং পাতার মতো চোখার ভাবে। চুলগুলোকে সবটা বেঁধে রাখা যায় নি, একটা খেই কপালের ডানপাশ দিয়ে মুখের উপরে ঝুলছে। বয়স কত হবে? তেরো-চৌদ্দ? বুক-দুটি উঠি-উঠি করছে।

ফ্যাকাশে লাল ঠোঁটে হেসে দুধওয়ালী বললে, দুধ সাহাব?

ময়ূর বুঝলে ওর কিছু দুধ বাড়তি হয়েছে, তাই অবেলায় ফেরি করতে বেরিয়েছে। তাসিলা এমন ধনী জায়গা নয় যে দুধ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়বে। হয়তো কিছু রোজানো আছে, তা দিয়ে, বাড়তিটুকু নিয়ে এ দুয়োরে, ও দুয়োরে ফিরছে।

ময়ূর দেখলে, কী কচি! চোখের নিচে কালি নেই। কিন্তু গালে ময়লার মধ্যে উপর থেকে নিচে একটা দাগ পড়েছে। চোখে জল? নাকি তাড়াতাড়ি ভোর রাতে চোখে মুখে জল দেয়ার ফল?

ময়ুর জিজ্ঞাসা করলে, কতটা আছে? মেয়েটি আধ লিটারের মতো আছে জানালে ময়ূর দিয়ে যাও বলে পাত্র আনতে উঠে গেল। ফিরতে ফিরতে তার মনে হল, এই বাচ্চা দুধওয়ালীকে সে আগে দেখেছে। মেয়েটি যখন তার চোঙ থেকে পাত্রে দুধ ঢালছে ময়ুর তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলে, দুধওয়ালী বললে, আগে কিছুদিন সে দুধ দিয়েছে। ময়ূরের তখন মনে পড়ে গেল, রিনিমেম যে কয়েকদিন ছিল, একটি মেয়েটি দুধ দিতো বটে। কিন্তু এই কি সে? সে মনেই করতে পারলে না, সেই মেয়েটি কী রকম ছিল দেখতে। ময়ূরের আবার মনে হল, কী কচি, কী সুন্দর যেন একটা সকাল। সে হেসে বললে, তোমার নাম কি সুন্দরী? খুব সুন্দরী তুমি।

সুনডুরি না, ডম্বরি।

ও আচ্ছা, ময়ুর হাসল।

টাকাপয়সা দিয়ে ময়ূর আবার ভালো করে দেখলে মেয়েটিকে। ঠিক সেই সময়ে তার সুবিধার জন্য যেন মেয়েটির মুখের উপরে আলো পড়ল। তা, অবশ্যই, ময়ূরের অনুভূতি হতে পাবে। সেই কচি, একটু বিষণ্ণ (নাকি চিন্তাশীল) স্পষ্ট, সোজা ভ্রু, কিন্তু চোখা চিবুকের, সরল গভীর চোখের মুখ ; উঠি-উঠি বুক, সেই কিশোরীকে দেখে ময়ুর অবাক হয়ে যেতে লাগল। সে এমন করে দেখতে লাগল যে ডম্বরির মুখে আবির লেগে গেল। ডম্বরির জীবনে এই প্রথম গালে রক্ত এসে যাওয়া। সে যেন ময়ূরের বড় বড় চোখের খাঁচায় ধরা পড়ে গেল। তার পরে পিঠের উপরে বাঁশের চোঙ দোলাতে দোলাতে চলে গেল। সে, অবশ্যই, যাকে আরও পরে লজ্জা বলতে পারবে, সেই অব্যক্ত সুখের কারণ খুঁজে পেলে না। হায়, কী করে সে আমার বোন হতে পারে! ময়ূরের অনুভূতিটা অব্যক্ত আনন্দের, উষ্ণতার। ভাষা দিতে পারলে সে বলতো : দেখো, এই তো আমার তাসিলা। আমি তো দেখতেই পাচ্ছি। যদিও হয়তো তা রেঞ্জারের ছবির মতো, বেধ নেই এমন ক্যানভাস।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১

এসব ব্যাপারে মত বদলে যায়, যেমন মুরলীধরের বদলেছিল। সে বলেছিল, বলেছিলুম নাকি? না, না, এমন সব উৎসব আত্মার উৎসার নয়, অবদমন থেকে সহজ প্রবৃত্তিগুলোর অন্তত সাময়িক মুক্তিও নয়, বরং কোনো ধুরন্ধরের মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে প্লট প্ল্যান করে কাজে লাগানো। বাস্তবকে মুখোস পরানোর চেষ্টা। এমনকী সে একবার ভেবেছিল, দেখো, বহু লোক মিলে ক্যালেন্ডারের পাতায় ছক কেটে, লাল নীল রঙে ছেপে, অঙ্কে চিহ্নিত করে ; এই সামান্য সময়টুকুকে নির্ভরযোগ্য দেখানো হয় বটে, কিন্তু কেমন উল্টেপাল্টে যায় না? যেন তুমি ঠকে যাও, হেরে যাও। মনে হয় না, ক্যালেন্ডারের খোপে আটকানো টুকরো সময়ই তোমাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে পারে? সেই সময়ে সে তো বরং ক্যালেন্ডার যার প্রতীক, সেই সময়কে একরকমের নৌকা মনে করেছিল। সুঘ্রাণ নৌকা যার আরোহী হয়ে কুয়াশার মতো অনির্দেশ্য এক সায়র, যার অন্য নাম জীবন, পার হও। কিন্তু এসব পোস্টমাস্টারের পরের তেমন সব মন্তব্য যা ঘটনাগুলোকে পার হয়ে আসার পরে করা সম্ভব।

সুতরাং, প্রিয় পাঠিকা, আমরা ক্যালেন্ডারের সময়ের সঙ্গে চলতে চাইছি। অন্য যে সময়, যা নিছক মনের সময়, তা সামনে পিছনে চলে দুরধিগম্য হয়ে ওঠে।

ক্লুটলং-এ এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ তখন। একটা টেবলের দুধারে বসেছিল জেন আর নামগিয়াল। মাঝখানে পিতলের উজ্জ্বল ল্যাম্প। জেনের ওয়াচে সাতটা হল। থেনডুপ কিচেনে রান্না করছে। জেনের পরনে হাউসকোট যা যেন এক শতাব্দী আগেকার স্টাইলে, তার মাথাতেও একটা বড় রঙিন রুমাল জড়ানো। হয়তো সেই রুমাল জড়ানোর জন্য, হয়তো টেবলল্যাম্পটার জন্য মনে হচ্ছে এটা এক কৃষি-পরিবারের বৈঠকখানা, যেখানে মালকানি তার স্টুয়ার্ডের সঙ্গে দিনশেষে নিজেদের জমি-ফসল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছে। ল্যাম্পটা সম্ভবত গ্রেগেরও পূর্ববর্তী, হয়তো ক্লুটলং-এর আদিযুগের কারো সময়ের। কারুকার্য করা পুরু গান-মেটালের, পাশাপাশি দুটো পলতে।

অন্য দিকে দিয়েও এই ধারণা করার যুক্তি আছে। কিছুক্ষণ আগে চা খেতে খেতে জেন নামগিয়ালের সঙ্গে ক্লুটলং-এর পঞ্চাশ একর জমির কথা আলোচনা করছিল। কী কী ফসল তাতে হয়, তা কত সহজে করা যেতে পারে, কীভাবে কাদের সাহায্য নেয়া হবে, জল, যা ছাড়া কোন চাষ হয় না তার কী বন্দোবস্ত হতে পারে—এসবই আলোচনার বিষয় ছিল।

আর তা যুক্তিসঙ্গতও হয়েছিল। কদিন থেকেই, অন্তত এপ্রিলের প্রথম থেকেই, আগামী বছরের জন্য বাজেট করে পাঠানোর পরদিন থেকেই বলা যায়, ভেবে ভেবে সেদিন সকালে জেন নামগিয়ালকে নিয়ে ক্লুটলং-এর উপত্যকা দেখতে বেরিয়েছিল। তা, এমন খুব দেরি আর কী হয়েছে? ডিসেম্বরে প্রথম আসা, তার পরে চার মাসের মধ্যে সে গুছিয়ে নিচ্ছে না? বরং আরও কম সময়ই। তার প্রকৃতপক্ষে ক্লুটলং-এ আসা তো গুণতে হবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি—সেই দ্বিতীয় বার কী যেন এক সাহস আর নির্ভরতা নিয়ে ফিরে আসা থেকে।

বাজেট, স্বীকার করাই ভালো, মার্চে পাঠানো সম্ভব হয় নি। এসব ব্যাপারে শুধু এক বছর দেখলে হয় না। স্থাপন করার ব্যাপার আছে। স্কুল, চার্চ ইত্যাদি কিংবা ক্লিনিক হসপিট্যাল এসব বিবেচনার ছিল। স্কুল একটা দরকার তাসিলায়। গ্রেগ একটা গড়ে তুলেছিল। একদিক দিয়ে বলতে গেলে, সেই স্কুলটাই এখন আছে, যদিও এখন তা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রাইমারি স্কুল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কিছু টাকা দেয়, দুজন পড়ায়। শর্মা নামে এক নেপালি ভাষার পণ্ডিত, আর মিসেস রোজালিন্ড নামে একজন কিছু কিছু ইংরেজি পড়ায়, সেলাই শেখায়।

নামগিয়াল বলেছিল, ফরেস্টকে দিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। শেষের দিকে নামগিয়ালই ওই দুই জনের বেতন দিতো গ্রেগের ক্যাশবাক্স থেকে। গ্রেগ সে রকম নির্দেশ দিয়ে সেসব ঝামেলা থেকে সরে গিয়েছিল। গ্রেগ চলে যাওয়ার পরে স্কুলের ক্যাশবাক্স খুলে নামগিয়াল দেখেছিল, হাজার দেড় টাকা আছে আর। তখন সে রোজা আর সেই হরকাবাহাদুর শর্মাকে ডেকে এনে, টাকাটাকে দুভাগে ভাগ করে, তাদের দিয়ে বলেছিল, এবার চালাও।

জেন হিসাব করেছিল, একটা স্কুল চালাতে আর তিনজন শিক্ষকের বেতন দিতে, মাসিক অন্তত দুহাজার, ঘরবাড়ি তৈরি করতে অন্তত বিশহাজার। প্রায় পঞ্চাশহাজার। তত টাকারই ওষুধ, যদি বিতরণ করা হয়। ওষুধ না শিক্ষা? জেন, হয়তো সে নিজে ডাক্তার বলে, স্থির করেছিল ক্লিনিকের পক্ষে। টাকা এলে সে একটা ক্লিনিক বসাবে, তার বাংলোর আউট-হাউসটাকে পাঁচ বেডের হসপিট্যাল করবে। এমনকী কোহেনকে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত না দিলেও বাজেটের সঙ্গে পাঠানো প্রস্তাবের চিঠি লিখতে লিখতে তার মন কল্পনায় আরও এগিয়ে গিয়ে ভাবছিল, সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাস হওয়ার মতো আবহাওয়া। কালে আউটহাউসটা কী একটা ক্ষুদে টিবি হাসপিট্যাল হতে পারে? এদিকে তো বুকের রোগই বেশি।

সে ইতিমধ্যে ভিনিগারের খোঁজে অসওয়ালের দোকানে গিয়ে, তার বদলে রোগী পেয়েছিল। অসওয়ালের বছর ত্রিশ বয়সের বেটা-বউ। এককালে সুন্দরী ছিল। কিন্তু এখন রোগ ও তার আতঙ্কে সংসারের বাইরে কোণঠাসা। জেন বলেছিল, সে রোগটাকে টিবি বলে না। অন্তত এখনও তা নয়।

এই এক কথায় সেই ত্রিশ বছরের বধূ তার নষ্ট যৌবন যেন ফিরে পাচ্ছে।

চিকিৎসায় কৃতজ্ঞ অসওয়াল প্রস্তাব করেছে ইতিমধ্যে, তার দোকানের একপাশে একটা ডিসপেনসারি করার।

প্রকাশ্যে যুক্তি না দিলেও তার মন হয়তো কাল্পনিক সেই হসপিট্যালের ততোধিক কাল্পনিক রোগীদের জন্য পুষ্টিকর ভিটামিনযুক্ত খাদ্যাদির কথা ভাবছিল। তার ফলেই ক্লুটলং-এর আবাদ মনে উঠে থাকবে। ঘুরে ঘুরে পাকদণ্ডি বেয়ে বেয়ে সেই জমিতে উঠতে হয়। আজ সকালে সেখানে গিয়ে আগাছা-ঢাকা ঝোপঝাড়ে সেই সব টেরাসের পর টেরাস দেখতে দেখতে চাষ করার সম্ভাব্যতা, সুযোগ ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছিল, নামগিয়াল আর থেনডুপের সঙ্গে আলাপও করেছিল। জলের অভাবই তার চোখে পড়েছিল যেন। আগাছা, যার মধ্যে আট-দশ ফুট উচু কুকাঠের গাছও স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে বাড়ছে, প্রমাণ করছে বর্ষার জল সাব সয়েলে কিছু থেকে যায়। কিন্তু শস্য? তখনই নামগিয়াল বলেছিল, আগে কিছু কিছু ফলের গাছ ছিল, নাসপাতি, এমনকি আপেলও দু একটা ; পেয়ারা আর কুল তো বটেই। কী হল সে সব? জেনের এই প্রশ্নের উত্তরে থেনডুপ বললে, গ্রেগ সাহেব শেষ আপেল গাছটাকে, নিজের হাতে কুড়াল দিয়ে কেটে, সবটা জায়গায় বার্লির চাষ করেছিল। বার্লি? আচ্ছা! তা হোক, কিন্তু জল? বর্ষায় আবাদ বেয়ে কয়েকটা অগভীর ঝর্না চলে, তখন তো পাহাড়ের গা থেকেও জল বেরিয়ে আসে। এপ্রিলের সকালের উজ্জ্বল আলোয় আবাদে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে—জলের বন্দোবস্ত অপ্রতুল হলেও আগাছা, ঘাস সবই সবুজ—জেনের ছোটবেলায় পড়া গল্পের বইয়ের কোন কৃষকপরিবারের ছবির কথা মাথায় আসছিল। স্মকপরা লম্বা গুঁফো কৃষক আর মাথায় রুমালবাঁধা কৃষক-স্ত্রী আর তার শস্যক্ষেত্র।

টেরাস থেকে নামতে নামতে তার মনে এই প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা তাসিলা তো একটা বড় গ্রাম, পাহাড়ি গ্রাম যেমন হয়। তাহলেও এখানে, মধ্য ইউরোপের পাহাড়ের ভাঁজে লুকানো কোন শহর যা অষ্টাদশ শতকে থেকে গিয়েছে, তার মতো কি মেয়রও থাকে একজন? বেশ টল, শক্ত, প্রয়োজনে কঠোর পুরুষ, এমন? তার একবার মনে হয়েছিল, সে নামগিয়ালদের কাউকে জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু তা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? অন্যদিকে দেখো, সেই বুড়ী ঘাসকুড়ানি বাংলোটাকে মেয়রের বলেছিল।

চা-পর্বের পরে চার্চে যায় নামগিয়াল। চার্চ-ফেরত সে আলোর কাছে এসে বসেছে। অন্ধকার হওয়ায় হাতের বইটাকে রেখে দিয়েছিল তখন জেন। তারপর আলোর দুপাশে বসে তখন গল্প। থেনডুপ কিচেনে ভাত চাপাচ্ছে। গল্পটায় বার্গলাররা এসে গেল। নামগিয়াল বললে, এমনকি দ্রুকও ক্লুটলং-এ আসবে না।

থেনডুপের কিচেনে ব্যস্ত থাকার কথা। ডিনার শেষ করে দিয়ে সে বাড়ি যাবে। অথচ এমন একটা গল্প জমে উঠেছে নামগিয়াল আর জেনের মধ্যে, যে থেনডুপ মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে যোগ না দিয়ে পারছে না।

বরং এইমাত্র শেষ মন্তব্যটা সেই করে গেছে। বলেছে, তারা অনেকেই শুনেছে, দ্রুকের একটা মাত্র চোখ। যদি একটাই চোখ হয় তবে তা কপালে থাকা স্বাভাবিক, নাকের একপাশে নয়। কিন্তু এখন দ্রুকদের নাকি নাকের একপাশে একটা থাকে।

থেনডুপ রান্নাঘরে গেলে নামগিয়াল বললে, আমি একজনকেই দেখেছি যার নাম দ্রুক ছিল, আসলে তার বাঁ ভুরুর নিচে কোন চোখ নেই। যেখানে সকলের চোখ থাকে সেখানে তার কোঁচকানো চামড়ার পর্দা।

কল্পনায় সেই মুখ দেখে জেনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তা হলেও হেসে বললে, থেনডুপকে বিশ্বাস করতে হলে দ্রুকের কথা তার বাবাও জানতো, তা হলে কিন্তু দ্রুকের বয়স একশোর কাছে

যায়। তা ছাড়া দ্রুক একটা নয়, অনেক দ্রুক হয়।

নামগিয়াল নিজেকে ক্রস করে বললে, মাদার, আমার তা মনে হয় না। আমি যার কথা বললাম, সেই যদি থেনড়ুপের দ্রুক হয়, থেনড়ুপের বাবাও তার বুড়ো বয়সে তাকে দেখে থাকবে। আমি যাকে দ্রুক বলে জানি, সে ছিল এখানকার আর্মি ডিভিশনের বুড়ো কসাইয়ের ছেলে। সে গোরু, শুয়োর, ছাগল কাটার সময়ে তার পিতাকে সাহায্য করতো, পরে সেই সব জানোয়ারের রক্তমাখা ব্লাডার নিয়ে পথে পথে বল খেলে বেড়াতো। তার বয়স পঞ্চাশের বেশি হয় না এখন।

থেনড়ুপ ইতিমধ্যে আবার রান্নাঘর থেকে ফিরে টেবিলের কাছাকাছি কিন্তু আলোর বৃত্তের বাইরে দুহাত বিপরীত আস্তিনের ভাঁজে ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে শুনছিল। জেন বললে, তা হলে এটা কি করে সম্ভব, জন, যে এখন থেকে সাত আট বছর আগে গ্রেগরী এক দ্রুককে, লাঠি বা বন্দুক না নিয়ে, ক্রস হাতে তাড়া করেছিল? কী করেই বা সম্ভব যে তুমি ফাদার গ্রেগকে ভোররাতের হিমে, যাকে ভোটগলি বলো, সেই গিরিপথে আকাশের দিকে ক্রস উঠিয়ে বসে থাকতে দেখবে? মানুষ কখনও আকাশপথে যায়?

থেনড়ুপ জেনকে সমর্থন করে মাথা দোলালে। জেন হাসতে পারলে না। নামগিয়ালের মস্তিষ্ক নরম হয়ে যাচ্ছে ভাবতে মায়া হয়। সে বললে, আচ্ছা দ্রুককে কি চোখে দেখা যায়? সে কি একটা ধারণাই নয়?

থেনড়ুপ বললে, হ্যাঁ। ভোটিয়াদের মতো পোশাক পরে। গগলস পরে যার বাঁ-টিতে কাগজ সাঁটা। এবার মেলায় মেয়রেব সঙ্গে বন্দুক ছোঁড়াছুড়ি হয়েছে। শেষ কথাগুলো থেনড়ুপ ফিসফিস করে বললে। মেয়র বন্দুকে, গ্রেগসাহেব ক্রসে। নামগিয়াল স্বীকার করলে, যে দ্রুককে ফাদার গ্রেগ তাড়া করেছিল, তাকে সে দেখে নি।

কুকারের শব্দে থেনড়ুপ রান্নাঘরে দৌড়াল। নামগিয়ালও উঠল। সে ডিনারের আগে এখন চার্চে মোমবাতি জ্বালবে। জপ করবে মালা ঘুরিয়ে।

একা হয়ে জেন জানলার কাছে মেঘ দেখতে গেল। অনেক দূরে আর অনিশ্চিত মনে হয়। তাহলেও এখানকার মেঘের কথা কিছু বলা যায় না। বৃষ্টি নেমে গেলে থেনড়ুপের অসুবিধা হবে। সে স্থির করলে, থেনড়ুপ বরং রাতের খাবার যা হয় কিছু নিয়ে চলে যাক।

রান্নাঘরে গিয়ে সে দেখলে, থেনড়ুপ কিছু ভাবছে, আর তারই তালে তালে মাথা নাড়ছে। সে থেনড়ুপকে বলতেই, সে তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে একটা প্যানে কিছু খাবার তুলে নিয়ে, রান্নার কী বাকি আছে কোনরকমে জেনকে বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। সেটা এমন যে তাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। দ্রুকের গল্প শুরু করে নিজেই এখন ভয় পাচ্ছে?

বাইরের দরজার ছিটকিনি তুলে দিতে গিয়ে জেনও শিউরে থমকে দাঁড়াল বাইরের অন্ধকার দেখে। কিন্তু আলোর কাছে ফিরে এসে সে হাসল। ভাবলে, সেও ভয় পেলে না কি? ভয় অবশ্য সংক্রামক। আর এসব গল্পের নিয়মই তাই। চেয়ারে বসে গল্প শুরু হওয়ার আগে যে বইটা পড়ছিল, সেটাকে হাতে নিয়ে সে পড়তে শুরু করলে। সামান্য রান্নার বাকি। নামগিয়াল এলে তখন কুকারে দেয়া যাবে। খানিকটা সময় সে নিবিষ্ট হয়ে বই পড়লে।

কিন্তু বইয়ের শব্দগুলোর উপর দিয়ে এক একবার দ্রুকের চিন্তাটা যে তার মনে এল, তা স্বীকার করতে হবে। একবার সে হঠাৎ অবাক হয়ে ভাবলে, গ্রেগের এই পোজটা তার পরিচিত। কোথাও কি সে দেখেছে? মন খুঁজতে খুঁজতে সে হেসে ফেললে, আচ্ছা। ও রকম একটা ছবি কি সে দেখেছে? দালি বা তেমন কারো আঁকা? তুমি কী বলবে গ্রেগও সে ছবি দেখেছে আর তাই তার মনে কাজ করেছিল? এক মতে দ্রুক শয়তানের মতো একটা ধারণা। কিন্তু যদি কসাইয়ের ছেলে হয়ে থাকে সে? সে তো মানুষ, অপরাধী, নতুবা বন্দুক চালায় কি করে? তা না হলে মেয়র আর দ্রুক সমান

ফ্যান্টাসি। অথবা দ্রুক এ অঞ্চলের অপরাধীদের কর্তা কি? তা যদি সত্যি হয় তবে সে ক্রসকে ভয় পাবে কেন? আবার সে যুক্তি দিলে, এমন কি হতে পারে দ্রুকের মন সব দিক দিয়ে হিংস্র হলেও, অপরাধীদের যেমন হয়, একটা অংশে শৈশব থেকে গিয়েছে? আর তার ফলে সে ক্রস এবং ল্যাটিনের ডিং ডংকে ভয় পায়? এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয় বটে। তা, আজকাল অপরাধীদের প্রায় সব সময়েই আনডেভেলপড ইগো মনে করা হয়, হয় না? কিন্তু দ্রুকের কথা অন্য কেউও তাকে বলেছে।

সাড়ে-আটেই ডিনার শেষ করলে সে আর নামগিয়াল। খেতে খেতে জেন হাসিমুখে অপরাধীদের অপরিণত মন নিয়ে নামগিয়ালকে কিছু বললে। নামগিয়াল, যে তখনও একটা মানুষ আর মিথকে গুলিয়ে ফেলছে, তার কাছে সে রকম আশা করা যায়, নিজের মধ্যে আত্মা ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে, তা বুঝতে পারলে না। কিন্তু মাদার যখন বলছে, সে ধৈর্যসহকারে শুনলে।

খাওয়া শেষ হলে নামগিয়াল চার্চে শুতে গেলে জানলা দরজা বন্ধ করে জেন ঠিক করলে, বৃষ্টি নামলে তা খানিকটা দেখে নিয়ে ঘুমাবে। ততক্ষণ বই পড়বে। টিনের উপরে বৃষ্টির শব্দ, শার্সিতে তার শব্দ, শার্সির গায়ে গড়িয়ে নামা জলের ছায়া এ সবের যে আনন্দ তা পেতে ইচ্ছা হল তার। সেই পঞ্চাশ একর জমি, যা গন টু সীডস, তা ভিজে ভিজে শস্যপ্রসবে আগ্রহী হবে, এরকম ভাবতে ভালো লাগল তার।

যুক্তি তর্ক মাঝেমাঝে উল্টো পথে হাঁটে কিন্তু। লাইব্রেরির দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ার মতো একটা বই বাছতে গিয়ে আবার তার গা শিরশির করে উঠল। তার মনে হল, এক বৃষ্টির রাতে সে খুব ভয় পেয়েছিল। কিন্তু সে স্মৃতিকে আমল না দিয়ে সে নিজেকে শোনালে, এসব গল্প ডাহা মিথ্যা হতে পারে। গ্রেগের দ্রুক তাড়ানোর সেই হ্যালিউসিনেশনের গল্প, যা জন নামগিয়াল হয়তো গ্রেগের মুখেই শুনে থাকবে।

এই সময়ে র‍্যাকের উপরে তার আগে পড়া সেই বাঘশিকারের বই যার উপরে এক ম্যানইটার বাঘিনীর হাঁ করা মুখ—তা চোখে পড়ল। সেই বাঘিনী যে কথা বলে না, কিন্তু যার ইনস্টিঙ্কট তাকে ডাকায়।

কিন্তু সে ভাবলে, ওটা এক স্মাগলিং বৃত্তের ব্যাপার হতে পারে। সীমান্ত এত কাছে। হয়তো সেই চক্রের দলপতি নিজেকে এই আদিবাসীদের কাছে অসীম, অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে প্রচার করছে। খোঁজ করে দেখতে হবে, এর মধ্যে ধর্মের কোন ব্যাপার আছে কি না। ক্রিশ্চানদের কাছে, লিভান্টে যারা দেবতা ছিল, ক্রমশ ঘৃণ্য শয়তান হয়েছিল, সর্প, মোলক, বাদল ইত্যাদি। স্মাগলারদের এই প্রচার এদিকের আদিবাসীদের মনে খুব ফলপ্রসূ হতে পারে। স্মোলেটকে এদিকের সংস্কৃতির এ দিকটা সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দিলে হয়। সে স্মোলেটের উপন্যাসটাকেই পছন্দ করলে। ক্লাসিক বারবার পড়তেই তার ভালো লাগে। বই হাতে নিয়ে লাইব্রেরির আলো নিবিয়ে শোবার ঘরের আলোতে গেল।

আর, এ অঞ্চলের আদিবাসীরা হয়তো এখনও নতুন মিথ তৈরি করার মানসিকতায় আছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে হেতু না খুঁজে, গল্প তৈরি করে বিষয়টা বুঝে নিতে চায়। যেমন ক্রস শূন্যে তুলে দ্রুককে শাসন করার গল্প। ওদিকে কিন্তু থেনডুপের গল্পে আবার রিয়ালিজম। নাকি এই এপ্রিলের মেলায়, তা হলে কয়েকদিনের মধ্যে, সেই একচোখো, রেপিস্ট আর ভায়োলেন্ট দ্রুকের সঙ্গে ডুয়েল হয়ে গিয়েছে। এই ডুয়েলটা হয়তো আর কয়েকদিনের মধ্যে আর এক মিথ হয়ে যাবে। দ্রুক এবং মেয়র নামে এক নাইট। যেমন ধর ল্যান্সেলট। পারফেক্ট নাইট। কিন্তু কী লেডি অব শ্যালট, কী রানী গুইনিভিয়ারের বেলায়, তেমন অর্থোডকস নয়। মানে, নীতি ভুলে যেতো যেন।

জেন একেবারে অবাক হয়ে গেল। যেন সে কি করে মিথে বিশ্বাস করে মিথে ঢুকে যাচ্ছে।

আগেই বোঝা উচিত ছিল, তাসিলা শহর, যা তার হাতের পাতার চাইতে বড় নয়, সেখানে মেয়র একটা মিথই মাত্র হতে পারে।

সে নিজেকে বললে, এই দেখো, আবার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। বাহ্, এই বুঝি পঞ্চাশ বছর ধরে এই পঞ্চাশ একর চার্চ-লিভিং-এ বাস করার প্রতিশ্রুতি! দেখো, সেই ফেব্রুয়ারির মাঝরাত থেকে এই এপ্রিল, পঞ্চাশ দিনও হয় নি।

নিজের আগেকার চিন্তার খেই তুলে নিয়ে জেন আবার ভাবলে, হয় না এখনও কি মিথ তৈরি? যেমন সেই ওঅর টু এন্ড অল ওঅর। সেই পুরনো আর্মাগেডনের মিথের পুনরাবর্তন? দু এক কোটি লোকের মৃত্যুতে যুদ্ধ বন্ধ হয় নি। ফ্যাশিজম, টোট্যালিট্যারিয়ানিজম থেকে গিয়েছে।

ঘুমানোর আগে যেমন স্বাভাবিক, সে আয়নার সামনে গেল, চুল নেটে জড়ালে, হাউসকোট ইত্যাদি খুলে তার সেই স্বচ্ছ সিল্কের শেমিজটা পরলে। আয়নার নিজেকে বললে, ফুলছো নাকি? সে একা কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চারিদিকে দেখে নিলে। তার ভিতরের ডাক্তার তাকে বলে দিলে, অ্যাবসার্ড যে, তা বুঝতে ডাক্তার না হলেও চলে। দুমাস হয়ে গেল।

নিজের চারদিক দেখতে গিয়েই তার চোখে পড়ে গেল। শোবার ঘরের টেবলে ব্যাটারিতে চলা টেবলল্যাম্পটার পাশে রাখা পুতুলটা চোখে পড়ল। ওটা অসওয়ালের বাড়ির চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত। স্ত্রীলোকটিকে আবার সামনের সপ্তাহে দেখতে যেতে হবে। কী অদ্ভুত এই ঘটনাগুলো! টিবি, এই শব্দটা তাকে জীবন্মৃত করে রেখেছিল। তার সেবা করার জন্য যে স্থানীয় যুবতীকে রাখা হয়েছিল, তার কাছেও অসওয়ালের সেই পুত্রবধূ হেরে যাচ্ছিল, তা সে বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকলেই বোঝা যায়। অসওয়াল কিছু বলতে পারছিল না, কিন্তু সে বুঝতে পারছিল তার রুগ্না পুত্রবধূ আর তার সেবিকাকে নিয়ে এক করুণ নোংরা নাটকের মতো কিছু হচ্ছে।

অন্যদিকেও প্রেসক্রিপশন নিয়ে জংশন-স্টেশন শহরের কয়েক দোকান থেকে ওষুধ সংগ্রহ করেছে অসওয়ালের লোকেরা। দোকানদারেরা সকলেই অবাক নাকি যে তাসিলায় এমন একজন ডাক্তার আছে যে এমন সব ওষুধ প্রেসক্রাইব করে! ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে তারা কম যায় না, দামি ক্যালেন্ডার পাঠিয়েছে দু তিনজন। একজন তো পুতুলও পাঠিয়েছে। কডলিভার অয়েল লেখা একটা প্লাস্টিকের পুকুর। যার চারিদিকে প্লাস্টিকের ঘাস, একটা তেমন গাছ, আর গাছের গোড়ায় একটা ছোট বাঘের বাচ্চা, যার শিশুভাবের মুখ দেখতে আদর করতে ইচ্ছা হয়, কিছু কড মাছকে ধরতে সাহস পাচ্ছে না। আর্টিফিশিয়াল পশমে ঢাকা এক সুন্দর বিড়ালই।

মুখে একটু ক্রিম দিয়ে নিয়ে, সে নিজেকে বললে আবার, ভয়েরই বা কী? সে ফায়ারপ্লেস পর্যন্ত হেঁটে গেল। তার পাশে রাখা ছুঁচলো মাথা, হাত দুয়েক লম্বা, মজবুত লোহার পোকারটাকে বিছানায় রাখলে। বই নিয়ে বিছানায় যেতে যেতে সে মনে মনে বললে, তা তোমার বাঘিনীরও দাঁতে থাবায় ধার থাকে।

কিন্তু বিছানায় উঠে, গায়ে রাগ টেনে নিতে গিয়ে দেখলে ব্যাটারির সেই টেবলল্যাম্পটার পাশে সে বিড়াল-কোমল বাঘাটা তার দিকে চেয়ে আছে। কী সুন্দর, কী মিষ্টি, আর চোখদুটি চকচকে রকমের দুষ্টু। সে বিছানা থেকে নেমে বাচ্চা বাঘটাকে তুলে নিয়ে এসে বুকের কাছে নিজের রাগের তলায় নিলে।

দশই এপ্রিল, সেদিন মঙ্গলবার ছিল।

বিকেলে থেনডুপ জেনকে বললে, নামগিয়াল বুড়ো অনুরোধ করেছে, সন্ধ্যায় যেন তাকে খানিকটা লাল মদ দেয়া হয়।

জেন লজ্জা পেয়ে বললে, ছি, ছি, এ আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন? ও কি ওয়াইন খায়? তবে এতদিন ডিনারে ওকে দাও নি কেন?

সন্ধ্যার আলোগুলো জ্বালালে থেনডুপ তার পরে। জেন তার বসার ঘরের টেবলে রাখা আলোর দিকে চেয়ে ভাবছিল, একটা ব্যাপারে দারুণ কৃপণ ছিল গ্রেগরী। সারা বাংলোয় একটা ইজিচেয়ার-জাতীয় কিছু নেই, শেজলং দূরের কথা। এসব দিকে পিউরিটানমতো আবার। নাকি ফ্রান্সিসকান? সে অন্তত দুখানা বানাবে। সে এই সময়ে লক্ষ্য করলে, টেবলের অন্য প্রান্ত ঘুরে নামগিয়াল যাচ্ছে। আলোটাই প্রকৃতপক্ষে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার দুহাতে ধরা একটা ট্রেতে কয়েকটা মোমবাতি। বুড়ো নামগিয়ালের মাথা পেঁচিয়ে লাল সুতো বাঁধা পাকাচুলে বিনুনির খানিকটায়, জরার গভীর দাগে দাগানো কপালের এক অংশে, মোঙ্গলীয় স্বল্পলোম ভ্রূ ও আধবোজা একটা চোখে, এবং স্বল্প পরিমাণ, বিচ্ছিন্ন, দু-তিন থোপ সাদা গোঁফযুক্ত মুখের একটা পাশে আলো পড়েছে। আলোর ফলে বোঝা গেল, ট্রের উপরে একটা ছোট গোল পাঁউরুটি আর তার পাশে একটা পুরনো দাগধরা গেলাসে লাল মদ।

জেনের বিস্ময় বোধ হয়। থেনডুপকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারলে, জন পোর্ট আর পাঁউরুটি নিয়ে চার্চে যাচ্ছে।

এদিকে দেখো, কিছু সাজসজ্জাও হয়েছে। গায়ের এ কোটটা পরিষ্কার, তা ছাড়া মাথায় বিনুনি বাঁধা চুলও তেলে চকচক করছে। তুকতাক নাকি, অথবা আদিবাসীদের কোন অনুষ্ঠান? একবার সে এরকম ভাবলে, চার্চে কেন? ক্রিশ্চানধর্ম আদিবাসীদের হাতে পড়ে ভুডু হয় বটে, এ কি তেমন কিছু?

কিন্তু লাল মদ আর রুটির সহাবস্থান তার মনে কাজ করে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, তার বিস্ময় দশগুণ হল। হোলি কমিউনিয়ন!

সে উঠে গিয়ে ইউনাইটেড চার্চ মিশনের প্রকাশ করা লম্বা ডায়েরিটাকে খুলে উৎসব, বিশেষ প্রার্থনা, ইত্যাদির তালিকায় চোখ রাখলে। হ্যাঁ, এই তো বেশ স্পষ্ট করেই লেখা এ বছর দশই এপ্রিল, মঙ্গলবার কমিউনিয়ন সাপার। আশ্চর্য, আশ্চর্য!

তার মনে একটা অভিমান দেখা দিল, সে আলোচনা করলে, এরকম একটা ব্যাপারে নামগিয়াল তাকে কিছু বলে নি, এতে কি তার অভিমান হওয়া উচিত? অথচ, দেখো, অনেক সময় পেয়েছে আজ নামগিয়াল তাকে বলার। এইতো, সারা সকাল তারা আজও আবাদে কাটিয়েছে। গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে লাউ, পাহাড়ি শসা, স্কোয়াশের বীজ লাগিয়েছে।

জেনের অনেক কমিউনিয়ন সাপারের কথা মনে পড়ল। ডাকোস্টা তো বটেই, চার্চের বয়স্ক লোকেরা বিশেষ ফাদার ল্যাংফোর্ড তো তাঁর পুরো পোশাকে উপস্থিত হতেন। আর প্রত্যেকে না হোক অধিকাংশ কিশোরবয়স্ক ছাত্রছাত্রী। আলোকের উৎসব যেন। রুপোর ক্যান্ডেলস্টিকের শত শত মোম ইলেকট্রিকের শ্যান্ডেলিয়ারগুলোকে নিষ্প্রভ করে দিত। আর সেই উৎসবে কারুকার্যখচিত রুপোর চ্যালিস থেকে রুপোর সুদৃশ্য চামচে পবিত্র মদ এবং রুপোর পরাত থেকে কাগজ-হেন পাতলা রুটির ছোট টুকরো বিতরণ করার আগে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্যই সেদিনের প্রিস্ট বোঝাতেন : দা ব্রেড, দা ব্রেড ফ্রম হেভেন, ইজ হিজ ফ্লেশ হুইচ হি স্যাক্রিফাইসড ফর দা সিনস

অব দা ওয়ার্লড। দিস ওয়াইন–ইট উইল কনটিনিউ টু রিপ্রেজেন্ট হিজ ব্লাড অ্যান্ড অল হিজ ডিয়ার ফলোয়ার্স অ্যাট অল টাইমস। এই রুটি তিনি সকলকে খেতে বলেছিলেন, এবং আমরা যখন তা খাই, সেই আশীর্বাদ, সেই দয়ার অংশ নিতে থাকি যে আশিস এবং দয়া ক্রসে তাঁর দেহ দীর্ণ হলে মানবজাতির জন্য নিশ্চিত হয়েছিল। এই মদ্য এমন সব উৎসবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর মৃত্যুকে এবং তার প্রতিশ্রুতিকে যা সেই রক্তে প্রত্যয়িত, আমেন, আমেন। কয়েক মিনিট ধরে যেন এক ক্যাথিড্রালের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিগুলোকে শুনতে পেলে সে।

কিন্তু একটা কথা ছিল, যা সেই পাদরি বলতেন, মাদার সুপিরিয়ার ডাকোস্টা যে নোটিশ দিতেন তাতে উল্লেখ থাকত–কারো অংশ গ্রহণ করা উচিত হয় না, ব্যতীত তারা, যারা হৃদয় এবং সর্বস্ব তাঁকে সমর্পণ করে প্রভুর সঙ্গে বিশেষ নৈকট্যে এসেছে।

এমন সব ঘোষণায় ভয় করে ওঠে বৈকি। বোধ হয় একটা বয়স থাকে যখন পাপ বলতে কাউকে মুখ ভ্যাংচানো, কারো মার্বেল চুরি করা, দু চারটে মিথ্যা কথা বলা, রাগের মাথায় কাউকে চাঁটি মারা–এমন সব বোঝায়। আর সে সব পাপের বিষণ্ন পিছন টানের তুলনায় ল্যাম্‌রোস্টের ডিনারের উজ্জ্বল উচ্ছল আনন্দের সম্মুখটান অনেক বেশি শক্তিশালী, ল্যামরোস্ট আর পীস পুডিং, আর সেদিন সকলেই ওয়াইন পেতো। সুতরাং একটা বয়স থাকে, যখন ছাত্রছাত্রী সকলেই কী চার্চে কী ফিস্টে হুড়মুড় করে যোগ দিতো। কিন্তু...

কিন্তু কত সহজেই আনন্দ কমে আসে, ভয় দেখা দেয়। সেবার অ্যালিস (তখনকার সেই ষোল বছরে সে তো জেনের হৃদয়ের বন্ধু, আর এখন, যদি সংবাদ সত্য হয়, তার এই ত্রিশে সে কম্পালসিব ডিভোর্সী) কমিউনিয়নে যাওয়ার সুন্দর নতুন পোশাকে ফ্যাকাশে মুখে নিজের ঘরে লুকিয়ে বসেছিল। জেন তাকে অনেক করে কমিউনিয়ন না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, বলেছিল, সে এক রাতে জুডিথের সঙ্গে ঘুমিয়েছে। জেন হাসল এখন। কিন্তু, জুডিথ সেই কমিউনিয়ন ফিস্টে সিনিয়ার ছাত্রী হিসাবে পাদরিকেও সাহায্য করেছিল মদ বিতরণে। আর সেবারের ফিস্টে, বোধ হয় তার পরের বছর, আইরিন দারুআলা, যে তখন প্রায়ই জেনের টেনিস–ডাবলসে পার্টনার, যে ছিল সব চাইতে হাসিখুশি আর উজ্জ্বল, যাকে কিন্তু সেই ফিস্টের তিন মাসের মধ্যে কনভেন্ট ছাড়তে হয়েছিল, কারণ তখন আর গোপন করাও যায় না, সন্তানের দরুন তখন সে চেহারাতেই বড় হয়ে উঠেছিল। কত সহজেই আনন্দ কমে যেতে থাকে। সংবাদ সত্য হলে, আইরিন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী পড়িয়ে বেশ নাম কিনেছে এখন।

এমন-সব ভয় ছাড়াও অন্য কারণও কি থাকে না? গত পাঁচ-ছ বছর অন্তত জেন নিজে সেই কমিউনিয়ন সাপারগুলোতে যায়নি লখনৌতে থাকলেও, এক চার্চ থেকে, অন্তত ডাকে, তার কাছে নোটিশ এলেও। প্রতিবারেই, ভেবে দেখতে গেলে, কোনো না কোনো বাধা এসেছে–হসপিটালের জরুরি কাজ, দূরে কোনো প্রাইভেট রোগী দেখতে যাওয়া।

জেন বিস্মিত হয়ে গেল। এমন কি হতে পারে, তার মনে একটা বাধা তৈরি হয়েছিল বলেই কাজগুলো জোগাড় হয়ে যেতো? নিজের এই প্রশ্নে অবিশ্বাস করে হাসতে গিয়ে সে বরং আরো বেশি অবাক হল।

সে বই থেকে চোখ সরালে। ভাবলে, অবশ্য, উনিশ পড়তে না পড়তে তারা অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছিল। সিনিয়ার কেম্ব্রিজ কোর্সের বায়োলজির জ্ঞানকে যখন মেডিক্যালের ফিজিওলজি পরিপূরক জোগাতে থাকে, তখন অলৌকিকে বিশ্বাস থাকে না। তখন রক্ত ও মাংস সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট ধারণা হতে থাকে, রক্তকে অলৌকিক ভয়ের বিষয় মনে না করে, বিশ্লেষণ করতে হয়। হসপিট্যালের বেডে এবং মর্গে উলঙ্গ স্ত্রীপুরুষকে চোখ মেলে দেখতে হয় প্রয়োজনে।

ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ায়, কলেজ ক্যান্টিনের অস্পষ্ট আলোর ঘরটাকে আবার সে দেখতে পেলে, যেন, যেখানে উনিশ-কুড়ির তারা কয়েকজনে। কমেডিয়ান খপ করে বলে বসল, দেখো, জেনেট, তোমার আর আমার রক্ত 'ও' গ্রুপের হলেও, তোমার রক্ত আর আমার রক্ত, যেমন ধরো, একটা মশার পেটে মিশছে মনে করে যতই কবিতা লেখো, যেহেতু ডি এন এ পৃথক, তোমার রক্ত আমার শরীরে কখনো অটুট থাকে? ব্লাড ট্রানসফিউশনে আমার সন্দেহ হচ্ছে। উনিশ বছর, অন্তু, আর কমেডিয়ান ছাড়া এমন আর কে বলতে পারে? আর এক দুঃসাহসী বললে, আদিকাল থেকে (সে উনিশেই মানুষের আদিযুগদ্রষ্টা) মানুষ রক্ত, অতীত, এমন সবকে অলৌকিক, যাদুযুক্ত মনে করে আসছে। সেজন্য নিজের যৌবন রাখার জন্য ড্রাকুলার যুবক-যুবতীর রক্ত খাওয়ার গল্প , কিন্তু যুবক-যুবতীর রক্ত অন্য খাদ্যের চাইতে বেশি কার্যকর নয়, রক্ত হজম না হলে রক্ত হয়? তৃতীয় একজন বললে, এখনো কিন্তু ষাঁড়, ছাগল ইত্যাদির মাংস-নির্যাস বোতলে বিক্রি হয়, আর কোনো কোনো ডাক্তার তা প্রেসক্রাইব করেন যেন তাতে ষাঁড়ের বলবীর্য সরাসরি শরীরে যাবে। এ থেকে তখনকার পাদরির ছেলে সুইনটারটন বলেছিল, পাপুয়া নিউগিনিতে এই সেদিনও মানুষ খেতো, সেও কিন্তু ম্যাজিক, যাকে খাচ্ছি তার গুণাবলী পেতে। এমন কি ধর্মেও এমন রক্তমাংস খাওয়া আছে। এই জায়গায় বোধ হয় মুলাটিয়ারই বলে উঠেছিল, ও মশায়, তা হলে হোলি কমিউনিয়নও কি তাই, কোন মহান পুরুষের রক্তমাংস খেয়ে তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করার আদিম পেগান রিচুয়াল?

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুক্তি, যুক্তি দেয়ার জন্যই তার মন ঘটনাটাকে সামনে এনেছিল, তাকে সাহায্য করলে না। ডিনারের তখন দুঘণ্টা দেরি। সে গলা তুলে বললে, থেনডুপ, আমাকে একটু কফি দিও। সে বরং উঠে পায়চারি করলে। এসব বৈজ্ঞানিক আলোচনার পরে সে কমিউনিয়নে যোগ দিয়েছেও বটে, না দিয়েছেও বটে। তা হলে এসব যুক্তির সঙ্গে ক্রমশ কমিউনিয়ন থেকে দূরে সরে যাওয়া যুক্ত নয়। সাইকোলজি পড়া না থাকলেও মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে সে। এমনকি ডাক্তারিতে জ্ঞান থাকলেও, মনে হতে থাকল মনটা বুকের কাছে থাকে মানুষের, কারণ সেখানেই মোচড়ানো ব্যথাটা হয়।

থেনডুপ, জেনের পছন্দ যেমন, ছোট সেই সুদৃশ্য সোনালি সবুজ কাপগুলোর একটিতে কফি আনলে তা নিয়ে বসে জেন সুস্থির হয়ে ভাববে স্থির করলে। আর তখন তার আবার মনে হল, বুড়ো নামগিয়াল কি করে বা জানলে আজ কমিউনিয়ন সাপারের রাত। তার কি কোনো ফর্মুলা জানা আছে যাতে সে তারিখটাকে কষে বার করে, নাকি ব্যাবিলনের মেষ-পালকদের মতো সেও তারা দেখে বলতে পারে সূর্য কবে কোন ক্রান্তি পার হয়। কে যেন বলেছিল, (সুইনটারটন?) খৃস্টজন্ম আসলে সূর্যের বাৎসরিক উত্তরায়ণ সূচনা।

কিন্তু এসময়ে তার আবার অভিমান বোধ হল।

তখন টিলাতে সে আর নামগিয়াল সেই স্বেচ্ছায় বেড়ে ওঠা ফুলফলপ্রসূ, পঞ্চাশ বছরেরও পুরনো চায়ের ঝোপটার পাশে, কথাও তো হচ্ছিল চার্চ নিয়ে। কথাটা নামগিয়ালই তুলেছিল। ক্লটলং-এর চার্চে এখন এমন-কি রবিবারেও চার্চের সার্বিস নেই। ক্রসবিদ্ধ খৃস্টের সেই বিরাট থাংকাছবিতে ধুলো পড়ছে, এক দিকে ইঁদুরে কেটেছে, এসব আলোচনাও হচ্ছিল। জন সে সময়েও কিছু বলেনি কমিউনিয়নের কথা। বরং হাঁ করে জেনের মুখের দিকে চেয়েছিল। জনের মুখে সামনের দুটোর দাঁত না থাকায় তার এরকম ভঙ্গি হাস্যকর দেখায়।

চার্চের সার্বিসে পাদরি দরকার, সে নিজে স্ত্রীলোক হিসাবে তা পারে কি? বাকি থাকে জন। কিন্তু সে বাইবেল পড়তে পারে না, এমন কি তার ব্যাপটিজম হয়েছে কি? কথাটা তখন জেন ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল ; আচ্ছা জন, তুমি ষাট-সত্তর বছর এই পাহাড়ে, তোমার ব্যাপটিজমে

কে পাদরি ছিল, কোথায় হয়েছিল তা, সেসব কি তোমার মনে আছে?

তখন জন মুখ তুলেছিল, তার মুখ উজ্জ্বল দেখিয়েছিল, সে বললে, ফাদার ক্রস্টাব পাদরি ছিলেন, কালিঝোরায়, এই তো সেদিন হয়েছে।

এখন এই কফির সামনে জেন হাসল। সত্যি কি তা ব্যাপটিজম? এই সেদিন বলতে কি সেই সময়ের কথা বলেছিল নামগিয়াল, যখন গ্রেগ নিজেকে সেন্ট এবং পোপের সমান পবিত্র ভাবতে শুরু করেছে? তা হলে হয়তো এমন হতে পারে গ্রেগ এক উত্তেজিত মুহূর্তে নামগিয়ালকে কালিঝোরার ঠান্ডা জলে চুবিয়ে ধরেছিল। এরকম ভাবতে পেরে জেন স্বগতোক্তি করলে, যেমন বুড়ো জন নামগিয়াল, তেমন কমিউনিয়ন।

৩

কিন্তু এ রকম হাসি ক্ষণস্থায়ী হয়। কফি শেষ করে বই খুলতে গিয়ে, ল্যাম্পটার নীচে কোমল নীলাভ অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করে বসল, জনের তবু তো কালিঝোরার জলে, তোমার?

প্রশ্নটাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বইয়ে পড়ার জায়গাটায় মন রেখে সে মনে মনে বললে, ডাকোস্টার মতো ডিসিপ্লিন–প্রিয় মানুষ যখন তাকে কমিউনিয়নে নিয়ে যেতেন, তখনই প্রমাণ হয় তার ব্যাপটিজম হয়েছিল। তা তো বটেই। যেমন সেই দু বোন চন্দনা আর চঞ্চলা, বারো থেকে ষোল যারা জেনের বিশেষ বন্ধু হয়ে উঠেছিল, যারা কলকাতার এক বনার্জি পরিবারের, অনেকদিনই কনভেন্টের লনের দূর কোণে বসে সে যাদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় আলাপ করতো গোপনে, গোপনে এজন্য যে কনভেন্টে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলা দণ্ডযোগ্য অপরাধ ছিল, তারা রবিবারে চার্চে যেতো, বাইবেলের ক্লাস করতো, কিন্তু কমিউনিয়নে কখনো নয়। এটাও একটা এসকেপেড জেনের, এই আইন ভেঙে দিনের পর দিন বাংলায় আলাপ করা, যেমন বিড়াল ধরতে ডানডাস হোস্টেলের গেবেলড রুফে ওঠা।

জেনের চোখ বই থেকে সরে গেল। সে আলোর বৃত্তের বাইরে তাকাল। তার ফলে আলো যেখানে অন্ধকারে মিশেছে সেখানে সেই দেয়ালটাকেই আবার দেখতে পেলে, যে দেয়ালটা এতদিনে পাথরের হয়ে যাওয়ার কথা, আর যাকে সে দশ বছরের আগেকার লখনৌতে রেখে আসতে পেরেছে মনে করেছিল। সে অবাক হয়ে গেল।

এই দেয়ালটার এখানে আসা উচিত নয়। যে দেয়াল ক্রমশ একটা স্বচ্ছ পর্দা শক্ত হতে হতে তৈরি হয়েছিল। এতো বোঝাই যায়, সেটা নিশ্চয়ই ঘটনা নয়, যে তাকে তার কনভেন্ট জীবনের প্রথম দিনেই, ভিজে ভিজে আলোর মধ্যে, একটা কাচের দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিল, যে দেয়ালটায় হালকা নীল মেঘের মতো কিছু চলে বেড়াছিল, আর যা থেকে এক হাড় কাঁপানো শীত উঠে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে দিচ্ছিল। একটা পর্দা, যেন স্বচ্ছ ধোঁয়ার কিংবা বাষ্পের, যা হয়তো দুটো পুরো দিন, দুটি পুরো রাতের নতুন জায়গার, নতুন মুখের ভয় ; নিজের সবকিছু, ভালোবাসা হারানোর কষ্ট ; ভ্রমণের ক্লান্তি, সুন্দর খাদ্যে সাজানো টেবলে কৌতূহলী অনেক অচেনা মুখ ; নতুন বিছানায় একা এক নতুন ঘরের রাত্রি ; ঘুমের ভান করে বালিশে মুখ গুঁজে রাখা, সকলে ঘুমিয়েছে মনে করে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে সেই নিঃশব্দতাকে দেখা–এমন সব কিছুতে তৈরি, যার ওপারে যেতে পারো না। তার পরে সেই পর্দা শক্ত হয়ে স্বচ্ছ কাচের এমন দেয়াল হয়েছিল, যেন স্তব্ধ হয়ে ওপারের দৃশ্য যা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, দেখে ফোঁপানো

যায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই দেয়াল নিরেট আর শক্ত হয়েছিল। জেনের মনে আছে সেটা, এক দুপুরে চন্দনা আর চঞ্চলার সঙ্গে কনভেন্টের লন পার হতে হতে হঠাৎ নেমে এসেছিল দেয়ালটা। আর জেন অবাক হয়ে দেখেছিল, ওপারে আর কিছু দেখা যায় না। সে কিন্তু দেরাদুন থেকে ডাকোস্টার সঙ্গে দ্বিতীয়বার ছুটি কাটিয়ে আসার পরে। এই শক্ত দেয়ালটা নেমে আসার পরে সে স্থির করেছিল, এতদিন এক স্বচ্ছতার ওপারে যা কিছু দেখেছে, সেই একটা বাড়ি যার হলুদ হলুদ দেয়াল, সেই একটি স্ত্রীলোক যে খুব আপন ছিল, যেন মায়ের মতো, সেই সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েরা যাদের কয়েকদিনের কী এক অদ্ভুত অসুখে শুয়ে থাকতে দেখা যেতো, সেই এক হলুদমুখ সাদা বিড়াল,–সে সবই স্বপ্ন। কত লেখক বলেছে, তারা পিছন দিকে তাকালে একটা অল্প আলোকিত টানেলের মধ্যে দিয়ে জীবনের প্রথম দিনগুলোকেই দেখতে পায়। তাদের হয়তো এরকম দেয়াল থাকে না। তারপর একদিন দেয়ালটা ভেঙে পড়ল। তার দরকারও ছিল না আর। ততদিনে যে স্বপ্নগুলো ওপারে থাকে বলে মনে হতো, তারা মুছে গিয়েছে। তা, দেয়াল তো ভাঙবেই। ডাকোস্টা না বললেও সে বুঝতে পেরেছিল, ডাকোস্টাকে সারা জীবন সে মম বলে গেলেও ডাকোস্টা তার জননী হয় না।

থেনডুপ এসে বললে, নামগিয়াল এসেছে, সময়ও, ডিনার কি দেয়া হবে?

জেন বললে, তা তো নিশ্চয়ই।

সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজেকে বলে নিলে, টেবিলের দিকে যেতে যেতে, সেই দেয়ালটা হয়তো মনের আত্মরক্ষার কৌশল, আর তা ততদিনই স্থায়ী দিবাস্বপ্নের মতো ছিল, যতদিন না সেই সময়ের দেয়ালের ওদিককার স্মৃতি স্বপ্নের মতো অলীক হয়ে মুছেও যায়। টেবিলে বসতে বসতে সে দেখলে নামগিয়াল এসেছে। আর সে ভাবলে, এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, সুইনটারটন যেমন বলেছিল, প্রকৃতপক্ষে এসবই বসন্তপূজা হতে পারে তো। বসন্ত-উৎসব যা সূর্যের সঙ্গে যুক্ত। আর সেই স্মৃতি তো এক হারিয়ে যাওয়া শিশুর।

সে দেখলে টেবলের ডান ভাগে সেই ট্রেটা, তার উপরে মোমগুলো জ্বলছে, ট্রের উপরেই তাসিলার তৈরি চার আনা দামের একটা গোল পাউরুটি, আর পুরনো সেই চ্যালিসের মতো চেহারার ওয়াইন কাপে খানিকটা লাল পোর্ট, টেবলের ঝকঝকে উজ্জ্বল গানমেটালের তৈরি ডবল ফিতের ল্যাম্পের তুলনায় সেই মোমগুলি, যা পুড়ে পুড়ে সামান্যই আছে, তা তখন লাল আর নিষ্প্রভ, কিন্তু তা হলেও তা যেন জেনের চোখের মণিতে গরম লাগল। তার রাগ হল যেন, এক অসাবধানে সাজানো টেবল দেখলে যেমন হয়। তার এরকমও অনুভব হল, এক অশিক্ষিত পাহাড়ি কেয়ারটেকার, যার ব্যাপটিজম হয়েছে কি না সন্দেহ, তাকে হীন প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

থেনডুপ যখন ডিনার আনতে শুরু করেছে, সে ভাবলে, না, না, ছি ছি, এতে এত বিচলিত হলে চলে কি? ডাক্তারকে নার্ভাস হলে চলে? অভ্যাসবশে নার্ভসগুলো শান্ত আর দৃঢ় করে নিয়ে সে দেখলে, ডোমটা পতপত করছে, নিববে মনে হচ্ছে। ভাবলে, তুমি তো অনেকদিন থেকে কমিউনিয়নের বিশ্বাস থেকে সরে যাচ্ছিলে, হয়তো নিজেকে পবিত্র মনে হতো না। সেজন্যই গত পাঁচ-ছ বছর তোমার সে তিথিতে নানা কাজ জুটে যেতো, তাছাড়া দেখো ওই রুটি যা থেনডুপ হয়তো পথের ধারের দোকান থেকে কিনেছে, আর যাকে তৈলাক্ত দেখাচ্ছে, তা নিশ্চয় স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তো, এই অশিক্ষিত আদিবাসীকে প্রশ্রয় না দাও, তার ছেলেমানুষের মতো মনকে আঘাত দিয়ে বা কী হয়?

সে বললে, আচ্ছা জন, আজ কি কোনো তিথি? হোলি কমিউনিয়ন নাকি? হেসে বললে আবার, আমাকে আগে বললেও তো পারতে, ল্যামরোস্টের ব্যবস্থা হতো।

ল্যাম? নামগিয়াল অবাক হল।

বাহ পাসওভার ল্যাম জানো না?

ল্যাম, মাদার?

জেন স্বস্তি ফিরে পেলে। তার আবাল্য অর্জিত ক্রিশ্চান সংস্কৃতি, তাও তো একটা অর্জনই, এক আদিবাসীর অন্ধবিশ্বাসের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত নয়। এরকম একটা অনুভূতি তাকে হীনমন্যতা থেকে উদ্ধার করে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিলে। সে উজ্জ্বল মুখে বললে, বাহ, তুমি কি জানো না? বাইবেলেব এক্সোডাসেই আছে। এক্সোডাস ১২...সেই সন্ধ্যা ছিল ১০ই নিসান মাসের এবং প্রত্যেক পরিবারই বাড়িতে এক বৎসর বয়স্ক এক ভেড়া বা ছাগ নিয়ে যাবে, যে ভেড়া বা ছাগ হবে পুরুষ এবং নিখুঁত, যাকে ১৪ই পর্যন্ত রাখা হবে। সেদিনের দুপুর আর সূর্যাস্তের মধ্যে তাকে হত্যা করা হবে পাসওভার ফিস্টের জন্য সেই পাসওভারের ল্যাম যাকে স্মরণ করে কমিউনিয়ন... অথচ মাটনের বদল চিকেন করেছে আজ থেনডুপ।

নামগিয়াল সেই ট্রের দিকে লজ্জায় মুখ নামালে, কিন্তু ট্রের মোমগুলো পতপত করে আবার সোজা সতেজ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার ফলেই যেন জেন নামগিয়ালের চাঁদের তিথি অনুসারে সারা বছরের তারিখগুলো হিসাব রাখার দক্ষতায় বিস্ময়াপ্লুতা হল। তার মনে এরকম প্রশ্নও উঠল, একি অলৌকিক কিছু ঘটে প্রমাণ করছে, সে ধর্ম থেকে, প্রার্থনা থেকে চিরকালের জন্য সরে গিয়েছে?

নামগিয়ালকে প্রফুল্ল করতেই যেন, তার উজ্জ্বল মুখ আলোকিত করে, তার বয়সকে সম্মান জানাতেই যেন, সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা নামগিয়াল, তুমি নিশ্চয় অনেক অভিজ্ঞ। কী মনে হয় তোমার, বলো তো। যদি কাউকে, ধরো আমার মতো এক মেয়েকে, চার-পাঁচ বছরে কেউ শেষ দেখে থাকে, পঁচিশ বছর বাদে আর একবার দেখেই কি সে তাকে চিনতে পারে? পারা যায়? যদি কেউ চিনিয়ে না দেয়?

পঁচিশ বর্স পিছাড়ি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিংবা জন, মনে করো, তোমার চার-পাঁচ বছরে কাউকে দেখেছিলে, তার পরে পঁচিশ বর্স তাকে দেখো নি, তার কথা শোনো নি, তার পরে তখন তাকে দেখলে কি চিনতে পারবে? বলো, পারা যায়? যদি বা তার হাতে পাশাপাশি দুটো আঙুলে দুটি বিশেষ ধরনের আংটি অথবা তার বিশেষ ধরনের সবজে রঙের চোখ, কেমন যেন আগে কোথাও দেখা, এরকম মনে হয়?

ভন্নু সকে না।

তা বলতে পারলে না, না হয়। কিন্তু কেমন অনিশ্চয় নয়? জানো জন, আচ্ছা এই অনিশ্চয় কি খুব কষ্ট দেয় না? আর তা ছাড়া, যা আমরা জ্ঞাতসারে করি না, তাতে কি আমাদের পাপ হয়?

কিছু যেন তখন জেনের মনের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, সেই কি এক যা তোমাকে শিকারির মতো অনুসরণ করে? তা ভয়। ভয় বিষের মতো টুপ টুপ করে সঞ্চিত হতে থাকে, মনকে অবশ করতে থাকে। ও গড, দাউ আর্ট মাই শেফার্ড, আই উইল নট ফিয়ার।

সে থেনডুপকে বলে বসলে, থেনডুপ আর একটা রুপোর চামচ দাও, আর একটা ওয়াইন কাপ।

কিন্তু যখন সেই রুপোর চামচে ট্রের উপরে রাখা ওয়াইন কাপ থেকে নিজের জন্য এক চামচ পোর্ট তুলে নিতে যাবে, তার হাত অচল হয়ে গেল।

যেন ডাকোস্টার সেই নোটিশগুলোকেই সে দেখতে পেলে মেয়েরা যদি শরীর থেকে অনুপযুক্ত হও, কমিউনিয়নে অংশ নিও না।

সে মুখ নামালে। এই যুক্তি শোনালে নিজেকে, অশিক্ষিত বুড়ো নামগিয়ালের, যে কেয়ারটেকার মাত্র, তার তারিখ ঠিক রাখার অলৌকিকপ্রায় দক্ষতার ভয়ে সে ভান করতে পারে না। তত নিচে

নামা যায় না। কী ভাববে কমিউনিয়নের মতো ওই পোর্ট আর ময়লা রুটির অংশ না নেয়ায়? ভাবুক না হয়, সে আজ মেয়েলিভাবে ময়লা হয়েছে।

মুখ লাল করে জেন বললে, নামগিয়াল চামচটা তোমার জন্য। আমি দেখেছি কমিউনিয়নে চ্যালিস থেকে ওভাবেই মদ তোলা হয়। তোমার অনুষ্ঠান তুমি করতে থাকো। ও, থ্যাঙ্কস আনটু হিম, হু গিভেথ আস আওয়ার ডেইলি ব্রেড। হ্যালোড বি হিজ নেম।

কিন্তু।

সেই পর্দা, অশ্রুজলের বাষ্পে আর খাকি পরা-পাগুলোর মধ্যে দিয়ে ভয় পেয়ে পালানো একটা বিড়ালকে খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে গিয়ে যে ভয়, তাতে তৈরি। যা সমবয়সী সঙ্গীদের পেয়ে মিষ্ক-স্বচ্ছ পর্দা থেকে ক্রমশ এক সময়ে পাথর দেয়ালের মতো, অপ্রয়োজনে তাকে উপেক্ষা করতে করতে তা কি ধ্বসে যাচ্ছিল আর তা খেয়াল করা হয়নি?

মুখের কাছে সুপের চামচ তুলতে তুলতে জেন ভাবলে, কিংবা সেই বিস্মৃতির দেয়ালে ফাটল ধরছিলই—যে সে ডাকোস্টার কন্যা হতে পারে না, যে জেন এয়ার উপন্যাসের নায়িকার নাম কোন জীবিত মেয়ের নাম হতে পারে না, আর সে রকম হতে থাকলে প্রাচীরের অন্য পারের জন্য কৌতূহল হতে থাকে আবার।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পঁচিশ বছর পরে কেউ কি কাউকে চিনতে পারে? বিশ্বাস করো, কারো মুখ পাঁচ বছরে দেখে পঁচিশ বছর কেউ মনে রাখতে পারে না। সেই হতভাগিনী মেরিয়ান রয় যার পুরো জীবনটা চিরদিনের জন্য ডাকোস্টার সেই মাকড়সা-ঘরে ধুলোঢাকা ফাইলে বন্দী, সে কি সত্যি কারো জননী ছিল? ম্যাকডুগাল যার ব্রেনটিউমার সরাতে গিয়ে পাপের স্মৃতিও তুলে দিয়ে থাকবে?

গোপনে আঙুলের ডগায় চোখ মুছলে জেন।

৪

তিন চারদিন পরে সকালে বেডটি নিয়ে বসে—সে নিজেই চা করে নিয়েছিল, কারণ থেনডুপ ঝব্বুতে মাল নিয়ে কোথাও গিয়েছে ছুটি নিয়ে—তার মনটাকে ভার বোধ হল। সে ভাবলে অবশ্যই রাতের ঘুমটা ভালো হয় নি, কারণ কাল এপ্রিলেই হঠাৎ মে মাসের মতো গরম লাগছিল। রাগ ফেলে ঘুমিয়ে ভোরে আবার ঠাণ্ডা লেগেছে। তেমন গরম লেগে ওঠার একটা কারণ এই হতে পারে, ডিনারের পরে শোবার ঘরে হঠাৎ যেন হুইস্কির উত্তেজনা ভালো বোধ হওয়ায় তা খেয়েছিল। সে সময়ে শুয়ে শুয়ে হিসাব করেছিল, ইস্টার উপলক্ষ্যে তাসিলার কিছু সংখ্যক অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাকে চার্চে এনে খাওয়ালে কী রকম হয়। তারা তো মেলার উৎসবের প্রান্তে পড়ে থাকে।

সে যাকগে, সে ভাবলে ব্রেকফাস্টের পরে অ্যানালজেসিক খেয়ে নিলে হবে। কিন্তু ব্রেকফাস্ট আজ তাকে নিজে তৈরি করে নিতে হবে।

সে উঠল। তখন সে বেশ ঠান্ডা ভাবে সে ভাবলে—যেন সাইকোসোমাটিক গবেষণা। সেই দেয়াল যা মনের আত্মরক্ষার চেষ্টা, নীরোগ হতে বিস্মৃতি, ট্রমা থেকে পলায়ন। নতুবা শুধু ডাকোস্টাকে মম বলতে পেরেই কেউ নীরোগ হতে পারে না, নতুবা স্মৃতি দেয়ালের অন্যপারে আবার দেখা দেয়?

তখন তো সে ইন্টার্নি হয়েছে হসপিট্যালে। জেন এয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত। হসপিটাল স্টাফ কোয়াটার্সে,

জুনিয়ার হোস্টেল, সিনিয়ার হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের অবস্থানগুলো পার হয়ে হয়ে কতদূরে। মনের মধ্যে অনেক কাল কাটিয়েই যেন যা অন্ধকার-অন্ধকার বাদামি হয়েছে সে রকম এক হলুদ রঙের ফ্ল্যাটে ; যাকে মাঝে মাঝে দেখা স্বপ্ন বলে মনে হতো, সেই ফ্ল্যাট যেখানে তার স্বপ্নের বিড়াল একদিন খাকি ট্রাউজার্সের সোজা সোজা সন্নিবিষ্ট পিলারের ফাঁক গলিয়ে কোথায় যে পালাল। যে ফ্ল্যাটে তরুণী সব মেয়েরা কোথা থেকে আসতো, আর একটা ছোট মেয়ে, স্বপ্নে যে সে নিজে হয়ে যাদের সঙ্গে কথা বলতো, পরে যারা কোথায় চলে যেতো।

সেদিন এর্মাজেন্সিতে হুইলড স্ট্রেচারে এক রক্তাক্ত স্ত্রীলোক। স্ট্রেচার চলতে চলতে টমলিনসন ইনজেকশন দিলে, গাইনি বলছে ড্রিপ ড্রিপ। নার্স ইনডোরে ঢুকবার পথ থেকে এমার্জেন্সি থেকে ঢুকে আসা কৌতূহলী দর্শকদের ভিড় সরাচ্ছে। আর কল পেয়ে সেও নেমে আসতে আসতে সে ভিড়কে ধমকে বলেছিল, সরুন, সরুন, কী দেখবাব আছে, কোয়াকদের অ্যাবর্শন, দয়া করে সরুন, প্রাণটা বাঁচাতে হবে। মেডসিনের স্পেশ্যালিস্ট সে, চলন্ত স্ট্রেচারের পাশে চলতে রোগিনীর নাড়ী ধরেছিল। আর ঠিক তখনই...সে যেন সেই স্বপ্নে দেখা ফ্ল্যাটে এক দরজার পাশ থেকে দেখেছিল, বিছানায় এক রক্তাক্ত তরুণী যার স্থির স্তব্ধ আড়ষ্ট শরীরের উপবে এক বয়স্ক পুরুষ আর তেমন এক স্ত্রীলোক কেন যে তেমন কাঁদছে!

সে কিচেনে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবলে দূর করো, সে সবই সে পিছে বেখে এসেছে। বালকও বুঝতে পারে, তোমার স্মৃতিতে জেগে ওঠা সেই ফ্ল্যাটে তোমার স্মৃতি অর্থ না বুঝেও একটা দুর্ঘটনার চিত্রকে ধরে রেখেছিল, আর অনুরূপ চিত্র দেখতে পেয়ে স্মৃতির ছবির অর্থ ধরা পড়েছিল। হয়তো স্মৃতি সেই দুর্ঘটনাকে এক অর্থহীন কুণ্ঠিত পাপবোধ করে রেখেছিল, রক্ত, কান্না, পুলিশের ট্রাউজার্স আর বিড়াল হারানোর ট্রমাকে, সে পাপবোধ ক্রমশ কমিউনিয়ন সাপারে যেতে অমনোযোগী অনিচ্ছুক করছিল ক্রমশ।

ব্রেকফাস্টে ইস্টারের কথা না তুলে, সে নামগিয়ালকে বললে, চামলিং-এর দেশ কী রকম বা? সীমান্তে পাহারা নেই বলছিলে তুমি। ওপারের লোকেরা সত্যি যাওয়া আসা করে?

নামগিয়াল বললে, তা তো যায়ই। খানিকটা গিয়ে ন্যাড়ান্যাড়া পাহাড় এক সীমান্ত হয়ে আছে। তার পরেই ন্যাড়া শুকনো মাটি, তা পার হয়ে প্রথম গ্রাম। আজই তো থেনড়ুপ গিয়েছে ঝব্বুতে মাল নিয়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েও যায়। যেমন ঝব্বুর দড়ি ধরে থেনড়ুপের ছোট মেয়েটাও যায়। নুন যায়, চিনি যায়, চাল গম যায়।

জেন বললে, গেলে হয় একদিন সেই সীমানা পাহাড়ে, দূর থেকেও গ্রামগুলোকে দেখা যায়। নামগিয়াল বললে, কিন্তু মাদার ওপারে গুটি হচ্ছে শুনেছি।

বাহ্, জেন হাসল, চলো আজই। আজ ভালো দিন। ডাক্তারেরই দরকার তো। চিকিৎসাও ভালো কাজ নয়?

পাহাড়ের গায়ে গায়ে, পরে দুই চূড়ার মধ্যে এক গলিপথে চলে তারা এক ক্রমশ উঁচু হয়ে যাওয়া পাহাড়ে এসেছিল। এই উঁচু পাহাড়টাই যা ক্লুটলং থেকে আধঘণ্টা চলে পাওয়া যায়, তাই সীমান্ত-প্রাচীর, যা সম্ভবত মেঘবাহী বাতাসকে বাধা দিয়ে উঁচুতে ঠেলে দেয়। ফলে, তারা সেই পাহাড়টার এক নিচু খাঁজের কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, সেই পাহাড়টার ওপারে প্রকৃতি রুক্ষ্ম, গাছপালা নিতান্ত কম, পরিত্যক্ত জুমচাষের মাটি জলের অভাবে শীতের শেষে ধুলো ধুলো। সবুজ টুকরো টুকরো ছড়ানো, গেরুয়া, বাদামি ইত্যাদি বেশি। দূরের পাহাড় লালচে বাদামি, বেগনি, যতক্ষণে আরও দূরের পাহাড় নীল। আকাশে তখনও নীলের নানা অনুপাতে সকালের লালচে দাগ টানা। হয়তো দেখতে সুন্দর, কিন্তু জেনের মনে হল কী দরিদ্র পৃথিবী!

সে বললে, এই খাঁজে গিয়ে পাহাড়টাকে ডিঙিয়ে ওই অন্যদেশে যেতে হয়? চলো, এখান

থেকে ফিরি।

আর একটু দেখে নেয়ার জন্য সে চাবিদিকে চাইল। আর তখনই সে প্রথম দেখতে পেলে, নিচে আর কিছুটা দূরে, যাকে পথ বলে মনে হয়, তার ধারে ধারে যেখানে কিছু সবজে ভাব সেখানেই যেন মেষপাল, আর কালো কালো তাঁবু। সেই গেরুয়া বাদামি মাটি, বেগনি লালচে পাহাড়, ক্রমশ দূরে নীল, যার উপরে লালচে সমান্তরাল দাগ টানা সাদা আর নীলে মেঘভাসা আকাশের নিচে কালো তাবু আর ভেড়ার পাল। হঠাৎ মনে হল জেনের যেন সে চেনে। সে মনে মনে বললে, কারো আঁকা লিভান্টের ছবি।

সে বললে, জন, এগুলো কি মেষ?

জন তার পাহাড়ীতে বললে, হ্যাঁ, মাদার, ভেড়া, এরা ভার বয়। এদের কোন কোন মেষপালকই অসুস্থ।

ফিরতে আরম্ভ করে সে তাঁবুগুলোকে দেখতে মনে মনে যেন বাইবেলের জগতে চলে গেল। লিভান্টই নয় কি? যেখানে ওলড আর নিউ, দুই টেস্টামেন্টের ঘটনা ঘটতে থাকে। সে যেন ছবি দেখে তৃপ্তি পেয়ে হাসল।

কিন্তু সেই সীমান্ত-পাহাড় থেকে নামতে নামতে সে বললে, আচ্ছা, জন, ঠিক করে বলো তো, তোমার কি কখনও কখনও ভয় করে না? কখনও করে না?

নামগিয়াল বুঝতে পারলে না, কাকে ভয়, কেন ভয়। সে চারদিকের খোলা প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে এতটুকু দেখে যা অনুভব করলে, সে ভাবলে, তাকেই ম্যাডাম ভয় বলছেন?

কিন্তু জেন ফ্যাকাশে মুখে বললে, চার্চের সেই থাংকা...আচ্ছা...। থাংকা?

নামগিয়ালের মনে চার্চের সেই বিরাট থাংকাটা ভেসে উঠল। সিল্কের কাপড়ে রঙিন পশমের আর সিল্কের। কাপড় বসিয়ে অতিমানুষ-প্রমাণ যিশুর ক্রশবিদ্ধ মূর্তি যা নিশ্চয়ই গ্রেগরী ব্রুস্টার সীমান্তের ওপারের শিল্পীদের দিয়ে করিয়েছিল, এখন যা ধূলিমলিন, অংশত কীটদষ্ট।

কথাটা বলতে বলতে জেনও ভাবলে, আশ্চর্য কিন্তু, থাংকাটা তৈরি হয়েছে এদেশে, অথচ দেখো গগ্যাঁর সেই ক্রুশিফিকশনের কথা মনে করিয়ে দেয়। বোধ হয় সরল ধর্মভাবের প্রকাশ, কী ফরাসী দেশের ব্রিটানি অঞ্চলে, কী ভারতের এই উত্তর সীমান্তে, একই রকম হয়।

জেন বললে, হ্যাঁ, ক্রাইস্টের সেই থাংকা, ভয় করে না সেখানে বসে?

ভয়, মাদার?

জেন হাসার চেষ্টা করলে, আচ্ছা, তুমি ভেবে বলো, জন, কেমন একটা ভয়-ভয় নয়? তুমি তো সেই গল্প জানো, জন, যখন ইডেন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হল। খুব কষ্টের তা। কিন্তু, ভেবে বলো, দূরে সরে এসে একটা ভার কমে যাওয়ার ভাবও ছিল না কি সেই অ্যাডাম আর ইভের? যারা নাকি আমাদের আদি। সব সময়ে কী হল কী হল ভয়, তা কিন্তু ছিল না বোধহয় আর, মানে, সেই পতনের পরে। বিষণ্ণ, খুবই বিষণ্ণ বোধ হয়। কিন্তু তা কি সব সময়ে ভয়ে আড়ষ্ট থাকার চাইতে ভালো নয়? বলো, ভালো নয় দূরে যাওয়া?

জন সব বুঝলে কিনা এই অদ্ভুত মুক্তির অর্থ, তা তার মুখ দেখে বোঝা গেল না, যেমন পাহাড়গুলোকে দেখে তাদের অব্যক্ত আবেগ বোঝা যায় না। সে নিজেকে প্রথমে কপালে, পরে বুকে ক্রস করলে।

আর জেন চলতে চলতে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলে, সেই দেয়াল, সেই ফাইল, সেই পবিত্রতা, সবই সে লখনৌ রেখে এসেছে। কেমন, পারেনি? দেখো, স্টেথস্কোপ ছাড়া আর কিছু আনে নি সে লখনৌ-এর, সে-সব কমিউনিয়নকেও পিছনে রেখে...সে হেসে বললে, তোমাকে একটা ধাঁধা বলি। যখন অ্যাডাম গর্ত খুঁড়ে শস্য লাগাতো আর ইভ কাপড় বুনতো, তখন কে ভদ্রলোক

ছিল? অ্যাডামের বোধ হয় চার্চও ছিল না।

সে রাত্রিতে বিজ্ঞানের, বিশেষ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথাই মনে হল জেনের। লাঞ্চে থেনড়ুপ এসেছিল। সেই জানালে, সীমান্তের ওপারে গুটিতে একজনকে পথের ধারে মরে পড়ে থাকতে সে দেখেছে। সে সময়েই জেন যথেষ্ট ভাবতে শুরু করেছিল। সীমান্তের ওপারের লোকজন এপারে আসে। নতুবা পাশাং কি করে তার এখানে আসার প্রথম দিনেই, সেই পনি এনেছিল, নতুবা চামলিং কি করে আসে? থেনড়ুপ আজই গিয়েছিল। যে পক্সে মানুষ পথের ধারে মরে তা তো সেই ভেরায়লারই নতুন কোনো স্ট্রেইন হতে পারে, যখন আমরা ভাবছি পৃথিবী থেকে তাকে নির্বাসিত করা গিয়েছে। আর এখানে সে রকম রোগ ছড়ালে চিকিৎসা করা কঠিন, দুঃসাধ্য বলা যায়।

তার ঝোঁক হল ভেরায়লা সম্বন্ধেই পড়বে।

আশ্চর্য নয় যে মানুষ যখন ওপেন হার্ট-সার্জারি, হার্ট–ট্রানস্প্লান্ট, নিউরোসার্জারি, ডি এন এ. এঞ্জিনিয়ারিং করছে তখন ভাইরাসের সঙ্গে পারছে না? ঘোষণা করেছে ভেরায়লা নিশ্চিহ্ন... এমনকি স্কাল খুলে ব্রেন সার্জারি,...এমন কি মানুষ যখন ভয়ে দিশেহারা (জেন ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল)...কিংবা বিষাদে, কিংবা ডিপ্রেশনে...যখন ভেজিটেশন, গাছপালা শৈবাল-হেন জড়...যখন মনস্তাত্ত্বিকেরা হার স্বীকার করেছে...তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রেগের নিজেকে সেন্ট এবং পোপ মনে করা স্কিটসোফ্রেনিয়া...না কঠিন নয় নিউরোসার্জারি... স্কালে ড্রিল করে ইলেকট্রোড বসিয়ে...সাইকোসোমাটিকের কোর্সে স্পেশালাইজ করলে হয়...সে সব তো, দেখো, সময়ের সেই স্রোতটার বাইরে নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে...দেখো এই গুড ফ্রাইডে, ইস্টার মানে এই তিথিগুলো যেন সব পাক...

ধড়মড় করে জেন সোজা হয়ে বসল। তার সমস্ত মুখ ঘামের বিন্দুতে ভরে গেল। সে জিজ্ঞাসা করে বসল তার চারদিকের ঘরের দেয়ালগুলোকে, তা হলে সে কি প্রকৃতপক্ষে নির্বাসিত?

বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, পঁচিশ বছরে চেনা যায় না, বিশেষ সে মুখ যদি যন্ত্রণাতে বিকৃত থাকে, টিউমারের ফলে যদি কারো দৃষ্টি মৃতের মতো স্থির আর বিস্ফারিত থাকে। তার ভয়ের এই যুক্তির সামনে সে ফোঁপাতে লাগল। তার চোখে জল এল। কিন্তু তা বিস্ময়ের ; সে বলতে পারবে না, কেন সে অশ্রু।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১

ব্রেকফাস্টের আগেই ক্লটলং-এর সেই টিলার উপরে দাঁড়িয়ে জেন ভাবলে, তাসিলা নামে এই শহর পথঘাট স্থাপত্য হিসাবে অষ্টাদশ শতকে আবদ্ধ বলা যায়। কয়েকটি উজ্জ্বল সুন্দর বাড়ি, কয়েকটি বাঁধানো পথ, আর সবই ছোটছোট কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণের বাড়ি। তার এই চলে আসা, সভ্যতর দেশ থেকে এই পিছিয়ে থাকা দেশে-- তাও অষ্টাদশ শতকের মিশনারী অভিযানের মতোই হয়েছে। অষ্টাদশ শতক থেকেও পিছিয়ে যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। এখন সেন্ট টমাসের যুগেও ফেরা যায় না। সেই টমাসের কথায় জেন মনে মনে বলল· ও লর্ড, মেক মি এ সেন্ট। বাট নট ইয়েট।

তারা পরনে খাটো ঝুলের চেক শার্ট, গায়ে হালকা পশমের লেবুহলুদে হালকা মেরুনডোরা ব্লাউজ। নিচু হিলেব জুতো। মাথায় বাঁধা সোনালি রুমাল। সে যখন নিচু হয়ে শাক তুলছিল তখন হালকা-হলুদ সূর্যের আলো তার পিঠে পড়ে তাকে আরাম দিচ্ছিল। শাক তোলার এই অর্থ, চার্চের সেই পঞ্চাশ একর জমিতে ধাপে ধাপে এখন কৃষির সূচনা হচ্ছে। দূর থেকেই বোঝা যায় পাহাড়ের ঢালটায় বরাবরই ধানচাষ হতো। একেবারে উপরে উঠে কিছুটা উপত্যকার মতো হয়ে আবার ধাপে ধাপে নেমেছে। গ্রেগ এই জমিতে বার্লি চাষ করতো। কেন? বাইবেলে গমচাষের কথা বলে না? জমিটার অধিকাংশ কাঁটাঝোপ, লতানো পাহাড়ি ঘাস, দু-তিনটে শিমূল, একটা বার্চ, দুটো ক্যাশিয়া জাতীয় ফুলগাছ। আর একটা ঢালে খানিকটা জায়গায় চার-পাঁচটা অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো, মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া চাগাছ।

টিলার সে গেরুয়া-হলুদ মাটিতে রসের অভাব নেই। গাছগুলো প্রমাণ করে তা। এতদিন থেনডুপ আর নামগিয়াল কী সঙ্কোচে জমিটায় চাষ করে নি। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে দুই বুড়ো ধাপে ধাপে কিছু চারা লাগিয়েছিল। স্কোয়াশ, বাটার–বিন, লেটুস, পাহাড়ী শশা, এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে। সে একগোছা রাইশাক হাতে পিঠ সোজা করে উঠে দাঁড়াল।

তার নিজের হাতে শাক তোলা প্রয়োজন নয়। ব্যাপারটা দৃঢ় এই মাটিটাকে স্পর্শ করায় যা পাওয়া যেতে পারে তাই, এক রকমের সুখবোধই। সে সেরকম দাঁড়িয়ে সকালের তাজা রোদে চারদিকে দেখল। সে তো বেশ খানিকটা উপরেও উঠেছে। সে জন্য চারিদিকেই অনেকটা দূর দেখতে পাচ্ছে। নানা জায়গা থেকে তা হলে তাসিলার শহরের নানা অংশও চোখে পড়ার কথা। আর যা চোখে পড়ে তাতেই অষ্টাদশ শতককে মনে করিয়ে দেয়। সে আরও দু-এক ধাপ উঠল, ফলে ডাইনেই সরল খানিকটা, তার চোখে মুখে রোদ পড়ল। ফলে চোখকে সেই উজ্জ্বল আলো থেকে আড়াল করতে তার উপরে হাতের তেলোর বারান্দা বানালে।

ওটাই মেয়র-বাংলো নাকি, যা একবার কাছে থেকে সে অফ সিজনে রোদ পোয়াতে ব্যস্ত একটা নির্জন পাহাড়ী হোটেলের মতো দেখেছিল?

সেই রোদে, হাতের আড়াল সত্ত্বেও, তাকে চোখ পিটপিট করতে হল, এমন কি তার গাল স্বচ্ছ আর লাল দেখাল। থেনডুপ গোরুদুটোর পাশে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তা দেখে তার মনে পড়ল,

এই শাক তুলতে আসার পথে থেনড়ুপ বলছিল, আরো একজন মেষপালক গুটিরোগে মরেছে। একটা কালো পুরনো ছাগললোমের তাঁবুতে তাকে রেখে তার সঙ্গীরা চলে গিয়েছিল। মরেছে পাশাং-চামলিংদের সেই গ্রামের পাশে। পাশাং-এর সেই স্ত্রী তার হাঁড়িতে কয়েকবার বার্লি-চা ঢেলে দিয়ে এসেছে, যতক্ষণ প্রাণ ছিল।

এই ভেরায়লা ভাইরাস কিন্তু সীমান্ত পার হতে পারে। মানুষই তাব বাহন। তার সীমান্ত পার হয়ে মানুষজন যাতায়াত করছেই। এখন তো জানাই গেছে, ওটা তাসিলাব একটা জীবিকা--ওই সীমান্তের ওপারে মাল পৌছানো। এসব বিষয়ে কিন্তু, সব শহরেই, যদি কিছু কবার থাকে, তা মেয়েরেরই।

ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল। দূব থেকে রেশটা এল। ঘড়ি দেখলে সে। পৌনে আট। এখনও পনের মিনিট বাকি? কীসেব? সে হেসে ফেলল। এখানে হোস্টেল কোথায় যে তার ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা বাজবে? হোস্টেল তো এক যুগ আগেকার বিষয়। কিন্তু ঘন্টা আবার বাজল। ও, নামগিয়াল বুড়ো সে জন্যই আসে নি। রবিবারে চার্চ প্রার্থনায় যেতে ডাকছে। আজ চার্চের সব জানালা দরজা খুলে দেবে, যদিও ধুলো ওর ক্রনিক ব্রংকাইটিসের পক্ষে..

থেনড়ুপ সকালেব চা দিলেই সে বলেছিল, ব্রেকফাস্টের আগেই, চলো, স্কোয়াস, শশা, আর বিনের লতাগুলোকে আর শাকগুলোকে জল খাইয়ে দিই।

এখানকার জল সংগ্রহও একটা মজার ব্যাপার। প্রাকৃতিক আর্টিজিয় কূপের ব্যাপার। ভূস্তরে ভূস্তরে চলে আসা জমাট জল তার এই টিলাটার সুরকি রঙের গা ফুটো করে বেরিয়ে চোঁয়ায়। বাংলোর দিকে রাস্তা সমতল করতে পাহাড়ের গা খানিকটা কাটার ফলেই ওই জল চোঁয়ানো গর্তটা দেখা দিয়েছে। জল চুঁইয়ে দু-তিন ইঞ্চি গভীর, হাত দেড়েক চওড়া একটা ঝর্না ঢালটার গোড়া দিয়ে বয়ে যায়। একটা সরু বাঁশের চোং বসিয়ে দিয়েছিল থেনড়ুপ সেই গর্তে, আব তা দিয়ে ক্ষীণ ধারায় কিন্তু ট্যাপের মতো জল পড়ছিল। প্লাস্টিকের বালতিতে জল ধরে ধরে উপরে সে জল দিয়েছে তারা। এখনও থেনড়ুপ সে ভাবে জল দিচ্ছে। জল নিয়ে পাহাড়ের ধাপে ধাপে ওঠার পরিশ্রম আছে। সে বিশ্রাম করতে কবতে বেছে বেছে শাকের পাতা কেটে নিচ্ছিল।

জলের বালতি নিয়ে পাহাড়ে উঠতে পোশাক আঁটশাট করতে হয়। এখানে হেয়ার ড্রেসার নেই। নিজে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে চুল ছোট রাখতে হয়। কৃষির জন্য শর্টস পড়তে হলে চুল ছোট রাখতে হবে। অন্য দিকে গ্রাম্য কৃষকরমণীর বোধ হয় বড় চুলের খোপা থাকে। তা হলে সে কি, যেমন সে শর্টস পরছে না, চুলকেও সে বকম পরবে, যেমন ঠাকুমার মায়েরা পিঠ ঢেকে পরতো?

মন্দ নয় এই ঘণ্টার শব্দটা। বাতাসে ভাসছে, উঁচু নিচু হচ্ছে। কিন্তু কৌতুকের, নামগিয়াল নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ যাবে না চার্চে। ও, তা, কৌতুক শব্দটা এক্ষেত্রে খুব হালকা হয়। থেনড়ুপ জল নিয়ে উঠে আসতেই সে বললে, এবার তুমি গোরুদের কাছে যাও। দুধ দোহাও। আমি আর দু বালতি জল এনে লতাগুলোকে আর একটু জল দিই।

সে শাক বাস্কেটে রেখে, বালতি হাতে নিচের দিকে নামলে। চওড়া চওড়া ধাপের মতো করে কাটা কাটা পথে ফুট পাঁচ-ছয় নেমে, তেমন ফুট পাঁচেক নামতে হবে পাকদণ্ডির পথে। সেই পথই আরও নেমে গিয়েছে সেই জলের উৎস পেরিয়ে। যে বালতিটা বাঁশের চোং-এর নিচে বসানো ছিল সেটা ভরে উঠেছে। সেটাকে সরিয়ে খালি বালতিটাকে বসিয়ে দিলে সে।

জল নিয়ে উঠতে উঠতে, সে, চারদিকে উজ্জ্বল এখন ক্রমশ কঠোর হচ্ছে, এমন রোদকে অনুভব করলে। যেন একটা ল্যান্ডস্কেপ চোখে পড়ল তার। এক মিনিট ওঠা থামিয়ে সে সামনে বাঁয়ের দিকে লক্ষ্য করলে, সেই ল্যান্ডস্কেপটার সঙ্গে মিলিয়ে আর একটি কৃষক ফ্যামিলির ছবির স্মৃতি মনে এল তার। তা হয়তো কোন ক্লাস– রীডারে ছিল। বেশ লম্বা চেক ফ্রককোট পরা, স্থূল হয়ে

যাবে, এমন এক কৃষক দেখতে পেলে যেন, যার মুখে সাইডার কিংবা হোয়ে, ঘোলের দরুনও হতে পারে টকো গন্ধ। ফস ফস শব্দ করে কাদার পাইপ টানে কড়া তামাকের। জল নিয়ে উঠতে লাগল সে।

বালতিটাকে থেনডুপের কাছাকাছি নামিয়ে সে একটা পাথরে বসল। মাথার রুমাল খুলে কপালের ঘাম মুছলে, হাতদুটোকে মুছে নিলে, রুমালটাকে আবার মাথায় বাঁধলে। তা, এই পঞ্চাশ একর পাহাড়ি জমি, যাতে কখনও ট্র্যাকটর উঠবে না, উঁচু নিচু ধাপে কাটা, এই এত জমি, একে আমার তো মনে হয়, চাষে রাখতে বেশ লম্বা চওড়া কড়া পুরুষ ছাড়া পারে না।

জলটা দেওয়া হয়ে গেলে, খালি বালতি নিয়ে সে নামতে শুরু করলে। তো এ বেলার মতো যথেষ্ট হয়েছে। এখন ব্রেকফাস্টের কথা ভাবতে হয়।

ফোয়ারার নিচে বালতি বসাতে বসাতে, সে ঝলকানিতে চমকে একটা বন্দুকের শব্দ শুনতে পেল। সে দিকে মন দিতে গিয়ে তার খেয়াল হল, এরকম, কিন্তু তা এত স্পষ্ট নয় যদিও, শব্দ আরও দু-একবার এসেছে যেন। ভরা বালতিটা, এটাই শেষ, তুলতে গিয়ে মনে হল, এটা, কিন্তু, সীমান্তই বলতে হয়। সে ধাপে ধাপে ভাবতে লাগল, শব্দটা– মানে সীমান্ত... ওদিকে দ্বীপও হলেও পনি নিয়ে পাশাং, চামলিংকে নিয়ে পাশাং-এর স্ত্রী–পাঁচদশ বছর আগে ওষুধ দিতো– এই গুজবের খবরে আসে, থেনডুপ ঝব্বু নিয়ে যায় ওপারের গ্রামে মাল পৌছে দিতে, এমন কি থেনডুপের এক ছোট মেয়েও নাকি সে রকম।

এবার কিন্তু পণ্যের মতো ভেরায়লা এসে যেতে পারে।

কী আশ্চর্য, একজন মেয়রের, যদি মেয়র থাকেই, এসব বোঝা উচিত নয়?

আবার ঘণ্টা বাজল, দেখো। নামগিয়াল রবিবারের সকালের প্রার্থনা শেষ করলে তা হলে।

জেন চমকে উঠল। পাকদণ্ডিতে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, যেখানে তার মনে হল, এবারের এই বন্দুকের শব্দ, কী আশ্চর্য, তার সামনে, মানে ক্লুটলং-এর উত্তর-পশ্চিম সীমার ওপারে যে একটা রিজ সে দিক থেকে এল। সে উত্তর-পশ্চিমে ক্রমশ উত্তরে উঁচু হয়ে যাওয়া বনে ঢাকা রিজটার দিকে চেয়ে রইল। এমন কি বালতিটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলে। এ পর্যন্ত কোন বাইরের লোককেই বা সে ক্লুটলং-এর এত কাছে আসতে দেখেছে!

কিছুক্ষণেই সে দেখতে পেলে, ওপারের রিজ থেকে নেমে তারা ক্লুটলং থেকে তাসিলা যাওয়ার পথটার উপরে নামতে চেষ্টা করছে। ক্রমে তারা পথটায় নেমে দাঁড়াল। তারা চারজন। চারজনের তিনজনই বেশ লম্বা। দুজনের পিঠে বন্দুক ঝোলানো। মে মাস, সেজন্যই হালকা আর রঙীন পোশাক। লম্বা তিনজনের উচ্চতাতেও তারতম্য। একজন তো ছফিটের উপরে, আর তার জামাটাও চোখে না পড়ে পারে না, এমন লাল। তার গলার কাছে রক্ত ছলাৎ করে উঠতেই, সে বাকি পথটুকু তাড়াতাড়ি উঠে, থেনডুপের কাছে গিয়ে বালতিটাকে নামালে। সে বললে, এ বেলার মতো এতেই শেষ করো।

কিন্তু সে দেখলে, এখান থেকে আরও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যেন। সব চাইতে পিছনের অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটির হাতে, মনে হচ্ছে, বেশ কিছু শিকার করা পাখি।

তার ধাপটার উত্তরপশ্চিম কোণে একটা ছোট বার্চ। সে এগিয়ে বার্চটার গায়ে, হাত দিয়ে দাঁড়াল। চারজন মানুষ কি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে? ও মাদার অব সেন্ট! গায়ে টকটকে লাল জামা, যাতে রোদ পড়েছে, হলুদ লাগছে গায়ের রং, গুড গ্রেশাস, পিঠে রাইফেল, আবার ইম্পিরিয়াল দাড়ি নাকি? তুমি বলতে পারো না। এদের কেউ মেয়র কি? একদিন কিন্তু কারো দাড়ি ছিল না। আর অন্ধকারে কারো গায়ের রং কেউ বুঝতে পারে না। সত্যি কি এদেরই একজন মেয়র? সব চাইতে লম্বা, ইম্পিরিয়াল দাড়ি, টকটকে লাল জামা। সে বার্চটার এক গোছা পল্লব নুইয়ে মুখের

রোদটাকে আড়াল করলে।

পাহাড়ি পথ। কিছু দূরে প্রথম বাঁকটায় তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। সে থেনডুপের দিকে এগিয়ে বললে, তুমি কি দুধ নিয়ে নামবে? আমি বরং কিচেনে যাই।

জেন নামতে শুরু করলে তার বাংলোর দিকে।

আর তখন কথাটা হঠাৎ তার মনে এল: আর যেন সে দিন দিন কী এক হিসাব রেখে চলেছিল। আর এখনই যেমন, কী আশ্চর্য, আজ আশি দিন হতে চলেছে কিন্তু কেন যে আশ্চর্য, তাই সে বুঝে উঠতে পারছে না। সে নিজেকে প্রশ্ন করলে, ওটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু তুমি তো শেষ হিসাবে ডাক্তার, বুঝতে দিন গুণতে হয় না। অবাক যে তুমি ভুলে যাও নি।

আশ্চর্য তো!

২

সে দলটায় ছিল মেয়র, রেঞ্জার, পোস্টমাস্টার আর নরবু। পোস্টমাস্টার আর রেঞ্জারের বনমোরগ শিকারের এই দ্বিতীয় চেষ্টা সফল হয়েছে। অনেকটা দূর ও সময় নিয়ে চেষ্টা করায় মুরলীধরের আনাড়ি হাতেও কয়েকটা পাখি শিকার হয়েছে।

ফেরার সময়ে তাদের এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য চোখে পড়েছে, তারা সেটাকেই আলোচনা করছে এখন। ক্লুটলং এর উত্তর-পশ্চিমের রিজের উত্তরপ্রান্তে তখন তারা, গাছের আড়াল অগভীর, সে সময়ে প্রভঞ্জন দেখেছিল, তাদের পায়ের নিচে রিজটা সাধারণভাবে উত্তরদিকে ঢালু। অনুমান পাঁচশোগজে পঞ্চাশ গজ নেমে, একটা উপত্যকা তৈরি করেছে। সেটা পার হয়ে আরও উত্তরে বেগনি বাদামি, বেগনি নীল, নীল পাহাড়ের পর্যায়। এই উপত্যকা আর তার লাগোয়া পাহাড়শ্রেণীতে বেশ খানিকটা হলুদ রং। সূর্য যদি রঙের বাটি হয় তবে তা থেকে ছলকে পড়ে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেই রঙের কোন প্রান্ত উজ্জ্বল সোনালি, কোন প্রান্ত ভার্ডিগ্রিস। আর সেই রঙের জলটায় ছপ ছপ করে, রং ছিটিয়েও একদল ঘোড়া ক্রমশ উত্তরপশ্চিমের পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে। ততদূর থেকে ঘোড়াগুলোর উচ্চতা ছাগলের মতো, মানুষগুলোকে তিনচার বছরের বালকদের মতো দেখাচ্ছে। দৃশ্যটা মনোহরণ।

তখন তারা রেঞ্জারের সেই স্কুলের পাশ দিয়ে সেই রিজ বরাবর চলেছে যার উপরে রেঞ্জারের বাংলো।

পোস্টমাস্টার বললে, দ্বীপ-প্রমাণ ক্যারিয়ার জাহাজ, পাঁচশো গজ লম্বা গুডস স্পেশ্যাল ট্রেন যে বাণিজ্য করে, ওই মিউল ট্রেনটা সেই একই বাণিজ্য করে, নয় কি?

প্রভঞ্জন বললে, কী যেন, সেই সমরখন্দ নাকি খোটান দিয়ে চলা বাণিজ্য ক্যারাভানের গল্প আছে। হয়তো সে রকম বিখ্যাত নয়। কিন্তু সেই জাতেরই হয়তো, যা নিয়ে সেকালের লোকেরা নালন্দা আসতো।

মুরলীধর বললে, আপনি ঠিকই বলছেন। যদিও এ পথটায় কোন ফা হিয়েন বা তেমন কেউ কোনদিনই যাওয়া আসা করে নি, তা হলেও ভূর্জপত্রের পাণ্ডুলিপির বদলে, চাল, নুন, ঘর ছাইবার টিন ইত্যাদি বাহিত হলেও পথটা মূল্যবান হচ্ছে। অদ্ভুত নয়? আমাদের এই পৃথিবী তার কোন কোন প্রান্তে কেমন মধ্যযুগের আদিমতাকে ছুঁয়ে আছে।

তারা স্কুলটাকে পার হল। দেয়ালের কাচে আলো ঝকঝক করল। সবুজ রং ছাদের নিচে কাঠ ও কাচের সেই বাড়িটা। একটা ধোঁকা যেন। কিন্তু আকর্ষণ করে। প্রভঞ্জন চোখ সরিয়ে নিল। রেঞ্জার

বললে, নরবু, এবার পাখিগুলোকে বিলিয়ে দিতে থাকো। সবগুলোই বেশ বড়। হেড ক্লার্ক, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পিডব্লুডির বিরিঞ্চি বাবু, প্রত্যেকের বাসায় একটা দিও। তোমাদের অর্থাৎ মেয়রের একটা। পোস্টঅফিসে একটা, আর কন্ট্র্যাক্টর গেন্দাসিংকে একটা দিও। গেন্দাসিংকে এক সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করতেও বলো।

নরবু সে রকম ব্যবস্থা করতে এগিয়ে গেলে, প্রভঞ্জন পোস্টমাস্টারকে বললে, চলুন একটু কফি, এসো, মেয়র।

পোস্টমাস্টার নিজের বাসায় যেতে চাইলে, প্রভঞ্জন বললে, অ, আপনি তা হলে গেরস্তর অমঙ্গল করতে চান? সেদিন শিকারের পরে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধেছিলেন, অসুস্থ রোজার হাতে বাজে ব্রেকফাস্ট হয়েছিল, গেরস্তর সে সব দোষ কাটাতে হবে না?

মুরলীধর হেসে বললে, একটা বিধান হচ্ছে নাকি, শিকারে গেলে ব্রেকফাস্ট করতে হবে?

আপনি বলছেন, একই রকম হচ্ছে, একঘেয়ে? ও মশায়, ও মশায়, নতুন কাকে বলে? দেয়ার ইজ নাথিং নিউ আন্ডার দা সান। এসো, মেয়র। বসুন, মাস্টারমশাই, আগে চা হোক। খেতে খেতে বিশ্রাম, পরে ব্রেকফাস্ট।

৩

একেবারেই নতুন কিছু ঘটেনা, তা তো নয়। এই অনুর্বর উপত্যকায় খেলা, শিকার, ব্রেকফাস্ট, ব্রেকফাস্ট, শিকার, খেলা ছাড়া হয়তো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না, যা নিয়ে বাঁচা যায়। না হলেও এপ্রিলের পরে মে আসে। মানুষকে লাল রং টানতে থাকে।

প্রভঞ্জনের সেই লিভিংরুমে আসবাব, আলো, বিয়ারের উচ্ছিষ্ট মাগ, পুরনো পত্রিকা, সবই আগের মতো, কিন্তু ইজেলের ছবিটা বদলেছে। সেই সেন্ট গ্রেগের কল্পিত পোরট্রেটের বদলে তিনফুট বাই চারফুট ক্যানভাস ইজেলে। ইজেলটাও স্থান বদলেছে যেন, বিশেষ মানানসই আলো ধরতে। একটা নিচু ডানদিকে ঢালু বাদামি-পোড়া অ্যাম্বার সিলিং-এর নিচে, ঘষা কাচের এক জানালাকে ডানহাতি করে, অ্যালুমিনিয়ম রঙের নানা শেডের হাঁড়ি, কেটল, কড়া ইত্যাদির এ পারে এক গাঢ়, বাদামি টেবলের সামনে এক পুষ্টাঙ্গী প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়া শব্দটায় চিত্রকর, বোধহয়, প্রৌঢ়যৌবনা বুঝে থাকে। টেবলের উপরে বিচিত্র বাঁশ ও বেতের ঝুড়িতে কিছু আনাজ। টেবলের উপরে বেশ কয়েকটি আপেল। চিত্রিতা সেই প্রৌঢ়া একটা আপেল বাঁ হাতে ধরে ডান হাতের ছুরিতে খোসা ছাড়াচ্ছে। একটা পোর্সেলিন বোলে দু-একটা তেমন খোসা ছাড়ানো আপেল। সেটা রান্নাঘর তা শুধু পট, প্যান, কেটলে নয়। তাদের কাছে নিমগ্ন আগুনের আভা। ছাদে, অংশত দেখা যাচ্ছে এমন দেয়ালে, ধোঁয়ার কালি। সেই পট প্যান কেটলের মধ্যে ধোঁয়ার অস্বচ্ছতা আঁকা। এমন কি স্ত্রীলোকটি হেঁট হয়ে হাতের আপেলের দিকে চোখ রাখায় তার যে খোপা সিলিংমুখো তার কাছাকাছিও ধোঁয়ার আভাস। টেবলের নিচে যে হাঁটুসমেত পায়ের আভাস, টেবলের উপরে কনুই থেকে নিরাবরণ হাতদুটো, প্রায় ডবল চিবুক, উঁচু গণ্ড সবই তাকে চল্লিশে স্থিত প্রমাণ করে। আর লালের ব্যবহার– যেন মনে হবে মের প্রভাবে আঁকা– আপেলে, অদৃশ্যপ্রায় আগুনের আভায়, চিত্রিতার গণ্ডে। কালচে রুপালি স্বচ্ছ শিফন শেমিজের বুক টেবলের রেখা পর্যন্ত খোলা, হয়তো রান্না ঘরের উষ্ণতার দরুণ সেই শেমিজ ডান কাঁধ গলিয়ে নেমে যাওয়ায় ডানমাইটাকে প্রায় নিরাবরণ করেছে। শেমিজের স্বচ্ছতার দরুণ বাঁ মাইটির স্ফীতিও বরং চোখে পড়ে। তারা প্রচুর। কিন্তু উদ্ধত নয়। স্নেহনত। কিন্তু তাদের, বিশেষ করে অনাবৃতটির অগ্রভাগ অ্যামারান্থফুলের মতো লাল, বাস্তবে যা হয় না।

অন্তত, অবশ্যই, রোজার তেমন নয়।

প্রভঞ্জন চায়ের খবর দিয়ে যখন ফিরে আসছে, তখন পোস্টমাস্টার ভাবলে, এ ছবি নিয়ে কি আলোচনা করা যাবে? এ তো রোজাই, আর পিছন ফিরেও নয়। বিস্ময়বোধ তাকে এর চাইতে বেশি কিছু ভাবতে দিল না। রেঞ্জার ফিরে আসার আগে, অস্ফুট এই ভাব হল: এটা নতুন কিছু।

আর প্রভঞ্জন ফিরতে ফিরতে রোজাও এল ধোঁয়ানো টিপট ইত্যাদি নিয়ে। রোজার পরনে লেবুহলুদে আকাশীনীল দাগটানা মোটা কাপড়ের গলা থেকে পায়ের পাতা তক ছড়ানো খোলের মতো গাউন! চা খেতে খেতেই প্রভঞ্জন বললে, অ্যাপলপাই দেখছেন?

অ্যাপলপাই?

মে মাসও বলতে পারেন। কিংবা জুলাই। উজ্জ্বল প্রগাঢ় বসন্ত, আসল কথা, মানে, আপেলকে যখন রান্নার স্তরে আনা যায়—প্রচুর আর পাকা আপেলের ঋতু। দিনটা আজ ভালো।

সে আপনার হাসিমুখ দেখে বুঝছি।

হাসছি নাকি? তো মশায়, বেশ রংগুলো ছিল সেই সমরখন্দের কাফেলায়।

পোস্টমাস্টার হেসে বললে, আচ্ছা, কিন্তু সবই কি ভালো? এরকম পাহাড়ি পথে শুধু কি খোবানি, সিরাজী, কার্পেট আর নুরজাহাঁ আসে? তৈমুর, জেঙ্গিস, নাদিরও আসতে পারে। আমি ভাবছি, ওটা ওদের অন্তর্বাণিজ্য না বহির্বাণিজ্য।

রেঞ্জার রঙের কথায় ফিরল। বললে, সেই, হয়তো কাছে থেকে হাড্ডিসার রুগ্ন, সাধারণ ঘোড়াগুলো ব্রোঞ্জের তৈরি মনে হচ্ছিল না? হলুদ, লেবুহলুদ, প্রায় সবুজ এমন জলাশয় যেন পার হচ্ছে এমন ব্রোঞ্জের ঘোড়া সব?

ব্রেকফাস্ট এল। রাঁধুনী আজ সুস্থ, আর সে তো অবশ্য গৃহকর্তার মেজাজ মন বুঝে থাকে। আয়োজনটা অন্য শিকারের দিনের চাইতে বেশী। একবার মুরলীধর বললে এটা কী, মশাই? পাই মনে হচ্ছে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে পোস্টমাস্টার সিগারেট ধরিয়ে বিদায় নেবার ভূমিকা করতে বললে, সাড়ে নয় হল।

রেঞ্জারও, যেমন তার কাছে প্রত্যাশা করা যায়, বললে, সেটা কোন কার্যকরী প্রস্তাবই নয় ; তখন নাকি ছুটির দিনকে বরং সম্বর্ধনা জানানোর সময় এবং রবিবারকে বিরক্ত করা কখনও উচিত হবে না। সে উঠে শার্সি দিয়ে আসা আলোর মধ্যে দিয়ে চলে আলমারি খুলে বিয়ার মাগ, বিয়ার ক্যান ইত্যাদি নিয়ে এল।

তা দেখে মুরলীধর বললে, না, না, বারবার তিনবার হবে। এর পরে ধরে ফেলবে। তখন এসব ফরেন জিনিস কোথায় পাবো মশায়? প্রভঞ্জন বললে, লক্ষীছেলের মতো বসুন, ছুটিছাটায় দুই এক গ্লাস কাউকে ধরে না। তো, মেয়র তুমি ত্রিশের অনেক নিচুতে। এখনও ইঞ্চি ছয়েক বাড়বার চান্স আছে। তুমি আর একটু কফি বানিয়ে নাও। আসুন, মশায়, আসুন।

বিয়ার নিয়ে ফেনাযুক্ত ঠোঁটে হেসে পোস্টমাস্টার বললে, তা হলেও, মশায়, আমি বলতে পারবো না, এটা কোথাকার।

দুজনেই যেন নিঃশব্দে সান্নিধ্যর সুখ উপভোগ করতে তেমন রইল।

প্রথম মাগের পর মুরলীধর সিগারেট ধরালে। প্রভঞ্জন বললে, মন্দ নয় দেখছি। কিছু যোগাড় করে রাখা ভালো। সে দ্বিতীয়বার মাগ ভরল। এটা কলকাতার চালান, মহকুমা সদরে আসে।

মুরলীধর বললে, আপনার চেতনা আজ বেশ উৎফুল্ল। তা বোধহয় এপারে ওপারে মে মাসের রং দেখে দেখে। বিশেষ সীমান্তের ওপারের সেই দৃশ্য...

তাই? আচ্ছা! ও মশায়, বলুন তো, আপনি কি কখনও ভেবেছেন, রং কেন আমাদের ভালো

লাগে। কেনই বা আদৌ লাগবে তা?

বলছেন, একরঙের সঙ্গে অন্যটির তফাৎ আছে, কিন্তু তার মধ্যে নিজস্ব ভালোমন্দ লাগার কিছু নেই?

ঠিক তা নয়। এমন হতে পারে রঙের জন্য রংকে ভালো লাগে না, সে রং যে স্মৃতি জাগায় তাতে ডুবতে ভালো লাগে বলেই, রঙটিকে ভালো লাগে।

স্মৃতি?

যেমন বসন্তের। আর তা হয়তো, খুবই পুরনো, দু-এক লাখ বছরের পুরনো।

বেশ তা হলে, কিন্তু বসন্ত ঋতু কেন তত পুরনো ভালো লাগার কৌম স্মৃতি হয়ে থাকে বলতে হয়।

ও মশায়, ও মশায়, সে তো খুব সহজ। শীতের কষ্টের পরে, কিংবা চাপের পরে, জীবন সে সময়ে বাড়তে পারে।

পোস্টমাস্টার উঠে দাঁড়াল। বললে, পুরনো স্মৃতি কেন? নতুন স্মৃতিই বা কী দোষ করল! ওই ব্রোঞ্জের ঘোড়াগুলো স্মাগলারের স্মৃতি আনে, বিয়ারের স্মৃতিও।

পোস্টমাস্টার হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।

প্রভঞ্জনও হাসতে শুরু করল। কিন্তু তার নিজের হাতে ধরে থাকা বিয়ারে সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল। আর তাতে সে বেশ অপ্রতিভই হল। কিন্তু এক মুহূর্তেই সে হাসিমুখে বললে, বেশ বলেছেন। হতে পারে তারা স্মাগলারই, আর এ বিয়ারও স্মাগলড। কিন্তু আমরা তো, মানে বনের কাঠচোরদের ধরতে। কী বলো, মেয়র? স্মাগলারের ব্যাপার আমাদের নয়।

সে বিয়ার মাগ হাতে দরজা পর্যন্ত এসে পোস্টমাস্টারকে বিদায় দিল।

৪

পোস্টমাস্টার ও মেয়র চলে গেলে, রেঞ্জার ঘরের ভিতরে এসে, দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ তামাকের স্বাদে নিমগ্ন রইল।

পরে আবার তার রঙের কথা মনে এল। সে যেমন ছিল তেমন উঠেই ইজেলের ছবিটার সামনে গেল। ছবিটার সামনে ঘুর ঘুর করে এ পাশ থেকে ও পাশ থেকে দেখলে। পরে রঙের পেলেট ও সরু তুলি হাতে নিলে। মানুষটা কি একটু বেশী স্থূলাঙ্গ হয়েছে ছবিতে? চোখের পাতার নিচে গালে রংটা একটু গভীর করলেই গালের উচ্চতা কমে যাবে এখনই। কিন্তু টেবলটার ধার থেকে বর্ডার পর্যন্ত স্পেসটা একটু ফাঁকা নয়? একটা ইনসিগনিফিক্যান্ট নিচু টুল জাতীয়, চোখ অগ্রাহ্য করে, এমন রঙের বর্ডার ঘেঁষে, আধখানা বেরিয়ে আছে এমন কিছু। কিন্তু প্রায় শেষ করে আনা ছবিতে ঝোঁকের মাথায় তুলি ছোঁয়াতে সাহস করলে না সে। সে বরং মনে মনে হাসল, হ্যাঁ স্বীকার করলে হয়, মে মাসের রংই বটে।

এমন সময়ে রোজা এল ব্রেকফাস্টের বাসন নিয়ে। তাতে যেন চিত্রীর সুবিধা হল। সে বললে, এদিকে এসো তো একবার। দাঁড়াও দেখি একটু। বিয়ার ক্যানটায় কিছু থাকতে পারে? তাও দেখো। তোমার চোখদুটোকে একটু মিলিয়ে নিই।

রোজা স্নানের জোগাড় করছিল সম্ভবত। খোপা খোলা, কিছু চুল কপালে, বেশির ভাগ সামনে বাঁ বুকে, দু-এক আঁশ সাদা। তার পরনে এখন রং জ্বলে যাওয়া বুটিদার শিফন ম্যাক্সি। ডান হাতের উপরে তোয়ালে। ব্রেসিয়ার—মুক্ত বুকের, চর্বিযুক্ত পেটের, গ্যাম্বোজ রং উরুর খানিকটা করে ফুটে

ওঠায় বোঝা যাচ্ছে, ইতিমধ্যে সাপ্তাহিক কাচাকাচির কর্তব্যে খানিকটা ভিজেছে সে।

প্রভঞ্জন বললে, নেভার মাইন্ড। আধঘণ্টা পরে স্নান হবে। আজ রবিবার।

রোজা ট্রেতে ব্রেকফাস্টের বাসনগুলোকে তুলে গোছালে। বললে, আজ বিকেলে আপনার চায়ের পর শিরিংদের বাড়ি যাব। এখন একটু তাড়াতাড়ি করতে হয়।

ছেলের বিয়ে? শিরিং-এর মেয়েকে তোমার মনে ধরেছে, বলো।

ভালো, বেশ ভালো, বয়সও কম, সত্র হবে।

তুমি ভাগ্যবতী রোজা। ছেলে, বেটাবউ, পরে নাতিনাতনী।

রোজা হেসে বললে, তো রেঞ্জারসাহেব, আপনারও তেমন হবে, মেমসাহেব আসার পরে।

সে বিয়ার ক্যানটাকেও ট্রেতে বসিয়ে নিলে। এখন একটু তাড়াতাড়ি আছে, সাহেব, ধোয়াকাচা শেষ করে রান্নাঘরে যাবো। পাখিটার কী হবে, সাহেব?

আমার দরকার নেই।

তা হলে।

একটু ভেবে প্রভঞ্জন বললে, তোমাদের প্রথায় কি আটকাবে? একটা থলেতে ভরে শিরিংদের বাড়িতে দিয়ে এসো। বলবে, তোমার সাহেব শিকার করেছেন। আর শিরিংকে খাতির ক'রে পাঠিয়েছেন।

তা হলে, দেখি কী হয়, বলে রোজা বাসনের ট্রে নিয়ে চলে গেল।

তুলি পেলেট রেখে, রেঞ্জার পাইপ হাতে করে ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল। তার ইজেলের ছবিটা আঁকার কথা মনে এল। গত রবিবারে শুরু হয়েছিল। তখন এরকমই বেলা হবে। পরনে এই পুরনো শিফন ম্যাক্সিটাই ছিল। রান্নাঘরে অ্যাপলপাই বানানোর যোগাড় করে রেখে তখন স্নানের ঘরে ঢুকেছে রোজা। রান্নাঘরে গিয়েছিল প্রভঞ্জন চায়ের খোঁজে। সেখানে টেবলে রাখা লাল আপেল, বাইরের দেয়ালের দিকে ক্রমশ নিচু হয়ে যাওয়া ওক রঙের সিলিং, উনানের নীলাভ ধোঁয়ার স্পাইর‍্যাল, উনানের কাছে সাজিয়ে রাখা পুরনো রুপো রঙের বাসনপত্র, উনানের ও পারের গ্রে কাঠের ফ্রেমে নীলাভ শার্সি, টেবলের গাঢ় বাদামি, এসব দেখে তার মন থেকে চায়ের কথা দূরে গিয়েছিল। করিডরে বেরিয়ে স্নানের ঘরে জলের শব্দ শুনে সে কড়া নেড়ে বলেছিল, গায়ে জল না ঢেলে থাকো, ঢেলো না, শুনে যাও।

রোজা এলে সে বলেছিল, ছবি আঁকলে কেমন হয়? রোজা বলেছিল, এখন, দিনের বেলায়? তা ছাড়া অ্যাপলপাই বানাবো, ঠিক করেছি। আর সে নিজে বলেছিল, অ্যাপলপাই, আচ্ছা সে দেখি কেমন হয়। রসো, আগে রেঞ্জারটাকে ট্যুরে পাঠাই।

সে টকটক করে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার ইন আউট লেখা প্লাকে নব ঠেলে রেঞ্জারকে আউট করে রান্নাঘরে ফিরেছিল। রান্নাঘরে টেবলের ধারে রোজাকে বসিয়ে আধঘণ্টার চেষ্টায়, টেবলটা সরিয়ে নড়িয়ে, রোজাকে এদিকে ওদিকে বসিয়ে আলোতে এনে, কম্পোজিশনের মডেল করেছিল। পরে আপেল, বাসন ইত্যাদি সাজানো হলে, আপেল কাটা ছুরিতে ম্যাক্সিটার গলা কেটে টেবল পর্যন্ত এনে ভাঁজগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে একত্র করতে হয়েছিল যাতে ডান বুক থেকে তিনভাগ জামা সরে যাওয়া কৃত্রিম না দেখায়। ইজেল, ক্যানভাস এসেছিল। আর সে রোজাকে বলেছিল, অ্যাপলপাই করতে আপেল কী রকম কাটতে হয় জানি না, কিন্তু ছবিতে তোমাকে আপেল কাটতে ব্যস্ত হতে হচ্ছে। সে চারকোলের প্রবহমান রেখায় আঁকতে সুরু করেছিল। আহা ওটা ঢাকা পড়বে কেন? বলা যায় না, বেশি পাকা আপেলের মতো, যেন ঝলসানো ডালিয়ার মতো ওটাকেই আমি সিম্বল করব। এই সময়ে তার মাথায় এসেছিল, চুচুকবৃত্তকে রঙীন করার কথা গ্যাম্বোজ হলুদে অ্যামরস্থ লাল। পেলেটে সেই রং তেলে পাতলা করে তুলির সাহায্যে এমন কি মডেলের গায়ে

লাগিয়ে পরখ করেছিল।

ইজেলের সামনে দুরূহ প্রবহমান রেখায় তন্ময় হয়ে যেতে যেতে সে তাসিলায় কত রকমের রং তা বোঝাতে গিয়ে নিজেই বোধহয় অবাক হয়ে যাচ্ছিল। সে বলেছিল বোধহয়, তুমি তো, বাপু, স্নানের আগে ঝাড়া একঘণ্টা রবিবারের ধোলাই করতে। আমার একঘণ্টাও লাগবে না। হাসছো যে? তা সে ভালোই ছিল, সেই চাপা হাসি। অ্যাপলপাই-এর সুঘ্রাণ সুস্বাদতো সেই চোখের হাসিতেই ধরতে হবে।

রোজা বলেছিল, সাহেব আমি খুব মোটা হয়ে যাই নি কি?

বোধ হয়। তা মোটা তো বটেই। কিন্তু, ও কী যেন?... কাউকে কাউকে মোটা আর প্রৌঢ়াও ভালো লাগতে পারে। তোমার শীত লাগছে না তো, রোজা? জল ফুটছেই। এক কাপ কফি করে দেবো? রসো একটু একটু রং ছুঁইয়ে রাখি, যাতে ভুলে না যাই। রোজাই কফি করে এনেছিল। আর প্রধান রংগুলোর পাশাপাশি কয়েকটি ছোপ ক্যানভাসে দিয়ে বলেছিল সে, এবার গরম জল নিয়ে স্নানে যাও রোজা, সর্দি না হয়।

ইজিচেয়ারে উঠে বসে এতক্ষণে সত্যি পাইপ ভরলে প্রভঞ্জন। যেন অনেক দূর হেঁটেছে বনে। কিংবা পনিতেই। সে জন্য পাইপ ধরিয়ে ইজেলের গোড়ায় গোড়ায় যেখানে খানিকটা রোদে সেখানে, যেন বনের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল সে। মিট মিট করে হাসল। চুচুকের রং তো চোর্টেন পীক থেকে শেখা। হতে পারে গঁগ্যার ছবিই সাহস দিয়েছে। সেই তো প্রথম মোটাসোটা স্ত্রীলোকদের এঁকেছে। কী সাংঘাতিক কথা, বসন্তের রঙের স্মৃতি কৌমের নির্জন মানসের গভীরে থাকা সুখের স্মৃতি। সেই স্মৃতিতে মনকে শুইয়ে দিলেই কি নান্দনিক আনন্দ?

৫

রোজা স্নানের ঘরে ঢুকবার আগে ব্রেকফাস্টের বাসন ধুয়ে নিতে নিতে ভাবলে: এটা কি ভালো হল, এই ছবিটা?... এর আগে পিছন থেকে, পাশ থেকে মুখটা তেমন চেনা যায় না। তা তখনই সে বলেছিল, যখন ছবিটা কিছুই হয়নি, এটা ভালো হল না। আর আজ তো পোস্টমাস্টার আর মেয়রও দেখে গেল ছবি।

কিন্তু সেদিন রেঞ্জার সাহেব বললেন, ভালো নয় কেন? দেখো, আমি ত্রিশ পেরিয়েছি। আর চার পাঁচ বছর পরে, তুমিই তো বলেছো, তখন হয়তো মেমসাহেব,... তখন হয়তো যৌবনকে ভালো লাগবে। কী বলো? আর তখন তুমিও হয়তো ক্যারেকক্টার-পোরট্রেট হতে পারো। লাভলি স্ত্রীলোক নয়... আঁকার বাইরে মোটা... আমারও আর এ চোখ নেই... এটা থেকে যাবে, এই রঙের আনন্দ... বাহ্, তুমি বলবে, বাহ্... আর পাঁচ মিনিট...বাহ্।

এরকম বলছিলেন তখন রেঞ্জার, মনে পড়ল রোজার, বাহ্ এই চুচুকবৃত্ত... আর সেই লালটুকুর দিকে নানা দিক থেকে ঝুঁকে আপেল, এসবের জানালা, ছন্দ, আনাজ এসবের নানা মিষ্টি রং যেন সুরের ঝোঁকে... চার পাঁচ বছর পরে তখন হয়তো আমি কোথায় ডিএফও। তখন চেম্বারে, আমার চেয়ারের পিছনে এটা... কী বলবে? লোভী ছিল চিত্রী? কী বলবে, দারুণ বিলাসী সেই মহিলা যে চুচুকবৃত্তে রং দেয়?

আর তখন সে নিজে বলেছিল, শীত লাগছে। কিন্তু তা কি কেউ রাখে? তা আপনি রাখবেন না, সার।

আর রেঞ্জার সাহেব বলেছিলেন, কেন? তোমার নাতি দেখে চিনে ফেলবে? সেও কি আমাদের

মতো অরণ্যে কাজ করবে?... আচ্ছা, আচ্ছা, এটা যদি রাখার মতো হয়, তোমার নাতিকেই না হয় দিয়ে দেবো একসময়ে, তার ঘরেই থাকবে।

রোজা স্নান শেষ করে বাইরে যাওয়ার মতো শাড়ি ব্লাউজ চাদর পরে বাইরে এল। সে স্থির করেছে, শিকার ব্যাগে নিয়ে বরং নরবুকে দিয়ে আসবে। বলে আসবে, তোমরা খেয়ো। সাহেব বলেছিলেন, শিরিংকে পৌঁছে দিলেও হয়, সাহেব পাঠিয়েছেন বলে।

সে প্রভঞ্জনের লিভিংরুমে ঢুকে দেখলে, সারা সকালের পরিশ্রমের ফলে রেঞ্জার সাহেব ইজেলেব সামনের রোদে ম্যাটিং-এর উপরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সে সাহেবের ঘুম ভাঙালে না। বিছানা থেকে বালিশ এনে ঘুম না ভাঙিয়ে মাথার নিচে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিলে। লাঞ্চ পর্যন্ত ঘুমালে ক্ষতি কী? রাতে ছবি আঁকতে ঘুম হয় না।

৬

বেলা দশটার পরে একটা সুখের ছুটির সকাল কাটিয়ে পোস্টমাস্টার তার বাসায় ফিরতে ফিরতে ভাবলে, রেঞ্জারের সঙ্গে রঙের আলোচনাটা আজ নতুন ধরনের হয়েছে। ডালিয়ার রং ভালো এ জন্য, তা কৌম অবচেতনে শীত সরে গিয়ে বসন্তের জীবন সঞ্চারের স্মৃতি জাগায় বলে। আসলে, এখন যার রং মনোহরণ করছে তার পিছনে সেই স্মৃতি। তেমন নীল উঁচু আকাশ ভালো, আর উদাস এ জন্য যে, বনবাসী সেই পূর্বপুরুষদের বর্ষার নানা কষ্ট দূর হয়ে যাওয়ার সময়ের স্মৃতি সেই আকাশ। খানিকটা গিয়ে সে অবাক হল। তা হলে? রোজার রং ছবিতে ধরার মতো টানছে, তা কি অবচেতনে শায়িতা প্রৌঢ়-যৌবনা অন্য কারো রঙের স্মৃতির জন্য?

আবার রং কি মুখোশও হয়। রং-এর আড়ালে বিপজ্জনক কিছু থাকতে পারে? যেমন সূর্যের আলো সেই উপত্যকায় পড়ে মাটিকে হলুদ, লেবুহলুদ, প্রায় সবুজ একটা জলাশয় করেছিল যাতে ব্রোঞ্জের ঘোড়াগুলো তেমন চলতে পারে?

যাক গে। দেখো, আজও দেরি হয়ে গেল। সে অনায়াসে বলতে পারতো, ব্রেকফাস্টের জন্য বসবো না। সুচেতনাকে শিকারের অভিজ্ঞতা শোনাতে শোনাতে ব্রেকফাস্ট করবো। সে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। আপনিও চলুন রেঞ্জার।

সে থমকে দাঁড়াল। সে কি আজকাল না জেনে সুচেতনার থেকে দূরে চলে যেতে চায়? আশ্চর্য ব্যাপার হবে তা হলে।

না, না। আজ ছুটি। দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত আজ বাজনা শুনলে ভালো। অনেকদিন হয় না সে রকম। মুরলীধর কল্পনায় তার বসবার ঘরে রাখা ইউরোপে তৈরি তার শখের স্টিরিওটাকে দেখতে পেলে যেন। ফলে, এসো, সুচি, একটু বাজনা শুনি, এরকম কটা কথা মনে নিয়ে সে বাসায় ঢুকল।

জামা-কাপড় পালটাতে সে বসবার ঘরে, স্টিরিওর ঘরও সেটা, ঢুকে সুচেতনাকেও দেখতে পেলে সেখানে। সুচেতনা তখন সেই ঘরে বই-এর র্যাকের নিচে পুরনো চিঠিপত্রের ফাইলগুলোতে রবিবারের ঝাড়পোঁছ করছে। তার মনে পড়ল, গত রবিবারেও এরকমই দেখেছিল সে। মনে হয়ে যেতে পারে, সংসারে কাজের চাপ না থাকলেই, সে সেসব কাগজপত্রে কিছু খোঁজে। যা হয়তো সত্য নয়।

মুরলীধর স্টিরিও খুললে, কিন্তু রেকর্ড বসানোর আগেই বললে, তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার কাছে গোপন রাখতে চাই না। মাঝে মাঝে বিয়ার খাওয়া হচ্ছে। আজ নিয়ে তিনদিন হল।

ওকে ঠিক মদ বলে না। প্রভঞ্জন বাবু... মানে ঠিক বাজে জিনিসও নয়, ফরেনই, যদিও হয়তো স্মাগলড। বিশেষ করে রোজার জন্যই যোগাড় করতে হয়। নতুবা সে নাকি এখানকার দিশি মদ গিলতো, যা নাকি গলা আগুন।... জানো, আজ আবার একটা ছবি দেখলাম। এটার মডেল যে রোজা তা যে কেউ বলে দিতে পারে। একেবারে নিরাবরণ বুক দেখানো। তো তা হলে তো মডেলকে বিয়ার খাওয়াতে হয়ই, তাই নয়।...

এই বলতে বলতে হঠাৎ মুরলীধরের কথাটা মনে পড়ে গেল। সেই শান্তির জন্য নাকি? সে বললে, জানো, রেঞ্জার একদিন বলেছিলেন, ইউ হ্যাভ টু পে ফর ট্র্যাঙ্কুইলিটি। শান্তি পেতে তার জন্য দাম দিতেই হবে। তোমার কি মনে হয় কোন রকমের শান্তি পেতে রেঞ্জারের চড়া দাম দেয়া এসব?

কী শুনবে? অ্যাফ্রিকান নাইট? নাকি ক্লাসিক? হেডন, বাখ, নাকি শোপ্যাঁ?

সে স্টিরিওটাকেও দেখছিল। হঠাৎ তার মনে হল– এটাই কিন্তু বিদেশি। এই সহজ সত্যটা তাকে এমন অপ্রভিত করলে, যে তার গাল লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু এতক্ষণে তার খেয়াল হল, এতক্ষণে একটা কথাও বলে কি সুচেতনা। ধুলো ঝাড়ছেনা বটে, র‍্যাকের গোড়ায় হাঁটু পেতে বসে আছে। হাতে মুখে, চুলে হালকা ধুলো বলেই মনে হয়। মুরলীধরের আগের রবিবার মনে এল। সেদিন সুচেতনা কী এক সৌরভ ও সুঘ্রাণের কথা বলেছিল।

শেষে সে নিজে বারবার জিজ্ঞাসা করলে সুচেতনা বলেছিল; সে আর বেশি কথা কী? একটা উনিশ-কুড়ির মেয়ের মনে বিয়ের আগের দিনে সুগন্ধ জন্মাবেই, তা ছাড়া হাবোলের মনেও তখন কত টাটকা মধু, যার একটা চাপা ধারালো সুঘ্রাণ থাক সম্ভব।

আর সে নিজে তখন বলেছিল, তাদের যে বিয়ে হয় নি, তার কার্ড খুঁজে পেয়েছো বুঝি? বিয়ের কার্ডে আতর সেন্ট, এসব দেয়া হয়।

আর সুচেতনা উঠে দাঁড়িয়েছিল। যেন লজ্জা পেয়ে বলেছিল, এই দেখো, তুমি? তোমাকে কি একটু চা দেবো এখন?

আর সে জিজ্ঞাসা করেছিল, হাবোল আবার চিঠি লিখেছে নাকি?

সুচেতনা বলেছিল, না, তো। আচ্ছা, হাবোলের একটা অন্য নামও ছিল। সে কিন্তু তোমাকে খুব বিশ্বাস করতো।

হ্যাঁ। সে জন্যই তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, বিয়ের এক সপ্তাহ আগেই ছুটি নিতে। পোস্টঅফিসের টাকা পয়সার কাজ। মন শান্ত রেখে কাজ করতে হয়। বাবুর তখন মন চঞ্চল। ছোটখাট ভুল প্রায়ই হচ্ছিল।

ও মা, তাই!

তা, সে বলেছিল, নতুন চাকরি। অল্পই পাওনা আছে ছুটি। বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে নিজের আর স্ত্রীর বাবার বাড়ি যাবে নাকি।

সুচেতনা বলেছিল, কী ভুলই না মানুষ করে! বিয়ের দিন সকালে পুলিশ অ্যারেস্ট করলে বিয়েই তার হয় না।

আর সে নিজে বলেছিল, হাবোলকে তুমি অবশ্যই স্নেহ করো। সেটা একটা দুর্ঘটনাই ছিল। নতুবা তার বিরুদ্ধে মামলায় কিছু প্রমাণ হয়নি। বলতে তার সময় লেগেছিল, সে বিয়েটা আর হয়নি। কিন্তু কীই বা বয়স হাবোলের, কিংবা সেই মেয়েটির। তুমি হয়তো খবর রাখো না, হয়তো সে মেয়েটির অন্য কোথাও বিয়ে হয়েই গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে হাবোলেরও হবে।

সুচেতনা আর একবার, ও মা তাই, বলে চা আনতে গিয়েছিল।

এখন মুরলীধর বললে, শুনছো, আমি বাজনার শোনার কথা বলছিলাম। তোমার কি রান্না হয়ে

গিয়েছে? আজ ছুটির দিনে একটু পরে করলেই বা ক্ষতি কী? নাকি প্রভঞ্জনবাবুর শিকারের মোরগের কথা ভাবছো? সে নয় রাতে হবে। এক কাজ করলে হয়। প্রভঞ্জনবাবুকেই রাতে খেতে বললে হয়।

তাই বলছো?

ভালো হয় না? রাতে একটা ঘরোয়া উৎসব করো।

উৎসব এই শব্দটাই যেন সুচেতনাকে উৎসুক করলে। তার মুখের রক্তের সজীবতা দেখা দিল। পোস্টমাস্টার লক্ষ করলে, তার পরনে গাঢ় নীল শাড়ী, যাতে এখানে ওখানে চুমকি যেন সোনালি বিন্দু, আর চোলিটা আকাশী নীল। যেন আকাশী নীল এক সৌন্দর্য জল থেকে উঠছে।

সুচেতনা বললে, তা হলে এ বেলাতেই নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা ঠিক করে নিও।

এতক্ষণে তার সুন্দরী স্ত্রী কথা কইল, এরকম অনুভব করে মুরলীধর খুশি হয়ে বললে, তোমাকে এখন শিকারের গল্প বলবো, না ছবির, ঠিক বুঝে উঠছি না। তা দেখো, সুন্দরী পেতে ভাগ্য করতে হয়। আজ একটা নতুন ছবি দেখলাম রেঞ্জারের। রোজাই মডেল। ছবিও সুন্দর। তা অবশ্যই রঙের জেল্লায়। ভাবছি তোমার মতো মডেল পেলে...

সে কী কথা?

তুমি নয়, তোমার মতো রূপসী যুবতী একজন। বসো। আধঘণ্টা গল্পটা করি। জানো, তোমাকে দেখলেও সুঘ্রাণের কথা মনে হয়।... আচ্ছা, সুচি, কালকের ডাকের সেই দামী খামের চিঠিটা তো তোমার ছোটমাসিরই?

হ্যাঁ।

তুমিতো আসতে লিখেছিলে? আসবে?

টিকলো নাকের নিচে সেখানে লাল ফুলো ফুলো ঠোঁট, সেখান থেকে উপরে ওঠে চোখের কোণের কোমল কালো, সেখান থেকে নিচে ঠোঁটের কোণে শক্তভাব। সুচেতনা বললে, লিখেছে, শাংরিলা লিখেছো বটে, আসলে ওটা ক্রিমিন্যাল কলোনি ছিল। যাদের ফাঁসিতে সরিয়ে দেয়া যায় না, তাদের ওখানে সরিয়ে দেয়া হতো। ফোর্টটার ধ্বংসস্তূপের ভিতরে নামটামও নাকি লেখা থাকতে পারে সেই সব হতভাগ্যদের।

মুরলীধর হোহো করে হেসে উঠল। বললে, সে আর বেশি কথা কী? এই তাসিলার যে ইতিহাস আছে, সমাজতত্ত্ব-ঘেঁষা ছোটমাসিমার ভালো লাগতে পারে। আদিতে সেই সীমান্তরক্ষার দুর্গনগরে কোলগ্যাসের আলো জ্বলত, পথঘাট ঝকঝক তকতক, ঝাড়ুদার পথ ঝাঁট দেয়। ঘোড়া পনি মিউল চলে; এমন কি সামনে পিছনে জন চারেক কুলি নিয়ে কম্যাডিং অফিসারের মিসেসের রিকশও চলতো হয়তো। সাসেক্স, মিডল্যান্ডস, স্কটল্যান্ডের লোকেরা ছিল, গোরস্থানের ফলকেই প্রমাণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আর্মি সরলে, ক্রমশ ডিটেনশন ক্যাম্প হয়ে উঠল দুর্গ। আর্মির হ্রাস, জেলওয়ার্ডার আর পুলিশের বৃদ্ধি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ডিটেনশন ক্যাম্পেরও প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেলে যখন এখানে অরণ্য হতে সুরু করেছে, তখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এল। শুনছো?

হ্যাঁ।

ফলে এখানকার জনগণে রিটায়ার্ড সোলজার, রিটায়ার্ড জেলওয়ার্ডারের বংশ থেকে গিয়েছে। আর্মির আর জেলের ছুতোর, কামার, ধোবা, মেথর– এদের বেকার হয়ে যাওয়া অংশও এই তাসিলাকে আঁকড়ে ধরেছিল। তাদের বংশধরদেরও কেউ কেউ আছে।

তুমি কি এবার এসব লিখবে কাগজে?

মন্দ হয় না, কী বলো? যদি এখানকার কয়েকটি পরিবারকে ধরে ধরে রাইজ অ্যান্ড ফল–মন্দ হয় না, কি বলো?... জানো হাবোল রেজিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো। রেজিস্ট্রি চিঠি, ইনসিওর

চিঠি, এসবই। নিয়ম এই, যে রেজিস্ট্রি চিঠি বিলি হল না, দিনের শেষে তা একটা সর্টিংকেসে থাকবে। যার চাবি থাকবে হাবোলের কাছে। ইনসিওরের বেলা নিয়ম আলাদা। দিনের শেষে বিলি না হওয়া ইনসিওর হাবোল পোস্টমাস্টারকে দিয়ে যাবে, তা থাকবে পোস্টমাস্টারের ট্রেজারিতে। হাবোলের বিয়ের আগেরদিন বিকেলে দুখানা ইনসিওর, হিসাব মতো, তার কাছে থাকার কথা, যার মূল্য ছিল ছ হাজার টাকা। সবাই, কেরানি বাবুরা, পোস্টম্যানরা বাড়ি চলে গেলে সন্ধ্যার পর খাতাপত্র চেক করতে গিয়ে দেখলাম, দুখানা ইনসিওর চিঠি জমা থাকার কথা। মনে পড়ল না, হাবোল সে দুটোকে ট্রেজারিতে দিয়েছে কি না। তারা খাতায় জমা দেখানো আছে, কিন্তু তার তলায় পেয়েছি বলে আমার সই নেই। ভাবলাম, দিন চারপাঁচ আগে যা হয়েছিল আবার তা হয়েছে, মনের চঞ্চলতায় হাবোল ইনসিওরগুলো ট্রেজারিতে না দিয়ে সর্টিংকেসে রেখে গিয়েছে। যখন এসব দেখছি, তখন তো রাতই হয়ে ছিয়েছে। নাইটগার্ডকে পাঠালাম হাবোলের খোঁজে। রাত এগারোটা পর্যন্ত খুঁজে নাইটগার্ড তাকে পেলে না। সে তখন বন্ধুবান্ধবদের বিয়ের নিমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছে। সকালে অফিস খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। হাবোল আসতে বললাম। সে হকচকিয়ে গেল।

বললে, ইনসিওর দিয়ে যাইনি? আশ্চর্য! নিশ্চয়ই দিয়েছি। ট্রেজারার তার সিন্দুক খুলে দেখাল, সেখানে ইনসিওর নেই। বললে, ইনসিওর দিয়ে গেলে মাস্টারমশাই-এর দস্তখত থাকতো। গত সপ্তাহের মতো হয়েছে। আপনার কি এখন মাথার ঠিক আছে? দেখুন সর্টিংকেসেই রেখে গিয়েছেন। সে এরকম বললে, বাকিদের সকলেই হাবোলের বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা করলে। শুনছো?

হ্যাঁ।

হাবোল তাড়াতাড়ি ছুটে গেল তার সর্টিংকেসের কাছে। কিন্তু কিছুতেই সর্টিংকেসের তালা খোলা গেল না। এ চাবি লাগায়, সে চাবি লাগায়, তালা খোলে না। তখন অন্য অনেকে তালা খুলতে চেষ্টা করলে। অবশেষে বোঝা গেল, অন্য কোন চাবি ঢুকিয়ে কেউ তালাটাকে নষ্ট করেছে। তালাটা ভাঙতে হল। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও ইনসিওর দুটোকে পাওয়া গেল না। তখন তো পুলিশকে খবর দিতেই হয়। আটটায় এসেছিল পুলিশ, ঘণ্টা চারেক পরে, বারোটায় ওরা হাবোলকে আরেস্ট করে নিয়ে গেল। সে সময়ে তো হাবোলের হলুদ-স্নান করার সময়! শুনছো? আজকাল কিন্তু কোন কথাতেই তুমি অবাক হও না।

বাহ্! তা কেন? এ গল্প তুমি আমাকে আগেও বলেছো দু একবার।

তা কী করা যাবে বলো? কনেপক্ষ তখন কি বিয়ে দিতে পারে? পাত্রপক্ষ তো তখন হাবোলের জামিন নিয়েই অস্থির। শুনছো? কিছু বললে? তুমি কি এখন দুপুরের বাকি রান্নাগুলো সেরে নেবে? জানো, আমি আমার সাক্ষ্যে এসবই বলেছিলাম। তালাটা খারাপ হওয়া সম্বন্ধে এই অনুমান করেছিলাম, নাইটগার্ড হাবোলকে খুঁজতে বাইরে গেলে, বাইরের কেউ তালাটাকে ট্যাম্পার করেছে, জোর করে খুলেছিল। হয়তো নাইটগার্ড বাইরে যাওয়ার সময়ে সদরের তালা দিতে ভুলেছিল। হাবোলের উকীল আমার এই অনুমান খুব কাজে লাগাতে পেরেছিল। নাইটগার্ডও জেরায় বলেছিল, তার ঠিক মনে নেই, সে বাইরের তালা বন্ধ করে বেরিয়েছিল কি না। শুনছো?... আমি বরং প্রভঞ্জনবাবুর সঙ্গে রাতের নিমন্ত্রণের কথা বলে নি।

তাড়াতাড়ি পোস্টমাস্টার রেঞ্জারকে টেলিফোন করতে অফিস ঘরে ঢুকল।

অন্যান্য দিনে যা সম্ভব নয়, ছুটির দিনে মুরলীধর তার বসবার ঘরের ছোট খাটটায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে পড়তে কখনও বা ঘুমিয়েও পড়ে। অস্থায়ী সেই দুপুরের ঘুমটা ভাঙতে তার একটা অসামঞ্জস্যর অনুভূতি হল। সে সুচেতনার খোঁজে এদিক ওদিক চাইল। বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসবার ঘরের দিকে ফিরতে তার অনুভব হল, সুচেতনাকে দেখা যাচ্ছে না। একটু ভয় হল তার। পরক্ষণেই সে হাসল– না, না, এই বিকেলের আলোয় তার সুন্দরী স্ত্রী হারিয়ে যেতে পারে না। তা যায় নি তার প্রমাণ, বাথরুমে গরম ছিল জল। তার প্রমাণ, বসবার ঘরেব দরজার বাইরে ডেকচেয়ারটার উপরে তার উলকাঁটার ঝাঁপি। আর সে তো জানেই, সেই প্রিমরোজ রং-এর সোয়েটার তার জন্যই, তাকে মানাবে বলেই, ভালোবেসে বুনছে সুচেতনা।

সে বসবার ঘরের দরজায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই কফি নিয়ে এল সুচেতনা কিচেন থেকে। বসবার ঘরের তেপায়ায় কফি রেখে সে বললে, কফি দিলাম। সেই ডেক চেয়ারটায় বসে সে কোলে উলকাঁটা তুলে নিলে। মুরলীধর কফির কাপ হাতে বাইরে এসে গদিদার মোড়া পেয়ে তাতে বসল স্ত্রীর কাছে।

সে বললে, একটা বিষয় লক্ষ করেছো, সুচি? তুমি আজকাল কম কথা বলছো।

বাহ্!

আমি কি তোমাকে সেন্ট গ্রেগ আর রোজার কথা বলেছি? আর একটা গল্প আছে, রোজা আর বিশ হাজার টাকা। শুনছো?

হ্যাঁ।

মুরলীধর ভাবলে একটু, দেখলে, সুচেতনা মুখ নিচু করে উলের ঘর গুনছে। বললে, আচ্ছা, সুচি...

বলো।

তুমি যখন প্রথম এলে, মনে আছে?... যেন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছিলে। আচ্ছা, তোমার কি এখন এখানে ভালো লাগছে না? যদি বদলির চেষ্টা করি?

হবে? তুমি রোজা আর বিশ হাজার, কী বলছিলে?

ও! আমার মনে হয়, আচ্ছা তোমার মনে হয় না?– রোজা আমার বা রেঞ্জারের চাইতে বছর দশেকের বড় হবে। এত পুষ্টাঙ্গী যে মনে হবে ছবিতে যত রং থাক, একটু ঠাট্টাও আছে। পোস্টমাস্টার অনুভব করলে, সে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠছে। যেন সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবে, এমন করছো কেন, কী হয়েছো বলো? অথচ বিকেলের রঙীন আলো ছাড়া সুচেতন'র মুখে, তার বসার ভঙ্গিতে, তার গলার স্বরে, কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে না।

সুচেতনা বললে, এখন রাতের রান্না শুরু করি।

তার লাল ঠোঁটদুটোর মধ্যে তার মুক্তোসারি দাঁত ঝিকমিক করে হেসে উঠল। সে কোল থেকে উল নামাতে নামাতে হাতের ডিজাইনে চোখ রাখলে।

মুরলীধর বললে, জানো, ক্লটলং-এরও এক গল্প আছে। কেউ কেউ তাসিলাকে ভালবেসে ফেলে। মহাযুদ্ধ চলে গেলেও ১৯২০তে এক কর্নেল অগিলভি এখানে ফিরে এসেছিল। সে সময়ের ম্যাপও আছে রেঞ্জারের কাছে। ক্লটলং-এর জায়গায় ঢেরা চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে কর্নেলের বাগিচা। তার চাইকেও পুরনো একটা ম্যাপে সেই ঢেরাচিহ্নর জায়গায় আড়াআড়ি দুটো তরোয়াল। হয়তো সেখানে এক সময়ে দারুণ সীমান্তযুদ্ধ হয়েছিল। কর্নেল অগিলভি হয়তো এখানে আমৃত্যু থাকবে ভেবে এখানে ফিরে বাগিচা করেছিল। এক মিসেস অগিলভির কবর আছে বটে, সে কিন্তু ১৮৯৯-এর।

সেই ১৮৯৯-এর স্মৃতিতে একুশ বছর পরে ফিরেছিল প্রথম মহাযুদ্ধর পরে কর্নেল অগিলভি,–এরকম মনে হয় না?

শুনছি, বলো।

আচ্ছা, সুচি, তোমার কি কোন অসুখ?

কই, না তো।

তুমি কি কলকাতায় যাবে? বলো তো কিছুদিনের ছুটি নিই।

ফ্যাকাশে মতো হাসলে সুচেতনা। কী দরকার?

সুচেতনা, একটা কথা বলি...

বলো।

তুমি তখন যেন কেমন শক্ত হয়ে যাও আজকাল।

সুচেতনার মুখটা গভীর ভাবে লাল হল। হাসির বদলে গম্ভীর হল সে মুখ। সে বললে, এই তো সেদিনেই এসব কথা হচ্ছিল। আর কাল রাতেই তো আবার... তা ছাড়া সেই পয়লা এপ্রিল...

মুরলীধরের মুখ গম্ভীর হতে গিয়ে অপ্রতিভ হল। সেই পয়লা এপ্রিলের রাতে মেলার উদ্বোধন দেখে তারা ফিরছিল। তখনও মেলা বসে নি। রকসির দু-একটা দোকানই বসেছিল। দু-একজন করে মাতাল হয়েছিল। পথের ধারে বেসামাল মাতাল স্ত্রীলোক চলেছিল দু-একজন। পথে তো প্রচুর ফুলের সমারোহ। আর সে রাতে সে ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করে এপ্রিলের মতো নির্দয় হবে বলেছিল সুচেতনাকে। আর সুচেতনা নিষেধ করতে করতে, বিছানার ধারে সরে যাচ্ছিল, পরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সুচেতনা মুখ না তুলে পোস্টমাস্টারকে দেখে নিলে। সে রাতে অন্যের কবিতা আওড়ানো হয়েছিল। দারুণ দুরন্ত আবেগ নিজেদের মধ্যে কবিতা হয়ে ওঠেনি।

ফোনের শব্দ নয়, ডাকছে বোধহয় কেউ বলে মুরলীধর তাড়াতাড়ি আবার অফিসে গিয়ে ঢুকল। অনেক ডাকাডাকির পর ওপারে রেঞ্জার সাড়া দিলে। বললে, আজ ফুটবল নামতে পারে।

মুরলীধর তেমন তাড়াতাড়ি বসবার ঘরে এল। বাইরে যাওয়ার পোশাক পরতে পরতে বললে, আজই ফুটবল নামবে, বুঝলে সুচি, যাই কী বলো? অ্যাঁ, যাই।

সুচেতনা বললে, তোমার তো বিকেলের চা খাওয়া হয় নি, তা ছাড়া, এই ট্রাউজার্সে আর শুতে ফুটবল খেলবে কি?

মুরলীধর বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, সেদিন সে খেলবে না।

ইতিপূর্বে উলকে কোলছাড়া করেছিল সুচেতনা। এখন সে তার সংসারের কিছু কাজ করে নেবে তাড়াতাড়ি। ঘরদোর বিছানা নতুন করে করার কিছু নেই। দুপুর থেকে ফিটফাট। বিকেলের খাবার করবার কথায় স্থির করলে, চায়ের সঙ্গে ফ্রেঞ্চটোস্ট করে দিলে হবে, যা পোস্টমাস্টারের বিশেষ প্রিয়। আর এখন থেকে রাতের খাবারের দিকেও যেতে হয়। রেঞ্জার নিমন্ত্রিত।

তা হলেও সে ঝাড়ন হাতে বসবার ঘরে ঢুকল, ফার্নিচারগুলো ঝাড়তে একটা কৌতুকের ব্যাপার এই হ'ল: ঘরটার শেষ প্রান্তে যে শার্সি, যা এক কাচের দেয়াল যেন, যা থেকে অফিসের সামনের রাস্তার কিছুটা চোখে পড়ে, সেখানে ছবির ফ্রেমে যেন, রোজাকে দেখতে পাওয়া গেল। এতক্ষণ রোজার কথা হচ্ছিল, আর সেই চলেছে। সাজসজ্জা রুচিসম্মত, আধুনিক নেপালি মহিলাদের মতো শাড়ি। হাতে সুদৃশ্য বাজার ব্যাগ। গায়ের রং বিশেষ ভালো। চোখে মুখে কিছু মোঙ্গলীয় ছাপ, তাতে কিন্তু বিজ্ঞাপনে দেখা জাপানী সুন্দরীদের মতো লাগছে। বোঝাই যাচ্ছে তার জনক সাদা ইংরেজ ছিল। আর এতো বোঝাই যায়, মানুষের জন্ম কোন কবিতায় নয়। তো রোজাকে চল্লিশে...

খবর কি করে আসে, তা বলা যায় না। প্রভঞ্জনবাবুর সদ্য ত্রিশ পার হয়েছে। সে তো খেলার কথাতে জানা গিয়েছিল। যেমন পোস্টমাস্টারকে খেলার মাঠের দিকে বেরিয়ে যেতে দেখে কয়েক বছর আগে যার ত্রিশ পার হয়েছে, সে রকম বয়সেরই মনে হল। তা হলেও জিজ্ঞাসা করা যায় না, হ্যাঁ গা, তোমার বয়স কতো? তার নিজের এবার ছাব্বিশ হল। পোস্টমাস্টারকে এখানে আসার আগে একটা প্রমোশনে পাকা হয়ে আর একটাতে অফিশিয়েট করতে, ত্রিশের কিছু উপরে বয়স হতে হয়।

বলতে পারো, পোস্টমাস্টার এখানেও খুব পপুলার, আর সে জন্য এতদিকের এত খবর আসে তার কাছে। ডাকঘরে যে নামে, সে গল্প না করে যায় না। কিন্তু এত জানা কী ভালো? এখানে কত লোকের বংশপরিচয়, কত প্রাচীন সংবাদ খুঁজে বেড়ায় যেন। তাতে তার নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই– যদিও কোন কোন নোংরা সংবাদ অস্বস্তি ধরায়।

সে তার বসবার ঘরেই এখানও। এখনেই তো তাদের সেই দামী স্টিরিও আর ক্লাসিক রেকর্ডগুলো, মোজার্ট, বাখ, হেডন, শোঁপ্যা, বিটোফেন। এমন কি ক্ল্যাসিকাল জ্যাজ। ভালো চেয়ার খান কয়েক। আর ওয়াড্রোব।

না, বিবাহে সে দুঃখিত কেন হবে? বরং গুমোটে জানলা খোলার মতো। সে আদৌ মেধাবী ছাত্রী ছিল না। নিজের রূপ, স্বাস্থ্য, মা যেমন একটা সংসার নিয়ে সুখী, তেমন একটা সংসারের ইচ্ছা– এসব নিয়েই সে ছিল। বইটই পড়ার ঝোঁক এখানে এসে।

আর সেই হাবোলের মামলা...

সুচেতনা থেমে দাঁড়িয়ে ভাবলে, হ্যাঁ, পোস্টমাস্টার এমন সাক্ষ্য দিয়েছিল আদালতে যার ফলে হাবোল বেনিফিট-অব ডাউটে খালাস পেয়ে যায়। ছমাস চলেছিল মামলা। প্রথমেই পোস্টমাস্টার জানিয়েছিল, সেই ঘটনার আগেও হাবোল একবার ইনসিওর ট্রেজারিতে না দিয়ে সর্টিংকেসে রেখে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত পোস্টমাস্টার স্বীকার করেছিল, রাতে নাইটগার্ড হাবোলকে খুঁজতে গেলে পোস্টমাস্টারের উচিত ছিল, পোস্টঅফিসে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়া। তা দেয়া হলে সর্টিংকেস পর্যন্ত কেউ আসতে পারতো না। তৃতীয়ত পোস্টমাস্টার স্বীকার করেছিল, হাবোল অফিস ছাড়বার আগেই তার উচিত ছিল হাবোলের খাতা রেজিস্টার চেক করা। তাহলে অফিস ছাড়বার আগেই হাবোলের ভুল ধরা পড়তো, ইনসিওর ট্রেজারি সেফে উঠে যেতো। অনেকেই বলেছে, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো পোস্টমাস্টারের ব্যক্তিত্ব যেন গলে গলে যাচ্ছিল। এসব কিন্তু এক রকম সাহস পোস্টমাস্টারের, এইভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিজেকে গলে যেতে দেয়া। যাতে হাবোল খালাস পেয়েছিল। বিয়ে ভেঙেছিল, বেল হয়নি।

সে শোবার ঘরে এসে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়াল। একবার এক সেকেন্ডের জন্য। সরে এসে মনে মনে বললে, তার ঠোঁট, নাক, মুখ, চোখ, রং কিছুই গলে যায় নি, শুকিয়েও যায় নি।

এই সময়েই হঠাৎ তার মনে হল: এটা কি পোস্টমাস্টারের এক পরিবর্তন নয়, এই এত খোঁজ-খবর নিয়ে বেড়ানো? এমন কি হতে পারে, এত বই পড়া, এত খবর সংগ্রহ, এত গবেষণাই যেন, – এসবই কোন এক অনুভূতিকে আড়ালে রাখতে? কী সে অনুভূতি?

সে চঞ্চল হয়ে বসবার ঘরে গিয়ে ওয়াড্রোব খুললে। সে পোশাক খুঁজতে লাগল। সন্ধ্যার আগেই সে পোশাক পরে নেবে। তার বিকেলের আর রাতের পোশাক নানা রঙের সুদৃশ্য স্বচ্ছ ম্যাক্সি। এটা পোস্টমাস্টারের শখও বটে। তা ছাড়া আজ রাতে তো গেস্টও আছে। এদিকে দেখো, ইন্দ্রবাহাদুর আর পুষ্পমায়া এখনও আসছে না আজ। সে নিজেকে বোঝালে, আকৃতিটাকে, ফর্মটাকে, চেহারাটাকে ঠিক রাখতে হয় না সংসারের?

সে রাতে রেঞ্জারকে নিয়ে ডিনার শেষ করতে বেগ পেতে হল না। রাত দশটাতেই প্রভঞ্জন

চলে গেলে, পোস্টমাস্টার সুচেতনাকে দেখে যেন অবাক হয়ে গেল। খুশিতে কথা বলতে গিয়ে সসঙ্কোচে মাথা নামালে।

তাদের সামনে দুকাপ কফি।

পোস্টমাস্টার বললে, আমাকে এখন সাবধান হতে হয়।

সে কি? কেন?

দেখ, রূপ... মানে আমাদের রেঞ্জার তো চিত্রী, আমার চাইতে অনেক বেশী রূপদক্ষ। যদি একদিন তাঁর তোমার ছবি আঁকতে ইচ্ছা হয়?

তা হলে কি আমার উপরে তাঁর দাবি বেশি হয়? এরকম উদার হচ্ছো?

পোস্টমাস্টার বললে, না, না। সে টেনে টেনে হাসল।

দু এক মিনিট পরে সে বললে, আচ্ছা, সুচি, আমি যদি, মনে করো, মালাধর বসু হই?

মালাধর? সে তো অন্য কেউ।...

হ্যাঁ।

বুঝিয়ে বলো। সে তো সেকালের অন্য একজন লেখক শুনেছি।

পোস্টমাস্টার যেন সম্বিত পেলে। আবার জোরে জোরে হাসল। বললে, মানে এখন থেকে যা কিছু লিখবো, যেমন তোমাকে বলেছিলাম, তাতে মালাধর বসু ছদ্মনাম নিলে কেমন হয়? তোমার কি সেই আর একজনের স্ত্রী হতে আপত্তি আছে?

সুচেতনা বললে, তাই বলো!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১

তখন তাসিলার মে মাস শেষ হতে চলেছে, এমন মনে পড়ছে।

এখানে ঘরে ঘরে ক্যালেন্ডার আছে বটে, কিন্তু ক্যালেন্ডারের সেই নানা রঙের ঘরগুলোর মধ্যে বাস করা যায় কি? মেঘহীন পরিচ্ছন্ন আলোর দিনগুলি চলেছে, কৃষ্ণকালের রাত্রিগুলি কারো চুমকিদার কালো সিল্ক মনে হতে পারে। কিন্তু দিনের বাটিকের কাজ করা দুকুল এবং রাত্রির সিল্ক এমন একজনের যে আমাদের সম্বন্ধে নিস্পৃহ।

স্বীকার করি, এ তুলনাগুলি আমার নয়। পোস্টমাস্টার মুরলীধরের। শ্রোতা রেঞ্জার প্রভঞ্জন।

সে বললে, আচ্ছা, মশায়, সেই নিস্পৃহকে ছেড়ে দিন। সময়কে অনেকেই স্রোত বলেছে। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলিকে সেই স্রোতে নৌকা বললে, নিস্পৃহ স্রোতই হোক, কিছু ভরসা হয় কি? সময়কে নিস্পৃহ বলে চলে যেতে দিলে, আমরাই থাকছি কি? কিছু থাকছে?

মুরলীধর টেবলটেনিসের ব্যাটটাকে হাতে করে কাল্পনিক একটা বলকে অদৃশ্য নেটের উপর দিয়ে সার্ভ করে বললে, কেন কিছু থাকছে না? আপনার সেই স্নেহনত স্তনের অ্যামারান্থলাল চুচুকবৃত্ত, অনেকদিন হয়, কূল পাক না পাক, সময়-নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়েছে বটে। আসুন বসি, নরবু যদি চা খাওয়ায়।

প্রভঞ্জন হাঁকাহাঁকি করে বললে, অ, নরবু কফি। যদি এখানকার স্টক ফুরিয়ে থাকে, জল চাপিয়ে আমার বাংলো থেকে দৌড়ে আনো। মেয়রকে দেখছি না।

জু, সার, মেয়র সাব হাটমা গয়ো সার। আইলে দিনছু কফি।

নরবু মেয়রের হাটে যাওয়ার সংবাদ দিয়ে কফি করতে গেল। তাদের চারিদিকে মেয়র-বাংলোর খেলাঘরে যে আলো, তা মেয়রের হাটে যাওয়ার খবরে বোঝা যায় বৈকালের হবে।

মুরলীধর বললে, আমার যদি আপনাকে কমিশন করার টাকা থাকতো!

মনে করুন তা আছে। পরে বলুন।

সুচেতনার একটা ছবি আঁকতে বলতুম।

সুচেতনার? প্রভঞ্জন তার লম্বা আঙুলগুলোকে একত্র করলে ভাবতে। বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, নিলুম কমিশন। একটা পুরো টাকা। সে হাসল। বললে, দেখবেন মশায়, সস্ত্রীক সময়–যান থেকে নেমে পড়ার মতলব নয় তো?

কেউই কথায় হারার নয়। মুরলীধর কি বিশ্বাস করে, ভাবলে প্রভঞ্জন, আর্ট মানুষকে সেই এক গভীরতার স্বাদ দেয়, যখন জীবনকে ক্যালেন্ডারের ছকে আবদ্ধ মনে হয় না। কিংবা নিস্পৃহ সময়ের ভেলায় ভাসমান মনে হয় না নিজেকে?

একসময়ে, তা তার কোয়ার্টারে ফিরেও হতে পারে, মুরলীধর আশঙ্কা বোধ করলে। সময়ের মাপজোখ থেকে চোখ সরালে সময়কে অস্বচ্ছ অথচ সীমাহীন কুয়াশাস্রোত মনে হয়, যা কী ভয়ংকর অনাব্য এবং দুস্তর। ক্যালেন্ডার আর তার তারিখ-তিথির খোপগুলোকে কি এড়ানো যায়ই না? তা হলেই কি সেই স্রোতে পড়ার আশঙ্কা?

২

ফোর্টের টিলা থেকে পশ্চিমমুখো এক স্পার আছে। তার উপরে একটা পায়েচলা পথও আছে, যা বিরিক ব্লকে নামে নারেঙ্গিহাটের দুমাইল আগে। পথটা কোথাও ঢালু হয়ে নেমেছে, কোথাও সিঁড়ি ভেঙেছে, কোথাও একশোগজ দু ফিটেরও কম চওড়া, কিন্তু ক্রমাগত উঠেছে। কোর্টের কাছে দাঁড়িয়ে একদিন কয়েকটি হরিণ-মার্কা ছেলেমেয়েকে সে সেই পথে যেতে দেখেছিল। নাকি পথের ধারে বুনো আলুবখরার গাছ, আর গাছে কাঁচা পাকা ফল। এই পথের উপরেই একদিন কয়েকটা ভেঁরুলকে চরতে দেখেছিল সে। আশ্চর্য, পড়ে যায় না! ভেঁরুলও আশ্চর্য। না ভেড়া, না ছাগল, অথচ বুনো লোমশ ছাগ।

সেদিন হাটে যেতে ময়ূর এই পথে চলতে শুরু করলে। তখনও এই পথে টাটকা আলো লুটোপুটি করছে। সেই ট্রেনকামরায় পাওয়া জিন পরেছে আবার। টকটকে লালে সোনালি গুল বসানো, বেশ বড় একটা রুমাল গলায় টাইয়ের মতো বেঁধেছে। হাতের লাঠিটা ক্র্যাম্পন-মতো, ডগায় লোহার টুপি। জুতোজোড়াটাও ফুটবলবুটের মতো, সোলে চামড়ার দাঁত। এসব হঠাৎ আবিষ্কার হয়েছে একদিন বাংলোর স্টোররুমে। নিশ্চয়ই কোন ডিএফওর ফেলে যাওয়া। মনে হতে পারে, এসব হাতের কাছে পাওয়াতে এই দুস্তর পথে এসেছে সে।

ইতিমধ্যে একবার দেড় ফুট চওড়া এক ঝুলন্ত লেজ দিয়ে চলতে হয়েছে গজ দশেক। পথটা ধ্বসে ওইটুকুই অবশিষ্ট। পার হয়ে একে পিছন ফিরে দেখতে ভয় হয়। সামনেও আশ্বাস নেই। পরের পথও এমন সংকীর্ণ হয়ে একটা পাইনের গোড়ায় পৌঁছেছে, যে মনে হয়, কিছু ধরে চলতে না পারলে তিন-চারশো ফুট গড়িয়ে পড়তে হবে। লাঠির ডগা পাথরের খাঁজে খাঁজে গুঁজে পথটুকু একপা একপা করে নামতে এক তীব্র নেশা-হেন সুখও বোধ হচ্ছে তার। পাইনের তলায় পৌঁছে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে গা শির শির করল, তাতেই যেন সেই

ট্র্যাফিকের ব্যালান্স হারিয়ে যাবে।

আর ব্যালান্স হারাতে থাকলে যেমন টালমাটাল করে সেটাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করতে হয়, তেমন তার বিপজ্জনক নির্জনতার অনুভূতিগুলি কথা হওয়ার জন্য কাঁপতে থাকল।

পিছন দিকে ফোর্টের ধ্বংসাবশেষ একটা ছোট সাদা বাক্সের মতো। দুদিকে গড়িয়ে থাকা পাহাড়ের গায়ে জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। বাঁ দিকের ঢালটা কোথায় কোন গভীরে নেমেছে, বলা যায় না। ভাগ্যে বনের দেয়াল সেই ভয়াবহ পতনকে আড়াল করে। এখানে সঙ্গী বলতে হলুদছাপ লাগা নীল-সাদা আকাশ। যা হাত বাড়িয়ে ধরা যাবে না। ডান দিকে একটা অনেকদিনের পরিতক্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ একটা ধ্বসের গায়ে। আর পায়ের নিচে দেড়ফুট চওড়া পথ। কবি হলে সে বলতে পারতো, এটাই আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু হঠাৎ যেন সম্বিত পেল সে। কেউ কি তার পিছনে? চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, এমন কি তার বুকের ধকধক শব্দও।

হঠাৎ ময়ূর বুঝতে পারল যেন। না, কেউ তাকে এখানে ঠেলে নি। সে স্থির করেছিল, সে নিচের গভীর উপত্যকায় আর নামবে না। তার ফলেই সে আজ এই উঁচু রাস্তাটা বেছে নিয়েছে। তাসিলার ত্বকেই চলবে, এই ভাবতে গিয়েই এখানে সে আজ। না, না, কেউ তাকে ডেকে এনে ফেলে দিতে চায় নি গভীর খাদে। সে তো বিশেষ ধরনের বুট পরেছে আজ, বিশেষ ধরনের লাঠি হাতে। তা হলে বলতে হয়, উদ্দেশ্য গোপন করতে সেই কেউ বুট আর লাঠির লোভ দেখিয়েছে।

সেটাও বেশ কৌতুকের হয়েছিল। একজনের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, সে দিন সে গ্রেগ অ্যাভেন্যুর সেই নির্জনতায় উপস্থিত কেন। বোঝা যায়নি, আগে থেকে গ্রেগ অ্যাভেন্যুর পাশের সেই গভীর উপত্যকায় নামতে ইচ্ছা হয়েছিল বলেই সে সেদিকে গিয়েছিল। কেন? রাতের গভীর বনে যে গভীরতা, সেই উপত্যকায় দিনের আলোতে তেমন গভীরতা?

কিন্তু কী হয় গভীরতায় নেমে, যা যেন তাসিলার অন্তঃকরণ? না, তা কেন? বরং বিপরীত। সে তো গভীরে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, অথচ তা পাহাড়ের ত্বকও আবার।

ময়ূর চমকে থমকে দাঁড়াল। পথটা আগে চওড়া ছিল হয়তো, এখন তার খানিকটা ধ্বসে গিয়ে একহাত চওড়াও নয়। আর তার উপরে পথ জুড়ে একটা ভেঁরুল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, শুধু চোখের মণি নাড়িয়ে সে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলে। কেমন এক দলছাড়া বুড়ো ভেঁরুল। আসল কথা এই সংকীর্ণ পা রাখার জায়গাটা কে তাকে ছাড়বে?

তো, একজন তো জেনেই ফেলেছে, একজন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। নিঃশ্বাস আর বুকের শব্দই প্রমাণ। ময়ূর দেখলে পালানোর চেষ্টায় ভেঁরুলটার শরীর নয় শুধু, চোয়ালটাও সূচলো হয়ে যাচ্ছে। সে বললে, ধ্যেৎ।

তো একজন তো এখন জেনেই ফেলেছে, সেই প্রভাতের দিকে ছুটে যাওয়া ফসফরাস–জ্বলা ঝর্নার জলে যাকে সে ভাসতে দেখেছিল, সেটা কাঠের গুঁড়ি না, একটা মৃতদেহই, আর সে মৃতদেহটা নিজেই সে।

তো, এখন এই ময়ূর, যেমন কাল নির্জন বিকেলে বাংলোর আয়নার সামনে দাঁড়াতেই, গায়ের রঙে, শরীরের উচ্চতায়, চোয়ালের গড়নে, নাকের ঢালে, এমন কি চুলের মধ্যে এক গোছা সোনালি রঙের খেইয়ে সেই গোঁসাই নামের সেই মহীন্দ্রকে, যে এক হস্তশিল্প সংস্থার একজিকিউটিভ আর হতভাগ্য মুরারিকৃষ্ণের জননী যাকে তা সত্ত্বেও ভাগনে বলে থাকে, দেখতে পাবে ; এমনকি আয়নার সামনে না দাঁড়ালেও, কাচের শার্সিতেও।

বরং এটাকে প্রশ্ন করে রাখা যায়, এতদিন দেরি হল কেন জানতে?

এই হতে পারে, মুরারিকৃষ্ণকে মেরে ফেলার পরে মোর যখন রাধন বুঁচকুর সঙ্গে হকার-

ফুটপাতের ভিখারি থেকে ক্রমশ, দাড়ি গোঁফ, লম্বা চুল, চোখঢাকা কালো চশমায়, রোদে পুড়ে কালো চামড়ার সেই মোর কেনই বা আয়নার সামনে দাঁড়ায়? নাকি কোন কোন রোগ যেমন যৌবন আসার অপেক্ষায় শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, এই গোঁসাই সে রকম অপেক্ষা করছিল তার যৌবনের? তাসিলার স্থিরতায়, নিয়মিত জীবনে, শরীরের ধুলো মুছে যেতেই সে আত্মপ্রকাশ করলে। এটা এখন বিস্ময় নয়। বিস্ময়, কী অকল্পনীয় শয়তানিতে, কী সামান্য আড়ালে এতদিন আত্মগোপন করে ছিল সে!

ময়ূর অবাক হল। ভেঁরুলটা কোথায় কিভাবে তাকে পার হতে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কোথাও সেটাকে দেখা যাচ্ছে না।

সে পাহাড়ের মানুষ নয়। এসব পথে তার বুকে অসুবিধা হতেই পারে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দম নিয়ে সে নামতে লাগল। সে নিজেকে বললে, সাবধান হতে হয় না? সে নিজে যতটুকু সত্য একজন, সেটুকু যদি চলে যায়, মৃতদেহটা এই জিন, রুমাল-টাই, ক্র্যাম্পনলাঠি, পাহাড়ের বুট সত্ত্বেও সেই মহীগোঁসাই হয়ে যাবে, যে অনায়াসে এক জননীকে এক সকালে হঠাৎ চওড়া নিতম্বের স্ত্রীলোক প্রমাণ করতে পারে।

ময়ূর নিজের চারিদিকে চেয়ে নিয়ে পথটাকেও পরীক্ষা করলে। পরে সেই ময়ূরকে অনুসরণ করলে যে সুন্দর ইম্পিরিয়ালে মেয়র। সে একটা জয়ই যেন অনুভব করলে।

সে তো সেদিন রেঞ্জার সাহেবের ছবি দেখতে দেখতে অবাক হয়েছিল ভেবে—দেখো কত গভীর, কিন্তু ক্যানভাসের পিছনে কিছু নেই। সেই গভীরতার কিছু বেধ থাকে না। অথচ কত সজীবতা সে গভীরতায়।

আর, সে হাসল, চালাকি করে আড়চোখে চারদিক দেখে নিলে, আসলে মেয়রও তো ডিএফওর আঁকা এক ছবি। আসলে গ্রেগ অ্যাভেন্যুর সেই গভীর উপত্যকায় নেমে দেখার যে সুখের আশ্বাস সেটাই ভুল হয়েছিল। সেই গভীর নির্জনতায় শিকড় ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে একটা গাছের মতো স্তব্ধ সুখী প্রতিষ্ঠিত হতে চাওয়া ভুল ছিল।

কিছুক্ষণ সতর্কভাবে ছবিটাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চলতে ময়ূর দেখতে পেলে, বিরিক ব্লকের ঘরবাড়ি তার পায়ের দু-তিনশো ফুট নিচে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাসিলায় ওঠার প্রধান পথ বরাবর কাঠ আর টিনে তৈরি কয়েকখানা ঘর। টিনে কোন সময়ে লাল রং ছিল। সে জন্য চারপাশের বাদামি, গেরুয়া, সবুজ-- এসব থেকে পৃথক। ওখানে পিডব্লু বিভাগের কিছু স্টোর, একটা লাইট রোলার, একজন এঞ্জিনিয়ার, আর তার কিছু লোকজন থাকে। সরু ফিতের মতো রাস্তার উপরে ছবিতে আঁকা ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষ দেখা যাচ্ছে যেন। বাহ্, বেশ তো!

ও, এটা সেই এঞ্জিনিয়ারের এক আস্তানা, যে বলেছিল, পাপী ছাড়া কেউ তাসিলায় নির্বাসিত হয় না। ওদিকে, কিন্তু, রেঞ্জ অফিসের তারা, সেই পয়লা মে তে, সে রকম না বললেও যেন নির্বাস থেকে পালাতে চাইছিল। যেন ক্যানভাসে রাখা চেহারাগুলো ছিটকে ক্যানভাসের বাইরে চলে যাবে।

কিন্তু কেউ যদি তাসিলার জন্যই তৈরি হয়ে থাকে, ডিএফওর তৈরি ছবিই তো, বেধহীন ক্যানভাস হলেও, সেই কেউ কি ক্যানভাসের বাইরে লাফিয়ে পড়তে পারে? তা কি সেই মৃত মুরারিকৃষ্ণের সাময়িক অ্যাম্নেশিয়া? কিংবা রাধনদের সেই বডির, মোরার, মোরের কিছু আর মনে না আনার প্রবল প্রতিরোধ? তার পর একদিন নিজের চুলে এক খেই মেটে সোনালি চুল দেখে হেরে যাওয়া? কিংবা এক নির্বোধ আশা মুরারি পোষণ করেছিল, যখন তার বারো-তের বছরের বোন তাকে জড়িয়ে ধরে বুকভাঙা কান্নায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার জন্মের আগে থেকে যে জেলে সেই তার জনক কি করে তা লোককে বোঝাবে, সে সময়েও এই আশা সে ধরে রেখেছিল ফেরারি

ফৌজ তার নিজের জনক হতে পারে?

ময়ূর নিজেকে বললে, পথটাকেই ভালো করে দেখো। সে সঙ্গে সঙ্গে আলুবখরার লাল সবুজ বর্তুল দেখতে পেলে। এই দেখো পথটা কেমন হয়েছে এখানে। তিন দিকে নানা উচ্চতার ছোটবড় টিলা। আর সেই সব টিলার নানা বঙ্কিম রেখা, ভাঁজ, বর্তুলতা। সোজা শাল, অজগরহেন বিচিত্র দোল খাওয়া লতা। এই নাগকেশর, এই অর্জুন, এই কিন্তু বার্চ, এরকম মনে মনে বলে সে নামতে লাগল।

তার মনে পড়ল, বিরিক ব্লক ছাড়িয়ে একটা লুপ আছে। প্রধান পথের মুখে একটা টানেল। উঠে লুপের নিচের রিংটা শুরু হয়েছে। এক সময়ে মোটরগাড়ি তুলবে এরকম পরিকল্পনা ছিল, তা তুলবার দরকার হল না। লুপটা খানিকদূর উঠে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু যার পরিকল্পনা সেই লুপ, তার ইচ্ছা ছিল লুপটা দৃষ্টিনন্দন করতে। নানা রঙীন পাতা ও ফুলের গাছ লাগিয়েছে। কিন্তু লুপের সব উপরের রিংটায় পৌঁছানো এক সমস্যা। সুতরাং সে এক পাকদণ্ডি পেতেই নিচের প্রধান পথে নেমে গেল। এখানে আর পথটা পিচের নয়।

টানেল সমেত সুন্দর লুপটার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে বুঝতে পারলে, সে রেলস্টেশনের ধারের সেই বুড়ী নান্নীর কথা ভাবছে। সেই হালকানীল চোখ, সেই টিকলো নাক, ভাঁজধরা গেরুয়া ত্বক, খয়েরি-সাদায় মিশানো চুল। যার কথা কেউ মনে রাখে না আর। রক্তমাংসের মানুষ, কিন্তু যেন স্বপ্ন। বাবা হয়তো ইংরেজ ছিল। এখন এক স্তিমিত ছায়া।

হঠাৎ এক বিচিত্র গানের সুরে নান্নী চলে গেল। একদল কিশোরকিশোরী গান গাইতে গাইতে পাকদণ্ডি বেয়ে তার সামনে নেমে তরতর করে নিশ্চয়ই বাজারের পথে চলেছে। ডম্বরি নাকি? সে কি ডম্বরি বলে ডাকবে? উত্তরের বদলে কেউ যেন একরাশি সুর আর কথা ছুঁড়ে দিল। কাঙ্গালামা গোম্ফামা, টাওকো ঠোকে ঢোঙ্গামা। কে এক ছোট লামা গুম্ফায় পাথরে মাথা ঠোকে।

সে নারেঙ্গিহাটে পৌঁছে দেখলে সেখানে উজ্জ্বল আলোতে হাট বসেছে। অনেকদিন পরে, তা অ্যাকসিডেন্টের পরে এই প্রথম, সে আবার হাটে এসেছে। ময়ূর বললে নিজেকে, না হাটটাকে দেখো। ওই তো উঁচু উঁচু মাঠের খুঁটির উপরে প্যাগোডা গড়নের কগিয়েনচং-এর বাড়ি। যার নিচের খোলা বাঁধানো চত্বরে এখানকার সব চাইতে ভাল চায়ের দোকান যা হাটের দিন ছাড়াও থাকে। তাসিলা পাহাড়ে উঠবার আগে অনেকেই সেখানে জিরিয়ে চা খেয়ে নেয়। এতদিনে নারেঙ্গিহাট তার পরিচিতই, তবুও সে স্থায়ী টিনের ছাদের টিনের দেয়ালের দোকান কয়েকটি দেখলে। পাতার ছাদ, পাতার বেড়ার অস্থায়ী দোকানগুলোকে লক্ষ্য করলে। সে খানিকটা সময় এদিক ওদিক ঘুরল। যেখানে মাখন বিক্রি হচ্ছে সেখানে এক কোণে সত্যি ডম্বরিকে শালপাতায় রাখা হলুদ তাল তাল মাখন বিক্রি করতে দেখলে সে। একটা দোকান থেকে সে একটা বড় তোয়ালে কিনলে, আর এক দোকান থেকে একটা গেঞ্জি। সেগুলোকে ঝোলায় পুরে, বড় চায়ের দোকানটায় বসে পিতলের গ্লাস রুমালে জড়িয়ে ধরে আগুন গরম চা খেলে। দোকানদার তো বটেই, চা-পায়ীদের অনেকেই তার পরিচিত। মেয়রের অ্যাকসিডেন্টের কথা তারা অনেকেই জানে, তারা সে বিষয়ে শুনতে চাইল, কোথায় ভেঙেছিল তাও তাদের দেখাতে হল। এইভাবে ঘণ্টাখানেক পার হলে সে উঠে পড়ল। এই সময়ে তাকে দেখলে তার চোখদুটিকে আবার বিশিষ্ট মনে হতে পারতো। বড় চোখ, কিন্তু কখনও তা উজ্জ্বল, কখনও যেন তাতে ছায়া পড়ছে।

সে ততক্ষণে হাটের প্রান্তে সেই বাসদুটিকে দেখতে পেলে, যে দুটি সপ্তাহে দুবার, হাটের দিনে, এই পর্যন্ত আসে বাইরের পৃথিবী থেকে। সেই জায়গাতেই থেমেছে যেখানে পাহাড়ের দেয়াল ফাটিয়ে একটা প্রাকৃতিক দরওয়াজা। সে জানে, এই বড় ফাটলটা পেরিয়ে গেলে তাসিলা রোড স্টেশনে যাওয়ার পথ, যা থেকে বেরিয়ে জাকিগঞ্জে যাওয়া যায়। আর স্টেশনে যাওয়ার সেই পথের উপরেই

সেই ভঙ্গুর মাটির পাহাড়ের উপরে সেই জোড়া বটগাছ যাতে অর্কিড ছিল। আর সেই অর্কিডের গাছ যাতে উঠতে তার অ্যাকসিডেন্ট, তার সামনে দিয়েই সেই অদ্ভুত নদী, যাতে যত বালি আর পাথর তার তুলনায় জল নেই। অথচ বালি আর পাথর দেখে তাকে নদী বলতেই চেষ্টা হয়। নদীর দুপারে গাছ। সেই গাছগুলো থেকে অনেক মোটা মোটা লতা যার গায়ে অনেক গাঁট, যার পাতাগুলো মানপাতার মতো বড়, ঝুলছে সেই অতীত কালের নদীর উপরে। গুমছে তাকে একদিন বলেছিল, অনেক আগে এই নদীটায় বারোমাস জল থাকতো। একবার যেখানে পাহাড়ের গায়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছে সেখানেই ধ্বস নেমে জলের উৎসই চাপা পড়েছে। এখন বর্ষায় কয়েকদিন পাহাড় গড়িয়ে নামা জল বয়ে যায়। পরপর দুদিন বৃষ্টি না হলে শুকনো খটখটে হয়ে যায়।

ময়ূর ভাবলে, সেই নদীর খালে নেমে পড়ে। এটা দুপার থেকে গভীর দেখায় বটে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ত্বকের উপরেই থাকে, অন্তরে যায় না। এটা অতীত কিন্তু স্রোতে টানে না।

সে কিছুক্ষণ চলে একটা বরং বড়মাপের পাথর বেয়ে তার উপরে বসে পড়ে দিন শেষ হওয়া দেখতে লাগল।

এই সময়েই তার মনে পড়ল, এই নদীর কথা বলতে গিয়ে আর এক কৌতুকের কথা বলেছিল গুমছে। এই ছবি-ছবি নদীর বালির নিচে কখনও কখনও পাথর হয়ে যাওয়া গাছ, পাতাসমেত গাছের ডাল, এমন পাওয়া যায়। কখনও কখনও বর্ষায় বালি ধুয়ে গেলে বালির উপরেও সে রকম পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাথরই, কিন্তু হুবহু গাছের কাণ্ড, ডাল, পাতা। দেখলে মনে হবে, পাতাসমেত একটা ডালই, আসলে পাথর হয়ে যাওয়া, জীবিতই যেন কিন্তু পাথর।

গুমছে বোঝাতে অনেকটা সময় নিয়েছিল। ময়ূরের মনে হল খুঁজে দেখলে হয় সে রকম জীবিত পাথর। সে স্থির করলে, সে রকম এক পাতা-সমেত পাথর হওয়া অতীতের সজীবতা পেলে সে তার কাছে রাখতে পারে।

৩

জেন থেনডুপের কাছে থেকে চা নেয়ার আগেই টেবলল্যাম্পটা জ্বালালে। এই সুদৃশ্য পেট্রল ল্যাম্পটাও অসওয়ালের উপহার। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আলো জ্বালাতেই হয়।

চা খেতে খেতে তার আবার ইউনাইটেড মিশনের সেক্রেটারি টোবি স্মোলেটের চিঠির কথা মনে হল। দুপুরে দিয়ে গিয়েছে চিঠিটা। এত সহজে তার প্রস্তাব গৃহীত হবে, ভাবা যায় নি। স্মোলেট লিখেছে, হসপিট্যাল নয়, একটা ক্লিনিক হোক। আউটডোর থাকবে। পাঁচটা ছয়টা বেডও। জেনের এই প্রস্তাব বোর্ড মেনে নিচ্ছে। বর্ষার পর থেকে যাতে কাজ শুরু করা যায়, সেজন্য জেন যেন অবিলম্বে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী বিলডিং প্ল্যান এখনই পাঠায়।

খুবই ভাল সংবাদ। চিঠিটা চা খেতে খেতেই আবার পড়ল সে। আর তা করতে যেন ক্লিনিকের একটা সাদা দেয়ালও দেখতে পেল সে।

চা শেষ হলে সে ভাবলে: অসওয়াল আর শর্মা দুজনেই, গল্পের ছলে এখানে হসপিটালের মতো কিছু একটা করার কথা সে তুলতেই, নানা ভাবে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। সহজে বিলডিং মেটিরিয়্যাল যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে আগ্রহ দেখিয়েছে। তা হলেও ক্লিনিকের বিলডিং তুলতেই, যত ছোট আর কমপ্যাক্ট করে তোলা হোক, পঞ্চাশ-ষাট হাজারের কমে কিছুতেই হবে না। এরপরে বেড রাখবার খরচ, ওষুধ, যন্ত্রাদি, রোগীর পথ্য, অ্যাটেন্ড্যান্টের বেতন, যা প্রতিনিয়ত খরচ হতে থাকবে। প্রথমেই সব মিলিয়ে লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাবে।

জেন স্থির করলে, এখন এঘর ওঘর পায়চারি করে পরে বই নিয়ে বসতে পারে যতক্ষণ না থেনডুপের রান্না শেষ হয়। থেনডুপ কিচেনে রান্না করছে। বুড়ো নার্মগিয়াল ইতিমধ্যে বিছানায় উঠে এসেছে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারহীন মানুষটা এখন যেন বয়সের ভার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বয়ে সন্ধ্যা হতে না হতেই শয্যায় যেতে চায়। ঘুমিয়ে পড়ে না থেনডুপের রান্না হয় না বলে।

হঠাৎ যেন ঘনায়মান সন্ধ্যার নির্জনতায় সে অবাক হয়ে গেল। যেন প্রতি সন্ধ্যাতেই এরকম হচ্ছে না! তারপর যে চিন্তাটা অনুভূতি আনছে, সেটা মুখর হল। অত টাকা খরচের পরে তখন ক্লিনিকটা নোঙ্গরের মতো হবে। তখন কিন্তু নিজেকে ভাসিয়ে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ তা হলে, এই ক্লুটলং, না হয় তার সঙ্গে তাসিলাও যুক্ত হল, একজনের সারা জীবনের একমাত্র পৃথিবী হয়ে যাচ্ছে।

এই চিন্তাটাই তাকে যেন ঠেলে তার সেই বসবার ঘরে, যেখানে বই, সেখানে টেবলল্যাম্পের ধারে ঠেলে দিল। সে একটা বই টেনে নিলে। কিন্তু খুলতে খুলতে সে মনে মনে বললে, আদিম পৃথিবী তো পাওয়া যায় না, বড়জোর এই পাঁচবেডযুক্ত ক্লিনিক যেখানে, সেই কোথাও না, যার পরিমাপ নাকি পঞ্চাশ একর। তা ছাড়া এটা বাস্তব, যে বিংশ শতক আউট অব ডেট, যা সব সময়েই ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল অনেক আগেই গ্রাউন্ডেড করা উচিত ছিল, তা থেকে নামলে এই অষ্টাদশ শতকেই পৌঁছাও। আর কোন ভাল বিংশ শতক পাও না।

চিন্তাটায় যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে, সে হাতের বইটাকে বদলে অন্য একটা বই টেনে নিলে।

আর অনুভব করলে: এখানে অবশ্যই পেট্রলল্যাম্পের আলোয় প্রতি রাত্রিতেই এমন বই পড়া, অন্ধকারে গা শিরশির করা, এই নির্জনতা, কাল যা হয়েছিল আজও ঠিক তাই হওয়া। সেই প্লেন অকেজো, এখানে কিন্তু হাঁটা, হাঁটা।

কিন্তু কী বা অন্য কিছু হতে পারতো? প্র্যাকটিস, ওয়াইন, সেক্স? লখনৌ কিংবা আরও কোন বড় আর ফাস্টার শহরে? বলবে, ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পর থেকে ডাকোস্টার সেই ডিসিপ্লিন আলগা হতে থাকায় সে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না?

না, না, এখানে কেউ তাকে জোর করে পাঠায় নি। বরং সে এখানে আসার প্রস্তাব করলে ডাকোস্টা, কোহেন, স্মোলেট সকলেই আপত্তি করেছিল।

একটা অভিমানের মতো কিছু অনুভব করলে সে। অনেকে যা পারে, তা সে পারে না কেন? অন্য অনেকের যা হয় না, তার কেন হল? সে কেন কেউই নয়? এতে বোঝাই যায়, সে কে তা কখনও কেউ খুঁজে পাবে না। জেন এয়ার তো উপন্যাসের চরিত্র।

হঠাৎ সে যেন এক দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হল। সে যেন নিজের চিন্তাটাকে কিছুতেই চিনতে পারছে না। যে মুহূর্তে সে যে কেউ এটা জানার সুযোগ এসেছিল, সে কি সেই মুহূর্তে নিজের পরিচয়কে মুছে দিয়েছে? না, না। তার কোন প্রমাণ নেই, ভাবলে সে। হ্যাঁ, কিংবা না, কোনটারই প্রমাণ হয় না বলেই তা ভয়ের। সেই ব্রেন অপারেশনের রোগী মেরিয়ান রয়? প্রমাণ থাকলে তো বলাই যেতো পুলিশকে, ডক্টর জেন এয়ার সে রকম রোগীর মৃত্যুর কারণ। কালপেবল হোমিসাইড। নিজের পরিচয় দিলে রোগিনী বেঁচে যেতো। ধরুন আমাকে। তা হলে একটা পরিসমাপ্তি হতো।

সে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে উঠে বসল। ঢোক গিললে। নতুন কী এ চিন্তায়? এই অষ্টাদশ শতকের এই পঞ্চাশ একর গ্রামে কতদিন ভাবতে হবে এই ভাবনাই। সে ভাবলে, দেখো, এসব হয়তো মনস্তত্ত্বের কথা, যা তুমি প্রায় কিছুই জানো না। আসলে এটা হয়তো সেই বাড়ি হারিয়ে ফেলার ট্রমা। সেটাই বড় একটা কিছু হয়তো। কিন্তু তা না হলেও কি আমরা প্রকৃতপক্ষে কেউ? অনেকেই

কি বাড়ি হারিয়ে ফেলি না?

কিংবা এটাই জেন এয়ারের চরিত্র। সে হাসল। আজ বই পড়াই হবে না মনে হচ্ছে। ভাবলে, চরিত্রই কথাটা, যা তাকে লখনৌ শহর, ইলেট্রিক ঔজ্জ্বল্য, লম্বা মোটরের মেটালিক হর্ন, ওয়াইন, সেক্সে আশ্রয় নিতে দেয় নি। সে জেন এয়ার নামে যে উপন্যাসটা হাতে নিয়েছিল তা র‍্যাকে রেখে দিলে।

ও, হ্যাঁ, চরিত্র। ডাকোস্টাও পড়ছিলেন সম্ভবত স্টার্ন কিংবা টোবি স্মোলেটের উপন্যাসটা। দুজনের কারো উপন্যাসেই চরিত্র, এমন কি গল্পও প্রাধান্য পায় না। ডাকোস্টাই বলেছিলেন, কাব্যে, নাটকে, উপন্যাস খোঁজা, সব কিছু চরিত্র থেকে জন্মায় মনে করা, উনবিংশ শতাব্দীর ক্রিটিকদের রোগ। আর তার পরে হেসে বলেছিলেন, সেই সব আনস্ক্রুপুলাস বিবেকহীন অ্যাডভেনচারিস্ট যারা আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায় টাকা করতো, আর সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি করতো তারাই সমাজে মুখ্য ছিল। দেখানো হতো আদর্শ চরিত্র বলে। যা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীতে এমন কি শেক্সপীয়ারের নাটকেও চরিত্রই মূলবিষয়, এরকম মনে করা শুরু হয়। ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রী হেসে উঠলে, অধ্যাপিকা ডাকোস্টা বলেছিলেন, প্লে ইজ দা থিং। উপন্যাসেও উপন্যাস খোঁজো, ড্রামা ও কনফ্লিক্ট দেখো, থিম কি তোমাকে কিছু দিল, তা দেখো।

ডাকোস্টার কাঁচাপাকা চুলে ঢাকা, মাঝে সিঁথি মাথা, শুকিয়ে ওঠা লম্বা গলার পার্লস্ট্রিং সমেত তার হাসিটা মনে পড়ল। জেন হাসতে পারলে।

কিন্তু থেনড়ুপ এল। বললে, ডিনার দেয়া হবে। আটটা বাজে।

চলো, চলো, বলে জেন উঠে দাঁড়াল। বললে, বেচারা নামগিয়াল। এক কাজ করো, থেনড়ুপ। কাল থেকে ডিনারটা সাতটায় করো। নামগিয়ালের ঘুম পেয়ে যায়। বললে, ভাবছি নামগিয়াল আর তোমার অ্যালাউন্স বাড়ানোর কথা কোহেনকে লিখলে কেমন হয়।

থেনড়ুপ পরিবেশন করে আর খাওয়া হতে থাকলে গল্প করে, তেমনই করছে, সেই পেট্রোম্যাকস জ্বালানো টেবলের ধারে দাঁড়িয়ে।

সে বললে, আজও বাজারে মেয়রের সঙ্গে সেই একচোখের দ্রুকের যুদ্ধের কথা তো আবার শুনল।

নামগিয়াল বললে, এক চোখের কী? যুদ্ধই বা কী?

হ্যাঁ, তার অনেক টাকা। কিন্তু চোখ এক।

থেনড়ুপ ডান আস্তিনে বাঁহাত, বাঁয়ের আস্তিনে ডানহাত ঢুকিয়ে কোমর থেকে শরীর নুইয়ে মাথা ঝাঁকালে।

কী নাম তার? নামগিয়াল গল্পটাকে অবিশ্বাস করছে।

থেনড়ুপ বললে, ওপারে সে শুনেছে তার নাম গিয়ালপো।

তখন জেন বললে, মেয়র? মেয়র কী বলছো? তাসিলার মত শহর, যা একটা বড় গ্রামও নয়, সেখানে মেয়র কে থাকবে? কী বলো নামগিয়াল, শুনেছো মেয়রের কথা?

নামগিয়াল কিছু না বলে মাদার সুপিরিয়ারের মুখের দিকে চেয়ে রইল, যা থেকে বোঝা যায়, সে ভাবছে মেয়র বিষয়টা কী হতে পারে।

তাতে জেন বললে, মেয়র খুব খুব বড় শহরে যা থাকে, যেমন কলকাতা, দিল্লী।

নামগিয়াল বড় বড় শহরে মেয়র থাকে, এ সংবাদটা বুঝে নিতে মাথা দোলাতে থাকল। থেনড়ুপ বুঝলে, তার আনা সংবাদে গোলমাল আছে। সে বেশ চওড়া করে হেসে পরের কোর্স আনতে গেল।

জেন ভাবতে গিয়ে আলোর বৃত্তের বাইরে অন্ধকারটাকে দেখতে পেলে, যা অবশ্য খুব গাঢ়

নয়। আবার তার ফলেই যেন অভিমানের মতো ভাব হল তার। কিন্তু তা থেকে উঠতে, সে ভাবলে, হতে পারে এই কোথাও না, এখানে এস্টেব্লিশমেন্ট কস্ট ছাড়া মাত্র দু হাজার একজনের অ্যালাউন্স, তা হলেও বই, আরও বই কেনা যায়, ক্লিনিক আর পঞ্চাশ একর পাহাড়ে চায। না গ্রেগের মতো বাইবেলের যব চাষ নয়। দেখতে হবে ধান হয় কি না, কোন রকমের পাহাড়ি সুগন্ধি ধান।

কিন্তু এখানে অবশ্য মেয়র থাকা একটা গল্প। কিন্তু যে রকম ভয়ের বন, চারদিকে ময়ূর থাকতেও পারে। ময়ূর যার তীক্ষ্ণ ঠোক্কর, থাবার নখ, ঝগড়া, এসবের ভয়ে কোন স্ত্রীজাতি দৌড় থামিয়ে বশীভূত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অভিমান, না হয়, না বললাম...

সে গোপনে নিজেকে বলল, একশো দিন হতে চলল কিন্তু। কেউ কি খোঁজ করেছে, তারপরে কী হল?

সে টেবলের টাইমপিসটায় আর এক নিঃসঙ্গ দীর্ঘ আগতপ্রায় রাত্রির সাড়ে আট হতে দেখলে। তার চোখ কেঁপে উঠল।

৪

সে, মরে যাওয়া, কিংবা ছবি হয়ে যাওয়া, সেই নদীতে বালি সরিয়ে. সেই পাথর হয়ে যাওয়া জীবিত পল্লব, যাকে আমরা ফসিল বলি, তা খুঁজে খুঁজে নিজের চারপাশে লাল লাল অন্ধকারের এক সন্ধ্যা নামিয়ে ফেললে। সে তখন স্থির করলে, ফিরতে হয় এখন। সেই পাথর হয়ে যাওয়া একটা পাতাসমেত পল্লব ঝোলায় নিয়ে হাটের দিকে চলল। এই জীবিত পাথর প্রমাণ করে, ত্বকেও কত গভীরতা পাওয়া যায়। তার খোঁজ করার দরকার কি, সেই নদীর বালির তলায় এখনও এক নদী চলে কি না, যার বয়স হয়তো একশো বছরের বেশি?

সে হাটে পৌঁছে অবাক। চা খেয়ে নিলে হয়, এই ভেবে কগিয়েনচং-এর সেই প্যাগোডা ছাদের বাড়ির নিচেকার বড় সেই দোকানটায় গিয়ে দেখলে, ডম্বরি দোকানটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এদিকে ওদিকে অন্ধকারকে দেখছে।

ময়ূর জিজ্ঞাসা করলে, সে সেখানে দাঁড়িয়ে কেন, বাড়ি চলে যায় নি কেন? ডম্বরি জানালে, তার দহি বিক্রি হয়েছিল, কিন্তু পাইকাররা কম দাম বলতে থাকায় মাখন বিক্রি করতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। মাখন ফেরৎ নিয়ে গেলেও পচে যাবে।

তা হলে আর চা খেতে হবে না। বাড়ি চলে যা। না হলে লুপেই অন্ধকার হয়ে যাবে। নাকি সঙ্গীরা সব চলে গেছে? একা অন্ধকারে ভয় পাচ্ছিস?

ডম্বরি মাথা নেড়ে বোঝালে, ঘটনাটা সে রকমই বটে। সে ঢোক গিলে ভয়ের কান্না চাপছে, তাও অনুমান হল। কগিয়েনচং-এর একতলায়, সব দোকানদার দোকান বন্ধ করে চলে গেলে একা থাকা, অন্ধকার পথে একা তাসিলায় যাওয়ার থেকে নিরাপদ কিনা ভাবতে গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে এদিক ওদিক চাইছে।

তখন ময়ূর বললে, আমি এখন তাসিলায় যাবো, আয় চা খেয়ে নে। আমার সঙ্গে যাবি। সে হঠাৎ গোপন মনে নেমে বললে, বুঝিস না বোন। তুই ছোট্ট হলেও স্ত্রীলোক, তা এখনই বোঝা যায়। সাবধান হতে হয় না? খুব বিপজ্জনক এই পৃথিবী স্ত্রীলোকের পক্ষে।

চায়ের কড়া উত্তাপটা ভালো। অনেকে মনের তলাকার মনের কথা বলেছে। আছেই তো। সকালে আগুনের গলা পাথর আরও পুড়ে পুড়ে কালচে তামা রং হচ্ছে। ততদূর না নেমে এই আর এক গভীরতা কি? যেমন যে মন বর্তমানে সতর্ক, তার আড়ালের স্মৃতি?

সেই ভাবে তাসিলার পথে খানিকটা এগিয়ে ময়ূর বললে, এ পথে তো অনেক চলেছিস, তাই নয়? ভয় কী? তোর কি মনে হয় ভালুক, চিতা, এসব আসতে পারে? তা আসবে না। যেখানে বাঘ নেই, সেখানে হরিণ আসে না। যেখানে হরিণ নেই, চিতা আসে না। ভালু বা কী খাবে? বড়জোর একটি দুটি বহেরা, একটি দুটি আমলকি গাছ আছে। ময়ূর অনুভব করলে, সেই কিশোরী তার কাছাকাছি হাঁটতে চাইছে।

ময়ূর হেসে বললে, আমি হর রাতেই অন্ধকারে ঘুরি। কোনো দিন কিছু দেখি না। না হলে বল, ভয়ই তোদের মেয়রকে ভয় পায়।

সে হো হো করে হাসল। ডম্বরি কিছু না বলে আরও সরে এসে ময়ূরের হাত ছুঁলে, ফিস ফিস করে বললে, আইলে তিমরো বন্দুক ছৈ না?

ময়ূর বললে, বন্দুক নেই বলে ভয় পাবো? হাত ধরবি আমার?

হুঁ।

এই সময়ে প্রথম যেমন সে ডম্বরিকে দেখেছিল, সেই দৃশ্যটাই মনে পড়ল তার। সে তার তালুর মধ্যে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছোট হাতটাকে অনুভব করলে। কী কচি, কী মধুর, আর পবিত্রও বা– এরকম অনুভূতি হল ময়ূরের। মনে একটি মধুর উষ্ণতা এই অনুভব করলে, যেন তাকে কোলে নিলে ভালো হয় আবার এরকম লোভ হল তার, তার ঠোঁটের কোণে নিজের ঠোঁটদুটি ছুঁইয়ে এমন একজন হয়, যে আবার পাখির মতো ছোট বুকে ভালু, চিতা, অন্ধকার– নানা ভয়কে ভরে এই অন্ধকারে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে চলে।

সে ফিস ফিস করে বললে, তোকে কোলে নেব কি, ডম্বরি?

ডম্বরি তোৎলাল। ময়ূরের প্রকাণ্ড হাতের মুঠিতে তার ছোট হাতটা আরও ঢুকে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করতে লাগল। সে ফিস ফিস করে বললে, আইলে ডর পনি ছৈ না।

ডম্বরির ভয়ও করছে না আর।

সমস্ত পথটা, ওঠানামা, ওঠানামা, বাঁক ফেরা, মৃদু ক্লান্তি, আবার দম নিয়ে চলা, দুজনে মাত্র শোনা যায় এমন করে ঘরবাড়ি, গরু, বাছুর, ঝব্বু, একটা নাসপাতি গাছ– এসব নিয়ে কথা বলার কবোষ্ণ সুখ, কখনও হেসে ওঠা, কখনও ডম্বরির হাতে টর্চ দিয়ে তাকে টর্চ জ্বালানোর সুখ অনুভব করতে দেয়া, কখনও সেই অন্ধকারের নির্মমতায় পাশাপাশি অকারণে থেমে দাঁড়ানো। এরকম করে রাত নটায় ডম্বরির বস্তিতে পৌঁছাল তারা।

ময়ূর নিজের বাংলোর দিকে চলতে শুরু করলে তার মনে পড়ল, ডম্বরি জানিয়েছে, কাল সে দুধ দিতে আসবে না, যেন রোজই দুধ দিতে আসতো, কারণ সে নাকি ঝব্বু নিয়ে ওপারে যাবে মাল পৌঁছাতে। ঝব্বু অনেক ভার টানতে পারে। তাদের ঝব্বুর দুটো শিংই কুকরির মতো ধারালো, চোখা। আর যখন পথ চলে তখন মাথার দুপাশ থেকে সে দুটো পথ বরাবর সোজা থাকে। কিন্তু তার কী ভয়? তার হাতে কঞ্চি দেখলেই সেই ঝব্বুবীর তাড়াতাড়ি হাঁটে। নাকডোর টানতে হয় না। বরং সে পথে কারো সঙ্গে হয়তো কথা বলছে, তখন সেটা এগিয়ে এসে ডম্বরির হাত, কনুই, গলা যা পারে চেটে দেয়।

বলতে বলতে ডম্বরি ঝব্বুর ভিজে জিভের স্পর্শেই যেন শিউরে উঠছিল।

রাত নটা পার হচ্ছে। ময়ূর একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল সেই বর্তমানের রাত্রিতে।

৫

প্রভঞ্জন হাতঘড়ি খুলতে গিয়ে দেখল, রাত নটা বেজেছে।

যেন পথেই ভেবে এসেছে কী কী করবে। সে জুতো খুলে স্যান্ডাল, ক্রমশ ট্রাউজার্স থেকে পাজামা, অবশেষে কোট থেকে ঢোলা বিচিত্র ড্রেসিং গাউনে গেল। পাউচ পাইপ হাতে নিলে। কিন্তু পাইপ ধরানোর আগে সিলিংএ ঝোলানো উজ্জ্বল আলোটা জ্বাললে। রং-এর টিউবের কার্টন, পেলেট, ছবি, সব নিয়ে টিপয়ের উপরে রেখে নিজে মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসল। সে মনে মনে বললে, পিংক, পার্পল, ভায়োলেট, লাইল্যাক। লাইল্যাকটাই। লাইল্যাকের মৃদু গন্ধ যদি কারো জানা থাকে।

সে দুরকম নীল ও সাদা নিয়ে লাইল্যাক রঙে পৌঁছাতে চেষ্টা করতে থাকল। তার সামনে ক্যানভাস নেই, তুলির জারটাও দূরে, পেলেটের উপরে রং তৈরি হচ্ছে। লাইল্যাক মানে, মানে– রং কখনও কথায় বলা যায় না। এক ভাষার কথা অন্যভাষায় হয়? লাইল্যাক মানে যে শিফন ম্যাক্সিটা আজ সুচেতনা পরেছিল টেবলে।

ক্লাব থেকে কফি খেয়ে দুজনে বাজারে গিয়েছিল। কিছু কেনার ছিল না। বেড়াতে। ফেরার পথে পোস্টঅফিসে ডেকে নিয়েছিল পোস্টমাস্টার। কথা না বলে থাকা যায়? সেখানে, রোজা আজ রাতে রান্না করতে রেঞ্জার-বাংলোয় নেই, গল্পে গল্পে এরকম প্রকাশ হতেই, চা থেকে ডিনার পর্যন্ত ধরে রেখেছিল মাস্টারমশাই তার স্ত্রী। আর সুচেতনা রান্না হয়ে গেলে, হাতমুখ ধুয়ে, ব্রাশে চুল ঝকঝকে করে শাড়ি পালটে সেই ম্যাক্সি পরে টেবিলে এসেছিল। শাড়িতেই যাকে ভালো দেখায়, তাকে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম গাউনের লম্বা লম্বা রেখাগুলোতে আরও ভালো দেখায় যেন। পেলেটে খানিকটা গোলাপি-ঘেঁষা কোন রং তৈরি হলে সে উঠে গিয়ে একটা সাদা প্ল্যাস্টিকের টুকরো যোগাড় করে আনলে। পেলেটে তৈরি সেই রং দিয়ে বৃত্ত, গোলক, ত্রিভুজ, পিরামিড ইত্যাদি আঁকলে কয়েকটা। কোন বৃত্তকে ত্রিভুজ তীক্ষ্ণাগ্রে বিদ্ধ করছে এমনও হল।

এবার সে পাইপে তামাক ভরে তাতে আগুন দিয়ে, পরে মনে মনে বললে, পরে ওগুলো বোঝা যাবে কী হল রং।

সে উঠে দাঁড়াল। ঝিঁ ঝিঁ লাগার মতো? সে পরীক্ষামূলকভাবে হাঁটুদুটোকে টিপলে। ও কিছু নয়, মনে মনে এই বলে, সে সোফায় বসে পাদুটোকে সামনে ছড়িয়ে পাইপের বিলেতি তামাকটাকে উপভোগ করতে থাকল।

এতক্ষণে, যেন নিস্তব্ধতার ফলে, তার মনে পড়ল। আজ রোজা তার নিজের বাড়িতে গিয়েছে। তার ছেলে এসেছে নিউফাউন্ড চা বাগান থেকে। তার বিয়ের কথাবার্তা হবে। কী সব আচার পালন আছে। রোজা নিশ্চয়ই আজ রাতে ফিরবে না।

ও, তারপরে, সে মনে মনে বললে, সুচেতনা লাইল্যাক ম্যাক্সি পরেছিল। দু এক ক্ষেত্রে ম্যাক্সির দীঘল প্রবহমান রেখা বেশ আঁকার মতো হয়। যেমন সেই মার্গারেট নোবলের কথা মনে করো– নিবেদিতা সিস্টার। সে ছবি আঁকার প্রোপাজ্যাল দিয়ে বসলে, সুচেতনাও রাজি হয়েছে সিটিং দিতে। বিকেলেই পোস্টমাস্টার ছবি আঁকার কমিশন দিতে চাইছিল না?

সে উঠে গিয়ে প্লাস্টিকের টুকরোটাকে আলোর নিচে টালমাটাল করে লাইল্যাক রঙের জেল্লাটা পরীক্ষা করলে।

তামাকটা শেষ করতে সে সোফায় বসল। পরীক্ষামূলকভাবে গাউনের উপর দিয়েই এ উরু ও উরু টিপলে।

আজ ছবি আঁকাও নেই। ঘুম আসার আগেকার আরও ঘণ্টা দেড়েক নিজেকে ব্যস্ত রাখার

মতো কাজের খোঁজে এদিক ওদিক চাইল। তখন তার মনে পড়ল, চিঠিগুলো লেখা হচ্ছে না। মুকুলকে সাপ্তাহিক চিঠি দিতে তার ভুল হয় না। সে ভুল হলে তো নিজের কথাও মনে থাকবে না। মুকুল, মাই ডিয়ার।

সে আবার উঠল। টেবলের পাশে চেয়ারে বসল। প্যাড আর কলম নিয়ে বসে, সে স্থির করলে মগজপ্রেষককে, সেই দেওদার পাইনকে লিখবে সে। অনেকদিন হল চিঠি লিখেছে ভদ্রলোক। কলমটা খুলে সে আপন মনে হাসল। সে কীভাবে দেওদার দেওদার, অথবা পাইন পাইন বলার স্বাধীনতা নিতে পারে? না। সেটা ঠিক হবে না। নামটার জন্য পিতমাতাই দায়ী। পিতার অবিমৃশ্যকারিতায় একজন সারাজীবন হাস্যকর নামের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। নাম নিয়ে ঠাট্টা করা যায় না। আর অতিসূক্ষ্মাগ্র সেই ছাগুলে দাড়ি নিয়েও। আর যাই হোক, সে সেই ক্রমশ সর্বাঙ্গ অবশ করে আনা ব্যথাটা ঠিকই সারিয়েছে, যখন অন্য সকলে ব্যর্থ। আজ অবশ্য হাঁটুটা অনেকদিন পরে চিন চিন করে উঠেছিল। তা রঙ তৈরি করতে বসে বেকায়দায় হাঁটু ভাঁজ করে। সেই ব্যথা কোমরের কাছে শুরু হয়ে ঘুণপোকার মতো শব্দ করে স্নায়ুগুলোকে খেতে খেতে নামতো।

সে লিখলে: আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর। এখানে আসার পর একদিনও সেই সর্বনেশে ব্যথা হয় নি। দুবছর পার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে হাঁটুদুটোতে, নিক্যাপের চার দিকেই, চিন চিন করছিল। সে কিন্তু বেকায়দায় হাঁটু ভাঁজ করে বসায়। ঘোড়া, মানে পাহাড়ী পনি, মাঝে মধ্যেই ব্যবহার করি। পাহাড় তো এটা, প্রতি পদক্ষেপেই উরু, ডিম, গুল্ফ, নিতম্ব ইত্যাদি পেশীর শ্রম হয়। আপনি, মনে করে দেখুন, বলেছিলেন, কোন একটা নেশায় থাকতে। তামাক আর বিয়ার নিয়েছি। পাপবোধকে অগ্রাহ্য করার উপদেশ মনে করুন। তামাক আর বিয়ার দুই বিদেশি। হয়তো স্মাগলড, একসাইজ আর কাস্টমস দিতে হয় না বলে কিছু সস্তা। এটাকে পীড়িত করতে দিচ্ছি না আত্মাকে। আপনার সেই অন্য উপদেশ, মানে হৃদয়কে অন্য কোথাও স্থাপন করা, এবং বরং কিছুটা স্বার্থপর হয়ে নিজের দিকে তাকানো, তাও চলেছে। সেই ভদ্রমহিলা, তাঁকে নিশ্চয় আপনার মনে পড়বে, কারণ তিনিই আমাকে আপনার কাছে নিয়েছিলেন, তাঁকে কচিৎ ভালো আছি বলে একটা টেলিগ্রাম, মাসে একবার মনিঅর্ডার কুপনে ভালো আছি, প্রাপ্তিস্বীকার করো, মুকুলের চিঠিতে জানলাম সে ভালো আছে– এর বেশি লিখি না। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি– যাকগে। আর এক নেশাও হয়েছে। আমার হাউসকিপারই। এক বিশেষ সুন্দরী যদি দেখার চোখ থাকে, যুবতী নয়। তাঁর নিজের হিসাবেই চল্লিশ পেরিয়ে বয়স। মোটসোটা গিন্নিবান্নি মতো। নিজের বিশ বছরের ছেলে আছে। দুবার বিয়ে হয়েছিল। দুজনেই গত। বেশ স্নেহশীলা। দেখা শোনা, রান্নাবান্না করে খাওয়ানো। বেশ নেশার মতো হয়েছে– রাত জেগে তাঁর ন্যুড ছবি আঁকি, কখনও অফিস পালিয়েও।

এখানে একবার আসুন না। আমার চিকিৎসার জন্য নয়। এটা শীতকালে হিল-স্টেশনের মতো হয়ে যায়। সব দিকেই অরণ্য। এমন কিছু কিছু সুন্দর দৃশ্য আছে, যা অন্যত্র দেখি নি। তখন দামি গরম স্যুটগুলো ব্যবহার করতে পারবেন, যা কলকাতায় বাক্সে তুলে রাখতে হয়। আমার একটা ভয়ই আছে। আপনাকে সেই সবজে হেরিংবোন স্যুটে দেখা। অনুগ্রহ করে সেটিকে আনবেন না। এখানকার সব চাইতে ভালো বাংলোয়, আমাদের মেয়রের সঙ্গেই থাকতে পারবেন। আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিঠি শেষ করে, সই করে, প্রভঞ্জন প্যাডটাকে সরিয়ে রাখলে। হাসিমুখে পাইপটা নিতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিলে। হাই তুলল। যেন জড়তা কাটাতে দুহাত তুলে মাথার পিছন দিকে নিলে। কিন্তু দুহাত সেখানে যুক্ত হলে, তাতে মাথা হেলিয়ে ভাবতে বসল। বিদ্বেষ শব্দটা সম্ভবত ঠিকই, কারো অসুস্থা জননীর সেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে মৃত্যুর দুমাসের মধ্যেই যদি কোন তরুণী, জননীর সেই নিজের হাতে সাজানো ফ্ল্যাটের মাঝখানে চলে আসে, আর তার আসনটাই নিয়ে নেয়, যদি সব

সময়েই শাড়ির রঙে, শরীরের স্বাস্থ্য ও কান্তিতে, অলঙ্কারের দৃঢ় গৌরবে, সেই জননীকে মুছে দিতে থাকে, তবে বিদ্বেষ হয়। আর পিতার উপরে ক্রোধও হতে পারে। বিবাহিত হয়ে ফ্ল্যাটে আসার তিনমাসের মধ্যে সে বিমাতা সন্তানবতী হলে, পিতাকেই জননীর মৃত্যুর কারণ মনে হতে থাকে। আহা, উনি জানতেন না, ইতিমধ্যে নিজের দেহযন্ত্রগুলোকে, সেই দ্রুতগামিনীর সঙ্গে চলতে গিয়ে, ক্ষয় করে ফেলেছেন। ফলত উইল করে কাউকে কিছু দিয়ে যাওয়ার আগে আকস্মিক বিদায় নিয়ে সেই একজন, কিছু বয়স্ক যুবতী, তার শিশুপুত্র এবং নিজের যুবক পুত্রকে ফ্ল্যাট, টাকা, লাইফ ইনসিওর ইত্যাদির লোহার বাঁধনে বেঁধে রেখে গেলেন। সে ফ্ল্যাটের দরজা তারা পৃথিবীর মুখের উপরে বন্ধ করে দিয়েছিল যেন। একজনের যদি ক্রোধ আর বিদ্বেষ ছিল, আর একজনের হয়তো দুটি মৃত্যুর ভার বইতে হতো। রাগে কিছু হয় না। ফ্ল্যাটটার মালিক এখন দুজনে, সেই বৃদ্ধের রাখা ব্যাঙ্কে টাকা এখন তাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে। সেই টাকায় কলকাতার ফ্ল্যাট চলে, সেই টাকায় বিলেতি তামাক আর বিয়ার। ক্রোধ, আবার কৃতজ্ঞতাও নাকি?

প্রমাণটা কিন্তু বাইরে দেখানো যায় না। বনানী, মিসেস বনানী দত্ত, এতদিন পরে তাকে মা বলা যায় কি? যায় না। তো সেই প্রথম গিয়েছিল দেওদার পাইনের কাছে, আর তাকেও পরে নিয়ে গিয়েছিল। বনানী সে সময়ে বলেছিল, আমাদের কী গতি হবে বলো? নতুবা এমন কোথাও বনে জঙ্গলে চলো, সেখানে আমাদের কেউ চেনে না। একটু দেরি হল আসতে, তাতেই তোমার ব্যথা বাড়ল। মুকুলের কান ব্যথা। এইমাত্র ঘুমাল। নতুবা পাইনের কাছে চলো। আমাদের মনকে দেখিয়ে নি।

প্রভঞ্জন পাইপ ধরালে। যাক গে, যাক গে, এটাই কি তাদের, তার চরিত্র যে সেই নানারকম টাকার অঙ্কের বাঁধন ছিঁড়ে সে, তারা, নিজেকে, নিজেদের মুক্ত করতে না পেরে, ঘনিষ্ঠ থাকতে বাধ্য হচ্ছিল।

বিদ্বেষ আর ক্রোধ তো বটেই, তা আবার প্রকৃতপক্ষে এক রকমের ক্রমবর্ধমান আসক্তি হয় যে তা পাইন ধরিয়ে না দিলে, সে দেখতে পেতো না। কারণ অবচেতন মনই কথাটা, আর অবচেতনকে কে কবে দেখেছে?

এখন কিন্তু সে-ই সব টাকার বাঁধন ছিড়ে ফেলেছে। বেশীর ভাগ মুকুল আর তার জননীকে লিখে দিয়েছে। আর অবচেতনের সেই সব ব্যাপার, যা শেষের দিকে তাকে পঙ্গু করে দিচ্ছিল, বলে পাইনের মত, তা সেরে গিয়েছে, অন্তত এই দুতিন বৎসর তা নেই। তা প্রমাণ করে, অবচেতন অনেক কিছু ঘটায় যা অবিশ্বাস্য, যার সম্বন্ধে সে নিজে কিছু জানে না। এ বিষয়ে সে, সেই প্রায়-সুন্দরী বনানী আর ডক্টর পাইন জানে। পরিচিতরা জানে, এম এস সি পরীক্ষার পর একজন আর্থ্রাইটিসে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছিল।

সে ভাবলে, এখন মুকুল আর তার জননী তার থেকে টাকার দিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। উপরন্তু সেই তার মাসমাহিনাকে ভাগ করে মুকুলকে তার স্কুলে, আর তার জননীকে কলকাতার ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে থাকে। হাত খরচ। হ্যাঁ সে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট পৃথক করতে মুকুল আর তার জননীকে দুই-তৃতীয়াংশ দিয়েছে।

যাকগে, তা ছাড়া, লক্ষ্য করো, আজ সে লাইল্যাক নিয়েই ভাবতে বসেছিল। স্বীকার করা ভালো, আজ তার চোখে খুবই ভালো লেগেছে সুচেতনার শরীরের পাতলা হালকা দীঘল রেখাগুলোকে।

তা, এখন তো রাত এগারোই হয়। ক্যানভাস তৈরি নেই, রোজাও অনুপস্থিত, ছবি আঁকার কথা ওঠে না। সে শুতে যাবে বলে উঠল। অ্যাপলপাই নামে ছবিটা যা দেয়ালের দিকে মুখ করে শুকাচ্ছে, তাকে ঘুরিয়ে ধরে দেখলে।

সে দাঁড়িয়ে পড়ল ছবিটার সামনে। তার ভয় হল, সে যেন নিজের চরিত্রের বাইরে কোথাও

যাচ্ছে। চরিত্র? নাকি তার সে অংশ, যা পাইন পেরেকটেরেক ঠুকে শক্ত করেছে? সে বেশ শক্ত গলায় নিজেকে শোনালে, ছবির মডেল কি চিরদিনই এক থাকবে! কিন্তু আর কেউ ফিস ফিস করলে, না, না, সুচেতনাকে ভালবাসতে যাওয়া অন্যায়, অন্যায়। না, সে সংকল্প করলে, সে পাইন পাইনের মেরামত করা চরিত্রই থেকে যাবে।

ভাবতে গিয়ে সে আশঙ্কা করলে, যদি মেরামত ভালো না হয়ে থাকে? যদি রোজার শরীরের রেখাগুলো আসলে আর এক বয়স্কা সুন্দরীর, অন্য কারো শরীরের তেমন সব রেখার ক্যারিকেচার হয়ে থাকে? কিন্তু এক মুহূর্তেই সে নিজেকে সমর্থন করে বললে, না, না, মশায়, এসবই গঁগ্যাকে নকল করা, তার সেই সব স্থূলদেহিনী মেট্রনলি পলিনেশীয়ানিরাই এরা। বেশ তো সে পরেব ক্যানভাসে, মনে করো, রেনোয়াকে আদর্শ করবে।

৬

রাত নটায় ডম্বরিকে তার বস্তির বাসায় পৌঁছে গিয়ে ময়ূর তার বাংলোর দিকে উঠছিল। বস্তিতে মিটমিট কেরোসিন আলো। কিন্তু পিচঢাকা পথের প্রধানটিতে ফরেস্টকলোনির স্ট্রিটলাইটিং যে ইলেকট্রিক আলো, তা চোখে পড়ছে। ময়ূর ঠিক করলে, আজ আর সে রোঁদে বেরুবে না।

সে কালিঝোরার দিকে যাওয়ার নিচের পথ ধরে এগোল। মাথার উপরে কালো সিল্ক রং-এর আকাশ, যাতে কমলা রং-এর অজস্র টুকরো কাচ বসিয়ে কেউ চুনরি করেছে, দূরে ফরেস্টকলোনির আলো যার ঝকঝকে আঁচলা। হঠাৎ তার মনে হল, সে কি ডম্বরির কথা ভাববে, নাকি সেই লুপের টানেলটার কথা? যে লুপ নান্নীর মতো পরিত্যক্তা সুন্দরী।

আরে, না, এতো বিদ্যুৎ নিবে গেল দেখছি। সে চোখ তুললে, আর তার পরে পোস্টঅফিসের মাথার উপর দিয়ে যে পথ তার উপরে কিছু নড়ছে, এমন দেখতে পেল। একটা মানুষ? পিঠের উপরে কিছু বাঁধা। সে গুণলে। একটা নয়। তিনজন মানুষ।

সে আবার হাঁটতে শুরু করলে, আবার দেখে আবার গুণলে। আশ্চর্য তো! এত রাতে তারা কী মাল বয়ে নিচ্ছে? কোথায় যাবে?

সে যখন কালিঝোরার ব্রিজের কাছে, হঠাৎ আবার বিদ্যুৎ জ্বলল। ব্রিজ পার হয়ে আট-দশটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে জলের ধারঘেঁষা ছোট পাম্পিং স্টেশন, আর ততোধিক ছোট পাওয়ার হাউস। আবার আলো নিবল।

পথ থেকেই তার মনে হল, পাম্পিং স্টেশনে কারা কথা বলছে। সেই খাড়া পাথুরে সিঁড়ির পথটা থেকে ত্রিশ চল্লিশ ফুট নিচে কালিঝোরা গমগম করছে অন্ধকারে।

সে জন্য সিঁড়িটা একটা পাকা লোহার রেলিংএ ঘেরা।

আলো সে রকম হচ্ছে কেন, এই কৌতূহল নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পাম্পিং স্টেশনের দরজার কাছাকাছি গিয়েছে, এমন সময়ে সেই অদ্ভুত কান্ড ঘটল। তার ইচ্ছা হয়েছিল আলো নেবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানতে। তার অনুমান হল, ঘরের মধ্যে তিনচার জন লোক। ঘরের মধ্যে একটা বালব, তা এত মৃদু যে মুখগুলোকে চেনা যাচ্ছে না।

যারা বসেছিল, তাদের একজন উঠে দরজার দিকে ছুটে এল। বিস্মিত ময়ূর সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে, কারণ সেই লোকটার হাতের কুকরি দরজার কাছেই আলোতে চক চক করে উঠেছে। পাগল নাকি, এই ভাবতে ভাবতে ময়ূর কুকরি থেকে আত্মরক্ষা করতে সরে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু অপরিসর সিঁড়িতে তেমন জায়গা না থাকায় হাত বাড়িয়ে লোকটার কুকরিধরা কবজি চেপে ধরলে।

সেই লোকটি থেকে তার শরীরের উচ্চতা প্রায় একফুট বেশি হওয়ায় ময়ূরের সুবিধা হল। কুকরিধরা সে অচল হাতের তলা দিয়ে নিমেষে গলে, সেই হাতের কুনুই নিজের কাঁধের উপরে তুললে, সেই হাত থেকে কুকরি সিঁড়িতে, পরে সেখান থেকে কালিঝোরায় ছিটকে পড়ল।

উলটোপ্যাঁচে ময়ূর লোকটার সামনে দিকে গিয়ে অবাক। ব্যথায় মুখ যতই বিকৃত হোক, মাথার চুল ঝুলে কপাল, নাক ইত্যাদিকে যতই আড়াল করুক, ময়ূরের চিনতে দেরি হল না। সে অবাক হয়ে বললে, নরবু, তুই?

কেউ কিন্তু তখনই যেন সুইচ টিপে শহরের সব স্ট্রিটলাইট জ্বালিয়ে দিল। একজন কে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কী হয়েছে এখানে?

ময়ূর অবাক হল, শশীবাবু? আপনি থাকতে আলো নিবেছিল?

সাব এঞ্জিনিয়ার শশী ঋষি বললে, এরকম হয়। পুরনো মেশিন। কালিঝোরায় জল কম। এখানে ও কে?

নরবু বোধহয়। খুব মদ খেয়েছে বোধহয়। ময়ূর হাসল। বললে, নে নরবু, ওঠ, বাংলো যাবি তো?

দুচার দিন পরে নরবু বলেছিল, নিঃশব্দে উঠে পালানোর চেষ্টা না করে, মেয়র তাকে ধরে না নিয়ে গেলেও, সে যে মেয়রের আগে আগে বাংলোয় গিয়েছিল, তার কারণ ভালু ধরলে চুপচাপ থাকা নিয়ম।

তখন বাংলোয় ফিরবার তাড়া ছিল। আলো জ্বলতেই ময়ূর দেখেছিল, তার ডান হাতের বাইরের ধার থেকে অনেক রক্ত পড়ছে। বাংলোর পিছন দিকের দরজা খুলে, আলো জ্বেলে, রান্নাঘরে পৌঁছে, ময়ূর বললে, বস। ধোঁয়ার লেপ পড়া বালবের নিচে নরবু টুলে বসে পড়ল। সে তখন মৃদু কাতরোক্তি করছে। বা হাঁতে ডান হাত ধরে কেঁপে কেঁপে উঠছে ব্যথায়।

ময়ূর বললে, জলের কলের নিচে হাত ধর। তারপর হলুদ লাগা।

সে এসময়ে লক্ষ্য করলে, তার ডান হাতের কড়ে আঙুল থেকে হাতের ধার কেটে অনেক রক্ত পড়ছে। প্যান্টে লেগেছে, জামায় লেগেছে, মেঝেতে পড়ছে। সে সেই রক্তের দিকে তাকিয়ে একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল। কী এক ভাবনায় তলিয়ে উদাস, নিস্পৃহ হয়ে গেল তার মন। যেন এরকম সে অনেক দিন থেকে যাচাই করতে চাইছিল। তার রক্ত লাল? মানুষের মতো?

কিছু পরে তার মাথায় বুদ্ধি এল যেন। সে কিছু না ভেবে একটার পর একটা কাজ করে যেতে লাগল।

স্টোভের পাশে লাইটার। বাঁ হাতে লাইটার জ্বেলে স্টোভ ধরালে। ঝোলা থেকে নতুন কেনা গেঞ্জিটাকে স্টোভের উপরে ধরে পোড়ালে। নিঃশেষে ছাই হলে, একটা বাটিতে সেই ছাই জমা করে হাতের রক্তঝরা ক্ষতটাতে সেই ছাই দিতে থাকলে রক্তঝরা ক্রমশ বন্ধ হল। গলার রুমাল খুলে নরবুকে বললে, জড়াতে হবে, বাঁধতে হবে, এক মাথা তুই বাঁহাতে ধর। সেভাবে সেই বড় রুমালটা হাতের একটা শক্তপোক্ত ব্যান্ডেজ হলে সে বাঁ হাতের সাহায্যে স্টোভে জলের কেটলি বসালে। দুই বড় গ্লাস লাল চা করল সে। যন্ত্রণাকাতর বিবর্ণমুখ নরবুকে বললে, লো। কিন্তু চা মুখে তুলতে গিয়ে বললে, পরখো। তাকে থামতে বলে, শোবার ঘরে গিয়ে একটা কাগজের বাক্স নিয়ে এল। পা ভাঙার সময়ে ব্যথা কমাতে ডাক্তার তাকে এই বড়িগুলো খেতে বলেছিল। চারটে বড়ি বার করলে সে। দুটো নরবুকে দিয়ে দুটো নিজেও খেলে।

নরবু বড়ি খাচ্ছে না দেখে, তার রাগ হল। বললে, ওষুধটা খেতেই হবে। ব্যথা কমবে। পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি খেলাম, দেখ। একটা হাত ভেঙেছে, অন্যটা ভাঙলে? তোমার হাতে কুকরি কেন? কারা ছিল পাওয়ার হাউসে? বাক্স করে কী নিয়ে যাচ্ছিল তারা?– এসবই তোমাকে

বলতে হবে। তুমি আদৌ মদে বেহুঁশ ছিলে না। তোমাকে বলতে হবে, অনেক রাতে তাসিলার পথে কেন তোমাকে দেখলাম, এমন মনে হয়। কেন রোজার বাড়িতে আগুন লাগার রাতে তোমাকে সেদিকের পাহাড় বেয়ে উঠে যেতে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল?

সে চা শেষ করে গ্লাসটা শব্দ করে স্টোভের পাশে রাখলে। চা খেলে, ওষুধও। তাকে খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ময়ূর তার সামনে থেকে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ কবিডরে ঘুরল। ফিরে এসে নরবুর সামনে আর একটা টুল টেনে নিয়ে বসল। কিছুক্ষণ ভেবে বললে, বাস বাস, তোকে কিছু বলতে হবে না। হাত না হয় জখম। খেতে হবে তো। অনেক রাত হল।

সে নিজেই স্টোভে হাঁড়ি বসাল। জল চাপিয়ে, তাতে চাল, ডাল, নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজ, বিন যা যা চোখে পড়ল, ছেড়ে দিল। বললে, ফুটে উঠলে নেড়ে নেড়ে দিস বাঁ হাতে।

চুপ করে থাকতে থাকতে আবার সে বললে, আমার উপরে নজর রাখিস? কী লাভ? আমি কি কেউ? আজ ভেবেছিলি আমার সঙ্গে রাইফেল নেই, তাই?

নরবু ফ্যাকাশে মুখে বসে থাকতে বলে ফেললে. তিমি মেয়র ছই না।

বটে তো।

এখানে মেয়র কোই হয় না। তিমি মানছে ছই না।

বেশ, তা হলে রক্ত কোথা থেকে? নাই হলাম মানুষ।

তিমি ঠুলো পুলিশঅফসর, মাস্টারসাহেব ভনেক ছ।

কে বলেছে? পোস্টমাস্টারমশাই? তুই জানলি কি করে? গুমছে বলেছে?

ময়ূর হো হো করে হেসে উঠল। বললে, মাস্টারমশাই বলেছে নাকি নজর রাখতে আমার উপরে? আচ্ছা মজা তো!

সে বুঝলে, সে পুলিশ অফিসার কিনা তা জানতে পোস্টমাস্টারের কৌতূহল হতে পারে। অনেক ব্যাপারেই তাঁর কৌতূহল আছে। কিন্তু তিনি কি নরবুকে তার পিছনে স্পাই লাগাবেন? সে আবার উঠে পড়ল। তার মনে পড়েছে। তার পা ভাঙার সময়ে অনেক জায়গায় কেটে ছড়ে গিয়েছিল। যাতে সে সব ঘা পেকে না ওঠে সে জন্যই ডাক্তার তাকে ক্যাপসুল খেতে দিয়েছিল। কাগজের বাক্সটায়, ব্যথার বড়ি বার করতে গিয়ে সে দেখেছে, তাও আছে কয়েকটা। সে সেই বাক্সটা নিয়ে এসে দুটো ক্যাপসুল খেয়ে নিয়ে আবার নরবুর মুখোমুখি বসল। সে ভাবলে: পোস্টমাস্টারের মতো জ্ঞানী পণ্ডিত, তাঁর সব বিষয়েই খোঁজখবর নেয়া স্বভাব বটে, কিন্তু ভাবলেন কি করে মেয়র পুলিশ অফিসারও বটে? (সে হাসল আপন মনে) বেশ তো, কাকে ধরতে সেই পুলিশ অফিসার? আর সেরকম পণ্ডিত হয়ে সে রকম ভাবা, যিনি কিনা মানুষের মনের তলায় আর এক মন থাকে-- তাও জানেন।

সে হাসতে গিয়ে অবাক হল। যে নিরক্ষর বলে টিপসই দিয়ে বেতন নেয়, তাকে সেই তার শয্যাশায়ী অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়তে দেয়া কি একটা পরীক্ষা ছিল পোস্টমাস্টারের? ময়ূরের দৃষ্টি ধারালো হল। মাস্টারমশাই পরে একদিন ক্লাবে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বটে, কুমুর গল্প সে কিছু বুঝেছে কিনা। আর সে কী বোকা! সেও বলে ফেলেছিল : ও ছাড়া কুমুর উপায় ছিল না। স্বামী তার যতই অযোগ্য হোক, সে তাকে ডিঙিয়ে অন্য পুরুষকে নেয় কি করে, যদি বা সে পুরুষ কুমুর দাদার কাছাকাছিও যায় যোগ্যতায়। পারে না। রুচিতে আটকায়। আর পুরুষরা সুযোগ পেলেই কুমুদের অপবিত্র করে দেয়। এরকম ঘটছে চিরকাল, রবীন্দ্রনাথ জানতেন। আশ্চর্য, তা হলে সে কি পোস্টমাস্টারের কাছে, রেঞ্জঅফিসারের কাছে ধরা পড়ে গেছে?

সে চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ল। ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াল। ঘরগুলো একরকম নয়।

সেজন্য তার চিন্তাকে যেন ঘরে ঘরে রাখতে সুবিধা হল।

কেউ ছদ্মবেশী পুলিশ অফিসার কিনা তাতো অপরাধীই জানতে চায়।

দূর দূর, ওটা মাস্টারমশাই-এর স্বভাব। তুচ্ছ জিনিসও জানতে চাওয়া। সেই ট্রেনের হিপির ফেলে যাওয়া জিন সে পরেছিল একদিন, তাতেই মাস্টারমশাই জানতে চেয়েছিল, কোথায় কিভাবে তা পেয়েছে সে। কত দাম দিতে হয়েছে। স্বভাবে এরকম থাকতেই পারে। সেও তো রাতের অন্ধকারে এপথে, সেপথে, এ রিজে, সে রিজে ঘুরে বেড়ায়। কী খোঁজে? আসলে নরবুর গোপন প্রেমিকা থাকতে পারে। হয়তো জাতে বা সম্বন্ধে আটকায়, সেজন্য সে বেরিয়ে পড়লেই নরবুও বেরোয় রাতে। এ সম্বন্ধে নরবুকে প্রশ্ন করা যায় না।

সত্যি যদি নরবুকে তার উপরে চোখ রাখতে কেউ বলে থাকে, নরবু কখনই তার নাম বলবে না। হঠাৎ আলো নিবে যাওয়া? অন্ধকারে মাল বয়ে নেয়া? পাওয়ার হাউসে ঢুকতে গেলে নরবুর সে রকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা? নরবু তা হলে কি স্মাগলারদের চর? স্মাগলারদের কি ধারণা তাদের উপরে চোখ রাখতে সে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়? বোঝাই যায় নরবু তাদের লোক হলেও তা স্বীকার করবে না।

সে রান্নাঘরের ফিরে গেল এই ভাবতে ভাবতে, ডম্বরি, সেই কৃশ, ভীরু হাতের ডম্বরি, তার ঝব্বুতে কী নেয় সীমান্তের ওপারে? অথবা এরা কি সেই গিয়ালপোরই দল, যার একটা মাত্র চোখ?

নরবুর সামনে গিয়ে সে বললে, তা এখন আর কী হবে? যার উপরে নজর রাখবি সে তো জেনেই ফেলল।

নরবুর মুখ আরও বিবর্ণ দেখাল। ময়ূরও একটা ক্লান্তি বোধ করলে। ভাবলে তত রক্ত পড়লে তা হয়।

সেই ম্লান আলো নিস্তব্ধতায় বরং হাঁড়ির টগবগ শব্দ প্রবল হল। আর তাতেই যেন বুদ্ধি পেয়ে সে বললে, দেখ, এটা পাকল কি না। খেয়ে ঘুমোতে তো হবে। নরবুও যেন বুঝলে, অনেক রাত হয়েছে, তাদের খাওয়াও হয় নি।

মিনিট পনের পরে রান্নাঘরের সরু টেবলে তারা পাশাপাশি খেতে বসলে, ময়ূর বললে, এক কাজ কর নরবু। এখন থেকে যে রাতে যেদিকে যাবো, তোকে বলে যাবো। তা হলে তোকে আর রাত জেগে আমার খোঁজে ঘুরতে হবে না। হুনচ কি?

নরবু চুপ করে খেতে লাগল। অবশেষে সে বললে, ক্লুটলংমা ঠুলো ডাংদর ছ।

আচ্ছা? ডাংদর?

ডাংদর ছ, মেমপনি ছ।

আচ্ছা, ডাক্তার আবার মেম। ময়ূর হাসল।

ইয়ো খুন বন্দ ন ভয়োভনে ভলি ওতা যানুই পরছ।

এই রক্ত বন্ধ না হলে কাল সকালে সেখানেই যেতে হবে? ময়ূর হাসল। হাতের ব্যথা নাকি ব্যথার ওষুধে মানুষ ভুল বকে? সে বললে, আচ্ছা এখন যা। তিমরো হাতপনি সেট গরনু পরছ কি?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১

ক্লুটলংএ ভারি এক ডাক্তার এসেছে, রক্ত বন্ধ না হলে তার কাছে যেতে হবে, নরবুর এই পরামর্শ, কিংবা নরবু, তোর হাতটাকে সেট করে নিলে হয়, ময়ূরের এই প্রস্তাব-- কাজে এল না।

বেশ সকাল থাকতেই অন্তত সে রকমই ময়ূরের মনে হল, নরবু ময়ূরের ঘুম ভাঙিয়ে জানালে সে চা করেছে, রেঞ্জার সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সে সেখানে যাচ্ছে, মেয়র সাহেবের কাছে কি ব্যথার ওষুধ আছে আর? তখন চায়ের সঙ্গে দুজনেই ব্যথার ওষুধ খেয়েছিল।

কিছু বেলা হলে ময়ূর রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তাকে অন্তত সেই বাক্সবন্দী মালের শোভাযাত্রার কথা বলা দরকার। কিন্তু সে গিয়ে জানলে, রেঞ্জার আগেই দুজন ফরেস্টগার্ড আর নরবুকে নিয়ে ট্যুরে বেরিয়ে গিয়েছেন।

সংবাদটা তাকে রোজাই দিলে। সে তখন বাজারের ব্যাগ আর প্যারাসল নিয়ে রেঞ্জার-বাংলো থেকে বাজারের দিকে যাচ্ছে।

ফেরার পথে সে তখন ভাবছে, এই ভালো হল, এই বাক্সবন্দী মালের মধ্যে রেঞ্জারসাহেবের প্রিয় সেই বিলাতি বিয়ার থাকতে পারে কিনা, বলা যাচ্ছে না। এদিকে ওপারের সেই বাণিজ্যপথ যেমন, কাল রাতে হয়তো সে অসওয়ালের, শর্মাদের বাণিজ্যপথ দেখেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, এসব মালই হয়তো ক্লুটলং-এর সেই ঠুলো ডাক্তারের, যার কথা নরবু বলেছিল তাকে অবাক করতে। পরে সে ভাবলে, দিনের বেলায় কুলির পিঠে মাল চলতে দেখলে সে ভ্রুক্ষেপ করতো না। এমন হতে পারে, যারা মাল নিয়ে উঠছিল তারা আসতে দেরি করে ফেলেছে পথে, হয়তো বা তারা নতুন লোক হওয়ায়, সোজা নিচের পথে বাজারে না উঠে, উপরের পথটায় উঠে পড়েছে।

সে হেসে ফেলল। তুমি বলতে পারো না, যে মাল বাহিত হয় তার কোনগুলি ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য, কতখানি বা অন্যায়, আর তার হিসাব করা তার কর্তব্য নয়।

সে বরং অন্যদিকে মন দিলে। রোজা তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিল, জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, ফলে তাকে একটা গল্প বানিয়ে বলতে হয়েছে। রোজা বলেছিল, ব্যাণ্ডেজটা ভালো হয় নি, সে ঠিক করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে কি না। আর সে নিজে বলেছিল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, মিসেস, কিন্তু এটা খুবই সামান্য ব্যাপার।

প্রকৃতপক্ষে সে কিছুক্ষণ থেকেই নিস্পৃহ হওয়ার যুক্তি দিচ্ছিল নিজেকে। ক্রেটগুলো সম্বন্ধে তার যুক্তিগুলো তা প্রমাণ করে।

বাংলোয় ফিরে সে বারান্দার রাখা ইজিচেয়ারটায় বসল। এতক্ষণ হাত ঝুলিয়ে হাঁটায় হাতটা টাটাচ্ছে। এখানে ডাক্তার বলতে কেউ নেই। শহর হলে সেলাই করা হতো। তার এরকম একটা অনুভূতি হল, যা চিন্তাতে ধরা পড়লে বেশ অদ্ভুত হয়, দূর, দূর, এ হাতটা কি আমার? কী সব যোগাযোগ দেখো!

কিন্তু ব্যথা কমাতে সে আহত হাতটাকে বাঁ কাঁধের দিকে বাড়িয়ে বুকের উপরে শোয়ালে। সে ভাবলে, দেখো, তার কি শরীর থাকা উচিত? তার ছায়া থাকা উচিত, যে ছায়ায় ঢুকে নরবু

খুঁজবে সত্যি সে কে? পোস্টমাস্টার ফাঁদ পাতবে সত্যিকারের তাকে ধরতে? মেয়র হিসাবে সে একটা তো চিত্র।

অথচ দেখো, সে ভাবলে, সেই বেতন নেয়া, সেই পা ভাঙা, এই হাত কাটা, এই সব ঘটিয়ে কেউ কি বোঝাতে চায় শরীরটা তোমারই?

আর সেই যেন বলে উঠল, শহরে অ্যান্টিটিটেনাস দেয়া হতো। আর সে রকম বলাতেই তার চোখ দুটো সতর্ক হল, তীক্ষ্ণ হল। সে দুপাশেই দেখে নিল। সে তো মৃত্যুই, সে ভাবলে, তা হলে কিন্তু, আগেই সতর্ক হতে হবে, যাতে মৃতদেহটা কেউ না পায়। না, রাধনদের সেই বড়ির মতো হলেও চলবে না। গ্রেগ অ্যাভেনিউ-এর সেই পাতাল উপত্যকার নির্জনে কেন, ঝোপের আড়ালে মাটিতে মিশে যাওয়া ভালো।

২

নারেঙ্গিহাটে পনি থেকে নেমেছিল প্রভঞ্জন। নারেঙ্গিহাটের বিট অফিসার ও ফরেস্টগার্ডের সঙ্গে কথা বলাই উদ্দেশ্য। সারাদিনের ট্যুর, কাজেই সে পনিকে নিজের মতে চলতে দিয়েছিল। ফলে তার সঙ্গের গার্ড দুজন ও নরবুও কিছুক্ষণের মধ্যেই নারেঙ্গিহাটে এসে গিয়েছিল। নরবু বললে, চিয়া খানে, সার, চায় লাউঁ?

প্রভঞ্জন একজন গার্ডকে বললে, বিট অফিসারকে খবর দিয়ে এসো। নরবুকে বললে, যদি পাঁচ কাপ ভালো চা দিতে পারে দোকানদার, দেখো তা হলে, বলে এসো। কগিয়েনচং এর বাড়ির নিচে দেখো। বিট অফিসার এসেছিল। নরবু চা-সমেত চায়ের দোকানদারকেই নিয়ে এসেছিল।

রওনা হওয়ার সময়েই নরবুর ফুলে ওঠা হাত প্রভঞ্জনের লক্ষ্যে এসেছিল। এখন রোদ ওঠায় আরও ভালো দেখা যাচ্ছে। কি করে হাতে চোট পেয়েছে জিজ্ঞাসা করলে নরবু বললে, পাম্পিং হাউসে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাতে লেগেছে। প্রভঞ্জন তাকে জিজ্ঞাসা করলে না, রাতে সেখানে কী জন্য গিয়েছিল সে। নারেঙ্গিহাটের বিট অফিসার, যে হাট থেকে দূরে বনের মধ্যে বাস করে, তার আসতে একটু দেরি হল। সে এসে রেঞ্জারের ট্যুরের কথা শুনে আর নরবুকে দলে দেখে বললে, তার বিট অফিসের কাছে একটা লগের ট্রাক আছে, জাকিগঞ্জ যাবে। নরবু সেই ট্রাকে জাকিগঞ্জ ডিসপেনসরির ডাক্তারকে হাত দেখাতে যেতে পারে। রেঞ্জার বরং এখানকার একজন গার্ডকে সঙ্গে নিতে পারেন ট্যুরে।

সে রকম হল। ট্রাকটা ববিজান কনট্রাক্টরের। ডাকা কুপ থেকে লগ নিয়ে সে জাকিগঞ্জ ছাড়িয়ে মহকুমা সদরে যাবে। রেঞ্জার বললে, তা হলে আরো ভালো। বিট অফিসে গিয়ে সে ড্রাইভারকে বলল যাতে সে মহকুমা হাসপাতালেই নিয়ে যায় নরবুকে। নরবুর মিনমিন আপত্তি সে কানে তুললে না। বরং নারেঙ্গিহাট বিটের একজন গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে দলভারি করলে প্রভঞ্জন। নরবুর ট্রাক রওনা হওয়ার আগেই সে পনিতে উঠল। রওনা হওয়ার কিছু পরে সে সঙ্গের তিন গার্ডকে কর্তব্য নির্দেশ করলে। একজন গোরুমারার পথ দিয়ে, অন্যজন তাসিলা স্টেশনের দিক দিয়ে কর্ড ধরে জাকিগঞ্জের দিকে যাবে, তৃতীয় জন এই দুটি পথের মধ্যে বরং অপ্রচলিত পথ ধরবে। আর সে নিজে এই পথ তিনটির মধ্যে যেখানে যেখানে সংযোগ ডাইভার্সান, তার উপরে চোখ রাখবে। ট্রাক তো নিঃশব্দে চলবে না, কী বলো? বলা বাহুল্য পথে ট্রাক পেলে তার লাইসেন্স নাম্বার, গেটপাস থাকলে তার বইয়ের নাম্বার, পৃষ্ঠার নাম্বার টুকে নেবে।

তখন গার্ডরা বুঝতে পারলে, সেদিনের ট্যুরের উদ্দেশ্য সারপ্রাইজ ভিজিলেন্স চেক।

তাবা তিনজনে তিন পথ ধরলে, কিন্তু তাদের চিন্তাটা একই খাতে চলল। এভাবে কোনদিন কোন কাঠচোর ধরা পড়েছে? কাঠের গুণ অনুসারে একটা ট্রাকে এমন কি লাখ টাকার কাঠ থাকতে পারে। ট্রাকে যদি ফরেস্টের দেয়া পাস থাকে? গার্ডদের বুকের মধ্যে থেকে একই রকম উষ্ণতা গলার দিকে উঠে এল। পাস ছাড়া ট্রাক? আর সেই ঝুঁকি নেয় যারা? একা এক নিরস্ত্রপ্রায় ফরেস্টগার্ড সে রকম এক ট্রাক আটকাতে পারে? ট্রাকে অন্তত তিনজন থাকে তারা। আর তা ছাড়া, যে রকম শোনা যায়, তারা যখন প্যান্টের পিছন পকেটে রিভলভার ছুঁয়ে থাকছে, অন্য হাতে তখন হয়তো দুখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে ধরেছে। কখনও সেই ট্রাকগুলো স্পিড তুলে বেরিয়ে যায়, ফরেস্টগার্ড হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখে। গার্ড বেপরোয়া হলে হয়তো একটা শব্দ শোনা যাবে, যা রিভলবার বা পাইপগান অথবা ট্রাকের ব্যাকফায়ার, তা ধরা যায় না। পকেটে পাস খুঁজে পেতেও অনেক সময় লেগে যায়। আর সবই যোগাযোগের কথা। একজন সে সময়ে পথের কোন বিন্দুতে, তার পনের মিনিট আগেই সে রকম একটা পাস ছাড়া ট্রাক সেই বিন্দু পার হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত এই ভিজিলেন্স চেকে যে দুচারখানা ট্রাক ধরা পড়েছে, সে সবই ছিঁচকে। হয়তো পাথরের ট্রাক, পাথরের উপরে কিছু লাকড়ি বসিয়ে নিয়েছে। তাদেব এ ভরসা আছেই, গেটপাস হতে বিশপঁচিশ পঞ্চাশ টাকাই লাগে। নতুবা বেশিভাগ ক্ষেত্রে তেমন সব পুঁচকে মানুষ ধরা পড়ে, যারা ফরেস্টের ভিতরে ঝোরা, ঝর্না বা নদীতে মাছ ধরতে নামে, কিংবা অ্যাফবেস্টেশনের ফরেস্টের জমিতে গোরু চরায়। ফলে গার্ডদের মনে নানা রকম আশা এবং আশঙ্কার বাষ্পতরঙ্গ উঠতে লাগল।

রেঞ্জারের এসব ভাবনা ছিল না। তার পনি ততক্ষণে প্রশস্ত পথগুলো ছেড়ে বনের গলিপথে ঢুকে পড়েছে। ভরসা, ট্রাক নিঃশব্দে চলতে পারে না, গাছ কাটলে শব্দ হবে। এক গলি দিয়ে চলে রাস্তা ছুঁয়ে, খানিকটা সে রাস্তায় চলে, আবার দুই রাস্তার মাঝে যোগাযোগ করে এমন বনের গলিতে ঢুকে পড়া। সে জানে, এ ভাবে কাঠচোর ধরা একটা গেম অব চান্স। সে আজ বেরিয়েছে বনে, আজই এই তিনটি পথের কোনোটিতে পাস ও লাইসেন্স ছাড়া ট্রাক ধরা পড়বে, এমন কথা নেই। অন্তত দু-তিনটি ট্রাক দেখতে পাওয়া দরকার। ফলে জানাজানি হয়ে যায় চেক হচ্ছে। তখন স্মাগলারদের বেপরোয়া ভাব কমে। খানিকটা দমে থাকে।

এখন দুপুর হয়ে আসছে। ফরেস্টের সব রকম প্রহরী সঙ্গে খাবার ও জল রাখে। কারণ কখন তারা বাসায় ফিরতে পারবে তার ঠিক থাকে না। কিছুক্ষণ আগেই পনির পাশে দাঁড়িয়ে সে জিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু নির্জনে সেরকম থেমে গেলে যা তাকে অস্বস্তি দিচ্ছে, তা সেই পোকাখাওয়া ড্যামেজড বলে চিহ্নিত পাসের বইগুলো থেকে হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠা কয়েকটা। কয়েকটি পৃষ্ঠা মানে কয়েকটি পাস, কয়েক লক্ষ টাকা। তার রেঞ্জ থেকে তিনটি সড়ক তিনটি গেট দিয়ে বেরিয়েছে। সে সব গেটে সেই সব নকল পাস, যদি কেউ তা পেয়ে থাকে, দেখিয়েই ট্রাকগুলো বেরিযে যেতে পারে। সেগুলো যে নকল, যদি তা হয়, ধরা পড়ে কি?

প্রকৃতপক্ষে, সে ভাবলে, হয়তো পৃষ্ঠাগুলো এত পোকাকাটা-পোকাযুক্ত ছিল যে সেগুলোকে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে। এমনও হতে পারে, আবার, অন্যমনস্কভাবে অসাবধানতায়, যথেষ্ট অ্যালার্ট না থেকে, অন্যকে বেশি বিশ্বাস করার ফলে, সেই সব হারানো পৃষ্ঠার কোন কোনটিতে যদি পাস তৈরি হয়ে থাকে, তাতে সে সই করেছে।

এদিকেও দেখো, হুমকি দিয়েও সে কিন্তু মিত্রবাহাদুরের কাছে থেকে পাসের বইগুলি নিজের কাস্টডিতে নেয় নি। কেন? সে কি ভেবেছে, যদি বা সেরকম বেআইনী গেটপাস তৈরি হয়ে থাকে তবে পাসের বইগুলো মিত্রবাহাদুরের কাছে ছিল, সেই অবশ্য পাস তৈরি করে এনে তার সই নিয়েছে– এরকম বললে তার দায়িত্ব কিছু হালকা হয়?

সে পনিতে উঠল।

কিংবা এমনও হতে পাবে, এখনও সেই পৃষ্ঠাগুলো ব্যবহার করা হয়নি, পরে কোনদিন হয়ে যাবে।

সে গভীর বনে ঢুকে পড়েছিল, যেখানে দুপুর বেলায় বিকেল মনে হচ্ছে। তার বাঁদিকে একটা জলা যা বছর তিনেক আগে একটা ঝোরার মুখ ধ্বসে আটকে তৈরি হয়েছে। এখন জল খুবই কম চোখে পড়ে। নলখাগড়া, হাতিঘাসে ঢাকা প্রান্তর মনে হয়। পনিটা কান খাড়া করে চলেছে। কোন পশু কাছাকাছি আছে এরকম অনুমান হচ্ছে। পনিটা নাক ঝাড়ল। তখনই সে প্রান্তরটার উত্তরপশ্চিম অংশ ঘেঁষে প্রথমে একটিকে, পরে দলটাকেই দেখতে পেলে। বাইসন। সে নিঃশব্দে লাগাম টানলে।

তার মুখে এতক্ষণে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি দেখা দিল। এরা বেশ বেড়েছে। কী দাম্ভিক, কী রাজকীয়। এই সব কিন্তু তার চাকরির যুক্তি হতে পারে, দুই চোখ ভরে এরকম রূপ দেখা। সে লাগামে ঢিল দিয়ে পনিটার পাছায় মৃদু চাপড় দিলে, পনিটা চলতে সুরু করল। সামলিং বনে বন্যায় বাঘ চলে যাওয়ায় হরিণ বেড়েছে ; হরিণ বাড়ায়, চিতা। এদিকে বাঁশবন কমায় হাতি কমেছে, অন্যদিকে ঘাসবন বাড়ায় বাইসন বেড়েছে। এগুলো বনরক্ষকের এক সার্থকতা।

একরকম বলাধান হল তার মনে। ফলে কিছুদুর গিয়ে এক গাছতলায় সে পনি থেকে নেমে তাকে ঘাসে চরতে দিলে। নিজের ছোট কেস থেকে স্যান্ডউইচ আর ফ্লাস্ক থেকে কফি নিয়ে সে দুপুরের খাওয়া শেষ করলে।

পাইপ ধরিয়ে সে হেঁটে চলল। পনিটা বনতলের ঘাস খেতে খেতে তার পিছনে হাঁটছে। সে স্থির করলে, বিকেলে চারটের মধ্যে সে গোরুমারা গেটে পৌঁছাবে। সেখানে গেট রেজিস্টারে যে সব ট্রাক পার হয়েছে, তাতে লাইসেন্স নাম্বার, ওনারের নাম, পাস নম্বার লেখা থাকবে। গত ছ-মাসের পাস নম্বার দেখে নিলে হয়।

তার সঙ্গের গার্ডরাও বেলা চারটে থেকেই ফিরতে সুরু করবে। চারটের পরে কোনো ট্রাককেই গেট পার হতে দেয়া হয় না। সুতরাং বনের পথে তিনটে সাড়ে তিনটের পরে কোন ট্রাক থাকবে না। নির্দেশটা না দিলেও নিয়ম অনুসারে গার্ডরা নারেঙ্গিহাটের দিকে চলবে।

কিন্তু গোরুমারার গেটে পৌঁছে গেটপাস রেজিস্টার দেখার কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। বরং আধঘণ্টা বসে সেখানকার কর্মচারীদের অসুবিধা, সুবিধা, অভিযোগ ইত্যাদি শুনলে। দুটো ছুটির আবেদন আর একটি বদলির প্রার্থনা শুনলে। আর তাতে মন হালকা হলে, সে বললে, দরখাস্তগুলো পাঠিয়ে দিও রেকমেন্ড করতে।

নারেঙ্গিহাট পৌঁছানোর আগেই সন্ধ্যা নামল। সে তখন রিভলবারটাকে বেল্ট ও হলস্টার সমেত কোটের তলা থেকে বাইরে আনলে। টর্চের আলোরও সাহায্য নিতে লাগল। এমন কি হতে পারে, গেটপাসের সমস্ত বই সে নিজের হাতে নিলে যদি কারো কাছে সেইসব হারানো পৃষ্ঠা থেকে থাকে, তা হলে সেগুলো ব্যবহার করতে কেউ সাহস পাবে না? যদি অবশ্য ইতিমধ্যে তার অন্যায় ব্যবহার না হয়ে থাকে। আশ্চর্য! সে কি এতই অমনোযোগী সে গেটপাস সই করার সময়ে সে তার অফিসের পাস রেজিস্টারে লেখা নম্বর আর পাসের নম্বর মিলিয়ে দেখে নি? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, নকল পাসে তার সই নেয়া হয়ে থাকলে, রেজিস্টারে তা তোলা হবে না। তার মুখ চারপাশের অন্ধকারের মতো মলিন দেখাল। সে কি সই করার সময়ে রেজিস্টার চেয়ে নেয় নি?

৩

তখন বেলা এগারোটা তো বটেই। ময়ূর তার ইজিচেয়ারে ক্লান্তিযুক্ত তন্দ্রায় নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। একবার সেটা টুটলে তার রান্না ও খাওয়ার কথা মনে পড়ল। নরবু পারবে না, তার হাত ভাঙা। তা ছাড়া সে তো ট্যুরে রেঞ্জার সাহবের সঙ্গে। তা হলেও সে এখন উঠতে পারবে না। সে পা-দুটোকে বরং হাতলের উপরে ছড়িয়ে দিতে নিচের হাতলদুটোকে সামনে ঘুরিয়ে নিলে। আহত হাতটা বুকের উপরেই রইল। অনুভব করলে, বার বার তাকে আঘাত দিয়ে কিছু প্রমাণ করতে চাইছে কেউ। সে তন্দ্রার ঘোরে বললে, দিচ্ছিনা প্রমাণ করতে। কষ্ট পাচ্ছি না।

দুপুরটা তার গায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। রোদ তার পা বেয়ে বেয়ে বুক অবধি উঠে আবার নেমে যাচ্ছে তখন। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল তার। সে অনুমান করলে, শব্দটা কাচে কিছু ঠোকার। তা হলে নরবু কি সকালের চা এনেছে? এরকম আন্দাজ করে চোখ মেলে সে অবাক হল। রোজা তার পাশে দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে জানালার কাচে আঙুল ঠুকছে সে। রোজা বললে, আমামা, কস্ত সুতেকো, সে সুইচ টিপে বারান্দার আলো জ্বাললে। ময়ূর লজ্জিত হয়ে বললে, এখন কটা বাজে?

চারটেতে সে স্কুল ছুটি দিয়েছে। বাসায় গিয়েছে। তারপর নিজের বাড়িতে গিয়েছিল। এখন পাঁচটা বাজে। সকালে বাজার করার সময়ে যেমন দেখে গিয়েছিল সে মেয়রকে, বাড়িতে যেতে যেমন দেখেছিল, এখনও ঠিক তেমন শুয়ে থাকতে দেখছে। আজু কে খায়েক?

ওই এক রকম।

তার মানে মেয়র রান্নাও করেনি, খায়ও নি। স্নিগ্ধ অনির্বচনীয় হাসি দেখা দিল রোজার মুখে। সে বললে, চিয়া খানে হো? গরঁছু? সে উত্তরের অপেক্ষা না করে ভিতরে চলে গেল।

দু-এক মিনিটে ময়ূর উঠে বসল। সে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলে, ইতিমধ্যে রোজা সেখানে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল তুলে দিয়েছে।

ময়ূর বললে, আপনাকে করতে হবে কেন? আমি চা করে নিচ্ছি।

রোজা বললে, মেয়রকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে। সে কোথাও বসুক, চা খেয়ে নিক। সে দেখে নিয়েছে, খান কয়েক চাপাটি করে দেয়ার মতো যোগাড় আছে।

নতুন জায়গা হলেও রোজা কয়েক মিনিটে একপট চা করে ফেলল। ময়ূর রান্নাঘরেই বসেছিল। তার সামনে চা দিলে, সে বললে, মিসেস, আপনিও একটু চা খান। রোজা আর একটা কাপে নিজের জন্য চা ঢেলে নিলে। রোজার এই সহজ ভাবটা ময়ূরের কাছে অসাধারণ মনে হল। আশ্চর্য, যেন রোজা রোজই এমন চা করে দেয় তাকে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রোজা জিজ্ঞাসা করলে, মেয়র জানে নাকি, এখান থেকে ফরেস্ট অফিস কি চলে যাবেই?

অনেকেই চলে যেতে চাইছে। অশান্তি করছে।

রোজা চোখ মেলে ময়ূরকে দেখতে থাকল চা খেতে খেতে।

দুজনেরই চা শেষ হলে, কাপ তুলে নিতে নিতে রোজা বললে, সকলে চলে গেলে জায়গাটা কেমন নির্জন হয়ে যায় না?

তাকে যেন দুর্বল আর অসহায় মনে হল। কিন্তু তখনই সে উঠে রান্নার টেবলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখন কিন্তু তাকে আর তেমন মনে হল না। কালো একটা গাউনের উপরে কালো চাদর। তা সত্ত্বেও পাশ থেকে তার শরীরটা দৃঢ় বাঁধুনি নিয়ে চোখে পড়ছে, চওড়া নিতম্ব, চওড়া পিঠ, পরিপুষ্ট বাহু। ময়ূর মনে মনে বললে, এখানকার সব স্ত্রীলোকের চাইতে যেন তুলনায় লম্বাও বটে।

কিন্তু রোজা যতক্ষণ খাবার করবে ততক্ষণ চুপ করে বসে থাকাও যায় না। সে তার শোবার ঘরে চলে গেল।

আধঘণ্টাও গেল না, রোজা খাবার করে আনলে। একটা টিপয় টেনে তার উপরে খাবারের প্লেট রেখে ময়ূরের জন্য একটা চেয়ার টেনে দিয়ে, আলো জ্বাললে। রান্নাঘর থেকে খাওয়ার জল এনে টিপয়ের উপরে রেখে একটা টুল টেনে নিয়ে নিজেও বসল।

রঙ দেখার চোখ সকলের সমান হয়না, তা হলেও সাধারণ চোখে কিছু রং ধরা পড়ে। তেমন ময়ূর লক্ষ্য করলে, প্লেটটা চীনামাটি সাদা, ওভাল, চৌকোণ করে ভাজা পরোটা কয়েকটা সোনালি, সবুজ মটর ছড়ানো তরকারিটা লাল। রোজার কমলা রঙের মুখ, নীলাভ চোখ, রুপোলি আঁশযুক্ত কালো চুলের অ্যালবার্ট ঢেউ কপালে, আঙুলগুলো সরু লম্বা, চাঁপা রং।

ময়ূর খেতে শুরু করলে রোজা বললে, তুমি খাও, আমি তোমার বিছানাটা ঠিক করি। খাওয়া হলে তোমার হাতের ব্যাণ্ডেজটা ঠিক করবো। খুব কষে বাঁধা মনে হচ্ছে।

বালিশ গুছিয়ে, চাদরটা টান টান করে, কম্বলটা ভাঁজ করে রোজা ময়ূরের সামনে এসে বসল।

ময়ূর লক্ষ্য করলে, রোজার চাদর, যা এতক্ষণ তার পায়ের কাছে ধারে ধারে ঝিলমিল করছিল, তা এখন, বোধহয়, চা, খাবার, বিছানা ইত্যাদি কাজের ফলে কাঁধের কাছে, তার রং কালো। তার গাউন যা মসলিন জাতীয় কাপড়ের, তাকে এখন কালো বলা যায় না, তাতে সবুজ আভা আছে, যা হয়তো হালকা সবুজ বুকজামার ফলে।

রোজা বললে, সকলে এখান থেকে চলে গেলে একা লাগবে না? আমি ভাবি।

আপনি কি তখন এখানে থেকে যাবেন?

তা তো বটেই। তুমিও তো তখন চলে যাবে, মেইঅর সাহেব।

খেতে খেতে ময়ূর বললে, এখনই ঠিক বলা যায় না। যদি থাকি...

তা কেন থাকবে? এখানে তোমার কিসের আকর্ষণ? রোজার চোখ দুটো নাচল যেন। সে বললে, আমরা এমন সুন্দর মেইঅর আর পাবো না।

কথার পিঠে কথা বলতে ময়ূর বললে, সুন্দর? আমি?

বাহ্ কী যে বলো! সুন্দর নয়? তোমার মতো সুন্দর পুরুষ কমই হয়। আমার ছেলে আছে তোমার মতোই যেন। তা হলেও তোমার মতো সুন্দর ছেলে যদি হয়, আমি তাকে ছেলে করতে রাজি।

ময়ূরের খাওয়া হয়ে গেলে প্লেট, গ্লাস, কাপ, ইত্যাদি জড়ো করে রান্না ঘরে নিয়ে যেতে যেতে রোজা বললে, জল ঢেলে দিই, হাত মুখ ধোবে, এসো।

শোবার ঘরে ফিরে রোজা বললে, এবার তোমার ব্যাণ্ডেজটা ঠিক করে দিই।

ময়ূর বললে, এই তো বেশ।

রোজা টুল টেনে নিয়ে পাশে বসে বললে, আমি শুনেছি, তোমার পায়ের চোটের সময়েও ডাক্তারের কথা শোনো নি। তুমি কি গ্রেগ সাহেব যে দুঃখ কষ্ট নেই?

রোজা সন্তর্পণে সেই রুমালের ব্যাণ্ডেজটা খুলতে লাগল।

ময়ূর জিজ্ঞাসা করলে, গ্রেগ সাহেবের কথা বলছেন কেন?

তিনি একদিন বলেছিলেন, শরীরটা তাঁর নয়। অথচ, দেখো, পোস্টমাস্টার সেদিনের হাঁটুর আঘাতে সত্যি কাতর হয়েছিলেন। তাঁর মুখ দেখে মালুম হচ্ছিল।

ব্যান্ডেজ খোলা হলে, রোজা চাদরের নিচে হাত চালিয়ে, সাদা কাগজে মোড়া তুলো আর ব্যান্ডেজের গজ বার করলে। বললে, অবাক হচ্ছো। সকালেই দেখেছিলাম রুমালের ব্যান্ডেজ ভালো বাঁধতে পারো নি। কাজ না থাকলে আগেই এসে বেঁধে দিতাম।

নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে রোজা জিজ্ঞাসা করলে, ময়ূর ওযুধ খাচ্ছে কিনা কিছু। ময়ূর বললে, ঘা শুকনোর আর ব্যথা কমানোর বড়ি কিছু আছে। তাই খেয়েছি। রোজা বললে, জাকিগঞ্জের ডিসপেনসারিতে গেলে একটা দুটো সুই দিয়ে নিলে ভালো হত। সত্যি বলোতো, তুমি আর নরবু কি ডাকাতি করতে গিয়েছিলে? নাকি দ্রুকের মার খেয়েছো? সেই একচোখ গিয়ালপোটার তোমার উপরে রাগ আছে, লোকে বলে। রোজা উঠে দাঁড়াল। গাউনের পিছনের কোন পকেট থেকে সাদা কাগজে জড়ানো খানিকটা তামাক পাতা বার করলে। দুই হাতের তেলোয় রেখে ডলে ডলে সেই কাগজেই একটা বিড়ি বানিয়ে নিয়ে দেশলাই জ্বেলে ধরালে। সে ধোঁয়া ছাড়তে জানলার কাছে উঠে গিয়েছিল। তার পিছনের শার্সি দিয়ে চাঁদের হালকা হলুদ, বাইরের পাহাড় গাছপালা মিলে ব্যাকগ্রাউন্ড, তার সামনে ঘরের আলোয় স্পষ্ট সেই কালো পোশাকে রোজা।

ময়ূরের মনে হল, এটাই গ্রেগের দেখা রোজা, এটা রেঞ্জারের এমন একটা ছবি যা এখনও আঁকা হয় নি। ওখানে দাঁড়িয়ে বাংলোটাকে যেন বাড়ি করছে। কেমন এক তৃষ্ণা, যেন তাকে মা বলা যায়। সে বললে, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি, মিসেস।

পরদই না। আইলে দ্রুক ছই না এতা। তিমরো শুটিংকো ডর পাউনছ এস্তপনি শুনছ। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও। নরবু হয়তো আজ আসবে না। আমি কাল এসে হাত দেখে যাবো।

রোজা চলে গেলে ময়ূর ভাবলে, রেঞ্জার চলে যাবেন। তখনও কিন্তু রোজা ছবি আঁকার মতো হয়ে থেকে যাবে এখানে।

তারপর তার মনে পড়ল দ্রুকের সেই বিশ হাজার টাকার প্রস্তাব। আসলে কিন্তু সে দ্রুক নয়। পরদিন কিংবা তার আগের দিন দাড়ি কামাতে বসে মনবাহাদুর নিজেই দ্রুকের কথা তুলেছিল। তার মতে দ্রুক একটা পৃথক জাত। তাদের দেশ আছে। সীমান্তের ওপারে এক সময়ে তারাই এইসব অঞ্চল, তা দুশো বছর আগে হবে, দখলে রাখতো, দমন করতো। তাদের সৈন্যরা নির্দয় ছিল, যেমন সৈন্য হয়। এখন নেই, কিন্তু তাদের ভয় থেকে গিয়েছে। ঠাকুর্দা থেকে বাবা, বাবা থেকে ছেলে– এ রকম যাবে। সেই ভয়টাই এখন দ্রুক। গেন্দাসিংদের বন্ধু বাহাদুরি করে সেই দ্রুক নাম নিয়েছে। আসল দ্রুক নয়। আমাদের মেইঅরের সঙ্গে পারবে না ওই গিয়ালপো। তখন সে নিজে বলেছিল, আর তোমাদের মেয়র বুঝি আসল? মনবাহাদুর বিস্মিত হয়ে বলেছিল, হোঃ।

৪

পরের দিন অফিসের সময়ে ময়ূর রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে বেরুল। ক্রেটগুলোর কথা না বলুক, পাম্পিং হাউস যে বিপজ্জনক জায়গা হয়ে উঠেছে, তা বলা উচিত। রেঞ্জারের বাংলোর কাছেই নরবুর সঙ্গে দেখা হল তার। নরবুর ডান হাতের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত প্লাসটার করা, গলায় তুলে বাঁধা। সে বললে, রাতে নারেঙ্গিহাট বিট অফিসে রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আজও তিনি ট্যুরে থাকবেন। ময়ূর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোর হাত?

নরবুর তেরচা চোখে ভয় ভয় বোকা হাসি দেখা দিল। বললে, মহকুমা শহরের ডাক্তার একমাস পরে খুলতে বলেছে।

ময়ূর বিষণ্ণ ও লজ্জিত মুখে বললে, তোর হাতটা ভাঙল। আমি এরকম চাইনি।

নরবু বললে, আইলে বাজারসওদা গরনু হোস। খানে শুনছ কি?

বাজার করে তারা যখন মেয়র-বাংলোর কাছে, বেলা এগারোটা হয়, তারা অবাক হয়ে দেখলে বারান্দায় লাকপা বসে আছে, তার সঙ্গে একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোক। লাকপা এখন পাহাড়ি ভাষা

কিছু শিখেছে, বুঝতে পারছে, বলতে অসুবিধা। সে বোঝাল, সে স্ত্রীকে আনতে গিয়েছিল। এই সে স্ত্রী। যার নাম করুই। তাকে নুমপাই নিয়ে যাচ্ছে। তার নরম ছোট ছোট পায়ে কষ্ট হবে বলে, রাতটা মেইঅর বাংলোর বারান্দায় থাকতে চায়। মেইঅর কি রাজি হয়?

ময়ূর বললে, লাকপা তুমি যে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে মেয়র-বাংলোয় থাকতে রাজি হয়েছো, মেয়রেব কথা মনে রেখেছো, এ জন্যই ধন্যবাদ। অবশ্য তোমরা এই বাংলোয় রাতে থাকবে। লাকপার স্ত্রী লাকপার কাছে ময়ূরের প্রস্তাব শুনলে তাদের সেই দুর্বোধ্য আসুর ভাষাতেই। মনে হয় পরিচিত ভাষাই, কিন্তু তার একটা শব্দও যদি বোঝা যায়। লাকপার স্ত্রী তখন লাকপার চাইতেও দ্রুত, যেন ঝর্নার মতো প্রবাহ তার এমন কিচিমিচি সে ভাষা, যেন পাখি ডাকছে, এমন ভাবে কিছু বললে, ময়ূরের দিকে একটা সুন্দর সাদা হাসিও অপাঙ্গে ছুঁড়ে দিলে।

কিন্তু লাকপা মাথা নেড়ে বললে, আসলে তার স্ত্রী রাজি হচ্ছে না। বলছে, কোন গাছের তলায় কিংবা গুহায় রাত কাটানো যেতে পারে।

ময়ূর তখন বললে, আমার আব নরবুর হাতের অবস্থা দেখো লাকপা, সকাল থেকে আমরা কিছু খাই নি। বাজার করেছি, কিন্তু চাপাটি টিকারা গড়ব, এমন উপায় নেই। তোমার সুন্দরী স্ত্রী করুই আমাদের জন্য কয়েকটা চাপাটি করে দিলে যদি খেতে পাই।

লাকপা ময়ূরের বক্তব্য তাদের ভাষায় অনুবাদ করলে আবার সেই পাখির কিচিমিচি। তারপর ডাগর চোখ মেলে লাকপার স্ত্রী ময়ূরের ব্যান্ডেজ বাঁধা আর নরবুর প্লাস্টার করা হাত দেখলে। তারপর স্নিগ্ধ হাসিতে সেই শর্মিষ্ঠা মেয়র-বাংলোয় থাকতে রাজি হলে লাকপা নিজেদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে, মেয়র শাগরেদ নিয়ে ডাকাতি করতে গিয়েছিল নাকি। যদি এটা মেয়রের বউ আনার চেষ্টায় হয়ে থাকে, তবে সে বউ কোথায়? তার স্ত্রী জানতে চাইছে।

তার নাম অবশ্যই শর্মিষ্ঠা নয়, যদিও বোঝা যাচ্ছে সেও লাকপার মতো অসুর। কোন পাখির তিনটে লাল পালক গাঢ় খয়েরি চুলের গোল খোপায় বসানো। গড়ন কিছুটা সাঁওতালি, কিন্তু মাথায় প্রায় পুরুষ সমান উঁচু, হালকা মুখে নাকটা সরল, সরু, মাঝারি রকমের উঁচু, চোখের মণি কালো না হয়ে খয়েরি আর বড়; সুদৃশ্য কানদুটোকে ফুটো করে গোল কালো কাঠের গুঁজি, গলায় নীল চীনামাটির মটরমালা। দাঁতগুলো মুক্তার তাতে সন্দেহ নেই।

দেখতে দেখতে সেই আঠারো উনিশের নরবু বলে ফেললে, এরকম করুই-এর জন্য একবারের জায়গায় তিনবার মরা যায়।

লাকপা সব না বুঝলেও করুই এর জন্য তিনবার মরা বুঝেছিল। সে বললে, নরবু ভাই, দুবার মরে, দুবার জন্মে, তৃতীয়বার তুমি বড় হতে করুই আজিনানী হয়ে যাবে। তো ভাই, মনে দুঃখ কোরো না।

চাপাটি যখন তৈরি হচ্ছে, তখন তারা সকলেই রান্নাঘরের কাছে। করুই সিমেন্ট-বাঁধানো উঁচু রান্নার টেবলের সামনে, নরবু বয়োকনিষ্ঠ বলে তাকে এটা সেটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছে। রান্নাঘরের দরজার বাইরে অল্প দূরে দুটো টুলে মেয়র আর লাকপা। লাকপা একটা বড় বাটিতে আনাজ নিয়ে ছুরির সাহায্যে কাটছে।

ময়ূরের তো কৌতূহল হচ্ছেই। সে জিজ্ঞাসা করছিল, লাকপা স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছো নুমপাই, খাওয়াবে কী? কমলা আর নাসপাতির ফল হতে তিন বছর। আর আমার ভাইবউ, তোমার স্ত্রী তো ফেজ্যান্ট পাখি নয়, যে তার ফলেই চলে যাবে।

লাকপা বলছিল, নুমপাই এর বন যেখানে হালকা, সেখানে কমলা আর নাসপাতি লাগানো হয়েছে। যেখানে ঘাস, বড়গাছ হয় না, সেখানে দাওআ বলেছে, বড়জোর দু-এক ফুট উপর মাটি, তার তলায় চাঁই চাঁই পাথর। ঘাস তুলে আলু, লাল আলু, কেঁদ হয় কিনা দেখতে হবে। ধান হবে

না। তত জল নাই। হয়তো ভুট্টা হতে পারে। ইস্কুশ হবে। শাকও হয়ে যাবে।

ময়ূর বললে, বাহ্, তা হলে তো তুই স্বর্গই বানালি। পাখি শিকার হবে, গোরুও ঘাস পাবে।

লাকপার আনাজ কাটা, খোসা ছাড়ানো হয়েছিল। ময়ূর বললে, চল, তোকে আমাদের সন্তরা গাছ দেখিয়ে আনি।

তারা রান্নঘরের দরজার কাছে থেকে উঠে, বাংলোর ব্যাকগার্ডেনের দিকে কয়েক পা মাত্র গিয়েছে, এমন সময়েই ঘটে গেল।

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, চিৎকার করে, যেন চোখে দেখছে না, যেন মৌমাছির তাড়া খাওয়া ভালুক-বাচ্চা, এমন করে নরবু তাদের দিকে ছুটে এল।

কী হল, কী হল, বলে ময়ূর ও লাকপাও তার দিকে দৌড়ে এল। নরবু বললে, থোঁচ্ রিচ্।

কী?

আঁরিচ্ গুঁচ্।

আরে. ধ্যেৎ, কী বলছিস।

নরবু তা সত্ত্বেও বললে, আঁ ক্রুচ্ হঁচ্।

কী হয়েছে বুঝতে, কারণ নরবুর নাক মুখ লাল, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, ময়ূর আর লাকপা রান্নাঘরে গেল। সেখানে উনানের এক মুখে ডাল ফুটছে। অন্যমুখে তাওয়ায় চাপাটি উল্টে দিচ্ছে শান্তশ্রী করুই। এক হাতে খুন্তি, অন্য হাতে আঁচল তুলে মুখ ঢাকা। নরবু তাদের পিছন পিছন রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছিল। সে ঘরে না ঢুকে উনানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ডাচ্ লচ্ লিচ্।

এখন, কিছুতেই কোন দিনই আসল ব্যাপার জানা যাবে না। ছোট ছোট হলুদ প্রজাপতি যেমন চঞ্চল হয়ে এ ফুল থেকে সে ফুলে উড়ে যেতে কসরৎ দেখায়, যেন মধুর খোঁজের চাইতে টেক অফ, ল্যান্ডিং এর কৌশল দেখানোই উদ্দেশ্য, নরবু যদি সে রকম ভাবে করুই-এর গুঁজিপরা কান আর খয়েরি চুলের কোমল জুলফির মাঝে ঠোঁট ছোঁয়ানোর চেষ্টা করে থাকে তা এমনকি লাকপাও কোন দিন জানবে না।

সেদিন ডালটা বিশেষ ঝাল হয়েছিল। সেই ঝাল কমাতে চমরিঘিয়ের মিষ্টি চাপাটিগুলো বেশি দরকার হল।

যেতে যেতে লাকপা মেয়রের হাতের কথা তুলেছিল। ছুরিতে গভীর হয়ে কেটেছে শুনে, ফুলে আছে দেখে, ব্যথা আছে জেনে, লাকপা পরিবেশনরতা করুইকে কিচমিচ করে কিছু বললে। অবগুণ্ঠনে তার মুখের অনেকটা ঢাকা থাকায়, তার সেই বড় বড় খযেরি মণির একটা চোখই শুধু দেখা গেল।

খাওয়া শেষ হলে তারা যখন বাইরের বারান্দায় গিয়ে পড়ন্ত রোদে গোল হয়ে বসেছে, লাকপা মেয়রের হাতের কথা আবার বললে করুইকে। করুই উত্তরে কিছু বললে। লাকপা অনুবাদ করলে, ওষুধ আছে করুই-এর সঙ্গে, মেইয়র ঝর্নার জলে হাত রেখে ভালো করে হাত ধুয়ে নিলে ওষুধ দেয়া যায় লাগিয়ে। লাকপা নিজের শরীরের সেই অনেক শুকনো ক্ষতচিহ্নর দিকে ইঙ্গিত করে বললে, সে সবও করুই-এর চিকিৎসায় সেরেছে।

বিকেল শেষ হওয়ার আগেই লাকপা ময়ূরকে নিয়ে কালিঝোরার স্রোতের পাশে গিয়ে বসেছিল, আর সেই স্রোতে ময়ূরের হাত ডুবিয়ে ধরে রেখেছিল, যতক্ষণে না কাপড়পোড়া ছাই ধুয়ে গিয়ে হাত থেকে যেন আবার রক্ত বেরোবে এমন যন্ত্রণা সুরু হয়েছিল। তারা বাংলোয় ফিরলে একটা ঢাকনাদার বাঁশের চোং থেকে পুরনো ঘিয়ের কটুগন্ধযুক্ত প্রলেপ বার করে করুই পাখির পালকের মতো নরম স্পর্শের আঙুল দিয়ে তা ময়ূরের হাতে লাগিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে নরবু বাজার থেকে

নতুন কাপড় কিনে এনেছিল। তাকে ফালি ফালি করে ব্যান্ডেজ বাঁধলে লাকপা।

তখন যন্ত্রণা না থাকায় ময়ূর জিজ্ঞাসা করলে, করুই কি এই দাওয়াই সব সময়েই সঙ্গে রাখে? ময়ূরের প্রশ্ন লাকপা অনুবাদ করলে, করুই তার পাখিভাষায় হাসতে হাসতে উত্তর দিলে। কিন্তু লাকপার, দেখা গেল, দোভাষিত্বে বেশ আপত্তি। পরে সে সোজাসুজি পাহাড়িতে বললে, মেয়র বিচার করুন, আমাকে দেখে কি হিংসুক পুরুষ মনে হয়? করুই বলছে, হিংসুক পুরুষ সঙ্গে থাকলে মেয়েদের সঙ্গে ওষুধও রাখতে হয়। এই তো বসে আছি, আমি কি কারো শিংএ শিং জড়িয়ে ফেলছি?

পরের দিন রোদ চড়া হওয়ার আগেই, লাকপা রওনা হতে চাইলে, নরবু বললে, তা কি করে হয়? ভাবী রান্না করে খেয়ে গেলে, আমাদের দুজনেরও আজ দুপুরের খাওয়া জোটে। মাঝামাঝি রফা হল। করুই পথের জন্য চাপাটি করে নিয়েছে। ফলে মেয়র আর নরবুর জন্য দুবেলার মতো চাপাটি সেঁকে রেখে গেল।

দুজনের পিঠেই মোট, কপালে আটকে রাখা দড়ির ছিকে থেকে ঝোলানো। লাকপার ডান হাতে একটা হালকা কাঠের ক্রস। সেটাকে দুহাতে ধরে সামনে ঝুঁকে করুই বিশ্রাম নিতে পারবে, কিংবা পিছনে মোটের নিচে ঠেকনো দিয়ে দাঁড়িয়ে পিঠকে বিশ্রাম দিতে পারবে। লাকপার বাঁহাতে ধনুক আর গোটা চারপাঁচ কালো, ইস্পাতের টুপি আর পাখিপালকের লেজ—এরকম তীর।

তারা যখন ব্রিজের কাছে, নরবু দৌড়ে বাংলোয় গেল। ছুরি দিয়ে এক থোকা আইরিস ফুল কেটে কুরুই এর হাতে গুঁজে দিলে। সে অসুর ভাষার হিংসুক শব্দটাকে ইতিমধ্যে আন্দাজ করেছে। লাকপার হাতের তীরগুলোকে দেখিয়ে বললে, লাকপা হিংসুক নয়। তারও বেশি।

বাংলোয় ফিরে ময়ূর বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসল। তার সামনে বিকেলের আলোতে ফুল ঝলসাচ্ছে।

নরবু।

জু।

যা রান্না করে রেখে গেছে, তাতে আজ রাতে, কাল সকালে রান্না করতে হবে না।

জু, পুগছ। (কুলাবে।)

তা হলে ক্লুটলং-এ কে ঠুলো ডাক্তার, তাকে হাত দেখাতে হবে না।

পরদই না। (দরকার হবে না।)

হঠাৎ ময়ূর হোহো করে হেসে উঠল। নরবু জিজ্ঞাসা করলে, কী হয়েছে?

কুরুইচ্ ইচ্। ভাচ্‌লচ্ লিচ্। আচ্ছা নরবু, ঠিক করে বল। নাকে লঙ্কার গুঁড়ো গিয়েছিল। ঠিক করে বল্। করুইকে চুমু খেতে গিয়েছিলি?

প্রকৃত পক্ষে ক্লুটলং-এর সেই বড় ডাক্তারের সঙ্গে ময়ূরের দেখা হয়েছিল যোগাযোগের ফলে। তার আগে ময়ূরের ডান হাতে ক্ষত সেরেছে। নরবুর হাতে প্লাস্টার থাকলেও সে ডান হাতের আঙুলগুলোকে বরং বেশিই নাড়ছে। দুজনের রান্না-খাওয়ার অসুবিধা নেই। নরবু বাঁ হাতে করে হলেও সব ফুলগাছকে বরং বেশি করে জল খাওয়াছে। একদিন বাংলোর পিছনের বাগানে বসানো কাচঢাকা হটহাউসে ব্লিডিং হার্ট ফুটেছে বলে বেশ চেঁচামেচি করলে। আর একদিন বললে, যে অর্কিড পাড়তে গিয়ে মেয়র পা ভেঙেছিল, সে রকম অর্কিড ঘির্লিং স্টেশনে উঠবার পথে একটা গাছে সে দেখেছে। ডাল সমেত সে অর্কিড এনে পিছনের বাগানে কোন গাছে বেঁধে দিলে হয়। ময়ূর বললে, গ্রেগ অ্যাভেনুতে যেতে বাঁ হাতে নিচের উপত্যকায় নানা অর্কিড আছে বলে তার অনুমান।

একদিন নরবু বললে, একপক্ষ হল আপনি রাতে বেরোচ্ছেন না, মেইয়র সাহেব। তখন চুপ করে থেকে পরে এক সময় ময়ূর বললে, আমি তো সব সময়েই তোর চোখের সামনে। আচ্ছা,

নরবু, ঠিক করে বল, পোস্টমাস্টার ছাড়াও আব কেউ কেউ কি তোকে আমাব উপবে চোখ রাখতে বলেছে? তারা কি সে জন্য তোকে টাকা দেয়?

তখন নরবু চুপ করে রইল।

পরে আর এক সময়ে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, মেইঅর, তপাই দ্রুক ছন কে?

ময়ূর হো হো করে হেসে উঠল। বললে, আমিই দ্রুক কি না? আমি কি একচোখো? ঠিক করে নে, আমি পুলিশ, না দ্রুক, না শুধু মেইঅব।

নরবু বললে, ডাক্তাররা বিশ্বাস করে না, কোন মানুষ হাত ধরলে এমন করে, আমার মতো, হাতের হাড় ভাঙে।

দূর বোকা, ও এক রকম খেলা, যা কোন কোন ইস্কুলে শেখায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

১

তখন জুলাই পৌঁছেচে তাসিলায়, সুতবাং ক্লুটলং-এও। ক্লুটলং টিলাটা অনেকাংশে এখন সবুজ। গাছে সবুজ পাতা, শাকসবজিও সবুজ। কিন্তু বেশির ভাগ ঘাসে ঢাকা। নামগিয়াল একদিন বলে বসল, ঘাস তুলে জড়ো করে পুড়িয়ে দিলে চাষের সুবিধা হয়, সারও হয়। তখন জেন বললে, আমি, তুমি আব থেনড়ুপ কী চাষ করব? বোধ হয় চাষের জন্য অন্য রকম মানুষ আছে। তাদেব খুঁজতে হয়।

ইতিমধ্যে ক্লিনিকের ব্যাপারটা আব একটু এগিয়েছে। পরশুদিন অসওয়ালের বাড়িতে তার বেটাবউকে আবার ইনজেকশন দিতে গিয়ে সেখানে ডাক্তারখানার কথা উঠেছিল। এখানে সে রকম একটা বাড়ি, যা শহরে দেখা যায়, তৈরি করতে হলে লোহা লক্কড় সিমেন্টের চাইতে কাঠই বেশি দরকার হবে। কৃতজ্ঞ, উৎসাহিত অসওয়াল বলেছিল, ম্যাডাম, আমাদের সৌভাগ্য এখানে এটা হচ্ছে। আমাদের সব বিজিনেসম্যান এ ব্যাপারে মদৎ করবো। সিমেন্ট, লোহা, টিন যত লাগে জংশন শহবের পাইকারি দরে আমি সাপ্লাই দেবো। কাঠও লাগবে। বোধ হয় ববিজান আর গেন্দাসিং দুজনেই মদৎ করবে। আমিই তদ্বির করবো। আর ইঞ্জিনিয়ার ভি আছে, বিরিঞ্চিবাবু। তাকে নিয়ে যাবো আপনার কাছে।

আজ আবার অসওয়ালের বেটাবউকে ইনজেকশন দেয়ার দিন। কাল রাতে ক্লিনিক তৈরিব চিন্তা তাকে মৃদুভাবে উত্তেজিত করায়, ঘুমাতে দেরি হয়েছিল। আজ সকালে জেনের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে। এতক্ষণে থেনড়ুপের চা নিয়ে আসার সময়।

থেনড়ুপের অনুপস্থিতি একটা প্রশ্ন হতে পারতো, কিন্তু রোগীটিকে ইনজেকশন দেয়ার আর অসওয়ালের সঙ্গে ক্লিনিকের বাড়ি তোলার বিষয়ে আরও আলাপের কথা মনে আসতে থেনড়ুপের ব্যাপারটা মন থেকে দূরে গেলে। সে কিচেনে গিয়ে তার আর নামগিয়ালের চা করে, ব্রেকফাস্ট থেনড়ুপ এসে করবে, এরকম স্থির কবে, অসওয়ালের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

সেখানে রোগিনীর খবর ভালো। পুরনো ব্রঙ্কাইটিস। চিকিৎসা আরও কিছু দিন চলবে। কিন্তু যৌবন ও স্বামী হারানোর ভয়ে যে মানসিক ভারসাম্য হাবাচ্ছিল, আরোগ্যের আশায় সে ভাবটাও কিছু কমেছে। আরোগ্যের আশায় তার নিকটজনেরাও এখন তাকে কিছু বেশি মূল্য দিচ্ছে। তার

স্বামী এখনই তার ঘরে গিয়ে বসছে আবার।

গেন্দাসিং আর ববিজানের সঙ্গে অসওয়াল আলাপ করেছে ইতিমধ্যে। তারা কাঠের দাম কমানোর বদলে, বরং সাধারণ দামেই সিজনড এবং আসল কাঠ বাছাই করে দিতে রাজি হয়েছে। অসওয়ালের দোকানেই এসেছিল এঞ্জিনিয়ার। সে ভদ্রলোকও প্ল্যানট্যান করে দিতে রাজি হয়েছে। আজ বিকেলেই এঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে অসওয়াল ক্লুটলং-এ আসবে। এঞ্জিনিয়ার জমি দেখে নেবে, মেপে নেবে।

পথে ফিরতে ফিরতে এসবই ভাবছিল জেন। এই সূত্রেই দুদিন আগে আসা স্মোলেটের চিঠিটার কথা মনে এল তার। দেখা যাচ্ছে, পাশাপাশি চেম্বারে বসে কাজ করলেও, দুজনেই ডাইরেক্টর হলেও, দুজনের কাজের পার্থক্য আছে। বাড়িঘর, এস্টাব্লিশমেন্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে চিঠি হলে উত্তরে সই থাকে কোহেনের। আর সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু জানাতে বা নির্দেশ দিতে চাইলে সই থাকে টি. স্মোলেট।

স্মোলেট শেষ চিঠিটায় লিখেছে : ক্লিনিক করা যখন স্থির করলেই, তখন তো ওখানেই থেকে গেলে স্থায়ীভাবে। দেখা যাচ্ছে, তোমার সাহসেরই জয় হল। এবার ওদিকের আদিবাসীদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করো। ওটা তো সীমান্তদেশ। ওখানে দেখবে নানা শ্রেণীর দরিদ্র আদিবাসী। ইতিমধ্যে লক্ষ্যে এসে থাকবে, আদিবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর। ওখানেও কি হিন্দুরাই প্রবল নয়? ওদের ভাষার আর ধর্মের তফাৎ লক্ষ্য করো। ওদিকে যাদের মুখোশনাচটাচ থাকবে তারা হয়তো সংখ্যালঘু। আমাদের কর্তব্য, এই সংখ্যালঘু, তুলনায় বেশি অনুন্নত আর কোণঠাসা মানুষদেরই আগে সাহায্য করা, ক্রমশ চার্চে আনা। এরাই আর্ত, এদের ত্রাণই আমাদের কর্তব্য।

বেশ আবহাওয়া। শীতের কুয়াশা, বৃষ্টি নেই। বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়নি। ঝরঝরে শুকনো, গরমের ধার ঘেঁষা। বোধ হয় সেই সময় যখন সুতোর কাপড় যথেষ্ট হয়। দৃশ্যটাও দেখো। রুক্ষভাব আছে, কিন্তু সেই চিত্রকর রঙে সামঞ্জস্য রাখতে পেরেছে। বেশ ভালো লেগে ওঠে না?

ঘড়ি দেখলে জেন। তা, বাপু, খিদেও পেয়েছে। সাড়ে আট পার হল। থেনডুপ একমনে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে বোধ হয়।

সে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলে, আর তখনই হঠাৎ তার এই কথাটা মনে পড়ল, তাসিলা দিয়ে হাঁটছি কিন্তু। কথাটা মনে মনে বলেই, সে ভাবলে, এটা অসংলগ্ন কথা হল না? উত্তরটা মনে আসার আগেই আবার তার মনে প্রশ্ন উঠল, কেউ কি তাকে দেখছে না?

দেখবে না কেন? বাজারে অনেকেই দেখে। আর আগের দিনই অসওয়ালের বাড়ি থেকে ফিরতে সেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যিনি নিজেকে পোস্টমাস্টার বলে নিজের পরিচয় দিয়ে উইশ করেছিলেন। আর দুচারদিনের মধ্যে কাঠের কনট্রাকটর, এঞ্জিনিয়ার এদের সঙ্গেও দেখা হবে।

সে মুখ তুলে চাইল। সে পোস্টঅফিসের সামনে দিয়ে চলেছে। সে জেনে গিয়েছে, এটা পার হয়ে চলতে থাকলে কালিঝোরার ব্রিজ। সেখানে ঝোরা থেকে পাম্প করে জল তোলা হয় আর সেখানেই হাফমেগাওয়াট-এর ক্ষুদে পাওয়ার হাউস আর সেটা পেরিয়ে চলতে থাকলে পথের ডানধারে একটি ব্রিজ, যা কোন নদী-ঝর্নার উপরে নয়, মেয়র-বাংলোর উপত্যকা থেকে শহরের প্রধান পথে সংযোগ রাখতে।

সে মনে মনে বললে, অনেক দিন হয়ে যায়। আর সে তো মনের ভিতরে বাইরে কুয়াশার, রাত্রির, ভয়ের, কত রকমের অন্ধকার। তুমি বলতে পারো না, তা স্বপ্নের মতো নয়। আর স্বপ্নের কিছু কিন্তু বাস্তব হয় না।

কিংবা তা সবই কি এক ম্যাজিক? বাকি তো সবই খুব আদিম অনুভূতি। নাকি বলবে, সমস্ত অনুভূতিই মূলে এক, স্নায়ুক্ষোভ? কিংবা তা কি একসিস্টেনশিয়ালিস্ট জগৎ, যখন পথ খুঁজে বার

করাই একমাত্র সমস্যা সেই প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যে?

আর কয়েক পা তাড়াতাড়ি হেঁটে মেয়র-বাংলোর ব্রিজ পার হল জেন। নিজেকে খানিকটা ঠাট্টা করছে, খানিকটা ভাবছেও, এরকম মনে সে ভাবলে : এরকম কি হতে পারে—যে সেই বাঘিনীর মতো সাহস নিয়ে বনের একটা অঞ্চলকে নিজের বলে দখল করে নেয়া! না, বরং অন্তত পঁচিশ বছর ক্রিশ্চান থাকা সত্ত্বেও আদিম ইভের সঙ্গে প্রয়োজনে নিজেকে এক করা যায়! হ্যাঁ, তা বটে, বজ্রগর্জনের মতো অভিশাপ, নাকি বিদ্যুতের মতো ঝলসানো রাগও, তা সত্ত্বেও ইভ হয়তো বেপরোয়ার মতো সেই বাগান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল! ক্ষমা চায় নি।

জেন হেসে ফেলল। নিজেকে বোঝালে, যারা মন, চেতনা, অবচেতন নিয়ে কাজ করে, তারা ভেবে মরুক। সে গলার দুপাশে ঝোলানো স্টেথোকে ছুঁয়ে নিয়ে ভাবলে, এখন ব্রেকফাস্টের কথা ভাবতে হয়। ডাক্তারের কারবার শরীর নিয়ে। আসলে এমনও হতে পারে, জেনেসিসের লেখক নরমপ্রকৃতি, বশংবদ মহিলাদের দেখেছেন। পুরুষ লেখকের মতো পুরুষ ভগবানও বুঝতে পারেন নি, ইভের মধ্যে নীতিকে টপকে আত্মরক্ষার একটা বেপরোয়া ভাব ভুল করে দেয়া হয়ে গিয়েছে। বাইবেলে কোথাও লেখেনি, ইভ পাদরির কাছে কনফেস করেছে, কিংবা অনুতাপে উপবাস করেছে। তা বটে, ইভ ক্রিশ্চান ছিল না। সে হেসে উঠতে গিয়ে নিজের গভীরে কোথাও ব্রীড়া অনুভব করলে।

এই দেখো! এখানে কয়েক ধাপ নেমে ফরেস্টকলোনি, তারপরে গ্রেগ অ্যাভেন্যু। বেশ খানিকটা যেতে হবে এখন। তো এতক্ষণে থেনডুপ নিশ্চয় এসে গিয়েছে, আর ব্রেকফাস্টও তৈরি হয়েছে নিশ্চয়।

২

বাংলোয় ফিরে জেন অবাক হয়ে দেখলে, সাড়ে নটা বাজে, থেনডুপ তখনও আসে নি। বুড়ো নামগিয়াল কিচেনে স্টোভ জ্বালিয়েছে, ব্রেকফাস্ট কী করা যায় ভেবে, তখন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

জেন বললে থেনডুপ আসে নি? তুমি কী করছো, ব্রেকফাস্টের যোগাড়? আচ্ছা, তুমি সরো, আমি দেখছি। স্টোভটাকে কমিয়ে বরং এক কেটল জল চাপিয়ে রাখো, আমি আসছি।

ডাক্তারি ব্যাগ আর স্টেথো আগেই সে ঘরে রেখে এসেছিল। স্লিপার, হাউসকোট, এপ্রনে, রান্না ঘরের জন্য সে তৈরি হয়ে এলে, নামগিয়াল বললে, না বলে অনুপস্থিত হয় না থেনডুপ। তার কোন বিপদই হয়েছে।

হটডগ, অমলেট, আলুভাজা আর কফির ব্রেকফাস্ট, (অত তাড়াতাড়ি আর কী হবে?) করতে বসেছে যখন তারা, থেনডুপ এল। এক রাতের তফাতে সে যেন আলাদা মানুষ। চোখ মুখ বসে গিয়েছে, চোখ দুটি অস্থির, যেন ভয়ে দিশেহারা।

জেনের আশঙ্কা হল। সীমান্তের ওপারে মাল নিয়ে যায় থেনডুপ। সেখানকার ব্যবসায় স্মাগলিং থাকতে পারে। সীমান্তে না আছে কাস্টমস না আছে পাহারা। স্মাগলারদের সঙ্গে জড়ানো কোন বিপদ নয় তো!

কিন্তু জেন প্রশ্ন করার আগেই থেনডুপ বললে, তার মেয়ে অসুস্থ, জ্বরে বেহুঁস, সেজন্য সে আসতে পারে নি।

জেন খাওয়া থামিয়ে শুনছিল। বললে, মেয়ের জ্বর হলে যে কোন পিতার কাজে আসতে দেরি হতে পারে। তুমি কিচেনে গিয়ে খেয়ে নাও তো। আজ আমাদের কাজ বাকি থাক।

থেনডুপ বললে, তাকে মুরগিদের ছেড়ে দিতে হবে। ডিম ঘরে আনতে হবে। দুধ না দোয়ালে গোরুর অসুখ করবে।

নামগিয়াল বললে, সেগুলো আমি ধীরে ধীরে করবো। তুমি বরং একটু চা খেয়ে নাও। তোমাকে দেখতে ভালো লাগছে না।

থেনড়ুপ বললে, আজ তার উপোস। কিছু খাবে না। ম্যাডাম অনুমতি করলে, মেয়ের কাছে গিয়ে বসবে।

উপোস? মেয়ের অসুখ, তাতে উপোস কেন?

ওঝা বলেছে।

নামগিয়ালও আদিবাসী। সে ব্যাপারটা জেনের আগে আন্দাজ করলে, কে ওঝা, কেন ওঝা? জেন ভ্রূকুটি করলে, হেসেও ফেলল, পিতা উপবাস করলে মেয়ের জ্বর ছাড়ে না। থেনড়ুপ বললে, তার মেয়ের গায়ে গুটি বেরিয়েছে। চৈত্য-জননীর লামা বলেছে, বাবা-মা উপোস না করলে পূজা হয় না।

জেনের বুকের নিচে কিছু নড়াচড়া করে উঠল, তারা যেন ভয়ের কুৎসিত শুককীট। সে বললে, পাঁচ মিনিট থেনডুপ, পাঁচ মিনিট। আমি তোমার মেয়েকে দেখতে যাবো, চিকিৎসা করবো। প্লিজ, কিছু মুখে দিয়ে এসো। তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে।

কয়েক মিনিটে জেন তৈরি হয়ে নিল। সে জিনসের উপরে সাদা কোট পরলে। ছোট ডাক্তারি ব্যাগটায় সম্ভাব্য প্রয়োজনের ওষুধ গুছিয়ে নিলে। থার্মোমিটার তো ব্যাগেই থাকে। মাথায় সাদা স্ট্রহ্যাট চড়িয়ে থেনডুপের হাতে ব্যাগ দিয়ে, বললে, চলো, চলো।

সে পথে একবার জিজ্ঞাসা করলে, তোমার তো একই মেয়ে। এই মেয়েই কি ঝব্বু নিয়ে ওপারে যায়?

থেনডুপ মাথা ঝাঁকিয়ে জানালে সেরকমই বটে।

কী সাংঘাতিক! বলছে গুটি। ওপারে তো, যতদূর মনে হয়, ভেরাযলা। পথে জেন নিজেকে বললে, অত ভয় পাও কেন? চিকেন হতে পারে না? এটা তো সেই ভাইরাসেরও সিজন। তার ডাক্তারি মন বললে, সব চাইতে খারাপটাকেও ভেবে নিতে হয় একবার। অবশ্য, ভ্যাকসিনেশন দেয়া থাকলে, ভেরায়লা না হয়ে, ভ্যারিওয়েভ কিছু হয়ে নিষ্কৃতি দিতে পারে। সে থেনডুপকে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে প্রতিবছর টিকা দেয়া হয় কি না। থেনডুপ জানালে, সে রকম কোন ব্যবস্থার কথা কখনও শোনেনি সে।

তখন জেনের আবার মনে হল, আশ্চর্য, এখানে নাকি আবার মেয়র আছে! এসব তো, ভ্যাকসিনেশন ইত্যাদি তো, মেয়ররাই দেখে থাকে। বাজে ব্যাপার দেখছি এখানে।

নিচু বস্তিতে পৌঁছে একটা ছোট, কাঠের পুরনো বাড়ি দেখিয়ে থেনডুপ জানালে, সেটাই তার বাড়ি। পাশাপাশি সেরকমই আরও কয়েকটা বাড়ি। কাঠের খুঁটির উপরে কাঠের পাটাতন। সামনের দিকে রাস্তার সমান উঁচু মাটিতেই বাড়ি বসানো, যার উপরে পাটাতন। পিছন দিকটা খুঁটিতে ভর করে শূন্যে ঝুলে আছে। ছাদ খুব পুরনো টিনের। সেই টিনে জল আটকাতে মাটির প্রলেপ দেয়া হয়ে থাকবে, তাতে ঘাস গজিয়েছে। সেই বাড়ির রাস্তা-সমান উঁচু বারান্দার এক প্রান্তে পুরনো টিনের কৌটায় কয়েকটা ফুল গাছ। অন্য প্রান্তে, অনেকটা জায়গা নিয়ে শালপাতা বিছিয়ে তার উপরে ফুল, চাল, ঘণ্টা, জলের পাত্র, ধর্মচক্র, আগুনের মালসা, ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে একজন মাথাকামানো লামা ভট্ ভট্ ভম্ ভম্ করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। সেই মালসার আগুনের ধোঁয়া যাতে ঘরের ভেতরে যায়, সে জন্য দরজা খোলা। সেই সব মন্ত্রতন্ত্রের যোগাড়যন্ত্র এড়িয়ে থেনড়ুপের পিছনে ঘরে ঢুকলে জেন।

সেই অন্ধকার ঘরের, যার দেয়ালের কাঠে বর্ষার জল নামার দাগ, যে দেয়ালের কাঠ কোথাও কোথাও ফাঁক হয়ে গিয়েছে, ভিতরে ঢুকে জেন আন্দাজ করলে সেই ধোঁয়াভরা ঘরের মেঝেতে চটটটের মধ্যে কেউ শুয়ে আছে।

জেন প্রথমেই বললে, জানলা থাকলে খোলো, থেনডুপ। ধোঁয়াটা বন্ধ করো। ওকে বলে এসো বিশ্রাম নিতে আপাতত।

থেনডুপ চেষ্টা করে একটা জানলা খুলতে পারলে। তখন রোগীকে সবটা দেখা গেল। আহা, ছোট্ট এক কিশোরীই বটে, জ্বরে বেহুঁস হয়ে আছে। জানালায় আসা সেই ম্লান আলোতে উদ্ভেদপঙ্কিল সে মুখ দেখেই, জেনের নিজের মুখ শুকিয়ে উঠল। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে টর্চ জ্বেলে সেই মুখ দেখে জেন বললে, মাই গড।

ডম্বরির বোধ কতটা ছিল বলা শক্ত। ধরাধরি করে সরিয়ে শোয়াতে গেলে অবোধ শিশুর মতো কঁকিয়ে উঠল।

ওষুধ তো এখনই দিতে হবে। জ্বর কিছু কমাতে হবে। ইতিমধ্যে লাংস আক্রান্ত। সেই দোষ আর বাড়তে দেয়া যায় না। একটু নরম, একটু ভালো বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু ভালো ঘরে নেয়া দরকার। আর এসবই গায়ের গুটিগুলো পেকে উঠবার আগে। জেনকে ভাবতে হল। এই রোগ আর তার রোগী সম্বন্ধে তার ধারণা সবই থিয়োরেটিক্যাল।

সে থেনডুপকে বললে, রোগীর খোলা বাতাস দরকার, ধোঁয়ার বিপরীত। জ্বরটা এখন ছাড়বে না, কিছু কমাতে হবে। এই বড়িটা এখন খাইয়ে দাও। আর পনের মিনিট পরে এই বড় ক্যাপসুলটা খাওয়াবে। আমি বিকেলে আবার আসবো। পিপাসা পাবে, জল খেতে দিও। বার্লি চা দিও। মাখনের বদলে তাতে অল্প দুধ দিও।

রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে জেনের মন হল, কোয়ার‍্যানটাইন। আর ইনটেনসিব কেয়ারের কথাও বটে। সে থেনডুপকে রোগ কী রকম ছোঁয়াচে, তা বলে, কীভাবে শুশ্রুষা করা যায় তা বুঝিয়ে, বললে, তুমি তোমার মেয়ের কাছে থাকো।

সে নিজেই ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে নিজের বাংলোয় ফিরে চলল। তার মনে হতে থাকল, রোগীর বিছানা নেই, রোগীর ঘরে সুস্থ লোকেরই দম বন্ধ হয়ে আসে, থেনডুপ আর তার স্ত্রী, যতই উপদেশ দেয়া হোক, নিজেদের আক্রান্ত না করে এরকম রোগীর সেবা আদৌ পারবে কিনা সন্দেহ। তার মনে হল, তার একজন ট্রেনড নার্স দরকার, রোগীকে আলো-বাতাস-যুক্ত ঘরে মেঝে থেকে উপরে খাটের নরম বিছানায় তোলা দরকার। কিন্তু সব চাইতে বেশি দরকার সেই সব ব্যবস্থা, যাতে এই মারাত্মক ব্যাধি, এই ছোঁয়াচে ভেরায়লা বসন্ত, তাসিলায় ছড়িয়ে না পড়ে।

বাংলোয় ফিরে ছোঁয়াচ এড়ানো ওষুধপত্রে স্নান করে নিলে সে, পোশাক বদলাল। ছাড়া পোশাক বালতিতে ডিসইনফেকট্যান্টে চোবানো রইল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে, এই কয়েকমাসের পিছনে ফেলে আসা হসপিট্যালের মজবুত নার্ভকে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবলে। একটু বিয়ার বোধ হয় দরকার। আর তেমন তেমন রোগে যশলার, মুলটিয়ার, ব্যাবিটদের মতো দারুণ শক্ত আর বেপরোয়া সহযোগী। হ্যাঁ মৃত্যুর সঙ্গেই তো যুদ্ধ। ওপারে মৃত্যু, এপারে সে, মাঝখানে এক কোমল মানুষ-শরীর। কখনও বা যেন মৃত্যুর জলে খাবি খাচ্ছে, এমন এক মানুষকে তুলে আনা।

সে কফি করে খেলে। সে স্থির করলে, এখন কয়েক মিনিট স্থির হয়ে বসে ভাবতে হবে। সে নামগিয়ালকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে ম্যাজিস্ট্রেট আছে?

না। শুনি নি।

পুলিশ আছে?

সে অনেক অনেক আগে ছিল।

কী করো তোমরা বিপদে?

নামগিয়াল ভেবে পেলে না। পরে বললে, ফরেস্ট রেঞ্জারকে বললে হবে?

কেন হবে? আচ্ছা, সব শহরে মেয়রের অফিস এসব দেখে। তোমাদের মেয়র আছে কি সত্যি? সে কি এসব দেখবে?

নামগিয়াল কিছু বলতে পারল না।

অবশেষে জেন স্থির করলে, এই পোস্টকার্ডের মাপের শহরে মেয়র যদি বা থাকে সেও হয়তো খেলনার পুতুল। তা হলেও এপিডেমিক রোগের খবর মেয়রকে জানানো তার কর্তব্য।

সে মেয়রের খোঁজে বেরোতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরল। আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার মনে হল গাউনটা ফেডেড। ওটাও একটা উপদেশ ডাক্তার বা নার্সেরা কখনও শ্যাবিলি ড্রেসড হবে না। সে গাউনটা বদলাবে স্থির করলে, আর তা প্রফুল্ল রঙের হওয়া দরকার। তার গায়ে ডিসইনফেকট্যান্টের গন্ধ। সে আবার ফিরে গেল এবং ওডিকোলন ব্যবহার করলে। এখন উল না পরলেও চলে। সে সাদায় হালকা হলুদ ও সবুজে ফুলপল্লব ছাপা গাউন একটা পছন্দ করলে। সাদা জুতো পরলে। তার পোলারয়েড চশমার যেটায় সোনার ফ্রেম সেটা পছন্দ করলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বললে, বাহ্, আমি তখন তো হসপিট্যালে রাউন্ডে যাওয়ার সময়ে যেমন। স্টেথোকে গলার দুপাশে ঝুলিয়ে নিলে।

৩

নরবু জানতো না। ময়ূর একদিন বাংলোর স্টোর রুমে রবারের হোস পাইপ, বালতি, স্টিরাপ পাম্প ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিল। আগুন নিবানোর বন্দোবস্তই। সেদিন সকালে জুলাইয়ের রোদে আর গরমে হাঁফিয়ে ওঠা আইরিস, লিলি ইত্যাদিতে নরবুকে বারবার ক্যানে করে জল দিতে দেখে, ময়ূর বললে নল, বালতি সব বাইরে আন, বাইরের ট্যাপের নিচে বালতি বসিয়ে, পাম্প চালিয়ে সারা লনে বৃষ্টি করে দে। দুমাস হয়ে গেল, বৃষ্টি হয় না।

এসব ব্যাপার এই অল্পবয়সী মানুষদুটোকে উৎসাহিত করে। চা খাওয়ার পর থেকে বাংলোর পিছনের হটহাউস থেকে শুরু করে, সামনের লনের ফুলের বেডগুলোকে তো বটেই গোটা লনকেই ভিজিয়ে দিয়েছে তারা।

নরবু খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, এর ফলে বৃষ্টি নামতেও পারে। ময়ূর তা বিশ্বাস করলে না। কিন্তু তত জল পাওয়ার ফলে মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে লেবুঘাসের সুগন্ধও উঠছিল মেয়র-বাংলোয়।

ময়ূরের মনে হল, গন্ধ, যা অন্য কোন জায়গায় চোখে দেখা যায় না, এখানে তা করুইয়ের মুখের বিড়ির হালকানীল চুলচুল ধোঁয়ার মতো চোখে পড়ছে বাষ্পের চেহারা নিয়ে। নরবু বাজারে গেল।

ময়ূর বাংলোর বারান্দায় বসে লনে পা ঝুলিয়ে লনের দিকে চেয়ে চারাগাছের মাটি ভেদ করে ওঠা, ফুল ফোটা, মাটির জল শুষে নেয়ার লোভ, জলের মাটিতে ঢুকে যাওয়া, সূর্যের চোখা আলো মাটিতে বেঁধা, এরকম সব চিন্তাকে সে ঘটনা বলে অনুভব করতে লাগল। যদিও এখানে মাটির ত্বকের নিচেই পাথর হয়তো, আর তার নিচে পোস্টমাস্টারমশায়ের সেই অবচেতন মন। নাকি লিবিডো?

গাছের প্রাণই তাকে ভাবাচ্ছিল। ফলে ঘণ্টা দেড়েক পরেও নরবু বাজার থেকে ফিরে খোঁজ

করে দেখলে, মেয়র বাংলোর পিছনের কৃত্রিম বনে একটা বাদাম গাছকে পরিচর্যা করছে, গোড়ার উইমাটি কেটে আল তৈরি করে। হোসের জলের তোড়ে শিকড় বরাবর মাটির নিচে ফুট খানেক ধুয়ে দিচ্ছে মেয়র, উইমাটি-সমেত উই আলের মধ্যে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ঝর্নার দিকে। অনভ্যস্ত কাজে যেমন হয়, তার জুতো, প্যান্ট, জামায় কাদা, জল, ঘাসের কুচি।

সে নরবুকে বললে, ভেবে দেখলাম, তোর বাগানের কাজে হাত লাগাবো। বেশ কাটে সময়। দেখ কী সুন্দর ওই বাদাম গাছ। কেন তাকে উই কুরে কুরে খাবে? উই তার প্রাণে ঢুকতে চায়। কী পাপ গাছটার?

নরবু কিছু বললে না। বালতিতে তখনও জল। সে বরং হোসটাকে উঁচু করে তাদের সেই কমলালেবুর চারা কয়েকটিকে জল খাওয়ালে বৃষ্টির মতো উপর থেকে জল নামিয়ে। ময়ূর হাত বাড়িয়ে সে জলে হাত ধুলে। আর তা করতে করতে বললে, কিন্তু একটা কথা আছে। তুই বলেছিলি, মাহিনা থেকেই প্রাণ। সময় থেকেই প্রাণ। তা হলে তো পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলেই প্রাণ। তা হলে প্রাণের আর কী দাম?

নরবু বুঝতে না পেরে বোকার মতো মাথা চুলকালে। ময়ূর বললে, যাকগে। সাহেবদের আনা কফির শিশি খুলে দুই কাপ কফি কর।

নরবু চলে গেলে ময়ূর গার্ডেনবেঞ্চে বসল। সে শুনতে পেল, কালিঝোরা পাখিদের সঙ্গে কথা বলছে। কালিঝোরাই বেশি বলছে। পাখিগুলো দুএকবার উত্তর দিচ্ছে। তাহলে দেখো, সে ভাবলে, বেশ নির্জন এখানে। সেই নির্জনতায় ঘুরতে ঘুরতে সে অনুভব করলে, সেটা নুমপাই উপত্যকাই। তো লাকপা সেখানে আলু ফলাবে। ভুট্টা ফলাবে। চাষ দেবে। জল ছড়াবে। লাকপার সেসব সুখ কোন ছায়াময় গভীর উপত্যকায় নেমে গিয়ে বুঁদ হয়ে যাওয়ার মতোই। কিংবা সে সুখ তো এক স্ফীতধারাই যা নিঃশব্দে মাটিতে চলে যেতে থাকে, যখন সেই সংযোগে মাটি আর মানুষ যেন এক।

কিন্তু সেই নির্জন মনে সে একটা নিঃশব্দ ফোঁপানিও যেন শুনতে পেলে। যে পৌরুষ প্রতিষ্ঠিত নয়, তার অপমান অনুভব করে যেন এক কৈশোর উদ্গত কান্না গিলে ফেলতে চাইছে।

সে কী? সে নুমপাই-এর চাইতে গভীরে নামতে গেল কেন? না, তত নিচে নয়।

সে তাড়াতাড়ি উঠে হাত পা ধুতে বাথরুমে গেল। কিন্তু সেখানে যেতে না যেতেই নরবুকে দরজা পেটাতে শুনতে পেলে। সে দরজা না খুলে বললে, শোবার ঘরে কফি রাখ, যাচ্ছি।

কিন্তু নরবু কফি আনে নি। সে হন্তদন্ত হয়ে বললে, বাপরে, ক্লুটলংকো ঠুলো ডাগদার আয়েকছন্।

কী বলছিস? আমার হাত কবে সেরেছে! কেন খবর দিলি?

মেমসাহেব পনি ছন।

কী বলছিস? ডাক্তার এসেছে, মেমসাহেব এসেছে? দুজন নাকি আবার। মেমসাহেব বড় ডাক্তার হয়? আর হলই বা, আসবে কেন এখানে? দেখো তো, রেঞ্জার কি ডিএফও সাহেবকে খুঁজছে।

হই না, মেয়র সঙ্গ ভেটনু পরছ, ভনেকছন।

ময়ূর ভাবলে, কী আশ্চর্য। মেয়রের সঙ্গে দেখা করবে বলেছে! কেন, মেয়র কী করবে? কী কাণ্ড, এখানে মেয়র কে? মরেছে! যা বড় ড্রইংরুমে বসতে দেগে অন্তত।

আর কফি?

কফি দিবি বলছিস? আচ্ছা দেগে, যা।

ময়ূর তাড়াতাড়ি ঘরে গেল। দেয়ালের ব্র্যাকেট আয়নায় নিজেকে দেখলে। তার জামা প্যান্ট কাদা, জল, খড়কুচি, এই রকম একজন ডাক্তার, তার উপরে মেমসাহেব, কী জানি কেমন বা তিনি, কেমন বা মেজাজ, তাঁর সামনে সভ্যভব্য হয়েই যেতে হয়। ক্লুটলং, দেখছি, আশ্চর্য জায়গা, সেখানে

এক ডাক্তার এসেছে। সে তাড়াতাড়ি তার সব চাইতে যা ভালো, সেই কালো প্যান্টটাকে পরলে। ভদ্রমতো জামা খুঁজে না পেয়ে, তার সেই রক্তলাল শার্ট, যা খুব ময়লা নয় তখনও, সেটাকে পেয়ে গায়ে গলিয়ে নিলে। আয়নায় সে ময়ূরকে দেখলে বটে, মেয়র ধারে কাছে যদি থাকে! ভাগ্যে কালই একবার মনবাহাদুর তার ইম্পিবিয়াল দাড়ি ঠিক করে দিয়েছে তখন সে সেই পেন্ডেন্ট ঝোলানো সোনার হারটাকে শার্টের উপরে দেখা যায়—এ রকম করে পরলে। যেন সেটাই শেষ পর্যন্ত মেয়রের ব্যাজ হতে পারে।

নরবু তার ঠুলো ডাংদরকে অবশ্যই বাংলোর প্রধান ড্রয়িংরুমেই বসিয়েছিল। ময়ূর সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। নরবুর কথায় যেমন আন্দাজ করেছিল সে, তার চাইতেও মর্যাদাময়ী, সুবেশ, সুন্দর, বিদেশিনী সেই মহিলা, যে আবার ডাক্তারও, প্রমাণ গলায় ঝোলানো স্টেথো।

জেন দেখলে, দরজার কাছে এক দীর্ঘদেহী মানুষ। তার সুগঠিত পেশল দেহ সত্ত্বেও, তার ফরসা মুখের সুদৃশ্য ইম্পিরিয়াল সত্ত্বেও, তার চোখও মুখের অপ্রতিভ সলজ্জতায়, সেই লাল শার্টে যে নিতান্ত তরুণ।

জেন হ্যান্ডশেক করতে হাত বাড়িয়ে উঠছিল, কিছু ভয়েব মতো এক নিরুৎসাহ তাকে স্তিমিত করলে। সে বললে, আমি মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সে চিন্তা করলে, স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেল। কিন্তু একে কেউ সেই সবুজ অন্ধকারের বিপুল দাম্ভিক ময়ূর বলে চিনতে পারে? কিংবা সেই ভোরের কুয়াশায় মাকরানা শ্বেতপাথরের—অথবা সবই এক প্রচণ্ড ধোঁকা।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটা দরজার পাশে নরবুকে বিচলিত করছিল। সে ডিএফওর সময় থেকে জানে, এই ড্রয়িংরুমে যখন রিনিমেমসাহেব বসতেন, তখন সেন্টার টেবলে ভাসে ফুল থাকতো। সে তাড়াতাড়ি করে চলে গেল। হটহাউস থেকে সপল্লব একগুচ্ছ ব্লিডিং হার্ট ও একদাঁড়া হলিহক এনে ভাসে রেখে সপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আইলে কফি লানছু কে?

কফি? হ্যাঁ, নরবু, নিশ্চয়। ময়ূর বললে, বসুন, সিট ডাউন প্লিজ। ভেরি গ্ল্যাড ইনডিড টু মিট ইউ। আমি মেয়র।

জেন যেন এক হতাশাকে কাটিয়ে উঠতে নিজের ভিতরে যুদ্ধ করলে। এক ছোট শহরে মেয়র যদি বা থাকে, যা ভাবতে গেলে কবিতার মতো, তাও সে কি এত কম বয়সের হয়? সে বললে, আপনিই মেয়র? আপনার কাছে না এসে আমার উপায় ছিল না।

ময়ূর বললে, আপনি বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেছেন। আমাদের শহরে তো কোন কনভেয়ান্স নেই। ফ্যানটা খুলে দিলে কি আপনার ভাল লাগতো, ম্যাডাম? আপনার মুখ খুব লাল দেখাচ্ছে।

না, না, তার দরকার হবে না। আপনাকে ধন্যবাদ। জেন খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে শুরু করে, পরে তার সেই উর্দুঢঙের বাংলায় কথাগুলো বলতে পেরে খানিকটা সহজ হতে পারলে। বললে, আপনার শহরে, মেয়র, স্মল পক্স হয়েছে। রোগিনী আমার এক কর্মচারীর মেয়ে। সব শহরেই পক্সের সংবাদ মেয়রকে জানানো হয়ে থাকে। খারাপ টাইপ। রোগটা সীমান্তের ওপারে নোম্যানস ল্যান্ড থেকে এসেছে, মনে করছি।

ময়ূরের ভাবহীন মুখের দিকে চেয়ে জেনের আশঙ্কা হল, যে রকম সে ভেবেছিল তাই, দু-তিন শতাব্দী পিছিয়ে থাকা এই শহরে, শহর বলা নিছক ভদ্রতা, যদি মেয়র থাকে তবে সেও দু-তিন শতাব্দী পিছিয়েই থাকবে। হয়তো ধারণাই নেই, এরকম ক্ষেত্রে কী তার কর্তব্য। যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট

নেই, পুলিশ নেই, ডাক্তার নেই, তা হলে সে কি সেই অজ্ঞাত রেঞ্জ অফিসারকে গিয়ে বলবে?

ময়ূর বললে, আপনি কাবো অসুখের কথা বলছিলেন। আপনি চিকিৎসা করছেন। সেরে যাবে। এই সহজ কথাতে যেন জেনের ভিতরের ডাক্তার জোর পেয়ে বললে, আমি বলতে এসেছিলাম, আমার সেই রোগিনীকে অন্য সব মানুষ থেকে পৃথক করা দরকার। আপনার শহরে এখনই ভ্যাকসিনেশন দেয়া দরকার। সীমান্ত পাব হযে কাবো যাওয়া আসা এখনই কঠোর করে বন্ধ করা দরকার।

ময়ূর বললে, আপনি যখন বলছেন, এসবই করা দরকার তা হলে।

নরবু তো কফির যোগাড় আগে থেকেই করছিল। সে রিনিমেমসাহেবের সময়ে যে রকম কবে কফি আনতো, তেমন করে ট্রেতে পট, ক্যান, বোল, প্লেট, কাপ, চামচ সাজিয়ে আনলে।

ময়ূর বললে, কফি নিন। আমি করবো, না আপনি?

জেন ভাবলে, এটা কি এজন্য, যে এই মেয়র, যদি সে না হয়ে থাকে, সফিস্টিকেটেড হতে চেষ্টা করছে? সে একবার বলতে গেল, এখন কফির দরকার ছিল না। কিন্তু এদিকেও দেখো, এই প্রথম সে তাসিলার এত ভিতরে ঢুকেছে। তা ছাড়া হসপিট্যালেও হাতে বেশ কঠিন কেস থাকলেও সে কি রাউন্ড থেকে ঘুরে এসে কলিগদের সঙ্গে এক মাগ বিয়ার খেতে অভ্যস্ত নয়? এমন কি দুএকটা হালকা রসিকতা কবতে? যদিও পরের মুহূর্তেই আবার কারো প্রয়োজন বোধ হলে, রোগীর ট্রিটমেন্ট নিয়ে খানিকটা গম্ভীর কনসাল্টেশানও।

জেন বললে, কফি আমি করছি, মেয়র। কিন্তু আপনাকে একটু শুনতে হবে।

সে ভাবলে, যেন হঠাৎ মনে পড়ল, সেই প্রচণ্ড ময়ূর কিন্তু আবার সেই ঝর্নার ধারে অনেক ভয়ের কথা বলছিল, যা যেন, রূপকথায় বিশ্বাস করে এমন ছেলেমানুষি মন। আর এমন ভাবে বলে, যেন তাতে বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

জেন কফি করতে করতে বললে, পৃথিবী থেকেই যখন রোগটা লোপ পাচ্ছে, তখন, মনে হয় না—যখন আর্মিস্টিস আর দুএক ঘণ্টার ব্যাপার, তখন পজিশন রাখার গোলাগুলিতে অকারণে দুদশজন সৈন্যর মৃত্যু হয়? হয়তো তেমন কিছু হতে চলেছে এখানে এই অসুখে।

জেন কফির কাপ নিলে, ময়ূরও কফির কাপ নিলে। তার হঠাৎ মনে হল, এরকম ভাষা, এরকম উচ্চারণের বাংলা...কিংবা এরকম একটা মুখ! সে নিজেকে সতর্ক করলে, এটা তো সকলেই জানে, সব বিদেশীকে একই রকম মনে হয়, খুব ভালো চেনা না হলে।

সে বললে, আপনার তুলনাটাকে বুঝতে চেষ্টা করছি।

জেন ভাবলে, একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না কি? এই ক্ষুদে শহরে কেন, কোন শহরেই কি দুজন মেয়র একই সঙ্গে থাকা সম্ভব? তার একবার এরকম জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল, কর্কশ পশম পরা, পিঠে রাইফেল, অন্ধকারের খাঁজে খাঁজে লম্বা পা রেখে রেখে চলতে পারে, এরকম একজন মেয়রও আছে নাকি এই বাংলোয়? ও, না। তা বলা যায় না। কিন্তু তার বেশ মনে আছে, অন্ধকারেও সেই মেয়রের চোখ কখনও স্তিমিত, কখনও ধারালো হচ্ছিল। অদ্ভুতভাবে হিংস্র আবার রক্ষাকারীও।

ঠিক এই সময়েই জোর করে আর একবার সোজাসুজি জেন তাকাতে গেলে, ময়ূরের শার্টের উপরে পরা জেডের পেনডেন্ট ঝোলানো সোনাব হারটা দেখতে পেলে সে। এক মিনিট সে চোখ নামাতে ভুলে গেল।

আশ্চর্য! এটা কি কোন প্রমাণ? সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে। চশমাটাকে ঠিক করে বসাতে হল মুখে। এমন কি হতে পারে, কেউ সেই কামরায় হারটাকে কুড়িয়ে পেয়ে তাদের মেয়রকে দিয়ে গিয়েছে? এমন কি হতে পারে কুয়াশায় যখন আলো ফুটছে তখনও সেই ঘুমন্ত শ্বেতপাথরের

মুখ সে লজ্জায় দেখে নি ভাল করে, যে মনে থাকবে? কিংবা মেয়র কারো কাছে কিনেছে এই তার পরিচিত ব্যবহৃত হার?

সে যেন কফি শেষ না করেই উঠে যাবে। তার মনে হল, রোগ, ডাক্তারি সম্বন্ধে যা বলার ছিল বলা হয়ে গিয়েছে। এখন বোধ হয় রেঞ্জারকে খবর দিতে হয় একবার। না হলে ভাবতে হয়, সেই মেয়র যে নিজের নাম ময়ূর বলেছিল, সে কোন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এই ডুপ্লিকেটকে সামনে রেখে তাকে পরখ করছে।

ময়ূর আবার ভাবলে, সব চীনাম্যানদেরই একরকম দেখায়। বাংলা বলতে চেষ্টা করলে সব মেমের গলা এক রকমই শোনাবে।

জেন বললে, ধন্যবাদ। আচ্ছা, বাই দি ওয়ে, আপনি কি ক্রিশ্চান? না, না আমি দুঃখিত। এরকম প্রশ্ন নান অব মাই বিজনেস।

জেনের কথায় নিজের ভাবনা থেকে সরে এসে ময়ূর নিজের চারদিকে ক্রিশ্চান কী আছে খুঁজলে যেন। কিন্তু মুহূর্তটা পার হতে না হতে সে অনুমান করলে, হারের লকেটে ক্রসসমেত যিশু, তা থেকেই এই ডাক্তার এরকম মনে করেছে। তার ইম্পিরিয়াল সত্ত্বেও তার মুখটা আরও সাদা হয়ে গেল। সে মনে মনে বললে, দেখো, আমি এটার দাম বুঝি নি, কিন্তু এই মহিলা একবার দেখেই বুঝতে পেরেছে। হয়তো এ হার যে কোন মেয়রের পক্ষেই মহার্ঘ্য। সে বললে, আপনি কি হারটার কথা বলছেন?

একটা সাহস দেখা দিল জেনের মনে। তার ত্রিশ থেকে তো সে দেখতেই পাচ্ছে এই মেয়র, যদি তা সে হয়ে থাকে, হদ্দ কুড়ি-বাইশে।

বলছিলাম, আপনার হারটা খুব সুন্দর। মেয়রকে মানায়।

মানায়? তা মানাক। এটা কিন্তু আমার নয়। মানে গচ্ছিত আছে। আপনি বাংলা যেমন বলেন, হয়তো ভালোই বোঝেন। গচ্ছিত মানে...আসলে সে এক রেল কামরায়... কখনও মনে করি হিপি, কখনও মনে করি ডোপ স্মাগলার, এই সব সোনাটোনায় আমাকে বোকা করে অনেক দামি জিনিস নিয়ে পালিয়েছে সে।

পালিয়েছিল? জেন এই সহজ কথাটা বললে বটে, কিন্তু তার বুকের ভিতরে নিজের বুকটাই অস্থিরপনা করছে। কিছু করার না পেয়ে সে পট ধরে আবার একটু কফি করে নিলে। হাসতে চেষ্টা করে বললে, আপনি কি জানেন, মেয়র, এখানে, এদিকে, ময়ূর বলে কেউ আছে কিনা, অন্তত নিজেকে ময়ূর বলে পরিচয় দেয়? তার গাল দুটো বেশ লাল হল।

ময়ূর? ও হ্যাঁ। নিশ্চয় ময়ূর। কিন্তু তার কথা আপনি জানবেন কেন? ময়ূর উঠে দাঁড়াল। মনে মনে বললে, হিপি নয়? ডাক্তার? বললে, ডু ইউ মিন মি, ম্যাডাম?

হোয়াট ডুউ মিন ময়ূর? জেনের সাদা মুখ লজ্জায় এবার এমন লাল হল, যেন সে আর ডাক্তার নয়।

ময়ূর নিজের গলা থেকে হারটা খুলে আনলে, দুহাতের অঞ্জলিতে নিয়ে জেনের সামনে ধরে বললে, আপনার এটা। আই মিন আপনি সেই—

জেন বললে, তুমি তো বলছো, ওটা তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছি, তোমাকে দিয়ে পালিয়েছি।

আরও আছে, জানেন? জিনের একটা ট্রাউজার্স যা, এ রামো, আমি দুএকবার লোভ করে পরেছি। ঝুলে ইঞ্চি চারপাঁচ ছোট হয়। কোমরে সব উপরের বোতাম লাগে না, বেল্ট কষে পরেছিলাম। তা ছাড়া একটা খুব হাল্কা কম্বলও, যা আমি ব্যবহার করি নি। আচ্ছা, ম্যাডাম, আমি এসবই আপনার বাংলোয় দিয়ে আসবো। জানেন, আমি, আমি বলছিলাম, সেই রাতে, মানে সেই রাতই আমার কাটতো না, আপনি দয়া না করলে। তখন আপনি না থাকলে, সেখানে কোথায় আশ্রয় পেতাম?

কী আমাকে গোপন রাখতো? বুকের ভিতরে হার্ট না কী এক বন্ধ হয়ে যেতো। কী ভয়, যে ভূত দেখছিলাম। সেই গভীর আশ্রয়ে আর ভয় ছিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

১

সেটা এক যোগাযোগ যা আমাদের এই ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনা করেছিল। ব্যাপারটা এক নিতান্ত দরিদ্র তের-চৌদ্দ বছরের এক আদিবাসীর মেয়ের বসন্তরোগ ও তাতে তার মৃত্যু। সাতদিন ধরে একটি তুচ্ছ প্রাণের যুদ্ধ ও তার পরাজয়ই, কিন্তু তার ফলে তাসিলা ও ক্লুটলং নামে দুটি অঞ্চল এক হয়ে গেল। আর তার গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পেল যে শুধু ডিএফও নয়, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সিএমওএইচ, সুপারইনটেনডেন্ট ল্যান্ড কাস্টমস, তাদের বাহিনী, একের পর এক এবং এক সঙ্গে আসতে লাগল তাসিলায়। কিন্তু ব্যাপারটা যে তুচ্ছই ছিল, তার প্রমাণও এই, কোন কোন ধুরন্ধর ব্যক্তি পরে বলেছিল, একটাই তো মৃত্যু, আসলে তত ভয়ের ছিল না ব্যাপারটা। বড় বড় সাহেবদের কিছু হৈ চৈ হল এবং ট্যুর হল।

কিন্তু ব্যাপারটা সামান্য ছিল না। কলকাতা থেকে বেশ কিছু জার্নালিস্ট পত্রকার এসেছিল তাসিলায়। মানবজাতি যখন রোগটাকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করেছে ভাবছে, ঠিক তখনই রোগের প্রাদুর্ভাব তাসিলা ও ভারতবর্ষকে একটা সংবাদ করে তুললে। ইংরেজি, বাংলা কাগজে, তাসিলার নানা দিক নিয়ে আলোচনা হতে থাকল। তাসিলা, তার ইতিহাস, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তা যে এক সময়ে কলোনিয়াল উৎপীড়নের ঘাঁটি ছিল, দ্বিতীয় সেলুলার জেলই, এসব লিখবার পর আদিবাসীদের দারিদ্র্য, তাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আর্মি ও পোস্টঅফিস ছাড়া কিছু থাকা উচিত নয়, ৩৫৬ ধারা অবিলম্বে রদ করা উচিত, প্রকৃতপক্ষে স্টেটগুলো কেন্দ্রের কলোনি হয়ে উঠেছে–ইত্যাদি বিষয়েও নানা পত্রিকায় বিশিষ্ট সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, মানবতাবাদী অন্তত একমাস ধরে ফিচার প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিল। কোন কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় দগ্ধকুসুম, এরকম নামে ছোটগল্পটল্পও লেখা হল।

এ বিষয়ে তাসিলাকেও একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। এখানকার পোস্টমাস্টার মুরলীধর, যে আগেও তাসিলা নিয়ে কলকাতার কোনো কোনো পত্রিকায় লিখেছে, কলকাতা থেকে আগত জার্নালিস্ট ও পত্রকারদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে, মালাধর বসু এই ছদ্মনামে, তাসিলার আদিসমাজ সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে ফেললে। পথে ঘাটে বাজারে যাদের দেখা যায়, তারা ছাড়াও মানুষ বাস করে তাসিলায়। পাহাড়ের উপরে যে ছোট ছোট জঙ্গল তার আড়ালেও ছোট ছোট চাষের জমি নিয়ে এক একটা ছোট বাড়ি আছে যা সব সময়ে চোখ পড়ে না।

এ ব্যাপারে অলৌকিকতাও যোগ হয়েছিল। পত্রিকাতে সংগ্রহ করা ডম্বরি নামে সেই রোগিনীর পিতা থেনডুপের বিবৃতিই তার প্রমাণ। আপনার কন্যার যখন প্রথম অসুখ হল তখন আপনার কীরকম লেগেছিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হলে তখন আপনি অথবা আপনার স্ত্রী কে বেশি কাতর হয়েছিলেন, এই যে আমরা কলকাতা থেকে এসে আপনাদের ফটো তুলছি ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে, এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলতেন। এ সবরকম প্রশ্নের উত্তরে সেই থেনডুপ তার পাহাড়ি ভাষায় অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলেছে : সবই তার পাপ। সে লোভে পড়ে তার মেয়েকে সীমান্তের ওপারে পাঠাতো মাল বইবার

বাবুদের সঙ্গে। সেখান থেকেই সেই রোগ এল। আমরা কি জানতাম ওটা সীমান্ত? সেই পাপেই আমি আমাব একমাত্র সন্তান হারালাম।

সকলেই ব্যাপারটাকে অলৌকিক হিসাবে দেখেনি। এ বিষয়ে প্রথমেই পোস্টমাস্টার মুরলীধরের নাম করা যায়। পোস্টমাস্টার তার স্ত্রীকে বলেছিল একদিন, এটাকে কি সত্যই পাপ বলা যায়? তার স্ত্রী বলেছিল, টাকা পয়সা নিয়ে গোলমালকে আমরা অপরাধ বলি। ওরা, বোধহয়, পাপ আর অপরাধের পার্থক্য বোঝে না, লেখাপড়া জানে না।

কিন্তু ভয়টা যে মিথ্যা ছিল না, তারও প্রমাণ আছে। মেয়রের মুখে শোনার পরেই রেঞ্জার ডিএফওকে টেলিফোনে ধরেছিল, টেলিগ্রাম করেছিল। সংবাদ পাওয়ামাত্র ফরেস্ট অফিসের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ধ্বজবীর পরিবারকে রেখে আসার নাম করে ছুটি নিয়ে পালিয়েছিল। মিত্রবাহাদুর সেই সংবাদ পেয়ে রেঞ্জারকে গিয়ে ছুটির কথা বলতেই, রেঞ্জার বললে, আপনার এখানেই বাড়ি, কোথায় আর যাবেন? কাল সকালে ডিএফও আসবেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে ছুটিতে যান। মিত্রবাহাদুর হেডক্লার্ক, সে তো ইউনিয়ান–প্রেসিডেন্টও, সে বললে চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকলে কী হয়, এবার কি আপনারা বুঝতে পারছেন? এসবই আপনাদের ক্রিমিন্যাল নেগলেক্ট। এর পরেও তাসিলায় হেডকোয়ার্টার রাখতে চান? এবার লাগাতার লাগিয়ে আপনাদের বুঝিয়ে দেয়া হবে।

এটাই প্রমাণ, ডিএফও এসেছিল তাসিলা, আর সেটাই প্রমাণ, ব্যাপারটা গুরুত্ব পাচ্ছিল ডম্বরির অসুখের দ্বিতীয় দিন থেকেই। ডিএফও তাসিলায় পৌঁছে সরাসরি ব্লুটলং-এর সেই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল এবং তার সঙ্গে সে অবস্থায় কী কী করণীয় তা নিয়ে আলাপ করেছিল। তাদের আলোচনায় সেই পুরনো তুলনাটা উঠেছিল : আর্মিস্টিস ঘোষণা করা সত্ত্বেও পজিশন রাখতে যেমন দুদশজন সৈনিক প্রাণ দিয়ে থাকে। ডিএফও সেখান থেকে পোস্টঅফিসে ফিরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার চীফ মেডিক্যাল অফিসারকে, কনজারভেটর অফ ফরেস্টকে টেলিগ্রাম করলে। ফলে দুদিনের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে গেল, সিএমওএইচও তার সঙ্গে। দেখার মতো জানার মতো ব্যাপারও বটে। যে রোগ পৃথিবীতে আর নেই তার লাস্ট স্পেসিমেন এখানে।

প্রভঞ্জনের সঙ্গে আলাপে ডিএফও বললে, শুধু তাসিলার জন্য নয়। আমাদের বনে যে সব ছোট ক্যাজুআল লেবার কলোনি আছে, সে সব সম্বন্ধেও ভাবতে হবে। সে সব জায়গার অধিবাসীরাও যে মাঝে মাঝে ওপারে যায় না, তা তুমি বলতে পারো না। ভ্যাকসিনেশনই একমাত্র উপায় মৃত্যুকে কম সংখ্যক করার। প্রভঞ্জন রোগের বীজ ওপারে, এরকম বললে, ডিএফও বলেছিল : এসব ট্রেডরুট শত বছরের পুরনো হতে পারে। ঝর্নাকে বাঁধ দিলে অন্য কোথাও দিয়ে সিপেজ হবে। কী যায় সীমান্ত পেরিয়ে খোঁজ করে দেখো, চাল, ডাল, লবন, হয়তো দুএক বস্তা সিমেন্ট, হয়তো এক বাঁধ টিন। তার বদলে হয়তো কিছু ড্রাগ আসতে পারে, কাস্টমস না দেয়া কিছু ফরেন ব্র্যান্ড বিয়ার বা মদ, ওপারে একসাইজ কাস্টমস কম হওয়ায় আমাদেরই সিগারেট, মদ, ঘড়ি সস্তায় আমাদের দেশে ফেরে। মনে করো, আবহমানকাল থেকে সীমান্ত টপকে আফিং চলাচল করতো। ভেবে দেখো, আফিংএ যত লোক মরে, পেট্রোল ও পেট্রোলজাত যা কিছু তাতে দুএক শতাব্দীতে তার তুলনায় কত বেশি লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ওটাকে বিষ বলি, এটাকে পরিবেশ দূষণ বলি।

সুতরাং যেহেতু এরকম রোগ, সিএমওএইচ জানুক ভ্যাকসিনেশনের প্রয়োজনের কথা। যে হেতু জেলার মধ্যে হচ্ছে, ডিএম জানুক। ডিএম প্রয়োজন বোধ করলে ল্যান্ড কাস্টমসে সংবাদ দেবে।

যাক সে কথা। ডম্বরির অসুখের তৃতীয় দিনে দেখা গেল, যেন সাধারণ মানুষের উপর আতঙ্ক চাপ ফেলেছে। বাজার বসছে না। বনের আদিবাসীরা তাসিলায় আসতে ভয় পাচ্ছে। রোগের ভয় তো ছিলই, তখন আবার ভ্যাকসিনেশনের ভয় হয়েছে। এ সংবাদে বোঝা যায় সিএমওএইচ

এসেছিল। কিছু লিম্প ও দুএকজন ভ্যাকসিনেটর পাঠিয়েছে। কিন্তু তাদের পক্ষে তো তাসিলা ফরেস্ট ডিভিশনের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে টিকা দিয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। কনজারভেটব কিছু বনবাসীকে ভ্যাকসিনেটর নিযুক্ত করবেন, সি এমওএইচ যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি যত পরিমাণে সম্ভব লিম্পা পাঠাবেন। কেননা এই বনের বাইরে রোগ ছড়ালে সারা দেশে তা ছড়াবে।

কিন্তু অন্যান্য রকম প্রতিক্রিয়াও হচ্ছিল যে, তা উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতি অকরুণ হয়ে উঠছিল, তা যেন কেউ লক্ষ্য করে নি। বাজারে শাকসবজি নিয়ে গ্রামের লোকেরা আসছে না। সে সম্বন্ধে এরকম বলা হচ্ছিল কিছুদিন থেকেই, বর্ষা না নামলে এরকমই থাকবে বাজার। অন্যান্য বারে যা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে বলে মনে হতো, এবারই তা ভয়ের লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে। ভয়ও অবশ্য ছিল। তাসিলা ফরেস্ট অফিস থেকে আরও কিছু কর্মচারী ছুটি নিয়ে সরেছে। তারা যে ফুটবল নিয়ে মাঠে নামতো, তা নামছে না। যেদিকে চাও সেদিকেই যেন হলুদ আর হালকা বাদামি, আর ধুলোর রং। বাতাসেও ধুলো উড়ছে। যারা প্রকৃতির এসব পরিবর্তন লক্ষ্য করে, তারাও বলেছে, এবার দেখো বৃষ্টি নামতেও দেরি হচ্ছে, জুলাই-এর মাঝামাঝি হয়।

ইতিমধ্যে পোস্টমাস্টার মুরলীধর একদিন রেঞ্জার প্রভঞ্জন দত্তকে বললে। তখন বিকেল হচ্ছে। রেঞ্জারের অফিস বসে নামমাত্র। তার স্কুলের সে বন্ধ ঘোষণা করেছে গরমের। ডিএফও ও ম্যাজিস্ট্রেট পরিদর্শন করে ফিরে গিয়েছেন। ক্লটলং পার হয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডে খানিকটা ঢুকে বাঁশ, কাঠ, কাঁটাতারের একটা বেড়াও দেয়া হয়েছে।

রেঞ্জার পোস্টমাস্টারের কোয়ার্টারে ছবি আঁকছে তখন। তার কাছের একটা শার্সির ওপারে খানিকটা রুক্ষ্ম প্রকৃতি চোখে পড়ছে। তার মধ্যে একটা পত্রবিরল গাছ। কিন্তু গাছটায় কয়েকটি লাল রঙের ফুল। আর যা আকর্ষণীয় রং, তা রেঞ্জারের ক্যানভাসে। সুচেতনা এই মাত্র চা করে আনি, বলে উঠে গিয়েছে, যদিও আচমকা মনে হতে পারে, তা যায় নি। কারণ তার লাইফ সাইজ পোরট্রেট যেন ইতিমধ্যে রক্তের উত্তাপে জীবন্ত। রেঞ্জারের এটাকে এক রকম পলায়নও বলতে হয়। সে ইজেলের গোড়ায় মোড়ায় বসে তুলিগুলোকে তারপিনে ধুয়ে দিচ্ছে। পোস্টমাস্টার বললে, একটাইতো সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি, ক্লটলং-বাসিনী সেই সন্ন্যাসিনী...

আপনার সেই ক্লাসমেট তো?

আমার ক্লাসমেট? মুরলীধর হাসল। সেই ঠাট্টা, নামটা আমার পূর্বপরিচিত বলে? তো, মশায় জেন এয়ার নাম কার না পরিচিত? কুমু নামটাও দেখবেন সে রকম মনে হয় অনেকের।

বলুন।

বলছিলাম, সে কেমন অনায়াসে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসে গেল। আমরা একটা প্রশ্ন করলুম না। এটাই তো একমাত্র সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি, এঞ্জেলের মতো নিষ্পাপ এক দুধওয়ালির অসুখের। তাসিলার মানুষেরা একজন ভাল বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তার পেলে। আজ সকালেই আপনার মিত্রবাহাদুর এসেছিল টেলিগ্রাম করতে। ডিএফও নাকি সেই ডাক্তারকে অনুরোধ করেছেন, ফরেস্টের কেউ অসুস্থ হলে তিনি যেন তাদের চিকিৎসা করেন। মিত্রবাহাদুর বলছিল, এটা ভালোই হল। এখন নাকি তার ইউনিয়ান থেকে লিখবে, এই ডাক্তারকেই কর্মচারীদের চিকিৎসা খরচ পাওয়ার বাবদে অথোরাইজড মেডিক্যাল অ্যাটেন্ড্যান্ট মানা হবে।

সেই টেলিগ্রাম করতে এসেছিল নাকি? কাউকে আসতে বলেছে?

জানলেন কি করে? দুজনকে তিন দিনের মধ্যে আসতে বলেছে। তারা নাকি তার ভাইপো। চাকরির জন্যই আসতে লিখেছে। কী চাকরি, মশায়?

প্রভঞ্জন হাসল। বললে, ভ্যাকসিনেটর। এমার্জেন্সি বেসিসে তাসিলাতে আর বনের মধ্যে ফরেস্টের লেবার কলোনিগুলোকে টিকা দিতে কিছু লোক নিযুক্ত করতে বনমন্ত্রী রাজি হয়েছেন।

কিছু লিম্পও পাঠাচ্ছেন। সিএমওএইচও কিছু লিম্পও পাঠাবে। কিন্তু এই বনে আসার মতো লোক নেই। এ বিষয়ে মিত্রবাহাদুর জিতে গেল। ধ্বজবীর ছুটিতে চলে গিয়ে নিজের কোন আত্মীয়র জন্য চাকরিটা ধরতে পারলে না।

সে কি মশায়, কাজটা কি যে কেউ পারে?

পারবে না কেন? আপনার মনে নেই? স্পিরিট তুলোয় হাতটা ঘষে নিয়ে লিম্পের টিউবের দু ফোঁটা রস দিয়ে স্ক্রুটাকে একবার করে ঘুরিয়ে দাও। প্রভঞ্জন হাসল। আসল কাজ হবে, যাকে টিকা দিতে হবে, তাকে দৌড়ে দৌড়ে ধরা, তা সে বনেই হোক কিংবা এই তাসিলাতে। সিএমওএইচের ভ্যাকসিনেটর কাল থেকে চেষ্টা করে মাত্র পাঁচ জনকে রাজি করিয়েছে। আপনাদের ভ্যাকসিনেটররা প্রতি একজনের টিকায় পঞ্চাশ টাকা পাবে। যদি তাতে কাজ হয়!

এসবই হালকা ব্যঙ্গের হতে পারে। কিন্তু গম্ভীর ব্যাপারও ছিল। পোস্টমাস্টার বললে, বোধ হয় আপনার, আমাদেরও টিকা দিয়ে নেয়া ভালো। অন্তত সুচেতনার সেই দুই হরিণ, ইন্দ্র আর পুষ্পের। পোস্টমাস্টার উঠে আলো জ্বাললে। সুচেতনাও চা আনলে।

২

অনুমান করি, যা নিয়ে এত হইরই সেই ডম্বরির অসুখের কথা বলা ভালো হবে।

দশ মিনিট অবাক হয়ে বসে থাকার পর জেন আরও পাঁচ মিনিট ধরে তার সমস্যার কথা মেয়রকে বলেছিল। আর তারপরে মেয়রের সত্যভাষণ শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তাসিলায় ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, অ্যাম্বুলেন্স নেই, থাকলেও তা চলতে পারতো এমন পথ নেই, টিকাদার নেই, সেই একমাত্র মেয়র বটে, তা হলেও এসব ব্যাপারে তার কিছু করার আছে, এই সে প্রথম শুনছে। শুনে ডাক্তার বলেই জেন হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, তা, আমার একমাত্র মেয়র, অন্তত স্ট্রেচারে করে আমার বাংলোর আউটহাউসে রোগিনীকে পৌঁছে দাও। অন্তত সেগ্রিগেট করি, অন্তত নিচু বস্তি, ভোট বস্তিতে রোগ না ছড়ায়। বেচারা মেয়েটি, দুধ বিক্রি করতো আর মাঝে মাঝে ঝব্বুর পিঠে মাল নিয়ে সীমান্তের ওপারে যেতো। শুনে ময়ূর বলেছিল, তার নাম কি ডম্বরি?

তুমি জানলে কি করে?

তখন মেয়রের মুখে কষ্টের ছাপ পড়ল।

জেন চলে গেলে ময়ূর স্থির করলে, এখানে কিছু করতে হলে রেঞ্জারকে তখনই জানানো দরকার। সে তখনই রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করলে। সে যখন অফিসে রেঞ্জারকে বলছে, তখন অফিসের অনেকেই তা শুনলে। তাদের কেউ কেউ বললে, ওসব অসুখের মরসুমই এটা। হয় সেরে যায়। যত ভয় লাগবে, ততই ভয়।

কিন্তু রেঞ্জার যখন শুনল, সীমান্তের ওপারে এই রোগে মানুষ মরেছে, রোগটার ছোঁয়াচ ডম্বরি ওপার থেকেই এনে থাকবে ; এসব যে বলেছে সে একজন ডাক্তার, তখন রেঞ্জারকেও ব্যস্ত হতে হল। সে জানতো, পৃথিবীতে এই রোগ নির্মূল করা হয়েছে বলে কথা আছে। উপরন্তু কি এই তাসিলায়, কি বনের ভিতরে লেবার কলোনিগুলোকে যারা বাস করে, তারা স্বভাবতই রোগের ছোঁয়াচ থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে অজ্ঞ আর নিরুপায়। সে তখনই ডিএফওকে টেলিফোন করে উপদেশ চাইল। যতদূর সে জেনেছে, তার কিছুই গোপন করলে না। তখন ডিএফও জানালে, পরের দিনেই দুপুরে সে তাসিলায় আসবে।

তখন মেয়র বললে, ডাক্তার স্ট্রেচারে করে রোগীকে তাঁর আউটহাউসে নেয়ার কথা বলেছেন।

সে আর বেশি কথা কী? স্টোরে একটা স্ট্রেচাব খাড়া করা আছে। কয়েকজন গেলেই হল।

মিত্রবাহাদুর এতক্ষণ উদাস মুখে সব শুনছিল, এবার বললে, আমার তো মনে হয় না, আমাদের ইউনিয়ানের কেউ এসব ছোঁয়াঘাঁটা করতে যাবে। তাদেব জীবনের রিস্ক আছে। সে রিস্ক কে কভার করবে? আমাদের অ্যাকসিডেন্ট গ্রুপ ইনসিওরেন্সে স্মলপক্স বলা নেই।

তখন পাশে দাঁড়ানো নরবুর দিকে ইঙ্গিত করে ময়ূর বললে, আমি আর নরবু স্ট্রেচার পেলে পারি।

শুনে নরবু বললে, থেনডুপ ওরা আর আমরা এক জাতি না আছি। ওরা ভোট।

ময়ূর বললে, অসুখের আবার জাত কী? বলতে পারিস এটা ম্যালেরিয়া না, কলেরা না। বলতে পারিস, এটা পান বসন্ত নয়, অন্য জাতির বসন্ত।

নরবু কথাটাকে সমঝে নিলে। বললে, তার বাবা, মা, ভাই, বোন কেউ নেই। তাদের বংশ আছে, বোধহয় তাতে কেউ নেই সে ছাড়া। এত একা, এসব ব্যাপারে তার খুব ভয় করছে। ময়ূর বললে, স্ট্রেচার নিয়ে আমি যাচ্ছি, সার। দেখি বুড়ো থেনডুপকে নিয়ে কিছু করতে পারি কি না।

ময়ূর স্ট্রেচার নিয়ে যখন একলাই রওনা হচ্ছে, নরবু তাকে দেখলে, মাথা চুলকালে, ভাবলে, বললে তখনই, আকেলা জানে কি?

অগত্যা।

হোস। মো পনি যানছু।

নরবুকে স্ট্রেচার ধরতে পেয়েও ময়ূরের সুবিধা হল না। নরবু উচ্চতায় ফুটখানেক কম।

তার হাতে তখনও প্লাস্টার। পাহাড়ের অসমান পথে স্ট্রেচার সমান রাখতে অসুবিধা হচ্ছিল। ক্লুটলংএ উঠতে, আবার সেখান থেকে আউটহাউসে উঠতে সিঁড়ির পথ। সেখানে অসমান উচ্চতার স্ট্রেচার তোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং সিঁড়ির গোড়ায় স্ট্রেচার নামিয়ে ময়ূর নরবুকে দিয়ে খবর পাঠালে, রোগিনী এসে গিয়েছে, বিছানা ঠিক রাখা হোক। নরবু চলে গেলে, অজ্ঞান ডম্বরির বন্ধ চোখ, গুটিতে আচ্ছন্ন বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে, ময়ূরের চোখ জলে ভরে উঠছিল। সে ভাবলে, কি করেই বা একে উপরে নেয়া যায়? হাত দিয়ে ছুঁতে গেলে ব্যথা লাগবে না? কিন্তু তা লাগলেই বা কী করছে? বাংলোর বারান্দায় জেনকে দেখতে পেয়ে সে সাহস পেলে যেন। নিচু হয়ে অনায়াসে সেই হালকা শরীরটাকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে ময়ূর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলে।

তখন রোগীকে শয্যায় নেয়া, তাকে পরীক্ষা করা, প্রয়োজনে ওষুধ দেয়া এগুলোই প্রথম দরকার। সে সব হলে, কয়েক মিনিট তাকে ওয়াচ করে, হঠাৎ জেনের খেয়াল হল। ততক্ষণে রোগিনীর কাছে থেনডুপ আর তার স্ত্রীও এসেছে। জেন ইতিমধ্যে থেনডুপের এক পড়শিকে নিযুক্ত করেছিল। আউটহাউসের পাশেই থেনডুপ আর তার স্ত্রীকে ডিসইনফেক্ট করার উদ্দেশে, সে গরম জল, সাবান, লাইজল, প্রভৃতি নিয়ে প্রস্তুত নিল। জেন থেনডুপ আর তার স্ত্রীকে সেই জল ও সাবানে স্নান করে নিতে বললে। সে ইতিমধ্যে থেনডুপ আর তার স্ত্রীর জন্য বাজার থেকে জোব্বা পায়জামা ইত্যাদি আনিয়ে রেখেছিল। স্নান করে তারা সে সব পরবে। আগে যেগুলো পরা ছিল, সেগুলোকে গরম জলে ফোটানো হবে। সে নরবুকেও সাবান জলে হাত পা ধুয়ে নিতে বললে।

এই সময়েই যেন তার চোখে পড়ল মেয়র রোগশয্যার পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবছে। তার চোখ দুটো মেঘলা। থেনডুপও তখন রোগশয্যার পাশে এসেছে।

জেন বললে, তুমি, জন, মেয়রকে আমার বাথে নিয়ে যাও। আলো দাও, সাবান, ডিসইনফেকট্যান্ট ইত্যাদি দেখিয়ে দাও। এমন বোকামি ভাবা যায় না, মেয়র, করেছো কী? এমন সাংঘাতিক রোগকে তেমন বুকে জড়িয়ে ছুঁতে হয়?

ময়ূর নামগিয়ালের সঙ্গে বাংলোর ভিতরে গেলে জেন ভাবলে, সত্যি বোকামি, সত্যি বোকামি,

এক্ষেত্রে এরকম স্নেহের ভঙ্গি, আর একটা কেস হল কিনা কে জানে?

বাংলোর ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে সে ভাবলে, এই দেখো, স্নানের পরে মেয়র কি এই পোশাকেই থাকবে? যা পরে সে রকম করে রোগিনীকে তুলেছিল? সে বাথটাওয়েল দিতে পারে। বলেছিল বটে, আমার ট্রাউজার্স কোন রকমে পরেছিল। কিন্তু...

সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে নরবুকে পেয়ে বললে, নরবু, মেয়রসাহেবের জামা, প্যান্ট, মোজা জুতো আনতে পারবে বাংলো থেকে? মেয়র সাহেবের স্নান শেষ করে বেরোতে পনের মিনিট লাগবে।

নরবু আধঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়ে দৌড়াল।

বাথে ঢুকে সাবান হাতে নিয়ে ময়ূরের মনে হল, তার যেন বমি আসছে, যেন সে কাঁদবে, তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল : তার একটা ছোট বোন ছিল, যে একটু বড় হতেই বলতো, যে যাই বলুক দাদা, তুই আমার হিরো। তোর ওই চওড়া পিঠের আড়ালে আমার ভয় থাকে না।

৩

সেটা সম্ভবত ডম্বরির অসুখের তৃতীয় দিন হবে। দ্বিতীয় দিনেই ডিএফও আসতে পারেনি। ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিল, আপনার সঙ্গেই তাসিলা যাবো, সেখানে তো আপনারই গেস্ট। সকালে জাকিগঞ্জ পৌঁছে, ব্রেকফাস্ট করে তাসিলায় গেলে কেমন হয়? সুতরাং ডিএফও বুদ্ধি করে জাকিগঞ্জ থেকে দুজন ভ্যাকসিনেটর পাঠিয়ে দিয়েছে। ডিএমএর সঙ্গে দুজন কনস্টেবল আসবে। বোঝাই যাচ্ছে পুলিশের ভয় না দেখালে, টিকা দেয়া যাবে না। আশা করা হচ্ছে, ডিএফও ও ডিএম লাঞ্চের আগেই এসে পড়বেন।

ভ্যাকসিনেটররা পৌঁছালেই প্রভঞ্জন তাদের বলে দিয়েছে, আপনারা অফিসে যান, অফিস এখনই খুলবে, সেখানে গিয়ে টিকা দিতে শুরু করুন। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে পাড়া ধরে কাজ শুরু হবে।

প্রভঞ্জন ভেবেছিল, টিকাদারদের এটা নতুন জায়গা, কাজ শুরু করার আগে এক কাপ করে চা খেতে দেবে তাদের। কিন্তু রোজার খোঁজে ভিতরে গিয়ে নরবুকে বরং রান্নাঘরে দেখে সে অবাক হল। সকালের চায়ের সময়ে রোজা ছিল, নরবু এসে কেন রান্নাঘরে ঢুকেছে? তার তো বরং মেয়র-বাংলো সাফসুতরো করা দরকার এখন।

তুই এখানে কেন? রোজা কোথায়? প্রভঞ্জন এরকম প্রশ্ন করলে, কিছু জানে না এরকম ভঙ্গিতে দুই হাত উল্টে নরবু বললে, খই! অর্থাৎ সে কি করে জানবে রোজা কোথায়?

তা হলে তুই এখানে ঢুকেছিস কেন?

তখন নরবু গলা নিচু করে বললে, রোজামেম বলতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু সে জানে রোজা-মেম ক্লুটলংএ। আমি যে আপনাকে বললাম, তা বলবেন না তাঁকে, সার।

তখন তা হলে তুই কয়েক কাপ চা বানা, আর তারপর মেয়রকে ডেকে আন—এই বলে সে ভাবলে, রোজার কৌতুকটা পরে ভাবা যাবে। এখন ববিজান আর গেন্দা সিংকে খবর দেয়া দরকার। এত অল্প সময়ে ডিএফও আর ডিএমএর লাঞ্চ ইত্যাদির উপকরণ আগে যোগাড় করা অতি প্রয়োজন।

নরবু চা আনলে, ভ্যাকসিনেটর দুজন চা খেয়ে অফিসের দিকে গেলে, নরবু মেয়রকে ডেকে আনতে গেল। মেয়র ববিজান আর গেন্দা সিংয়ের বাড়ির থেকে না ফিরলে, তার কিছু করার নেই। সে কি রোজাকে খবর দিতে ক্লুটলংএ যাবে? রোজা না হলে লাঞ্চের রান্নাই বা কে করে?

প্রায় বারোটায় রোজা এল। প্রভঞ্জন শুনে অবাক। রোজা সকালে তাকে চা দিয়েই, ব্রেকফাস্ট নরবুকে করে দিতে বলে, ক্লুটলংএ রোগীর কাছে গিয়েছিল। আর তার আগে (এইখানে রোজা হেসেছিল) কাল রাত দশটা থেকে ভোর পর্যন্ত সেখানেই ছিল সে, রেঞ্জার সাহেব নিশ্চয়ই তা জানতে পারে নি।

রোজা বললে, আপনাকে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে দেয়নি? সে হাই তুলল। বললে, আমি স্নান করে এখুনি দিচ্ছি।

না, তুমি স্নানটান করে ঘুমিয়েও নিতে পারো। কিংবা নরবু আর মেয়র মেয়র-বাংলোয় ডিএফও ডিএম সাহেবকে দুপুরে লাঞ্চ দেবার চেষ্টায় আছে, সেখানে গিয়ে দুপুর দেড়টা-দুটোয় তাদের লাঞ্চ দিতে পারা যায় কি না দেখো।

তার ফলে, বলা বাহুল্য,রোজাকে স্নান করেই মেয়র-বাংলোয় যেতে হয়েছিল। গেন্দা সিং ও ববিজান পাঠান চেষ্টা করলে দুজন বড়-সাহেবকে দু-চারটে ভাল লাঞ্চ ডিনার ব্রেকফাস্ট দেয়া কিছু নয়। ঘি, মোরগ, ডিম, মসলা, সবজি, ভালো চাল তাদের নিজেদের ঘরেই থাকে। বরং রেঞ্জারকেও সেই দুজন সাহেবের সঙ্গে তাঁরা তাসিলার জন্য যা যা করলেন সে সব ব্যবস্থায় সঙ্গী হতে হল, এমন কি লাঞ্চ ডিনারেও।

রাত আটটায় নিজের বাংলোয় ফিরেছিল প্রভঞ্জন। তার মনে হয়েছিল, সে একা নয় বাংলোয়। বাথে জলের শব্দে অনুমান করেছিল, রোজা মেয়র-বাংলো থেকে ফিরেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রোজা স্নান করে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, সে এখন একটু কফি খাবে, সাহেব কি ঘুমের আগে ইচ্ছা করেন?

কফি করে আনলে রোজা। ইতিমধ্যে সে চুলের প্রসাধন করে মাথায় বনেটের মতো করে রুমাল বেঁধেছে, বাঙালি মহিলাদের মতো করে শাড়ী পড়েছে।

রোজা বললে, আপনি যখন টিকাদার আর পুলিশ নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে ঘুরছেন, মিত্রবাহাদুর এসেছিল।

কী বললে? এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই বলে পক্ষ হচ্ছে?

তা তো বললেই, পরে বললে, ক্লুটলং-এর মেমসাহেব তাদের সকলের চিকিৎসা করতে রাজি হয়েছেন। মেডিক্যাল বিল পাওয়া যাবে। আর তার দুই ভাইপোকে, একজনকে বিরিক ব্লকে, অন্যজনকে নারেঙ্গিহাটে টিকাদার নিযুক্ত করতে রাজি হয়েছে। প্রতি একশোজনকে টিকা দিলে, পঞ্চাশ টাকা করে পাবে।

রেঞ্জার হাসি গোপন করতে পারলে না। বললে, ভাবছি ডিএফওর সঙ্গে এত কথা কখন হল মিত্রবাহাদুরের। সে যাক। তার চাইতে তোমার কথা বলো, ম্যাডাম, এটা কি ভালো হচ্ছে? মনে হচ্ছে দিনে রাতে রোগীর পাশে দশ বারো ঘণ্টা থাকছো।

আপনার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে, আমি দুঃখিত। নরবুকে আমি ধমকে দেবো।

তা নয়।

তবে? কী হবে? আমি মরতে পারি?

ষাট, বালাই। গ্রেগ তোমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু দাগী হয়ে যেতে পারো।

রোজা এমন করে হাসল, যে তার সামনে সেটা যেন কফি নয় শ্যাম্পেন, আর সে ইতিমধ্যে কয়েক কাপ রকসি মদ খেয়েছে। বললে সে, আমি না থাকি, সুচেতনা থাকবেন, চোর্টেন পীক থাকবে আপনার ছবির জন্য।

তা বলছি না। তুমি নার্সিংএর কী জানো? বিপদ না ছড়ায়।

রোজা বললে, আমি না গেলে, ম্যাডাম একা কী করতেন? থেনডুপ আর তার স্ত্রী যে ভাবে

মেয়েকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে, তাদের পাহারা দেয়ার জন্যই একজন দরকার। জানেন সাহেব, আমার পঁচিশ বয়সেই সেই স্বামী আর পাঁচ বছরের মেয়েকে এই রোগে নিয়েছে। সেই প্রথম স্বামীর মেয়েটা থাকলে এত দিনে পঁচিশ বছর হতো। ক্রুটলংএর ম্যাডামের মতো সুন্দর হতো। কাল মনে পড়ল তাদের কথা। সেই স্বামী দেরাদুনের ছিল, আর আধা ইংরেজই ছিল। আমার রাগ আছে এই রোগের উপরে। তখন বুঝতাম না। পরে অনেকবার ভেবেছি, ওই রোগ পেলে আর একবার লড়বো। সেই আমার প্রথম স্বামী। আর আমার পনেরতে আমাকে দেরাদুনে নিয়ে গিয়েছিল।

আবাব তো হারতে পারো।

রোজার মুখটা ফ্যাকাশে হল। সে বললে, সার, এ কয়েকদিন যদি নরবু আপনার ঘরের সব কাজ করে? সাহেবরা চলে গেলে কাল থেকে আর অসুবিধা হবে না, বেলা বারোটা থেকে রাত দশটা, বাংলোয় থাকবো। আপনার লাঞ্চ ডিনার ঠিক দিতে পারবো।

তার মানে, সারা রাত জেগে থাকছো তুমি সেখানে? আর সারাদিন আমার সেবা? রোজা কফি শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বাহ, কতদিন সারারাত ছবি আঁকা হয়নি?

রোজা ক্রুটলং চলে গেলে, প্রভঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে পরে ভাবলে, রোগের উপরে রাগ কি কোন মনস্তত্ত্বের কথা? নাকি এসবই সেই পাগলা সাহেব গ্রেগের প্রভাব? আর তা হলেও, তা কিন্তু নিঃশব্দ প্রভাব। সেই পাগলা নিশ্চয়ই রোজাকে বসিয়ে উপদেশ দেয়নি। নতুবা বলতে হয়, সাহেবি মতে, ইভ পালানোব সময়ে এঞ্জেলিক কিছু সেই ইডেনেব বাইরে গোপনে নিয়ে এসেছিল। বাকপটু সে, এরকম একটা কথা তৈরি করে আপন মনে হাসল। একটু মোটা এঞ্জেল।

৪

সেদিন ডম্বরির অসুখের পঞ্চম দিন হয়তো। বিকেলের দিকে পোস্টমাস্টার বাজারফেরত এসে বললে, এ বেলাও বাজারে কেউ শাকসবজি নিয়ে আসে নি। আমি শর্মাকে বলে এলাম, কাল তার লোক কোন গ্রামের হাটে গেলে, আনাজ-শাক যা পাওয়া যায় আনবে আমাদের জন্য। গুমছে তো তোমাকে নারেঙ্গিহাট থেকে ডিম এনে দিয়েছে, মোরগও। এখানকাব গোরুকে বিশ্বাস নেই। এখানকার মাখনেও বিশ্বাস রাখা যায় না। এখনও কিছুদিন কৌটার দুধ-মাখন চলুক।

সুচেতনা, যেমন সে বলে, বললে, চা দেবো?

চা? রেঞ্জার সাহেব এখনই আসবেন। দেখা হল। পথে তাঁর স্কুলের মাস্টার সেই শর্মাপণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলছেন। স্কুল তো বন্ধই। স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীর টিকা দেয়া হল কি না, তাই যেন শর্মা দেখে। রেঞ্জার এলেই চা করো। তার সঙ্গে কিছু খাবারও। রোজা ক্রুটলং-এই থাকছে বেশির ভাগ। ভদ্রলোক নরবুর উপরে নির্ভর। কী খাচ্ছেন, কে জানে? আচ্ছা, সুচি, তুমি পুষ্প আর ইন্দ্রর জন্য ভয় করছো, বস্তিতে ওদের বাপ মার কাছে যেতে দিচ্ছোনা।

আসলে, রোগটা লোপ পেয়েছিল পৃথিবী থেকে ; আবার হঠাৎ ফিরল, তাতেই ভয়।

কিন্তু ওদের বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাজারে। তারা ওদের জন্য দুশ্চিন্তায়। ছেড়ে দিলে হয়।

সুচেতনা বললে, এটাই তো ওদের প্রাইমারি টিকা। আজও, দেখো, জ্বর আছে।

কিন্তু মনে করো, বস্তিতে ওদের বাবা মা আক্রান্ত হল, তারা গত হল।

সুচেতনাকে ফ্যাকাশে দেখাল। সে চেষ্টা করে হেসে বললে, তা হলেও ওরা আমার চিরকালের বোঝা হয়ে থাকবে না। দাঁড় থেকে একদিন উড়ে যাবে, দেখো।

পোস্টমাস্টার বাথ থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল। সুচেতনা তোয়ালে এগিয়ে দিলে মুরলীধর বললে,

কী ধুলো হয়েছে। এ ধুলো না গেলে অসুখের ভয়ও যাবে না।

তুকতাক করে বৃষ্টি নামানো যায়?

মুরলীধর ঠাট্টা গায়ে না মেখে বললে, এ সবের ফলে কত রকমের ব্যাপার হয় দেখো। ক্লুটলংএর পাশ দিয়ে যে গলিপথ উত্তর-পশ্চিমে গিয়েছে, অর্থাৎ দুদিকের পাহাড়ের মধ্যে একটা গলি, চওড়া অমসৃণ একটা উপত্যকাই, তার উপরে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হয়েছে। শহরে ট্রেজারির সামনে যেমন দেখো। তাই বলে, সীমান্ত পার হওয়ার ওটাই কি পথ একমাত্র?

সুচেতনা বললে, প্রতীক হিসাবেও ওটা ভালো হল। ওপারে মৃত্যুবীজ, মনে এরকম কথা সৃষ্টি হলে...

তা ছাড়া, আমরা জানতাম না, গভীর বনের মধ্যে তত ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বিশ-পঁচিশ জন মানুষের গ্রাম থাকে। কবিটবি হলে কাব্য করা যায়।

তা থাকবেই। নতুবা এই তাসিলায় কারা শাক, আনাজ, মাখন, ডিম যোগান দেবে?

যেমন এখান থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে যে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়টা দেখো, মেটে রঙে হলুদ টানা টানা দাগ যার গায়ে, ওটাকে টপকে নেমে গেলে, মাইবং নামে একটা গ্রাম আছে—একটা পৃথক উপত্যকাই। মিত্রবাহাদুরের ভাইপো এক কনস্টেবল নিয়ে টিকা দিতে গেল আজ। সেখানকার মানুষেরা তাসিলার মানুষ থেকে নাকি পৃথক।

সুচেতনা ইতস্তত করে বললে, আজ রেঞ্জার ছবি আঁকবেন?

মুরলীধর বললে, জানো, এসব ঘটনা আমাদের কেমন সব চিন্তা করায়। মেয়েটির বাবার নাম থেনড়ুপ। সে কী বলছে জানো, নাকি তার পাপেই মেয়েটি তাকে ছেড়ে যাচ্ছে?

হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে একদিন। তুমি বলছো সেটা পাপ নয়। সীমান্তের ওপারে মাল নিয়ে যাওয়ার টাকাপয়সার অপরাধ?

মুরলীধর বললে, পাপ বললে অলৌকিক ভয়ও এসে যায় না?

ওরা তো তত সভ্য নয়। অপরাধ আর পাপের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না হয়তো। আমরা শিক্ষিত সমাজে সে রকম করি না। এবার চা-কফির জল বসাই। রেঞ্জার আসবেন, বলছিলে।

মুরলীধরকে ম্লান দেখাল।

তারপর তার কিছু মনে পড়ল যেন। আর সে ভাবলে, দেখো, এই দরকারি কথাটা রেখে এতক্ষণ কী বাইরের কথা বলছি! সে বললে, এই দেখো, আসল কথাটা একদম ভুলে গিয়েছি। রেঞ্জার এই সেন্টটা কলকাতায় আনতে দিয়েছিলেন। আজই অসওয়ালের এক লোক এনেছে। সে পকেট থেকে একটা ছোট সুদৃশ্য রঙীন লেবেলের শিশি বার করলে। বললে, এই নাও। তোমার জন্যে। রেঞ্জার দিলেন। ছবিতে তোমার গাউনটা তো লাইল্যাক রং। সেন্টটার নামও দেখছি লাইল্যাক। জানি না লাইল্যাক ফুলের সেন্ট কেমন। ইটালীতে তৈরি, দেখো।

৫

সেটা সম্ভবত ডম্বরির রোগের ষষ্ঠ দিন, যখন কেউ কেউ জানতে পেরেছে, আশা করার আর কিছু নেই। রোগী বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারছে না। মেয়র সেই বিকেল চারটেতে অক্সিজেনের খোঁজে বেরিয়েছে। বেলা দুটো থেকে টেলিফোনে চেষ্টা করার পর জানা গিয়েছে, জংশন শহরের হসপিট্যালে শেয়ার করার মতো অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকলেও, অত ভারি জিনিস কি করে বা সেখান থেকে রাত শেষ হওয়ার আগে তাসিলায় আনা যায়। কিন্তু সেই হসপিট্যালের

চীফ শেষ পর্যন্ত বলেছিল, এদিকে এক মাউন্টেন ব্রিগেড আছে নিমতিঝোরার কাছে রংডংএ। সামলিং বনের পথে সোজাসুজি যেতে পারলে সেটা বরং কাছে হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তো! তখন রেঞ্জার ডিএফওকে ভার নিতে অনুরোধ করেছিল। এটা খুব সৌভাগ্য, জংশন শহরের সুইচবোর্ড সেই মাউন্টেন ব্রিগেডের লাইনে সুইচআপ করতে পেরেছিল। ডিএফও সেই ব্রিগেডের মেডিক্যাল ইউনিটকে অনুরোধ করলে সেখানকার ব্রিগেডিয়ার বলেছিল, অক্সিজেন সিলিন্ডার নয়। একটা দুটো অক্সিজেন মাস্ক স্পেয়ার করতে পারে।

টেলিফোন করতে রেঞ্জার পোস্টঅফিসে গিয়েছিল, কারণ পোস্টমাস্টারই জংশনের সুইচবোর্ডকে অনুরোধ করে কানেকশনগুলো করে দিতে পারে। দুটো থেকে চারটে লাগল সংবাদ পেতে, মাউন্টেন ব্রিগেড অক্সিজেন মাস্ক স্পেয়ার করতে পারবে। কিন্তু তাতে খুব এসে গেল কি? কে যাবে তাসিলা থেকে সেই মাস্ক আনতে? তাসিলা থেকে জাকিগঞ্জে পনির পথে ৩৬ কিমি। সেখান থেকে জংশন মোটর পথে ৩০ কিমি। জংশন থেকে নিমাতিঝোরা ২২ কিমি, রংডং যেখানে সেই ব্রিগেড, তা যে বনে তা আরও ৫ কিমি। তা হলে মোটর আর পনি দুই-ই পেলে, মোটর পথে ৫২ কিমি আর পনির পথে ৪১ কিমি। ৯৩ কিমি যাওয়া আর সেই পথটাই আসা। এখান থেকে পনি নিয়ে জাকিগঞ্জে যেতে পারো। সেখানে পনি ছেড়ে ৫২ কিমি ট্রাকে গিয়ে নিমতিঝোরা। সেখান থেকে রংডং ৫ কিমি যাওয়া, ৫ কিমি ফেরা, পনি কোথায় পাবে?

ময়ূর পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে বললে, ডিএফও সাহেব যদি একটা পনি দয়া করে ট্রাকে নিতে দেন।

তা হলেও মেয়র, ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে ছেড়ে দিতে হয়। আমাদের মেনে নিতে হবে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক, তার সুযোগসুবিধা শহরের জন্য। আমাদের বনের জন্য নয়। এটাই জানা থাক, আমাদের আমরা এক রোগীর জন্য ফরেস্টের রেলওয়ের ও আর্মির বড় বড় অফিসরদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সহানুভূতির কথা শুনেছি।

সেখান টেলিফোনের সামনে পোস্টমাস্টার, রেঞ্জার আর মেয়র দাঁড়িয়ে। অক্সিজেন দরকার হচ্ছে ডম্বরির, এই সংবাদ মেয়রই এনেছে ক্লটলং থেকে। রেঞ্জার বললে, চলো মেয়র, তুমি বরং জানিয়ে দাও ডাক্তারকে, অক্সিজেন যোগাড় করা সম্ভব হল না।

পোস্টমাস্টার মেয়রের মুখের দিকে চেয়েছিল। সে লক্ষ্য করলে, মেয়রের চোখ দুই-ই মেঘলা দেখাচ্ছে।

তখন অবসন্ন বৈকাল।

মেয়র বললে, আমি একটা পনি নিয়ে জাকিগঞ্জে ডিএফও সাহেবের কাছে যাই।

কী লাভ হবে বলো? হিসাব করে দেখো। চারটে বিকেল এখন। জাকিগঞ্জ থেকে সন্ধ্যার পথে আড়াআড়ি বন পার হতেও চারঘণ্টা। রাত আটটা হবে। সেখান থেকে ট্রাকে। সে পথ শহরের পথ নয়। চায়ের বাক্স আর কাঠ নেয়ার ট্রাকরোড সংকীর্ণ, সব সময়ে ব্যবহারযোগ্য থাকে না। ঘণ্টায় কুড়ি কিমি গেলেও নিমতিঝোরায় পৌঁছতে আড়াই ঘণ্টা। সেখান থেকে রংডং পৌঁছতে রাত এগারোটা। ফিরতে হিসাব করো—রাত দুটো আড়াইটে জাকিগঞ্জ। সেখান থেকে পাহাড় ও বনের মাঝরাতের অন্ধকার পথে চার ঘণ্টা। সকাল ছটার আগে সারারাত চলেও, কেউ কি অক্সিজেন আনতে পারে? রাত পুইয়ে যায় না?

রেঞ্জার চিন্তা করলে। বললে, একটা অলটারনেটিব আছে। বিরিকব্রুক থেকেই সামলিং, সামলিং থেকে নিমতিঝোরা, এই বনগুলো পার হলে, নিমতিঝোরা চা বাগান, সেটা পার হলে রংডং ফরেস্ট। এ পথে সব সমেত যাওয়া আসায় ৬০ কিমি, যদি সে বনে পথ না হারায়। সামলিং চিতার বন। হাতিও এসেছে। সামলিং-এ ডিএফও পথ হারিয়েছিল। পোস্টমাস্টার বললে, সেই বন যা

অবচেতনের মতো?

রাতের অন্ধকারে সেখানে মন থাকে না। চাঁদ উঠলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে যেসব গলিপথ–সেগুলো ধাঁধায় ফেলতে থাকবে, প্রভঞ্জন বললে।

তা হলে, সার, যাওয়া হয় না দেখছি।

যেতে পারো, যদি ওই তিনটে বনের বিট অফিসারের সাহায্য পাও। আর পনিও বদলে নিতে হবে।

তা হলে যাই, সার।

পোস্টমাস্টার বললে, মেয়র, বোধ হয় রাইফেল আর টর্চও নিতে হয়।

প্রভঞ্জন বললে, গভীর রাতে বনের ধাঁধায় এমন কিন্তু হতে পারে মেয়র, ৬০ কিমি যেতে আসতে সকালের আগে তুমি ফিরতে পারবে না। বরং কাল ভোরে রওনা হয়ে তুমি বেলা ১১ টার মধ্যে ফিরতে পারো। এখন রওনা হওয়া আর কাল ভোরে রওনা হওয়ার মধ্যে তফাৎ ৬ ঘণ্টা।

ময়ূর বললে, ৬ ঘণ্টা তফাতে–

তা হতেই পারে। কিন্তু এখন রাতে রওনা হলে–রিস্কগুলো ভাবতে হয়। অচেনা পথে তোমার পনি স্টাম্বল করতে পারে। পাহাড় থেকে পড়ে যেতে পারে, কম্পাস নেই, ম্যাপ নেই যে দিক ঠিক থাকে। ঘুমন্ত বিট অফিসার নিশ্চয় তোমার জন্য পনি নিয়ে অপেক্ষা করছে না। বললে হয়তো, পনি কাল সকালের আগে নয়। পনি আর সহিস থকে আছে।

ময়ূরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা হলে সার, আজ রাতের মধ্যে কিছু করা সম্ভব নয়?

তুমি ডাক্তারকে বলো, কাল বেলা এগারোটা নাগাদ আনতে পারবে অক্সিজেন মাস্ক।

সে রকমই হবে, সার, বলে ময়ূর পায়ে পায়ে সেখান থেকে চলে গেল। সে কী করতে পারে? পনিগুলো তার নয়। বিট অফিসাররা রাতের পথে যেতে তাতে সাহায্য না করতে পারে। ডম্বরি তাদের কে? হঠাৎ তার মনে হল, খুব হেরে গেলাম বনের কাছে। খুব হেরে গেলাম।

কিছুক্ষণ কেউই কিছু বললে না। পরে সুচেতনা বললে, এবার কফি নিয়ে আসি? পোস্টমাস্টার বললে, এখন তা হলে কফি হোক, ছবি আঁকা হোক।

প্রভঞ্জন বললে, পাঁচদিন, এক সপ্তাহই বলতে পারি, তা আঁকা হয় না।

সুচেতনা বললে, আমি বরং ভাবছি, আপনারা কফি নিয়ে বসলে, আমি বরং খাবার করি আপনাদের। রাতের খাবারও করি আপনার। রোজা তো ক্লুটলং-এ এই। নরবুর হাতে কী খাচ্ছেন, কে জানে?

না, না সে ভাবতে হবে না। খিচুড়ি আর ভাজা দেখলাম, নরবুও বেশ ভালবাসে। রেঞ্জার এই বলে উঠে ক্যানভাসের উপরে আলতো করে রাখা পর্দাটাকে সরালে, আলো জ্বালালে। জার থেকে তুলি বেছে বেছে পাশের নিচু টেবলে সাজাতে শুরু করলে। সুচেতনা কফি আনতে গেল। সে চলে গেলে পোস্টমাস্টার বললে, মেয়র শেষ পর্যন্ত অক্সিজেন আনতে পারুক না পারুক, তাতে কাজ হোক, না হোক, সে যে রাত করে অক্সিজেন আনতে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল, এটা অসাধারণ সাহসের কথাই। ওর সিরিয়াস মুখ দেখেছিলেন? পরে হতাশা? আপনি তার কথায় সায় না দিয়ে ভালো করেছেন।

প্রভঞ্জন বললে, না, মশায়, তা সম্ভব নয়। জাকিগঞ্জ থেকে মোটরের পথটার কথাই ভাবুন। অসমান, অন্ধকার, দুপাশে বন, লুপগুলো যেন আকাশের দিকে ওঠে আর পাতালে নামে, বেন্ড নেবার সময়ে গাড়ির সামনের চাকা প্রতিবারেই খাদের ছ ইঞ্চির মধ্যে এসে যায়, দিনের বেলাতেও ব্রেক, ক্লাচ, গিয়ার করতে করতে ড্রাইভাররা ঘেমে ওঠে। একবারই গেছি আমি সে পথে। সে উঠল। বললে, জাকিগঞ্জেও ফোন করে বলে দিই, রাতের বেলায় ট্রাক রাখা দরকার নেই।

পোস্টমাস্টার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সে যেন বনের মধ্যে গাঢ় অন্ধকারে পাহাড়ে বিপজ্জনক বাঁকে বাঁকে পাক খেয়ে চলা একটা নিঃসঙ্গ ভ্যানের দুটো আলোর কিছু দেখতে পেল। সে যেন দেখলে, গভীর রাতে গভীরতর বনের পথে একজন পনি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ক্রমশ এক ক্লান্ত পনি আর তার সওয়ার হয়তো বা টর্চের আলোয় খাদের ধার দিয়ে দিয়ে সরু পাহাড়ি পথে তাসিলার পাহাড়ে উঠছে। অথচ সেই আদিবাসী হতদরিদ্র মেয়েটা তার কেউই নয়!

সে ভাবলে, কী আশ্চর্য! এই দুঃসাহসও কি প্রমাণ করে সে এসব ব্যাপারেও ট্রেনড? নতুবা এমন একটা কল্পনাই বা মনে আসে কেন?

প্রভঞ্জন টেলিফোন বুথ থেকে ফিরে এল। পাইপ ধরালে। বললে, আচ্ছা মশায়, কী মনে হয় আপনার?' মেয়রের এই ব্যাপারটা? ডিএফও বলছিলেন, না পাঠিয়ে ভাল করেছি; একজনকে বাঁচাতে আর একজনের জীবনের অতবড় রিস্ক নেয়া যায় না। কিন্তু কী আশ্চর্য, এরকম লোক থাকে! অ্যাবনর্মাল মনে হয় না? আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হয়। এরকম সব সাহস—এগুলো হয়তো মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে ডেথ উইশ বলে, তাই হতে পারে কি? নাকি যৌবনের বেপরোয়া ভাব নিছক? খাবার সুচেতনা আগেই তৈরি করেছিল। সে কফি ও খাবার এনে দিলে। সে দেখলে, দিনের মতো উজ্জ্বল আলো সত্ত্বেও তেমন গল্পে দুজনে চুপ করে বসে আছে। বললে, আপনারা কফি নিন, আমার তৈরি হতে দেরি হবে না। সে ছবির জন্য পোশাক পরতে গেল।

পোস্টমাস্টার তখন আবহাওয়ার কথা তুললে, আচ্ছা মশায়, আপনি তো এখানে আমার চাইতে বেশি অভিজ্ঞ, জুলাই মাসভোর এখানে কি প্রকৃতি এরকমই থাকে প্রতিবারই?

প্রভঞ্জন বললে, শুকনো থাকে। কিন্তু হয়তো এতটা নয়। বৃষ্টি নামা উচিত। কিংবা হয়তো অসুখটার ভয়ে এরকম মনে হচ্ছে। সে ভাবলে, আমি কিন্তু মেয়রের কাছে হেরে গেলাম।

পোস্টমাস্টার বললে, কোন অর্থ হয় না।

কীসের?

নতুবা বলতে হয়, সবই মিত্রবাহাদুরের সুবিধার জন্য। তাদের মেডিক্যাল বিলের টাকা হবে। ডক্টর মিস এয়ার তাদের চিকিৎসা করতে রাজি হয়েছে। তার দুই ভাইপো আপাতত টিকাদার হয়েছে। সে আশা করছে, এই সুযোগে তারা হয় হসপিট্যালে কিংবা ফরেস্টে স্থায়ী চাকরি পেয়ে যেতেও পারে।

হসপিট্যাল?

বাজারে শুনছিলাম, মিস এয়ার এখানে একটা হসপিট্যাল, মানে হেলথ সেন্টারের মতো, খুলতে চেষ্টা করছে। তা হলে উন্নতিই হচ্ছে তাসিলার। আবার দেখুন, খবরের কাগজেও তাসিলার কথা উঠছে। আজকের কাগজ দেখছেন? সেকালের স্বাধীনতা-যোদ্ধার যারা এখানকার ফোর্টে একসময়ে বন্দী ছিলেন, তাঁদের স্মৃতির জন্য ফোর্টের ধ্বংসাবশেষ আবার সারানো যায় কি না, তা নিয়ে লেটার্স টু দা এডিটর লিখেছে দুজন।

মনে হচ্ছে, আপনি কিছু বলতে চাইছেন। তাসিলার সামাজিক অগ্রগতি সূচিত হল বলছেন? প্রতি বৎসরই কিছু মানুষ ফোর্টের ধ্বংসাবশেষ দেখতে এলে একটা ট্যারিস্ট অ্যাট্রাকশনই হবে? পোস্টমাস্টার একটু টেনে হেসে বললে, বলবো না? নইলে তো বলতে হয় একটাই অর্থ আছে। লোভের পাপে মৃত্যু।

তাও ভালো। আমি ভেবেছিলাম আপনি বলবেন, এই রকম অখ্যাত জায়গায় সীমান্তর এত কাছে এবং আনমার্কড বর্ডার, এমন একটি মিশন হাউস, এত করে হাসপাতাল তৈরি করা, অথচ ধর্মান্তরীকরণ নয়, তা কত বিনা বাধায় আমরা মেনে নিলাম।

একথা বলছেন যে?

রেঞ্জার হেসে বললে, আজকের কাগজেই তো, মালাধর বসু নামে সেই সাংবাদিক, যিনি মাঝে মাঝেই আজকাল তাসিলার কথা লিখছেন, তিনি ক্লটলং মিশনের কথা লিখেছেন। লিখেছেন-ধর্মান্তরী-করণের চেষ্টা এখনও দেখা যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও সীমান্ত ঘেঁষে একটা হসপিট্যাল হচ্ছে, অথচ রোগের ভয়ে আমরা তাকে মেনে নিলাম। এটা ভেবে দেখার ব্যাপার। ভাবছি, এই মালাধর এত জানলেন কি করে? পরে মনে হল লেখক আশঙ্কা করছেন, বিদেশি ডিস্ট্যাবিলাইজার সি আই এর কাজ নয়তো?

ছবির জন্য তৈরি হয়ে আসতে সুচেতনার মিনিট পনের লাগল। সে বিকেলে গা ধুয়েছিল। চুলগুলোকে ব্রাশ করে তাকে উজ্জ্বল্য আনলে, হাত দুখানাকে ও মুখকে প্রসাধনে উজ্জ্বলতর করলে। লাইল্যাক ম্যাক্সিটাই ছবির বিষয়। আসলে সেটা হালকা নীল শিফন, কিন্তু চিত্রকর তাকে লাইল্যাক রঙের করেছে, আর গলার কাছে যে কুঁচিগুলো সেগুলোকে বাদ দিয়ে গলাটাকে স্কোয়ার করে লম্বা করেছে, বুকের উপর তাদের আভাস এনেছে। কিন্তু লাইল্যাক গার্মেন্ট ছবির বিষয় হওয়াতে পরবার যোগ্য আন্ডারগার্মেন্টের এখানে ওখানে সদ্য আনা লাইল্যাক সেন্ট দিয়ে, এই যুক্তি দিলে এই ম্যাক্সি বারবার পরছি, গত পাঁচ-ছ দিন তো আলনাতে তোলা ছিল—কেমন ধুলোধুলো গন্ধ হয় না? এসবে আর কতটুকু সময় লাগে?

সে এলে মুরলীধর বললে, আমি কিন্তু আগেই ঠিক করেছি, ছবি আঁকার সময়ে আজ থেকে আমি বেড়াতে বেরুবো।

সে উঠে পড়ল, ঘরে গিয়ে পোশাক পালটে টর্চ হাতে সত্যি বেরিয়ে পড়ল।

সিটিং দেয়ার নির্দিষ্ট জায়গায় বেতের চেয়ারটাকে প্লেস করলে প্রভঞ্জন। সুচেতনা দাঁড়ালে সে ম্যাক্সির ফোল্ডগুলোকে ঠিক করে দিলে। এ সময়ে সুচেতনার একটু লজ্জা করেই। সে সেজন্য প্রভঞ্জনের দৃষ্টি ক্যানভাসের দিকে আকর্ষণ করলে। বললে, উলের ঝুলিতে আপনার ওই বাদামি সাদায় মোটাসোটা আদুরি বেড়ালটা কিন্তু আমার চাইতে সুন্দর।

না, ম্যাডাম না। ওটা ওভাবে ওখানে না আঁকলে, আপনি ঘরের মধ্যে মৃদু আতপ্ত সুখে, তা কি করে বোঝাই? বিড়ালটা ছবিতে আপনার ঘরের তাপ বাড়াচ্ছে। আপনার মৃদু তৃপ্তির হাসির কারণও হচ্ছে দুষ্টুমি করে উলের ঝুড়িতে বসে। কী বললেন, সুন্দর। আপনাকে বলব কি? প্রথম আঁকবার সময় থেকে এখন কিন্তু, কেন জানি না, আরও সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে।

৬

তখন পোস্টমাস্টারের চারিদিকে, বিকেলের সূর্য সামনের রিজের নিচে নামতে থাকায়, বাদামি আর হলুদে আঁকা তাসিলা। পাহাড়ের গা বাদামি, গা বেয়ে ওঠা পাকদণ্ডিগুলো গেরুয়া-হলুদ, পিচের পথ কালোর বদলে খয়েরি। পথের ধারের খাদ কালচে বেগনি। শুকনো বাতাসে ধুলোর গন্ধ। যাতে মরা লেবু ঘাসের বিকৃত গন্ধ মিশেছে মনে হয়। কাছের খড়ের রং সবুজ থেকে কালচে-নীল পর্যন্ত, অবস্থানের উচ্চতা অনুসারে। তার অভ্যস্ত বুদ্ধি তখন নিজেকে প্রশ্ন করলে, এবার কোনদিকে? সে নিজে অনুভব করলে, কী অদ্ভুত এক গল্প হয়ে উঠছে তাসিলা, ডম্বরি, থেনডুপ, ডাক্তার জেনের হসপিট্যাল, কাঁটাতারের বেড়া, মিত্রবাহাদুরের ভাইপোদের চাকরি, অক্সিজেন মাস্ক। সে হাসল মনে মনে, হুঁ, কালই তো অসওয়ালের দোকানে দেখা হতেই মিত্রবাহাদুর তাকে অনুরোধ করেছিল, মিত্রবাহাদুরের অন্তত এক ভাইপোকে ডাক্তারকে বলে হাসপাতালে চাকরি করে দিতে পারে কি না সে। ধরে নিয়েছে পোস্টমাস্টার যখন, চিঠি আসা যাওয়ার সুবাদে নিশ্চয়ই তার ডাক্তারের

সঙ্গে খুব আলাপ আছে। টিকাদারের চাকরি দুমাসে শেষ। অদ্ভুত গল্প যা...

এখনই টর্চ দরকার হবে না। খাদ থেকে সরে হাঁটো।

এই সময়েই সে মেয়র-বাংলোর ব্রিজের কাছে এসে গেল। এখনও অন্ধকার হয়নি, তা হলেও আলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে দেখতে পেল, মেয়র-বাংলোর বারান্দায় একটা হলুদ রঙের আলো। আর সেই আলোর নিচে কেউ যেন কোন নিচু আসনে, মোড়া হতে পারে, স্থির হয়ে বসে আছে। উপর থেকে ছিট ছিট আলো ছিটোচ্ছে যেন, আর লোকটি যেন বাদামিতে তৈরি। কী আশ্চর্য, না, ওটা পাথর হয় না। ভঙ্গিটা দেখো। সব চিন্তাশীল দুঃখমগ্ন মানুষের বসার ভঙ্গি কি একই রকম হয়, রদ্যাঁ যেমন কল্পনা করেছিল। কিন্তু ওখানে ওভাবে তো মেয়রই হতে পারে।

না, না, এখনই তো মেয়রের সঙ্গে কথা হল সেই অক্সিজেন মাস্কের ব্যাপারে। এখনই আবার তার সঙ্গে কেন?

সে মেয়রের ব্রিজ পার হয়ে বরং ফরেস্ট কলোনি যেতে উপরের পথটা ধরলে। অদ্ভুত, গা ছমছম করা, এক গল্প, যার অর্থ শেষ পর্যন্ত কী হয় কে জানে...

কিন্তু কিছুদূর চলেই তাকে বসতে হল। সে দেখলে, দুটি স্ত্রীলোক আসছে। পিঠের উপরে চা-পাতা তোলার মতো কাপড়ের বোঝা। চা-পাতা নিশ্চয়ই নয়। সে জানে, গোরুর জন্য কাটা ঘাস হতে পারে। স্ত্রীলোক দুটি তাকে দেখে হেসে দাঁড়াল রাস্তার একপাশে। ও হরি, এদের দুটিকেই তো সে চেনে। পেনশন আসে মানি অর্ডারে। সে জন্য প্রতিমাসেই একবার পোস্টঅফিসে যায়। এরা দুই বন্ধু অথবা দুই বোনের মতো। কিন্তু নামে বোঝা যায় তারা বোন হতে পারে না। এরা এখানকার যে তিনজন ৭১-এর যুদ্ধের বিধবা পেনশনার আছে তাদের দুজন। একই যুদ্ধে স্বামী হারিয়েই বোধ হয় সখ্য। এটুকু ভাবতে ভাবতেই মুরলীধর লক্ষ্য করলে তারা তাকে সম্ভ্রম দেখাতে থেমে পড়েছে। সে জন্য সে কথা বললে। বাড়ি যাচ্ছো?

জু, তাদের মধ্যে কম বয়সের স্ত্রীলোকটি বললে, তপাই কোথা যানছেন।

মুরলীধর বুঝলে, তাকে সম্মান জানাতে বাংলায় বলতে চেষ্টা করছে।

সে বললে, বেড়াচ্ছি। চলো, তোমাদের সঙ্গে ফিরি আবার।

এটা বেশ বিস্ময়ের ব্যাপার, সেই স্ত্রীলোক দুটির পরনে যে রঙের শাড়ি থাক, তাদের মাথা থেকে ঝোলানো ঘাসের পিঠঝোলার কাপড়ে যে রং থাক, তা সব ঢেকে যেন দীঘল রেখায় সিপিয়া রং লেগেছে।

মুরলীধরের এক হাত পিছনে স্ত্রীলোক দুটি, সেটাই সম্ভ্রমের ভঙ্গি।

মুরলীধর বললে, একটু আগে তোমরা চীনাদের কথা কী বলেছিলে?

একজন বললে, তখন আমরা অল্পবয়সের, আমার এগারো-বারো হবে। আমরা অন্য রকম চেহারার কয়েকজন মাঝে মাঝে দেখতাম। ভাষাও আলাদা ছিল। ইংরেজি, বাংলা, পাহাড়ি ছিল না। ওরা সিল্ক আনতো, সে কথা করছিলাম।

মুরলীধর জিজ্ঞাসা করলে, তোমার এগারো-বারো হবে তখন, সেটাকে এখন থেকে প্রায় বিশ বছর আগের, তা সে চীনারা গেল কোথায়?

খই—

অর্থাৎ তারা জানে না। সেই চীনারা কোথায় গেল তা তারা জানে না।

কী করতো চীনারা এখানে? ফরেস্টে কাজ করতো?

তাদের একজন বললে, না, কাপড়জামা, জুতো বিক্রি করতো বোধ হয়। এসব পুরনো মানুষরা রামরো ভননু শকছ। ববিজানকো ওতা আইলে পনি এক চীনা ছ কে।

মুরলীধরের মনে পড়ল। ববিজান পাঠানের বৃদ্ধা পিসির সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। একবার

সে টাকা তুলতে পোস্টঅফিসে এসেছিল। তার সঙ্গে চীনা-চীনা চেহারার এক যুবক ছিল বটে।

এই চীনাদের ব্যাপারটা তার কাছে নতুন। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে হবে। ববিজানের পিসিমা, সেই সাদা ধবধবে চুলের নীলচোখের বৃদ্ধা আইশা ছেলেটিকে সুভান বলছিল আর সুভান আইশাকে নানী বলছিল। তার মনে পড়ল, সেই বৃদ্ধা ঘোমটা দিয়ে, গায়ে চাদর দিয়ে, পাঠানি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এসেছিল। এক সময়ে সে অবশ্যই সুন্দরী ছিল। দুজনেই ফরসা—কিন্তু রঙে তফাৎ আছে। ঠিক তো, সুভানের রং হলদেটে বটে আর আইশা সাদা।

সে দেখলে, সে সঙ্গে থাকায় ঘাসওয়ালি, ৭১র যুদ্ধের পেনসনার, দুটির চলতে অসুবিধা হচ্ছে। সে ধীরে চলেছে বলে তারাও ধীরে চলতে বাধ্য হচ্ছে। সে বললে, আচ্ছা, তোমরা এগিয়ে যাও। স্ত্রীলোকদুটি অনুমতি পেয়ে পাশ কাটিয়ে তর তর করে এগিয়ে গেল।

তার তো বেড়ানোই কাজ। ওদিকে রাত আটটা পর্যন্ত ছবি আঁকা চলবে। তাকে এড়াতে গেলে আরও কিছুক্ষণ বেড়াতে হবে তাকে। অতক্ষণ বেড়ানো যায় না। বসতে হয় কোথাও। সে দেখলে নাপিত মনবাহাদুরের দোকানটা খোলা। ঘরের আড়া থেকে একটা লণ্ঠন ঝোলানো। মনবাহাদুর সেখানে স্থির হয়ে বসে আছে। হঠাৎ তার মনে হল, মনবাহাদুরের বয়স পঞ্চাশের মতো হবে, সে বোধ হয় চীনাদের কথা জানে। গল্প করলে হয় মনবাহাদুরের সঙ্গে। মনবাহাদুর নাপিত হিসাবেই গল্প করতে ভালবাসে। মুরলীধর মনবাহাদুরের দোকানে ঢুকে পড়ল। মনবাহাদুরের কাজ ছিল না, সন্ধ্যার মদ খাচ্ছিল। শিষ্টাচার শেষ হলে মুরলীধর সোজাসুজি চীনাদের কথা তুললে। এটাই আজ তার কৌতূহলের বিষয়।

মনবাহাদুর বললে, জী হাঁ। চীনারা এখানে থাকতেছিল।

একটু ভেবে বললে, তখন ষাট সাল হবে। ছয়মাসের মধ্যে এক দুই করে ওদের পাঁচজনকে দেখতেছিলাম।

কী করতো তারা?

নানা কাজ। বসে থাকলে খাবে কী? খুব কষ্ট করতো। প্রথমে দুজন বাপবেটা কিংবা দুই ভাই। নারেঙ্গিহাটে গিয়ে গিয়েনচং-এর বাড়ির নিচে এখন যেখানে চায়ের দোকান, সেখানে নতুন জুতো তৈরি করে বিক্রি করতো। জুতো মজবুত ছিল, সস্তা ছিল। পুরনো জুতো সারিয়ে নতুন করে দিতো। তাদের তৈরি জুতো ছিঁড়লে ফাটলে, তা ছ মাসের মধ্যে হলে, বদলে নতুন জুতো দিত অর্ধেক দামে।

আর?

একজন পিঠে গাঁটরি নিয়ে আসত হাটের দিনে দিনে, জাকিগঞ্জে, নারেঙ্গিহাটে, তাসিলায়। মেয়েদের বোকু আর ব্লাউজের জন্য ব্রোকেড আর সিল্ক। আর দুইজন ছিল ববিজান পাঠানের কাঠগোলায়। চেয়ার, টেবল, আলমারি এইসব বানাতো। তাদের একজন ববিজানের পিসি আইশার মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সেই মেয়ের ছেলেই সুভান।

মনবাহাদুর মদ শেষ করে, তামাক পাতা আর কাগজ নিয়ে বিড়ি তৈরি করে নিল। মুরলীধর জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে ওই এক হাফ-চীনাই আছে এখন। আর সব? সেটাই মজার ব্যাপার হয়েছিল। হঠাৎ এক এক করে পনেরদিনের মধ্যে কোথায় যে তারা গেল! তারা সে রকম হঠাৎ চলে যাওয়ার ছ-সাত মাস পরে আমরা শুনেছিলাম, ৬২ সালে নাকি চীনাদের সঙ্গে খুব যুদ্ধ হয়েছে।

মুরলীধর এই সংবাদে একেবারে অবাক হয়ে গেল। সংবাদটা আইশা পাঠানির চীনা নাতি হওয়ার তুলনায় অন্যরকম। সেরকম সব ঘটনা তাসিলায় তো ইংরেজদের সময় থেকেই হচ্ছে। এই মনবাহাদুরই একদিন বলেছিল, আইশা খুব ভাল মানুষ। দরকারে সুদে টাকা ধার দেয়, সাধারণ মানুষকে, দোকানদারদেরও। ববিজানের ঠাকুরদা কম্যান্ড্যান্টের বাবুর্চি হয়ে এসেছিল। কম্যান্ড্যান্ট

চলে গেলেও সে এখানে থেকে গেল। লজ্জা ছিল দেশে ফেরার। কারণ তখন ববিজানের পিসির মেয়ের জন্ম হয়েছে। সে খুবই সুন্দর শিশু। কিন্তু ববিজানের পিসির স্বামী নাকি আগেই রাগ করে এখান থেকে চলে গিয়েছিল।

মুরলীধর বললে, তোমার এই চীনাদের গল্প আবার একদিন শুনবো। মুরলীধর উঠে পড়ল। আইশাকে দেখে তার এরকমই সন্দেহ হয়েছিল বটে। ববিজানের তখনও কিছু করার ছিল না। এখন তো আইশার বরং নিঃশব্দ দাপট। পাশাপাশি তাদের পৃথক বাড়ি। ববিজান যদি কাঠের ব্যবসায়ী, আইশা তবে দোকানদারদের ব্যাঙ্কার। হাটের সকালে টাকা দিয়ে বিকেলে সুদসমেত ফেরৎ নেয়।

মুরলীধর ভাবলে, ওটা নয়। মনবাহাদুরের পরিবারেই সে রকম গল্প আছে। আসল গল্পটা হচ্ছে, চীনাদের আসা আর চলে যাওয়া। ৬০এ এসেছিল আর ৬২র যুদ্ধ লাগতে চলে গিয়েছিল। এটা ভাবার বিষয় বটে, বলার মতোও। হয়তো রেঞ্জারও জানেন না। একটা বিষয় প্রমাণ হয়—এটা একটা বিশিষ্ট সীমান্তই। যদিও পাহারাদার নেই। যুদ্ধের চিন্তায় এই সীমান্ত চীনাদের মনে এসেছিল।

বাজারের দিকে উঠে যেতে যেতে সে পিচরাস্তা ছেড়ে কালিঝোরার বাঁককে বাঁহাতে রেখে কাঁচা রাস্তায় চলে এল। সে ভাবলে, আশ্চর্য কিন্তু! চীনারা হয়তো সীমান্তের পথঘাটের খবর সংগ্রহ করতো আর আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ কোন খবরই রাখতো না।

সে পথের ধারে পাকদণ্ডি পেয়ে একটু উপরে উঠলে। এখান থেকে অনেকটা দূর দেখা যায়। টর্চ ফেলে ঘড়িতে দেখলে ৬টা বেজেছে। সন্ধ্যা হয়েছে। না এখন ধূলোই বলো, কিংবা ভাইরাস, কিছু চোখে পড়ছে না। তা ছাড়া সেই মৃত্যুর ভাইরাস যদি থাকে, তবে তা ক্লটলং-এর চার দেয়ালের মধ্যে। আর সেখানকার ডেটল, লাইজল, ফেনলের গ্যাসের পর্দা ভেদ করে তা বাইরে আসতে পারে না। বরং, সে মনে মনে বরং বলে চোখ তুলতেই অবাক হয়ে গেল। সূর্যের কীর্তি! লালের কাণ্ডকারখানা। কত রকম যে লাল—সিঁদুর, আবির, স্কার্লেট, ইন্ডিয়ারেড, ভার্মিলিয়ন, মেরুন। মধ্যে মধ্যে সিয়েনা। আর রঙে বৈচিত্র আনতে অ্যাম্বার। তার পথ আর সে নিজে সিয়েনায়, তার উপরেই সে লাল আরম্ভ। আর রাংতার মতো ঝলমল। আর ঢেউএর মতো গতিশীল। সব ঢেউকেই এক রকম মনে হয়, কিন্তু আসতে থাকলে বোঝা যায় প্রতিটাই আলাদা, প্রতিবারেই পৃথক সে রঙের তরঙ্গ। বড়জোর বলতে পারো, মূল কর্ডটা ধরা আছে কিন্তু একবারই, ছোট ছোট পরিবর্তনে সেই সিম্ফনি সার্থকতর হচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে আপন মনে হাসল, কোন পল ক্লী অনেক বড় কাগজ পেয়েছে আর টিন টিন অ্যাক্রিলিক। সেই পল ক্লী নয়। কোন পাগলা পল ক্লী।

পোস্টমাস্টার তাড়াতাড়ি আকাশের দিকে মুখ তুললে। নিজের দু পাশে সে ভয়ে ভয়ে দেখে নিলে। নিজেকে সে কৈফিয়ৎ দিলে, না, না, ওটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়েছে। ওসব নামটাম কার, আমি কেন জানতে গেলাম! পাগল নাকি যে রং দেখে সঙ্গীততরঙ্গের কথা বলবো! বিশ্বাস করো আমি আর ওসবের ধারে কাছে নেই। বোঝাই যাচ্ছে, এটা এক পাহাড়ী সূর্যাস্ত শেষ বসন্তকালে। বাতাসে অনেক গেরুয়া ধূলো থাকলে এরকম হয়। ছবি কেন হবে? দেখো না, এই তো প্রভঞ্জনবাবু ছবি আঁকছেন, আমি কি সরে আসিনি?

পোস্টমাস্টার একটু নিচে নেমে গেল। আর সেখানে পৌঁছে সে নিজেকে বললে, দেখো, এবার, ছবিটা বদলে গেল না? চোখের সামনে এবারে গাছের কালচে নীলা আর তার উপরে মেরুনে পোড়া সিয়েনার দাগটানা আকাশ। সে একটা পাথর পেয়ে তার উপরে বসে পড়ল। সে মনে মনে হাসল। কী কাণ্ড এই তাসিলার! বসতে পেরে চশমার ডাঁটে হাত রেখে সেটাকে যথাস্থানে তুলতে গিয়ে সে গম্ভীর হল। নিজেকে বললে, চিন্তাটা তো আমার, হ্যাঁ মশাই? (যেন প্রভঞ্জনকে বলছে।) কোন পথে যাবে আমিই বলে দেবো, কেমন কি না? হতে পারে না, চিন্তা থেকে স্মৃতি এক আলাদা বিষয়? চিন্তা করতে গেলেই স্মৃতি খুলবে কেন? কিন্তু তার লম্বা করে রাখা গলায় আর মাথায়

একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো হল অন্ধকারে। একটা দলছাড়া পাখি চিৎকারে ডেকে তার কয়েক হাত দূরে মাটিতে নামতেই সে সতর্ক হল। সে ভাবলে, এখানে কেন এলাম, এই রিজে। খানিকটা দূরে গেলেই রিজটা কালিঝোরায় নেমেছে। পিছিয়ে গিয়ে আর এক পাকদণ্ডি দিয়ে আরও উপরের রিজে ওঠা যায়। পাথরগুলো সেখানে আলাদা কিন্তু। সে পিছিয়ে গেল কিন্তু সেই পাকদণ্ডি দিয়ে উপরে না উঠে, বরং জেডের মতো সেই পাকদণ্ডির নিচের বাহু ধরে সতর্ক ভাবে আর একটু নিচে নামলে। পায়ের নিচে কালো পিচের পথ পেয়ে সে ডানহাতি খাদের দিক থেকে সরে, বাঁয়ের পাহাড় ঘেঁষে চলতে লাগল। এ জায়গাটা একটু সাবধানে পার হয়ে, সে ফরেস্টকলোনির দিকে যাবে। চোখ তুলে ফরেস্টকলোনির স্ট্রিটলাইটিং দেখতে পেয়ে, সে অকারণে ভয় পাওয়ার জন্য হেসে ফেললে। তা হলেও সন্ধ্যার পরে এখন সাবধানে চলতে হয়।

হঠাৎ তার মনে পড়ল। ও, হাঁ, সুচেতনার সন্তান হবে। হয়তো তা সেই পয়লা এপ্রিলেই এপ্রিল ক্রুয়েলেস্ট মান্থ বলার ঝোঁকেই। তা হলে এখন তো আর অন্যের কবিতা আবৃত্তি মাত্র নয়। নতুন হয়ে ওঠা।

সে হাঁটতে শুরু করে ভাবলে, আচ্ছা, দেখো, মেয়র কি এখনও সেই ভাবে বসে আছে? সে যে রাত করে, এ তো তার জানা পথ আর তাসিলার মধ্যেই, সে যে রাতের অন্ধকারে গভীর বনে ঢাকা পাহাড়ি পথে যেতে চেয়েছিল—তা কি ডেথ উইশ? কী আশ্চর্য! ডেথ উইশ কি সকলের মধ্যেই থাকে? কাকে আমরা সাহস বলি? এ পথে, ও পথে, যা বিপথে টেনে নেয়? তা কি ভাইর‍্যাল রোগের মতো? কখন আক্রান্ত হয়েছো জানো না। এক সময়ে তা একটানে খাদে ফেলে দিতে পারে? অস্ফুট শব্দ করে সে খাদ থেকে দূরে সরতে পাহাড়ের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল। পা দুটো কাঁপছে, ধক ধক করছে বুক।

সে ঠিক করলে কালিঝোরা থেকে দূরে সরে বরং ফোর্টের দিকে উঠে ফরেস্টকলোনিতে নামবে। একটু বেশি ঘোরা হবে। ফরেস্টকলোনির চ্যাটালো বিস্তৃত খেলার মাঠে যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুরতে পারবে, অন্ধকার হলেও স্ট্রিটলাইটিং এর মৃদু আলোয়। সেখানে চোখ বুজে চললেও গড়িয়ে পড়ার সুযোগ নেই।

সে রকমই হল। সে ফরেস্ট কলোনির খেলার মাঠে নেমে প্রথম রাতের কোমল অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করলে। অবশেষে ঘড়িতে টর্চ ফেলে দেখলে, রাত আটটা বাজে। তা হলে সে কতক্ষণ সেই সূর্যাস্ত দেখেছিল, কতক্ষণ সে হেঁটেছে? তা হোক, এখন অন্ধকার। আর কখনও ততদূরে নয়। সে তো মনের বাইরে এসে গায়ে হাওয়া লাগাতেই চায়। খানিকটা করে এই কোমল অন্ধকার কপালে আর হাতের তেলোয় মেখে নিলে হয়। তার মনের এই রকম ঝোঁক হল, তা যেন মনের বাইরে আসতে পেরে, ডম্বরি নামে সেই দুধওয়ালী গরীব মেয়েটার গল্পে তারাও বিচলিত কি না। সারা তাসিলাই কি বিচলিত হয়েছে? আর তা এজন্য যে চোখের সামনে প্রমাণ পাচ্ছে, যেমন তার বাবা থেনডুপ বলেছে, পাপের ফল, লোভের ফল সদ্য সদ্য ঘটেছে। ওদিকে, দেখো, সুচেতনা বলেছে, থেনডুপের মতো নিরক্ষর লোকেরা যাকে পাপ বলে, আমরা সে রকম কোন সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনী টাকা সংগ্রহ করাকে বড়জোর অপরাধ বলি। অপরাধের কোন ফল থাকে না পাপের মতো। ধরা পড়লে মামলা মোকদ্দমা হয়। পাপের মতো মৃত্যুদণ্ড দেয় না কেউ।

সে সেই অন্ধকারে কিছুক্ষণ চলে অনুভব করলে, এতক্ষণ সে দ্বিতীয় প্রাণীকে দেখে নি, তাকেও কেউ দেখেনি। সে খেলার মাঠ পার হয়ে ফরেস্টকলোনির বাড়িগুলোর দিকে বরং এগোল। কলোনির পাশ দিয়েই তার বাসায় ফেরার পথ।

পথটায় উঠেই রেঞ্জারের বাংলো। বাংলোর সামনে স্ট্রিটলাইটিং-থাম। আর সে সেদিকে চোখ তুলতেই তার মনে হল, রেঞ্জারের বাংলো থেকে নানা কাচ দিয়ে আলোর আভা। তা হলে রেঞ্জার

কি ছবি আঁকা শেষ করে বাংলোয় ফিরেছে? তা হলে তাকে গুডনাইট জানিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু রেঞ্জার কি এখনই ফিরবে, রাতে সুচেতনা খেতে বলেছে না? তা হলে নরবু থাকবে এখানে। এসব ভাবতে ভাবতে, যেন কৌতূহলেই, সে রেঞ্জার-বাংলোর পাশে এসে পড়ল।

সে লক্ষ্য করলে, রেঞ্জারের বৈঠকখানার দরজার উপরের কাচের প্যানেলদুটোতে বেশ উজ্জ্বল আলো। নরবু কি তা জ্বালবে? তা হলে রেঞ্জারই ফিরেছে। হয়তো সুচেতনা আগেই খাইয়ে দিয়েছে। রাত আটটা তো খাওয়ার সময়ই এখানে।

কৌতূহলে আর গুডনাইট করতে বারান্দায় উঠে, সে দরজার কাচের প্যানেলে চোখ রাখলে। ভিতর থেকে পর্দা টানা নেই। সে দেখলে, আজও, সেই যেদিন রোজাকে আলতা পরতে দেখেছিল, তেমনই রোজা প্রসাধন করছে। হয়তো ভেবেছে, রাতে কেউ কোনদিন আসে না, এলে রেঞ্জারই আসবে সে জন্যে অসতর্ক। সে তার দীর্ঘচুলের গোছা বুকের উপরে এনে ব্রাশ করছে। তার সচেতন বুদ্ধি বললে, রোজাকে এখানে আশা করি নি। তার তো ক্লটলং-এ রোগীর কাছে থাকার কথা। নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে যাওয়াই উচিত হবে। ওদিকে, দেখো, বারান্দায় তার পায়ের শব্দ শুনতে পায় নি এখন অন্যমনস্ক। কিন্তু এরকম হল, মুরলীধর সরে যেতে পারলে না। তার বুদ্ধির নিচে কিছুকে সেই চুলের গোছা আচ্ছন্ন করায়, সে দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে ফেললে। পরেই তার মনে হয়েছিল, কাজটা ছেলেমানুষের মত হল।

রোজা দরজার দিকে ফিরতে একটু সময় নিলে। উঠে এসে ভিতরের পর্দা টানতে গিয়ে যেন ততক্ষণে খেয়াল করলে দরজায় টোকা দিয়েছে কেউ। সে দরজা খুলে দিয়ে বললে, আসুন।

সে অবশ্যই রেঞ্জার ফিরেছে মনে করেছিল।

মুরলীধর বললে, রেঞ্জারসাহেব এখনও আমার বাসায় ছবি আঁকছেন।

তাই? বসুন। নরবুকে পাঠিযেছি বিরিক ব্লকে সাহেবের জন্য মোরগ আনতে। সে হাটফেরত মেয়রের রান্না করে রেখে আসবে। মেয়রের শরীর বিকেল থেকেই খারাপ। কিছু যেন হয়েছে। নরবু বললে।

রোজা ডানভাগের চুলগুলো পিঠে দিয়ে বাঁভাগের চুলগুলো সামনে এনে ব্রাশ করতে সুরু করলে। কালচে-নীল রংয়ের সেমিজের বাইবে তার নিটোল বাহুদুটো হয়তো স্পাঞ্জের অতিরিক্ত ঘষায় লালচে। আর সে অবশ্য শেমিজের নিচে আর কিছু পরে নি। গরমে শেমিজ স্বচ্ছই হয়। সে কি তার অন্যমনস্কতায় কিংবা সংকোচের জড়তায় আয়নার দিকে চাইছে না? বললে, একটু কফি করবো কি?

না।

রোজার চুলগুলো ভালো, এখনো তা প্রচুর, যদিও কয়েক খেই ইতিমধ্যে সাদা। আর মিনিট দশেক কেশচর্চা করলে সে। ফিতে এনে ঘাড়ের উপরে বেড়ার মতো বুনে চুলগুলোকে সংহত করে যেন পিঠের উপরে ছড়িয়ে দিলে। তার স্থূল উরুদুটি সেমিজ সত্ত্বেও হলদে। মুরলীধর ভাবলে, এত অজস্র চুল। সে আয়নায় প্রতিফলিত নিজের মুণ্ড কেটে যাওয়া ছবিটা দেখলে। সে তাসিলার বর্ষার অভাবের কথা তুললে।

চুলের পরে ঠোঁট আর নখ রাঙালে রোজা, বললে তা করতে করতে, বিষের সিজন। এটা গেলে, জলও নামবে, বিষও থাকে না।

নখ পালিশ শেষ করে হাত তুলে তুলে বগলে স্প্রে করলে সে। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিত পেল আয়নায় পোস্টমাস্টারকে দেখে। বললে, মুখ কিছু লাল হল তার, ক্লটলং যাবো। শাড়ি পরে আসি।

মুরলীও সম্বিত পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। থতমত খেয়ে বললে, তা হলে এখন থাক, মনে

হচ্ছিল আলাপ করি, যেমন ধরো প্লেগের কথা।

পথে বেরিয়ে পোস্টমাস্টার অবাক হয়ে গেল। কেন তেমন করে সে ঘরে গিয়ে বসেছিল, দরজার প্যানেলেই তো রোজাকে অপ্রস্তুত দেখা যাচ্ছিল! সে না হয় ভেবেছিল রেঞ্জার ফিরেছে, না হয় কোন ভাবনাতে ঢুকে ছিল সে। তার কি এমন অবস্থা হয়েছিল, কথা না বললে চলছিল না? তা হলে বলতে হয় চিন্তাকে ঢাকতে চেষ্টা করছিল যা হোক কিছু বলে? নাকি কৌতূহলকে, জানার ইচ্ছাকে বাড়তে দিয়ে সেটাই এখন আর বাগে থাকছে না? বর্ষার কথা, তাসিলার বর্ষার কথা, তার আলাপে কী সার্থকতা, যে তা বলতে সে রকম ভাবে চেয়ারে সেঁটে বসতে হবে?

ছি, ছি, এ কী রুচিহীনতার পরিচয় দিল সে? ন্যুড ছবি আর ন্যুড মডেল এককথা নয়। ন্যুড মডেল চোখের সামনে পোশাক পরতে থাকলে বেশি ন্যুড হয় না? সে পিছন ফিরে দেখলে, রোজা টর্চ জ্বেলে পথে বার হয়েছে। তার কেমন এক অভিমান হল, মনে মনে বললে, যাচ্ছো তো এক মুমূর্ষু রোগিনীর সেবা করতে, তার জন্য এত প্রসাধন কেন? যে রূপের জন্য এত প্রসাধন তা কিন্তু এই রোগে পুড়ে যেতে পারে। চিন্তার এক ফেরে সে ভাবলে, হতে পারে রোজার রুচি বলে আর কিছু নেই। সে হয়তো এমন অভ্যস্ত এরকম প্রসাধনে যে রোগের সেবা করতে যেতেও প্রসাধন করে থাকে। তা হয়তো ছবির মডেল হওয়ার ফল।

কিন্তু, কিন্তু রেঞ্জারকে কী বলা যাবে? ফলে, যদি ভালটাই ভাবো, রেঞ্জার হয়তো বলবে, দেখে কি আপনারও ছবি আঁকতে ইচ্ছা হল? কিন্তু অন্য রকমও হতে পারে। আবার কোনদিন ছবি আঁকার সময়ে রোজা যদি বলে, আপনার বন্ধু একটি স্ত্রীলোককে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখেছে, আরও দেখতে বসে পড়েছিল, আর আমি তার অপ্রতিভ ভাবকে এড়াতে অন্যমনস্কতার ভান করছিলাম।

ক্যাড, ক্যাড। সে যেন এই অনুভব করে ক্ষুব্ধ হল। কেউ যেন তাকে প্ল্যান করে জব্দ করেছে। প্রায়ই হয় এমন, যে সকলেই কিছু আত্মপক্ষ সমর্থন করে। মুরলীধর খানিকটা চলে এসে ভাবলে, ক্যাডের মতোই কাজ হয়েছে। কিন্তু মনে মনে স্বীকার করতে হবে, এক ঘোরও লাগছিল। জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ বর্ষা দেখলে যেমন হয়, যেন শিথিল নিষ্ক্রিয় এক স্নিগ্ধতা আর নিরুদ্বেগ।

কিন্তু, কিন্তু, রোজার প্রসাধনের আদিম সরলতা কি দায়ী নয় ; দূর, দূর। তা না হলে তা সুচেতনার নীতিবাগীশ প্রসাধনের বিপরীত বলেই তাকে টানছিল?

সে একবার নিজেকে আর রোজাকেও সমর্থন করতে নিজেকে শোনালে, তা হয়তো কোন ডিজইনফেকট্যান্ট স্প্রে যা রোগের সেবা করতে যেতে দরকার ছিল।

সে তাড়াতাড়ি চলে মেয়রের ব্রিজটাকে পার হল। এর পরে পাম্পহাউসের ব্রিজটাকে পার হলে তার বাসা। রোজা বেশ তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যাচ্ছে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে। ওখানে হয়তো ডম্বরি খুবই ক্রাইসিসে। সেই অক্সিজেনের প্রয়োজনের কথা ছিল না?

আর এই সময়ে—ক্যাড, ক্যাড।

শব্দটার উৎপীড়নে সে শরীরকে শক্ত করলে। পথের উপরে টর্চের আলো ফেলে তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। আর তাতে তার বুদ্ধি এল। সে ভাবলে রেঞ্জার পোস্টঅফিসে, রোজা ক্লুটলং-এ। আজ রাতে দেখা হচ্ছে না তাদের। রোজা কিছু বলার আগেই, রোজার জানার আগেই তাকে কিছু করতে হয়। রসো, এ ধরনের ছবি যেন কোথায় দেখেছে! তার কথাই বলতে হবে। কিন্তু সাবধানে, ভুল উচ্চারণে, আনাড়ির মতো যাতে ভাবে রেঞ্জার। বলবে সেই ইংরেজি অক্ষর অনুসারে, টুলোসলট্রেকের মলিন রুজের ছবির কথা মনে করুন, মিস্টার দত্ত। মলিন রুজই বলতে হবে, ভুল উচ্চারণ করেই। সেখানে গ্রাহকদের জন্য বারনারীরা প্রসাধন করছে, যেন সে একা এমন নিশঙ্ক, কিন্তু সে একা নয়, তার প্রমাণ, আয়নাতে দেখা যাচ্ছে এমন গ্রাহকও সেখানে উপস্থিত। আপনি এরকম আঁকুন। লট্রেক থেকে নিন না হয়।

মনে মনে রেঞ্জারকে এরকম বলতে বলতে, কিন্তু পোস্টঅফিসের বারান্দায় উঠতে উঠতে সে থমকে দাঁড়াল। কী সর্বনাশ আবার ছবি আর চিত্রকরের নাম?

সে অফিসের পাশের প্যাসেজ দিয়ে বাসায় ঢুকে পড়ল। দেখলে, প্রভঞ্জন এইমাত্র ছবি আঁকা শেষ করেছে। সুচেতনা পোশাক পালটেছে। তার অর্থ, সে ছবির মডেল হওয়া শেষ করেছে, সংসারের কাজ এখন, সে ক্যানভাসের অদূরে দাঁড়িয়ে ছবিটাকে দেখছে হাসিমুখে। ক্যানভাসে ঈষৎ পরিবর্তন হয়েছে যেন। পোস্টমাস্টার চোখ বুলিয়ে দেখলে। ছবিতে, যখন সে বেড়াতে যায়, চেয়ারের উপরে রাখা সেলাইয়ের ঝাঁপিতে পিংক উলের মধ্যে হলুদ, সাদায় ডোরা একটা বিড়াল ছিল, যাকে ছবির সুচেতনা দেখছে। এরই মধ্যে সেই ঝাঁপিতে বিড়ালটার পিঠের উপর দিয়ে দুটি সুন্দর বাচ্চা টুল টুল করে নীল চোখ মেলে আছে। আর সে জন্যই যেন তাদের দেখেই ছবির সুচেতনার মুখে আরও সজীবতা।

সুচেতনা বললে, এত দেরি করলে? লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি খেতে বসো দুজনে। মুরলীধর ভাবলে, হ্যাঁ, এখন কথা চাই। অনেক কথা। সে বললে হাসিমুখে, কী কাণ্ড। লুচি! যখন ঘি পাওয়া দুর্ঘট। এ যে শরৎ চাটুয্যের নায়িকা হলে। ছবি আঁকাতে আঁকাতে লুচি! আচ্ছা মিস্টার দত্ত, আপনার কি মনে হয় না শরৎবাবুর সেই লুচিগুলো পেতি বুর্জুয়া লেখকের সুপ্ত লোভ? যদিও ত্রিশের দশকে ঘি টাকা-পাঁচসিকে সেরে পাওয়া যেত। সুচেতনা বললে, আজ আমাকে আঁকা হয় নি। বিড়াল আঁকা হয়েছে, তাই লুচি করা গেল।

কথাগুলো বলে ফেলে একটু থামল মুরলীধর। না, মশায়, বেড়ানো আজ সার্থক হয়েছে। আপনি কি তাসিলার চীনাদের অভিযান ও পশ্চাদপসরণের কথা শুনেছেন। শোনেন নি তো। বলছি বলছি। আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি। সুচি, তুমি টেবিল তৈরি করো। আমার দেরি হবে না। আর আইশা যে এরকম ব্যাঙ্কার, সে গল্পও আছে। অনেক গল্প এনেছি, মিস্টার দত্ত, আপনার জন্য।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

১

তারপর, এখন, যেমন প্রতিবারেই হয়, তাসিলার বর্ষাকাল চলছে। ডম্বরির মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকেই প্রায় প্রতিদিন প্রবল ধারাবর্ষণের পরে, আগস্টমাসে সপ্তাহে গড়ে চারদিন বৃষ্টির পরে, এখন সেই গড়টা সপ্তাহে দুদিনে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবার যেমন হয়। শুধু কারো কারো ধারণা, এবারকার সেই শুকনো দিনগুলোর কথা সহজে ভোলা যাবে না। মনে করো, এই পাহাড়, (তার মতো শক্ত আর অচল আর কী?) ধ্বসে যদি এক দিককার চেহারা বদলায়, দৃশ্য কি আর অবিকল আগেকার মতো থাকতে পারে? এ ভাবটাকে নানা ভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন পোস্টমাস্টার মুরলীধর বলেছিল, হ্যাঁ, মশাই, বলতে পারেন, তাসিলার এবার দ্বিতীয় খণ্ড সুরু হবে। ডম্বরির অসুখ, তার মৃত্যু, মেয়রের সেই অক্সিজেন আনার দুঃসাহস, ক্লুটলং-এর ডাক্তারের তাসিলার অভ্যন্তরে এসে যাওয়া– এসবই দুইখন্ডের মাঝখানে এক কার্টেন রেইজার। আগের মতো থাকবে কি আর?

তো মুরলীধরের নিজেরও কি কিছু পরিবর্তন হয়েছে? ডম্বরির মৃত্যুর রাত্রিতে, যদিও ডম্বরি কোনদিক দিয়েই তার কেউ নয়, সে যে নিজের কাছে ক্যাড প্রতিপন্ন হওয়ায় কথার আড়ালে আশ্রয়

নিয়েছিল, সেই আশ্রয়কেই আরও মজবুত করার দিকে ঝুঁকেছে। এই ছোট্ট বসতি তাসিলা নিয়ে যে এত কথা লেখা যায়, তা কি কেউ কল্পনা করেছে? সে একটা ব্যাটারির টেপরেকর্ডার আনিয়ে নিয়েছে। তাতে এখানকার প্রাচীনতর লোকদের ইন্টারভিউ ধরে ধরে তা থেকে সামাজিক ইতিহাস রচনা করছে, প্রায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখছে মালাধর বসুর ছদ্মনামে। প্রকাশ হয়ে পড়ায় প্রভঞ্জনের কাছেও সে মালাধর বসু হয়ে উঠেছে। প্রথম দিনের কথা মনে রাখার মতো। রবিবারের পত্রিকায় তাসিলায় চীনারা বলে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সেই ৬০ থেকে হঠাৎ চীনদের তাসিলায় আসা আর ৬২ তে হঠাৎ উধাও হওয়াতে, কারা কে কী করতো, তাসিলায় কোন কোন পবিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তা বলে, প্রশ্ন তুলেছে, ভারত সরকার কেন জানলে না? প্রভঞ্জন কাগজ পড়তে পড়তে বলেছিল, আপনি কি বলতে চান, সেটা ৬২র যুদ্ধের প্রস্তুতি, স্পাই রিং, যার খবর আমাদের সবকার এখনও রাখে না।

মুরলীধর বললে, আমি কেন বলবো, এ তো কোন মালাধর বসুর লেখা দেখছি।

কিন্তু চীনা অ্যাম্বাসাডর প্রটেস্ট করবে না?

আমার কাছেও এখানকার, মাইবঙের, নারেঙ্গিহাটের লেপচাখা, দুগশোমের অন্তত পাঁচজন বৃদ্ধের ভয়েস রেকর্ড করা আছে। বাই দি ওয়ে, গ্রামের নাম লেপচাখা লেপচাখোলা প্রমাণ করে ওখানে লেপচারা ছিল এক সময়ে।

তা হলে স্বীকার করুন, আপনিই মালাধর। যে রকম লিখছেন, মশায়, এক সময়ে আপনার আসল নামই লোকে ভুলে যাবে। ছদ্মনামকেই আসল মানুষ মনে করবে।

দ্বিতীয় খণ্ড বলার অন্য যুক্তিও অস্বীকার করা যায় না। তাসিলা সেই যে একটা দরিদ্র পরিবারের মেয়ের রোগে প্রাধান্য পেয়েছিল, সেটাতে ধরে রাখতেই যেন আরও পরিবর্তন হতে থাকবে, তা শোনা যাচ্ছে। চূড়ান্ত আধুনিকতার প্রতীক তো জেনের প্রস্তাবিত হাসপাতালই। যাকে অবশ্যই হসপিটাল বলা যায় না। ছোটই তো, পাঁচ-ছয় বেডেরই তো। কিন্তু নাকি এক্সরে থাকবে। মাইক্রোস্কোপ আসবে। এসব যন্ত্র এলে, নিশ্চয়, এদের চালকেরাও আসবে। না আসা পর্যন্ত জেন ডাক্তারই একা একশো। কিন্তু প্রতীক তো এরকমই হয়।

মালাধর বসুর মতে অন্য এক ব্যাপারও আছে। এই ছোট বসতির মানুষদের মধ্যে নাকি এক রকমের মগ্ন সফিস্টিকেশন গোড়া থেকেই আছে। তার মূলে হয়তো ত্রিশের দশকের ইংরেজদের জিন দায়ী। যেমন, পথে দেখা হলে উইশ করা, যেমন পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা। যেমন, যত ছোট বাড়ি হোক, মাটিতে বা টবে ফুলগাছ লাগানো। মালাধরের থিয়োরি ভুল হতে পারে, কিন্তু তার টেপ রেকর্ড প্রমাণ করে ববিজানের পিসি আইশা, মনবাহাদুর ক্ষৌরকারের কাকা, তাসিলা রোডের নান্নীর মতো কিছু ইউরেশিয়ান বংশ এখানে আছে। রোজার তো নামেই প্রমাণ, আকৃতিতেও। ববিজানের ঠাকুর্দা ক্যান্টমেন্টের বাবুর্চি শেফ ছিল। এরকম সফিস্টিকেশন সম্বন্ধে লেখা যায় কি না ভাবছে মুরলীধর।

কিন্তু এসবই ডম্বরির মৃত্যুর পরে। যেদিন ময়ূরের অক্সিজেন আনতে যাওয়ার সঙ্কল্প হয়েছিল, সেদিনটা অন্ধকার রাত্রিতে শেষ হয়ে তখন পরের দিনের ভোর হচ্ছে। আকাশে তখন রক্তিমতা প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র। ময়ূর তার বিছানায় তখনও ঘুমিয়ে আছে। চাদর কোঁচকানো, সে বালিশ থেকে নেমে এসে দুবাহু একত্র করে তার একটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। বিছানার এক পাশে শার্সিতে আলো। তার শোওয়া ও বিছানা দেখে মনে হয় রাত্রিতে তার ঘুম ভালো হয়নি। অনুমান কেন? অভিযানে তাকে নিরস্ত করা হলে, সে যন্ত্রণা নিয়ে বাংলোর বারান্দায় সন্ধ্যা কাটিয়ে জেনের কাছে গিয়ে জানিয়েছিল, অক্সিজেন আনতে সে ভোর পাঁচটায় রওনা হবে। এগারোটা বেলার মধ্যে এনে দেবে অক্সিজেন। জেন তাকে একটা ঘুমের বড়ি দিয়ে বলেছিল, বিছানায় যেতে এটা খেয়ে নিও,

ভোরে পনি নিয়ে পাহাড়ে চলতে, আগের রাতটায় ভালো ঘুম দরকার। সে যে সারারাত বিছানায় ছটফট করেছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। যতক্ষণ না বীভৎস স্বপ্ন দেখে সে কথা বলতে শুরু করেছিল, ততক্ষণ ঘুম জমে নি। ভোরের দিকেই স্বপ্নটা বীভৎসতম হয়েছিল। আর তার ফলেই ক্লান্ত ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের মতো সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ময়ূর স্বপ্ন দেখছিল, তার গুটির ক্ষতে ছাওয়া মুখ দেখে নরবু, রোজা, দত্তসাহেব তাকে মেয়র বলে ডাকছে। অথচ সে সেই মুখ দেখে নিজেকেই নিজে চিনতে পারছে না। আর তার পরে সে যেন খুশি হয়ে উঠছে সেই মেয়রের সম্মান পেয়ে, আশা হচ্ছে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবে এখন ; মৃতদেহটা আর কারো হবে না ; মেয়রেরই থাকবে। সেই ভোর ভোর সময়ে, মেয়রকে নরবু ভোর পাঁচটায় জাগিয়ে দেয়ার আগেই, জেন এসেছিল। অনুমান হয়, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছে। পরে বোধহয় খোলা বাতাসে ক্লান্তি দূর হয় কি না দেখতে বেড়াতে বেরিয়েছে।

মেয়রেব ভোরের চা নিয়ে যেতে যেতে শব্দ পেয়ে নরবু জেনের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল। জেন তার অফার করা চা না খেয়ে, বরং সিগারেট ধরিয়ে মেয়রের খোঁজ করেছিল। ভ্রূণের ভঙ্গিতে অসহায়ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে, হাসির ভাব লাগল জেনের মুখে। সে হেঁট হয়ে ময়ূরের কাঁধ স্পর্শ করে নাম ধরে ডাকলে।

ময়ূরের ঘুম, বোধহয়, ভোরে উঠে অক্সিজেন আনবার প্রতিজ্ঞার দরুন হালকা হয়ে আসছিল। সে ধড়মর করে উঠে বসল। ততক্ষণে জেন কাছের একটা চেয়ারে বসেছে।

ময়ূর চোখ মেলে বললে, এখন খুব সকাল নয়? পাঁচটা কি বেজে গিয়েছে?

সকালই। মুখ হাত ধুয়ে নাও। নরবু চা করেছে। আমিও বরং এখানেই চা খেয়ে নিই। চলো, একবার ক্লুটলং যেতে হবে। শরীর খারাপ করে নি তো?

আপনি কি এঘরে বসবেন? বিছানাটা অগোছালো।

না, আমি তোমার বসবার ঘরে বসছি। তুমি প্রস্তত হয়ে এসো।

ময়ূর কিছু পরে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখলে, নরবু ট্রে সাজিয়ে চায়ের যোগাড় এনেছে।

জেন চা করছে। জেন বললে, চা খেয়ে নাও, বলছি।

চা শেষ হলে, জেন বললে, তোমাকে অক্সিজেন আনতে আর যেতে হবে না। থেনড়ুপ আর তার স্ত্রীকে সামলানোই কঠিন। খবর পেলে তারা তো মেয়েকে শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে চাইবে। তাদের বলিনি। অথচ তাতে দুজনেরই ইনফেকটেড হওয়ার ভয়। হ্যাঁ, ঘণ্টা দুয়েক আগে ডম্বরি এক্সপায়ার করেছে।

বিদ্যুৎ–আহত বলে একটা কথা আছে। ময়ূর তেমন শিউরে উঠল। তার মুখ রক্তহীন দেখাল, সে দু-এক মুহূর্তের জন্য চোখ দুটিকে বন্ধ করলে, এত জোরে দাঁতে দাঁত চেপে রইল যে তার চোয়ালের পেশী খানিকটা উঁচু হয়ে উঠল।

পোস্টমাস্টার পরিবর্তনের কথা বলছিলাম। এখনই বলা শক্ত তা প্রকৃত পক্ষে কী। আগেও লোকে তার সঙ্গে কথা বলতো। এখন সে আরও বেশি লোকের সঙ্গে মেশে, তার চারদিকে, ফলে, আরও বেশী কথা। কিন্তু কথার আড়ালে? বড় গাছ খরায় মরে যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সে সময়ের অতি শুষ্কতার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে বিকৃত হয়, তা গুঁড়িতে অর্বুদের মতো সে দুঃসময়ের চিহ্ন হয়ে থেকে যায়। কিন্তু সে তো সেই মুরলীধর যাকে চোখে দেখা যায় না। মালাধর কি মুরলীধরের থেকে কিছু ধীরগতি, বেশি অনুত্তেজিত? তার বই পড়া বেড়েছে।

যেমন এখন। এখন তো তাসিলায় ফুটবল নামছে, বরং অন্যবারের চাইতে বেশি উৎসাহে। বৃষ্টির তাড়া না খেলে কেউ মাঠ ছাড়ছে না। বৃষ্টি হয় না, হয় না। এদিকে বৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই বৃষ্টি মাথায় করে প্রভঞ্জনকে দুবার ট্যুরে যেতে হয়েছিল। প্রথমবার তার এক শিশু প্ল্যান্টেশন

থেকে বাড়তি জল ড্রেন কেটে বার করে দিতে। দ্বিতীয় বার অনুপস্থিত থেকে ডিএফওর সদর থেকে ফিরেছে। কনজারভেটর এসেছিল, কনফারেন্স ছিল। বিকেলে খেলার মাঠের পাশে দেখা হওয়ায় তারা মেয়র-বাংলোর খেলার ঘরে এসেছে।

মেয়র আলো জ্বেলে দিলে, তারা স্থির করলে, পোস্টমাস্টার-মেয়র, মেয়র-প্রভঞ্জন, প্রভঞ্জন-পোস্টমাস্টার, এমন ভাবে প্রত্যেকে তারা দুটো করে গেম খেলবে। বাইরে সন্ধ্যায় টেবলটার পালিশে আর শার্সির কাছে আলো চকচক করছে।

প্রথম দু গেম শেষ হলে, মুরলীধর বললে, আপনি কি জেন এয়ারের ক্লিনিকের কথা আর কিছু শুনেছেন? অসওয়াল ঠিক করেছে, সিমেন্ট, লোহালক্কর, টিন যত যা লাগবে, কলকাতার দামে সাপ্লাই করবে।

ও, মশায়, সে আর বেশি কথা কী? অসওয়ালদের এখানে যেমন, সদরেও একটা দোকান আছে আর সেটা হার্ডওয়ারের। সেখানে সে তো কলকাতার হোলসেল প্রাইস থেকে পনের পার্সেন্ট কম করে লাভ করে। সেই লাভের কিছু ছাড়লে পরিবহণ খরচ উঠে যাবে। পাঁচ পার্সেন্ট লাভ থেকেই গেল। এদিকে কলকাতার রিটেইল প্রাইসে সরবরাহ হল। কলকাতাতে হোলসেল থেকে রিটেইলে দশ-পনের পার্সেন্ট বেশি দাম থাকে।

মুরলীধর হেসে, রুমালে কপালের ঘাম মুছলে। ব্যাট গ্রিপ করে টেবলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শূন্যে কয়েকটি স্ট্রোকও প্র্যাকটিস করে নিলে। না মশায়, সিনিক হওয়া চলবে না। অসওয়াল পরিবার বিশেষ উপকৃত। আপনি কি শুনেছেন, অসওয়ালের বেটাবউএর সেই অসুখ টিবি তো নয়ই, হাঁপানি মতো হচ্ছে এমন ব্রংকাইটিসও নয়? মনের ব্যাপার আছে। ডাক্তার বলেছে, সেই স্ত্রীলোকটিকে পুজো করতে, জপ করতে।

সে সার্ভ করার জন্য বল হাতে নিলে। বলটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। স্থানীয় এক যুবতী তার স্বামীকে ভুলিয়ে নিচ্ছে, এই সন্দেহ থেকেই নাকি বলেছে--ধর্ম, পরোপকার এসব করতে থাকলে ওটা সেরে যাবে, বুকে মাথায় কষ্ট।

রেঞ্জার বললে, ও মশায়, তা হলে কিন্তু সেই ডাক্তার, জেন এয়ারই থাকছে। উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আঁকা মানুষ।

প্রথম গেমটা শেষ হলে প্রভঞ্জন দেয়াল বরাবর রাখা চেয়ারগুলোকে একটিতে বসলে মেয়রকে ব্যাটটা দিয়ে। গলা তুলে নরবুকে ডাকলে। নরবু নেই জেনে, মেয়রকে জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের ক্লাবে চা কফির যোগাড় কেমন? অনেকদিন আসা হয় না, ছাতা পড়েছে নাকি?

ময়ূর বললে, না, সার। নতুন কৌটো একটা আছে, আমি আনছি কফি করে।

ময়ূর চলে গেলে, পোস্টমাস্টার রেঞ্জারের পাশে গিয়ে বসল। বললে, তা হলেও, মশায়, যত বিচক্ষণ ডাক্তার হোক, নামটাই প্রমাণ করে কিছু ছদ্ম আছে এতে। আপনি কি শুনেছেন, জেন এখনাকার আদিবাসীদের জাতি, সংস্কৃতি, ভাষা এসব সম্বন্ধেই খোঁজ নিচ্ছে বেশি।

সে তো মিশনারিরা নিয়েই থাকে। এসব বিষয়ে কারো কারো ভালো বইও আছে।

মিত্রবাহাদুরের কাছে খবর পেয়েছি। সেই বলছিল, ধর্মে তেমন মতি নেই। কাউকে ক্রিশ্চান করা চেষ্টা নেই। নেপালিরা, ভোটিয়ারা, লেপচারা কী উৎসব করে, এখানে বিভিন্ন উপজাতির আনুপাতিক সংখ্যা কী, এসবই তার কৌতূহলের ব্যাপর।

ও, রেঞ্জার বললে, ইনট্রেস্টিং। এসব অন্তত একজন ক্রিশ্চান মিশনারি, এমনকি ডাক্তারের পক্ষে অলস কৌতূহল। মিত্রবাহাদুরের ভালো। তার ভাইপোকে চাকরি পেতে জাত দিতে হবে না।

মুরলীধর বললে, এই সীমান্ত ঘেঁষে নির্জন নির্বাসনে থাকার উদ্দেশ্য যদি এখানকার দীন আদিবাসীদের সংবাদ নেয়া, তা হলে ভাবতে হয় তার পিছনে গভীরতর কিছু থাকতে পারে।

সেই চীনাদের মতো বলছেন?

অথচ কোন প্রশ্ন না তুলে এখানকার স্বাভাবিক প্রতিরোধ যেন ধ্বসে যাচ্ছে।

মুরলীধর অনুভব করলে, কী দরকার এসব আলোচনা, যদি দেশের গুপ্তচর বিভাগ এসব দিকে লক্ষ্য না রাখে? ও দিকে আবার দেখো, মেয়রের গলায় যে সোনার হার দেখেছিলাম, ডম্বরির অসুখের সময়েই সে রকম হার জেন এয়ারের গলায় দেখেছি। কোন সহকারিতার চিহ্ন নাকি? সে নিজেকে বললে, মেয়র যদি-ই হয় তা হলে, পুলিশ অফিসার হয় না। এটা একেবারে অকারণে ভয় পাওয়া হবে কিন্তু। সে রেঞ্জারকে বললে, আসুন, সার্ব নিন।

আ, মশায়, কফির পরে হোক।

মুরলীধর বললে, আচ্ছা, মশাই, আপনার কি মনে হয় না, আমরা অনেক সময়ে অকারণে ভয় পাই?

সত্যিকারের ভয় যখন চারিদিকে গিজ গিজ করছে, তখন অকারণে ভয় পাওয়া বলি কি করে?

আপনার কি মনে হয় না, তাসিলায় যত লোক সকলেব মনেই কিছু না কিছু ভয়ের ভাব আছে?

মুরলীধরকে একটু ফ্যাকাশে দেখাল। সে হেসে বললে, তা হলে, মশায় আপনিও বাদ যান না, না? আচ্ছা আপনার দার্শনিক বইগুলো যে ডাকে আসে তার মধ্যে অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজির বই আছে?

ইয়ুংই বেশি।

কিন্তু তখনই মেয়র ট্রেতে তিনকাপ কফি নিয়ে এল। আর টাটকা কফির সুঘ্রাণ ছাড়িয়ে পড়ল আলোর নিচে।

প্রভঞ্জন বললে, মেয়র তোমার কফি?

এনেছি সার।

তা হলে, মাস্টারমশাই, তো যা বলেছিলাম, কেমন কি না? যখন কিছু নেই, তখন আমরা নিজের অতীতকে, অর্থাৎ চরিত্রকে ভয় পাই। এমন কি মৃত পিতাকে, পুরাণের গল্পকে। গ্রেগরি ক্রুস্টার পাগল হয়েছিল পুরাণের গল্পের ভয়েই কিন্তু।

বেশ গুছিয়ে কথা বলার সুখে প্রভঞ্জনের মুখ উজ্জ্বল দেখাল। কিন্তু মুহূর্তেই তার মুখের ভাব এমন হল, যেন সে দূরের কিছুকে চিন্তায় আনছে।

কফি শেষ করার পরে আর খেলা হল না। বরং নরবু আর রোজাকে একত্র দরজার কাছে দেখা গেল।

রোজাকে আজ একটু অন্যরকম দেখাল। তার পরনে লালপাড় কালো রেশমি শাড়ি যা সে মধ্যপ্রদেশীয় ঢঙে পরেছে। তার এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে একটা পিকলের শিশি। বোধ হয় বেরেনোর আগে স্নান করেছে। পিঠের উপবে খোলা চুল।

সে বললে, বরখা আউন্দাইছ।

নরবু তাকে সমর্থন করে বাংলায় বিশদ করলে, খুব জোরসে বর্ষা আসতে আছে।

এখন বর্ষা আর অভিনব নয় যে কারো ভিজতে ইচ্ছা করবে। তারা বুঝতে পারলে খেলাঘরের উজ্জ্বল আলোর নিচে সেই কবোষ্ণ উত্তাপে তারা বুঝতে পারে নি বাইরে কী ঘনঘটা হয়েছে। আগতপ্রায় সন্ধ্যা ফলে বেশ গভীর অন্ধকার। তারা নরবুর বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহারের চেষ্টায় হাসতে পারলে না।

প্রভঞ্জন বললে রোজাকে, ভালো আসছে, তাহলে বেরিয়েছো কেন? সেই থেকে সর্দিটা এখনও সম্পূর্ণ সারে নি।

রোজা বললে, নরবুকে দিয়ে শর্মা খবর পাঠিয়েছিল। মেমসাহেবের জন্য পিকল এসেছে।

মেমসাহেব দু বোতল নিয়েছে। ভালো। একটা আছে। যদি রেঞ্জ সাহেবের জন্য নেয়া হয়। আর যখন আনতে গিয়েছিলাম মেঘ ছিল না। এখন মেঘ দেখে মনে হল আপনাকে খবর নিই।

শব্দ-প্রিয় পোস্টমাস্টারের হঠাৎ কাজরী শব্দটা মনে হল। আর তাতে সে অবাক হল। কথাটার ঠিক অর্থ কী মনে করতে না পারায় একটু অসুবিধাও হল। বর্ষায় যুক্ত নারীকে তা বলে না কি?

মুরলীধর বললে, চলুন তা হলে।

প্রভঞ্জন বললে, অগত্যা। ভালো কথা, মেয়র বলতে ভুলে গিয়েছি। অথচ তাই বলতে এসেছিলাম দু-তিন দিনের মধ্যে স্কুল ইন্সপেক্টর সস্ত্রীক আসবেন। আজই চিঠি পেলাম ডিএফওর। তার সঙ্গে আর একজন থাকবে, কী জিলা শিক্ষা অধিকর্তা। জানিনা তা কী পদ। আমাদের সময়ে ছিল না। স্টেটরুম না। দু নম্বর তিন নম্বর ঘরদুটোকে নরবু যেন সাফসুতরো করে বাতাস খাওয়ায়।

চলুন।

প্রভঞ্জন অগ্রসর হল।

বাইরে সন্ধ্যায় বেশি অন্ধকার কিন্তু তেমন নয় যে সব রং এক হবে। ব্রিজটা সাদাই। মানুষগুলোর রংও সিলুয়েট—মাত্র নয়। হলুদ ভাবটা দেখা যায়।

ব্রিজের কাছে এসে প্রভঞ্জন মুরলীধরকে জিজ্ঞাসা করলে, তাকে ডাকঘর পর্যন্ত এগিয়ে দেবে কিনা।

মুরলীধর বললে, সে কী? এমনই গভীর রাত নাকি?

প্রভঞ্জন বললে, তা হলে টর্চটা নিন।

আপনাদেরও তো লাগবে।

আমার সঙ্গে পাহাড়িনী। অন্ধকারে ঠিক নিয়ে যাবে। আচ্ছা অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলোজির বই কাল সকালে।

সে রসিকতা না করে পারলে না। বললে, মশায়, আমার হাত পা ভাঙলে আপনি টরেটককা করে খবর দিতে পারবেন, আপনার তেমন হলে খবর দেয় কে?

তখন তারা মেয়র-ব্রিজ পার হয়ে রাস্তায়। এবার দু-দিকে দুজনকে যেতে হবে। প্রভঞ্জন যেতে যেতে থামল। আধ মিনিট দাঁড়িয়ে ভেবে বললে, একটা কথা কি, মাস্টারমশাই, সুচেতনাকে বলবেন, ছবিটা শেষ করতে না পেরে আমি দুঃখিত। বলবেন, কনফারেন্সের জন্য সদরে গিয়েছিলাম। কিছুদিন দেরি হতে পারে কিন্তু। আচ্ছা, না হয়, আমাকে একটু বকে দেবেন। বলবেন, আনাড়ি তো। বুদ্ধি ফুরিয়ে গিয়েছে। কি করে তোমাকে ফটোর চাইতে ভালো ফোটানো যায় ভেবে পাচ্ছেনা। যেদিন মাথায় বুদ্ধি আসবে, সেও দৌড়াতে দৌড়াতে আসবে। ছবিটা শেষ হয়েছে ভাবি, কিন্তু সই দিতে সাহস নেই। প্রভঞ্জন নিজের বলার কায়দায় হাসল।

২

রেঞ্জার আর রোজা ফরেস্টকলোনির দিকে পা বাড়িয়েছে। একটা পরিচিত মুল্যবান সেন্টের গন্ধের মধ্যে সেই অন্ধকারে মুরলীধর দাঁড়িয়ে পড়ল। সে অন্ধকারে তখনও পনের-বিশ হাত দুরের পরিচিত মানুষের হাঁটা চলা দেখেই চিনতে পারা যায়। হ্যাঁ, সেই স্প্রের সেন্টের গন্ধ। আর তা ছাড়া ওই তো রোজা আর রেঞ্জারও। রেঞ্জারের গায়ে সাদা চেক শার্ট এখন ধূসর। কিন্তু মাথার ফেল্ট টুপি বেশ বোঝা যাচ্ছে। কে আর এখানে সে ছাড়া এরকম টুপি ব্যবহার করে শার্টের সঙ্গেও? আর রোজাকে তো চেনা যাবেই। তার রেশমি শাড়ির পিঠে ব্রাশে উজ্জ্বল করা কালো চুলও যেন ঠাহর

হচ্ছে। সে ছাড়া কে এখানে চল্লিশ পেরিয়েও চুল খুলে দেয়?

কিন্তু তারা তো দূরে যাচ্ছে। হঠাৎ এই অবিশ্বাস্য অনুভব হল মুরলীধরের, সে একা পড়ে গেল।

কিন্তু সে নড়ে উঠল। দূর দুব, একি কোন ভয়ের ব্যাপার? বাসায় ফেরা তো। সে নিজেকে ঠাট্টা করলে, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো কেন?

এটা অবশ্য অনুভূতির ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সে এক মিনিটও তেমন দাঁড়িয়েছে কি না সন্দেহ। সেকি ভয় পেয়েছে যে অন্ধকারে পা বাড়াতে পারছে না?

দূর দূর, অন্য কথা ভাবো। ওই তো স্কুল ইন্সপেক্টর আর শিক্ষা অধিকর্তা আসছে। তার অর্থ, তাসিলায় স্কুল হচ্ছে এবার। এও এক পরিবর্তন। অবশ্যই হাইস্কুল নয়। হয়তো প্রাইমারি, যা পরে ক্লাস এইটের হতে পারবে। এতো বোঝাই যাচ্ছে, গৌণভাবে নানা কাগজে একের বেশিবার মালাধর বসুর লেখালেখির ফলও হতে পারে। শেষবার তো সে লিখেছিল, এখানকার ভোট কিন্তু প্রয়োজন হয়। অন্তত চাব হাজার ভোট।

অবশ্য, পাহাড়ে তার এক রকম ভয় আছেই। না হলে ঠাট্টার পরেও কেন সে হাত বাড়িয়ে টর্চ নিলে রেঞ্জারের থেকে? ওহো, তা হলে দেখো, তুমি ভয় না পেলেও তোমার মধ্যে থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিয়েছে। তা হলে সেই কাউকে কি চরিত্র বলবে?

সেই ঘন অন্ধকার যা দেয়ালের মতো নিরেট নয়, বরং স্বচ্ছতার জন্যই তার এক ভেদ আছে, তারপর রোজা, ভয়, চরিত্র, সেন্ট এমন বিচ্ছিন্ন শব্দ একত্র করে পরস্পর সংযুক্ত চিন্তাশ্রেণী তৈরির চেষ্টা করছে তার মনে।

থমথমে, গুমোট, অস্বচ্ছ অন্ধকার যেন তেমন, যেন যে যার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু নামতে চাইছে না। ও চরিত্র, সে ভাবলে, কী ডেঞ্জারাস! সেই ক্যাড হওয়ার ঝোঁক কার তা হলে? সেই অন্ধকার জলাশয়ের কালো এক প্রাণী, হয়তো বহুভুক, হয়তো আকারহীন, হয়তো সরীসৃপাকার বড়জোর।

সে একা একা বেশ জোরে হাসতে গিয়ে মাঝপথে ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকালে। না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এটা কি সত্য হতে পারে না, সে আর তার চরিত্র আলাদা- যেমন ধরো মালাধর আর মুরলীধর। একবার কিন্তু প্রমাণ হয়েছে, দুই-এর একজন ক্যাড।

সে চলতো শুরু করেছিল। তার বুকের মধ্যে ধুকপুক বাড়ায় সে তৎক্ষণাৎ যুক্তি দিলে, প্রাঙমুখর মনের সব চিন্তাই বুকের ধুকপুক।

সে তাড়াতাড়ি ভেবে নিলে, অন্ধকার, আলো চাই। সে হাসল, কেননা, তার মন কাজ করছে এরকম অনুভূতি হল। সে আবার হেসে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে টর্চ বার করলে। পথে আলো ফেলে পা বাড়ালে সে। সে নিজেকে শোনালে, অন্ধকার তো বটেই, তা ছাড়া বর্ষার পরে পাহাড়ি পথ। পথের ধারগুলো ভেঙে না গেলেও তলে তলে এমন ফেটে থাকতে পারে, পায়ের চাপে ভেঙে পঞ্চাশ-একশো ফুট নিচে পড়বে। দিনের বেলাতে সেই চুল চুল দাগগুলোকে এড়িয়ে পা ফেলা হয়। কারণ তার স্বরূপ বোঝা কঠিন। নিচে পড়ার একটা ভয় আছেই, পাহাড় থেকে অনেক নিচে কালোয় তলিয়ে যাওয়ার।

সে মনে মনে বললে, তাই বলে আমি কিন্তু চরিত্রর চাইতে কম হুঁশিয়ার নই। দেখো, টর্চের আলোটা কালো অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে চলার মতো সুড়ঙ্গ তৈরি করছে।

আর সেই সুড়ঙ্গে নিশ্চিত হয়ে চলতে পেরে সে ভাবলে ঃ

ও, রোজা। এটা কিন্তু আশ্চর্য, লালপাড় কালো শাড়ি, বেশ বেছে নেয়াই, হলুদ সাদা মুখ, আর তেমন রঙেই কাঁধ থেকে পরিপুষ্ট বাহু। ওদিকে কিন্তু সেই রোজা কখনই রেঞ্জার বা তার নিজের সমকক্ষ নয়। সমাজের চোখে কেন? সত্যিকারের বিচারেও, লেখাপড়া, টাকাপয়সা, রুচি,

নীতি—এসবেও। কিন্তু তা সত্বেও এসব সরিয়ে ফেলে কি করে যেন তাদের সমধর্মী হয়। সেটা কী? মনে বলছো? শরীরের আদিমতায় পৌঁছে?

সে টর্চের আলোটাকে ড্রিলেব মতো ঘোরালে। আরে, না, না। সে ভাবলে, চিন্তার বিষয় হিসাবে ওটা অকিঞ্চিৎকব। সত্যিকারের চিন্তা ছেড়ে ওরকম ভাবা। সে নিজেকে শোনালে, আসলে সেই খরার দিনে সব চিন্তা ভুলে থাকা গিয়েছিল ভয়ে। আবার ভয়েরও কিন্তু চিন্তাকে ঘুলিয়ে দেবার অভ্যাস আছে। এখন আবার ভাবতে হবে। কারণ এই তাসিলা পৌরাণিক কিছু নয়, আর কাব্যের শাংরিলাও নয়। ভয়টাও অবশ্য এক রকমের ঘুলিয়ে যাওয়া চিন্তা। চিন্তার সঙ্গে ভয়ও আসতে পারে। কিন্তু তাই বলে সেই সন্ধ্যায় কিন্তু ক্যাডের কাজ হয়েছিল। যদিও এখন তো বোঝা যাচ্ছে, সেই সন্ধ্যায় তখন ভয়ের চিন্তাগুলোকে দূরে রেখেছিল সে রকম রোজা।

বরং ভেবে ভেবে পথ চলতে হয়। সে টর্চকে নেড়ে নেড়ে পথ দেখলে। ওখানে পোস্ট অফিস থেকে কয়েক পা আগে রাস্তাটা খাদের ধারে বিশ্রি বাঁক নিয়েছে বলে নিচু পাথরের রেলিং। পথের বাঁ দিকে তারপরেই খাদ। টর্চের আলোয় সেই খাদ ধরা দিতেই সে অবাক হয়ে গেল। কী আশ্চর্য, ভয় ভুলতে সেই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ঘুরছিল কেন?

সে চোখ বন্ধ করে সেই রেলিংদার খাদটাকে পথের ডানদিকে সরে পার হল। পাহাড়ের খাদগুলোর একটা টেনে নেয়ার শক্তি থাকতে পারে এরকম মনে হয়।

৩

কাচে কালির প্রলেপ দেয়া থাকলে তার মধ্যে দিয়ে আলো যেমন চোখে পড়ে, এ অন্ধকারটায় এখন তেমন স্বচ্ছতা। বোধ হয় মেঘ সরে গিয়েছে পাশের পাহাড়ে।

রেঞ্জারের প্রথম যা মনে হল, তা, রং মিশিয়ে মিশিয়ে কি করে এই সন্ধ্যার রং তৈরি করা যায়! পরে পাশে রোজাকে দেখে মনে হল, বাহ, তা বটে, যোগাযোগের ফলে এই অন্ধকারে সে কালো রেশমি শাড়ি পরায় এই অন্ধকারের বৈশিষ্ট্য যেন সেই স্পষ্ট করছে। তার কাঁধ আর বাহু, মুখ আর গলায় হলুদ-ঘেঁষা রং এখন গেরুয়া, তার শাড়ি আর চুল যা অন্ধকারে চিক চিক করছে। কালো থেকে সোনালী কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না।

সে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলে? তুমি নিশ্চয় জানতে, পিকল, তা ফজলি আমের হলেও, আমার তেমন আগ্রহের নয়। শেরিংদের বাড়িতে কি?

রোজা বললে, হ্যাঁ, সাহেব। ওদের একটা ঝগড়া পাওনা ছিল। সেটা সেরে এলাম। বলে এলাম, ছেলের কাছে বেটাবউ থাকবে, আমি তাদের কাছে থাকতে গেলাম কেন, বউ বা আমার কাছে থাকতে গেল কেন? তাকিয়ে দেখো, আমার বাড়িটা তোমার বাড়ির চেয়ে উঁচু কিনা।

কথাটা রেঞ্জারের ধাঁধার মতো মনে হল। পরেই সে অনুভব করলে, এর মধ্যে কোন গোলমাল আছে। রোজা কি সত্যি স্থির করেছে, তার ছেলে-বউ যখন তার নিজের বাড়িতে থাকবে, তখন সে সেখানে যাবে না? কেউ কি স্বেচ্ছায় অধিকার ছাড়ে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, মেয়েটা কি খুবই ভালো? তবে?

অর্থাৎ কোন কারণে শেরিং রোজার ছেলেকে জামাই করতে চায়, কিন্তু রোজাকে আত্মীয় করতে যেন আপত্তি। রোজাও মেয়েটিকে পছন্দ। অথচ। অপবাদ? রেঞ্জারের মনটা ম্লান হল। অনেকেই এখন জানে, রোজা বেশির ভাগ রাতেই নিজের বাড়িতে ফেরে না? রাত করে ছবি আঁকার কথা না জানলেও। হয়তো ভাবে, শুধু পোশাক, সামান্য হাত খরচ, তার বদলে একটা গৃহের কর্ত্রীত্ব

পেয়েছে বলেই, কেউ এত প্রভুবশ হয় না। রোজা জিজ্ঞাসা করলে, স্কুলের ইন্সপেক্টর আসবে বলেছিলেন। আমাদের স্কুল দেখতে নাকি?

হ্যাঁ, তুমি বেরিয়ে গেলে, ডিএফও টেলিফোনে বলছিলেন, মঙ্গলবার নাগাদ আসবেন। আগে চিঠি পেয়েছিলাম অফিসে, তাতে দিন স্থির ছিল না।

রোজা বললে, আমার ভয় হচ্ছে, আপনার বদনাম না হয়।

প্রভঞ্জন যেন একটু অবাক হয়ে বললে, বদনাম? ও, হ্যাঁ, বদনাম।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তে সে হো হো করে হেসে উঠল। বললে, রোজা, ওটা যে স্কুল নয়, অর্থাৎ ইন্সপেক্টররা যাকে স্কুল বলে তা নয়, তা আমি আব তুমি ভালোই জানি। ইন্সপেক্টর দেখবে, ষাটসত্তরজন শিশু সমবেত হয়, একটা ঘর আছে, যাতে বর্ষাতেও জল পড়ে না, যাতে শীতের বাতাসে কাঁপতে হয় না, দেয়ালে কাচ থাকায় আলোর অভাব হয় না। তুমি এ বি সি ডি প্রাইমার পড়াও। শর্মা নেপালির পয়লা দুসরা কেতাব পড়ায়। কেউ হয়তো ছবি আঁকা শেখায়। তাতে সাহেব সম্বন্ধে ভয় কমে বন্ধু বন্ধু ভাবে মিশতে পারে। ছবি এঁকে গাছপালা, পাথর, ফুলপল্লব চিনে, বা সাহেবের হাত ছুঁয়ে কথা বলতে পেরে, যে মানুষ হওয়া তা দিয়ে কিছু হয় না।

কিছু হয় না। তা হলেও স্কুলটা ছিল তো। রোজা বললে।

রেঞ্জার ভাবলে, জেলার শিক্ষাকর্তৃপক্ষ হাতে নিলে, গ্রেগের বসানো এই স্কুল, যা ডিএফও ও রেঞ্জারদের উদারতায় চলছিল, তা নিশ্চয় থাকবে না। রেঞ্জারের মনটা ম্লান হল।

এই সময়ে তার মন কনফারেন্সের স্মৃতিতে ফিরে গেল। সেখানে একেবারে শেষদিকে বনবাসীদের জন্য শিক্ষার কথা উঠেছিল। আর তখনই কনজারভেটর জেলার শিক্ষা অধিকর্তা ও জেলা স্কুল ইন্সপেক্টরকে টেলিফোনে জাকিগঞ্জ ও তাসিলার স্কুলদুটোকে পরিদর্শন করতে আমন্ত্রণ ও অনুরোধ করেছিলেন।

কনফারেন্সের এক একদিনে এক এক সেশন। প্রথম দুই সেশনে কার রেঞ্জের কী অবস্থা, অ্যাফরেস্টেশন– প্ল্যানিং, যার সঙ্গে বোটানির জ্ঞান ও ইকোলজির সুন্দর ইনট্রেস্টিং ইন্টেলেকচুয়াল আলাপ। তৃতীয় সেশনে বনবাসী মানুষ, ক্যাজুয়াল লেবার কলোনি ও বনের পশুদের কথা। প্রতি সেশনেই গেট টুগেদার ছিল। মিডমর্নিং কফি ছিল, লাঞ্চ ব্রেকে কমিউনিটি লাঞ্চ ছিল, আর সে সব লাঞ্চে যার যা বিদ্যাবুদ্ধি দেখানোর তা দেখাচ্ছিল। যার যা গোপন রাখা দরকার তা গোপন রেখে, কখনও হেসে, কখনও হুঁ হাঁ করে চলেছিল। চতুর্থ দিনের সেশনটা জরুরী হয়েছিল, গুরুত্ব পেয়েছিল। সব রেঞ্জারকেই পোচিং ও স্মাগলিং সম্বন্ধে যার যার অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা হয়েছিল। ইভনিং সেশন ছিল সেটা। আলো ছিল, কনফারেন্সের মানুষগুলোর মাঝে মাঝে পাশের ছায়া পড়েছিল, কোথাও বা এক থাবা অন্ধকার। স্মাগলিং তো বনের কাঠচুরিকেও বলা যেতে পারে। বনের পথ দিয়ে সে সব পণ্য চলে, তার চাইতে অনেক মূল্যবান পণ্য এই কাঠ। বনের কাছাকাছি শহরগুলোর উপান্ত, বন ঘেঁষে ঘেঁষে, বিশেষ সে শহর যদি কোন রেলজংশনের কাছে হয়, অসংখ্য নতুন নতুন কাঠের গুদাম, কাঠ-চেরাই কল গজিয়ে উঠছে। একজন বললে, স্মাগলিং চিরদিনের ব্যবসা কিন্তু এমন প্রথাগতভাবে, নিয়মিতভাবে আগে কখনও হয় নি। একজন বললে, আর তা এমন রাজনীতির সঙ্গে, এমন কি কোন কোন মন্ত্রীর সঙ্গেও এরকম জড়িয়ে যায় নি। ভিজিল্যান্সের সাহায্যে কমানো সম্ভব কিনা, প্রশ্ন তুললে একজন। একজন তখন বলেছিল, বর্তমানে যা আছে তার দ্বিগুণ ফরেস্ট গার্ড, এবং তাদের প্রত্যেকের রাইফেল থাকলে আমরা চেষ্টা করতে পারি। মনে রাখতে হবে, কাঠের জন্য যারা বনে আসে তাদের কাছে পাইপগান, বোমা তো বটেই, আজকাল এমন কি স্টেনও থাকে। অনেকক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক কেডার ও অ্যাকটিভিস্ট। অন্য একজন বললে, আত্মরক্ষার জন্য ফায়ারিং করা যায়, কিন্তু তখনও প্রমাণ করতে হয়, ফরেস্টগার্ড

নিজে চূড়ান্ত বিপন্ন হয়েছিল কিনা, নতুবা নবহত্যার জন্য দায়রায় যেতে হয়। এদিকে আমরা কেউই ম্যাজিস্ট্রেট নই যে ফায়ারিং-এর অর্ডার দিতে পাবি। না, সে সেশনে কাঠচুরি বন্ধ কবার কোন বিশিষ্ট উপায় পাওয়া যায় নি।

পরের দিন সকলেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রভঞ্জন জাকিগঞ্জে থেকে গিয়েছিল। তাসিলাব ডিএফওর এলাকাতেই কনফাবেন্স, সে জন্য কনজাবভেটর ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তাসিলাব রেঞ্জাব তাসিলার ডিএফওর মতো কনজারভেটরের কাছাকাছি উপস্থিত ছিল। সেই পঞ্চমদিনেব রেস্টডের বিকেলে কনজারভেটর আর ডিএফওর কাছাকাছি গিযে দাঁড়িয়েছিল তাসিলাব রেঞ্জার। তখন তাসিলার রেঞ্জার প্রভঞ্জন দত্ত দেখতে পেয়েছিল, তার আর ডিএফওদের মধ্যে এক সিয়েনা বঙের ব্লক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আর সে এ পারে হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে।

তার রেঞ্জের গেটপাসের বইগুলোর কয়েকটি পোকা কাটা বলে ব্যবহার করা হতো না। এখন দেখা যাচ্ছে তাদেব দু-একটি করে পৃষ্ঠা নেই। এখন তো মনে হচ্ছে, সেগুলোর প্রত্যেকটাব সাহায্যে দু-এক লাখ টাকার কাঠ স্মাগল করা যায়।

সে ভাবছিল, এই কথাগুলো সে পরিষ্কার করে বলছে। কিন্তু বুঝতে পারছিল, একটা শব্দও তার মুখ থেকে বেরোচ্ছে না। হাত যতই শক্ত করে মুঠো করুক, কয়েক বার অন্তত গলা সাফ করেও, কী এক ধরনের রোগে তার গলা বন্ধ করেছিল। আর ঠিক তখনই সে শুনতে পেয়েছিল, ডিএফও, রেঞ্জারের তাসিলায় যে স্কুল আছে, তা নিয়ে কনজারভেটরের সঙ্গে আলাপ করছে। তারপর স্কুল নিয়ে আলাপ হতে থাকল। কনজারভেটরও জেলার শিক্ষা অধিকর্তাকে টেলিফোন করলেন। আর সে নিজেও সুযোগ পেয়ে তাসিলার সেই স্কুল সম্বন্ধে খুব খানিক বক্তৃতা দিয়েছিল। আর তা শুনে কনজারভেটর বলেছিল, তুমি তা হলে কাল থেকে যাও, দত্ত, ডি আই স্কুলের সঙ্গে কথা বলো। ভোটের সময় হচ্ছে। শিক্ষাঅধিকর্তাকে ইন্টারেস্টেড মনে হল। বিশেষ, যখন স্কুলের বাড়ি তুমিই দিচ্ছো।

মনের ম্লানতার এই এক স্বভাব যা থেকে সহজে বেরিয়ে আসা হয় না।

রোজা স্কুলের কথা তোলায় যে ম্লানভাব এসেছিল রেঞ্জারের মনে, তা যেন বরং আরও গাঢ় হল।

অবশ্যই সেই পাসের বইগুলোর সিরিজ বর্তমানের সিরিজের সঙ্গে মেলে না। গেটের বিট অফিসার পার্থক্য বুঝবে। নাকি সই দেখে কিংবা স্ট্যাম্প দেখে আর কেয়ার করবে না। এমন হতে পারে, অনেক আগে থেকে সেই বইগুলো পোকায় কাটা বলে তেমন পড়ে আছে, আর পৃষ্ঠাগুলো তখন থেকেই নেই। সে চার্জ নেয়ার আগেই সেই পৃষ্ঠা কয়েকটি সরানো হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এই দ্বিতীয়বার সে মুখোমুখি হতে পারলে না। সেদিন ভিজিল্যান্সে বেরিয়ে তার রেঞ্জের তিনটি গেটেই সে গিয়েছিল। কিন্তু রেজিস্টারগুলো চেক করতে পারে নি। তাতে তো গেটপাসের নম্বর লিখেই রাখা হয়। দেখলেই বোঝা যেতো গেটপাসের নম্বরের সিরিয়াল ভেঙেছে কিনা।

হয়তো কিছুই নয়। তা হলেও বাংলোর মধ্যে কালো কালো লার্ভা সব যেন নড়তে থাকে। কী ব্যাপার! স্মাগলড বিয়ার আসে ওপার থেকে। মিত্রবাহাদুর এনেছে, ববিজান এনেছে। যা দাম বলেছে, তাই দিয়েছে সে। কিন্তু দাম যে তারা কম নিয়েছে, তাও সত্যি। স্মাগলড কাঠের দাম দিয়ে পুষিয়েছে?

রোজার জন্য বিয়ার দরকার হয়ই।

রোজা বললে, দাঁড়ালেন, সার?

রেঞ্জার হাত বাড়িয়ে রোজার এক হাত নিজের হাতে নিলে। উষ্ণ, মসৃণ, পুষ্ট, কোমল হাত।

রোজা বললে, না, সার। পড়ে যাবো না। আর তা ছাড়া আমি চোখে তেমন কম দেখি না।

রেঞ্জার হেসে রোজার হাত ছেড়ে দিলে। বললে, কিন্তু জানো, রোজা, তোমাদের স্কুলটাকে স্কুল বলে স্বীকার করতে অন্তত হাইয়ার সেকেন্ডারি পাশ অন্তত দুজন শিক্ষক দরকার। এরকম বলেছে স্কুলের সেই ইন্সপেক্টর। নতুবা সরকারি টাকা দেয়না। কনজারভেটর কেন, ডিএফও বললেই কনট্র্যাকটর স্কুলের ঘর বাড়াতে পারে, পড়ুয়াদের বেঞ্চ ডেস্ক তৈরি করে দিতে পারে। ফরেস্ট যদি এসব করে দেয়, মাস্টারদের বেতন দেবে জেলা পর্ষদ। জেলা পর্ষদ ভোট পাবে, কনট্র্যাক্টার কী পাওয়ার আশা করে? যাবে, যাক, রেঞ্জার বললে, স্কুলটা তোমার আর শর্মার থাকছে না বোধহয়।

রোজা বললে, এস্ত হুনছ।

তারা তখন ফরেস্টকলোনির সীমায় নেমে স্ট্রিটলাইটিং-এর সীমাতেও ঢুকেছে। প্রভঞ্জনের মনে হল, সরকারি স্কুল হলে এখানকার শিশুরা চাকরিটাকরি পাওয়ার মতো শিক্ষার পথে যাবে, কিন্তু... আরে শর্মা তবু তো পুরোহিত হিসাবে কিছু উপার্জন করবে। শিক্ষক হিসাবে সে ত্রিশটাকা মাসে পেতো, সেটা কমবে। রোজা? স্কুলের আর কী পেতো। কতই দিতো ছাত্রেরা? আর কখনও ছাত্রদের কারো বাড়ি গেলে হয়তো খাতির করে হাতে গড়া দুখানা রুটি আর এক বাটি তরকারির ঝোল, হয়তো বা চায়ের বদলে এক গ্লাস বকসি। অথচ, দেখো, রোজা নিজের ছেলের সঙ্গে থাকার পথ বন্ধ করেছে। বেশ, না হয় বর্তমানে তার খাওয়া থাকার ভয় নেই। ভয় করে না রোজার? তার আর্মি পেনশন আর কত? পনের, বিশ...

রোজার অবলম্বনহীনতায় আঁকুপাঁকু করে উঠল প্রভঞ্জন।

রোজা বললে, সাহেব, অনেকদিন আগে থেকে আমার এক বোতল বিলাইতি মদ আছে। অনেকদিন আগে দামের জন্য এপ্রিলের মেলাতেও বিক্রি হয় নি। ভেবেছিলাম, ছেলের বিয়ের দিন শেরিংদের দেবো।

তো? এখন ঠিক করলে শেরিং তার উপযুক্ত নয়?

না, আজ আপনার রাতের খাওয়ার পরে নিজেই খাবো।

খেয়ো।

কিছুক্ষণ রোজা ভাবলে, কি করে বললে ভালো হয়। অবশেষে বললে, আপনার সেই টেবলের মাপের ক্যানভাসটা তোলা আছে।

তাতে কী বা আঁকা যায়? সেই তিনফুট বাই চারফুট ক্যানভাসটা বেমক্কা মাপেরই। সে রকম লম্বা কি ছবি হয়? তুমি, রোজা, বিলাইতি মদের কী বলছিলে?

৪

পোস্টমাস্টার আর রেঞ্জার চলে গেলে ময়ূর নরবুর খোঁজ করতে গিয়ে দেখলে, সে স্টেটরুম সাফসুতরো করছে।

ময়ূর হেসে জিজ্ঞাসা করলে, সে কী? রাত করে যে? তা ছাড়া সেই ইস্কুলের সাহেবরা তো এ ঘরে না, করিডরের ওপারে ছোট ঘরদুটি তাদের জন্য– ছোটসাহেব বললেন না?

নরবু জানালে, সে সব কিছু নয়। রাতে কম ধুলো ওড়ে।

তাই বুঝি?

তা ছাড়া ভলি বিহানে মেরো কাম ছই না?

সেজন্য রাতে কাজ সেরে রাখছিস?

নরবু বললে, নতুন কাজ বলে হাতে সে বেশি সময় রাখছে। কাল বিহানে সে ক্লুটলং-এর

মেমসাহেবের টিলায় যেখানে ওরা তারেব বেড়া দিয়েছে, তার পাশে পাশে নডচেনচন লাগিয়ে দেবে এক সারি।

ময়ূর বললে, তুই তো কাল বলছিলি, এখানে এখন সব বর্ষার ফুল লাগাতে হয়। তোর চনচন কি বর্ষার ফুল?

নরবু বললে, তা কেন? বর্ষার ফুলও লাগাবো। তার কাটিং আছে।

ডম্বরিব অসুখের সময়ে, তোর সেই ঠুলো ডাংদবের সঙ্গে দু-এক কথা হয়েছে। তার সেই টিলায় সে জন্য ফুলগাছ লাগাতে যাচ্ছিস?

নরবু জানালে, দুপুরে সে ক্লটলং গিয়েছিল। আর সেখানে মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা হল। ডম্বরিকে কবর দিয়েছিলাম। কিন্তু ফুল দেয়া হয় নি। না দিলে কি ভালো? সেই বাচ্চা মেয়েটাব যদি মনে হয়, সেখানে তার কেউ নেই। যদি সেখান থেকে চলে আসতে চায়?

ময়ূর অবাক হয়ে গেল। নরবুদের মনে মৃত সম্বন্ধে ভয় থাকতে পারে। কিন্তু সে ভয়ে কেমন একটা স্নেহের ভাব মিশছে না? চার্চের একটেরে নিছক মাটির উপরে একটা রঙীন গোলালো পাথর চাপা দেয়া সেই কবর। চার্চেব প্রথম কবব। আর সেই গোলালো পাথর যেন ডম্বরির প্রতীক। ময়ূর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কিন্তু নরবু গল্প করার জন্য কাজ থামিয়ে এগিয়ে এল। বললে, সে দেখে তাজ্জব বনেছে। হাসপাতাল হতেছে। যে ঘরমা ডম্বরি থাকতে ছিল তার চুনকাম ভয়েকছ। মেমসাহেব দাঁড়িয়ে কাজ করাচ্ছেন। পিডবলুর এঞ্জিনিয়ার পনি দেখতে আসেছেন। মিস্ত্রি দরজা জানলা করতে আছে। পুরা স্টার্ট ভয়েকছ। কিন্তু এক বাৎ। সাঁঝ ভয়ে সবাই ঘরে চলি যায়, তখন মেমসাহেব একদমে একা।

না একদম একা বোধহয় নয়। বোধহয় কাছাকাছি নামগিয়াল, শর্কি আর থেনডুপ থাকে এখন। তবে বাংলোতে একাই। যাক গে। ঘরদোর কাল মুছিস। খেতে হবে তো। রান্না করিগে চল।

নরবু বললে, ময়ূরকে আদৌ রান্না করতে হবে না। তরখার ডাল সিদ্ধ করাই আছে। এই আলমারিটা ঝাড়া হলেই সে রান্না ঘরে যাবে। পাঁচ-ছটা ধাঁউসা ভাজতে আর কত সময়?

ময়ূর পায়ে পায়ে তার শোবার ঘরটায় চলে এল। এখন তার কোন কাজই হাতে নেই। খানিকটা সময় একেবারে চুপচাপ বসে থেকে উঠে পড়ল। চুপচাপ বসে থাকা খুব কঠিন। বসলে না ভেবে থাকা যায় না। খানিকটা পায়চারি করে সে স্থির করলে, আজ খেতে বসেই সে নরবুকে বলে দেবে, সে আজ রাতে না হয় ক্লটলংএই ঘুরবে। তা হলে তোর মেমসাহেবের ভয় থাকবে না।

কিন্তু এটা তার চিন্তার বিষয় নয়। লক্ষ্যহীন হয়ে সে নরবুর ভাষার কথা ভাবলে। তরকা নামে বেশ কালো শুকনো ডাল, ধাঁউসা মানে চমরীঘিয়ে বাদামি করে সেঁকা, মোটা, ভিতরে নরম রুটি। এসব যেমন নরবুর তৈরি, নামগুলোও বোধ হয় তারই দেয়া। সুবিধা এই, শীতকালে একবেলা অন্তর রান্না করলে দুবেলা চলে যায়।

কিন্তু সে দেখতে পেলে, নরবু স্টেটরুমের আলো নিবাতে ভুলে গিয়েছে। সে সুতরাং স্টেট রুমে গেল। সে দেখলে নরবু ফার্নিচারগুলো ভালো মুছেছে। বিশেষ কাবার্ড। গুলদার মেহগ্নিতে মেহগ্নি পালিশ। যেন কাচ এমন চকচকে। এ ঘরের উপযুক্ত বটে। কিছুক্ষণ আগে রেঞ্জারসাহেবের জন্য কফি করতে কফির টিনের খোঁজে একবার খোলা হয়েছিল। কফির কৌটো সেই রিনিমেমসাহেবের রেখে যাওয়া। এতদিনে শেষ কৌটোটাকে বার করলে। ও, আর, সেই দুই বোতলই আছে। কী আশ্চর্য, সেই মদ যা বোতল বেয়ে গ্লাস বেয়ে ফেনায় গড়ায়।

তো, নরবু যেমন বলছিল, পরশুদিন সেও তেমন গিয়েছিল ক্লটলং-এ। লিম্বু নামে একজন তাকে এসে বলেছিল, মেমসাহেব ডাকছেন। সে তো পায়চারি করতে করতে অনুভব করছিলই। ডম্বরির অসুখ, ডম্বরির প্রাণের জন্য আশঙ্কা, তার রোগ ছড়িয়ে পড়ার ভয়, এসব নিয়ে আলাপ হয়েছেই

তো। কিন্তু জেনের সামনে তার কি নিজের থেকেই একবার গিয়ে দাঁড়ানো উচিত ছিল? সে তো এখন নিশ্চিতই জেনেছে, সেই সোনার হার যার ছিল সে নেশার ঘোরে পথভোলা, নেশা ছুটে যাওয়া হিপি নয়। ভয় ছিল, এখন ভাবতে গেলে বলা যায় না, কার ভয় বেশি ছিল।

আবার সাহসও কিন্তু। ডম্বরির সেই ভয়ঙ্কর রোগটার কথা ভাবো, যার ভয়ে তাসিলা আর কলকাতা পর্যন্ত তোলপাড়, সেই রোগকে নিজের শোবার ঘরের পাশে নিয়ে যাওয়া। যেন নরম হাতের শক্ত মুঠে রোগটাকে ধরে রেখে আর সকলকে বাঁচিয়ে দেয়া।

অন্যদিকে দেখো মৃত্যুর সামনে কেমন অবিচল। ভয়তো নেই-ই, এমন কি দুঃখও নেই। কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই এসেছিল, ডম্বরির মৃত্যুর খবর দিতে সেই সেদিনের সকালে। তখন শুধু কর্তব্যর কথাই মনে ছিল। শেষবারের মতো সেই মৃত্যু থেকে রোগ না ছড়ায়।

তাই বলে অনুভূতি তার পাথর হয়ে গিয়েছে, এমন নয়। ডম্বরিকে সেই পৃথিবীর ভিতরে রেখে আসার পরে তার দিকে তাকিয়ে জেনের মুখে উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, এরকম করে নিঃশ্বাস নিচ্ছো কেন? সব সময়েই কি এরকম করে নিঃশ্বাস নাও? তা কি করে হয়... যেন ডাক্তারি চোখে তাকে দেখতে উৎকণ্ঠায় বলেছিল, কথা পরে হবে। এখন বরং বাথে যাও। এই পোশাক ছেড়ে ফেলে রেখো বাথেই। স্নানই করে নিও ডিজইনফেক্ট্যান্টে। তোমার সেই স্যুটটা ধোয়ার পরে তোলা আছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি। তখন স্নান শেষ করে এসে সে দেখেছিল, সকলেই চলে গিয়েছে। ডম্বরির বাবা-মা এক পাশে বসে কাঁদছে। তা ছাড়া সেই বাংলোয় জেন একলা।

ময়ূরের হঠাৎ মনে হল, একজনের কি কারো কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত? তার মনে হল, পরশুদিন লিম্বু ডেকে নিয়ে গেলে, সেই যে জেনকে দেখেছিল তার আগে যেন তাকে সে দেখে নি। তা অবশ্যই ঠিক নয়। অন্য কিছু মনে নাই এল, সেই মদের বোতল আর হরিণরাং-এর দিন নিশ্চয় দেখেছিল জেনকে। জেন আর ক্লুটলং-এর কথাই মনে এল তার।

ক্লুটলং-এর বাংলো থেকে কিছু দূরে সেই কাঠের আউটহাউস যেখানে ছিল, সেটাকে ভেঙে ফেলে সে জমি থেকে শুরু করে টিলার দিকে এগিয়ে একটা আয়তক্ষেত্রর বাহু বরাবর কোদাল আর গাঁইতি দিয়ে নালি কাটছে যেন কয়েকজন। যেখানে মাটি সেখানে সোজা, যেখানে বড় পাথর পড়েছে তাকে হয়তো তুলে দিতে হচ্ছে, নতুবা, তার গা কেটে কেটে সেই নালির তলদেশের সমানে আনা হচ্ছে। একটা টিনের শেডের তলে কাঠমিস্ত্রিরা দরজা জানালা তৈরি করছে। তাদের থেকে একটু দূরে কয়েকজন শ্রমিক পাথর কেটে কেটে চৌকোণ চেহারার ব্লক ঘনক তৈরি করছে। তাদের কাছাকাছি, কিন্তু একটু ফাঁকায় রঙীন গাউনে একটা বেতের চেয়ারে জেন। তার পাশে সে রকম আর এক চেয়ারে এক ভদ্রলোক।

জেন উঠে দাঁড়িয়েছিল। বললে, এসো, মেয়রসাহেব। এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে জেনেছি। তাই না এঞ্জিনিয়ারসাহেব? তুমি ভালো সময়ে এসেছো মেয়র, বিকেলের চায়ের কথা ভাবছিলাম। আসুন বিরিঞ্চি, এসো মেয়র।

বাংলোর পার্লারের একপাশে সাদায় ঢাকা টেবলের পাশে চেয়ার সাজিয়ে চা-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। টেবলের কাছে তৃতীয় একটা চেয়ার টেনে বিরিঞ্চি ও ময়ূরকে বসতে বলে জেন থেনডুপকে খবর দিলে। থেনডুপ তো প্রস্তুত ছিলই।

চা খেতে খেতে জেন বললে, আমাদের অবশ্যই এঞ্জিনিয়ারসাহেবকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। তিনি না এলে আমরা কাঠের খুঁটির উপরে টিনের চালা করতাম বরাবর। এ ভাবে পাহাড়ের ঢাল অনুসারে ভিতের জমি কেটে বাড়ি তোলা যায় কল্পনাতে আসতো না। এখন দেখো, কংক্রিট পিলার কংক্রিটের বেজ-বাইন্ডারের উপরে পাথরে গাঁথা প্লিন্থ উঠবে। এখানকার জমি সমতল নয়। সব জায়গায় সমান শক্তও নয়। আমি এখনই প্রতিষ্ঠার তারিখটারিক সমেত একটা মার্বলপ্লাক প্লিন্থে

গেঁথে দেয়ার কথা ভাবছি।

এঞ্জিনিয়ারের কাজ শেষ হয়েছিল। সে চায়ের পরপরই বিদায় নিয়ে নেমে গেল।

জেন তখন বলেছিল, এরা এখনও একঘণ্টা কাজ করবে। নামগিয়াল এদের টাকাপয়সা দেবে। চলো, একটু ঘুরি। তার পাকদণ্ডি ঘুরে ঘুরে ক্লুটলং-এর সেই টিলায় উঠেছিল। যা নাকি কোন এক সময়ে এক বাগিচা ছিল।

জেন বললে, এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক বেশ ভালো আর কোয়ালিফায়েড সিভিল এঞ্জিনিয়ার। সমস্ত বাড়িটাই তাঁর প্ল্যান। কোনদিক দিয়ে কোন করিডর, তার কোন দিকে কোন ঘর, তাদের দরজা জানলা কটা কোনদিকে হবে, সবই যেন দেখতে পান এখনই। কিন্তু একটা মজা জানো, তুমি আসার আগেই বলছিলেন, এখানে পাপী ছাড়া নাকি আর কেউ আসে না। তিনিও নিশ্চয়ই পাপী, নইলে এরকম জায়গায় তাঁর চাকরি হবে কেন? আমিও কম যাইনি, বললুম নরকে কি এমন ঘাস দেখা যায়? গাছে এমন ফুল? পাহাড়গুলো এমন বেগনী আর নীল হয়? সেখানে তো শুনি সব আগুনে লাল আর পোড়া খয়েরি। এঞ্জিনিয়ার তখন বললে, স্বর্গ আর নরকের বাইরে এটা এক জায়গা যাকে এখনও আমরা চিনতে পারছি না। এটা ভালো, এই চিনি না বলা। কোথায় আছি তা কি চিনি আমরা?

পাকদণ্ডি বেয়ে বেয়ে এ ধাপ থেকে ও ধাপে চড়ে তারা টেরাসে টেরাসে ঘুতে লাগল। কোন কোন ধাপে, উচ্চতা ঠিক অনুমান না হওয়ায়, জেনের উঠতে অসুবিধা হলে ময়ূর হাত ধরে দু-একবার সাহায্য করলে।

জেন দেখালে, কোথাও স্কোয়াশ, কোথাও শশা ইতিমধ্যে সবুজ লতায় ছড়াচ্ছে। কোথাও রাইশাক ইতিমধ্যে ঝোপ বাঁধছে। কিছু দূরে এক অপেক্ষাকৃত সমতল এক চত্বরে কাঠের মসৃণ দেয়ালের, খড়ের ছাদের নিচু নিচু দু-তিনটি ঘর। দেয়ালের কাঠ বাদামি, ছাদের খড় হলুদ। ঘরগুলোর সামনে ছোট এক বার্চ গাছের নিচে দু-তিনটি রোমশ পাহাড়ি গোরু। জেন পরিচয় দিয়ে বললে, এটা থেনডুপের। সে এবং তার স্ত্রী বুড়ো। তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়েই বা আর কী হবে? থেনডুপ তো আমার কাজ করেই। তা ছাড়া এই ভাবে আমার প্রয়োজনের দুধ ঘি আর শাক যোগান দেয়। লিম্বুর বয়স কম। তার কোটরি আরও উপরে। প্রায় একশো ফুট উপরে। লিম্বু তার তিন-চার একর মাটিতে আলু লাগাবে। কেমন ভালো বন্দোবস্ত নয়।

কথার পিঠে কথা। সে নিজে জিজ্ঞাসা করেছিল, আর নামগিয়াল?

জেন বলেছিল, সে তো একেবারেই বুড়ো, আরও নিচে তিন একর জমি তাকে নিতে বলেছি। সে ঘর করবে না। চার্চের ট্র্যানসেপ্টে যেমন ঘুমায়, তেমনই নাকি ঘুমাবে। সে চাষ করতেও পারবে না। সুযোগ পেলে সেই তিন একরে পেয়ারা, কুল, কমলা, এসব গাছ লাগাবে। কুল নাকি এখানে গোল না হয়ে লম্বাটে আর মিষ্টি হয়।

এক জায়গায় জেন একটা পরিচ্ছন্ন চ্যাটালো পাথরে পা ঝুলিয়ে বসল। ছোট ছোট হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। জায়গাটা টিলার উচ্চতর অংশগুলোর একটা। বেশ পরিশ্রমই হয়েছে উঠতে। এখান থেকে তাসিলার ঘরবাড়ি বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। শুধু আকারে ছোট আর ঘন সন্নিবিষ্ট বোধ হয়। তার উপরে রুপোলি-ধোঁয়াটে মেঘগুলোর কোন কোন অংশ গলানো পিতলের রং নিচ্ছে।

জেন বললে, ফিরি চলো, সন্ধ্যা হবে।

বাংলোতে পৌঁছালে জেন আর একবার চা খাওয়ার প্রস্তাব করলে। আর সেরকম চা খেতে সে ভিতরের দিকে একটা ঘরে গিয়ে বসেছিল। যেখানে ডিভান পাতা, সেখানে একটা শেলফে বেশ কিছু বই। আর একটা আলমারিতে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি যা কাচ দিয়ে দেখা যায়। তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে জেন নিজে সেই নিচু ডিভানে বসেছিল। থেনডুপ চায়ের সরঞ্জাম এনেছিল আর

জেন চা বানিয়েছিল। ততক্ষণে কারিগর মিস্ত্রিরা দিনের কাজ সেরে যে যার গৃহে।

কিন্তু থেনডুপ আসাব আগেই উঠে গিয়ে একটা সেলাই নিয়ে এসে বসেছিল জেন। সেলাই শুরু করে সে বলেছিল, আসলে আমার থেনডুপ আর লিম্বু কেউই কৃষিকাজ জানে না। লিম্বু ওদিকে এক গ্রামে গিয়েছিল, সেখানে শুনেছে এখন আলু লাগালে ডিসেম্বরে তা উঠবে। বলেছি, তা হলে গ্রামের থেকে কাউকে এনে তার সাহায্যে লাগাও তবে।

সে নিজে জিজ্ঞাসা করেছিল, এটা কি আপনার নিজের গাউন?

প্রায় ধরেছো, আসলে এটা বোকু। এখানকার ভুটিয়া আর লেপচা স্ত্রীলোকেরা পরে। আচ্ছা, মেয়র, এখন তো তোমার সঙ্গে সেই রাইফেল নেই। আচ্ছা তুমি কি রোজ রাতে তেমন করে ঘুরে বেড়াও? যেখানে ভয় আর অন্ধকার?

ভয়? ও হ্যাঁ, ভয়।

জেন একটু তাড়াতাড়ি সেলাইতে চোখ নামিয়েছিল। আর তখনই থেনডুপ চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকেছিল। জেন চা করেছিল। চা খাচ্ছিল তারা। কিন্তু কী জরুরী দরকারে লিম্বু তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তা বলে নি। সে মনে করলে, চা খেতে জেন বলেছিল, তুমি, কিন্তু, জানো, খুব কম বয়সে মেয়র হয়েছো। অনুমান একুশ-বাইশ হয় কি না হয়। আর কী সুন্দর নীল নীল ইম্পিরিয়াল! তুলিতে আঁকা। তুমি কি জানো, তোমার চুলের এক গোছা বাদামি রোদে প্রায় সোনালি দেখায়। আর কী টল! আমি, কিন্তু, তুমি জানো না বোধহয়, তোমার আট-দশ বছরের সিনিয়ার। তার মনে পড়ল, সেই সময়ে, তখনই প্রথম, চোখ মেলে জেনকে দেখেছিল।

সে ভাবলে, লোকে শুনলে হাসবে, কিন্তু মুখের ভাষার মতো শরীরের একটা ভাষা আছে। আর সে ভাষা অস্পষ্ট নয়। আর তার এ চিন্তাও সত্যি। তার আগে আর কবে জেনকে দেখেছে সে? সেই ভয়ের রাতে আধ-অন্ধকারে তখন ভীত এক হিপির মতো, পরে ভয়ে যাদের সমবয়সী করেছিল তেমন পরস্পরকে দেখা ; তখন সে হিপিও এক ভয়ে দিশেহারা, সেও তো তখন সে রকমই ; সদ্য যুবতী মনে হয়েছিল, ভয়ে তো নিজেকে কিশোরের মতোই অনুভব হয়ে থাকবে। তারপর সেই মেয়র-বাংলোয়, সে তো বিস্ময় আর বিস্ময়। তার পরেই ডম্বরির অসুখের আড়ালে সে তো জেন ডাক্তার। বিচক্ষণ, বুদ্ধিদীপ্ত, পটু, কঠোর, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের সমকক্ষা একজন। হয়তো ডাক্তারের পক্ষে একটু দয়াশীল, হয়তো অনুভূতিপ্রবণ। ডম্বরির অন্ত্যেষ্টি তার কথামতো হয়েছিল। যখন সেই হতভাগিনীকে মাটির গর্তে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হচ্ছিল, তখন জেন থেনডুপ আর তার স্ত্রীর পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সে নিজে চোখের জলে কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। তখন চোখ তুলে দেখেছিল, সেই ডাক্তার যে তখনও সম্ভবত রোগ যাতে না ছড়ায় তা ভাবছে, তার চোখ চশমার নিচে ভিজে উঠেছিল।

কিন্তু পরশুদিন চা খেতে জেন তেমন বললে, সে নিজে বলেছিল, তা হবে ম্যাডাম, আপনি যেমন বলছেন।

কথাটা কী তা সে বুঝতে পারছে না। যে সুন্দরী সে সব অবস্থাতেই সুন্দরী। কিন্তু পরশুদিন চোখ মেলে সে যা প্রায় দেখেছিল তা সেই রূপের উপরে অন্য কিছু।

ময়ূরকে ভাবতে হল শব্দটাকে মনে আনতে। অবশেষে সে স্থির করলে শব্দটা বোধ হয় মর্যাদা।

মানে, মানে রাজকুমারী একরকম আর রানী একরকম। এ বোধ হয় রানীর মতো ব্যাপার। বেশ কাছের রানী।

আচ্ছা, ম্যাডাম, তার মনে পড়ল, সে চা খেতে খেতে বলেছিল, আপনি ভয়ের কথা বলছেন। থেনডুপের বাড়ি হয়েছে সে রাতে বাড়ি যাবে। লিম্বু নিশ্চয় তার কোটরিতে থাকে। বললেন, নামগিয়াল চার্চে ঘুমায়। ম্যাডাম রাতে বাংলোয় একা থাকেন। ম্যাডাম, একটা রাইফেল কিনে নিলে

ভালো হতো। এরকম রাইফেল আমি একজনের হাতে দেখেছি। চোংটা নিকেলে মোড়া রুপো-চকচকে, মাছিটা বোধ হয় সাদা কাচের, আধ-অন্ধকারে মণির মতো চকচক করে। বাইশ বোরের রিপিটার। কিন্তু রিভলবারের চাইতে হালকা।

জেন ম্যাডাম তখন ঝিরঝির করে হাসলে। বললে, আ, আমার মেয়র, তা হল তুমি আছো কেন?

এই বলে যেন তাকে আশ্বস্ত করতে সেই ঘরের কোণে দাঁড় করানো এক লোহার শিককে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। একটু মোটা শিকটা যার একমাথা চোখা, ধারালো, অন্যমাথা গোল করা।

কী আশ্চর্য, সেই আগুন খোঁচানোর লোহা কি নির্জনতার ভয় থেকে কাউকে রক্ষা করে! কিন্তু সেদিন, ময়ূর ভাবলে, লিম্বুদের বাড়ি আর চাষ, হসপিট্যালের প্ল্যান ছাড়া আর কী দরকারি কথা হয়েছে? ভয় করে কিনা তার– এরকম একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু তা ভাবতে গেলে তো এই প্রশ্ন ওঠে, সে তবু তো এক শহরের মাঝখানে থাকে, আর তিনি তো সীমান্ত ঘেঁষে নির্জনতাকেই বেছে নিয়েছেন। এখন তবু তো লিম্বু আর থেনডুপেরা কাছাকাছি। তার আগে? তুমি জানো না কিন্তু অনুমান করতে পারো। এই নির্জন বাংলোয় রাতের পর অন্ধকার রাত একা কাটানো ভয়ের ব্যাপারই। কিন্তু তা জেনেও সেই ভয়ের মধ্যে সে থাকতে পারে। ওই আগুন খোঁচানো লোহাটা আর কী নির্ভয় দেবে? অথচ সেই একরাতে কী অসম্ভব ভয় পেয়ে, এখন তো বোঝা যাচ্ছে, ক্লুটলং ছেড়ে ট্রেনে উঠেছিল। সে তো পালাতেই। আবার ফিরে এসে সেই নির্জন বাংলোতেই।

তা হলে, সে কি সত্যি এক অলৌকিক ভয় ছিল, তা নির্জন বাংলোয় লোকালয় থেকে দূরে থাকতে যে ভয় পায় না তাকেও দিশেহারা করেছিল? আর মনে হয়েছিল, কোন একজন মানুষকে ছুঁয়ে না থাকলে বাঁচা যাবে না।

করিডরে এসে সে আলো জ্বাললে। তখনই রোজা যে বর্ষার কথা বলেছিল, শার্সিতে তার আঘাতের শব্দ শুনতে পেল। আলো আর শব্দ একসঙ্গে তার মনে ঢুকে এক বন্ধঘরের দরজা খুললে। সে কিচেনের দিকে যেতে যেতে নরবুকে ডাকলে। কিচেনের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলে। কনুই পর্যন্ত ময়দায় সাদা করে নরবু তার ধাঁউসার ময়দা মাখছে।

৫

রোজার রান্না হয়ে গিয়েছিল। রাত আটটাতেই সে রেঞ্জারসাহেবের টেবল সাজিয়ে দিল। প্রভঞ্জন যখন খেতে বসছে, রোজা জিজ্ঞাসা করলে তার নিজের খাবার এই টেবলে আনতে পারে কিনা।

প্রভঞ্জন বললে, তোমাকে যেন গোড়া থেকেই সে রকম বলেছি। দিনের বেলা হয় না। রাতে এক সঙ্গে খেলে ক্ষতি কী? রোজা আর কথা না বলে, রান্নাঘরে গিয়ে কাঁধ উঁচু এক প্লেটে দুখানা চাপাটি, একটু লালচে আলুসিদ্ধ, এক কোয়া সাদা রসুন নিয়ে টেবলের এক প্রান্তে বসল।

প্রভঞ্জন দেখে হেসে বললে, এই নাকি তোমার খাওয়া? তা হলে টেবলের এই এত আমার জন্যে করেছ কেন?

রোজা বললে, আমি এর বেশি খেলে শুধু মোটাই হব। আর আপনি কম খেলে আর বাড়বেন না।

প্রভঞ্জন হো হো করে হেসে বললে, আমি কি ত্রিশের পরেও বাড়ার বয়সে আছি?

রোজা বললে, তো, সার, আপনার ওই প্লেট থেকে একটা কাঁচা লঙ্কা দিন।

সেইভাবে খাওয়া শুরু হলে রোজা বললে, সাহেব, আপনি কি কখনও আমাদের দেশের আঙুরের

মদ খেয়েছেন?

কোথায় পাবো? তা ছাড়া বিয়ারই আমার পক্ষে ভালো। তোমার রকসি একদিন খেয়ে জ্বলে মরি।

রোজা বললে, আমার কাছে এক বোতল গ্রেগসাহেবের মদ আছে।

গ্রেগসাহেবের। সে তো তা হলে আটদশ বছরের পুরনো। সে হয়তো এতদিনে ভিনিগার হয়ে গিয়েছে।

রোজা বললে, তার চাইতেও পুরনো। আমি পেয়েছিলাম পঁয়ষট্টি সালে। তারও কয়েক বছর আগে বোতলে ভরা হয়ে থাকবে।

এখনও না খেয়ে রেখে দিয়েছো।

আপনি অনুমতি করলে, আজ খাওয়া যায়।

তুমি পঁয়ষট্টি সালে পেয়েছিল, তা হলে গ্রেগসাহেবের মদ হল কি করে? গ্রেগসাহেব কি পঁয়ষট্টিতে এখানে ছিলেন সুস্থ অবস্থায়?

রোজা বললে, এখানকার মদ নয়। দেরাদুনের। গ্রেগসাহেব দেবেন কেন? সে তো দিয়েছিল সেই পঁয়ষট্টিতে দেরাদুনে এক ক্যাপটেন, যুদ্ধে যাওয়ার আগের রাতে। এখনকার মদও নয়। তখন আমার বয়স ত্রিশ। অনেক হালকা ছিলাম। আর সে মদ খাওয়াও হল না। আমার দ্বিতীয় স্বামী, আমার ছেলের বাবার শিয়ালকোটে মৃত্যু হয়েছে, সেই খবরও এসেছিল আমাদের সেই রাতের মদের ডিনার শুরু হতেই।

আচ্ছা রোজা, তোমার এই দ্বিতীয় স্বামী...?

আমার দ্বিতীয় স্বামী ছিল কুমায়ুনের হাবিলদার। আমার পঁচিশে সে বিয়ে হয়েছিল। দেরাদুনেই থাকতাম তখন।

আর তোমার প্রথম স্বামী?

আহা বেচারা! তখন আমার চৌদ্দ হয়েছে কি না। এখানকার সৈন্যদলের এক আদ্ধা সাহেব লেফটেন্যান্ট ছিল। তার সঙ্গে দেরাদুনে ডেরা হয়েছিল আমার। কিন্তু বাঁচল না। আমার কুড়ি হতে হতে বাপ আর তার মেয়ে পকসে চলে গেল। সে মেয়ে থাকলে এতদিনে ক্লটলং-এর ডাক্তার, আপনার-- এরকম বয়স হতো। ক্লটলং-এর ডাক্তারের মতো খয়েরি চুলের সুন্দরী হতো।

তারপর তুমি এখানে ফিরলে কখন?

সে তো সাতষট্টি হবে। ছেলেটাকে আট-নও বছরের নিয়ে, যার এখন বিয়ের কথা শিরিং গিরিধরের মেয়ের সঙ্গে। সেই ছেলে আর মদের বোতল, দ্বিতীয় স্বামীর কিটব্যাগ আর পিন্সানের কাগজ নিয়ে এখানে ফিরেছিলাম।

সেই মদের বোতল তখন থেকে রেখেছো?

কী করবো? সেই ক্যাপটেনও লাহোরের কাছে মরেছিল। এখানে যখন এলাম তখন আমার বয়সই বা কত? ত্রিশ পার হয়ে দুই বছরই হল। মদটা বিক্রির চেষ্টাও করেছিলাম। তা মদটা আর আমার বোধ হয় একই সালে জন্ম। এপ্রিলের মেলায় পর পর তিন বছর, আমার তখনও দোকান ছিল, দোকানে রাখলাম। রকসি বিক্রি হয়, কিন্তু সেই মদের দাম বুঝে কেউ আর তা কেনে না।

প্রভঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে এটা গ্রেগের মদ হয় কি করে?

সেই সময়েই তো গ্রেগসাহেব এখানে। আমি কী বা জানতাম? এখন থেকে নও-দশ বছর আগে সাহেবের সঙ্গে একদিন দেখা হল। তখন আমার মনে হল মদটা একদিন কাজে লাগবে, গ্রেগসাহেবের নামে ওটাকে তুলে রাখলাম, যদি কোনদিন ভালো মদ চান।

সেই থেকে তুলে রেখেছো? কী রকম বা আছে!

রোজার খাওয়া আগেই হয়েছিল। প্রভঞ্জনের খাওয়াও শেষ হল। রোজা টেবল সাফ করতে করতে হেসে বললে, না খেলে বলা যায় না। বোতলের গায়ে তারিখ থাকে। কিন্তু না খেলে কি করে বোঝা যাবে?

তাও কী হয়? আমার বিয়ারের মাগ আছে, তোমার রকসি খাওয়ার গ্লাস আছে। ভালো মদ খাওয়ার আলাদা রকমের গ্লাস। তা কোথায়? না থাক। আনোতো দেখি, এখানেই আছে নাকি?

রোজার টেবল সাফ করা হয়েছিল। সে রান্নাঘর থেকেই শাড়িতে মুছতে মুছতে একটা সবুজ রঙের বোতল নিয়ে এল। আশটেপৃষ্টে তার জড়ানো। গালাসিল দিয়ে মুখ বন্ধ।

প্রভঞ্জন হাতে নিয়ে বললে, রসো, এতো সিল ভাঙতে হবে, তার কাটতে হবে, কর্ক স্ক্রু দিয়ে খুলতে হবে। তুমি দুটো কাচের গ্লাস আনো।

মাথার উপরের সেই উজ্জ্বল বালবটার নিচেই খাওয়ার টেবল। যে বালবটা ছবি আঁকার সময়ে জ্বালানো নিয়ম। রেঞ্জার তার বিয়ার ক্যান খোলার কম্বাইনড কাটারটাকে বার করলে দেরাজ থেকে। বোতলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে, যেন সে মদের কনেশর, আসলে উল্টো, মদকে ভয়ই পাচ্ছে, সে কাটার থেকে ছুরি খুলে গালা সিলকে ঠুকে ঠুকে আলগা করলে, প্লায়ার্সের মতো এক ফলা দিয়ে তার কাটলে। সে বেশ সম্ভ্রমে এগোচ্ছে সেই চল্লিশের বেশি বয়সী মদের দিকে।

রোজা দুটো গ্লাস নিয়ে এলে সে কর্ক স্ক্রুব ফলাটা খুলে কর্কটাকে না ভেঙে বার করতে পেরে সুখী হল। ওয়াইন গ্লাস হলে মাপ বোঝা যায়, বিড় বিড় করে এরকম বলে নিজের জন্য সিকিগ্লাস সেই রঙীন মদ নিয়ে বোতলটা রোজাকে দিয়ে বললে, তোমার মদ, তুমিই এগোও। রোজা তার গ্লাসটাকে প্রায় পুরো ভরে নিল।

প্রভঞ্জন বরং, বেশ ভালোই তো বলে, যতক্ষণ সিপ করছে, রোজা কী করে দেখতে গিয়ে দেখলে, রোজা তার সেই পুরো গ্লাস প্রায় খালি করে ফেলেছে। দ্বিতীয়বার নিজের গ্লাসে তিন আঙুল মতো ঢেলে নিয়ে সিপ করতে করতে গ্লাসের উপর দিয়ে প্রভঞ্জন দেখলে, হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে রোজা দ্বিতীয়বার তার গ্লাসটা ভরে নিলে। যেন জল মিশিয়ে রকসি খাচ্ছে। সে মনে মনে বললে, আহা সেই ৬৫ সাল থেকে, নিজের ত্রিশ থেকে, এই ৭৯ পর্যন্ত যা খাওয়া হয় নি, আজ তা খাচ্ছে। গ্রেগের নাম করে আর কত ধরে রাখবে? কিন্তু তার মনে হল, রোজা আজ খুব উত্তেজিত, কিংবা সে রকম ঝপ ঝপ করে গ্লাস শেষ করে তার চোখদুটিকে সে রকম আয়ত আর উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

সে বললে, রোজা, ওরকম খেয়ো না। দেখো বোতলটাকে, সিকির বেশি খালি হয়েছে। তোমার চোখ ইতিমধ্যে লাল হয়েছে। একি দোলের রকসি? এর নেশা বেশি হয়।

তা সত্ত্বেও রোজা আর একবার আধগ্লাস ঢেলে নিলে, হাসল। বোধহয় বললে, আর খাবো না। সে টেবল থেকে উঠে পড়ল। প্রভঞ্জন সেই সুযোগে বোতলে কর্কটা চাপিয়ে দিলে। রোজার রকসিতে অভ্যস্ত শরীর টলল না। সে সেই আধভরতি গ্লাস হাতে বিছানায় গিয়ে বসল। যেন তাতে মদ থেকে দূরে থাকা হয়। কিন্তু বসে মদটা খেলে। গ্লাসটা কোন রকমে মেঝেতে রেখে বললে, আজ কিন্তু গরম।

সে বিছানায় পা তুললে, যেন শুতে ইচ্ছা করছে। সে পটপট করে ব্লাউজ খুললে, ব্রা খুললে, প্রভঞ্জন বললে, করো কী? রসো পর্দা টেনে দিই দরজায়।

পর্দা টেনে দিয়ে ফিরতেই সে দেখলে, রোজার শাড়ি মাটিতে। সে বললে, আঁকার মতো নয়, সাহেব?

রোজা সব খুলে ফেলে বিছানায় বাঁ পাশে শুয়ে পড়ল।

এরকম মনে হল প্রভঞ্জনের, কেউ তাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করছে। সাদা বিছানায় ওই চাঁই

চাঁই সোনাও বটে। সে মাথা ঝাঁকালে। বিড়বিড় করে বললে, একেবারে নতুন নয় অবশ্য। চিত হলে টিশিয়ানের মাজা, তার তা নকল করে, একটু বা বদলে আরও কতজন। সে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে চেয়ারটায় বসলে। কিন্তু তখনই এদিক ওদিকে চাইল। দেয়ালে খাড়া করে রাখা সেই লম্বাটে ফ্রেমটা তার চোখে পড়ল। তার মনে পড়ল, এই ফ্রেমটার কথা রোজা যেন আজই কখন বলেছিল। ধুলো পড়েছে। সে তো রঙের আগে ঝাড়লেও চলে। আর তা ছাড়া রেনোয়া, তারও তো সেই মেডসার্ভেন্টকে মডেল করে সোনালি ন্যুড। আর তা বোধ হয় পাশ ফিরে। সে চারকোল হাতে নিয়ে বললে, রোজা, কাইন্ডলি বাঁবাহুটা একটু উপর দিকে তুলে মাথাটা রাখো তাতে। হয়েছে, রসো, এক কাজ করো। ডান হাঁটুটাকে একটু গুটিয়ে হাঁটু দিয়ে বিছানাটা ছোঁও। অর্ধেক ঢাকা পড়ুক। নিজেকে বললে, না, সেরকম কিন্তু নয়। যেমন সেই ভিনাস থেকে আজ পর্যন্ত লোভানোই করা হয়েছে, সে রকম নয়। আচ্ছা রোজা, ডানপাটাকে হাঁটু না নাড়িয়ে বাঁপায়ের উপর দিয়ে দাও, যাতে বাঁপায়ের গোড়ালির কাছে ডানের আঙুলগুলো থাকে। মানে, একই রেখায় থাকলে সুবিধা। দুপায়েই আলতা আঁকার সুবিধা হবে। আর গলাতেও লাল কারে একটা কালচে পদক দেবো। সে নিজেকে বললে, আসলে ভিনাস নয়, মাজা নয়। সে রংটাকে এরকম করবে যাতে রাফ হয়। ভিনাস নয়, কোমল নয়, মাটি খুঁড়ে পাওয়া সেই আনাড়িভাবে পাথর কেটে তৈরি সেই মাদার ফিগারিনে যে ভাব।

হেনরি মুর যে রকম শক্তির ভাব আনে। তা তো বটেই। তাসিলা ছাড়া কোথায় এমন পাবে!

সৌন্দর্য দেখে বেহিসাবে চলতে গেলে খাদে পড়ে মৃত্যু না হোক, হাত পা বলে কিছু থাকে না। একটু পাথুরে কর্কশতা চাই ব্রাশে। মানে প্রিমিটিব মাদার।

সে গলা তুলে বললে, এখন তো গরমই। বরং গুমোট। শীত লাগছে না নিশ্চয়। তোমার কালো চুলগুলোকে কিন্তু আমি খয়েরি করবো, আর কালো চোখকেও তাই। তাড়াতাড়ি করছি। ঘুম পেলেই বলবে। স্কেচ তো, দেরি হবে না। এখানে ঘুমিয়ে পোড়ো। আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে যাবো। থ্যাঙ্কু।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

১

রেঞ্জার বললে, হ্যাঁ মশায়, সময়কে স্রোত বললে, তার প্রপাতকেও জানতে হয়, কুয়াশায় ঢাকা প্রপাত। অদৃশ্যতায় ঢাকা সেই প্রপাত শুধু দ্রুতগতি নয়, পতনও।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, অনুভূতির এরকম ভাষায় প্রকাশ তখনই সম্ভব, যখন অনুভূতিটার যন্ত্রণা কমাতে পরিবেশ কিছু হালকা, কিংবা অনুভূতি তার যন্ত্রণা নিয়ে চলে গিয়েছে, ভাষা তাকে অনুসরণ করছে।

পরপর দুদিন ছুটি। ১৯১৯ সেপটেম্বরে সে রকম ছুটি দুর্গাপূজারই হবে। আর তা মাসের শেষ দিকে। সেই ছুটির দিনদুটির প্রথমটির সকালে রেঞ্জার পোস্টঅফিসে এসেছিল। আর সেখানে এসে তার অনুভূতি হয়েছিল, পূজার ছুটিতেও সে তাসিলায় থেকে যাচ্ছে। তার অফিসেও তো সে ছুটির চাপ সামলাতে অস্থির। আরও বিস্ময়, দেখো, পোস্টমাস্টারও ছুটিতে যাচ্ছে না।

এই অনুভূতিকে ঢাকতেই ক্যালেন্ডারের লাল অঙ্কের তারিখগুলোর কথা উঠেছিল। আর তাতেই

বাকপটু পোস্টমাস্টার বলেছিল, আগে সেই তারিখগুলোকে সময়ের নৌকো মনে করে ওঠা যেতো যেন। এখন এই ত্রিশে এসে সময়কে দুর্বার স্রোতই দেখি, তারিখগুলো নৌকার মতো প্লবণ করে না।

এর উত্তরে রেঞ্জার প্রপাতের কথা তুলেছে।

সে জানালে, দুপুর পর্যন্ত সুচেতনার পোরট্রেট নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবে আজ, যদি সুচেতনা সম্মত হয়।

প্রভঞ্জন ইজেলের কাছে গেলে, তখন সকাল নটা, মুরলীধর সুচেতনাকে খবর দিয়ে, আমি কেন বসে থাকি, বলে বেরিয়ে পড়ল।

মুরলীধর ক্লুটলং-এ চলেছে। এসময়টায় তেমন শীত নয়। তার পরনে হালকা শীতের পোশাক। তার কাঁধঝোলায় মাইবং-এর আদিবাসীদের কাছে থেকে সংগ্রহ করা একটি মুখোশ। মাইবং-এর আদিবাসীরা এ অঞ্চলে এখনও মুখোশ নাচ নাচে। সে এই মুখোশটিকে তেমন মূল্য দিলে হাত ছাড়া করতো না। মুখোশটা জেন এয়ারের জন্য সংগ্রহ করা। ইতিমধ্যে একদিন জেন এয়ারের সঙ্গে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে তার আলোচনা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা একটু অন্যরকমে হয়েছে।

প্রভঞ্জন তার লাইল্যাক উওম্যান ছবিতে যেন বার্নিস দেবে এমন ভঙ্গিতে ইজেলের উপরে আলো জ্বেলে বসেছিল। সুচেতনা খবর পেয়ে কফি আনলে। কফি খেতে খেতে প্রভঞ্জন তার রং তুলি সাজিয়ে নিলে। কোথায় বার্নিস? সে তো আবার নতুন করে আঁকার তোড়জোর।

এটাকে লক্ষ্য করো, সুচেতনার ছবি আঁকা শুরু করার পর থেকে প্রভঞ্জনের রঙের কেস, তুলির চোং, ইজেল সবই মুরলীধরের বাসায়। অর্থাৎ সে রোজাকে আর মডেল করছে না, আঁকছে না তাকে। এক মডেলকেই চিরকাল আঁকবে এমন কথা নেই।

মুরলীধর ফরেস্টকলোনি পার হয়ে গ্রেগ অ্যাভেনুতে পা দিয়ে ভাবলে, এর আগেও একদিন সে কেলেঙ্কারি করেছে। সেই স্কুল পরিদর্শকরা আসার পরের দিন সকালে। সেদিনও প্রভঞ্জন এসেছিল, সেই মৃগমাংস লাঞ্চের দিন। ছুটির দিন ছিল না। সেদিনই প্রভঞ্জন নতুন করে সুচেতনাকে আঁকতে শুরু করেছিল আবার। আর সে, মুরলীধর, বলেছিল, আপনি আঁকুন। শুনেছি, বাজারে ইতিমধ্যে নতুন মুলোশাক, মেথিশাক উঠেছে। আনতে বেলা তিনটে করেছিল, যদিও সে শুনতে পেয়েছিল, সুচেতনা প্রভঞ্জনকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করছে, আর প্রভঞ্জন তা যেন সাগ্রহে গ্রহণ করছে। ভাবলে মুরলীধর, আজ সেরকম করলে চলবে না।

২

গল্পটাকে পিছিয়ে গিয়ে বলা দরকার।

স্কুল পরিদর্শকরা এসেছিল। একেবারে প্রস্তাব মতো হয়নি। জেলা স্কুলপরিদর্শক তার সহকারীকে না এনে, বরং জেলা শিক্ষাপর্ষদের সভাপতিকে এনেছিল। পরিদর্শক প্রথম সুযোগেই প্রভঞ্জনকে কানে কানে বলেছিল, টাকার ব্যাপারে সুবিধা হবে। পরে বুঝেছিল প্রভঞ্জন, বিদ্যার ব্যাপারে সেই বিদ্যাহীন রাজনীতির মানুষকে আনতে হওয়ায় পরিদর্শকের কোথাও লজ্জা ছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা তাসিলার লোকদের পক্ষে স্মরণীয়। আগন্তুকদের পোশাক পরিচ্ছদ, তাদের চেহারা, তাদের পনি চড়ার ভঙ্গি এসবই লক্ষ্য করছিল তারা। কিন্তু তারা সুন্দর চেহারা ও পোশাকের পরিদর্শক, ততোধিক সুন্দরী, পুষ্টাঙ্গী, খুশি মুখ পরিদর্শকের মেম সাহেবের সঙ্গে, কালো শিড়িঙ্গে,

বেমানান সুটের লোকটিকে পরিদর্শকের পরিচারক মনে করেছিল। এই ভুল করার দলে সুচেতনাও ছিল। সে তার বসবার ঘরের জানলার নিচে তিনটি পনি, তাদের আরোহী ও তাদের তিন সহিস দেখেছিল। তাদের মতো নগণ্য পাহাড়ি লোকদের জানার কথা নয়, শিক্ষার ব্যাপার শিক্ষিতরা নিয়ন্ত্রণ করবে—সে দিন গত হয়েছে।

পরিদর্শকদলের এটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু দলে মেমসাহেব থাকাতে সন্দেহ থাকে না, তাদের ভ্রমণসুখের ইচ্ছাও ছিল।

দেখো সেই মেমসাহেবকে। কালো সানগ্লাসের নিচে রক্ত লাল ঠোঁট, নীল সিল্কের স্ল্যাকস। মেটে লাল সোয়েটার, ফলে ত্রিশ-অতিক্রান্ত প্রচুর বুক, ও বিশেষ পুষ্ট নিতম্ব চোখে না পড়ে পারে না।

সভাপতি পাহাড় পর্বত সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা ও অকুতোভয়তা প্রমাণ করতে একবার বললে, এই সেদিন, পাঁচ বছর হয় নি, অখিলভারত বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভায় সে বেজওয়াদায় গিয়েছিল। প্রচুর পাহাড় সেখানে।

পরিদর্শকের স্ত্রী যোগাযোগের ফলে পিতার কর্মস্থল হিসাবে বেজওয়াদা বিশাখাপটনম অঞ্চলে দীর্ঘদিন ছিল। সে বললে, তা বেজওয়াদার পাহাড় তো—

সে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলে, বললে, আমি বোধ হয় অন্য বেজওয়াদার কথা বলছি। সভাপতি স্ত্রীলোকের এই নিবুদ্ধিতার প্রমাণে হেসে বলেছিল, তা হয় না। বেজওয়াদা একটাই। আপনি অনেকদিন আগে দেখে থাকবেন। আমি যখন দেখেছি তখন সে পাহাড়গুলো বেশ বড় হয়েছে।

সভাপতি আর্গুমেন্টে জেতার উত্তেজনায়, হাতের কাছে চাপড় দেয়ার মতো টেবল না থাকায় পনির পেটে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে ফেললে। সেটাও হঠাৎ নাক ঝেড়ে ছোট্ট একটা দৌড় দিল। তার সহিস যে একটা ছোট সপল্লব ডাল নিয়ে পনির পিছনে সেখানকার মাছি তাড়াচ্ছিল, সেও হৈ হৈ করে দৌড়াল।

পরিদর্শক ভাবলে, পর্ষৎ দপ্তরের রাজকীয় প্রকাণ্ড চেয়ারে মুখের দিকে না চাইলে যে নিতান্ত শুঁটকো, চেয়ারের ঘেরে হারিয়ে যায়, মুখের দিকে চাইলে যে দস্তুর ভয়ঙ্কর, সেই সভাপতি যেন কোন সেন্টের সুবাসে অন্যরকম হয়ে উঠছে।

পরিদর্শককে দেখে মনে হল সে যেন বিনিপয়সার মদের আশায় অভিভূত। চোখে তন্ময়তা। ঠোঁট আর জিভে যেন সেই এখনও অনুপস্থিত মদের স্বাদ পাচ্ছে।

পরিদর্শকের মহিলা বললে, আহা কী দৃশ্য! যদি সত্যজিৎ আর মৃণাল সেনের ক্যামেরা—পনির পিঠে তার দু হাত, দুপা ছড়ানো, পাহাড়ের অনাস্বাদিত পৌরুষের সামনে তার মুখে সলজ্জ সুখ।

পরিদর্শক বা তার স্ত্রী অন্তত দার্জিলিংএও একবার যায়নি বললে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কিন্তু পাহাড়, বন, সভ্যদেশ থেকে এসে অসভ্যদেশ আবিষ্কারের সুখ, সে সব শহরে থাকে না। আর এমন সমাদর। এক নম্বর বাংলোতেই তো থাকার বন্দোবস্ত। স্টেটরুমটা না দিলেও, যথেষ্ট সুন্দর সব ঘর, নরম সাদা বিছানা, রাগ, যথেষ্ট গরম জল, প্রচুর ব্রেকফাস্ট, দামি ক্রকারি।

স্কুল তো শুধু নামে। এমন দুজনের পরিদর্শন করতে আর কতটুকু সময় লাগে! লাঞ্চের অনেক আগে তা শেষ করে তারা তাসিলা শহর দেখতে বেরিয়েছিল।

পরিদর্শকের মেম বললে, এমন কিছু কি কাছে শহরে, যা এখানকার স্মৃতি হতে পারে? পরিদর্শক বললে, লোকে বলে এখানকার হাতে তৈরি নাকি একরকম আছে, যা বেশ সাদা হলেও শীতের পক্ষে বেশ কড়া।

প্রভঞ্জন বুঝলে, সে বিষয় রকসি ছাড়া আর কী হতে পারে? সে জিজ্ঞাসা করলে, লাঞ্চেই না ডিনারে?

সভাপতি বললে, ডিনারে ভালো হয় না?

সুতরাং তারা যখন বাংলোয় ফিরে লাঞ্চের আগে কফি খেয়ে নিচ্ছে, প্রভঞ্জন, রোজাকে তাদের সুবিধা দেখতে রেখে, ববিজানের কাছে গিয়েছিল। ববিজান তাকে বসিয়ে গেন্দা সিংএর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে দু বোতল রাম, দু টিন বিয়ার পাওয়া গেল। বিয়ার বিদেশি, তা লেবেলেই প্রমাণ।

এখন, পাহাড়, অরণ্য, শিকার, মোরগ ঝোল, ফিশ ফ্রাই, সবই শিক্ষিত কালচার্ড বড় শহরের মনে সুদূর ও বিপুলের ডাক দিতে থাকে, তা নিয়ে উপন্যাস সিনেমায় অরণ্যের দিন ও রাত্রি হয়।

লাঞ্চেই সভাপতি বললে, বেশ আপনাদের চাকরি, সার। বন, জঙ্গল, শিকার। প্রভঞ্জনের মনে পড়ল, সে যেদিন পরিদর্শকের ঘবে এখানকার স্কুল দেখতে আহ্বান করতে ঢুকেছিল, পরিদর্শক বলেছিল, বেশ, মশাই, জীবন আপনাদের, আর্ডেন অরণ্যে আছেন। হরিণ পেলেন, বনের ডালপালায় আগুন জ্বেলে রোস্ট হয়ে গেল। সে নাকি দারুণ সুস্বাদ। প্রভঞ্জন বললে, কাল ভোরের দিকে চেষ্টা করলে বনমোরগ আর তিতির পাওয়া যায়। পরিদর্শক বললে, কাল সকালে তো চলেই যেতে হবে।

সভাপতি বললে, হরিণটরিন হয় না, সার? সে তো রাতেই হয়, শুনেছি।

সুতরাং বিকেলের রোদ পড়তেই তাবা বেরিয়েছিল। এমন কি পরিদর্শকের স্ত্রীও, পনিতে পাহাড়ে ওঠার ক্লান্তি সত্ত্বেও। এমন গা শির শির করা অভিজ্ঞতা কতবার আসে? হরিণ শিকার?

হরিণ পাওয়া কঠিন নয়। রেঞ্জার জানতই, বিরিক ব্লক থেকে বাঁ হাতের বনে ঢুকতে থাকলে পাহাড়ের সেগুন প্ল্যান্টেশন হয়েছে। সেখানে পুড়িয়ে দেয়া ঘাসবনে বর্ষার শেষে আখের অঙ্কুরের মতো নতুন ঘাস। সেখানে হরিণের একটা দলকে সে নিজেই দেখেছে। সুতরাং টার্গেট লক্ষ্য করেই তারা অগ্রসর হয়েছিল। রেঞ্জার, পরিদর্শকের দল, এবং ময়ূর ও নরবু।

সন্ধ্যার রং, হরিণের গায়ের রং এক হতেই হরিণও দেখা দিয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে রেঞ্জার যেমন করে, তা হল। পরিদর্শক ও সভাপতি হরিণকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার সুখ পেলে, অনেক ঝোপ-ঝাড় গুলি খেলে, অবশেষে চাঁদ যখন হরিণরঙের অন্ধকারের উপর দিয়ে উঠেছে, শিকারীর দল পাহাড়ের পথহীন পথে চলতে সাহস পাচ্ছে না, একটা ঝর্নার ধারে প্রভঞ্জন বললে, একবার দেখবে নাকি মেয়র? আপনারা চাঁদের আলোয় ঝর্নার ধারে বসুন।

ঝর্না ডিঙিয়ে ময়ূর আর নরবু চলে গিয়েছিল। পরিদর্শক আকাশ, চাঁদ, পাহাড় দেখছিল। গাছের নিচে শুঁটকো সভাপতি পরিদর্শকের মহিলার পাশে বসে পড়েছিল। উত্তপ্ত ঘাসের গন্ধ আর মহিলা সেন্টের গন্ধ মিশে কেমন এক ঘনতা। সে জনতার জীবনের শরিক হতে পারে, গোলগলা সোয়েটার যেখানে স্তনদ্বয়ের জন্য উঁচু, সৌরভটা যে সেখান থেকে, তা কি সে বোঝে না? তার শুঁটকো শরীর কেঁপে কেঁপে গোপনে ঘোঁত ঘোঁত করছিল।

আধঘণ্টা বাদে পরপর দুটো গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল। এর পর প্রায় বিশ মিনিট বাদে নরবু আর ময়ূর ফিরলে, প্রভঞ্জন বললে, আহা, দুটো, মেয়র।

পরিদর্শক বললে, কী মজা, দুটো।

ময়ূর বললে, সরি সার। দ্বিতীয়টা প্রথম দিককার আন্দাজি গুলিতে কি করে উনডেড হয়েছিল। ঘা হয়ে মরতো। সে জন্যই।

রেঞ্জার দেখলে, একটার তখনও খোলা চোখে চাঁদের আলো প্রতিফলিত। টানা সেই কাজলপরা চোখের কোণে শ্লেষ্মা কিংবা শুকিয়ে ওঠা জল।

বাংলোয় ফিরতে রাত নটা হয়েছিল। বনে বসে ছাল-ছোলা এনজয় করতে করতে, সভাপতি প্রস্তাব করলে, শিং-সমেত মাথাদুটো নেবে সে। বাঁধিয়ে রাখবে বসবার ঘরে স্মৃতি করে। প্রভঞ্জন

বললে, যদি বলেন আপনার শিকার, তা হবে অপরাধের প্রমাণ। আমি বরং বিস্কুটের বড় টিনে প্যাক করে অনেক মাংস দিয়ে দেবো আপনাদের সঙ্গে।

ডিনারের জন্য মৃগমাংস যা নাকি পরিদর্শকেব ভাষায় ভেনিজোন, তা নতুন করে রান্না করতে সময় লাগল। রোজা পরিদর্শককে ড্রিঙ্কসের কথা জিজ্ঞাসা কবলে। আর্মি রামের কথা শুনে তখনই সভাপতি কিছুটা খেলে। ফলে রাত এগারোটায়, হরিণরোস্টের ডিনারে বে-এক্তিয়ার হয়েই বসল সে।

ডিনার শেষ হয়েছে। রেঞ্জার তখনও নিজের বাংলোয় যেতে পারেনি। তার অতিথিরা ডিনার টেবলে বসেই হিক্কা তুলছে। রাত্রি, পাহাড়, অরণ্য, আরণ্যক এসবের প্রভাব থাকেই। প্রভঞ্জনের ভয় হচ্ছিল, বমি না করে।

রেঞ্জার পার্লারে ঢুকে দেখেছিল, পরিদর্শক-মহিলা ও রোজা গল্প করছে। রেঞ্জার হাসতে হাসতে বললে, ঘুম পাচ্ছে না, ম্যাডাম? বিয়ার খাবেন? বেশ নির্দোষ কিন্তু। রোজা, কিচেনেই তো বিয়ার, আনিয়ে নাও না হয়। সাহেবরা রাম খাচ্ছেন।

ময়ূরকে সচেতন থাকতে বলে, নিজের বাংলোর উদ্দেশ্যে বেরোতে আবার পার্লারের পাশ দিয়ে যেতে শুনলে সে, রোজা বলছে, তাতে কী, ম্যাডাম? কর্তাদের মুখে রামের গন্ধ এত বেশি, আপনার মুখে বিয়ারের গন্ধ ধরা যাবে না। আমরা তো খেয়েই থাকি এখানে।

সকালে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা ছিল। কিন্তু রওনা হতে বেলা হল। বড় বড় বিস্কুটের টিন যোগাড় করে প্রায় আধমণ করে মাংস তাতে ভরে দিয়ে, তার জন্য চতুর্থ পনি যোগাড় করে তাদের রওনা করা হয়েছিল। অনভ্যস্ত পেটে আর্মি রাম সহজপাচ্য নয়।

রওনা হওয়ার সময়ে সভাপতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, পুজোর বন্ধের শেষেই দুজন শিক্ষক জয়েন করবে তাসিলার স্কুলে। হিলট্রাইবের কোটা থেকে স্কুলের বাড়ির জন্য টাকা দিতেও অসুবিধা হবে না।

পরিদর্শকের মহিলাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। যেন উন্মনা, যেন নীল, মলিন, প্রসাধন সত্ত্বেও। রেঞ্জার পরে রোজাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বেশ মেজাজের সঙ্গে বললে, পাপ বুঝি পাহাড়ি মেয়েরাই শুধু করে? বিয়ার কেন, রকসিও খেয়েছে। জিজ্ঞাসা করছিল, পাহাড়ি মেয়েদের অন্য পুরুষ নিতে সঙ্কোচ থাকে না কেন? তা বললাম, রকসি খেলে সেই স্বাদ বোঝা যায়।

তারা চলে গেলে প্রভঞ্জন বাড়তি মাংস, সে অনেকটাই, তার ব্যবস্থা করার কথা ভাবতে গিয়ে স্থির করলে, নরবু খানিকটা পোস্টমাস্টারকে দিয়ে আসবে আর ময়ূর অধিকাংশ নিয়ে ক্লুটলং যেতে পারে। সকলকে সে মাংস দেয়া যায় না।

নরবুকে পোস্টঅফিসে সে রকম পাঠিয়ে, সে ময়ূরকে বললে, তুমি দুটি কাজ করো। অফিসে খবর দাও, আজ আমার জ্বর। বিকেলে চিঠিপত্র ফাইল-সমেত বাংলোয় পাঠাবে। তুমি হরিণের রাংটাকে ক্লুটলং-এ দিয়ে এসো।

এই বলে সে নরবুকে অনুসরণ করে পোস্টঅফিসে গিয়েছিল।

৩

অফিসে রেঞ্জারের ট্যুরের খবর দিয়ে এসে ময়ূরের অবাক লাগল। একটা কাজ আছে বটে, সেই হরিণের রাং ক্লুটলং-এ নিয়ে যাওয়া। তা কি বোকার মতো কাজ হয় না? মৃগমাংস ভোজন, রাজার হরিণ, এমন সব শব্দ কোথা থেকে মনে আসছে? হঠাৎ তার মনে পড়ল, ফ্রায়ার টাকের একটা গল্প ছিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিক দেখে নিল।

হঠাৎ ঘড়িতে চোখ পড়ায় সে নিজেকে শোনাল, খুব দেরি হয়েছে। এরপর গেলে কখন রান্না হবে? সে খুব তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের হুক থেকে রাংটাকে নামালে। খবরের কাগজে জড়িয়ে দড়িতে বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করলে। হাত ধুয়ে এসে পোশাক পালটালে। এই সময়ে হঠাৎ তার মনে পড়ল, সেই কত দিন থেকে রিনিমেমসাহেবের রাখা দুই বোতল মদ আছে স্টেটরুমের আলমারিতে। এটা কী আশ্চর্যের কথা, সেই মদেব কথা কাউকে সে জানায় নি! এতদিনে তা নষ্ট হল কিনা কে জানে! সে তার খাকি কাঁধঝোলায় বোতল দুটিকে ভরে নিলে। সে যখন গ্রেগ অ্যাভেনুর ছায়াছায়া পথে, ঝোলার মধ্যে সরুতারের জালে জড়ানো সিলকরা মুখ মদের বোতল, তাতেই যেন তার শরীর কখন ঝিমঝিম করল নেশায়। সে নিজেকে বোঝালে, দূব দূর, তাও হয় না কি!

৪

ফরেস্টের সেটা ছুটির দিন নয়। তা সত্ত্বেও প্রভঞ্জন আসাতে পোস্টমাস্টার খুশি হয়েছিল। রেঞ্জার বললে মৃগমাংসের কথা ইংরেজিতে। বললে, ইন্দ্র আর পুষ্পার না জানাই ভালো। পরে বাংলায় বললে, নরবু কেটে কুটে, মশলা বানিয়ে তৈরি করুক। বুদ্ধিমান পোস্টমাস্টার বললে ইন্দ্রদের, আজ দুপুরের রান্নায় দেরি হবে। তোরা কিছু খাবার, কাচার কাপড়চোপড় নিয়ে ঝর্নায় যা। তারা চলে গেলে পোস্টমাস্টার সুচেতনাকে বললে, কফির জল চাপাও। নরবু তোমার বান্নাঘরে যা করার করতে থাক।

সুচেতনা বললে, নরবু তো খাবেই, রেঞ্জার সাহেবও যদি না খান, তবে এত বেলায় নতুন করে রাঁধবো কেন?

পোস্টমাস্টার বললে, বলতে?

একটু অসুবিধা বোধ করলে প্রভঞ্জন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে তার বাসার ভিতরে গিয়ে বসে। রাতে এক সঙ্গে ডিনারে বসেও কাল সে হরিণমাংস ছোঁয় নি। সে যেন মদের ঝোঁকে খাওয়ার দিকে নজর দিচ্ছে না, এরকম অভিনয় করেছিল। রোজা ভেবেছিল, বোধহয় রেঞ্জার সাহেবের এতরাতে খেতে ইচ্ছা নেই। সে কিছু বলে নি। কিন্তু এখানে এখন? সে না খেলে এদেরও খাওয়া হবে না।

সে একবার যুক্তি দিলে, মেয়র দুদুটোকে শিকার করায় তার মনে ক্ষোভ ছিল। অন্য একবার যুক্তি দিলে, চাঁদের আলো প্রতিফলিত সেই চোখ, সেখানে জল দেখে সে রকম হয়েছিল তার। আর সেটা ছিল হরিণকন্যা।

পোস্টমাস্টার অফিস ভুলে বসে পড়েছিল। বললে, তো মশায়, কাল সন্ধ্যায় আবার বাজারে অসওয়ালের বাড়ির সামনে সেই জেন এয়ার মেমের সঙ্গে দেখা হল। কথাটা আদিবাসীদের দিকে ঘুরিয়ে দিতেই জিজ্ঞাসা করলে, আদিবাসীরা এখানে নাচ, গান করে কি না। বললুম, মাইবং-এর আদিবাসীরা, যারা চেহারায় তিব্বত-ভোট, তাদের এক রকম মুখোশনাচ আছে বলে শুনেছি। বলে

পোস্টমাস্টার হাসল।

রেঞ্জার জিজ্ঞাসা করলে, মিথ্যা করে বলেছেন নাকি? আপনিও তো কবে থেকে আদিবাসীদের নিয়ে ভাবছেন, লিখছেনও। সে হেসে বললে, তবে? ও, আপনার সেই আদিবাসীদের মধ্যে বিদেশি কোন ইন্টেলিজেন্স ঢোকার থিয়োরি?

না। ঠিক তা নয়। বলে মুরলীধরও হাসল।

ডাক কাটছে গুমছে। পোস্টমাস্টারও উঠে অফিসে গেল। রেঞ্জার মৃদু বিস্ময় ও অস্বস্তি বোধ করতে থাকল। অথচ সে একা নয়। সুচেতনাকে করিডরের মুখে নরবুকে কিছু বলতে দেখা যাচ্ছে। পাপ নাকি? অপরিচিত সেই স্কুলপরিদর্শক-মহিলাকে তেমন করে বিয়ারে প্রলুব্ধ করা পাপ হয়েছে? বলবে, পাপটা সেই মহিলার মনেই ছিল, অরণ্যের ছবি দেখার ফলে একটু বেশিই খেয়েছিল, সকালের মুখের চেহারায় প্রমাণ। কিন্তু জীবনে প্রথম বিয়ার খাওয়া কি পাপ? শেষে রকসিও। মনে মনে হাসতে গেল। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন উঠল। তা হলে সেই হরিণীর মৃত্যুর জন্য যে রাগ, তারই শোধ নিয়েছে সে গোটা দলটার উপরে ততটা রাম আর বিয়ার যোগান দিয়ে? পাহাড় থেকে নামতে নামতে অনুশোচনা হোক তাদের।

সে চিন্তাটার পাশ কাটাতে এদিক ওদিক চাইল। আর তাতে ইজেলে চড়ানো, ঢেকে রাখা সুচেতনার পোরট্রেটে চোখ পড়ল। তাতে লাভ হল না। আর এক অস্বস্তি দেখা দিল মনে। অন্যায়, অন্যায়, এতগুলো সিটিংএর পরেও সেটাকে অসমাপ্ত রাখা। তোমার ইনসপিরেশন ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য কি সুচেতনা কারণ, যে তাকে এভাবে অসম্মান করা যায়? এই তো, সেদিন এসে ছবি শেষ করবো বলে বিড়ালছানাই আঁকা হল শুধু।

কফি করে আনতে খুব একটা দেরি হয়নি সুচেতনার। তার শাড়িতে হলুদ দেখে বোঝা গেল, সে নরবুকে সাহায্য করছিল। সুচেতনা কফির ট্রে নিয়ে ঢুকতে একটু অবাক হল। সে দেখতে পেল, রেঞ্জার ছবির ঢাকনা খুলে ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে। সে ভাবলে, তা হলে? কিন্তু ট্রে নিয়ে সে পোস্টঅফিসের দরজার কাছে গেল বরং। গুমছে দরজায় উঁকি দিল। তার কাছে খবর পেয়ে পোস্টমাস্টার কফি নিলে। দরজার মুখ বাড়িয়ে বললে, আর একটু দেরি মশায়। জন পাঁচেক আর্মি মিউল ট্রেনের জওয়ান খানপঞ্চাশ মনিঅর্ডার এনেছে। ঠিকানা খুঁজে পেতে হয়রান। পোস্টমাস্টার মুখ সরালে।

সুচেতনা একেবারে লজ্জিত হয়ে পড়ল। দেখো কাণ্ড! রেঞ্জার গেস্ট, তাকে কফি না দিয়ে আগে কিনা অফিসে দিতে গেল! হতে পারে, উনি ছবিটাকে তেমন তন্ময় হয়ে দেখছিলেন। সে এগিয়ে গিয়ে ট্রেটাকে প্রভঞ্জনের সামনে ধরলে। একটু লাল হল তার মুখ।

পোস্টমাস্টার আর সুচেতনা সরে গেলে প্রভঞ্জন ছবিটার দিকে চেয়ে বিষণ্ণ বোধ করলে। একটা চিকচিকে রঙীন ফটোগ্রাফ হয়েছে। কিন্তু সুচেতনা চলে যাওয়াতেই ছবিতে চোখ রেখে কী খুঁজতে লাগল। যেন এখনই দেখেছিল, অল্পের জন্য ধরতে পারে নি।

রান্নার কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে, বিশেষ নরবু তার ভার চেয়ে নিলে সুচেতনা এল। গেস্টকে কতক্ষণ একা রাখা যায়?

আধঘন্টা পরে, তখন শার্সি দিয়ে আসা রোদ কাঠের মেঝেতে একটা খয়েরি সামান্তরিক তৈরি করেছে, খেয়াল না করে সুচেতনা তার প্রান্তে পা রেখে দাঁড়াল। তার ফলে তার বাঁ বাহুতে কাঁধ থেকে বেশ খানিকটা ক্যাডমিয়াম হলুদ লাগতে দেখলে প্রভঞ্জন।

হলুদ বেতের পিঠতোলা চেয়ারটার কাঁধে হাত রেখে নিজের দিকে টানতে গিয়ে সুচেতনা মনে মনে বললে, এই চেয়ারটার পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েই তো ছবি। তা বলে এখন সে তো ছবি আঁকাতে বসছেনা। সে মুখ নিচু করলে, আর অবাক হয়ে গেল, এই দেখো, হলুদ লাগা শাড়িটা

পালটাতে গিয়ে, কখন সে এই নীল শিফন ম্যাক্সিটা পরলে! অন্য শাড়ি পরাই ভালো ছিল। ছবি আঁকার ম্যাক্সিটাই এটা।

সে তখন ঘরে গিয়ে উলের ঝাঁপি আনলে, হাসি মুখে সেই চেয়ারটায় প্রভঞ্জনের সামনে বসল। ভুলে যাবে কেন? ছবি আঁকার চেয়ারই এটা। উলের দিকে নজর দিয়ে ভাবলে, অকটোবরে পরতে পারবে পোস্টমাস্টার। আর রংটা যা মানাবে। সে চোখের কোণে দেখলে, রেঞ্জার ধীরে ধীরে অন্যমনস্কর মতো কফিটা খাচ্ছে। আর সেলাইএর ঝাঁপিটাও বিড়াল সমেত ছবিতে। কেমন ভয় ভয় করে না? কেমন নিঃসঙ্কোচে দেখে না ছবি আঁকিয়েরা? সে উলের দিকে চোখ নামালে। কী জানি শিল্পীরা কতদূর দেখতে পায়, মনের ভিতরেও কিনা?

কফির কথা ভুলে গিয়েছিল প্রভঞ্জন। তার চোখ ক্যাডমিয়াম সোনালি হলুদ বাহু বেয়ে উঠে, শান্ত গভীর নীলাভ-কালো চোখের কোলে, পরে নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত অকার হলুদ ভাঁজ ধরে, প্রফুল্লগোলাপ ঠোঁটে এসে থামল। বিষণ্ণতা? না। নিছক এক গোপন গভীরতা? আগে কি দেখেছি?

সুচেতনা মুখ তুললে। চোখের পাতাকে না তুলে যেমন পারা যায়, তেমন করে দৃষ্টিকে ছড়ালে। অনুভব করলে, আগে হয় নি, তেমন করে লুব্ধ হচ্ছে নাকি কারো চোখ? কিছু বলতে সে তাড়াতাড়ি বললে, ওদের সঙ্গে একজন সুন্দর মহিলাও ছিলেন। স্কুলটা ওরা নিলে, তা আর আপনার থাকে না। কষ্ট হয় না?

কফির কাপ হাতে থাকতেই প্রভঞ্জন অন্য হাতে পকেট হাতড়ালে পাইপের খোঁজে। এক ঢোকে কফি শেষ করে কাপটাকে মেঝেতে নামিয়ে স্বগতোক্তি করলে, দেখো জঠরের গুরুত্ব, জঘনের গাঢ়তাও দেখো। কী আশ্চর্য এতদিনেও কি সে সাহস করে দেখে নি? না কি আজই এসে পৌঁছাল! খুব তাড়াতাড়ি তামাক-পাইপ বার করে, সে থমকে গেল। না, ছবি আঁকার সময়ে কেন? সে পাইপ পকেটে রেখে, ইজেলের নিচে রাখা ক্যানভাস ব্যাগ থেকে সিকি ইঞ্চি তুলি বার করে হাতের পিঠে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে দেখলে তা কত নরম। সে ছবির উলঝুড়ির একটা কিটেনের একটা কানকে আর একটু নরম করার চেষ্টা করলে। তার মনে পড়ল, সেই এক সন্ধ্যায় হঠাৎ কিটেনগুলোকে এঁকেছিল। সুচেতনাকে না এঁকে। তুলি হাতে সে বললে, ও আমরা সকলে পাই। কষ্টের কথা তো? কিছু নয়।

এই সময়ে পোস্টমাস্টার এসে অন্য চেয়ারে বসতে বসতে বললে, হল এবেলার কাজ। পরে সব পাঠাবো অ্যাডভাইস করে। হোক মিউলট্রেন, তবু তো আমি দেখলাম আবার এই শহরে।

কিন্তু তখন তার চোখ পড়ল নীল ম্যাক্সির সুচেতনায় ও রেঞ্জারের হাতের তুলিতে। সে হেসে বললে, ছবি? ও মশায় আমি তো ভেবেছিলাম বার্নিস দেয়ার আগে শুকাচ্ছে বুঝি। বেশ, বেশ, ও মশায়, কে যেন বলেছিল, টিশিয়ানই তো, ছবি রেখে দিতো, আবার একদিন তুলে রং চাপাতো। এরকম চলতো। যতক্ষণ না মনের মতো হয়।

এই পর্যন্ত বলেই সে থমকে গেল। কেমন যেন চিন্তাকুল দেখালো তাকে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হুঁ হুঁ, শিল্পীকে ডিস্টার্ব করা উচিত নয়। শুনেছি, বাজারে নতুন মুলোশাক আর মেথি শাক উঠেছে। দেখি পাই কি না।

সুচেতনা বাজারের ব্যাগট্যাগ দিতে উঠে গিয়েছিল। সে ফিরে এলে প্রভঞ্জন বললে, সেও একটু ঘুরে আসতে পারে।

সুচেতনা বললে, তা কেন? লাঞ্চ করেই যাবেন। নরবু রান্না করছে কুকারে। তার খুব ইচ্ছা। আমাকে মিনিট পনের-কুড়ি পর পর উঠতে দিলেই হবে। আপনার স্কুল ওরা নিয়ে নিলে ছবি আঁকা কেউ শেখাবে না বোধহয়।

সুচেতনা চেয়ারে বসে উল হাতে নিলে প্রভঞ্জন অনুভব করলে, তাকে শান্ত রং করতে হবে। লাইল্যাক আবও হালকা করে দিতে হয় না? আরও স্বচ্ছ? বিড়ালের বাচ্চাটার কানদুটোকে নরম করতে করতে সে নিজের মনের কান্ড দেখে অবাক হয়ে গেল। তাইতো! এই এক পক্ষ, বিশ দিনেই! এতদিন বোঝোনি? নাকি বুঝেই নিজের অজ্ঞাতসারে সেই সন্ধ্যাতে মায়ের পাশে কিটেন দিতে ঝোঁক হয়েছিল?

সুচেতনা চোখের পাতার তলা দিয়ে দেখে গাল লাল করে ভাবলে, সেই শেষ সিটিং দেয়ার পর এ পোশাকে সামনে আসিনি বলেই এমন করে দেখা।

প্রভঞ্জনের মুখ উজ্জ্বল হল। সে বললে, ও এটাইতো তাকে প্রথম ছবি আঁকতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। এই লাইল্যাক-নীল পোশাক, নাক-মুখ-চোখের নরুনে কাটা সৌন্দর্য, সুন্দর লম্বাটে হাতে সুঠাম গড়ন আঙুল। ও, না। সে রঙের টিউব সাজালে, পেলেট, তুলি হাতে নিলে। ভাবলে, বুকের বৃত্তাভাস কত গভীর দেখো, চোখ কত বেশি আয়ত। না না, ঠোঁটের বা কানের শেড বদলে ওখানে গর্বভরা বিস্মিত হাসি ছড়িয়ে দিয়ে হবে। আগে ছিল না। আজ ধরা পড়ল।

সুচেতনা ভাবলে, দৃষ্টি কিন্তু আজ বেশি লোভালু। সে মুখ লাল করলে।

প্রভঞ্জন ভাবলে, দুটো অনুভূতি তো, বিস্ময় আর গর্ব, যাকে স্নিগ্ধ সুঘ্রাণে মিলিয়ে দিতে হবে। শরীরের এই গর্বগুলো দেখাতে লাইল্যাক ম্যাক্সিকে কিন্তু মসলিন-স্বচ্ছ করতেই হবে। সে নিজের ভিতরে যেন তার ছবির সত্বাকে উত্তেজিত হতে অনুভব করলে। সুচেতনা উঠে দাঁড়াল। গ্রীবা বাঁকিয়ে দেখলে যেন। ঝির ঝির করে হেসে বললে, এঘরে স্টিরিও চালিয়ে দিই। ক্লাসিকাল মিউজিক। তাই শুনবেন? কিংবা শুনতে শুনতে আঁকুন।

সে চিত্রকরের চোখ দেখেই বুঝতে পারছে, আজ আর গোপন করা গেল না। তার চোখ লজ্জায় কাঁপতে স্নেহে ডাগর মধুর হয়ে উঠল।

৫

কী ভাবে নিজেকে উপস্থিত করা যায়, এই যখন ভাবছে ময়ূর, তখন বাগিচার টিলার উপরে দূর থেকেই জেনকে দেখতে পেলে সে। একটা সাদাতে হলুদ সরুকাণ্ডের বার্চ গাছ, তার পাশে মরালাল পোশাকে জেন, আর গাছ আর জেনকে ছুঁয়ে নামা হালকানীল আকাশ। স্কাইলাইন ছুঁয়ে জেন।

তার কাছে উঠতে দশ মিনিট লেগে গেল ময়ূরের।

জেন বললে, বেশ করেছো এসে। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবো, মিস্টার মেয়র।

ময়ূরকে সঙ্গে করে খানিকটা নেমে, দুটো কাঠের ঘরের ছোট বাড়ি যার সামনে গুটিকয়েক গোরু বাছুর, সেখানে দাঁড়াল জেন। বললে, এটাই থেনডুপের বাড়ি। মনে আছে? ওই সাদায় লালে গোরুটা নতুন কিনে দিয়েছি। থেনডুপ এই কয়েক মাসে বেশ বুড়ো হয়েছে। সে এখন এসব কাজই করুক। তার স্ত্রী পেমা বরং আমার বাড়ির কাজ করছে। বলো, ভালো নয় ব্যবস্থা?

এই সময়ে ময়ূরের হাতের কাগজে জড়ানো লম্বা বড় প্যাকেট লক্ষ্য না করে পারলে না জেন। বললে, এটা কি মেয়র, বেশ চড়া গন্ধ?

ময়ূর বললে, ও, হ্যাঁ, যা বলতে এসেছিলাম, এটা হরিণের–

হরিণের?

রাজার হরিণের একটা পিছন পা।

জেন অবাক হল, কাটিয়ে উঠল। হাসল। থেনডুপকে ডেকে বললে, মাংসটা নাও সাহেবের

হাত থেকে। বাংলোয় পৌঁছে দাও। পেমাকে বলো কফির জল করতে।

থেনডুপ মাংস নিয়ে চলে গেলে, ময়ূরের শব্দ ব্যবহারে খুশি হয়ে, স্মিতমুখে কয়েক পা চলল জেন। পরে বললে, লিম্বু জোয়ান, তার উপযুক্ত অনেকটা জায়গা চায়। বলেছিলাম, এই পথে উঠে গেলে তার বাড়ি আর আলুর জমি। তিন একর আলু লাগিয়েছে। সার আর বীজ কিনে দিয়েছি। বলেছে, অর্ধেক লাভ দেবে ক্লিনিককে। বলো ভালো নয়?

ময়ূর ভাবলে, মাংস হাতছাড়া করা চলে, কিন্তু ঝোলায় যা আছে? বোধ হয় চুপচাপ ফিরিয়ে নেয়া ভালো।

জেন বললে, চলো নামি। একটাই মুস্কিল, নিচে ট্যাঙ্ক করে পাম্পে জল তুলতে হবে। কখনও ওরা বালতি ভরে জল তোলে, জমিতে দেয়।

নামতে নামতে জেন বললে, চলো কফি খাই। নামার পথে তারা ক্লিনিকের সাইটে দাঁড়াল। জেনের মুখ বিশেষ উজ্জ্বল হল। সে বললে, মেয়রসাহেব, সেদিন তুমি যা দেখেছিলে, ও, না, তুমি তো ক্লিনিক সম্বন্ধে কিছুই জানো না বোধহয়, এরই মধ্যে কত এগিয়েছে দেখো। পিলার জমানো হচ্ছে, দেখো। ডিসেম্বরে জন দশেক রোগী রাখা যাবে আশা করি।

বাংলোর পার্লারে কফি নিয়ে বসে ময়ূরের মনে হল, জেনকে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। আর প্রফুল্ল হলে সব মানুষকে বেশি সুন্দর দেখায়।

জেন বললে, আমি প্রস্তাব করি, ময়ূর, আজ এখানে তুমি লাঞ্চ করো। আড়াইটেতে আপত্তি হবে? তা হলে আমি রাজার হরিণ রান্না করি।

কিন্তু থেনডুপ এসে বললে, অনেক মাংস, কী হবে?

সবাই খাবে। লিম্বু আর তার বন্ধুকে দিও।

থেনডুপ বললে, তা হলেও থেকে যাবে।

জেন হেসে বললে, তাওতো বটে, আমাদের ফ্রিজ নেই। দেখো না, মেয়র, কী বিপদে ফেললে থেনডুপকে!

থেনডুপ দুহাতে নিজের দুই কবজি ধরে মাথা উপরে নিচে দুলিয়ে বললে, শুকিয়ে রাখা যায়, ম্যাম। রান্নাঘরে নুন মাখিয়ে ধোঁয়ায় ঝুলিয়ে।

কোন কোন গন্ধ এত তীব্র হয়, তার কল্পনাতেও মন্তব্য টেনে আনতে পারে। ময়ূর বললে, সর্বনাশ, সে তো ভয়ানক গন্ধ। সারা বাংলো ভরে যাবে গন্ধে।

জেন তার বলার ভঙ্গিতে হেসে উঠল। থেনডুপকে বললে, ওতেই হবে থেনডুপ। তুমি রাম্প থেকে পাউন্ড দেড়েক কেটে রেখে দাও আমার জন্য। পেমাকে বলো, গ্রিলের উপরে আগুনটা যাতে জোর হয় এমন লগ সাজাবে। রোস্ট করবো।

থেনডুপ চলে গেলে সে ময়ূরকে বললে, চলো, ভিতরে কিচেনের কাছাকাছি কোথাও বসি।

যে ঘরটাকে লাইব্রেরি বলে সে, সেখানেই গিয়ে বসল তারা, ইতিমধ্যে সে ঘরে খান দুয়েক কুশন দেয়া চেয়ারের ব্যবস্থা করেছে। তার একটা টেনে দিলে ময়ূরকে বসতে। বললে জেন, লাঞ্চের আগে যাচ্ছো না, কাঁধের ঝোলা কি কাঁধেই থাকবে?

ময়ূর মহাবিপদে পড়লে। সে শ্যাম্পেনের বোতলদুটি বার করে পাশের টিপয়টায় রাখতে বাধ্য হল। অনেক চেষ্টায় সে বলতে পারলে, আপনার জন্য।

জেন বিব্রত হয়ে গেল। এসব কেমন হচ্ছে? এই যে ভেনিজন আর শ্যাম্পেন, এ কি এই শতাব্দীর হতে পারে? ইতিমধ্যে শ্যাম্পেনের লেবেল চোখে পড়েছে। এদেশের নয়। খুবই দামি হবে।

সে বললে, তুমি কি লাঞ্চে ওয়াইন খাও? দিতে বলবো? কিন্তু উপহারের নামে একটা ছোট সেন্ট বটলই যথেষ্ট হয়।

ময়ূর ভাবতে পারে নি, এরকম অবাক করা কাণ্ড সব ঘটতে থাকে। অবাক লাগার কারণ হিসাবে, সেই কাঠের দেয়ালের ঘরটাকে, এই মেম ডাক্তারের একটু নামানো, একটু লাল হয়ে ওঠা মুখ, ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কিছু এমন উজ্জ্বল সাদা দাঁতের ডগা—এসব ভাবতে লাগল। জেন বললে, তুমি একটু বসো, ময়ূর। আমি দেখিয়ে দিয়ে আসি, রোস্টের জন্য কোথায় কাটতে হয়।

কয়েক মিনিটে ফিরে এল জেন। সে ইতিমধ্যে বাংলোর পিছনে গিয়ে ফুলও সংগ্রহ করেছে। সে ময়ূরের পাশে বসে হেসে হেসে বললে, তোমার এসব ব্যাপার যেন শেকসপীয়ার, স্যার ফিলিপ সিডনি, এদের কথা মনে করায়। সে হেসে বললে, তুমি শুকনো মাংসের দুর্গন্ধের কথা বলছিলে। ভাবো তো, শেকসপীয়ার তাঁর একটা সনেট লিখেছেন, আর সেই ঘরেই বা পাশের কিচেনে রাখা আস্ত বীফের সাইড ঝুলছে, ঘামছে, শুকাচ্ছে, গন্ধে ঘরটাকে ভরে তুলেছে।

শেকসপীয়ার, মানে সত্যি, কে শেকসপীয়াব?

জেন হেসে হেসে কথার নেশায় বললে, সে সময়ে যখন কবিরা কাব্য লিখছে, তখন শুকিয়ে রাখা মাংস কী ভাবে যে খেতো তারা! অবশ্য সে জন্যই তো মসলার খোঁজে ভারতে আসা। তার আগে শেকসপীয়রের চুরি করা হরিণমাংসের গন্ধ মানুষ খুন করতে পারতো।

গ্রেগরীর সময়কার ছোট গ্রিল বলেই মাংসটা বাদামি হতে সময় নিচ্ছিল। তারা মুখোমুখি একটার পরেই লাঞ্চে বসেছিল। প্রায় দুটোই বাজছে তখন।

একবার ময়ূর বলে ফেললে, এখানে পাহাড়ে মাংস শুকিয়ে রাখে, ওদেশেও তাই হতো? তার মুখ দেখে বোঝা গেল, এসব সে কিছুই জানতো না। শেকসপীয়ার আর তার সনেট তো অনেক দূরের কথাই। কথায় কথায় সেরকম প্রকাশ হলে, জেন মনে মনে সেই চার্মটাকে খুঁজে পেলে ময়ূরের ইম্পিরিয়াল ঢাকা মুখে, যা, সে ভাবলে, ফুলের প্রথম ফুটে ওঠার সময় সম্বন্ধে দ্বিধায় থাকে।

সে ময়ূরের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বরং ফরেস্টের বিদ্যুৎ থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় কি না, জানতে চাইল। বললে, কাইন্ডলি দেখো। পেলে রোগীদের সুবিধা। কথাটা পাড়ো। ইউনিটের চার্জ তো দেবোই। তাসিলা থেকে এখানে লাইন আনার খরচ দিতেও রাজী আছি। সে বলতে গেল, আলো অন্ধকারের নিঃসঙ্গতা কমায়। কিন্তু বললে, তাই বলে ময়ূর, তুমি এরকম দামী উপহার আনবে না। নেয়া উচিত হয় না আমার।

এই কথার পিঠে ময়ূর বললে, বাহ্, আমি আপনার বেশ কয়েকটা দামী উপহার নিজে থেকেই নিয়েছি। সেই লাল জিনস ট্রাউজার্স, আর সেই নরম রাগটা। জিনসটা ঝুলে ছোট হয় বটে। তা হলেও পরে থাকি। ফেরৎ দিলাম কোথায়? কয়েকদিন আগে সেই রাগটার কথা মনে হয়েছিল। সঙ্গে রাখা ভালো, বনে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হলে আরও বেশি ক্লান্ত হতে বাংলোয় ফেরার চেষ্টা করতে হয় না। যে কোন গাছতলায়, রাগটা গায়ে জড়িয়ে শিকড়ে মাথা রেখে ঘুমালেই হল।

জেন বললে উদ্বেগ নিয়ে, না, না, ওরকম তুমি কখনও করবে না। বলো কী? ভয় করবে না? আশ্চর্য লোক তুমি। তুমি বলেছো, বনে হাতি থাকে, চিতাও।

ময়ূর হাসল। নিজের অনুভূতিতে অবাক হল। জেনকে দেখতে থাকল। বললে, রোজ ভয় পাবো কেন? স্বীকার করছি, একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম। সে কী ভয় আপনাকে বোঝাতে পারি না, ম্যাম। ভূতেও বিশ্বাস করেছিলাম।

জেন বললে, মনে পড়ছে, বলেছিলে, জলে পচে ওঠা নিজের মৃতদেহকে প্রপাতের দিকে ভেসে যেতে দেখেছিলে।

বলাটা অবিশ্বাস্য, যদি ভেবে দেখো, এরকম বলতে গিয়ে জেনের মুখ গাঢ় লাল হল।

ময়ূবের মুখ তার চেষ্টার বিরুদ্ধে বিবর্ণ হল। সে তাড়াতাড়ি বললে, না ম্যাডাম। এখন আর

তত নিচে নামি না। তাসিলার উপত্যকার উপরে, যেখানে আমি ঘুরি, দেখবেন গাছ, গাছগুলোতে ফুল, ঝোপে চিতা। এমন কি নিচের উপত্যকাতেই যদি নামি, সেখানে গাছ আর ফুল দেখতে পাই, যদি আকাশ নাও থাকে। আর শুধু আপনার কম্বলটাই বুঝি সঙ্গে থাকে? রাইফেল, টর্চ, টাঙ্গি এসব থাকে না?

সেই লাঞ্চের পরে ঘণ্টাখানেক ছিল সেখানে ময়ূর। জেন উঠে গিয়ে সেলাইয়ের ঝুড়ি নিয়ে এল। যেন সেলাইয়ে বসবে। হয়তো সে নিজের জন্য নিজের হাতে তৈরি পাহাড়িনীদের বোকু ময়ূরকে দেখাতেও চায়। কিন্তু সে বললে, মিস্টার মেয়র, বি এ গুড বয়। এই ডিভানটায় একটু শোবে? না আমি যন্ত্র আনছি না। একটু ওয়াচ করবো, অ্যাট রেস্ট। আচ্ছা, বেশ, তাও নয়। বলো, বুকে কোথাও কি কখনও কষ্ট হয়?

ময়ূর বললে, না, না, তা কেন? আমি কথাই দিচ্ছি আপনাকে। না হয় কোনদিন আর নিচের উপত্যকাগুলোতে নামবো না। পাহাড়ে সে রকম নেমে গেলে সকলেরই কষ্ট হতে পারে। আমি এখন যাই, কেমন? আমাদের রেঞ্জার আজ ট্যুরে যাবেন বলেছিলেন।

সে হেসে উঠে দাঁড়াল।

তাসিলার দিকে চলতে চলতে সে ভাবলে, কী সর্বনাশ, সে এখানেও কি সে ধরা পড়ে গেল? যদি একদিন জামা সরিয়ে বুক দেখতে চান? তার মনে পড়ল, সে একদিন এরকম ভুল করেছিল। ডম্বরিকে মাটিতে শুইয়ে দেয়ার পর, তার ভয় হয়েছিল, সে তখনই মাটি খুঁড়ে দেখবে, ডম্বরির সেখানে আর কষ্ট আছে কি না। তখন ম্যাডাম প্রায় ধরে ফেলেছিলেন।

কথা দিয়েছে, অস্পষ্টভাবে এরকম মনে করে, সে সহজ পথে ধীরে চলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, জেন যখন জেনেই ফেলেছে তখন এখানে এই নির্জনে বুকের ব্যথা গোপন করে লাভ কী?

এই ভাবতেই তার বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠল। যেন পা টলে যাবে। সেই একেবারে নিজের ব্যথায় তার মুখ বিকৃত হচ্ছে, চোখের জল আসছে। সে মনকে ভাবতে অনুমতি দিলে, তার একটা বোন আছে। ডম্বরি যার কথা মনে করাতো। সে বলেছিল একদিন, দাদা আমিও জেনে ফেলেছি সব। কিন্তু তুই, দাদা, তুই আমার থাকতে, আমার ভয় কী? সেই বোনকে ছেড়ে এসেছে সে।

৬

লাঞ্চটা খুব ভালো হয়েছে, এই অনুভূতি নিয়ে অনেক বেলায় প্রভঞ্জন পোস্টঅফিস থেকে বাইরে এল। তৃপ্তিই তো। সে আর সুচেতনা, একেবারে একা। পোস্টমাস্টারও ছিল না। শাক আনতে গেল তো গেলই! সেই অভূতপূর্বা সুচেতনা আর সেই রেকর্ডগুলো। পরে রেকর্ডও নিঃশব্দ হয়েছিল। যেন সুঘ্রাণের নির্জন পৃথিবীতে সে আর সুচেতনা একা। পোস্টমাস্টারের জন্য অপেক্ষা করে থেকে থেকে আড়াইটেতে লাঞ্চে বসেছিল। সে যখন বিদায় নিচ্ছে তখন সলজ্জমুখে পোস্টমাস্টার উপস্থিত হল। বললে, আ সুচেতনা, তখন যদি বলতে রেঞ্জারকে লাঞ্চে বলেছো, তা হলে কি দেরি করি?

সে একটু বিব্রত বোধ করলে চলতে চলতে। না, সে অর্থে একা নয়। ইন্দ্র ছিল, পুষ্পমায়া ছিল, পরিবেশনের সময় নরবু ছিল সুচেতনার পাশে। সে মনে মনে বললে, না, না, সেই অভুতপূর্ব সান্নিধ্যর জন্য এরকম কৈফিয়ৎ দিতে চাওয়া সেই সান্নিধ্যকেই লজ্জা দেয়। বিশেষ সুচেতনা বন্ধুপত্নী।

বরং পোস্টমাস্টারকে তো ডাক ছাড়তে লাঞ্চ না করেই অফিসে যেতে হল বলে তার সঙ্গে কথা বলা হয় নি। তা ভালো, জব্দ হয়েছে। আর তার সঙ্গে আবার দেখাও হবে। ঠাট্টা করা যাবে

শাকের কথা তুলে। কিংবা ও মশায়, একি এক রকমের হিংসা করা আর্টিস্টকে?

সেই নির্জন সান্নিধ্যর মাধুর্য অবশ্য অন্যরকম, মডেল আর শিল্পীর সেই স্বপ্নসম্বন্ধ, যখন মডেলের সম্পূর্ণ সত্বা শিল্পীর সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে।

সলজ্জ সুচেতনা বলেছিল, ছবি একেবারে বদলে যাচ্ছে। আর সে বলেছে, আর তিনচার সিটিংএ এ নতুন ছবি হয়ে যাবে। শুধু পোশাক নয় তো! বিড়ালগুলোর দিকে চাওয়ার মধ্যে লজ্জা, কৌতূহল, গর্ব, সুখ আঁকতে হবে। কিন্তু ছবিতে নিজের শরীরের সবজে হলদে ছায়া ফুটে ওঠার কথা মনে হওয়ায় লাল হয়ে উঠছিল সুচেতনা। কিন্তু প্রভঞ্জন ধাক্কা খেল যেন। সে দেখলে, মেয়র-বাংলোর ব্রিজের উপরে নরম হয়ে আসা রোদে মেয়র দাঁড়িয়ে আছে। সে একবার চেষ্টা করলে সেই ছবি আঁকার সময়টাকে ধরতে। বৃথা হল। সে বললে, হ্যাল্লো, মেয়র, আজ তো ট্যুরে যাওয়ার কথা ছিল, তাই নয়। চলো, চলো।

এখন, সার? রাত হয়ে যাবে না পথে? পনির কথা বলবো?

বেশ সারপ্রাইজ হবে না?

কোন দিকে, সার?

প্রভঞ্জন একটু ভেবে নিয়ে বললে, রসো, সে দিকে তুমিও কোনদিন যাওনি। গ্রেগ অ্যাভেনু থেকে নুমপাই রেঞ্জের দিকে নেমে যেতে একটা গালি আছে। ওখানে এক সময়ে ইন্ডিয়ান ওক প্লান্টেশন হয়েছিল। আমিও এ পর্যন্ত যাই নি। গাছগুলো কি আছে? ভালো মজবুত তক্তা হয়। রাইফেল, টর্চ, টাঙি নাও। কাউকে বলার দরকার নেই।

তারা পনের মিনিটে রওনা হয়ে গেল।

পথে প্রভঞ্জন ভাবলে, অফিসিয়াল মিথ্যা হল। ছল। সে হতাশ হল। কিন্তু কিছুক্ষণে যুক্তি দিল, এটা সুচেতনার সেই বিস্মিত পবিত্র গর্বের এত কাছে বলেই এটাকে ভার লাগছে। নতুবা এটা সেই স্কুলপরিদর্শক-মহিলাকে বিয়ার খাওয়ানোর সেই ব্যাপারের চাইতে অনেক হালকা। আর এদিকেও দেখো, সেই হরিণীমাংস যার প্রতিহিংসায় কাউকে বিয়ার খাওয়ানো, তাও মনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল। সে হাসল মনে মনে, খুব বাহাদুর! এক মৃতা হরিণীকে ক্যানভাসে জীবিতা করেছো বুঝি? তাই সুচেতনার টেবলে কষ্ট হয় নি আর? অবশ্যই হরিণী জীবিতা থেকে গেলে সে খুশিই হতো।

তার মন আবার যুক্তি দিলে, কী এসে যায় তোমার তাসিলার স্কুলে? যার জন্য সেই জেলা শিক্ষাপর্ষৎ সভাপতিকে তোয়াজ করা? নতুবা হরিণ-হরিণী খুন হতো না। তুমি নিজের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে চাইছিলে? বেশ তো নাই যেতে। সে তো ইচ্ছা করে যাওয়া।

এখন বরং ট্যুরের কথা ভাবা উচিত। একটা অন্ধকারের বনে ঢুকে সে বললে, টাঙিটা আমার হাতে দাও বরং। টর্চটা মাঝে মাঝে জ্বালো।

সেই ট্যুরটা আকস্মিক ভাবে গুরুত্ব পেল। গ্রেগ অ্যাভেনু দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর তারা ডাইনের দিকে বনের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা এক ভারতীয় ওকের চূড়া দেখতে পেলে। আর রেঞ্জার বললে, এটাই নিশানা কিনা দেখা যাক। হয়তো এটাই প্লানটেশনের এদিকের শেষ মাথা। তারা বনে নেমে গেল। রেঞ্জারের আন্দাজ ঠিকই হয়েছিল। ঘণ্টা খানেক চলে তারা সেই গালিরও সন্ধান পেলে যা গ্রেগ অ্যাভেন্যু থেকে প্রায় ষাট ডিগ্রি কোণ করে দূরে সরে গিয়েছে। ওক প্লান্টেশনও বটে যা কোন এক ডিএফওর খেয়ালে তৈরি হওয়ার পরে এখন বিস্মৃত। গালিটার দুপাশেও ওকগুলো বেশ ভালো বেড়েছে। প্রভঞ্জন অনেকক্ষণ থেকে কিছু বলছে না। দিন শেষের আলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে চুঁইয়ে পড়ে সন্ধ্যার মতো অন্ধকার করেছে। প্রভঞ্জন সতর্ক চোখ মেলে এদিক ওদিক দেখছে। সে একবার ভাবলে, মেয়র তার এই ট্যুর সম্বন্ধে কী ভাবছে বা। শব্দে প্রথমে ময়ূর, পর মুহূর্তেই

প্রভঞ্জন দেখতে পেল।

ময়ূর বললেন, ধনেশ?

প্রায় ধরেছো। ধনেশের ঠোঁট আর এদের শিং, নারীদের তুলনায় কত বড় দেখো।

ছাগল?

হ্যাঁ। খুব দুষ্প্রাপ্য। জুতেও নেই বোধ হয়।

তারা. বনে যেমন উচিত, তেমন চাপা ফিসফিস করে কথা বলছিল, তা সত্বে টর্চের আলোয় ধরা পড়া প্রাণীদুটো বিশ্রাম থেকে উঠেই অদৃশ্য হল। তার বদলে কালচে নীল আব দিন শেষের লালচে আলোর বিশৃঙ্খল চৌখুপি একটা পর্দা দেখতে পেলে তারা সেখানে।

ময়ূর বললে, এবার ফিরতে হয় সার।

প্রভঞ্জন বললে, আমরা তাসিলা থেকে সরেছি। ডাইনের গালিটা ধর। এটা সম্ভবত ফরেস্ট-কলোনি কিংবা গ্রেগ অ্যাভেনুর গোড়ার দিকে যাবে।

সেই পথটাই সুবিধার। গালিটা অগভীর আর গাছগুলো দূরে দূরে বলে সন্ধ্যা তত গাঢ় নয়। কিন্তু তাদের থামতে হল। প্রায় দুঃসহ এমন এক মধুর গন্ধে এদিক ওদিক চাইতেই তারা এক ফুলের রাজ্য আবিষ্কার করলে। টর্চের আলোয় গাছে গাছে অর্কিডের তোড়া, মালা। অর্কিডে কি এত মধু হয়? কাকের মতো ঠোঁট, লাল চোখের, মেটে রঙের এক ঝাঁক পাখি, সেই অর্কিডগুলো খাচ্ছে। ঠোঁট ডুবিয়ে মধু খাওয়ার চেষ্টা করলেও, তাদের সেই বিকট লোভের ঠোঁট সে জন্য তৈরি নয়। তারা অর্কিডগুলোকে তছনছ করছে, গাছের উপরে গাছের নিচে ছুটোছুটি করে, ভাঙা অর্কিডের পাপড়ি গবগব করে গিলছে, যেন মধুতে ভিজানো রুটি।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে দেখতে প্রভঞ্জন যেন অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। বললে, কী সুন্দর, কী আশ্চর্য! জানো মেয়র, এ ফুলের কী অসম্ভব দাম হতে পারে? এক একটি ছোট গুচ্ছ বিশ-ত্রিশ টাকায় অনায়াসে বিক্রি হবে বড় বড় শহরে। সে হিসাবে এখানে দেখো কত হাজার টাকার ফুল।

ময়ূর অর্কিডের দাম শুনে অবাক হল।

কিন্তু তখন অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। একটিমাত্র টর্চের আলোয় ভরসা করে অচেনা পথ, চলার পক্ষে অসম্ভব দুর্গম হবে। তারা তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলে।

প্রভঞ্জন বললে, শহরের কাছেই এই ফুলের দাম, ওদিকে কিন্তু শহরের কাছে হলে এ ফুল থাকতো না।

কোন ট্যুর ঘটনাবহুল হবে, তা জানা যেত যদি! তাদের পনের মিনিটেই থমকে দাঁড়াতে হল। তখন তারা উঁচুতে স্কাইলাইনে দূরে দূরে তাসিলার আলো দেখতে পাচ্ছে। এদিকে তাদের ঘিরে অন্ধকার। দুজনেই থমকে দাঁড়াল। অনেকগুলো ঘোড়া কিছুকাল এক জায়গায় থাকলে তাদের সে গন্ধ অনিবার্য। তাতে নাক জ্বলে যেতো, যদি না ভয়ও দেখা দিতো।

তারা দুজনেই সব চাইতে কাছের ঝোপের আড়ালে গিয়ে আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলে। কোন সাড়া না পেয়ে, পরে টর্চ জ্বেলে খুঁজলে। তারপর ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে গালির উপরে রিজের গা বেয়ে বেয়ে উঠে গেল।

পোচার সার?

স্মাগলারের দল হবে। মাল নেবার ঘোড়া।

স্মাগলার এখানে কী করবে, সার? অর্কিড?

রেঞ্জার উত্তর দেবার আগে ভাবলে। বললে, ডিএফওর একটা কথা মনে পড়ছে। বাণিজ্যের একটা খুব পুরনো পথ থাকে, যাকে অনেক সময়ে রাজ্যের সীমার বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না।

মেয়রের যদি কিছু মাত্র সফিস্টিকেশন থাকে! তাকে বোঝাতে সুতরাং, প্রভঞ্জন এমন অনেক কিছু বললে, যা পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে সঙ্কোচ হতে পারে।

প্রথমে বললে, স্মাগলিং বাণিজ্যই। আইনের চোখে অপরাধ, কেন না ট্যাকস আদায় হয় না। ট্যাকসটা যে যুক্তিসম্মত, তা নাও হতে পারে। আবার পণ্যর তো ক্রেতা আছে। তারা স্মাগলিংকে পাপ মনে করে না। স্মাগলাররা বলতে পারে, চাহিদা অনুসারে পণ্য সাপ্লাই-এ পাপ কেন থাকবে? মানুষ বিদেশি পণ্য চায়, আমরা যোগান দি। কিংবা পাপ, অন্যায়, এসব বলবে কি? একটা গল্প আছে, পৃথিবীটাই মধু আর কটুতে তৈরি। মধুর পাশে কটু থাকবে। আবার একটা গল্প আছে, ইভ পাপ করেছিল, আমরা সকলেই সেই পাপের ফল। সে জন্যই পাপী। তুমি কি শুনেছ, ইভের এক ছেলে অন্য ছেলেকে খুন করেছিল? কেন? তা আমাকে কেউ বলে নি। জমির জন্য? অথবা স্ত্রীলোক তখন দুষ্পাপ্য ছিল বলে, স্ত্রীলোক নিয়ে? ওদিকে আবার স্ত্রীলোক বলতে ইভ ছাড়া কাউকে দেখি না সেখানে। দেখো, সে আবার কী! তাড়া খেয়ে যেখানে এসেছিল সেখানে ভগবানের ছায়া ছিল। সেই খুনের পর একেবারে মানুষের রাজ্য হল।

তারা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ফরেস্টকলোনির প্রান্তে উঠে পড়ল।

মেয়র জিজ্ঞাসা করলে, এরকম কেন হয়, সার? যাকে নিষেধ করা হবে, তাই পাপ হয়ে উপস্থিত হবে?

হয় বলেই বাইবেলে লিখেছে, হয় বলেই মধুকৈটভের গল্প। যাকে পাপ বলে নিষেধ করবে, তার এরকম চলাচলের পথ আছে। ওহো, তোমাকে বলি, মিস্টার মেয়র, এরকম গল্পও আছে, আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে ওরকম গলি আছে যেখানে খয়েরি ফেজ্যান্ট অর্কিড খায়, ঘোড়ার গন্ধে নাক জ্বলে যায়, আর আমরা বুঝে না বুঝে সে পথে চলিও। ভয়ে ভয়ে টর্চ জ্বেলে হলেও।

তারা ততক্ষণে ফরেস্টকলোনির স্ট্রিটলাইটিংএর নিচে এসে পড়েছে। প্রথম পোস্টটার নিচেই দাঁড়াল রেঞ্জার। টাঙিটা মেয়রের হাতে দিয়ে টুপি খুলে, কপাল আর মুখের ঘাম রুমালে মুছে, সে হাসি মুখে বললে আবার, এদিকে মুস্কিল। তুমি গ্রেগের গল্প জানো? পাপ থেকে সরতে সরতে মানুষ গ্রেগের মতো পাগল হয়ে যেতে পারে। গুডনাইট, মেয়র।

রেঞ্জারের সেখানেই দাঁড়াল। বাতাসটা প্রীতিপ্রদ। মেয়রকে দেখলে তার বাংলোর দিকে যেতে।

কথার আড়ালে মনকে আড়াল করতে পারলে মানুষ খুশি হয়। সেজন্য মানুষ প্রগলভ হয়, বাকপটু হয়। সে রকম কি সেই দুই বন্ধু মুরলীধর পোস্টমাস্টার আর প্রভঞ্জন রেঞ্জার? পাপপুণ্য, স্মাগলার, মনের তলাকার এক গোপন ভয়ঙ্কর ও সুন্দর পথ—এসব সম্বন্ধে আলাপ করেছে, আর সেই হেভি লাঞ্চের পরে ট্যুরের পরিশ্রমও হয়েছে, এসব কারণে, তিন গেম ভলিবলের পরে যেমন হয়, রেঞ্জার শরীরে মনে খুশি ও ঝরঝরে বোধ করলে। লাঞ্চটাও ভালো আর তার আগে সুচেতনার ছবি আঁকা।

সুচেতনার ছবিটা যে এরকম হয়ে উঠবে, পোস্টমাস্টার চলে যেতেই যে সুচেতনা প্রকাশ পেলে—প্রত্যাশার বেশি পেয়েছে সে। কথার জন্য বাকপটু তাকেও ভাবতে হল। ছবিটা সাহসী হবে আবার পবিত্রও। ওহো, সেই ভার্জিনের প্রেগনেন্সি। তার চাইতে মহৎই বা কী?

দূর থেকে তার বাংলোর আলো চোখে পড়ছে। সে নিজের উপরে খুশি হল। সে স্থির করলে, খানিকটা গরমজলে স্নান করে নিতে হবে। ট্যুর ডায়েরিটা লিখতে পারে, নাও পারে। ডায়েরিটাতে ওক প্লান্টেশন, মার্কর ছাগ দম্পতী, অর্কিড, লালচোখের খয়েরি ফেজ্যান্ট, স্মাগলারের ঘোড়া—ফর ইনফরমেশন ও অ্যাডভাইস। তা হলে ট্যুরটাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা দেখাতে পারলেই ভালো হয়। একটু মন হাতড়ে, সে নিঃশব্দে হাসল। তা যায়ও। সেই ভোর সকালে ক্লুটলং-এর বিপরীত দিকে গ্রেগ অ্যাভেন্যুর পাইনের বনে বনে ঘোরা সেই শিকারের জন্য, সেই বনে চাঁপা আর সেগুনের

প্লান্টেশন, আর সীমান্তের ওপারে দেখা, দূর থেকে দেখতে ছাগলের মতো ছিল যারা, সেই পনির দল, যারা স্মাগলার ছিল। এসবই আজকের ট্যুরের সকালের অংশ হিসাবে দেখান যায়। স্মাগলারদের সেই পনিগুলো যা সীমান্তের ওপারে দেখা গিয়েছিল আর অর্কিডবনের পাশে ঘোড়ার গন্ধ বেশ মিলে যাবে।

সে বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। সে যে সকাল থেকে ট্যুরে ছিল না, ছবি এঁকেছে তা কে প্রমাণ করবে? এই ট্যুর ডায়েরির পর?

কিন্তু বাংলোয় ঢুকতে ঢুকতে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চিন্তায় গভীর হল তার মুখ। সে যেন দেখতে পেল, সুচেতনার ক্যানভাসে ফাংগাসের মতো কী দাগ লাগছে। সে মনের গভীরে ছোট গলায় বললে, কী আশ্চর্য, আজকের এই মহৎ দিনে এই মিথ্যা ডায়েরি!

দরজা খুলে সামনের সেটিতে সে বসে পড়ল। ভাবলে, কেন কী ভয়ে মিথ্যা ট্যুর ডায়েরি? দেখো কী কাণ্ড! সে তো কবেই স্থির করেছে, না হয় আজই স্থির হোক, স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতে আর যাবে না, আর মিত্রবাহাদুরকে তার সুযোগ নিয়ে ওভারটাইম দাবি করতে দেবে না। না, মিত্রবাহাদুর ফরেন বিয়ার আনলেও নেবে না। আর ফরেস্ট পাসের বইগুলোকে সে নিজের কাস্টডিতে নিয়েছে। তাতে যদি মিত্রবাহাদুর বুঝে থাকে তাদের সম্বন্ধ বদলে গেছে—তা ভালো। ফরেন বিয়ার আসবে না।

বইগুলি কাস্টডিতে নিতে গিয়ে সে কয়েকখানা ড্যামেজডই দেখেছে। সে সবগুলোর সব কয়েকটা পাতা আছে কি না দেখা হয়নি। যদি সে সব হারানো পাতা ব্যবহার হয়ে থাকে পাস হিসাবে? যদি মিত্রবাহাদুর পাস তৈরি করে তাতে তার সই নিয়ে থাকে? সেই ফরেন বিয়ারের জন্যই কি সে তেমন বিশ্বাস করতো তার হেডক্লার্ককে?

আশ্চর্য, এসবই যেন পরস্পরযুক্ত। রোজার হাউসকিপার হওয়া, রোজার ছবি আঁকা, রোজাকে রকসি মদের বিপদ থেকে বাঁচাতে বিয়ার, পরে ফরেন বিয়ার, পরে হেডক্লার্কের উপরে নির্ভরশীল হওয়া, পরে অফিসে তাকে আরও ক্ষমতা দেয়া।

আশ্চর্য! সে তো ডেসপারেট হয়েই মিত্রবাহাদুরের কাছ থেকে পাসের বইগুলো নিজের কাস্টডিতে নিয়েছে। চেকবইগুলিও। ক্ষমতাও কমিয়ে দিচ্ছে তার। হ্যাঁ, এখন ডেসপারেট হতেই হয়। কেন মিথ্যা ট্যুরডায়েরি? কীসের ভয়ে?

এই দেখো! সে কি সুচেতনার ছবিটাকে শেষ করতে পারবে না?

৭

সেপ্টেম্বরের সেই পরপর দুদিন ছুটির কথা হচ্ছিল। সে হরিণযুগল হত্যার পর থেকে সেইপর্যন্ত আমার সব কথা বলতে আরও কিছু বলতে হয়, অকিঞ্চিৎকর হলেও। যেমন এই সময়ের মধ্যে ময়ূর আর নরবুর একটা কুকুর সংগ্রহ হয়েছে। বড়, কালো। সুন্দর নয়। মোটা গর্দানের উপরে বড় মাথায় মুখ বেমানান ছুঁচলো, সামনের পাদুটো অন্য কোন বলবান জন্তুর কাছে ধার করা। নরবুর দিনমানের খেলার সাথী। বেঁধে না রাখলে রাতে ময়ূরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

ডিএফওর আদেশে ময়ূর ইতিমধ্যে একদল অসুরকে গোরুমারা থেকে নুমপাই-এ পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। জন তিনেক তরুণী, একজন প্রৌঢ়া, জন ছয়েক নানা বয়সের পুরুষ। তরুণীরা কেউই করুইএর মতো সুন্দরী নয়। কিন্তু তামা রং, টিকলো নাক, আয়ত চোখ, চুলে পাখির পালক। নরবু বলেছিল, এই তিনটি বাচ্চা স্ত্রীলোকের জন্য এই পুরুষগুলো লড়াই করে মরবে। সে যাই হোক,

কুকুরটা তাদের দল থেকেই ময়ূরের সঙ্গে এসেছে, তার নুমপাই থেকে ফেরার সময়ে।

যেমন, পোস্টমাস্টারের ইতিমধ্যে কয়েকবার মাইবং গ্রামে যাওয়া। বসন্তের টিকাদারই প্রথমে বলেছিল গ্রামটার কথা। তাসিলা থেকে নিচে, মাইল তিনেক পশ্চিমে। তাসিলার তুলনাতেও দরিদ্র গ্রাম। যুগের পর যুগ যাদের বহির্জগৎ বড়জোর তাসিলা। তাসিলায় তারা আসে শাকসবজি নিয়ে। শীতে কমলালেবু আনে। অনেকের বাড়িতে দু-একটা করে কমলার গাছ আছে। এরাও মঙ্গোল গোষ্ঠীর। দাবি করে, তারাই আসলে তাসিলা অর্থাৎ পবিত্র গিরিপথের বা উপত্যকার প্রকৃত অধিবাসী। মালাধর বসু নাম নিলেই তো হয় না। লিখতেও হয়। মাইবং-এর সেই স্বগোষ্ঠী-বিচ্যুত, পরে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের নিয়ে লিখতে ইচ্ছা হয়েছিল পোস্টমাস্টার মুরলীধরের।

তো মাইবং-এর মোট লোকসংখ্যা দুশোজন। মাইবং থেকে যা সে জেনেছে, ইতিমধ্যে একরাতে লিখতে বসে পোস্টমাস্টার লক্ষ্য করছে, তাতে একটা প্রবন্ধই মাত্র হয়। লোকসংখ্যা, স্ত্রীপুরুষশিশু ভেদে, বয়স ভেদে, কার কী জীবিকা, এসব বড় জোর একরকম সেন্সাস। দুটো আবিষ্কার হয়েছে, এদের ভাষার গুটিকয়েক শব্দ যা তাসিলার ভাষায় নেই। সে শব্দকে অনুকরণ করেছে ইতিমধ্যে। আরও গবেষণা দরকার। দ্বিতীয় আবিষ্কার, এদের এক রকমের মুখোশ নাচ আছে। সেই নাচের দলের কর্তার কাছে থেকে সে একটা মুখোশও যোগাড় করতে পেরেছিল ইতিমধ্যে। হাজার শব্দ হলে একটা কাজ হয় বটে মালাধর বসুর।

যাক সে কথা। মুরলীধর, সেপটেম্বরের সেই জোড়াছুটির প্রথম দিনে রেঞ্জার সুচেতনার ছবির ঢাকনা খুলে, রং তুলি গুছিয়ে নিচ্ছে দেখে, মুখোশটাকে কাঁধঝোলায় ভরে ক্লুটলংএর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। তার আগে কেউই পুজোর ছুটিতে তাসিলা ছাড়ছে না, তারপর সময় স্রোত কিনা, ক্যালেন্ডারের ছুটির তারিখগুলো নৌকো কিনা, এসব আলাপ। মনে হচ্ছে এবার সুচেতনার ছবি শেষ হবে।

সে পথে ভাবলে, সেই হরিণমাংসের লাঞ্চের দিনে প্রভঞ্জনের সামনে সেই হালকা শিফন ম্যাক্সি পরা সুচেতনাকে দেখে সে মুলোশাক আনতে বেরিয়ে পড়েছিল, আর রেঞ্জার লাঞ্চে নিমন্ত্রিত জেনেও ফিরতে প্রায় তিনটে বাজিয়ে ফেলেছিল, আজ তা হতে দিলে চলবে না। কী বিসদৃশ ব্যাপার!

যাক, যাক, তাতে মালাধর বসুর কী? সে বরং পথের দিকে চাইল। সে ইতিমধ্যে গ্রেগ অ্যাভেনুতে এসে পড়েছে।

তো গ্রেগের সে সব ধর্মের ব্যাপার। জেন এয়ার কিন্তু, এদিকে, সাদা, কালো, বাদামি, কোন আলখিল্লা, ক্যাসক পরে না। ডাক্তার, ক্রিশ্চান, মিশনকেন্দ্রের কর্ত্রী জিনস পরে। এদিকে দেখো, ডম্বরির সেই অসুখের আতঙ্ক কেমন তাকে তাসিলার কেন্দ্রে এনে বসিয়ে দিল। কেউ প্রশ্ন তুলল না, কেন সে এখানে। কারো মনে হল না জেন এয়ার প্রকৃতপক্ষে এক উপন্যাস-নায়িকার নাম। তার শার্টের কলারের পাশে এক সোনার হার, যা কিন্তু এক সময়ে যেন মেয়রের গলায় দেখা গিয়েছে।

এদিকেও দেখো, সেই মেয়র, তারই কি অন্য কোন নাম শুনেছো? ওদিকে ডম্বরির অসুখের সময়ে তার যে তরতাজা মন, তা ধরা পড়েছে ; তার পরে সে অ্যামনেশিয়ার রোগী এরকম ভাবা যায় না। আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়তে দিয়ে যে ফাঁদ পাতা হল লেখা পড়া জানে কিনা দেখতে, তাতেও ধরা পড়ল না।

সে যে ডাক্তার, তাতে সন্দেহ নেই। কেন তেমন একজন এই সীমান্তের কাছে নির্বান্ধব এক ভাঙা মিশনে পড়ে থাকে? একবার এক বিদেশী ভাইরোলজিস্ট গবেষণার নামে কী সব করেছিল, ফলে শেষ পর্যন্ত ভারত থেকেই তাকে বহিষ্কার করতে হয়েছিল। ডম্বরির সেই ভেরায়লা বসন্ত—। না না, তা নতুন স্ট্রেইন নিয়ে পরীক্ষা হবে কেন?

ক্লটলংএর কিছু আগে মুরলীধরের চিন্তায় বাধা পড়ল। সে সামনে এক ভিড় দেখতে পেলে। ঠিক ভিড় নয়। কয়েকজন মিলে পথের ধারে একটা রঙীন হোর্ডিং খাড়া করেছে আর তা দেখছে দুজন। দু পা হাঁটতে সে লোকদুটিকে মিত্রবাহাদুর হেড ক্লার্ক, আর বিরিঞ্চি এঞ্জিনিয়ার বলে চিনতে পারলে। হোর্ডিংটার কাছে গিয়েও সে অবাক হল।

তা হওয়ার মতোই। সেই প্রকাণ্ড লোহার পাতে আঁকা ছবি চিড়িয়াখানার মতো বিচিত্র। বন ও পাহাড়ের দৃশ্য। যত রকমের যত গাছ সম্ভব তা তো বটেই, হাঁসুলিপরা ভালুক, বাইসন, হরিণ, হাসিমুখ হাতি, গাছে চিতা, ফেজ্যান্ট, ঘাসে চিতাপরিবার ও হরিণদম্পতী, মাঝে এক শালের ব্যবধান। নিচের ডান দিক ঘেঁষে প্রকাণ্ড হুমদোমুখো বেঙ্গল টাইগার। ছবিটার মাথায় ছ ইঞ্চি ইংরেজি অক্ষরে লেখা—ভিজিট তাসিলা।

বিরিঞ্চি বললে, বাহ্, এতো একদিনের ব্যাপার নয়। অবশ্য কয়েকদিন এদিকে আসি নি।

মিত্রবাহাদুর বললে, তা হলে সে দুদিন বিরিকি ব্লকেও ছিলেন না। সেখানেও ছবি বসেছে। মুরলীধর বললে, হেডক্লার্কবাবু, আপনারই সব চাইতে সুখী হওয়ার কথা। আপনি এখানে স্থায়ী বাসিন্দা। দেখুন, তাসিলা ট্যুরিস্ট রিসর্ট হচ্ছে। তার মানে শহরের কত উন্নতি।

মিত্রবাহাদুর বললে, শুধু খামখেয়াল হলেও হতো। খবর রাখি না ভাবছেন? যে আর্টিস্ট ডিএফওর মথ প্রজাপতির ছবি আঁকতে এসেছিল, তাকে এসব আঁকিয়ে সরকার থেকে টাকা পাইয়ে দেয়া। কম খরচ হচ্ছে? অথচ আমাদের ওয়াশিং অ্যালাউন্স মাসে আট-আনা বাড়াতে টাকা থাকে না।

সে দাঁড়াল না। বেশ রাগ দেখিয়ে চলে গেল।

মুরলীধর বিরিঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোন দিকে? ক্লটলং-এ কি? চলুন তা হলে। বিরিঞ্চি মিটমিট করে হেসে বললে, মিত্রবাহাদুর চটেছে। মেমসাহেব এখনই তার ভাইপোকে চাকরিতে দিতে পারছেন না। হসপিট্যাল উঠুক আগে। তখন দেখা যাবে বলেছেন।

তারা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। এই সময়ে বিরিঞ্চির হাতে কাগজে জড়ানো এক চৌকোণ প্যাকেট দেখে মুরলীধর জিজ্ঞাসা করলে, লাঞ্চের কৌটো? তা হলে ক্লিনিকের বাড়ির কাজে সারাদিন কাটে নাকি?

বিরিঞ্চি হাসি হাসি সলজ্জ মুখে থেমে দাঁড়িয়ে কাগজ সরিয়ে প্যাকেটটা খুললে।

মুরলীধর দেখলে, সেটা এক মার্বল প্লাক। দেখি দেখি, বলে হাতে নিয়ে প্লাকের খোদাই করা অক্ষরগুলো পড়লে। ক্লটলং ক্লিনিকের স্থাপনের তারিখ। তার তলে লেখা কনস্ট্রাকশন প্ল্যানড অ্যান্ড ডাইরেকটেড বাই, তার তলায় বিরিঞ্চি নাম, তার একাডেমিক ডিগ্রি।

মুরলীধর হেসে বললে, ও মশায় তলে তলে।

তার একটু বিস্ময়বোধও হল।

বিরিঞ্চি বললে, অসওয়ালের টাকা আর ম্যাডামের অনুরোধ।

মুরলীধর হো হো করে হেসে বললে, কী মশায়, এই পাপপুরীতে, এই নরকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে পার্মানেন্ট করলেন। নিজেকে পুঁতে দিলেন? নাকি মশায় তাসিলা ডাকিনীর প্রেমে পড়লেন?

বিরিঞ্চি বিপর্যস্ত হল। কিন্তু যত জুনিয়ারই হোক, সে একজন সিবিল এঞ্জিনিয়ার, সে হেসে বললে, কে যে কার মোহে পড়ে? আমি রেলস্টেশনের নান্নীর কথা বলছি না। তো কিছু বিলডিং মেটেরিয়াল তাকেও দেয়া যায় বটে ভাবছি। দিন পনের আগে খবরের কাগজে তাসিলার আদিবাসী নিয়ে একটা ফিচার ছিল। কালে ট্যুরিস্ট সেন্টার করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে গবেষণা ছিল। পড়েছেন? লেখক এক মালাধর বসু। মনে হয়, তাসিলা আর তার পাশের উপত্যকাগুলোকে তন্নতন্ন করে জেনেছেন। অথচ সে সব লেখার মতো মানুষ যে কে তাসিলায়, কে মালাধর, ধরতে পারছি

না। ঠিক করে বলুন তো। আপনার নামের খুব কাছাকাছি কিন্তু এই মালাধর। উপাধি তো একই। আপনি নন তো?

মুরলীধর বসু বেশ অপ্রতিভের মতো চুপ করে গেল।

তারা যখন মিশন হাউসে পৌঁছাল, তখন সেদিন জেন থেনডুপ, লিম্বু, নামগিয়ালকে নিয়ে চার্চ সাফসুতরো করতে লেগেছে। যা হয়, বেশ ভালো রকমে ধূলো উড়ছে। কর্মরতদের মুখে, চুলে হাতে বেশ ধুলো।

মুরলীধর ও বিরিঞ্চিকে দেখে জেন চার্চের সিঁড়িতে নেমে এসে দাঁড়াল। সে প্রথমেই বিরিঞ্চির হাতের প্লাকটাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল। বললে, আজই কিন্তু লাগাতে হবে।

বিরিঞ্চি বললে, আপনি এদিকের কাজ সেরে আধঘণ্টা পরে আসুন! যেখানে এটাকে গাঁথা হবে, আমি সেই প্লিন্থকে বাঁধাই করাই।

তখন মুরলীধর বললে, আপনার সঙ্গে সেই মাইবং আদিবাসীদের আর তাদের নাচের কথা হয়েছিল। একটা মুখোশ যোগাড় করেছি। আদিবাসীদের সম্বন্ধে আপনার ইন্ট্রেস্ট দেখে একটা নিয়ে এলাম।

জেন বললে, দিনটা খুব ভালোই দেখছি। চলুন চলুন, বাংলোয় গিয়ে বার কববেন, এই ধুলোয় নয়। নামগিয়াল, তুমিও এসো। এর মধ্যে কাশতে শুরু করেছো। থেনডুপ লিম্বু যা পারে করুক।

উৎফুল্ল জেন মুরলীধর আর নামগিয়ালকে নিয়ে বাংলোয় পৌঁছে মুরলীধরকে পার্লারে বসিয়ে, তার অনুমতি চেয়ে ভিতরে গেল। দু-পাঁচ মিনিটে পোশাক পালটে ফিরে এসে বললে, আপনাকে ধন্যবাদ, মাস্টারমশাই, সত্যি তা হলে মাইবং-এ মুখোশনাচের মতো আদিবাসী আছে। ওই যা ভুলে গেলাম। নামগিয়াল, পেমাকে কফির জলটল দিতে বলো।

নামগিয়াল চলে গেলে, আপনার জন্য একটা নমুনা, বলে মুরলীধর মুখোশটাকে বার করলে।

জেন মুখোশটাকে হাত নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলে। একবার গা ঝেঁকে উঠল তার, একবার সে হেসেও ফেললে। বেশ করেছে তো। ইনএইন লাফটার। কী বলবেন, নির্বোধের উচ্চহাস্য? বেশ লাইফলাইক করেছে। আদিবাসীদের এইসব অদক্ষচেষ্টাও রক্ষা করতে হয়, কী বলেন? কাগজের না শোলার? কাগজেরই।

মুরলীধর বললে, কিন্তু খুবই রিয়ালিস্টিক, স্টাইলাইজেশনের অভাবে ঠিক আর্ট হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু আলাপটা জমে ওঠার আগেই নামগিয়াল নিজেই কফির সরঞ্জাম নিয়ে এল। ইতিমধ্যে জেন মুখোশটাকে ভালো করে দেখার জন্য অদূরে দেয়ালের গায়ে একটা হুকে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

নামগিয়াল কফিটার ট্রেটা যখন টেবলে নামাচ্ছে, মুখোশটায় তার চোখ পড়ল। সে এক কৌতুককর কাণ্ড ঘটালে। সেই বুড়ো একা এতদিন ছিল ক্লটলং মিশনে, তার এত ভয়, তা কে জানতো? তার মুখ বিবর্ণ হল। সে নিজের কপালে বুকে কয়েকবার ক্রস আঁকলে।

জেন কফি পরিবেশন করতে করতে বললে, এটা হয়তো রিয়ালিস্টিক। তাদের নাচের মুখোশগুলো অন্য রকম হয়তো।

মুরলীধর বললে, তা হতে পারে। একটা কথা, ম্যাডাম, এই সব আদিবাসী, চার্চের ধর্ম, ক্লিনিকের আধুনিক চিকিৎসা, স্কুলের লেখাপড়া শেখার পর আর কি আদিম থাকে?

জেন বললে, তা থাকে না বলেই, হয়তো তাদের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়।

তা হলে কিন্তু এরকম হয়, তারা মেইনস্ট্রিম-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

তা কেন? ওদের সংস্কৃতি বদলাবে। কিন্তু শিকড় ছাড়া হবে না। আপনি আমাকে এ বিষয়ে কাইন্ডলি সাহায্য করবেন।

আদিবাসী সংস্কৃতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ নিয়ে আর একটু খোঁজ খবর নেবার ইচ্ছা হল মুরলীধরের। কিন্তু সময় ছিল না। সেই প্লাক লাগানোর ব্যাপার ছিল।

জেন বললে, আপনি যদি লাঞ্চে থেকে যান, এঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাজটা করে এসে আর একটু আলোচনা করা যায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের প্রকল্প নিয়ে।

ক্লিনিকের ভিত্তিতে যেখানে প্লাকটা লাগান হবে সেখানে এঞ্জিনিয়ার বিরিঞ্চি প্রস্তুত ছিল। জেন তাকেই প্লাকটাকে বসিয়ে দিতে নির্দেশ দিলে।

খুবই খুশির সময়। সেই শ্বেতপাথর বসানো হয়ে গেলে জেন বললে, আপনাদের দুজনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবেশী হিসাবেও আমরা কাছাকাছি। আমি এতদিন আপনাদের মিস্টার এঞ্জিনিয়ার, পোস্টমাস্টার এরকম বলছি। এখন নাম ধরে বলা উচিত হয় না?

বিরিঞ্চি বললে, সে আর বেশি কী? আমাকে বিরিঞ্চি বলবেন। আমাদের মাস্টারমশাইকে বসু, মালাধর বসুও বলতে পাবেন। আমি কিছুক্ষণ আগেই জেনেছি, তাসিলা আর তার আদিবাসী নিয়ে যিনি কাগজে ফিচার লেখেন মাঝে মাঝে, সেই মালাধর বসু আমাদের পোস্টমাস্টারই। অফিশিয়াল নাম মুরলীধর।

জেন বললে, স্প্লেনডিড। তবে আরও আলাপ হলে উনিই যে ফিচার লেখেন, উনিই মালাধর, তা বোধ হয় গোপন থাকতো না। ছদ্মনাম, নম ডি প্লুম নয় তো?

বিরিঞ্চি রসিকতা করলে, আসলে উনি মালাধরই হয়তো। পোস্টমাস্টারি হয়তো ছদ্ম ব্যাপার।

কিন্তু মুরলীধর উঠে পড়ল। তার মনে পড়ল, রেঞ্জার আজও তার বাসায়। হয়তো ছবি নিয়েই বসে আছে এখনও। আজও দেরি করা যায় না। তা ছাড়া এরকম লাঞ্চের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করে না কেউ। ওদিকে তার বাসাতেই হয়তো সুচেতনা প্রভঞ্জনকে ছুটির লাঞ্চে থাকতে বলেছে। বলা যায় না।

সে বেশ তাড়াতাড়ি হেঁটে চললে বাসায় পৌঁছাতে। ছুটির দিনটা মাটি করলে চলবে না। গ্রেগ অ্যাভেনুর ঘোরা সহজ পথে না গিয়ে, এখন সাহস নিয়ে চলতে হয়, এ রকম ভেবে সে পাকদণ্ডি বেয়ে উঠে পড়ল। খানিকটা চলে সে ভাবলে, না, এখানে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকার সন্দেহ তুলে নিচ্ছে না সে। তা হলেও এমন কী হতে পারে, যার জন্য একজন রূপসী অল্পবয়সী ডাক্তার এখানে আসেই বা কেন? এই জেন কি সে সময় বিচ্যুতি থেকে ভুগছিল, তার সুযোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষের কেউ? আজ এই তিথি, কাল উৎসব, সেদিন এনগেজমেন্ট, তাকে আর শান্তি দিচ্ছিল না? কিংবা সে সব তো সময়ের নৌকা। তা থেকে পড়ে সময়ের স্রোতে তলিয়ে গেছে?

মুরলীধর নিজেকে সতর্ক করলে, এখন এসব বুকের ভিতরের কথা নয়। চোখ মেলে সাবধানে চলতে হয় বরং। সে বরং একটা পাহাড় শিলায় উঠে পড়ল। পথ মাত্র দুফুট চওড়া, সমানও নয়, জমা পাতাপল্লব পায়ের নিচে খচমচ করে ভাঙছে। আজ সে দেরি করতে পারে না। সেই হরিণী-মাংসের দিন থেকে রেঞ্জার কিন্তু ইজেল থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারছে না, আর সুচেতনা আজও তাকে লাঞ্চে বসাতে পারে। ছুটির দিনই তো, আর পুজো। আজ হয়তো ছবিতে সই আর তারিখ বসবে শুধু।

বুদ্ধি নিয়ে চলতে হয় না? মুখোশের স্টাইলাইজেশনের কথায় নাইজেরিয়ান আদিবাসীদের কথা ও পিকাসোর কথা মুখে এসে যাচ্ছিল। ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে সে কথা। সাবধান হতে হয়। সেই সেদিন রেঞ্জার আবার নতুন করে ছবি আঁকতে গেলে টিশিয়ানের কথা বলে ফেলেছিল। এতটা অসতর্ক হতে পারে সে, তা কিন্তু সে ভাবে নি। ছি ছি, তুমি কী ভেবেছিলে? রেঞ্জার তোমার সুন্দরী স্ত্রীর ছবি আঁকা শেষ করতে চাইছে না? অকারণে শেষ টানগুলো দিতে দেরি করছে, আর

তা তার সান্নিধ্যে বসতে? সেই ঈর্ষায় তাকে ঠাট্টা করতে টিশিয়ানকে নকল করার কথা বলেছিলে তো? এখন ছবিতে টিশিয়ান নেই, আগেও ছিল না। এখন বললে দোষ নেই। আনাড়ি ভাববে। সেই ভালো।

সে বাঁ হাতে পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। ঈর্ষা কি এজন্য যে বন্ধু রেঞ্জার সুচেতনার রূপে প্রবেশ করে সুখী, আর সে নিজে মালাধর বসু হয়েও মুরলীধরকে ভুলতে পারছে না? মুরলীধরের রূপসী স্ত্রী সুচেতনা।

সে থেমে দাঁড়াল। যে পথ ধরে এগোচ্ছিল তা সংকীর্ণ আর দুরারোহ হলেও এতক্ষণ পথ ছিল, এখন সেটা আর পথ নয়। সামনে দুর্ভেদ্য কাঁটাবন আর পথটা পাহাড় বেয়ে একটা সরু দাগ মাত্র। সে দম নিলে দাঁড়িয়ে। সে বাজারের রিজ থেকে আরও উঁচু রিজে উঠে যাচ্ছিল। এই দেখো বয়সেব দিকে রেঞ্জার আর সুচেতনা কাছাকাছি। তার সঙ্গে সুচেতনার বারো বছরের তফাৎ। সে জন্য?

সে কপালের ঘাম মুছে উলটো দিকে নামতে শুরু করলে, একটা অপ্রচলিত পাকদণ্ডি পেয়ে। সে নিজেকে সতর্ক করলে। এই পাহাড়ে সময় নষ্ট করে সে লাঞ্চটাকে আজও আবার রেঞ্জার আর সুচেতনার লাঞ্চ হতে দিতে পারে না। আজ ছুটির দিনে, সে না বললেও, সুচেতনা নিশ্চয় তাকে লাঞ্চে থাকতে বলেছে। বলা উচিত।

পাকদণ্ডিটা ঠিক তা নয়ও। দুপাশে উঁচু একটা ভাঁজ, সে জন্য দুপুরের আলো থেকে যেন অনুজ্জ্বলতায় নেমে চলা। ওটা তাহলে অসওয়ালের দোকানের ছাদ। যাক।

মনে জোর পেয়ে ঈর্ষা শব্দটাকে সে অপছন্দ করলে। ঈর্ষা মানে তো অন্যের ব্যক্তিত্বর কাছে নিজেকে হারতে দেখা। বেশ ঢালু পথে সে দ্রুত নামতে লাগল।

দিনের বেলা কেন শুধু? এই তো কয়েক সন্ধ্যাতেও যখন রেঞ্জার আর সুচেতনা একাই হয়ে যায় সে বেরিয়ে পড়লে, সে কি রেঞ্জারকে ছবি আঁকতে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে নি, যে দিকে খুসি চলতে, আপনি ছবি আঁকুন বলে? ঈর্ষা কি ভালো? যার চাপে মালাধরের যা জানার নয় সেই টিশিয়ানের ছবি আঁকার অভ্যাসের কথা মুখে আসে? আর আজ তো সে ছবি দেখে বতিচেল্লির গর্ভিনী বসন্তের কথা প্রায় বলেই ফেলেছিল।

গতি কমাতে তাকে পিছন দিকে হেলে নামতে হচ্ছে।

সে ভাবলে, তা কেন? অ্যাডলটারি নয়। হয়তো মডেলের চুল ছবির মতো বিন্যস্ত করে দিতে গালে হাত, হয়তো ম্যাক্সির আজকের ভাঁজ ছবিতে যে রকম আঁকা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে বাটকসে ছোঁয়া, হয়তো একটা আলিঙ্গন, একটা চুমু। এই সব আর কি। তা কিন্তু ভালো। সুচেতনার আঁকড়ে রাখা পবিত্রতার বোধটা কমে বোধ হয় সে রকম হলে। আর তা ছাড়া ছবিতে আগেকার সেই লাইল্যাক ব্রকেড ম্যাকসি যে স্বচ্ছ মসলিন হয়ে গেছে শেষ চেষ্টায়, তা দেখে কি খুশি হয়নি সুচেতনা?

মুরলী খেয়াল করেনি। কুচো গোল পাথরের উপরে সে স্কেটিংএর মত গড়িয়ে নামছে। হঠাৎ সামনে চেয়ে ভয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সেই চোরাপথ একটা ধ্বসে শেষ হয়েছে। সেই গড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে সে দু হাতে ঘাসলতা ধরে বসে পড়ল। তার মুখ কান্নায় ভাঙতে লাগল। সে প্রায় চিৎকার করে বললে, আমি হারিয়ে গেছি।

কিন্তু সে তখনই উঠে দাঁড়াল। প্যান্টের শার্টের ধুলো ঝেড়ে নিলে। ঠাহর করলে, না, সে হারিয়ে যাওয়ার কথা বললেও, কেউ শোনে নি। দেখো তো, সুচেতনা তার রূপসী আর আদরের স্ত্রী। মিস্টার দত্ত, রেঞ্জার, এই পৃথিবীতে তার একমাত্র বন্ধু যাকে সে ভালোবাসে। ছি, ছি! এটা সেই ক্যাডই আবার। যত চাপা পড়ছে তত বেশি ক্যাড হচ্ছে। তা হলে মালাধরের আড়ালেই তো তাকে চলতে হবে, যদি সে তার নিজের চরিত্রও হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

১

সেই জোড়া ছুটির দ্বিতীয় দিনের সকালে অফিসে বসে মুরলীধর পোস্টমাস্টার নিজেই ডাকের ব্যাগ কাটলে, চিঠি গুছিয়ে রাখলে। গুমছে ডাক আনার পরে, তাকে পুরোদিনটা ছুটি ভোগ করতে ছেড়ে দিয়েছে। বিশেষ বাৎসরিক ছুটির দিন বলে সে সকালেই স্নান করে সুদৃশ্য নতুন স্যুট পরেছে। তার ব্রেকফাস্টও হয়েছে। এই সময়েই সে স্থির করলে, বুদ্ধি নিয়ে চলা হচ্ছে নিজে সিচুয়েশন তৈরি করা, তাকে উদ্ভাবন করা, সিচুয়েশনে রিঅ্যাক্ট করা নয়। তা হলে কিন্তু কিছুটা কৃত্রিমতা থাকছে, যেমন ধরো, যা হয়তো গ্রেভ মানে গম্ভীর বিষয়, তার এপাশে ওপাশে হাসি ঢুকিয়ে দেয়া, গম্ভীর না হয়ে।

সে চিঠিগুলোকে গুছিয়ে সাজিয়ে ডাস্টারে পরিষ্কার করা টেবলে তুলে সেগুলোকে সর্ট করে রাখতে শুরু করলে। সে রকম করতে গিয়ে সে দেখলে, চারপাঁচখানা ক্লটলং-এর আর খান কয়েক রেঞ্জারের চিঠিও আছে।

সে ভাবলে, আজ এই ছুটির দিনে কিছু কি উদ্ভাবন করা যায়? এই সময়ে সে ভাবলে, চিঠিগুলো নিয়ে, আজ তো ডাক বিলির কথা নয়, সে নিজেই ক্লটলং-এ যেতে পারে। সে এক নতুন সিচুয়েশান হবে যে পোস্টমাস্টার ডাক বিলি করছে। আর তার ফলে সেই ডাক্তারের সঙ্গে আদিবাসী নিয়ে আরও আলাপ করা যেতে পারবে। জেন এয়ার বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীদের পরস্পরের সান্নিধ্য থাকা ভালো। সে এক বুদ্ধি করলে, ইন্দ্রবাহাদুরকে গলা তুলে ডাকলে। সে এলে বললে, এক কাজ কর। ওই ক্যানভাসের ব্যাগটা আন। সে ব্যাগ আনলে সেটাকে ঝেড়ে পুঁছে, তাতে ক্লটলং-এর চিঠিগুলো রেখে বললে, একবার তোকে ক্লটলং যেতে হবে। চিঠিতে হাত দিবি না, ব্যাগ খুলবি না, ব্যাগ নিয়ে মেমসাহেবকে দিবি, তাঁকে ব্যাগ খুলে চিঠি নিতে বলবি। ভয় পাবি না, তারপরে ব্যাগ নিয়ে ফিরবি। ছোট ইন্দ্রবাহাদুর এই কাজের ভার পেয়ে খুব খুশি। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ছোট ছোট পায়ে তখনই সে রওনা হয়ে গেল।

ইন্দ্রবাহাদুর চলে গেলে সে ভাবলে। তার মনে পড়ল রেঞ্জারের চিঠিগুলোর মধ্যে একটা চিঠি আছে ব্যক্তিগত। সে চিঠিটাকে হাতে নিলে। ঠিকানায় রেঞ্জারের নামের আগে পূজ্যপাদ অগ্রজ লেখা দেখে বুঝলে, চিঠিটা রেঞ্জারের ভাইয়ের। সে স্থির করলে, চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে একটা হালকা প্রীতির সিচুয়েশন তৈরি করা যেতে পারে।

রেঞ্জারের বাংলোয় পৌঁছে সে বুঝলে, রেঞ্জার তার বসবার আর ছবি আঁকার ঘরেই আছে। ইজেলটা দরজার মুখোমুখি রাখা। ঘরে ঢুকতে তার পাশ দিয়ে যেতে হয়। তার উপরে একটা তিনফুট বা চারফুট ফ্রেমে ক্যানভাস। দরজার দিকে তার পিছন। দরজা দিয়ে ঢুকতে ফ্রেমের তলা দিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। ঘরে শরৎকালের উজ্জ্বল আলো। ছবির ওপারে টেবল। তার সামনে চেয়ারে রেঞ্জার। টেবলে হলুদ তরলে ভরা একটা চৌকো কাচের বোতল যাতে রোদ পড়ায় ভিতরের তরলটাকে বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছে।

পোস্টমাস্টারে পায়ের শব্দে চোখ তুলে রেঞ্জার তাকে দেখে বললে, বসুন, ছবিটা সরাই, আসতে

আজ্ঞা হোক।

ততক্ষণ ছবিটাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে মুরলীধর। সে হেঁটে গিয়ে রেঞ্জারের পাশে দ্বিতীয় চেয়ারটায় বসল। সে বললে, বেশ প্রফুল্ল দেখছি। কিন্তু আনন্দের কারণ তো আমার হাতে। এই বলে সে চিঠিটা রেঞ্জারের হাতে দিলে।

প্রভঞ্জন চিঠিটা নিলে, তার মুখ উজ্জ্বলতর হল। সে বললে, তাই বলে পোস্টমাস্টার নিজে চিঠি আনবেন? সে চিঠিটাকে টেবলে নিজের হাতের কাছে রাখলে।

মুরলীধর বললে, তা হলে বলুন, ছুটির সকালে রোদে উজ্জ্বল মদের বোতল নিয়ে একা বসে অত খুশি ভাব কেন? কিছু সেলিব্রেট করার কথা মনে হচ্ছে?

সেলিব্রেট?

হ্যাঁ, কেন নয়? ছবি শেষ হলে... যেমন ধরুন সুচেতনার ছবি। কাল দেখলাম, শেষ হয়েছে স্থির করে সই দিয়েছেন। ওটাই আপনার মাস্টারপিস আপাতত। ভাবছি এটা আপনাকেই প্রেজেন্ট করি।

তা হলে তো সেলিব্রেট করতে হয়।

আসলে এখানে একটা নতুন সিচুয়েশন তৈরি করলে পোস্টমাস্টার। তিনফুট বাই চারফুট একটা উজ্জ্বল হলুদ ছবি যাতে রোদ পড়েছে, যা নিজের চেয়ার থেকে তিন-চার হাত মাত্র দূরে, তা কারো চোখে না পড়ে পাবে না। মুরলীধরেরও তা পড়েছিল। সে বলতে চাইছিল, প্রভঞ্জন সেই ছবিটাকে সেলিব্রেট করতে চাইছে কিনা। কিন্তু কথাটা অর্ধসত্য দিয়ে ঘুরিয়েছে। পাশের এই বড় ছবিটা ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেই তার চোখে পড়েছে, কিন্তু ছবি দেখার মতো স্পষ্ট করে তাকে দেখতে তার সঙ্কোচ হচ্ছে। তা নিয়ে, তার সৌন্দর্য নিয়ে, আলাপ করা দূরে থাক। সে তো দেখতে পেয়েছে, ছবিটা রোজার প্রায় প্রমাণসাইজ শায়িতা ন্যুড। হতে পারে ন্যুড একটা ফর্ম মাত্র যাতে চিত্রকরের মনের লিরিসিজম মাত্র প্রকাশ পায়। তা হলেও পরিচিতা একজন স্ত্রীলোকের বিবস্ত্র শরীর, গলার একটা লাল কার ছাড়া যাতে একটা সুতো নেই, তাকে বারবার দেখা যায় কি, অথবা একবারই স্পষ্ট করে চোখ তুলে? তার একবার মনে হল, সে বলবে, রেনোয়ার মেডসার্ভেন্টকে মডেল করে এরকম এক ন্যুড আছে। কিন্তু তা বললেও ছবিটাকে দেখতে হবে। যা এক্ষেত্রে খুবই লজ্জার হয়ে দাঁড়াবে। রেঞ্জার বললে, আমি কিন্তু ভাবছিলাম আপনি এই গ্রেগের মদকে সেলিব্রেট করার কথা ভেবেছেন। সুচেতনার ছবিও উৎরেছে।

মুরলীধর বললে, গ্রেগের মদ? অলৌকিক কথা বলছেন? ছবিতে বোতল দূরে থাক, গ্লাস পর্যন্ত নেই।

কিন্তু আর কথা হতে পারল না। তখন রেঞ্জারের ব্রেকফাস্টের সময় আর রোজা কথা শুনে বুঝতে পারছিল, রেঞ্জার একা নয়। সে রেঞ্জারের ব্রেকফাস্টের ট্রেতে পোস্টমাস্টারের জন্য চা সাজিয়ে নিয়ে ঢুকল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। পরে ঘরে ঢুকে ট্রেটা টেবলে রেখে যখন ফিরে যাচ্ছে, রেঞ্জার বললে, রোজা মাস্টারমশাইকে কিছু খেতে দেবে না? কর্ক স্ক্রুটাও এনো।

কর্ক স্ক্রু?

প্রভঞ্জন বোতলটাকে টেবল থেকে হাতে নিলে।

সে কি, মশাই? চা কফি কি যথেষ্ট নয়?

না, মশায়, ছবি সেলিব্রেট তাতে হয় না। তা ছাড়া পুজোর দিন। তা ছাড়া দেখুন, সাইডার, পড়ে দেখুন লেবেল। বিশুদ্ধ আপেল জুস। এখানে দেখুন স্পষ্ট স্ট্যাম্প মারা, একসাইজ পেড। আসলে পিওর পানীয়, ব্রেকফাস্টে চলে। তাও ঘোষণা করা। মেড ইন সিকিম। ফরেনও নয়।

মুরলীধর একবার ভাবলে, এটা কি রেঞ্জারের স্মাগলড ফরেন বিয়ার থেকে সজ্ঞানে সরে আসা? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সে মনে করিয়ে দিলে, দেখো, এইসব অনুভূতির কথা নয়, বুদ্ধি নিয়ে উপরে উপরে চলে বেড়াতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু রোজা এল। সে একটা ট্রেতে সাজিয়ে এক প্লেট স্যান্ডউইচ, দুটো কাঁচের গ্লাস আর কর্ক স্ক্রু আনলে। সে আরও কিছু এনেছিল। তার কাঁধের উপরে যেন তোয়ালে, এরকম করে রাখা একটা সাদা স্বচ্ছ কাপড়। সে স্যান্ডউইচের ট্রে টেবলে রেখে কাঁধের সেই কাপড় দিয়ে ইজেলের ন্যুডটাকে ঢেকে দিলে।

মুরলীধর এতক্ষণে চোখ তুলে লক্ষ্য করলে, রোজার পরনে সেই লালপাড় কালো সিল্ক, চুল আলগা খোপায় বাঁধা। তার হলদে সাদা গাল বেশ লাল।

সে বললে, এতো দোকানের মতোই। সব সময়েই তৈরি থাকে নাকি খাবার?

রোজা বললে, সাহেব ট্যুরে যাবেন তাই বানালাম। সে ঝিকমিক করে হাসতে পারলে।

সাইডারটা স্পার্কলিং। খুলে গ্লাসে ঢালতে ফেনায় ভরে উঠল।

মুরলীধর বললে, না, না, আমি নয়। এ কি গ্রেগ সাহেবের মদ যে নির্দোষ হবে? বিয়ার অভ্যাস করিয়েছেন। তাই বলে মদ!

প্রভঞ্জন বললে, আরে মশাই, আজ পূজা। অ্যালকোহল কনটেন্ট তিনচার পার্সেন্ট। সেলিব্রেট করবেন না?

তখন স্যান্ডউইচের সঙ্গে সাইডারও নিতে হল।

সে বললে, হিয়ার্স টু আর্ট।

প্রভঞ্জন কম যায় না। সে বললে, হিয়ার্স টু সুচেতনা।

প্রভঞ্জনের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছিল। সে দুজনের গ্লাসই সাইডারে ভরে নিলে।

চুমুক দিতে দিতে সে বললে, ভালো নয়? এতক্ষণ ভাবছিলাম, সাইডার আমাদের আর্টের, জীবনের প্রতীক কিনা। আপেল বাড়তি হওয়ায় তা সংরক্ষণ করতেই সাইডার। সেই কাঁচা, পাকা, গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, প্রচুর আপেল নষ্ট হয়। তাই রস করে সংরক্ষণ করতে গিয়েই... এখন কিন্তু সাইডারের জন্যই বিশেষ ধরনের আপেল চাষ হয়।

একটু ভেবে মুরলীধর বললে, ও মশায়, জীবন তো এক অন্ধ তীক্ষ্ণতা যা রমণীর বুকে, চিত্রফলকে, এমন কি পাপ বন্ধ্যামাটিতে নিজেকে প্রোথিত করে।

জীবন সম্বন্ধে বাক্যদুটো যেন পাশাপাশি লাইনে গতিশীল, আলোকিত দুটো ট্রেনের মতো পরস্পর সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পরস্পরকে পার হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দফা সাইডার নিয়ে প্রভঞ্জন বললে, হিয়ার্স টু মমম

মুরলীধর সেই প্রথম গ্লাসটাকে আবার ঠোঁটে তুললে, হিয়ার্স টু মাস্ক ড্যান্সিং।

গ্লাস মুখ থেকে সরিয়ে, প্রভঞ্জন বললে, রমণীর বুকে, চিত্রফলকে তো বুঝলাম। বন্ধ্যা মাটিতে কোন জীবন প্রোথিত হল? সে যেন দুয়েক মিনিট এই ধাঁধার উত্তর খুঁজলে।

তখন মুরলীধর বিরিঞ্চি এঞ্জিনীয়ারের মার্বল প্লাক এবং তার অনুসঙ্গ মাইবং-এর মাস্কের কথা বললে। পরে সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা মশাই, আজ ছুটির দিনে ট্যুর কেন?

প্রভঞ্জন উত্তর দেয়ার আগে মিটমিট করে হাসল। বললে, প্রথম কারণ আজ পূজা। রোজাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে আজ তার বাড়িতে যাবে এখন। সেখানে আজ কুকরি পূজা হবে। তার দ্বিতীয় স্বামী হাবিলদারের কুকরি। আইডেনটিটি-ডিস্কের সঙ্গে ফেরৎ পেয়েছিল। শিয়ালকোটের রণক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করেছিল নাকি মেডিক্যাল কোর। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের হাতের তৈরি রকসি খাবে। তা নাকি মিন্টপুদিনাগন্ধী, সেই স্পেশ্যাল রকসি। সুতরাং বলেছি, স্যান্ডউইচ

করে দিয়ে চলে যাও।

দ্বিতীয় কারণও পূজার সঙ্গেই যুক্ত। আপনার কথাই মশাই। ক্যালেন্ডারে পূজার ছুটির খোপকে নৌকা না করে স্পেশ্যাল ট্রেন করা হয়েছে। সেকালে এই লাইনে গুলমি বলে এক স্টেশন ছিল। এখন স্টেশন নেই। কিন্তু রেলের লাইন আছে, বাফার লাইন আছে। এখন গুলফাম চা বাগানে যেতে এই স্টেশন পরিত্যক্ত। বাসে, কারে লোক চলাচল। তো একজন ভোর সকালে এসে খবর দিল। তার মানে সে রাতেই রওনা হয়েছিল। সে বললে, গুলমির সেই পরিত্যক্ত স্টেশনের, যার দুপারেই রিজার্ভফরেস্ট, বাফার লাইনে আগের দিনের সকাল থেকেই একটা সেলুন ছিল। সেলুনের গায়ে কাপড়ে লেখা ছিল অফিসার্স ক্লাব। এখন সেখানে কোন সেলুন নেই। সকালের গাড়ি জুড়ে নিয়ে গিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, রেলের লোকেরা পিকনিক করতে এসেছিল, বিকেল থেকে সারারাত পিকনিক করেছে। আলো ছিল সে নিঃসঙ্গ সেলুনে, বোধ হয় হ্যাজাক। মাইকে গান হয়েছে। গাড়ি চলে গেলে, মাটিতে কেটে বসানো উনুন পড়ে আছে। বেশ কয়েকজন ছিল আর খুব খেয়েছে। কিন্তু সেই ফরেস্টগার্ড যে রাতে যায় নি, পরের দিন বিকেলে অর্থাৎ গাড়ি চলে গেলে তার মনে হয়েছিল রাতে কয়েকবার বন্দুকের শব্দ শুনেছিল সে। সুতরাং এদিক ওদিক দেখতে হয়। সেই বাফার লাইন থেকে মাইল খানেক দূরে ঘাসের জঙ্গলে একটা মৃত হরিণ পেয়েছে। তার ধারণা, ওদিকে যখন পিকনিকের রান্না হচ্ছে, সেলুন থেকে কেউ কেউ হরিণের খোঁজে নেমেছিল। গুলমিতে সেলুন আসা, তার থাকা সেখানে, এসব প্রমাণ করা সহজ। সে তো আর গোপনে হয় না। ট্রেনের ড্রাইভার জানে, গার্ড জানে, পয়েন্টসম্যান জানে, নতুবা সেখানে সেলুন যায় না। গুলমিতে এখন পয়েন্টসম্যান থাকে যে শুধু সবুজ ফ্ল্যাগ দেখায়। ওটা প্রমাণ করা যাবে না যে হরিণটাকে মেরে, পরে খুঁজে না পেয়ে তারা ফেলে গিয়েছে। কিংবা কটা হরিণ মেরেছিল। অথচ ফরেস্ট বিট থেকে খবর পেয়ে রেঞ্জার ছুটিব দিন বলে তদন্তে যায় নি, তা হতে পারে না।

গল্পটা শুনে মুরলীধর ভাবল, আশ্চর্য, পূজার দিনে শিক্ষিত ভদ্র মানুষেরা কী বিনা দ্বিধায় আনন্দের নামে, জীবনকে পূর্ণ করতেই যেন, অপরাধ আর পাপ করে। তার মুখ এই চিন্তায় বিশীর্ণ হতে থাকল।

আর তা লক্ষ্য করে প্রভঞ্জন বললে, অ, মশায়, অতিলোল প্রাণ, তুলোর মতো হরিণকে যে আগুন দিতে হয় না, সে তো কালিদাস থেকেই জানা আছে। তাতে কি হরিণ মরবে না? তার চাইতে আপনাকে বলি, হঠাৎ মনে পড়ল, আমার আজকের ট্যুরের পথ থেকে দু-তিন কিলোমিটার বিচ্যুত হলে একটা বসতি আছে আদিবাসীদের। তারা মুখোশনাচ নাচে না। কিন্তু এদিকে সব চাইতে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী। মনে হয়, অন্য কোন দেশে ছিল, এই জঙ্গলে এসে বসেছে। তারা এরকম দাবী করে, তারা ভোটদেশে ভোটদের চাইতেও আদিম ছিল একসময়ে। আপনি কি টুং-এর নাম শুনেছেন? এরা সেই টুং-এর আদিবাসী। ভাষা, ধর্ম, সমাজব্যবস্থা আমাদের সব পরিচিত নরগোষ্ঠী থেকে পৃথক। সংখ্যায় কম। সুতরাং স্বগোষ্ঠীতে বিবাহ, স্বগোত্রেও বাধ্য হয়ে। প্রায় ইনসেস্ট হয়ে যায়। গৌরবর্ণ, সুন্দর, অসম্ভব রকমে দরিদ্র এই মঙ্গোল গোষ্ঠীর মানুষেরা। ভাষা শুনলেই অবাক হবেন। একটা কৌতুকের কথা শুননুম। ওদের গায়ে, বিশেষ স্ত্রীলোকদের, একরকম ঘা হয়। হয়তো কোন ফাঙ্গাস ইনফেকশন। হয়তো অপুষ্টি থেকে, কিন্তু একে অন্যকে সংক্রামিত করে চলেছে। তো, তাদের এক প্রধান বলেছিল, সেই সোর নাকি ভগবানের আশীর্বাদ, তারই ভয়ে তাদের সুন্দরী স্ত্রীলোকদের অন্যজাতের পুরুষেরা অপবিত্র করে না।

বিস্মিত মুরলীধর বললে, সে কী মশায়, সেখানে যাওয়া যায়?

যায়। প্রকৃতপক্ষে আজকের ট্যুরে সেই টুংবস্তির পাশ দিয়েই যাবো।

মুরলীধর ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। তা হলে আজই আপনার সঙ্গে যাইনা কেন? আজ

টেলিগ্রামেরও ছুটি আছে।

প্রভঞ্জন মুরলীধরের আগ্রহ বুঝলে। একটু ভেবে নিয়ে বললে, সত্যি নাকি? বেশ তা হলে বাসায় গিয়ে সারা দিনের মতো তৈরি হয়ে নিন। খাবার নিতে হবে না। রোজার তৈরি স্যান্ডউইচ আর লুচিও যথেষ্ট থাকবে। আমি কফির ফ্লাস্ক নেব। আপনি ঠাণ্ডা জলের ফ্লাস্ক নিলে ভালো হয়। অবশ্য পথে ঝর্না ও নদী থাকবেই। আমি, আপনি, নরবু। বেলা এগারোটার মধ্যে আপনার কাছে পনি যাবে। রোজা, তুমি বরং ক্যাপসিকাম আর লিম্বু পিকল পরে করো। তিনজনের দুপুরের খাবার তৈরি করে দাও।

সে রকম হয়েছিল। রেঞ্জার তার পনিতে, নরবু, পোস্টমাস্টারের জন্য আর একটা পনির লাগাম ধরে পোস্টঅফিসের কাছে গিয়েছিল বেলা এগারোটা বাজতে না বাজতে। পোস্টমাস্টারও প্রস্তুত হয়ে ছিল। নতুনত্বের মধ্যে তার মাথায় একটা স্ট্রহ্যাট রোদ নিবারণের জন্য। কাঁধ থেকে ঝুলছে পানীয় জলের ফ্লাস্ক। হাতে একটা গ্রিপই যেন। তাতে তার টেপরেকর্ডার, কাগজের প্যাড, পেনসিল। স্ট্রহ্যাট বেশ বড় বৃত্তের, ফলে তার মুখে ছায়া পড়ায় একটু অপরিচিত মনে হচ্ছে।

তাদের বিদায় দেবাব জন্য সুচেতনা পোস্টঅফিসের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পোস্টমাস্টারের এই প্রথম অশ্বারোহণ, সে পনি কিংবা আর কিছু হোক। সুচেতনার মুখটা হাসিহাসি, প্রফুল্ল, যেন কিছু কৌতুকের আশা করছে। তাতে কিন্তু নিদয়ার ভাব আছে। তা অবশ্যই পোস্টমাস্টারের সঙ্গে পনির পারস্পরিক সংযোগ নিয়ে। উঠতে পারবে কি, চলতে পারবে কি, যখন উঠতে চাইছে তখনই পনিটা সে জায়গা থেকে সরে যাওয়ায় পোস্টমাস্টারের অর্ধেকটামাত্র ওঠা হল বা।

প্রভঞ্জন বললে, মিসেস বসু, এটা কেমন সুন্দর হচ্ছে, দেখুন। বাঙালি কালচার বলে, পুজোর সময়ে ভ্রমণ করো। তা, আমরাও দেখুন, কালচার ঠিক রাখছি, ভ্রমণে চললুম। তবে আপনি কি মাস্টারমশাই-এর মুখে ভয়ের ছায়া দেখছেন?

সুচেতনা অনুচ্চস্বরে হাসল।

প্রভঞ্জন বললে, একটা কথা, মশাই, লাগামে হাত দেবেন না। লাগামটা এমন সাপোর্ট নয় যে ধরে পড়া আটকানো যায়। আপনার পনি আমারটিকে অনুসরণ করে ঠিক চলবে। পথ চেনা ওদের, ধার ঘেঁষে চলতেই বেশি ভালোবাসে। যদি মনে করেন খুব বেশি খাদের ধার ঘেঁষে চলছে, চোখ বন্ধ করে নেবেন, লাগাম টেনে খাদ থেকে দূরে নেবার চেষ্টা করবেন না। উলটো ফল হতে পারে। তারা পোস্টঅফিসের সামনে পনিতে উঠেছিল।

সুচেতনা হাত তুলে যাত্রারম্ভের সূচনা করেছিল।

তারপর চলছে দুটি পনি তাদের চেনা পথে, জোরেও নয় ধীরেও নয়, এদিকের সব পাহাড়ি মানুষেরা যে ভাবে চলে।

মুরলীধর বললে, এদের চালটা কি এরকমই?

তাই ভালো নয়?

তা বলছি না। ঠিক পাহাড়ি মানুষদের চাল শিখে নিয়েছে। আচ্ছা, মশাই, এরকম চালের হেতু কি এই, পাহাড়ের মানুষ মাত্রেই এরকম ভাবে, যতটুকু উঠছো ঠিক ততটুকু আবার নামতে হবে, অথবা মিছিমিছি নামলে কেন, যতটুকু নামলে ঠিক ততটুকু উঠতে হবে। সে জন্য তাড়াতাড়ি নেই, ঢিলেমিও নেই।

প্রভঞ্জন হাসল।

মুরলীধর বললে, তা হলে মশায় এই এক কৌতুক হচ্ছে, পনিগুলোর আদিম মনের ইনস্টিঙ্কট, স্মৃতি, অভ্যাসের তৃপ্তি তাদের সার্থক করে, তার উপরে বিজ্ঞানবুদ্ধি চাপালেই গোলমাল।

প্রভঞ্জন বললে, লাগাম, লাগামের নির্দেশ এসবকে বুদ্ধি আর বিজ্ঞান বলছেন?

তাই হয় না? ইনস্টিংক্ট, আবেগ, যা পুরাতনের স্মৃতি থেকে জন্ম নিতে থাকে, তাকে লাগামের টান দিয়ে সংহত করতে থাকলে ছোটখাট বিদ্রোহ হয় ওদের লম্বাটে মস্তিষ্কে।

কিছু দূর গিয়ে যখন তারা তাসিলা ছাড়িয়ে নেমে যাওয়ার রিজ পথ ধরেছে, প্রভঞ্জন বললে, নারেঙ্গিহাট পৌঁছাতে বেলা একটা হয়ে যাবে। লাঞ্চটা সেখানেই সেরে নেয়া যাবে।

সেখানে কি ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসার জায়গা আছে?

তা একদিক দিয়ে ভালো, অন্তত গাছের তলায় পরিষ্কার ঘাসজমি খুঁজে বার করার চাইতে ভালো।

তা ছাড়া ওখানে হাতমুখ ধুয়ে নেয়ার জল পাওয়া যাবে।

পিছন থেকে সাহেবদের আলাপ শুনে নরবু বললে, গিয়েনচং-এর দোকানে চিয়ার হবে, টেবিল হবে, জলপানি হবে।

প্রভঞ্জন বললে, নরবুও যখন সায় দিচ্ছে, তখন আর কথা নয়।

নারেঙ্গিহাটে নেমে যেতে তাদের একটা পার হয়ে গেল। নারেঙ্গিহাট গ্রাম পোস্টমাস্টারের অত্যন্ত পরিচিত কিন্তু তার চোখে নতুন লাগল।

তাসিলায় আসার পরে এই প্রথম সে তাসিলায় বাইরে চলেছে। আসার দিন গরম কালের বেলা ছিল। তার কপালগুণে ট্রেনটা বিকেলেই এসেছিল রাত না করে। তার আগেকার পোস্টমাস্টার পনি, ঝব্বু, মাল বইবার কুলি পাঠিয়েছে। তাদের ভিড়ের মধ্যে, নিজের মনের মধ্যে, নিজেদের ও নিজেদের মালপত্র— যা তো একটা সংসারের ট্রানশিপমেন্ট, ট্রাকের বদলে ঝব্বু আর কুলিদের পিঠে কোন রকমে উঠছে— তা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যস্ত ; অবশ্যই পথে কোথাও থামার কথা নয়। ওরা বলেছিল বটে নারেঙ্গিহাট। সন্ধ্যার আলোতে ছড়ানো ছড়ানো কয়েকটি টিনের ঘর দেখেছিল সে।

এখনও সে রকমই দেখছে। তাসিলার পাহাড় এখানে এতটা চওড়া উপত্যকায় ছড়িয়ে গিয়েছে। সমতলের মতো যার একদিকে তাসিলার পথ আর তিনদিকে অরণ্য। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। হাটের জায়গাটা পথ থেকে কিছুটা সরে। হাট বসার প্রমাণস্বরূপ ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা বাঁশখুটির উপরে কয়েকটা চালা। সেগুলোতে হাটের দিনে দোকান বসে। তাদের থেকে আরও কিছু সরে অন্তত দুটি টিনের ছাদের টিনের দেয়ালের বাড়ি পরস্পরের কাছাকাছি। অনুমান, দোকানদুটি সারা সপ্তাহে, হাটের দিন ছাড়াও, টিম টিম করে চলে। হয়তো চা আর ভাজা, হয়তো সেই দোকানের মধ্যেই তেল, নুন, চিনি পেলেও পাওয়া যায়। আর তাদের থেকে সরে, অনুমান হয়, রাস্তার বিপরীত দিকে, এসব দোকান থেকে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে বেশ একটা উঁচু, বড়, বিশেষ ধরনের বাড়ি। বাড়িটার টিনের ছাদে প্যাগোডার গড়ন দূর থেকেই চোখে পড়ে, প্রান্তগুলো উপরের দিকে শিখার কায়দায় তুলে দেয়া। কোন সময়ে রং ছিল তার চিহ্ন আছে। সেই দোতলা বাড়ির একতলাটার তিনদিকে পাথরের দেয়াল— পূর্ব দিকটায় দেয়াল নেই। কাঠের মোটা মোটা স্তম্ভের উপরে দোতলা, যার কাঠের মেঝে নিচতলার দেয়ালের উপরের ছাদ। দোতলার দেয়াল কাঠের। সেই দোতলার দেয়াল ঘিরে ফুটচারেক চওড়া রেলিংদার বারান্দা, সামনের দিকে তো বটে দুপাশেও। দেখতে দেখতে, যাদের ছবি দেখা আছে, তাদের মনে হবে ভুটান রাজ্যের কোন জং বা দুর্গের ছোট আকারের অনুকৃতি, শুধু সে সব জং-এর একতলার একদিকের দেয়াল নেই, এমন হয় না।

সেই বাড়িটার দিকে তারা এগোতে থাকলে। নরবু বলে দিল সেটাই গিয়েনচং-এর বাড়ি আর যাদের ভারি করে বলতে ইচ্ছা করে তারা বলে কগিয়েনচং।

সেই বাড়ির একতলাতেই দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে কিন্তু বরং পূর্বে এগিয়ে এসে এখনকার স্থায়ী চায়ের দোকান। দোকানটা সত্ত্বেও একতলার উত্তর অর্ধেক এবং পশ্চিমের দেয়াল বরাবর একটা প্যাসেজ খালি থাকে। চায়ের দোকানটার উনুন কিন্তু খোলা আকাশের নিচে, ছাদের বাইরে। সম্ভবত তা এ জন্য যে উনুনের ধোঁয়া দোতলায় পৌঁছালে চলে না। এর মধ্যে একটা বিষয় আছে। দোকানটা সকালে খুলে সন্ধ্যা সাত-আটটা পর্যন্ত চলে। হাটের দিনেই যা বিক্রি, কিন্তু সপ্তাহের বাকি পাঁচদিনও দোকান খোলা থাকে। কোনদিনে সকাল থেকে সন্ধ্যায় চার পাঁচ কাপ চা বিক্রি হয়, কোনদিনে বা দশ বারো কাপ। তো সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময়ে উনুনে ভুটিয়া ধূপের সরু সরু ডাল চাপিয়ে দেয়। রাতভোর ধোঁয়া ওঠে। ধূপের গন্ধ, আর মশাও হয় না। হাটের দিনদুটোতে চায়ের দোকানের উত্তরে উত্তর দেয়াল ঘেঁষে মিঠাই লাড্ডু জিলিপির দোকান একটা বসে। খুব বিক্রি হয়।

এসব নরবু বলতে থাকল যতক্ষণ না পনি থেকে রেঞ্জার ও পোস্টমাস্টার সাহেব নামল। পোস্টমাস্টারের কাছে অবশ্যই নতুন। প্রভঞ্জন নিজেই বললে, সেও তাসিলায় উঠতে বা সেখান থেকে নামতে অনেকবার দোকানটায় চা খেয়েছে। কাপগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কয়েক সেট সেকালের, অনেকদিনের পুরনো স্টাইলের। রেঞ্জার সাহেবকে সেই কাপে চা দেয় দোকানদার। পঞ্চাশ বছর আগে যারা চা খেতেন, তাঁরা এরকম মোটা বড় সাদা চীনামাটির কাপ রেলস্টেশনে সোরাবজির চায়ের দোকান দেখে থাকবেন। বিলেত থেকে জাহাজে আসতো। আর সম্ভবত এই সব চীনামাটির কাজ যারা করতো, সে দেশের তাদের নিয়ে ট্রলোপ উপন্যাস লিখেছিল।

ঠিক এরকম সময়ে চায়ের দোকানে ঢুকতে দোতলার রেলিংদার বারান্দার দিকে চোখ পড়েছিল তিনজনেরই। সেখানে বারান্দায় সদ্য সরে যাওয়া রোদের ওমে পূর্বদিকে মুখ করে ভুটিয়া বোকু পরা, যার উপরে গলার কাছে পশমি মাফলার, সাদা ধবধবে চুলের এক বৃদ্ধ। সে একটা ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে আছে। তত নিচে থেকে তার মুখ স্পষ্ট বোঝা যায় না। সাদা চুলের নিচে হলদেটে সাদা বৃদ্ধের মুখ। অনুমান, চোখদুটি যতটুকু না খুললে নয়, ততটুকু খোলা।

নরবু দোকানে ঢুকতে ঢুকতে ফিসফিস করে বললে, গিয়েনচং। রেঞ্জারও এ পর্যন্ত তাকে দেখে নি, সুতরাং পোস্টমাস্টার তো বটেই, রেঞ্জারও চোখ তুললে। রেঞ্জারের মনে হল, সেই বৃদ্ধ ঠোঁটদুটো যতটুকু ফাঁক না হলে নয় তেমন করে থামল যেন।

রেঞ্জার বললে, দেখে নিন, মশায়, অনেক গল্প আছে, পরে বলবো।

তাদের সেদিনের লাঞ্চ ভালোই হল। রেঞ্জার ও পোস্টমাস্টারের স্যান্ডউইচ ছিল। সামান্য সুযোগে পেয়েই সুচেতনা ডিমের বড়া ভেজে দিয়েছিল। রোজা মুখ আটকানো বোতলে সুপ দিয়েছিল। ওদিকে নরবু তার ধাঁউসা আর শুকনো ডাল করে এনেছিল। চায়ের দোকানদারকে বললে, সে নরবুর জন্য বড় আকারের মটরশুঁটি আর গাজরকুচি দিয়ে অমলেট ভেজে দিল। দোকানের চা মশলা দেয়া না হয়ে বরং, তার ভাষায় ইংলিশ চা, সুস্বাদের হয়েছিল, সুগন্ধি না হোক।

তারা গুলমির বিট অফিসের দিকে যাবে। মাঝামাঝি দূরত্বে রেঞ্জার আর নরবু গুলমির রাস্তা ধরলে পোস্টমাস্টার টুং-এ যাবে। পথ হারানোর কোন সুযোগই নেই। পোস্টমাস্টারের পথ—ধানের জমিতে পৌঁছালেই সে টুং-এর কুটিরগুলি দেখতে হবে। সবই প্রায় কাঠের খুঁটির উপরে ছনের ছাদের দোতলা। দেয়াল কিছু বাঁশচাটাই, কিছু কাঠ। নিচতলা গোরু ও শুয়োরের। পরিবেশ দরিদ্র এবং সেজন্যই অপরিচ্ছন্ন।

গিয়েনচং-এর একতলার চায়ের দোকানে লাঞ্চ শেষে বেরিয়ে তারা দেখলে, পনিদুটো হাটের

উপত্যকায় সীমায় পথের ধারের পাহাড় থেকে ঘাস খাচ্ছে। সুতরাং তাদের হেঁটে পনিদের দিকে চলতে হল। পোস্টমাস্টারের একবার মনে হল সে জিজ্ঞাসা করবে, এটা কি পনির আবেগ যে মুখে বিজ্ঞানের বিট থাকা সত্ত্বেও এভাবে ঘাস খাচ্ছে। অবশ্যই কষ্ট হয় মুখের ভিতরের লোহাটায়।

কিন্তু পথে গিয়েনচংকে নিয়েই আলাপ হল পনির গবেষণার বদলে। প্রভঞ্জন বললে, বাড়িটার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হবে। আমাদের বড়বাবু মিত্রবাহাদুর সে রকম বলে। যদিও তার নিজের বয়স পঞ্চাশ না, কিন্তু ছোটবেলা, চারপাঁচ বছর বয়স থেকেই, সে জানে এটা তার জন্মের আগে তৈরি। তার পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হল, এটারও বয়স পঞ্চাশ হতে পারে।

মুরলীধর বললে, পঞ্চাশ বছর আগে, ত্রিশের দশকের গোড়াতেও কি এখানে ভুটিয়ারা ছিল? এটা ৭৯ সাল।

নববু গল্প শুনতে এগিয়ে এসেছিল। প্রান্তরের পথে পাশাপাশি দুটি পেনি মৃদু চালে চলছে। কিন্তু হেঁটে চলছিল তারা। নববু বললে, এ বাড়িটাকে ভুটিয়া বাড়ি পনি বলতে আছে। এ বাড়িটা ডোলমার। আর এ বাড়িটাও তৈরি করেছে ভোট মিস্ত্রিরা।

তুমি তো এ বাড়ি সম্বন্ধে জানো দেখছি, নরবু। ডোলমা আবার কে এল?

নরবু বললে, গিয়েনচং যেমন বুড়ো, তেমন এক বুড়ি আছে ওই বাড়িতে। বুড়ো কখনও নিচে নামে না। কিন্তু হাটের দিনের কোন কোনটায় ডোলমা নেমে আসতে আছেন। হাটে কিনতে আছেন। একদম সাদা চুল কি। ভুটিয়া বুড়ি। একদম লাল ঠোঁট, সাদা মুখ কি। বোকু পরতে আছেন।

প্রভঞ্জন বললে, নববু ঠিকই বলছে। বুড়ি একজনও আছে। মিত্রবাহাদুর তার নাম ডোলমা বলেছিল বটে। মুরলীধরের বুড়ি সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না, বুড়ো থাকলে তার এক বুড়িও থাকতে পারে। বাড়িটার গড়নই তাকে টানছিল। সে বললে, এরা কি আসল ভোট? তাদের জং-এর যে ছবি দেখছি, তাতে কখনই তিন দেয়ালওয়ালা ঘর দেখি নি। এই বুড়োর বয়স সত্তর হলে বুড়িরই বা কত কম হবে?

প্রভঞ্জন বললে, এ ব্যাপারেও মিত্রবাহাদুর একদিন সখেদে গল্প করছিল। ওই হাটের নাম নারেঙ্গিহাট হয়েছে কেন, তা নিশ্চয় জানেন। নারেঙ্গি, মানে অ্যান অরেঞ্জ যা থেকে এল, অর্থাৎ কমলালেবু। বাড়ির একতলার মেঝে বাঁধানো দেখেছিলেন তো। এত সময়ে সিমেন্টে ফাটল ধরেনি। আগাছাও গজাতে পারে নি। পঞ্চাশের দশকেও ওই তত বড় একতলার মেঝে জুড়ে কমলার সিজনে লাখ কমলালেবু বিছানো থাকতো। হাটের দিনে দিনে সেকালে কমলার সিজনে গোরুমোষের গাড়ি বোঝাই করে দক্ষিণ থেকে পাইকাররা কমলা কিনে নিয়ে যেতো। পরে ট্রাক বোঝাই করেও নিতো। ঘর সব দিকে বন্ধ হলে কমলার গরম বেশি লাগলে তাড়াতাড়ি মজে যায়, সেজন্য তিনদিকের দেয়ালে জানালা, আর একদিকে দেয়ালই নেই। কিন্তু আমি এসে নারেঙ্গিহাটে বড় জোর পিঠের খাঁচায় করে বয়ে আনা যে কমলা দেখেছি, তা সবসমেত হয়তো দু এক হাজার হবে। বলতে পারেন, এখনও কমলার খোঁজে দক্ষিণ থেকে লোক আসে। সে বড়জোর হাজার লেবুর পাইকার।

নরবু বললে, এস্ত শুনছ। ডোলমার নিজের চারশো গাছের সন্তরা বাগান ছিল। সেই লেবু যখন আসতো, তার সঙ্গে অন্য অন্য বাগান থেকেও আসতো। এখন ডোলমার না আছে সেই বাগান। সে বাগান এখন ডোলমার জেঠি বেটির হল। সন্তরা তত হয় না।

নরবুকে পনি ধরে আসতে বলে পথের ধারে পাথরে বসে প্রভঞ্জন বললে, নরবুর এ সংবাদও ঠিক। ডোলমার বড় মেয়েকেই সেই বাগান দিয়েছিল ডোলমা। সেই বাগানের বয়সও আশি-নব্বুই বছর হবে। আমি জানি না, বাগান তত বয়সেও ফল দেয় কিনা। কিংবা পুরনো গাছে উই ধরলে তা কেটে ফেলে নতুন নতুন গাছ লাগিয়ে বাগানকে ফলপ্রসূ রাখা হয় কিনা। মিত্রবাহাদুর ফরেস্টের চাকরিতে ঢোকার আগে কিছু দিন সেই বাগানে কাজ করেছিল। গতবছর এবকম পুজোর ছুটি

কাটাতে মিত্রবাহাদুরের সঙ্গে সেই বাগানে গিয়েছিলাম। আমারও খুব কৌতুহল ছিল ফলে অবনত কমলাবাগান দেখতে। আর তত অসুবিধাও ছিল না। ডোলমার সেই বাগান থেকে দুদিনের মধ্যে ঘুরে আসা যায়। এখন অবশ্য সে বাগানের নাম জেঠির বাগান। মাইবং-এর উত্তরে যে রিজটা পূর্ব পশ্চিমে প্রায় চলে গিয়েছে, তার ওপারের ঢালটাও আমাদের ফরেস্ট এরিয়া। কিন্তু রিজটায় এপার থেকে যত উঠতে হয় ওপারে ততটা নামতে হয় না। হাজার ফুট নামলে একটা নদী কিংবা চওড়া ঝর্না। তাতে যত জল, তার চাইতে বেশি বালি আর পাথর। সেই নদীপারে আমাদের এরিয়াতে একটা ছোট সুন্দর ফরেস্ট বাংলো আছে। নদীটা পার হলে ভুটান রাজ্য। নদীটার অবস্থানই তিন আড়াই হাজার ফুট। তার ওপার থেকেই যে রিজ পূর্ব-পশ্চিমে না চলে পূর্ব উত্তরপশ্চিমে গিয়েছে তার উপরে কমলার সেই বাগান, রিজের গায়ে গায়ে তিন হাজার থেকে প্রায় চার হাজার ফুটে পর্যন্ত।

মুরলীধর বললে, ও মশায়, এবার ছুটি কাটাতে সেই বাংলোয় গেলেই হতো।

প্রভঞ্জন হেসে বললে, কপাল মশায়, সেলুনের পিকনিকের হরিণহত্যার তদারকিতে চলেছি।

নরবু পনিদুটিকে নিয়ে এসেছিল। প্রভঞ্জন পাইপের আগুন-আগুন ছাই ঝেড়ে ফেললে। হাত বাড়িয়ে তার পনির লাগাম হাতে নিলে। মুরলীধর বললে, পনিটাকে ধরো বাপু আমার ওঠার সময়ে।

কিন্তু পনিতে উঠতে গিয়ে প্রভঞ্জন সময় নিলে। কিছু ভাবলে যেন। বললে, নরবু, বেলা একটা হয়ে গেল এখানেই। গল্পে বসলে তো খেয়াল থাকে না। এক কাজ করা যাক নরবু, গোরুগাড়ি আর ট্রাকের ঘোরা পথে না গিয়ে শর্টকাট করি গোরুমারা বনে ঢুকে। তুমি সে ভাবে গুলমি বিট অফিসে চলে যাও। বলো, আমি আসছি। আমি বরং মাস্টারসাহেবকে নিয়ে শর্টকাট করতে করতে কর্ড ধরে গোরুমারা বিট অফিসে যাই। সেখানকার বিট অফিসে টুং-এ বাড়ি এমন একজন গার্ড আছে। মাস্টারসাহেবকে তার সঙ্গে দিয়ে দেবো। আধমাইলের মধ্যে টুং। সেই মাস্টারসাহেবকে টুং দেখিয়ে নিয়ে সন্ধ্যা হতে হতে নারেঙ্গিহাটে পৌঁছে দেবে। আজ নবমীর চাঁদ। নারেঙ্গিহাট থেকে পনিতে মাস্টারসাহেব একাই যেতে পারবেন। সে রকমই হল। প্রভঞ্জন তার পনিতে উঠলে, নরবুও মুরলীধরকে তার পনিতে উঠতে সাহায্য করলে। প্রভঞ্জন যেমন বলেছিল, দশ মিনিট চওড়া পথটায় এক সঙ্গে চলবার পর মুরলীধর একবার পেছন ফিরে দেখলে, নরবু উধাও। সে কথা প্রভঞ্জনকে বলতে, সে বললে, বাঁ হাতের পাহাড় বেয়ে উঠে গিয়েছে, পার হয়ে হয়ে পথ ধরতে গুমলি যেতে।

তাদের সামনে তখন ট্রাক চলার সেই রাস্তা যা তাসিলা রোডের দিকে যাচ্ছে।

মুরলীধর বললে, আচ্ছা, মশাই তুলনাটা কি বদলে নেয়া হবে? পনির মনটা যদি তার ব্যক্তিত্ব হয়, লাগাম হাতে আমরা কি তার সুপারইগো?

প্রভঞ্জন হেসে উঠল। বললে, আচ্ছা মশাই, ওইসব ব্যাপার কি আপনি বিশ্বাস করেন? চোখে দেখা যায় না বলে ভগবানে বিশ্বাস হয় না, তবে ওই সব ইগো, সুপারইগোতে কী যুক্তিতে বিশ্বাস করা যায়? সব সমান মিথিক্যাল নয় অর্থাৎ ওটা কি মিথ ছাড়া আর কিছু? কিন্তু এবার সামলে।

ডান দিকে ঘন বন। বড় ঘাস, ঝোপ, বনসন্নিবিষ্ট বড়গাছ, মাথার উপরে আকাশ অল্প, পত্রাচ্ছাদনই বেশি। ঘাস যেখানে ঈষৎ হলুদ একটা দাগ হয়ে খানিকটা দূরে আরও গভীর বনে ঢুকেছে, তার উপরে পনি নিয়ে প্রভঞ্জন বললে হেসে, এবার মশাই লিবিডোর মতো ব্যাপার হবে ক্রমশ এই পথ।

মুরলীধরের গা ছমছম করল। সে বললে, না, মশাই, আমরা একটা রং, রোদ্দুর, ছোট বাংলো, এসব গল্প করছিলাম।

প্রভঞ্জন বললে, সে তো ডোলমার কমলা প্লান্টেশনের কথা। এদিকে কিন্তু, একটা কথা বলে

দি, ঝোপঝাড় পায়ে না লাগে, মাথার উপরের ডালে মাথা ঠুকে না যায়। এই সব পথে বনেচররা লাকড়ি কুড়াতে একা একাই চলে। ম্যানইটার নেই। চিতা দু একটা থাকতে পারে। জোঁক আছে, শুঁয়োপোকা আছে আর সাপ। যেখানে পাশাপাশি চলার ফাঁক নেই, পিছনে আসতে থাকবেন। তো সেই প্লানটেশন যা পাহাড়ের গায়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে কোথাও ঢাল বেয়ে, কোথাও বা ধাপে ধাপে, সেখানে অনেক গাছ, মিত্রবাহাদুরের মতে চার-পাঁচশো। গাছগুলোর নিচে নিচে ঘাস কেটে নেয়া, অবশ্যই গরু, ঝব্বু ইত্যাদির খাদ্য হবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছিল, গাছগুলোর নিচে নিচে লাইন ধরে কিছু লাগানো হয়েছে, শটি কিংবা আদা হতে পারে। সেই ডোলমার বাগান যা এখন জেঠি মানে বড়মেয়ের বাগান সেখানে অবশ্য ডোলমা ছিল না। ছোট ছোট খড়ের ছাদের খড়ের দেয়ালের ঘর ছিল মাঝে মাঝে। সেগুলোতে বাগানের কৃষিকর্মীরা থাকে। মালিকদের একটা বাংলো আছে, সে বরং নিচে নদীর ধারে। এরকম ব্যাপার, যেন ফরেস্টের ছোট বাংলোটা আর বাগানের বাংলোটা প্রায় মুখোমুখি নদীর দুপারে। বাগানের বাংলোটা সেকালে কী রকম ছিল জানা যায় নি। কিন্তু গত বৎসর তার ভিতরটা বেশ আধুনিক আর কমফর্টেবল ছিল। ইলেকট্রিসিটি ছিল না। কিন্তু ব্যাটারিতে চলে এরকম একটা ছোট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি ছিল, সমুদ্রসৈকতে ট্যুরিস্টরা যে রকম সঙ্গে রাখে। ডোলমা তো নারেঙ্গিহাটে, জেঠি থিম্পুতে, সেখানে জেঠির বৃদ্ধ পিতা দোর্জে ছিলেন। স্বাস্থ্য ভালো এরকম এক বৃদ্ধ যাকে দেখলে সৌম্য ও অভিজাত বলে চেনা যায়। নেপালি বলতে পারেন, একটু ভিন্ন উচ্চারনের দুচারটে বাংলা শব্দ বলেন, ভিন্ন অ্যাকসেন্টের ইংরেজি। শব্দে বাক্য তৈরি হয না, কী বলবেন তা বোঝাতে পারেন। তো বয়স আশির কোঠায় বললেও এখনও মেরুদণ্ড সোজা। হাঁটবার সময়ে মাথা পা থেকে ছফুট উপরেই থাকে। খুব খাতির করলেন। একটা লাঞ্চ খাওয়ালেন, চাকর দুজন রান্না করল। যোগাযোগের মতো হল। আমরা সন্ধ্যার আগেই নদী পার হয়ে ফরেস্ট বাংলোটায় ফিরবো। সেখানেই তো রাতের বিছানা আর খাওয়াও। দোর্জে ভুটিযার কাছে তখন আমার বিদায় নিয়ে তাঁর বাংলোর বাইরে এসেছি। দুজন ভুটিয়া বোকু পরা সঙ্গীর আগে আগে এক ভদ্রমহিলাকে বাগানের গাছের ফাঁকে ফাঁকে পায়ে চলা রাস্তা ধরে নেমে আসতে দেখা গেল। সেই জেঠি। মিত্রবাহাদুরতো এক সময়ে তার বাগানে কাজও করেছে। তার সম্বন্ধে রোমান্টিক হওয়ারও আশা করেছিল এক সময়ে। উঁচু বংশের ধনী ভুটিয়ারা, তিব্বতী মহিলারা যেমন হযে থাকেন, তেমন পোশাক, তেমন গায়ের রং, কিন্তু চুলের কাট আর কানের সোনা ইংরেজ মহিলার মতো আধুনিক। অন্তত ট্যাশদের মতো তো বটেই। আর সেন্ট, যেটা ব্যবহার করেছিলেন সেই বছর পঁয়তাল্লিশের সুন্দরী, তাও কলকাতার মহিলাদের মতোই। যদিও আমার সন্দেহ হয় এখন, বাগানের বাতাসে যে কমলা সুঘ্রাণ ছড়িয়ে তাই সেন্টের গন্ধ অনুমান করেছিলাম ; আমার ভুলই ছিল। আসলে সেটা সেই তীর্যকচক্ষু জেঠির রূপ। মিত্রবাহাদুরকে চিনলেন। সে কী করে বর্তমানে জানতে চাইলেন। মিত্রবাহাদুর পরিচয় করিয়ে দিল। আমি যে রেঞ্জার, তার বস, তাও জানালে। মিত্রবাহাদুর বোধ হয় ভাবলে, তার পক্ষে গিয়েনচং ও ডোলমার সংবাদ দেয়া উচিত ডোলমার কন্যাকে। যদিও সে তাদের সংবাদ রাখতো কিনা সন্দেহ। তার ধারণা বোধহয় এই ছিল, নারেঙ্গিহাটের সেই বুড়োবুড়ির জীবনে কোন দুঃসংবাদ থাকলে হাটে আর তা থেকে তাসিলাতে ছড়িয়ে পড়তো। সে সেরকমভাবে বললে, নারেঙ্গিহাটের খবরও ভালো। শুনে জেঠি বললে : ভালো খবর সুবাতাসের মতো, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিই কিন্তু তার কথা ভাবা হয় না। খারাপ খবর ভাবার সময় দেয় না। ক্রুকের মতো আসে আর তার প্রতিকার নেই। তা হলেও তার সঙ্গে বাংলোর ফিরে এক কাপ চা খেতে হল।

মুরলীধর হঠাৎ একটু জোরে বললে, এগুলো কী, মশাই, দেখুন তো। রেঞ্জার পনি থামালে। মুরলীধরের ডান হাতটার কব্জির উপরে বেশ খানিকটা জায়গা লাল চাকায় ভরে উঠেছে।

প্রভঞ্জন বললে, এই মরেছে। কোন ডালে হাত দিয়েছিলেন?

না দিয়ে উপায় ছিল না, মাথায় লাগতো।

বেশ করেছেন। শুঁয়ো লাগিয়েছেন ভালো করে। প্রভঞ্জন এই বলে গাড়ি থেকে নেমে, তার স্যাডলব্যাগ থেকে একটা মলমের কৌটো বার করলে। বললে, এটা লাগান। কৌটোটা পকেটে রাখুন। অন্য কোথাও চুলকাতে শুরু করলেই লাগাবেন।

সে রকম মলম হাতে আর ঘাড়ে লাগিয়ে নিলে পোস্টমাস্টার। বললে, চলুন। বরং গল্পটা বলতে থাকুন! না হলে চুলকানিতেই মন থাকবে।

প্রভঞ্জন বললে, ফরেস্ট বাংলোয় ফিরে এসে রাতের খাবার তৈরি হওয়া পর্যন্ত, খাওয়ার পরে পাশাপাশি শুয়ে মিত্রবাহাদুর, জেঠি আর তার বাগানের গল্প বলেছিল। বোঝাই যায় তার প্রথম যৌবনের মালকানির প্রতি একটা–

মুরলীধর বললে, ডিজায়ার অব দা মথ ফর দি স্টার।

তার সঙ্গে, অব লং এগো, বলতে হবে।

মুরলীধর বললে, উঃ।

চুলকাচ্ছে? একটু সময় দিন। ভাগ্যে জোঁক নয়। আজ আবার সঙ্গে নুনও নেই।

মুরলীধর বললে, বাগানও আছে, নারেঙ্গিহাটে কমলা রাখার ঘরও আছে। কমলা আসছে না কেন?

প্রভঞ্জন বললে, তাও বলেছিল মিত্রবাহাদুর। পাহাড়ের যে ঢালে সেই সুগন্ধ বাতাস আর সবুজ, ঈষৎ কমলা, পুরো কমলা রং-এর বর্তুলের ভারে আনত গাছগুলো, তা বেয়ে উঠে গিয়ে চূড়ায় পৌঁছালেই পথটা চোখে পড়ে, রিজের উত্তর গায়েই রাস্তা, কিছুদূর গিয়েই থিম্পু রোড।

থিম্পু রোড বরাবর ছোট ট্রাক চলে। কমলা এখন থিম্পু যায়। সেখানে অরেঞ্জ স্কোয়াশ হয় কিংবা সেই থিম্পুরোডের মাঝামাঝি সমতলে নামার পিচের পথে নেমে, পরে সমতলে পাইকাররা গদি বানিয়ে অপেক্ষা করে।

তা হলে জেঠির এখন কমলা বিক্রি বাগানেই হয়ে থাকে?

প্রভঞ্জন বললে, মিত্রবাহাদুরের উপন্যাস মানতে হলে তা সে করে না বছর দশেক থেকে। সে থিম্পুতেই থাকে। বাগান দেখে দোর্জে। দোর্জের এককালে কমলার ব্যবসায় ছিল। পরে দোর্জের দাদার মৃত্যু হলে দোর্জে পুনাখায় চলে যায়। পুনাখায় দোর্জেদের বাড়ি। দোর্জের দুই অগ্রজ, তাদের তিনজনের এক স্ত্রী আর সন্তানেরা সেখানে। দোর্জে সর্বকনিষ্ঠ বলে সংসারের দায় ছিল না। কিন্তু দুই অগ্রজের দুই বছরের মধ্যে পরপর মৃত্যু হল। পুনাখায় পরিবার, জমিজায়গা, বাড়ি, পরিবার-পরম্পরায় রাজ্য সরকারের চাকরি যা আভিজাত্যর অন্য নাম, দোর্জে সে সব নিয়ে পুনাখাতেই ছিল। কমলালেবুর ব্যবসার থেকে পারিবারিক আভিজাত্য, প্রতিষ্ঠা, সংসারে অবশ্যই অনেক বেশি গুরুত্বের।

এখন কি দোর্জে রিটায়ার্ড?

দোর্জে নিজেই বলেছিল, তাদের বড় ছেলে সেই চাকরিটা করছে এখন। সে এখন পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুরুষ।

বনটা একটু হালকা হওয়ায় তখন তারা পাশাপাশি চলছে। মুরলীধর জিজ্ঞাসা করলে, এই সব চাকরি কি পরিবারের পুরুষদেরই পেতে হবে? আর কেউ পায় না?

এর মধ্যে তো রাজনীতিও। অন্যের হাতে চলে গেলে পরিবারের আভিজাত্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা সবই গেল। এরই আর একটা উদাহরণ মিত্রবাহাদুর বলেছিল, তা ডোলমার জেঠি সম্বন্ধে। যেমন জেঠির প্রথম বিবাহ হয়েছিল পুনাখার এক বণিকের সঙ্গে। সে মাঝে মাঝে এই কমলা বাগানে

এসে থাকতো। কিন্তু জেঠির যখন বছর ত্রিশেক বয়স, জেঠির দিদি দোর্জেপরিবারের বড় মেয়ের আকস্মিক মৃত্যু হলে জেঠি তার স্বামীকে ত্যাগ করে সেই ভগ্নিপতিকে বিবাহ করে। কারণ সেই ভগ্নিপতিও রাজ্যের এক অভিজাত সামন্ত, দোর্জে পরিবারের সামন্তশক্তির সহায়ক। তাকে অন্যত্র বিবাহ করতে, দুই পরিবারের সম্মিলিত শক্তিকে চিড় ধরতে দেয়া যায় না। সুতরাং জেঠির সঙ্গে তার সেই ভগ্নিপতির বিবাহ হল। ফলে জেঠির পক্ষে তার কমলা প্লান্টেশনে আর থাকা সম্ভব হল না। এখন সেই ভগ্নিপতি অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় তার সহোদর এখন সেই পদ পেয়েছে। অনুমান করি, জ্যেষ্ঠি সেই পরিবারের স্ত্রী হলেও, এখন নিজের প্লান্টেশন সম্বন্ধে দেখা শোনা করার কিছু বেশি সময় পায়। মিত্রবাহাদুরের মতে পুনাখার শীত এড়াতেই জেঠি তার প্লান্টেশনে নেমে আসে। শীত ও কমলার সিজন শেষ হলে পুনাখায় ফিরে যায়। দোর্জের মায়া আছে প্লান্টেশনে। সে ফুলের গুটি ধরবার আগেই নেমে আসে বাগানে, আর ফাল্গুন-চৈত্রে গরম পড়তে সুরু করলে তবেই পুনাখায় ফেরে।

মুরলীধর কিছুক্ষণের জন্য না-দেখা সেই প্লান্টেশনে চলে গিয়েছিল যেন, ভাবছিল একবার বলবে, বেশ হতো সেই প্লান্টেশনে গেলে, হয়তো এখন তা ডোলমার প্রথম যৌবনে যেমন ছিল অথবা জেঠি যখন তার ভার নিয়েছিল তার প্রথম যৌবনে, তখন যেমন তেমনও নেই। তা হলেও আপনারাও তো খুবই সুন্দর দেখেছিলেন, যদিও তখন কমলা পাকার সিজনের সবে মাত্র শুরু, যদিও সে কমলা আর নারেঙ্গিহাটের গোলায় আসে না।

মুরলীধরের একটা খটকা লাগল। সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার মিত্রবাহাদুর এত জানলে, এটাই আশ্চর্য।

প্রভঞ্জন বললে, সেটা অস্বাভাবিক না। দুজনে সমবয়সী। ত্রিশের দশকের গোড়ায় জন্ম। আমি তার সার্ভিস বুক থেকে জানি, ৩৪ মে মিত্রবাহাদুরের জন্ম। সে সময়ে একটা অ্যাংলো নেপালি স্কুল ছিল তাসিলায়। সেখানে জেঠি তার সহপাঠিনী ছিল। ৪৫ সে স্কুল উঠে যায়। গ্রেগের স্কুল হওয়ার অনেক আগেকার ব্যাপার। গ্রেগ তো ষাটের দশকের। মিত্রবাহাদুরের বাবা তাসিলায় আমর্ড পুলিশের হাবিলদার ছিল। এখান থেকে শিলিগুড়িতে চলে যায়, যখন ফোর্ট আর জেল থাকল না, দেশও স্বাধীন হয়ে গেল। জেঠিও শিলিগুড়িতে থেকে লেখাপড়া কবতো। বছর পনের বয়স হলে জেঠি নারেঙ্গিহাটে ফিরে আর পড়তে যায় নি। মিত্রবাহাদুর শিলিগুড়ি আর দারজিলিং-এ লেখাপড়া করে গ্র্যাজুয়েট হতে থাকে। আমরা ধরে নিতে পারি, দশ-এগারো বছর পর্যন্ত তারা যখন তাসিলায় একই স্কুলে পড়ে অথবা বছর পনের বয়স পর্যন্ত শিলিগুড়িতেও একই স্কুলে পড়ে, তখন মিত্রবাহাদুর জেঠির নারেঙ্গিহাটের বাড়িতে গিয়েছে, ডোলমা গিয়েনচং-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আপনার খটকা লাগছে কোথায়?

মুরলীধর বললে, মিত্রবাহাদুরের গল্প, যা এখন আপনার গল্প হয়ে গিয়েছে তার মধ্যে যে খটকা আছে তা তো আপনি নিজেই বললেন। হাসল। বললে আবার, আপনি বলছেন ডোলমার প্লান্টেশন। সে সেটাকে তার বড়মেয়ে জেঠিকে সে প্রাপ্তবয়স্ক হলেই দিয়ে দিয়েছে। ডোলমা, গিয়েনচং-এর বৃদ্ধা স্ত্রী, আর কোন দিনই বাগানের খোঁজ নিচ্ছে না আপনার গল্পে। ওদিক বলছেন, জেঠির বাবা দোর্জে নামে সেই অভিজাত সরকারি কর্মচারী বাগানে নেমে এসে শীত কাটায়। জেঠি দোর্জে-পরিবারের কন্যা হিসাবে সেই পরিবারের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য স্বামী ত্যাগ করে ভগ্নিপতিকে বিবাহ করছে। জেঠি কি গিয়েনচং-এর কেউ নয়? অথচ তার পনের বছর বয়স পর্যন্ত সে নারেঙ্গিহাট ও তাসিলায়, সেখান থেকেই শিলিগুড়ি।

প্রভঞ্জন বললে, তা ঠিকই বটে। তাসিলার স্কুলে, শিলিগুড়ির স্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থা গিয়েনচং-এর ডোলমাই করেছে, যেমন তাদের অন্য দুই সন্তান, ছেলে ও ছোটমেয়ের বেলাতে

করেছে, আসলে গিয়েনচং ও দোর্জে এমন কি ডোলমা নিজেও জানতো না- জেঠি তো তার নাম নয়, বড়মেয়ে বলে সে বকম উল্লেখ করা হয়– আসল নাম মণি. জেঠি কাব কন্যা, দোর্জে অথবা গিয়েনচং-এর। এই দেখুন, গোরুমাবা কর্ডে উঠেছি। ট্রাকরোড ধবে এলে দু ঘণ্টা লাগতো, চোরেদের পথে আধঘণ্টায এসেছি।

মুবলীধর হেসে বললে, চোর আব পুলিশকে অনেক ক্ষেত্রেই একই বকম ওস্তাদ হতে হয।

অগত্যা। এপথে চলে আর আধঘণ্টায গোরুমারা বিট অপিসে পৌঁছাবো। আর তার পরের আধঘণ্টায় টুং-এ পৌঁছাবেন আপনি, যদি সেই ফরেস্ট গার্ডকে পাই। টুংএ ঘণ্টা দুই আড়াই সময পাবেন আজ। চেষ্টা করবেন, সাড়ে চারে রওনা হতে। গোরুমাবা কর্ড ধরে আসবেন নারেঙ্গিহাট। সাড়ে ছয়-পৌনে সাতে। নবমীব চাঁদ থাকবে। তাড়াহুড়ো করবেন না। পনি সাড়ে আট-নটায তাসিলায় পৌঁছে দেবে নিজের মতো চলে। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চাবও হবে আপনাব।

মুরলীধব বললে, তা হবে। আজ আলো থাকবে বটে। কখনই সন্ধ্যাব চাইতে বেশি অন্ধকাব হবে না। কিন্তু–

প্রভঞ্জন বললে, আপনি গিয়েনচং-এর বাড়িব তিন দেয়ালেব কথা বলছিলেন না। তা হয়তো লেবুর গুদাম কবতেই, কিন্তু তা অন্য কাজেও লাগতো। গিয়েনচং বিশের দশকের শেষদিক থেকে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাসিলাব আর্মিব সাপ্লায়াব ছিল। পোলট্রি, ক্যাটল, শাকসবজি, আটা, চিনি, ঘি। পরে আর্মি চলে গেলে তাসিলা যখন জেলখানা হল, ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে চল্লিশের দশকেব মাঝামাঝি জেলখানার আর্মর্ড কানস্টেবুলারি, ওযার্ডার এবং বন্দীবাবুদেরও র‍্যাশন কন্ট্রাক্টর ছিল সে। সে আব একটা কাজ করতো। কী আর্মির সময়ে, কী বন্দীবাবুদেব সময়ে রোড স্টেশনে নেমে যারা তাসিলার উঠবে, তাদের জন্য ওই তিন দেয়ালের নিচুতলায চা বিস্কিট ও খাবারের দোকান বাখতো। পঞ্চাশ জন এক সঙ্গে বসতে পাবে এমন চেয়ারটেবিল ছিল। কমলালেবুর সিজনে সে সামিয়ানা খাটাতো। অন্য সময়ে ওই তিনদেয়ালের ঘরেই চায়ের জন্য বসতো সকলে, কী আর্মিব লোকেরা, কী বন্দীবাবু ও তাদের আর্মড এসকর্টরা। আর্মির সময়ে চায়ের সঙ্গে বিয়াব ও রাম থাকতো। কমলার প্লান্টেশনের ফসল বিক্রি থেকে শুরু হয়েছিল ত্রিশের দশকেব গোড়া থেকে, তা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি এসে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে, নানা রংভরা মেঘের আকাশ এক নিষ্প্রভ সিপিয়ারং সন্ধ্যার আকাশ হয়ে গেল। লেবু চালান দেয়ার এক জয়েন্ট স্টক কম্পানি ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে আর্মির সাপ্লাযার, পরে আর্মড পুলিশ ও বন্দীবাবুদের সাপ্লাই কনট্রাক্টর হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে দোর্জেকে কেউ আব নারেঙ্গিহাটে আসতে দেখে নি। কারণ ততদিনে তাদেব পুনাখার বাড়ির কর্তার, তার জ্যেষ্ঠাগ্রজেব মৃত্যু হয়েছে, মধ্যম অগ্রজ অনেক আগে থেকেই তার উপপত্নী নিয়ে পৃথক বাড়ি ও সম্পত্তি নিয়ে থাকতো, সুতরাং দোর্জেকে পরিবারের সরকারি পদ ও পারিবারিক সম্পত্তির ভার নিতে হয়, তা ছাড়া তার থিম্পুর দোকান যা আধুনিক কলকাতার দোকানের মতো, তাও দেখা শোনা কবতে হতো। এরকম অবস্থায় দোর্জে পরিবারের গৃহিণী, সে তখন প্রৌঢ়া এবং এক হিসাবে দোর্জের অগ্রজদের স্ত্রী হিসাবে তারও স্ত্রী বটে, আর তার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি, তাদের দেখতে হতো দোর্জেকে। ওদিকে ডোলমা তার প্লান্টেশনেও শেষবার গিয়েছিল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়েই জেঠিকে প্ল্যান্টেশনে প্রতিষ্ঠিত করতে। জেঠি সেখানকার ভার নিলে ডোলমা নারেঙ্গিহাট থেকে যদি কোথায সাময়িকভাবে গিয়ে থাকে তা শিলিগুড়িতে, কাবণ সেখানে তার দ্বিতীয় সন্তান যে পুত্র সে একটা রেঁস্তোরা দিয়েছে যা একসময়ে হোটেল হতে পারে, তারপর তৃতীয় সন্তান যে কন্যা সে শিলিগুড়ি থেকেও দূরে খার্সাংএর স্কুলে পড়ে। ডোলমা নিশ্চিতভাবে জানে তার তৃতীয় সন্তান কন্যাটি গিয়েনচং-এর , দ্বিতীয় সন্তানটি সম্বন্ধে তার ধারণা, তার দোর্জে অথবা গিয়েনচং-এর পুত্র হওয়ার সম্ভাবনা সমান

সমান ; প্রথম কন্যা জেঠির বেলায় তার ধারণা তার পিতা খুব সম্ভবত দোর্জে, যদিও সে শৈশব থেকে নারেঙ্গিহাটে মানুষ হয়েছে। ডোলমা সম্বন্ধে আর একটা উল্লেখ করেছিল মিত্রবাহাদুর। তাকে সব সময়েই পুরুষদের মতো বোকু পরতে দেখা যেতো হাঁটু ঝুলের, আর পুরুষদের মতো জুতো। ফলে সেই ত্রিশের দশকে যখন দোর্জে, গিয়েনচং ও ডোলমা কলকাতা যাচ্ছে, তখন তাদের তিন ভোট যুবকের মতোই অবশ্য দেখিয়েছিল। ডোলমার সুকুমার রূপের দরুন, তার লালঠোঁট দুটির জন্য দোর্জের চাইতেও কমবয়স্ক একজন তরুণ মনে হতো, আর গিয়েনচংকে তার দাড়িকামানো মুখ দেখে দলের প্রবীণতম যুবক মনে হতো, কারণ দোর্জের মুখে যে দু-চারগাছ রোম তা কখনও সখনও কাঁচিতেই কাটা চলতো। আর তাদের যৌথ বাণিজ্যের পত্তনও হয়েছিল এই কলকাতা যাওয়া নিয়ে। কলকাতা এক নগর, এক বিদেশীনগর যা নাকি আয়তনে এক দেশের মতো। ডোলমা আর দোর্জে জানতো, তাদের অনেক দক্ষিণে সে শহর আছে যেখানে তাদের কমলা যায়, সেখানে থেকে তাদের দেশের জন্য নানা পণ্য সংগ্রহ হয়। তাই বলে তারা সাহস করে যেতে পারে কি? তখন তাদের কমলালেবুর পাইকাবি আড়তদার গিয়েনচং বলেছিল, সে বেশি কথা নয়। একদিন কমলার সিজনের শেষে গেলেই হল। তিন সুদৃশ্য বোকুপরা যুবক পিঠে সুদৃশ্য বেতের পিঠু নিয়ে তাসিলা রোড স্টেশনে গাড়িতে উঠে বসেছিল, আর দ্বিতীয় দিনের ভোরে আর এক বড় রেলগাড়ি থেকে কলকাতা নামে সেই দিশেহারা করা শহরে নেমেছিল। কিন্তু দিশেহারা হয় নি তারা, পথ ভুল করে ঘুরে মরে নি, তাদের শেষ ফসল সেই তিন হাজার কমলা বিক্রি করতে তাদের ঘুরতে হয় নি। তাদের চোখে নানা শখের জিনিশ পড়েছিল, সেগুলো যথার্থ দামেই কিনতে পেরেছিল তারা, ঠকতে হয় নি, তাদের থাকার হোটেল খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি, কারণ তারা বুঝেছিল, গিয়েনচং সঙ্গে থাকলে সে সব কোন ভয় থাকে না। সে ইংরেজি বলে, কলকাতার লোকেরা তাদের সম্বন্ধে কী বলাবলি করছে নিজেদের ভাষায়, তা শুনে নিয়ে তার দুই সঙ্গীকে ভোট ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, নিরাপত্তা বা সুবিধা লাভের জন্য তাদের তখন কী করা উচিত, বুঝিয়ে দিয়ে দল নিয়ে সরে যায় অন্যত্র। সেবার কলকাতা ফেরার পর থেকে তারা তিনজনে পরস্পরের বন্ধু হয়েছিল।

পোস্টমাস্টার জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে ডোলমা কারো স্ত্রী নয়?

এখন তার এই সত্তর পার হওয়া বয়সে তিনটি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বৃদ্ধা জননীর হওয়ার পরে বরং এরকম মনে করা উচিত, সে গিয়েনচং ও দোর্জের পার্টনার। জীবনটাও তো এক দেয়ানেয়ার লাভক্ষতির ব্যবসা। নিন মশায়, এই গোরুমারা ফরেস্ট বিট অফিস। এখন দেখা যাক টুং-এর সে লোকটিকে পাওয়া যায় কিনা। আপনার বিছে লেগেছে বটে, তবে চোরদের পথ চিনেছেন, আড়াই ঘণ্টার পথ এক ঘণ্টায় এসেছেন।

সেরকম হয়েছিল। টুং-এর আদিবাসী সেই যুবক নতুন ফরেস্টগার্ডকে পাওয়া গিয়েছিল। পূজার ছুটিতে তাদের কোন উৎসব নেই, তা হলেও তিনচার ঘণ্টার জন্য হলেও নিজের গ্রামে যাওয়ার অনুমতি পেলে খুশিই হয় মানুষ। সে সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে পোস্টমাস্টারের সঙ্গী হতে রাজি হল। সেই বিট অফিসের পনিটারও সেদিন কাজ ছিল না। সুতরাং পোস্টমাস্টার সঙ্গী পেয়ে গেল। তখন প্রভঞ্জন তাকে বললে, সে যেন পোস্টমাস্টারকে গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে নিয়ে যায়, আলাপ করিয়ে দেয়। পোস্টমাস্টারকে বললে, যাওয়া আসার দু ঘণ্টাও আপনার কাজে লেগে যাবে, কারণ আপনার সঙ্গী এই ফরেস্ট গার্ড তো টুং-এর মানুষ, সেও আপনাকে টুং-এর ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পথেই দেবে। এমন সময়ে ফিরবেন যাতে ছয়-সাড়েছয়ে নারেঙ্গিহাটে পৌঁছে যেতে পারেন।

পোস্টমাস্টার যখন তার পনিতে উঠছে, আর যাতে সে সহজে উঠতে পারে, রেঞ্জার তার পনির লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছে, পোস্টমাস্টার বললে, আচ্ছা মশায়, আপনি তো ডোলমার জেঠিকে

গতবার দেখেছিলেন তার বাগানে।

তা তো বটেই। আধুনিক গাউনের উপরে একটা সুদৃশ্য এপ্রনপরা সেই বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সেব সুন্দরী সিডাকটিব নয়, কালচার্ড, কার্টিয়াস।

সে তো ভালোই কিন্তু একটা খটকা, ডোলমার বড় মেয়েব নাম মণি বলেছিলেন।

তা বটে।

আমরা বাঙালীরা বড়মেয়েকে আদর কবে মণি নামে ডাকি, সে বকম নাম বাখি। ডোলমাবা সে রকম নাম রাখবে কেন?

প্রভঞ্জন হেসে বললে, বেশি কথা কী? মণি কি শুধু বাংলা শব্দ? ওবা তো মণি শব্দের হুং মন্ত্রই দিবারাত্রি জপ করে। সে মণি শব্দেরও অর্থ আছে। আমি যা জানি, সেই মণি শব্দের অর্থ বজ্রমণি, হীরা, বুদ্ধ। আবার দোর্জে শব্দের অর্থও বজ্র, তা থেকে হীবা। আসুন।

৩

ভাবনাটা অনেকক্ষণের। লাঞ্চের পবে বিশ্রাম করে ওঠার পব থেকেই।

তা হোক, সে শোবার ঘরের আয়নার সামনে গিয়ে বসেছিল, ওডিকোলনে হাতমুখ গলা-ঘাড় ধুয়ে।

এটা অ্যানালজেসিকের ব্যাপার নয়। কাল চার্চের ধুলো ঝাড়ার ফলে তার চিরকালের ডাস্ট অ্যালার্জি। আর এটা প্রসাধনে, ওডিকোলনে, নতুন পোশাকে ক্রমশ সেরে যাবে। সে আয়নার দিকে চেয়ে হাসল। অ্যালার্জির দরুন মুখটা ভরাট দেখাচ্ছে। ব্রাশ দিয়ে সে চুলগুলোকে ইতিমধ্যে সে চকচকে করেছে। এখানেই সে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। এমন কি আজকে ক্লিনিকের কাজ দেখতেও যাবে না, না হয়। কষ্ট নয়, অস্বস্তি, বরং আয়নায় নিজেকে দেখা ভালো যে সে অসুস্থ নয়। ঘরের ভিতরে বলেই দিনেও আয়নাটা নীলাভ দেখাচ্ছে। হালকা সুন্দর একটা নীলাভ ফলক যার মধ্যে সে ঢুকে বসেছে। নীল সে একটা সুন্দর উদার আশ্বাসই।

চারটেতে থেনডুপের স্ত্রী পেমা চায়ের সরঞ্জাম আনবে। তাকে একটা নতুন বোকু নতুন এপ্রন কিনে দিতে হয়।

চারটের কাছাকাছি উঠে সে, জেন, লাইব্রেরিতে গেল। সেখানে জানলার ধারে বসে সে সেলাই করতে পারে। সে আয়নার সেই নীল আলোকেও নিজের চারপাশে নিয়ে চলল। সেই ভুটানী বোকুটাই। সেলাই খুলে সেলাই করা দরকার। বুকের উপরে ল্যাপেল দুটো চেপে বসেছে। এরকম পোশাক যারা পরে সেই ভোট-মেয়েরা কি সকলেই ককেশিয়ানদের তুলনায় ফ্ল্যাট-চেস্টেড? জামার কাটটায় তত অসুবিধা নেই। পাশ থেকে কাপড় ছেড়ে জুড়লেই হবে। কাপড়টা কিন্তু কালো চিতার গুলের মতো। আলো পড়লে খয়েরি জমিতে হাল্কা খয়েরি জিরানিয়ামগুলো চকচক করে ওঠে। অসওয়ালই আনিয়েছে কাপড়টা নাকি থিম্পু থেকে।

অসম্ভব ব্যাপারটাই দেখো, সে বলে, শোওয়ার ঘরের সেই আয়নার নীল আলোটা তাকে চারদিকে ঘিরে বসল।

আচ্ছা, দেখো, চিঠিটাই তাকে আয়নার সামনে পাঠিয়েছিল নাকি? চিঠিটা দেখো, বুকের সামনে টেঁকা হয়ে গেল, ডাকোস্টার। তো, সে তো এখানে এখন প্রতিষ্ঠিতই। মার্বল প্লাক বসেছে ক্লিনিকের। লিম্বুর আলুর জমির আলুগুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। সে চোখ তুললে। ফলে বুকশেলফের ঠিক উপরে দেয়ালে টাঙানো মাইবং-এর মুখোশটা চোখে পড়ল। সাদার ধার ঘেঁষে হলুদে মুখে সাদা

একসারি দাঁত হাসছে। সে যে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করেছে, তার একটা প্রমাণ। ডাকোস্টার এই প্রথম চিঠি, সে এখানে আসার পরে। চিঠির শেষে সই-এর উপরে লেখা, তোমার মম। লাঞ্চের আগে, লাঞ্চে, তারপরেও সে পড়েছে চিঠিটা। সেই ভায়োলেট কালিতেই, যেমন চিরদিন।

জেন সেলাই শেষ করে, জামাটা গায়ে দিয়ে ল্যাপেল দুটোকে তার বিশেষ উঁচু বুকের উপরে পেতে বসিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখে চকের দাগ দিয়ে নিলে। বসে সে নতুন করে পড়তে শুরু করলে। আর দেখ, কিছু ভোলে নি মম-- ডাকোস্টা। এমন ভাবে ডাকে দিয়েছে যাতে চিঠিটা এরকম সময়েই তার হাতে পৌঁছায়। কী আর? আজই জেনের এবারের জন্মদিন। আজ ছুটি, ডাক বিলি নেই, তা সত্ত্বেও পোস্টমাস্টার নিজের লোক দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছেন। সেটা যোগাযোগ, যে জন্য চিঠিটা জেন এয়ারের জন্মদিনে তার হাতে এসেছে। এটাকে কি অলৌকিক বলবে? না, এটায় পোস্টমাস্টারের মানবিক সহৃদয়তা ফুটেছে। বরং, তা যদি বলো, জেন এয়ারের জন্মদিন হওয়াটাই অলৌকিক। পোস্টমাস্টারের যোগাড় করে আনা এই মুখোশটাও তাঁর সৌহার্দ্যের চিহ্ন। মালাধর বসু নাকি নাম। ভালোই। নাক আর চোয়ালে একটা বেশ নর্ডিক ভাব। পটুতা আছে। তা অশিক্ষিত হওয়ায় কি অসামঞ্জস্য থাকবেই? বোধ হয় দাঁতওয়ালা হাঁ করা মুখের কোণগুলো তো লাল রং ছোঁয়াচ দেয়া তাই। কমনীয়তার সঙ্গে ভয়ঙ্করের-- দুটো বিরুদ্ধভাবকে এক করার চেষ্টা-- যা বোধহয় শিল্পীর আদিবাসী মনে পরিচয়। পেমা চায়ের ট্রে আনলে।

ভাবনাটা অনেকক্ষণের, সেই লাঞ্চের আগে থেকেই। আর এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, আয়নার আলো যত নীলই হোক, তার কিন্তু নানা রঙের ফ্রেম থাকে। তা লাল, হলুদ, বাদামি হয়ে পুরনো স্মৃতি হয়, লখনৌ হয়। কেমন সব চিন্তা আসে মনে, জন্মদিন মনে করলে! নিজের জন্মের অভিজ্ঞতা থাকে না ; মনে হয় না, এক অপরিচিত শিশুকে দেখছে, নিজেকে নয়?

সে চমকে উঠল। কিন্তু চা করে নিতে শুরু করে সে বুঝলে, পেমা চায়ের ট্রের সঙ্গে একটা ল্যাম্প নিয়ে ঢুকেছে। সেটা নীল আলো ভেঙে দিল। সে মনে মনে হাসল। কিন্তু তা হলে এখন কি সন্ধ্যা হয়ে আসছে? চা আনতে এত দেরি করেছে পেমা?

যাকগে, সে চা খেতে খেতে ভাবলে, বরং সেলাই। তা ছাড়া, দেখো, পেমার পরনেও বোকু। আর আজ সে তো স্নানের পরে পয়সার মাপের দুটো রক্তলাল প্লাস্টিকের চাকতি নিজের দুই রগে লাগিয়েছে। পেমার রগের দুটো বরং বাদামি। এ ঘরেও আয়না আছে। সে এদিক ওদিক চোখ ফেলে দেখলে, ছোট হাত আয়নাটা মুখোশের কাছাকাছি দেয়ালের হুকে বটে। জেন একটু মাথা তুলে আয়নায় নিজের রগে লাগানো চাকতিদুটো দেখে হেসে নিলে, ডু অ্যাস দা রোমান ডাজ। না, না, তাই বলে দুই স্বামী নয়। তা কিন্তু পেমাও করেনি। সে মনে মনে হাসল।

যাকগে, দিনের আলো না থাকলেও সেলাই ভালোই করা যায়। তা ছাড়া বই। বেশ, সে ডিনারের পরে। তো, এটা এখানে এমনই হবে, বিকেল থেকে সেলাই করা আর বই পড়া ছাড়া কিছু থাকে না। না, লখনৌ নয়। এখন হয়তো সাড়ে পাঁচ। ঘুমোতে যেতে নটা। বই তখন।

ওদিকেও দেখো। কারো জন্মদিন। কার? বেশি কথা কী, তা জেন এয়ারের। তা কি মিথ্যা কেক মোমবাতি সমেত? ও, না, ও, না। সে তো কবেই সমাধান করা হয়েছে। না হয়, একবার বলে নাও, এই তারিখেই ডাকোস্টা প্রথম এনেছিল তাকে কনভেন্টে, তা হলে তো ঠিকই হল জেন এযারের জন্মদিন।

যাক গে, সে এখন এখানে যা কিছু, সে নিজেই, যে নামেই বলো, কিংবা নাম নাই বলে যদি ম্যাডামই বলো।

স্থির করলে, একটু হাত চালিয়ে নিলে জামাটা আজই পরার মতো সেলাই হবে। আর আগে একদিন রাতে আয়নার সামনে টিসু সিল্কের শেমিজ ট্রায়াল দেয়া হয়েছিল, এটা ব্রোকেড। আর

ব্রোকেড স্বচ্ছ হয় না। লজ্জায় ফেলে না। এটার টেকশ্চারটাই চোখে লাগবে। কে দেখবে? কেন, এঞ্জিনিয়ার আসছে। মেয়র আসবে না, কে বললে? আর পোস্টমাস্টারও হয়তো। তা ছাড়া তার গলায় স্টেথোও থাকবে। পরনে বোকু, রগে চাকতি, গলায় স্টেথো। সে হাসল। তা কেন, তার রোগীরা নিজেদের মতো চেহারার একজন ডাক্তার পেলে কি মনে বাড়তি জোর পায় না?

সে ঢোক গিললে। কিচেনে পেমার কুকার হুইসল দিল। জেন হাত ঘড়িতে দেখলে সাড়ে সাত। শার্সির বাইরে ল্যান্ডস্কেপে আজ হালকা আলো থাকার কথা কালচে নীলের পরে। তাই হয়েছে। সে সেলাইটা নামালে হাত থেকে। আঙুল নেড়ে নেড়ে জড়তা কাটালে হাতের। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে সেলাই হল। আদিবাসীদের কথা যদি বলো— সে চোখ তুলে মুখোশটাকে দেখলে। পেট্রল-ল্যাম্পের আলোয় একটু অন্যরকম দেখায় না? সে ডিভানের উপরের একটু দূরে সরে বসল। সেলাই হাতে নিয়ে তাতে মন দিতে গিয়ে আবার চোখ খুললে সে? ওটা কি কোন ইংরেজ পুরুষের প্রতিকৃতি? সেজন্য নর্ডিক নাক আর মাথায় হলদে রং করা পাটের চুল, চৌকো ধরনের চোয়াল? এখানে কিন্তু সবই কালো চুল আর নাক চাপা বরং চওড়া মোঙ্গলীয়। শার্সির বাইরে কালচে নীল গাছপালা, ঝোপঝাড়, যার উপরে সেই হালকা হলুদ। কেউ কাউকে টেনে নিয়ে একটা ছবি হচ্ছে না। আলো যেমন, গাছপালাও তেমন নিসঙ্গ।

অবশ্য এই মুখোশে কিন্তু, যেমন পোস্টমাস্টার মালাধর বলেছেন, সেই সব স্টাইলাইজেশন নেই যা, যেমন ধরো, কোন কোন আফ্রিকান আদিবাসীদের মুখোশে থাকে। এটা বরং বিতৃষ্ণা জাগায়, আদিবাসী আর্ট বলে প্রিজার্ভ করার মতো নয়। বরং রিয়ালিজম। এখানে আদিবাসীই বা কোথায়? বোঝাই যায়, তাসিলার স্থায়ী অধিবাসীরা টাকায় কুলালে ইংরেজদের লাইফস্টাইলকে নকল করতো। দরিদ্র নিশ্চয়, অশিক্ষিত নিশ্চয়। হয়তো কুসংস্কারও, যেমন ওপারের পাশাং চামলিংদের মতো এপারেও ভোটবস্তিতে, যারা চল্লিশ থেকে ষোল পর্যন্ত বয়সের কয়েক ভাই মিলে পঁযতাল্লিশের একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করেই মাত্র সংসার বাঁধে! বিতৃষ্ণা মনে ভরে ওঠে না? অথচ টোবি স্মোলেট কী রকম উৎসাহিত, অন্তত তার চিঠিতে! হসপিট্যাল করো, ভালো। কিন্তু মেইনস্ট্রিম থেকে আদিবাসীদের বৈচিত্র্য রক্ষা করো। ডিলিউশন? সে যেন ধরেও ধরতে পারছে না। হসপিট্যাল, যার জন্য অর্থব্যয়, তাও যেন আসল নয়। তা হলে? যেমন এদেশের কাগজে লেখে? আদিবাসীদের সেলফ রেসপেক্টের নামে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ উস্কে দিতে থাকা? কথাটা কিছুক্ষণ ভাবলে সে। ফলে হতাশায় মন ভরে উঠতে লাগল। এরকম হয় না। সে এখানে ডাক্তারও নয়, তার ডিলিউশন? যেমন তার নামেই সে ফিকশন? ফিকশন থেকে নেমে আসা?

কিন্তু সে বিরক্তিবোধ করলে। যেন কাউকে ঠাট্টা করলে হয়, এমন ভাব হল তার মনে। টোবি স্মোলেট নামও কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ঔপন্যাসিক থেকে ধার করা। কে এত বোকা যে বুঝবে না? ওদিকে দেখো, যদি আদিবাসীদের মেইনস্ট্রিম থেকে বিচ্ছিন্ন করাই হয়! এই একহাজার আদিবাসীকে বিচ্ছিন্ন করেই বা কী পলিটিক্যাল স্বার্থ রক্ষা হয় কার? সে হাসতে গিয়ে থেমে নিজেকে প্রশ্ন করলে, তা হলে সে, পোলিটিক্যাল উদ্দেশ্যের মতো হোক নোংরা, তবু তো উদ্দিষ্ট কোন কাজ, তাতেও নিযুক্ত নয়। আর এটা কি কোহেন বোঝে না? তা হলে? হঠাৎ যেন সে বোতলের তলার নোংরা লীজ দেখতে পেলে। যারা টাকা দেয় তাদের কাছ থেকে কোহেন, স্মোলেট এভাবে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার নাম করে টাকা আনছে। তাকে যত পাঠায়, অবশ্য তার চাইতে বেশি রাখে লখনৌয়ে। তা হলে এটা এক মস্ত ফ্রড মাত্র?

তা হলে কী থাকছে এখানে তার? সে যেন চূড়ান্তভাবে, নিঃশেষে ঠকে গেল। সে ক্ষেত্রে এই হসপিট্যাল, এই ক্লুটলং, এসবেরই একটাই প্রয়োজন সিদ্ধি, ডাকোস্টার ফাইল থেকে মেরিয়ান রয়ের ছায়া থেকে, নিজের জীবন থেকে এক নোহোযারে পালানো? তা হলে তো টোবি স্মোলেট,

কোহেন, এদের উপরেও আর বিশ্বাস রাখতে পারে না।

মরিয়ার মতো সে উঠে দাঁড়াল, সে ভাবলে, আর তত মরিয়া হয়েছিল বলেই তার মনে ভাষা তৈরি হল। হতে পারে সে ফাউন্ডলিং, তারপর থেকে সে ফিকটিশাস, এমন কি হয়তো ফ্রডও (এই জায়গায় চোখভরা জল নিয়ে সে মাথা ঝাঁকালে) কিন্তু সে কি শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীলোক নয়? নিদারুণ চাপে সে এই শেষটাই যেন প্রমাণ করবে এমন ভাবে সে নিজেকে বললে, বাহ্ এই তো সেদিন রাতে সেই স্বচ্ছ শেমিজে আয়নায় নিজেকে দেখেছো, বেশ না হয়, আজ এখনই পরছি আর আয়নার সামনেও যাচ্ছি। পেমা ছাড়া আর কেউ আসবে না সকালের আগে। কেমন, সাধারণত যেমন হয় না তেমন লম্বা পা। কেমন উন্নত, প্রচুর, সুগোল, লাল বৃত্তযুক্ত বুক নয়? অসাধারণ সবুজ চোখ, হেলথি পিয়ারিয়ড, এমন এক স্ত্রীলোক নয়? আর তা ছাড়া, যদি জেন হওয়ায় এম ডি, এম এস ডিগ্রিতে সেই স্ত্রীলোকের অধিকার ফেলেও দাও, বিদ্যাটা, ডিগ্রি ছাড়াও, থেকে যায় সে। স্বাস্থ্যবতী এক স্ত্রীলোক নয় কি?

তখন আটটা বাজছে তার টাইমপিসে। সে চোখ তুললে। নিজেকে স্মৃতির সেই আয়নায় রাত দশের আলোতে সেই স্বচ্ছতম নাইটড্রেসে স্ত্রীলোক হিসাবে দেখার আশায় হাসতে গেল। তখনই তার মনে হল আচ্ছা, আচ্ছা, এই মুখোশ, এটা কি গ্রেগের প্রতিকৃতি? গ্রেগ? গ্রেগ ক্রুস্টার? গ্রেগরি জনাথন ক্রুস্টার, এম এ. (অক্সন) ডি ডি? যে নাকি নিসঙ্গতায় পাগল হয়েছিল? সে অবাক হয়ে সেই সাদার ধারঘেঁষা, হলুদচুলের মুখোশ, যার অর্ধেক হাঁ করা মুখে এক সারি দাঁত, যার চোখ দুটির জায়গায় শূন্যগহ্বর, দেখতে লাগল। তার সাড়া শরীর শিউরে উঠল, তার পেটের সব নাড়ি স্নায়ু হিল হিল করে উঠল। গ্রেগ, সেজন্যই মুখোশ তেমন হাসছে মনে হয়। ও, ও, ও, না, ও, না। জেন পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল মুখোশের দিকে সর্তক চোখ রেখে। ও, না, সে আর গ্রেগ এক নয়। সে ভাবলে, বেশ শক্ত করে যুক্তি দিয়ে, গ্রেগ সভ্যতা থেকে সরে গিয়ে ধর্ম চেয়েছিল সেন্টদের মতো, নিজের আত্মাকে দেখতে চেয়েছিল, হয়তো সুখ আনন্দের সঙ্গে পাপের সহ অবস্থানের যুক্তি খুঁজতো। সে তো তা চায় নি। কিছুই না, এই মাত্র প্রমাণ হল, সে নিছক এক স্ত্রীলোক হিসাবে নিজেকে দেখতে, অনুভব করতে, জীবিত থাকতে চেয়েছিল। আর সেই সময়েই, যেন তাকে, সে রকম বিবস্ত্রপ্রায় স্ত্রীলোক দেখেই সেই মুখোশও ঠাঠা করে হেসে উঠল।

সে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে পালাল দরজা বন্ধ করে দিতে। কী করবে খুঁজে না পেয়ে পায়ের গ্রিসিয়ান স্লিপারের বদলে যা দেখা যায় না এমন ক্যানভাসও পরলে তাড়াতাড়ি। এমন সময়ে ঠাঠা করে আবার গ্রেগ হেসে উঠল।

ভয় পাবে না, ভয় পেলে চলবে না, কেউ হাসতে চায় হাসুক– এরকম ভঙ্গিতে সে শোবার ঘর, করিডর, পার্লার পার হয়ে বাইরের দিকের বারান্দা থেকে সিঁড়ির পথে নেমে গেল। গ্রেগ অ্যাভেন্যুতে পৌছে সেই আলোর চাইতে বেশী অন্ধকারের রাতে সে ছুটতে লাগল।

8

আমাদের এই তাসিলা কি ভয়েরই জায়গা!

তাহলেও আটটায় মুরলীধর তাসিলায় পৌছে গেল। রেঞ্জার আর নরবু ট্যারে থেকে গিয়েছে। সে বেশ ক্লান্ত আর সুখীও। বরং সন্ধ্যা থেকে মৃদু ঠাণ্ডা পড়ায় ক্লান্তিটা চলে গেছে। টুং সম্বন্ধে রেঞ্জার যা বলেছিল, সেটা তার চাইতে বেশি। পুরো দুপুর বিকেল তার বুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করেছে।

সেই উপজাতীয় ফরেস্টগার্ড সব সময়েই তার সঙ্গে থেকে সাহায্য করেছে। টেপরেকর্ডে তার কণ্ঠস্বরই বেশি। যাওয়া আসার কয়েক ঘণ্টাও টুং-এর আদিবাসীদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ হয়েছে। গ্রামেও নানা মানুষের সঙ্গে অন্তত তিনঘণ্টা ধরে তাদের উপজীবিকা, সমাজ, উৎসব, বিবাহপ্রথা, জন্মসংস্কার মৃতসৎকার সম্বন্ধে সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে। তাদের একটা ধর্মীয় আচার প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে সে। ভাষার শব্দ ও অর্থ তার টেপরেকর্ডে আছে। একজন তরুণীর সঙ্গে আলাপ করেছে যার বাহুতে সত্যি এক রকমের ঘা ছিল। একটি প্রৌঢ়া তার অনুরোধে একটু কাপড় সরিয়ে গুল্ফ থেকে জানু তার হলুদ ত্বকের বাদামী সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্নটাকে দেখিয়েছিল। গল্পটা এই, ক্ষতগুলি অন্য জাতের পুরুষদের লোভ থেকে তাদের সুন্দরী স্ত্রীলোকদের রক্ষা করে। কিন্তু তার অন্য এক ফলও ফলেছে, আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ, সবসময় ইনসেস্ট থেকে রক্ষা পায় না।

অথচ নিজেদের জাতি সম্বন্ধে একটা ক্ষীয়মান কিন্তু তেজালো ধারণা পোষণ করে। যেমন মানুষ সৃষ্টি সম্বন্ধে তাদের এক অলিখিত পুরাণ আছে, যা অন্য কোন জাতির পুরাণের সঙ্গে মেলে না। তারাও বিতাড়িত কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক নয়। এক অগ্নিময় ইস্পাতবহুল ঝড় তাদের পূর্বভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল। আগুন জ্বলছে, মানুষ, পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, যুবক, শিশুর মৃত্যু। হাহাকার করতে করতে তারা পালিয়েছিল। পালানো কি সহজ? এক তরুণী জননী তার ক্রোড়ে সদ্যোজাত শিশু, এই বনে এসে আত্মগোপন করতে পেরেছিল। এই দিকে তখন বন ছাড়া কিছু ছিল না। শিশুটি বালক হল, যুবক হল, মাছ ধরা শিখলে, শিকার শিখলে, বন থেকে মধু আর কেঁদ সংগ্রহ করতে শিখলে। একদিন সকালে শিশুর কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙলে সে দেখলে তার দুপাশে সদ্যোজাত দুটি শিশু, একটা পুরুষ, অন্যটি স্ত্রী। সে চিৎকার করে জননীকে ডাকলে। কিন্তু জননীকে আর দেখতে পেল না। সেই শিশুদুটি থেকেই তাদের জাতি। তারা আদি পিতা আর জননী। আর যারা বিতাড়িত হয়ে এসেছিল, সেই জননী আর তার পুত্র, পাথর ও জল হয়ে গিয়েছিল। সামনের উঁচু নীল পাহাড়টা সেই বিতাড়িত জননী, আর সেই পাহাড়ের গুহা থেকে এই যে নদী সেই পুত্র। আর কোনদিনই এই পাহাড় ও নদী ছেড়ে কোথাও যাবে না।

অপুষ্টি, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অচিকিৎসা, কিন্তু না বৌদ্ধ, না হিন্দু, না ক্রিশ্চান, অসম্ভব রকমে এক আত্মকেন্দ্রিক জাতি। পৃথিবীতে এত পরিবর্তন, এত দর্শন, এত উন্নতির চেষ্টা, তারা নিজেদের এই স্বাতন্ত্র্যের বদলে আর কিছু চায় না। মুরলীধর স্থির করলে, আজই রাতেই লিখতে সুরু করতে হয়।

এদিকে কিন্তু এই প্রথম ওরকম পনিতে চড়ে তেমন পাহাড় আর জলে পরিক্রমা। নারেঙ্গিহাটে সেই গার্ড তাকে ছটায় পৌঁছে দিয়েছিল। সন্ধ্যা হচ্ছে, নবমীর চাঁদও উঠেছে। বাকি পথটা, আর সে তো স্থির করেই নিয়েছিল, পনিকে সে আপন মনে চলতে দেবে। সে তার আস্তাবল অবশ্যই চেনে, সেদিকেই সে যাবে, তাড়না করতে হবে না।

একটা সুবিধাও হয়েছিল। নারেঙ্গিহাট পার হতে হতে সে পথের বাঁ দিকে হাটের দিকে লক্ষ্য করেছিল। হাটে লোক ছিল না। টিনের ছাদের টিনের দেয়ালওয়ালা ছোট ছোট বাড়িগুলোতে আলোর আভাস ছিল। দূরে গিয়েনচং-এর প্যাগোডা ছাদের বাড়িটা দূরে। অস্পষ্ট আলোতে তা সত্ত্বেও তার আকারটা চোখে পড়েছিল। তাদের সম্বন্ধে তত গল্প শোনার পরে তাদের কথা মনে আসাই স্বাভাবিক, ভাবতে ভাবতে সে চোখ তুললে। আর তখন সে দেখলে, যেন একা চলতে হবে। সে ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু টর্চ আর নবমীর আলোয় সাহস যোগাড় করছিল। বাড়িটার সেই দোতলা বারান্দায় তখন একজনের বদলে দুজনকে যেন দেখা যাচ্ছে। একজন বসে, সেই দিনের বেলার মতোই, অন্য জন তার পাশে দাঁড়িয়ে। মৃদু একটা আলো তাদের পাশে। সেই বুড়োটা গিয়েনচং আর ডোলমা যে দিবসান্ত উপভোগ করছে।

রাত আটটা বাজে প্রায়। নারেঙ্গিহাট থেকে একটা পনিতে উঠে আসার সাহসের কাজটা করতে পেরে সে নিজেকে বেশ সুখী বোধ করছে। আর টুং-এর অধিবাসীদের নিয়ে মালাধরের একটা প্রবন্ধই হবে না। প্রকৃত একটা আবিষ্কারের মতোই একটা মনোগ্রাফ হতে পারবে।

সে তাসিলার খুব কাছে এসে পড়েছে। আলো দেখতে না পেলেও শহরের মৃদু আলোর প্রতিফলনই যেন আকাশে। তার সুচেতনার কথা মনে পড়ল। সেই, তার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী, যেন সে যখন পনিতে উঠছে তখন সেরকম গোলাপি যাকে রানী রং বলে, সেরকম শাড়ী আর স্লিবলেস পান্নাসবুজ চোলি পরে দাঁড়িয়ে পোস্টঅফিসের বারান্দায় হাত তুলে কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল মুখে বিদায় জানাচ্ছিল।

মুরলীধরের পনি টুক করে সেই টিলাটার গায়ে উঠে পড়ল যেখান থেকে তাসিলার ইলেকট্রিক আলো চোখে পড়তে থাকে। আর সেই আলো থাকাতেই যেন সে তার স্ত্রীকে আবার ভালো করে দেখতে পেলে। সে রকম হাত উঁচু করলে, স্লিবলেসের দরুন যা হয়, মুরলীধর সুচেতনার বগলের সে রকম নীলাভতা দেখতে পেয়েছিল যা বোঝাই যাচ্ছে, হেয়ার রিমুভারের দরুন। মুরলীধর চারদিকে দেখে নিল। এখানে আলো আছে বটে, জনমানব নেই। নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে এরকম এখানে ভাবলে দোষ কী? এটা কিন্তু আশ্চর্য। এসব দোকান থেকেই কেনা হয়। কিন্তু কখনই সে জানে না, কখন কেনা হয়। কী বলবে, সুচেতনার রুচি, যে এসব স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলা যায় না। কিন্তু তখন রওনা হওযার সময়ে রেঞ্জারও উপস্থিত ছিল। না, না, তা কেন?

সে বাঁ দিকে দূরে তাকাল। নিচে দূরে পিচপথই, আর তার ধারে ওই ছোট বাড়িটায় কত আলো, পোস্টঅফিসই হবে। রোজ অত আলো থাকে না। আজ এত রাতে একা আছে বলেই সবগুলো আলো জ্বালিয়েছে সুচেতনা।

সে ভাবলে, তো, ওটাও, ওই স্বচ্ছ ম্যাক্সিটাও যা ছবিতে আঁকা হয়েছে। সেটাও সদর থেকে নিজেই নিশ্চয় কিনেছিল সুচেতনা, পরে এমন কি তার সামনেও পরে নি। হয়তো পরার অকেশন পায় নি। কিংবা স্বামীর সামনেও লজ্জা করেছে পরতে। এখন ছবির ব্যাপারে কাজে লাগল।

না, না তা কেন? এতে হিংসার কী আছে? সে নিজেই তো ছবি আঁকতে বলেছে। আসলে শব্দটা বিব্রত হওয়া। প্রথমে ছবিটায় সুচেতনার পরনে মোটা ফোল্ডের সিল্ক ছিল। যাতে রেঞ্জার মাঝপথে আঁকা ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরনের নাইট গাউন ক্রমশ স্বচ্ছ মসলিন গাউন হলে আবার অনুপ্রেরণা পেল চিত্রকর। কিন্তু একজন সে রকম দাঁড়াচ্ছে, আর একজন সে রকম আঁকছে– বিব্রতবোধ হয় না সকলেরই, বিশেষ চিত্রকর আর মডেল ছাড়া তৃতীয়পক্ষের?

সে এতক্ষণ যা করে নি, এবার তা করলে। লাগাম টানলে পনির আর তাতে পনিটা দুড়দাড় করে নিচের পথে নেমে পড়ল। বিপদ ঘটে নি। সে তাকিয়ে দেখলে, সে ফরেস্টকলোনির স্ট্রিট-লাইটিং দেখতে পাচ্ছে। ওদিকেই তো যেতে হবে। পনিটাকে আস্তাবলে দিতে হবে না?

পনিটা যেন অধিকতর পরিচিত পথ পেয়ে টকটক করে চলেছে। ফরেস্টকলোনিতে ঢুকে পড়েছে। আসলে বত্তিচেল্লির সেই ছবিটার নাম বসন্ত। রাত্রিবাসটার রং হলুদ হলে কি– না সঙ্গীদের পোশাক হলুদ রঙে জ্বলন্ত কিন্তু কেন্দ্রীয় ফিগারটায় রাত্রিবাসের রং হালকা পিংক। ফলে চারিদিকের বসন্তের মধ্যে সেই মহিলা একা। আর তা এজন্য, জানো সুচেতনা, যে সেই হালকা পিংক গাউনে যে কন্যা তিনি ম্যাডোনা মেরি, খৃষ্টের জন্মের ঠিক আগে। বোঝা যায়। সেজন্যই ছবিটার বিশেষ মূল্য। তো তোমাকেও গর্ভবতী এঁকেছেন। তোমার পুত্র কি খৃষ্ট হবে নাকি? মুরলীধর ঠাট্টা করে হাসতে গিয়ে বিব্রত হল। সে মনে মনে বললে, আসলে ভদ্রলোক তো প্রকৃত একজন অরিজিন্যাল আর্টিস্ট নন। অ্যামেটার। কাজেই এই সব প্রকৃত চিত্রকরদের প্রভাব এত পড়ে ছবিতে। এসব বললে বিব্রত করা হবে।

আর তা ছাড়া, ওই বাংলোটা নিশ্চয় রেঞ্জারের, আলো জ্বলছে কিন্তু, তা ছাড়া বিব্রত হতেই

হয়। সকালে রোজা তাড়াতাড়ি ইজেলের ছবিটাকে ঢেকে দিয়েছিল না?

পনিটা টক টক করে চলছে। হঠাৎ সে নাক ঝাড়ল। কী আশ্চর্য ওটা কি আস্তাবলের, ঘাসের গন্ধ পেল নাকি। সে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, না কেউ তাকে দেখছে না, পনির শব্দও শুনছে না। সে দেখলে, রেঞ্জারের বাংলোর দরজার মাথায় আলো জ্বলছে। প্যানেল দিয়ে ভিতরের আলোও দেখা যাচ্ছে। সে বুঝলে, তা হলে নিজের বাড়ির সেই কুকরি পূজা শেষ করে রোজা ফিরে এসেছে, আর সে তো জানেই রেঞ্জার ট্যুর থেকে ফেরেনি। সে ভাবলে, তা ছাড়া এত রাতে রোজা নিশ্চয় প্রসাধনরতা থাকবে না, অপ্রস্তুত থাকবে না।

সে আচমকা দেখলে, সে পনিটাকে বারান্দার রেলিংএ লাগামে বেঁধেছে, বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজার কড়ায় হাত দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে নিজেকে সাহস দিলে। বলবে, সকালের সেই ন্যুড ছবিটা কেন গ্রেগের মদ হল, তা বুঝতে না পেরেই... ভালোমতো শুকোতেই তো দেয়া হয়েছিল...তখন ঢেকে দিলেও, এত রাতে যখন কেউ নেই তখন খোলা থাকবে।

দরজার উপরের কাচের প্যানেলে চোখ রেখে রোজাকে দেখতে পেলে সে। না, না, অপ্রস্তুত নয় আজ। হলুদ শাড়ি পরেছে বাঙালীদের মতো আর কপালে হলুদ কিছুর একটা টিপ।

দরজা খুললে রোজা, বললে আসুন, বসুন, এই ফিরলেন?

মুরলীধর বিব্রত হয়ে বললে, আজ রেঞ্জার আসবেন না।

রোজা বললে, সে জানে। দরজা থেকে সরে মুরলীধরকে ঘরে ঢুকতে সুবিধা দিয়ে সে বললে, সে জানে রেঞ্জার আজও ফিরবে না, কালও নয়। একটু কফি করি?

এখন অনেক রাত হয়ে যায় নি?

রোজা হেসে বললে, কে আর জানতে পারবে আপনার তাসিলায় ফিরতে কত রাত হয়েছিল? পনিতে কি সময় ঠিক থাকে? পনের মিনিটও লাগবে না।

রোজা কফি আনতে গেলে সঙ্কোচ সত্ত্বেও ইজেলে রাখা রোজার ন্যুড ছবিটার দু-হাতের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল মুরলীধর। এমন যে রোজা মিনিট দশেকে কফি আনলে তাকে সে রকম দেখে চোখ নামালে কফি দিতে গিয়ে। এমন যে তার কপালের শিখার মতো হলুদ টিপ, হলুদ শাড়ি, বাদামি চুল সত্ত্বেও তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

মুরলীধর যেন রাতের অন্ধকারে পড়ে গেল। সে যেন কী আতঙ্কে দিশেহারা হচ্ছে বলে তার মুখ ছাইরঙা হল। সে নিজেকে বললে, আশ্চর্য, আশ্চর্য, এটাই তো স্বাভাবিক যে গৃহকর্তা ডিনারে আসবে কি না, হাউসকিপারেরই তো জানার কথা। সে বরং নিজেকে রোজার মুখোমুখি একা সেই ঘরে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এখন কি বসার সময়? দেখো না হাঁপাচ্ছি। পনি চড়ার অভ্যাস নেই তো। পনিটাকে রেলিংএ বেঁধে দিয়েছি। সহিসকে খবর দিও, আস্তাবলে নেবে। গুডনাইট।

মুরলীধর খুব তাড়াতাড়ি নিজের কোয়ার্টারের দিকে হাঁটতে লাগল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

১

কোন তুচ্ছ ব্যাপার যখন ভয়কে চূড়ান্ততায় পৌঁছে দেয়, শিক্ষিত মনকে বিবশ করে, তখন কি বুঝবো, মন অন্য কোন হেতুতে উদভ্রান্ত ছিলই, তার ফলেই তুচ্ছ ব্যাপারটা প্রতীক হয়ে উঠেছে?

সেই উদভ্রান্ত মনে জেন গ্রেগের সেই মুখোশটাকে হা হা হা করে হেসে উঠতে শুনছিল তখনও, যখন সে রাত আটটার অন্ধকারে গ্রেগ অ্যাভেন্যু ধরে তাসিলার দিকে ছুটছে।

ছোটার ফলে জেন যখন মেয়র-বাংলোর বারান্দায় উঠেছে, সে ঠোঁট ফাঁক করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তার মুখ আরক্ত, কপালে ঘামের বিন্দু। তা হলেও দরজার মাথার কাচের প্যানেলে আলো দেখে, সে যখন বেঁচে গেল মনে করছে, তখনই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

সে পরে মনে করতে পেরেছিল, সে দরজার নবে হাত রাখতে পেরেছিল, ও ময়ূর, বলে চিৎকার করেছিল, কিন্তু তা কতখানি আর্তরবে ফুটেছিল, তা বলতে পারবে না। সেই ভালুকহেন কালো জীবটার আক্রমণে সে মরে যাচ্ছিল, তা মনে আছে।

পরে এক সময়ে সে দেখলে, মাথার উপরে উজ্জ্বল আলো, সে এক সোফায় শুয়ে, পাশে ময়ূর যে তার কপালে, চুলে, চিবুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর দু-এক হাত দূরে একটা বড় কালো কুকুর, লাল টকটকে জিভ আর কাচ-উজ্জ্বল চোখ মেলে, কৌতূহলে সব ব্যাপারটা দেখছে। যেন ইঙ্গিত মাত্রেই আবার সে খেলা দেখাতে পারে। সেই ভয়ঙ্কর আক্রমণটা তার খেলাই ছিল। ময়ূর বললে, একটু কফি আনি ম্যাডাম?

জেন উঠে বসল। বললে, তোমার কুকুরটার কাছে আমি একা থাকবো ভেবেছো? তা ছাড়া, আমি তোমার মতো সাহসী না হতে পারি, কফি নিশ্চয় ভাল করি। আমি কি খুব রাত করে ফেলেছি আসতে? যদি বৃষ্টি নামে?

আচমকা বৃষ্টির কথা শুনে, বুঝতে না পেরে, ময়ূর একটা জানলার কাছে গেল, আকাশ দেখে এসে বললে, অন্তত কয়েক ঘণ্টায় নয়। আসুন তা হলে।

ময়ূর ভাবলে, মেমসাহেবের রেখে যাওয়া শেষ কফির টিনটা আজ খোলা যেতে পারে। আর তা দরকারও। রেঞ্জারসাহেব বেশ কিছুদিন থেকে আসছেন না খেলতে। হয়তো নষ্ট হয়েই যাবে। সে সুতরাং স্টেটরুমের প্রভিশনের আলমারির দিকে এগোল।

সে ঘরে গিয়ে জেনকে পাশে দেখে বললে, বৃষ্টি হলেই বা। আপনার মত হলে, এই ঘরে এই বিছানাতেই থাকবেন। চাদর, ওয়ার, রাগ, পর্দা সব বদলে দেবো। কেমন, ভালো নয়, এই স্টেটরুম?

কফি করতে রান্নাঘরে গেল তারা। ময়ূর যখন স্টোভ জ্বালছে, টেবলে মেখে রাখা ময়দার তাল দেখে জেন জিজ্ঞাসা করলে, রাতের খাবার বুঝি? বেশ তো, কয়েকটা পরোটা করে নেয়া যাক। খালি পেটে কফি খেয়ে রাত কাটানোর চাইতে ভাল হবে। আর কী আছে? তোমার রান্নার লোক নেই আজ?

ময়ূর বললে, নরবু আজ রেঞ্জারসাহেবের সঙ্গে ট্যুরে। সে ঢাকনা খুলে, শুকনো অড়হর ডাল

দেখালে একটা বোলে। সেই ডালের লঙ্কাসমেত চেহারা দেখে, কড়া হিং-গন্ধ পেয়ে, জেনের মুখ বিবর্ণ হল। সে তাড়াতাড়ি কেটল বসালে স্টোভে। সিঙ্কে হাত ধুয়ে এসে প্রথম পরোটা করতে শুরু করলে।

রাত দশটায় কিচেনে মুখোমুখি বসে তারা রাতের খাওয়া শেষ করলে। সেই পাহাড়ে তৈরি ঘিয়ের কটুগন্ধ, হিংগন্ধী সেই আগুন-ঝাল ডালের সামান্য অংশও জেনের রুচিতে পরুষ আঘাত দিতে থাকল। ফলে রান্নাঘরের সেই আধময়লা টেবলে, ময়ূরের সামনে, সেই খাদ্যগুলোকে নিজের ভিতরে নিতে জেন দু-একবার শিউরে উঠল, তার মুখ লাল হতে থাকল, হয়তো ঝালের দাপটে, হয়তো সেই পরোটার কঠিন কর্কশতায় ; কিন্তু সে এক রকম বেপরোয়া সাহসিক সুখও বোধ করলে।

কফি দ্বিতীয়বার শেষ হল। দুধের অভাবে তা কালো।

ময়ূর বললে, রাত সাড়ে এগারো হয়।

মাঝরাতই তো।

আপনি যদি স্টেটরুমের পালঙ্ক ব্যবহার না করেন—আপনি কি ক্লুটলং মিশনে ফিরবেন? জেন হ্যাঁ, না, কিছু না বলে ভাবতে লাগল।

ময়ূর কুকুরটাকে নিয়ে বাঁধল। তার শোবার ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে এল। টর্চ, রাইফেল, বনে চলার ভারি বুট, মোটা সার্জের খাকি কোট।

জেন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এখন কি সারারাত বনে বনে?

ময়ূর বললে, চলুন। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে ওদিককার বনে একটু যাবো। ওদিকে এক অর্কিডের বন আছে। যেন অর্কিডের নার্সারিই।

তারা ফরেস্টকলোনির আলোকিত সীমা পার হয়ে গ্রেগ অ্যাভেনুতে সেই মাঝরাতের প্রায়ান্ধকার নির্জনতায় পৌঁছালে। নবমীর চাঁদে তখন মেঘ সঞ্চার হয়েছে। তারা দুজনেই অনুভব করলে, তারা খুব কম কথা বলছে গোড়া থেকেই। পথের একধারে গাছের সারি, অন্য ধারে খাদ। কোথাও দুপাশে সারি বেঁধে গাছ। আকাশের সেই রকমের আলো ছায়ার জাল পড়ছে মুখে, পথে।

জেন বললে, আমি এক রাত তোমার সঙ্গে বনে যেতে পারি না?

আজ এখন মাঝরাত হয়ে গিয়েছে।

বাহ্, সারারাত যদি বনে কাটাতে চাই, তবে মাঝরাতেই বা কী, সন্ধ্যারাতেই বা কী!

ময়ূর মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছে। বললে, ঘড়িতে দেখুন, সত্যি মাঝরাত।

হোক না। তা হলে ভোরের আলো খুব দূরে হবে না। আমাদের রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এক যদি পিপাসা পায়। তোমার এই জঙ্গলে ঝর্না নেই? তুমি বনে নেমেও এখন টর্চ জ্বেলে জ্বেলে চলবে?

সব সময়ে নয়। অন্য পক্ষ খুব হুঁসিয়ার আর হিংস্র। আপনার জামা হালকা। শীত লাগবে বনে নেমে গেলে।

জেন ভাবলে। কিছু পরে বললে, জানো, ময়ূর, তুমি কি ফাদার গ্রেগের কথা শুনেছো? যে অনেকদিন পরে ক্লুটলংএ মিশন, বাংলো, চার্চ এসব প্রায় পুরোটাই সংস্কার করেছিল, প্রায় নতুন করে তোলার মতই। তুমি তাকে দেখেছো কি? সে একজন ডক্টর ছিল।

আপনি তো ডক্টর।

সে রকম নয়। গ্রেগ ডক্টর অব ডিভিনিটি ছিল। ধর্মের ডক্টর।

ময়ূর না বুঝে অবাক হয়ে দেখলে জেনকে কেমন চিন্তায় দেখাচ্ছে। জেন বললে, বেশি ধার্মিক হওয়া কি ভালো, বলতে পারো, ময়ূর? যত ধার্মিক, তত কি ভয় নয়? একটু পরে জেন নিঃশব্দে মৃদু হেসে বললে, ইভ আর আদম যখন বনে ছিল, তখন কিন্তু তারা ঈশ্বরের অনেক কাছে ছিল,

এখনকার তুলনায়। তুমি কি গল্পটা জানো? মনে করো, আমি, ধার্মিক তো হতেই হবে, যদি আরও পরে, অনেকটা পরে ধার্মিক হই?

ময়ূর বললে, ম্যাডাম, আপনি কি কুকুর ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় পেয়েছিলেন? না, ওটা ভুলই বোধ হয়। কিন্তু কথা কি, আমাদের এই অঞ্চলটাই কেমন ভয়ের জায়গা নয়?

কী একটা পাখি ডালপালার মধ্যে ঝটপট করল, কী একটা ক্ষীণ প্রাণী মৃদু আর্তনাদ করল। জেন সরে এসে ময়ূরের বাহুতে হাত রাখল। বললে, সেই সাঁকোটার কাছে টর্চ জ্বেলো কিন্তু। ওটা সব সময়েই ভেঙে পড়বে মনে হয়। এখনও, দেখো, আমাদের পায়ের চাপে ছোট ছোট ডাল ভাঙছে। তুমি কি আমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছো? কেমন অদ্ভুত লাগে না? ভয় লাগছে না তোমার? সে কোথায়, যেখানে তুমি নিছক বনের মধ্যে ঢুকে যাবে?

দু-এক মিনিটে জেন শিউরে উঠল। সে হাত ছুঁয়ে ছিল ময়ূরের, এবাব তার বাহু ধরলে। বললে ফিসফিস করে, ওই খাদটা দেখো। অন্ধকার নয়? একদিন একটা মেয়ে বেড়াল ধরতে ওখানে নেমে গিয়েছিল। যদি আর উঠতে না পেরে থাকে? তোমার কি মনে হয় ওখানে থাকতে থাকতে তার ভয় কেটে যাবে? পথের ডানদিকে কি তোমার বনে নামার পথ? পরে আমার মনে হযেছিল, সে ডম্বরিই ছিল।

হ্যাঁ, ওদিকে একটা ওক গাছ দেখলে নেমে যাবো, ওদিকে সল্টলিক, তারপরে সেই অর্কিডের গলি।

হ্যাঁ, ময়ূর, যদি আমরা সেই বনে নেমে যাই?

ভয় করবে না?

বাহ্!

ময়ূর থমকে দাঁড়াল।

কী?

ময়ূর বললে সামনেই নেমে যাওয়ার পথ। বন কিন্তু সব সময়েই ভয়ের জায়গা।

কিংবা ভয় নিয়ে গবেষণায় লাভ হয় না। এম এ ডিডি ফাদার গ্রেগ অবশ্যই ধার্মিক মানুষ। আদিম পাপের অভিশাপ থেকে সরে যেতে যে অবস্থায় পৌঁছেছিল, তা এমন ভয়ের কি, যে গভীর রাত্রির অরণ্য বরং আশ্রয় মনে হয়?

২

রাত বারোটা হয়। সেপটেম্বরের জোড়াছুটির দ্বিতীয় দিন ইংরেজি মতে শেষ হতে চলেছে। পোস্টমাস্টার মুরলীধরও ময়ূরের মতো জেগে। সে টেবলল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোর গোড়ায়। বসবার কায়দাটায় তার আরাম অনুমান হচ্ছে। সে বাসায় ফিরে প্রচুর গরম জলে ও সাবানে স্নান করে সারাদিনের ট্যুরের ধূলো মাটি থেকে নিজেকে মুক্ত করে, উষ্ণ আহার্যে রাতের খাওয়া শেষ করে লিখতে বসেছিল, তার গায়ে সুদৃশ্য উষ্ণ আরামদায়ক ঢিলেঢালা শাল। তার কোমরের কাছে হটওয়াটার ব্যাগ। ঘোড়া চড়ার অনভ্যস্ত পরিশ্রমে সেখানে একটা মৃদু চাপ বোধ।

তার সামনে অ্যাশট্রেতে প্রচুর সিগারেটের ধ্বংসাবশেষ, যার কোন কোন অংশে এখনও ধোঁয়া ও নিভন্ত আগুন। যেন যজ্ঞ—সমাধি।

লিখতে লিখতে কলম তুলে সে ভাবলে, এগুলো তো নোটস শুধু। জায়গা বটে টুং। আর সত্যিকারের আদিবাসী চাও যদি তো সেখানে।

একটু অন্যমনস্ক হল সে। টেবলল্যাম্পে যা হয়, ঘরের টেবল থেকে দূরের কোণগুলি অন্ধকার। একটা কালো রঙের অতিকায়, পেশীদার, শিঙের মাথায় যার গোল গোল চোখ, এমন একটা চেটোকে সে দেখেছিল একবার, যদিও তা এক মোড়ার উপরে রাখা সুচেতনার চাদরটা, যা সে শুতে চলে যাওয়ার আগে তার গায়ে ছিল। ওদিকে একটা বই-এর নীল মলাটে রুপালি রঙের প্রচ্ছদ প্রকৃত পুরনো রুপোর ভাস্কর্যর মতো।

সে ভাবলে, একটু বিষণ্ণ দেখাল তার মুখ, মনের নিচে আদিম সব ক্যাড়।

ও, হ্যাঁ, নোটস, সে লেখায় চোখ ফিরালে। এথনোলজি আসলে বিজ্ঞান, সেনসাসের সংখ্যাসারি নয়। সেই আদিবাসীদের ব্যাপারে সাংবাদিকদের ফিচারের মত এ ইনট্রেস্ট, সে ইনট্রেস্ট বসিয়ে লিখলে হয় না। তাদের সমাজ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কার, মিথলজি, মিথ, গল্প, যা তাদের অলিখিত ঐতিহ্য-আগত ইতিহাসও–এসবই আনা চাই। আরও কয়েকবার যেতে হবে টুং-এ। কমপ্লিট ডিসকভারি যাকে বলে। মস্তিষ্কচর্চার সুখে হাসল সে। কাগজকলমের সংযোগে চোখে রাখলে সে। একটা বই, যাতে চঞ্চল এক মালাধর বসু, প্রতিষ্ঠিত-ব্যক্তিত্ব স্থায়ী এক মালাধর বসু হয়ে যাবে।

হঠাৎ গল্পটা মনে পড়ে গেল তার। এক জাহাজ আটকে পড়েছিল আর্কটিক সাগরের নিচে। কি করে তারপরে সংক্রমণ হয়েছিল এক রকমের ফাঙ্গাসের। প্রথমে নাবিকরা মনে করেছিল খাদ্য। পরে সেই ফাঙ্গাসের এত দ্রুত এত বেশি বৃদ্ধি হল যে প্রত্যেকটি নাবিকই সেই ফাঙ্গাসে আবৃত, বরফে ঢেকে গেলে সম্পূর্ণ যেমন দেখাতে পারে। ও, না, না! মালাধর তেমন ফাঙ্গাস নয়।

মৃদু শব্দে সে চোখ তুলে দেখলে, সুচেতনা দাঁড়িয়ে। তার হাতে চিরুনি, বেণী খুলে শুতে যাওয়ার আগে এলো খোপা বাঁধতে যেন। মুরলীধর মনে মনে বললে, তার স্ত্রী সুন্দরী বটে, বিশেষ এখন। কিন্তু, সে ভাবলে, দুঘণ্টা আগে শুতে গিয়েছিল না? তা হলে আজও কি কাঁচের শার্সিতে চোখ রেখে এই দুতিন ঘণ্টা তেমন বসেছিল, যেমন দেখে ফেলেছিল সে একদিন?

মুরলীধর খুক করে কাশল। বললে, বলো। কী সুন্দর তোমাকে দেখায় এখন, সুচি! বোধহয় আর তিন পূর্ণিমা বাকি। ভাবছি রোজাকে বলে রাখবো। সে তো এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ। আর ডাক্তার জেনকেও দুএকদিনের মধ্যে ডেকে এনে তোমাকে দেখিয়ে নেবো। সে, নাম যাই হোক, একজন দক্ষ ডাক্তারই। অসওয়ালরা তাই বলে।

সুচেতনা বললে, এখনও কি তুমি মালাধর? রাত দুটো হল! নিজের ঘরে!

মালাধর? মালাধর কেন? মুরলীধর অবাক হল যেন। ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই খবর-কাগজের নম ডি প্লুম। না, না, সুচি। এটা, মানে এই লেখাটা, একটা ডকটোরাল থিসিসের মতো হয়ে উঠতে পারে। যেমন ধর ডিএফওর মথ আবিষ্কার। এটা আমারও তেমন এক হারানো মানুষজাতি আবিষ্কার। তারপর বইটা লেখা হয়ে গেলে, হয়তো আর মালাধরকে দরকার হবে না।

মুরলীধর যেন নিজের কথাতেই অবাক হয়ে গেল। বললে, ও, এই নোটসগুলোকে সাজিয়েই উঠছি। অবশ্যই নিজের ঘর।

সুচেতনা মোড়াটাকে টেনে নিয়ে বসল।

মুরলীধর ভাবলে, সে কি সুচেতনাকে শুতে যেতে বলবে? অনেক রাত হল না? নাকি সুচেতনার একা ঘরে শুতে ভয় করে? নাকি ঘুমিয়ে পড়তেই ভয় করছে? বাহ্, তা কেন করবে?

সে বললে, আজ ট্যুরে গিয়ে রেঞ্জার বলেছিলেন, সেই হরিণমাংসের লাঞ্চের দিনে তিনি যখন তোমার ছবি নতুন করে আঁকছিলেন, তখন নাকি স্টিরিও রেকর্ড শুনেছেন। ভারি খুশি।

সুচেতনা বললে, আচ্ছা, তুমি কিছু মনে কোরো না। তুমি কি সেই ফাদার নাকি মঁসিয়ে ফালোকে ফরেন মনিঅর্ডারে কিংবা ড্রাফটে টাকা পাঠিয়েছিলে?

কেন? এখন কিন্তু অনেক রাত। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি মতে, ছুটির দিনের পরের সকাল শুরু

হয়েছে। মুরলীধর হাসল। তোমার কিন্তু ভাল ঘুম হচ্ছে না। যা এই অবস্থায় খুব দরকার।

দেখো, সেদিন তুমি স্টিরিও, রেকর্ড, এসব আনলে, তারপর দিনেই সেই ফাদাবের প্লেন ধরার কথা।

মুরলীধর উঠে এল। বললে, এসব কেন? এ কি মাঝরাতে ভাবার বিষয়?

সুচেতনা ফিক করে হাসল। তা বটে। সূর্য উঠলে বিজয়া দশমীর দিন হবে।

মুরলীধর বলতে গেল কিছু। কিন্তু কোন অন্তরস্থল থেকে দিনটার কথা ভুলে যাওয়ার জন্য কেউ যেন আর্তনাদ করল।

মুরলীধর বলতে পারলে শেষে, সে কিছু নয়। তুমি সেই ফরাসী ফাদারের কথা মনে করছো কেন?

বাহ্, তুমিই তো বলেছিলে। ছটফট করছিলে কয়েকদিন ধরে। বলছিলে, বীটোফেন, মোজার্ট, শোপ্যাঁ, এদেশে সে রকম রেকর্ড পাওয়া যায় না, সে রকম স্টিরিও। আর বিখ্যাত সব চিত্রকরের ছবির প্রিন্ট যা এদেশে আসে না। জীবনের একটা চান্স চলে যাচ্ছে। সুচেতনা বললে। মুরলীধর হাসল, বললে, আরে এসব অনেকদিনের পুরনো--

সুচেতনা বললে, আমি আমাদের পুরনো পাসবইগুলো খুঁজে দেখেছি। সে পাঁচ-সাত হাজার টাকা কি ছিল আমাদের কোথাও?

এসব ভেবে কী হয়? তা ছাড়া আমরা তো জানুয়ারিতেই চলে যাচ্ছি। চলো, শুতে যাই আমরা। মুরলীধর স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলে। বললে আবার, কেমন জঙ্গল আর নির্জন নয় এই জায়গা।

সুচেতনা বললে, সেদিনটা ছিল হাবোলের বিয়ের।

তা ছিল, তা ছিল। মুরলীধর স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলে। বললে, সুচি, এ অবস্থায় তোমার ঘুম দরকার--দুজনের ঘুম তো একজনকে ঘুমাতে হয়।

সে স্ত্রীর নাভির কাছে হাত রাখলে। হাসল। বললে, দেখো, সঙ্গে সঙ্গে হাত ছুঁড়ল। সে স্ত্রীর বুকে হাত রাখলে। বললে, দেখছো কত ভারি! কত দুধ হবে দেখো। চলো ঘুমাইগে।

যেতে যেতে মুরলীধর তার সেই ঘর আর শোবার ঘরের কাঠের দেয়াল, কাঠের মেঝের মসৃণ বাদামি ঘেঁষা রংই তো দেখবে, ঘরে আর প্যাসেজে ইলেকট্রিক বালবই তো, কিন্তু সে যেন সবুজ, কোথাও কালো এমন সবুজ, যেন রাত্রির বনই দেখতে পাচ্ছে চারদিকে।

সে জন্য হাত বাড়িয়ে সুচেতনার হাত ধরলে। কয়েক ফুট মাত্র পথ শোওয়ার ঘরে যেতে। ইজেলে সুচেতনার ছবি। তার উপরে ছবি আঁকার আলোটা জ্বলছে। সেটা নিবাতেই সেখানে গেল মুরলীধর। আর তার ফলে ছবিটার সামনে দাঁড়াতেই হল।

মুরলীধর বললে, ভালোই, বেশ ভালোই। যদিও চিত্রকর অ্যামেটার বলেই কোন না কোন শিল্পীর প্রভাব এসে যায়। যেমন এটায় বত্তিচেল্লির। বসন্তের সেই ম্যাডোনাই যেন। সেখানে ল্যাম, ভেড়ার শাবকরা বোঝাচ্ছিল, সে কেন্দ্রীয় চরিত্রটা দেবীমাতার। সাদা হলুদে ডোরা বিড়ালছানাও বোঝাচ্ছে, এটিও এক পবিত্র জননী।

আলো নিবিয়ে দিয়ে মুরলীধর বললে, আমরা তো এখানে স্বামী আর স্ত্রী, কাজেই শরীরের কথা বলা যায়। জানো, রেঞ্জার, আমাদের বন্ধু, একটা বেশ বড় ছবি এঁকেছেন। গায়ে সুতো নেই এখন এক ন্যুড রোজার। সে নাকি গ্রেগের জন্য মদ এমন এক নাম পাবে। একই ব্যাপার। খুব অরিজিন্যাল কম্পোজিশন নয়। তুমি তো রেনোয়ার সেই তার হাউসমেইডের ন্যুড ছবির প্রিন্ট দেখেছো। সেটাই হয়তো ইনসপিরেশন। কিন্তু রোজা তো রেনোয়ার সেই যুবতী হাউসমেড নয়। ফলে তফাৎ হয়ে গিয়েছে। রেনোয়ার যদি লাস্য আর কামনার প্রতিমা হয়ে থাকে, রেঞ্জারের ছবি কিন্তু কামনার অথচ গম্ভীর। গলার কালচে রুপো পদকের লাল কার ছাড়া আর সুতো নেই গায়ে।

যেন হাঁটু বিছানায় ছুঁইয়ে রাখায় লজ্জা কিছু ঢাকা পড়েছে, ওদিকে দুই পায়েই আলতা। মনে হয় রেনোয়ার প্রভাব থেকে বেরিয়ে হেনরি মুরের প্রভাবে ঢুকেছিলেন–সেই মাদারফিগারগুলোর ছবি তো তুমি দেখেছো, এতটুকু মাথা কিন্তু প্রচণ্ড চওড়া নিতম্ব আর উরু।

সুচেতনার মুখে সে ম্লান আলোতেও লাল হয়ে উঠল।

মুরলীধর বললে, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না এসব ছবি তেমন করে আঁকা, আঁকতে আঁকতে অবশ্যই দেখতে হয়, উপভোগ করতে হয়, তোমার কি মনে হয় এসবই কমপ্লেকসের ব্যাপার?

মুরলীধরের মুখ সে ম্লান আলোতেও বিবর্ণ দেখাল।

সুচেতনা ঝির ঝির করে হেসে বললে, তুমি কি ফেরার পথে রেঞ্জারের বাংলোয় নেশা করে এসেছো?

মুরলীধর হাসল। বললে, এই দেখো, স্ত্রী কি এতই পবিত্র যে বিবাহিত পুরুষ তাকে ছবির কথাও বলতে পারবে না?

সুচেতনা বললে শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে, রেঞ্জারসাহেবের পাঠানো ওই বইটা তো কমপ্লেকসের বিষয়ে, যুগে যুগে তাকে যা বলা হয়েছে। আর প্রচ্ছদ যে হেনরি মুরের ভাস্কর্যর ছবি তাতো ছোট প্রিন্টে বলাই আছে। ওটাই এখন তোমার মাথায়।

মনে যেন মুরলীধর জোর পেল। সে হাসল। বললে, একটা ভারি মজার কথা শোনো। রেঞ্জার পনি আর তার লাগামের কথা বলছিলেন। বলছিলেন আবেগ আর বিজ্ঞানের কথা। পনির শুধু আবেগ আর লাগামওয়ালার বিজ্ঞান। এরকম কি সত্যি হতে পারে, লাগামের মুখোশের টানে যখন সেটা চলতে থাকে, তখন তার আবেগের স্মৃতি স্বপ্ন হয়ে তার পশুমস্তিষ্কে পড়ে থাকে? মনে পড়ে কি সে মাঠের কথা যেখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে মায়ের কথা যার শরীর তাকে পুষ্টি দিতো, যে শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর ছুঁইয়ে দাঁড়ালে, অচেনা পৃথিবীর আতঙ্কের কাঁপুনি থেমে যেতো, সে শরীর থেকে দূরে দৌড়ে সরে গিয়ে তার চাইতেও জোরে সে শরীরের কাছে ফিরে আসাই ছিল আনন্দের খেলা? অথচ সে নিজের গতিতে খাদের ধার ঘেঁষে, খাদ বাঁচিয়ে দ্রুত চলছে, যদিও তার পিঠে মালাধর বসু নামে এক পণ্ডিত লাগাম হাতে।

সুচেতনা অবাক হয়ে যাচ্ছিল, হেসে বললে, মালাধর বসুকে ফেলে দিলে আমারও কষ্ট লাগবে। তাই বলে–

সুচেতনার বলতে সঙ্কোচ হল, মুরলীধর নামে মানুষটা পনির মতো অন্ধ-মস্তিষ্কের আবেগ, যার বাহী অন্য কেউ--তা কেন বলবে? কারো ছদ্মনাম কারো জেলখানা হয়?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

১

১৯৭১এর আগেকার গল্প হলে, এই পরিচ্ছেদটার নাম হত শুট আউট। অর্থাৎ সে রকম এক বিস্ফোরণ, যার ফলে অন্তত একটা দিকে চলার পথ হয়। তা যুক্তিযুক্ত মনে হয় এজন্য, ময়ূর সেই প্রথম অন্ধকারে অদৃশ্যপ্রায় এক মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল রাইফেলে। অন্ধকার, অতীত, ছায়াছায়া, অবয়বহীন তাকে।

তখন অকটোবর এসেছে তাসিলার পাহাড়ে। ময়ূর প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছিল সেই রাতে, এরকম প্রমাণ করাও যায়। কেন না সে রাইফেল সাফসুতরো করেছিল, একস্ট্রা ক্লিপ একটা নিয়েছিল পকেটে আর তার সেই কালো জাতিহীন ভালুকহেন কুকুরটা তার পায়ে পায়ে হাঁটছিল। কিন্তু বাইবের এই বিষয়গুলো থেকে যদি চিন্তার প্রমাণ হতো—তা হলে জজ-ব্যারিস্টার থাকতো না।

আকাশে মেঘ চলায় একবার আলো, একবার অন্ধকার এমন হচ্ছিল। তার গন্তব্য প্রায় স্থির, অর্কিডের সেই প্রাকৃতিক নার্সারি, যেখানে ঘোড়ার গন্ধ স্মাগলারদেব অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল।

২

পথে তার কয়েকদিন আগেকার সেই রাতের কথা মনে পড়ল, গ্রেগ অ্যাভেনু থেকে বনে ঢুকে পড়তেই। সে রাতে নিবিড় অরণ্যে বন্যপ্রাণীদের, তাদের স্বাভাবিক জীবনে দেখার ঝোঁক এসেছিল যেন ময়ূরের মনে। আশ্চর্য কিন্তু।

সে জেনকে বলেছিল, কথা বললে চলবে না, ভয় পেলে চলবে না, প্রাণীরা নিজেদের মতো চলাফেরা করবে, আমরাও তেমন তাদের মতো, কিছু ভীত, কিছু সতর্ক, কিছু স্বাভাবিক হবো।

তারা অপেক্ষাকৃত এক অসমান পথে ক্রমশ এক সল্টলিকের দিকে এগিয়েছিল। কথা বলছিল না। তা না বললে অনুভূতি গাঢ় হতে থাকে। তারা মাঝরাতের পর সল্টলিকেব অদূরে একটা বড়, চ্যাটালো, খানিকটা উঁচু পাথর পেয়ে, তার উপরে বসেছিল পাশাপাশি। বনের সেই ক্বচিৎ জোনাকি আলোর অন্ধকারে জেন স্বভাবতই ময়ূরের গা ঘেঁষে বসেছিল।

কিছুক্ষণ পরে মৃদু হাইয়ের শব্দে ময়ূর জিজ্ঞাসা করেছিল, ঘুম পাচ্ছে নাকি, ভয় করছে না তো? মানুষ কখনও কখনও কিন্তু খুব ভয়ই পায়।

জেন ফিসফিস করে বললে, কেমন উত্তেজনা, আর ভয় ভয়ও, অথচ বিশ্বাসের আরামও।

ভয়ের কথায় সে টর্চ-সমেত বাঁ হাতটাকে বাড়িয়ে জেনের পিঠের দিকটা ঘিরে নিলে। বললে, ভয় নেই।

ও, নো, নো।

তখন সময় চলতে থাকে, কিন্তু তার চলা বোঝা যায় না। ফলে সময় মনে আসে না। একবার সে নিজে বললে, কানের কাছেই তো মুখ, ভয় পাবেন না, ওরা ভয় পাবে। দেখুন। জেন তো

চমকেই উঠেছিল। নিজে তার কাঁটা ওঠা বাঁহাতে নিঃশব্দে হাত রেখে আশ্বস্ত করলে। দুজোড়া বড় জোনাকিই যেন তাদের অদূরে শূন্যে স্থির।

ময়ূর বললে, ওরা অবাক হয়েছে, আমাদেব আশা করে নি। কৌতূহল মিটলে চলে যাবে। আমার রাইফেলে কভার করা আছে।

জেন ফিস ফিস করে বললে, অথচ আমরা ওদের দেখছি না।

অথচ ওরা সিগন্যাল দিয়ে আমাদের সবে যেতে বলছে। আলোগুলো লালেব ধার ঘেঁষা।

অন্য রকমও হয় নাকি?

বাহ, মিনিট পাঁচ আগে ওখানে নীলের ধার ঘেষাঁ আলো ছিল, দেখেন নি? আলোগুলো সরে যেতেই টর্চ জাললে ময়ূর, ঘড়ি দেখলে, স্বাভাবিক গলায় বললে, রাত দুটো হল। আপনাব ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এবার আপনাকে ক্লুটলংএ পৌঁছে দেব?

এই সময়েই জেন বললে, জানো মেয়র, অপারেশনের যন্ত্রগুলো আনার সময়ে আমার একটা ছোট রাইফেলও আনিয়ে নেয়া উচিত ছিল। ক্লুটলং-এ আমি একেবারে একা। তা তুমি, বোধহয়, জানো না।

তখন তারা গ্রেগ অ্যাভেন্যুতে উঠে এসেছে। তখন ময়ূব সুবিধার জন্য টর্চ জ্বালছে। পায়েব তলায় ডালপালা ভাঙলে গ্রাহ্য করছে না। হঠাৎ ট্যুরিস্টদের জন্য রাখা ফরেস্টেব বিজ্ঞাপন সেই বড় হোর্ডিংটায় টর্চের আলো পড়ল।

কী এটা? জেন জিজ্ঞাসা করায়, ময়ূর হোর্ডিংটার সব জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেললে।

তখন চাপা উত্তেজনায় জেন বললে, দেখো, দেখো, শ্বেতময়ূর।

আসলে তা সাদা ফেজ্যান্ট যা হোর্ডিংএর মাথায় ঘুমন্ত অবস্থায় টর্চের আলোয় ধরা পড়েছিল।

জেন বললে, একটা কথা, ময়ূর, তুমি বলেছো এদিকের বনে বাঘই নেই তো ম্যানইটার, ওদিকে ফরেস্টের এই সাইনবোর্ডের গোড়াতেই জালামুখো বাঘ।

তখন তো একটু শীত শীতই শেষ বাতের। আর অন্ধকারও।

কয়েক পা গিয়ে ময়ূর উৎকর্ণ হয়ে থামল। রাইফেল রেডিতে নিলে, বাঁ হাতে জেনেব সামনে চলা আটকে, তাকে নিজের পিছনে ঠেলে টর্চ জ্বাললে। সেই আলোতে এক জোড়া চিতা, সবুজ মরকত–সিঁদুরেলাল চোখ, সাদা দাঁত, সোনায় খয়েরি গুল।

জেন আর্তনাদ করার আগে ময়ূর হো হো করে হেসে বললে, তোরা? যা, ভাগ। জেন ময়ূরের বাহু চেপে ধরলে। বললে, ময়ূর!

ওরাই আমাদের সল্টলিকে লক্ষ্য করছিল।

৩

রোজ একরকম হয়না। সেই অর্কিড নার্সারিতে পৌঁছানোর একঘন্টা আগেই ময়ূব আঙুল চালিয়ে দেখলে, তার রাইফেলের সেফটি ক্যাচ সরানো তখনই। এখনই কেন, বলে সেফটিতে আনলে ক্যাচটাকে। তা হলেও ট্রাউজার্সের বাঁ পকেটে হাত বুলিয়ে দ্বিতীয় ক্লিপটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হল। তার পায়ে আজ ট্রাউজার্সের উপরে মোটা পট্টি। কাঁটাকে গ্রাহ্য করা চলবে না।

সকাল থেকেই সে ভাবছিল বটে। তার মনে পড়েছিল, সেই রাতে যখন সে জেনকে তার বাংলোয় পৌঁছে দিচ্ছিল, জেন বলেছিল, সে এখানে একা থাকাই স্থির করেছে। তার ক্লিনিককে ক্রমশই বড় করা হবে। তার সেই পঞ্চাশ একরের পাহাড়ি ঢালের জমিতে ফসল হলে, খাওয়ার

অভাব থাকে না। রোগীদের পর্যন্ত পথ্য হয়। একটা স্থিতির কথাই যেন। তখন অনেক অর্কিড আর অনেক রকমের ফলের কথাও উঠেছিল। মেয়র অনুভব করেছিল, তার চারদিকের ঘটনাগুলো তাকেও এক সুস্থিতির মধ্যে ধরে রাখতে উদ্যত।

কিন্তু একা কি সুস্থিত হয় কেউ? অনেকদিন পরে, (তাসিলার আসার পরে প্রথম কিম্বা হয়তো মোর সেই ময়ূরবনে হারিয়ে যাওয়ার পরেও বোধ হয়) বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে অসাড় জ্বালা ধরল, তার একটা বোন ছিল। আশ্চর্য, কি করে ভুলে ছিল সে? এতদিনে বড় হয়েছে। হয়তো স্ত্রীলোক হতে চলেছে। যদি সে প্রশ্ন তোলে, তার দাদা, যে তাকে কত ভালবাসতো, যাকে সে পৃথিবীর সবচাইতে শক্ত মানুষের একজন ভাবতে শুরু করেছিল, কোথায় গেল সে? সেই সরল ডাগর চোখদুটির কী আস্থা সেই দাদাকে, ভালবাসার আস্থাই তো, যে ভালবাসায় আর কোন অভাব-বোধ থাকে না—কেন গেল সে? একটা কালো, ময়লা, না, দমবন্ধ করা অন্ধকারকে সেই কোমল ছোট্ট মেয়েটি কি করে সহ্য করবে?

ভাবতে ভাবতে তার নাকের দুপাশে জল নামল, কিন্তু সে মনে করতে পারলে না, ডম্বরির কথা ভাবতে গিয়ে এরকমই আর একবার এক কচিমুখ মনে পড়ায় এরকম কেঁদেছিল সে।

আসলে স্ত্রীলোকেরা বড় বিপন্ন।

কিন্তু এসবেও যুক্তি হয় না তার এরকম অন্ধকারে নিঃশব্দে এগিয়ে চলার। যুক্তি বোধহয় হয়ই না। অনুভূতি পথে নামালে, তখন যুক্তি খোঁজা হয়। অনুভূতি যুক্তি দেখায় না। স্বপ্নের মতো ছবি তুলে তুলে আনে, এক ছবি অন্য ছবিতে মেশে।

আজ বিকেলেই তো। মেয়র-বাংলোয় তার নিজের শোওয়ার ঘরেই তো। সে প্রায়ান্ধকার ওকগলিতে সন্ধ্যা নামতে দেখতে গিয়ে সেই কালো পাখিগুলোকে দেখতে পেল যারা দীর্ঘ কালো ঠোঁট অর্কিডের গর্তে ঢুকিয়ে মধু খেতে খেতে অর্কিডের পাপড়িও চিবিয়ে খায়। নরবু এত চালাক নয়, সে স্মাগলারের গল্প থেকে দ্রুককে আলাদা রাখে। গিয়ালপো যার এক কানে হীবা দোলে। বিশ হাজার আর আশি রাত। সেই ঘোড়াগুলো যাদের প্রস্রাবের গন্ধ অর্কিডের মধুর গন্ধকে আরও তীব্র করে।

তুই যা ইচ্ছা কর, যেখানে ইচ্ছা যা, কখন খাবি নিজে ঠিক কর বলে, কিচেনে ঢুকে, সন্ধ্যার অন্ধকারই তো সেখানে, ময়ূর কিচেনের টেবলের পাশেই অর্কিডবনে বাইবেলের গল্প দেখতে পেয়েছিল, যে গল্প সেদিন রেঞ্জার বলেছিলেন—ইভের প্রথম পাপ।

সেই গল্পে কি কারো কিছু এসে যায়?

সেই সল্টলিকে পাশাপাশি বসে হরিণ বা চিতা দেখার পর অন্ধকারে চলতে চলতে জেন বললেন, রাইফেল না আনিয়ে ভুল করেছে, মিশনে সে একা। কুকুরগুলো ডাকছিল, চিতাজোড়া দেখা দিয়েছিল। রোজার বাড়িতে আগুন লেগেছিল কিন্তু। সেই আর এক রাতে।

স্ত্রীলোকদের নিরাপদ রাখা সহজ হয় না।

অর্কিডবনে পৌঁছতে ময়ূরের রাত দুটো হল। সে খুব সোজা পথে পাক খেয়ে খেয়ে চলেছিল। আবেগে তার বুক ধক ধক করছিল। কুকুরটাকে আশ্বস্ত রাখতে সে মাঝে মাঝে তার মাথা চাপড়ে দিচ্ছিল। সে অসুরদের কুকুর, সহজে ডাকে না।

কিন্তু কুকুরটাই বিপদ ঘটালে এবং তাকে রক্ষাও করলে। ময়ূর ঘোড়ার গন্ধ পাওয়ার আগেই, তাদের খুরের শব্দ শোনার আরও আগেই, কুকুরটা গরগর করে উঠল। আর তাতেই ময়ূরের ভিতরে এক ভীষণ হিংস্রতা সতর্ক হল। সে তার রাইফেলের ব্যারেলে সরু টর্চটাকে পরিয়ে নিলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার তিনদিকে তিনটি জোরালো টর্চ জ্বলে উঠল। সে কুকুরটার বকলেসে টান দিয়ে সামনে যে ওকটাকে পেলে তার আড়ালে গিয়েই সেখান থেকে গড়িয়ে বুকে চলে, সেই অন্ধকারে,

গাঢ়তর অন্ধকার এক চাঁই পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়ল। আবার সেই টর্চগুলো কিছু সন্দেহ করে যেন এদিকে ওদিকে আলো ফেলছে। কুকুরটা একটা ঝোপের পাশ দিয়ে মাথা উঁচু করে থাকবে বাতাস শুঁকতে। ওদের টর্চের আলোয় তার মাথাটা ধরা পড়ল। ময়ূর বুটের লাথিতে সেটাকে অন্ধকারে ঠেলে দিতেই ওদিকে থেকে গুলি চলতে শুরু করল। ময়ূর প্রথম যে গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল সেটার গায়ে, পরে যে পাথর চাঁইএর আড়ালে, তাতেও গুলি লাগছে। টুকরো পাথর ভাঙছে। কুকুরটা তার পাশে শুয়েছে বটে, তাকে কাছে রাখা যাচ্ছে না। সেটা হঠাৎ বাঁদিকের ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড় দিল। ওদের টর্চ আর গুলি তার শব্দকে অনুসরণ করলে। ময়ূর তার রাইফেলের সেফটি ক্যাচ সরালে, নলটাকে পাথরটার ডান পাশ দিয়ে এগিয়ে মাটিতে শুয়ে নলে লাগানো টর্চ টিপলে। একটা ঘোড়ার মাথা, প্রায় তার সঙ্গে লেগে থাকা এক মানুষ, আর তার এক হাতে রিভলবার অন্য হাতে টর্চ। সেই রুপোরং টর্চই সব চাইতে চকচকে নিশানা।

ময়ূর ট্রিগার টানলে, বাঁ হাতে টর্চ টিপলে, সঙ্গে সঙ্গে সরেও গেল। কুকুরটা ভয় পেয়েছে এতক্ষণে। ঝোপঝাড় ভেঙে এক দিক থেকে অন্যদিক দৌড়ে ঘোড়াগুলোর এপাশে ওপাশে গিয়ে ডাকাডাকি করে একাধিক কুকুর হয়ে গেল। আবার ওদের টর্চ জ্বলতেই তার নিশানাতেই ময়ূর দ্বিতীয়বার গুলি করলে টর্চটা নিবে গেল।

এসব ঘটতে কয়েক সেকেন্ড লাগে। প্রথম আর্তনাদের গায়ে দ্বিতীয় আর্তনাদ, তার চারদিকে গোলমাল, ঘোড়ার খুরের দ্রুত ধাবমান শব্দ, এগিয়ে পিছিয়ে একাধিক কুকুরের ডাক, একসঙ্গে মিশে যাওয়ায় যেন আবার সব নিস্তব্ধ হল, যেন শব্দগুলো পরস্পরকে সমান আঘাত দিয়ে ভয়ে স্তব্ধ হল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে চলে গেলে, ময়ূর তার পাথরের আড়ালের অন্ধকারে পনের-বিশ মিনিট শুয়ে রইল। কুকুরটা গন্ধ শুঁকে শুঁকে অন্ধকারে আর এক চাঁই অন্ধকার হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। টর্চ জ্বলল না, গুলি চলল না।

শেষ রাতের ঠান্ডা আর বৃষ্টির ছাঁটে তাকে সক্রিয় করল। গ্রেগ অ্যাভেন্যুতে পৌঁছে সে ছুটতে শুরু করল। ক্লটলংএ জেনের বাংলোর কাছে যখন সে, ভোর হতে দেরি থাকলেও, পূর্ব আকাশ হালকা হচ্ছে।

৪

রাত্রির সেই গুলিগোলার ব্যাপারের পরদিন বেলা আড়াইটা হচ্ছে এখন। ময়ূর বুঝতে পারছে, খবরটা নীতিগতভাবে রেঞ্জারকেই আগে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে ক্লটলং-এ গিয়ে সেখানে বাকি রাতটা কাটিয়েছে। এমনকী জেন ডাক্তারকে সেই ভয়ংকর গোপন সংবাদটা দিয়ে ফেলেছে। যেন জেন ম্যাডামকেই বলে জেনে নেয়া দরকার, রেঞ্জারকে কী বলা হবে? কারণ দুবার তো সে তার রাইফেল চলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ শুনেছিল।

বেলা আড়াইটা হচ্ছে। কি করে সে জেনের ঘুম ভাঙালে, কি করে জেন তাকে বাংলোর শোওয়ার ঘরে নিয়ে বসালে, এসব যেন স্বপ্নে ঘটা ব্যাপার যা ঘুম ভাঙলে মনে থাকে না। জেন তাকে নিজের বিছানাতেই শুইয়ে দিয়েছিল। প্রমাণ, অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলে নিজেকে সে সেখানেই দেখেছিল।

ময়ূরের মনে পড়ল, ওটাও ঠিক বটে, জেন সেই ভোর রাতে গরম দুধ এনেছিল গ্লাসে। কী একটা ওষুধের বড়ি খাইয়েছিল। বড়িই বটে।

জেন তার গায়ে রাগ চাপা দিয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বলেছিল, কাল সকালে যুদ্ধের বীরত্ব শুনবো, এখন ঘুমাও। আমি লাইব্রেরিতে শুচ্ছি। দরজা খোলা থাকবে। ঘুম না এলে ডেকো।

বেলাতেই ঘুম ভেঙেছিল সকলের। সে চোখ মেলার আগেই, শুনতে পেলে জেন কথা বলছে যেন তার বিছানা থেকেই। চোখ মেলে সে মশারির বাইবে জেনকে তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলে। জেন হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললে, বেডটি, পেমা, বেশি লাগবে। আর এক কাপ আনো। মেয়রসাহেব ঘুমাচ্ছেন। হ্যাঁ, কাল ডিনারের পরে তুমি শুতে গেলেই এসেছেন। এই বলে পেমার সামনেই মশারি তুলে মেয়রসাহেব কাল রাত থেকে সেই বিছানায় ঘুমাচ্ছে তা দেখানো হয়েছিল।

ব্রেকফাস্টও বেলায় হয়েছিল। তার আগে জেন ছাড়লে না। টাটকা ডিম ও দুধের যোগান নিয়ে থেনডুপ এসেছিল। সে শুনে জিভে টাকরায় শব্দ করে বললে, তা হলে মেয়রসাহেব খেলেন কী? ব্রেকফাস্টের টেবলে নামগিয়াল জন জানলে, জেনের কাছে মেয়রসাহেব রাত নটাতে এসেছেন ডিনারের পরপরই।

এই গল্পটা জেন বেশ চালু করেছে। যদিও পেমা বোকা স্ত্রীলোক বলেই যেন, তাকে জানতে দিয়েছে মেয়রসাহেব রাতে কোথায় ঘুমিয়েছে।

ব্রেকফাস্ট টেবলে জেন বললে, এদিকে এক মজার ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। সেই চিতা দেখে আমরা যেদিন শেষ রাতে ক্লুটলং-এ ফিরেছিলাম। তুমি তো দেখেইছিলে, আমার সঙ্গীরা, নামগিয়াল, থেনডুপ, লিম্বু, পেমা সবাই আলো জ্বেলে আমার জন্য বাংলোর বারান্দায় বসেছিল। তা হতেই পারে। ওরা অবাক হয়েছিল, ভয়ও পেয়েছিল। ওরা দেখেছিল, ঘরের দরজা-জানালা খোলা, আর ওদের ম্যাডাম বিকেল, সন্ধ্যা, রাত্রি অনুপস্থিত। তোমার বাংলোয় যাবার সময়ে কাউকে বলে যাইনি তো। কত কী ভাবছিল ওরা কে জানে? শেষে আমরা যখন ফিরলাম, তার আগেই ওরা স্থির করেছিল, ম্যামের যখন বিপদ, মেইঅর সাহেবকে খবর দিলে হয়। ওরাও স্থির করেছিল, তাসিলার কিছু হলে মেইঅর ছাড়া আর আর কাকেই বা বলা যায়? আমরা সে রকম ফিরে এলে ওরা ধরে নিয়েছে, আমি তোমার কাছেই ছিলাম বিকেল, সন্ধ্যা, রাত। (এখানে জেন ম্যামের মুখ আরক্ত হয়েছিল।)

সে, ময়ূর, নিঃশব্দে খাচ্ছিল।

পরে জেন বললে, সে রাতে সে রকম ফেরা এখন কাজে লাগছে। কাল সারা রাত তোমার ক্লুটলং-এ কাটানো বিশ্বাসযোগ্য হবে আরও।

দুপুর আড়াইটা হল।

ময়ূর ব্রেকফাস্টের পরে ক্লুটলং বাংলো থেকে বেরিয়ে কুকুরটাকে বারান্দাতেই পেয়েছিল। ভালুকটাকে ভয় পায় নি জেন আর বরং পেমারা কেউ তাকে খেতে দিয়ে থাকবে।

প্রায় এগারোটায় সেই অর্কিডগলিতে পৌঁছে আধঘণ্টা গোপনে খোঁজাখুঁজি করে গুলিলাগা সেই গাছ আর পাথরের চাঁইটাকে খুঁজে পেয়েছিল সে। পরে চকচকে নতুন, কিন্তু চুরমার হয়ে ভাঙা একটা বড় টর্চও খুঁজে পেয়েছিল। তো অর্কিড বন থেকে রওনা হওয়ার আগেই তো বৃষ্টি নেমেছিল। পরে সেটাই এদিকে খুব জোর হয়ে থাকবে। হয়তো ক্লুটলং-এও, সে বিছানায় গেলে তেমনই হয়েছে। মাটিতে রক্ত নেই, ঘোড়ার খুরের চিহ্ন নেই। গালি দিয়ে জোরে জলের স্রোত নেমেছিল। সেই স্রোতের দাগ আছে বরং। তখন অকটোবরে বৃষ্টি কি করে, বলতে পারো না।

তা হলেও কাল রাতের কোন ব্যাপারই স্বপ্ন নয়। দেরি হলেও রেঞ্জারকে বলতে হয় না কি? তার গল্প যা সে রেঞ্জারকে বলবে, আর জেন যে গল্প ক্লুটলংএ তৈরি করেছে, কি করে সে দুটোকে মেলানো যায়?

মেয়রের সেই শুটআউটের পরের দিন সকালে রেঞ্জার প্রভঞ্জনের ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়েছে।

সে আগের সন্ধ্যাতেই বনানীকে চিঠি লেখার সঙ্কল্প করেছিল। ইতিমধ্যে বনানী তাকে চিঠি লিখেছে, এমন নয়। সেপটেম্বরের সেই জোড়া ছুটির দ্বিতীয় দিনে পোস্টঅফিস ছুটি থাকা সত্ত্বেও, পোস্টমাস্টার মুকুলের লেখা একটি চিঠি বয়ে এনেছিল। সেই চিঠিটাই এই অকটোবরে এসে বনানীকে চিঠি লেখার কথা মনে এনেছে। মুকুলকে সে চিঠি পেয়েই টেলিগ্রাম করেছিল . চিঠি পেয়েছি, লিখছি। তারপরে আর কাউকেই চিঠি দেয়া হয় নি। সেজন্য কাল সন্ধ্যায় সে প্যাড কলম নিয়ে চিঠি লিখতে যখন বসবে, পোস্টমাস্টার মুরলীধর এল। বগলে একটা ক্যানভাস। কাগজের মোড়ক ছাড়ালে দেখা গেল সেটা সুচেতনার ছবি। এটা এক অদ্ভুত ব্যাপারই হয়েছিল।

বন্ধু মানুষ পোস্টমাস্টার। সে কফির ব্যবস্থা হয়েছিল। ঘণ্টা দুএক গল্প হয়েছিল। পোস্টমাস্টার সুচেতনার ছবির কথায় বলেছিল, তা মশায়, করেছেন কী? ভেবেছিলাম বউয়ের এক রঙীন ফটো হবে, দেখছি এক ছবি করেছেন। তো, মশায়, এটাই আপাতত আপনার মাস্টারপিস। ছবির মালিক চিত্রকর। যদিও আঁকার সময়ে বত্তিচেল্লির ছবি মনে এসেছিল আপনার। ছবির কথার পরে টুংএর আদিবাসীদের কথা উঠেছিল। সে তো এক গবেষণাই। ঠাট্টা করেছিল, না, মশায়, চাবুক কুড়িয়ে পেয়ে ঘোড়া কেনা, ঘোড়া কিনে ঘেসেড়া রাখা। ডম্বরির পক্ষে তাসিলার কথা লিখতে গিয়ে মালাধর বসু হওয়া, মালাধর বসু হয়ে এখন সেই নামটাকেই আসল মানুষ করে তোলা। পোস্টমাস্টার রাত হওয়ার আগেই চলে গিয়েছিল, কিন্তু চিঠি লেখা হয় নি।

সে জন্য এখন এই সকালে রেঞ্জার দেরি করে ঘুম থেকে উঠেও, অফিসের আগেই যাতে চিঠিটা লিখে নিতে পারে, সেজন্য প্যাড আর কলম নিয়ে টেবলে বসেছে। আর এখন তার খেয়াল হচ্ছে, সে সকালের চাও খায় নি, এমনকি প্রথম পাইপটাও ধরায় নি। অথচ তার নাইটগাউন পায়জামা পরা ভঙ্গি থেকে সে রকম অপ্রস্তুত মনে হয় না তাকে। সে যেন আবার এক ছাত্র হয়ে পড়ছে, পরীক্ষার প্রস্তুতির চাপে চায়ের জন্যও অপেক্ষা করতে পারে নি। তো, তখন, সেই ভোররাতে বনানী চা করে আনতো। দুজনের একসঙ্গে চা খাওয়া হলে, সে পড়তে শুরু করতো আবার। কোন কোনদিন শিশু মুকুল কেঁদে উঠলে চায়ের কাপ হাতে করে বনানীকে চলে যেতে হতো।

তখন তার মনে পড়ল · বেচারা রোজা, তারও হয়তো ঘুম ভাঙে নি। ঘুম ভাঙলে কী লজ্জাই পাবে। তার সাহেব চা না খেয়েই লেখাপড়ায় বসেছে।

সে টেবল থেকে বাইরে চোখ নিতেই তার চোখ দুখানা ছবিতেই পড়ল। উজ্জ্বল রং সে রকম চোখ টানতেই। ইজেলে রোজার পোরট্রেট, তার পাশে দেয়ালে হেলানো সুচেতনার সেই পোরট্রেট যা ছবি হয়ে গিয়েছে।

তো দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার জন্য সে নিজেই দায়ী। কথা ছিল বটে, রোজার একটা পোরট্রেট এঁকে দিতে হবে, যা তার ছেলেকে দেয়া যায়। ইজেলে এখন তাই। কাল রাত জেগে, তা রাত দশটা থেকে ভোর চারটে, খুব তাড়াতাড়িই সে এঁকেছে। ফ্ল্যাট করে আঁকা, মনে হয় অর্ধসমাপ্ত করে ছেড়ে দিয়েছে চিত্রকর। ক্যানভাসের বুনোট রঙে ঢাকে নি। মন দিয়ে সে ছবি দুটোকে দেখলে। তার ভালোই লাগছে। এগুলো দেখে পোস্টমাস্টার মশাই আবার কী বলবেন কে জানে! যেমন সুচেতনার ছবিতে বত্তিচেল্লি, গ্রেগের মদ ছবিতে রেনোয়া, আর রোজার এই পোরট্রেট দেখে হয়তো বলবেন স্বয়ং সেজানের প্রভাব। ছবি সম্বন্ধে এরকম সংবাদপত্রের একসপার্টরা বলে থাকে আকছার।

কত ছবিই তো আঁকা হল রোজার। তার বাংলোর আসার পরপরই সেই ঘাগরা করে পরা

নেপালি ঢঙের শাড়ি, তুলোভরা কাপড়ের পুরো হাতা ব্লাউজ, গায়ের চাদর কোমরে কয়েকফের জড়ানো। নাকে দোলক নথ। কিন্তু চুল নামিয়ে কপাল ছোট করে, বয়স ত্রিশে কমিয়ে এনে সেই প্রথম ছবি। পরে ধাপে ধাপে সেই গ্রেগের মদ নামে রিক্লাইন্ড ন্যুড। এ ছবিটা অবশ্যই একেবারে অন্য রকম। হলুদ বাসন্তী শাড়ি বাঙালিদের ঢঙে পরা, কপালে বড় হলুদ টিপ, হালকা হলুদ ব্লাউজ, বাদামি চুল যাতে সাদার কয়েক খেই, উঁচু গণ্ডে লাল, আর পুষ্ট গালে টোল, ঈষৎ হাসিতে লালচে ঠোঁটদুটো ফাঁক গ্যাম্বোজ হলুদ মুখে।

তা বলতে পারেন পোস্টমাস্টার, সেজানের প্রভাব। ফ্ল্যাট করে আঁকা, যেন নির্দিষ্ট সময়ে যা এক্ষেত্রে ছ ঘণ্টা, তার পরই কেউ যেন তুলি কেড়ে নিয়েছিল। কিংবা না ঘুমিয়ে রাতের ছ ঘণ্টার পরে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁকা যাচ্ছিল না। তো, এটা রোজার ছেলেকে তার বিয়েতে উপহার দেয়া যায়।

আর সে জন্যই তার এত বেলায় ঘুম ভেঙেছে আর রাতের হুইস্কি মুখটাকে বিস্বাদ করে রেখেছে। আর সে জন্যই এখনও রোজার শোবার ঘরের দরজা খোলে নি। বেচারা। আসলে, প্রভঞ্জন ভাবলে প্যাডের উপরে খোলা কলম নিচু করে, এসব কি করে হয়, তুমি জানো না। পোস্টমাস্টারমশাই চলে গেলে সন্দেহ হয়েছিল একবার, তিনি হয়তো ভাবছেন, মডেল হিসাবে রোজা থেকে আমার মন তাঁর সুন্দরী স্লিম স্ত্রীর দিকে সরে গিয়েছে। এই বিব্রত করা চিন্তাটা সবাতেই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম, তা ঠিক নয়। পোস্টমাস্টারমশাই এসে দেখুন (তিনি তো আসবেনই আর ইজেলে ছবি থাকলে দেখবেনও), রোজাকে নিয়েই আমার ছবি আঁকা চলে। হ্যাঁ, এটাই কাল সারা রাত দাঁড়িয়ে রোজাকে জাগিয়ে রেখে তার পোরট্রেট আঁকার ইনস্পিরেশন। তিনি নিশ্চিন্ত হোন।

এই রোজা সম্বন্ধেও তোমাকে বলতে পারি। ট্রেনিং শেষে এখানে পোস্টিং পেতে আমার হেডক্লার্ক মিত্রবাহাদুর তাকে হাউসকিপার হিসাবে জুটিয়ে দিয়েছিল। রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, রুমালটা, পায়জামাটা কাচা। শুনেছিলাম, দুপুরে কিছুক্ষণ এক প্রাইমারি স্কুলে পড়াবে। ত্রিশ টাকা মাইনে পাওয়ার কথা। পায় কি? ওদিকে গ্রেগ সাহেবের স্কুল, ছাড়তেও পারে না। ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে গেলে দু-একখানা হাতে গড়া রুটি, আর দু-এক গ্লাস দেশি মদ। এখন আর তা খেতে হয় না তাকে। আমি বিয়ার কিনি তাই খায়, তা খেতেই তাকে বাইরে যেতে হবে কেন? পোশাকও বদলেছে। নোলক, নথটথ নেই। কিছুদিন থেকে বাঙালিনীর মতো শাড়ি পরছে রান্নাবান্নার সময় ছাড়া। তখন সে ম্যাক্সি-ট্যাক্সি পরে নেয়। ফলে তাকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের সুন্দরী বাঙালিনী গিন্নিবান্নি মনে হয়, যেমন ইজেলের ছবিটায়। আসল কথাই বলা হয় নি। তার রং, চুলের রং, গড়ন, এসবে তো বেশ বোঝাই যায়, শেষ যে ইংরেজরা এই পাহাড়ে ছিল তাদেরই কোন ছোকরা আর্মি অফিসারের এদেশের কোন আয়াকে গর্ভ দেয়া। তখন ত্রিশের দশকের সেই মাঝামাঝি সময়ে নানা পাহাড়ে, চা-বাগানে বৃটিশদের এরকম ঘটানোর দাপট ছিল। তাসিলা ছেড়ে সেই বৃটিশ সৈন্য মহাযুদ্ধের সময়েই চলে গেলে রোজাও দেরাদুনে চলে গিয়েছিল, হয়তো তার সেই আয়া মা কোন বৃটিশ অফিসারের মহিলার সঙ্গেই গিয়ে থাকবে। হয়তো কখনও কনভেন্টে কয়েক ক্লাস পড়ার সুযোগ ছিল। সেখানে বছর পনের বড় হতেই সে এক বৃটিশ আর্মি সার্জেন্টকে বিয়ে করেছিল। হয়তো সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সে বৃটিশরা তখনও এদেশ ছেড়ে যাবো কি যাবো না করছে। কিন্তু আঠারো উনিশেই সে বিধবা হয়েছিল। তার মেয়ে আর স্বামী একই সঙ্গে পকসে মরেছিল। পরে আবার সে কুমায়ুনী কিংবা গাড়ওয়ালী এক হাবিলদারকে বিয়ে করে। তার দরুনই তার ছেলে। কিন্তু সে হাবিলদারের ৬৪র যুদ্ধ শিয়ালকোটে মৃত্যু হল। সে এখন থেকে বছর বারো আগে তাসিলায় ফিরে আসে।

দেখো, সে মাইনে নেয় না। ছেলেকে পাঠাতে দশ বিশ টাকা কখনও দরকার হলে চেয়ে নেয়।

সকালের চা থেকে রাতের ডিনার পর্যন্ত যে তৈরি করছে, ক্বচিৎ কখনও আমার টেবিলের প্রান্তেই বসে। তাকে সুতরাং প্রসাধন কিনে দিতে হয়। আর শাড়ি তো স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রয়োজন। এখন আর রকসি খায় না। রকসি যে কী? এক গ্লাসে যে কাউকে নক আউট করতে পারে।

তো তাকে মডেল করে ছবি আঁকা চলে। ধাপে ধাপে ক্রমশ সেমিন্যুড। অবশ্য সুচেতনার ছবি আঁকতে শুরু করার পর আর তাকে আঁকছিলাম না। শেষে, সুচেতনার ছবি শেষ হলে, সেই গ্রেগের জন্য তুলে রাখা মদ খাওয়ার রাতে রোজাই আমন্ত্রণ করেছিল তার বিছানায় শোওয়া ন্যুড আঁকতে।

সুচেতনার কথা। আর গ্রেগের কথা। গ্রেগ এক পাদরি যে সেন্ট সন্ত হতে গিয়ে উন্মাদ হয়েছিল। অন্য গল্প। আর সুচেতনা আমার এখানকার একমাত্র বন্ধু পোস্টমাস্টারের তরুণী বউ। সুন্দরী, তা তো অনেকেই, কিন্তু চোখে বুদ্ধি আর মরাল পবিত্রতা ঝক ঝক করলেই সেরকম লাভেবল হয়। আর তার উপরে কী আশ্চর্য, প্রথম সন্তান গর্ভে পেয়ে যেন দাম্ভিক! ওটা যে সৌন্দর্য বাড়ায়, ছবি আঁকতে ডাকে সেই মধুর আত্মম্ভরিতা, তা যদি জানতাম!

রেঞ্জারের শরীর এই সময়ে চা আর পাইপের কথা মনে করিয়ে দিলে তার চিন্তা টুটল। সে নিজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরে এসব লিখেছি নাকি? সে নিশ্চিন্ত হল, প্যাডটা সাদা। সে ভাবলে, রোজার ঘুম ভাঙিয়ে চা করার কথা বলা কি অনুচিত হবে?

কিন্তু পোস্টমাস্টারের কথা ঠিকই, সুচেতনার ওটা পোরট্রেট হয় নি। প্রথমে তা হচ্ছিল, পরে নতুন করে আঁকতে বসে ভারতীয় ভাস্করদের সেই স্বচ্ছ ধুতি-শাড়ি পরানো মূর্তিগুলোর মতো হয়েছে বরং। লাইল্যাক টাফেটা গাউন ক্রমশ স্বচ্ছ টিসু সিল্কের চেহারা নিয়েছে। ছায়াছায়া অবয়ব। সমুন্নত গর্ভের আভাস আর কৃশকটির উপরে স্নেহস্ফীত বুক। আর মুখে অন্তর্বত্নীর সেই বিস্মিত মধুর হাসি, তা যেন উলের ঝুড়িতে বিড়াল আর তার ছানাগুলোকে দেখে। আশ্চর্য কিন্তু, সে বিস্মিত মধুর সুখানুভূতি সে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল। আর তারপর পোরট্রেট ছবি হয়ে গেল। কিন্তু বন্ধুপত্নী না হয় হল, ওদিকে কিন্তু পরস্ত্রী নিশ্চয়ই।

রোজা চা আনলে। সে বেশ লজ্জিতা। বললে, নও বাজেক ছ। তার চোখের কোলে কালি, মুখ শুকনো। সে বললে, আজু অফিস না গয়ে পনি হুনছ কে?

বেলা নটা হল, আজ অফিস না গেলেও কি চলে? রোজার এই প্রশ্নে প্রভঞ্জনের মনে হল, তারও শেভ করা হয় নি, স্নান হয় নি, আয়নায় তার মুখও রোজার মতো শুকনোই দেখাবে। সারা রাত ধরে সিকিমের হুইস্কি আর দাঁড়িয়ে ছবি আঁকার ফল যা হয়।

রেঞ্জার চা নিলে রোজা বললে, তার পাহাড়িতে, আপনি ভোরের চা খেয়ে, শেভটেব করে স্নান করে নিন। পরে ব্রেকফাস্ট করে লাঞ্চ পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলে ভালো হয়। আপনার ব্রেকফাস্ট হলে আমি বারান্দায় সেলাই নিয়ে বসবো। কেউ এলে বলে দেবো, আপনি ট্যুরে।

রেঞ্জার স্থির করলে চা খেয়ে, শেভটেব করতে ওঠার আগেই চিঠিটাকে লিখবেই আজ। রোজা আয়না, গরমজল, শেভিংসেট আনলে। একটা তেপায়া টেনে তার উপরে সাজিয়ে দিলে। বললে, সার, শেভ করে স্নান করে নিন, শরীর ভালো দেখাচ্ছে না। আপনার বিছানা করে রাখছি। বাইরের প্লাকে আউট দেখিয়ে দিয়েছি। অফিসে গেলেও বিকেলে যাবেন।

স্বভাবতই ইজেলে রাখা নিজের পোরট্রেটের দিকে নজর গেল রোজার, আর সারা রাত তার সিটিং দিতে হুইস্কি সিপ করে চলার কথাও। সে সলজ্জভাবে বললে, ছবিটা কি ওখানে থাকবে সাহেব না শুকানো পর্যন্ত?

প্রভঞ্জন বললে, তা তো বটেই। কিন্তু সুচেতনার ছবিটা বরং আমার শোবার ঘরে নিয়ে রাখো। কারো দেখার কী দরকার? পরে সে ঘরেই টাঙিয়ে দেবো।

রোজা এক মিনিট মুখ নিচু করে রইল, পরে বললে, সার, সেই পুরনো মদ খাওয়ার ছবিটা,

ওটা কোন ঘরেই টাঙানো চলবে না কিন্তু। বার্নিস করে দিলে আমি ছবিটাকে ওয়াড় পরিয়ে দেব। টাঙাতে হয় যদি, সে যখন আপনি অন্য কোথাও ডিএফও। যেখানে রোজা নেই।

প্রভঞ্জন চা খেয়ে শেভ করেও নিলে। কিন্তু স্নানে না গিয়ে পাইপ ধবিয়ে বরং চিঠি লিখতে বসল। সে ফাইলের তলা থেকে মুকুলের সেই পূজোর সময়ে পাওয়া চিঠিটাকে বার করলে। এনভেলপের মধ্যে সে পোস্টকার্ড সাইজের ফটো পাঠিয়েছে। কোণারকের সেই রথের চাকা, সেই এক স্থূলবক্ষী যক্ষিণী যে প্রসাধনরতা, এক যক্ষমিথুন। চতুর্থটি কিনতে পাওয়া যায় এমন অন্য কারো তোলা ফটো নয়। বিধি অনুসারে তার নিজের তোলা ফটো। বোঝা যায় কাঁচা হাতের। কী আশ্চর্য! প্রভঞ্জন শেষ ফটোটাকেই হাতে নিলে। ম্যাগ্নিফাইংগ্লাস নিয়ে ফটোটাকে নিবিষ্ট হয়ে দেখলে। পরে মুকুলের চিঠিটাকে আবার পড়লে।

সে লিখেছে, নো ইওর কানট্রি প্রোগ্রামে আমরা স্কুল থেকে পুরী–কোণারকে গিয়েছিলাম। সামনের নভেম্বরে স্থির করতে হবে আর্মিস্কুলের অ্যাডমিশন টেস্ট দেয়া হবে কি না। কোণারক থেকে কলকাতা গিয়ে মায়ের কাছে ছিলাম। তাঁর মত জানতে চাইলে বলেছেন, দাদামশায়কে লেখো। মত দেবেন। ওদিকে মা আমাকে পেয়ে কী যে খুশি! কয়েকটা ফটো পাঠালাম। তার মধ্যে একটা মায়ের। ফটোতে মায়ের খুশি ভাবটা ওঠে নি। সন্দেহ হয় আগের চাইতে অনেক রোগা। ঠোঁট দুটো আর লাল নয়, ফ্যাকাশে। কেমন সব রংজ্বলা শাড়ি পরনে। বলো, পঁয়ত্রিশে কেউ বুড়ী হয়? তুমি আবার বলে না বসো, ত্রিশেই তুমিও বুড়ো। একদিন একা আলসে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। না বলে এই স্ন্যাপ ফটোটা তুলেছি। দেখো, কেমন রোগা, নাকি নিঃসঙ্গ? নাকি বিষণ্ণ? আমার মনে হয়, তোমার একবার তাড়াতাড়ি কলকাতায় যাওয়া দরকার। তুমি আমার তুলনায় কলকাতার কাছে থাকো। কিন্তু অনেকদিন, অনেকদিন নাকি যাওনি, বললেন।

প্রভঞ্জনের মুখ বিষণ্ণ দেখাল। সে লিখলে :

বনানী, এতদিন পরে, পাঁচ বছর পরে, এখন আর তোমাকে না লিখতে পারলাম না। ভেবে দেখলে এই প্রথম চিঠি লিখছি। মনি অর্ডার কুপনে ভাল আছি, ভাল থেকো, নিশ্চয় চিঠি নয়। মুকুল তোমার শীর্ণ মুখের ছবি ফাটিয়েছে। লিখেছে, তুমি বোধহয় ভালো নেই। নিশ্চয়ই তোমার দুই প্রতিবেশী একতলা তিনতলার ফ্ল্যাটের মানুষদের সঙ্গে তোমার বিবাদ হতে পারে না। আমার ধারণা হয়, গানের স্কুল করেছো, কিংবা নিভৃত সঙ্গীত সাধনায় তোমার দিন কেটে যায়।

ভালো আছি। বনে জঙ্গলে বেড়ানোই কাজ। পাহাড়ে ওঠা নামা অবিরত। খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা নেই। রোজা নামে আমার হাউসকিপার খুবই যত্ন করে। গরীব ইউরেশিয়ান। দুবার বিয়ে করে দুবার বিধবা। ৪৫ বছর হবে। সে রকমে স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ সুন্দরী হয়ে ওঠে। তেমন সুন্দরী। আমার সেই পঙ্গু করে আনা আর্থ্রাইটিস নেই। প্রমাণ কাল রাত দশটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তার ছবি এঁকেছি, সহায় ছিল হুইস্কি আর পাইপ। সে কথা বলতে গেলে এও বলতে হয়, তার ছবি গত তিন বছরে আমি অনেক এঁকেছি। মডেল হতে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সেই ঈষৎ স্থূলাঙ্গী সুন্দরী যাকে বাঙালিনী গিন্নিগোছের পোশাকে মানায় এখন সে ন্যুড মডেল হতেও আপত্তি করেনা আর। তাই বলে শুধু তাকেই আঁকি তা নয়। তাকে আঁকতে আঁকতে অন্য এক সুন্দরীরও ছবি এঁকেছি। সে তরুণী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সুরুচিমতী। তোমাকে বলতে পারি, সেই তরুণীকে আবিষ্কার করেই আমি বুঝেছি, পুরুষ কেন নারীকে ভালবাসে। তাই বলে কিছু মনে করোনা। তিনি আমার বন্ধুপত্নী। আমার দূরস্থিত আইডিয়াল মাত্র। তিনি রোজার ছবি আঁকার নেশা কাটিয়ে দিতে পারেন।

আর এসব কেন তা তুমি জানো। তোমার সামনেই সেই পাইন, মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার বলেছিলেন, মুকুল আর সৎমায়ের জন্য বাঁধা পড়ে না থেকে দূরে চলে যাও, নিজের একটা হবি ধরো, অল্প

অল্প নেশা করো। মনে করে দেখো, পাঁচ বছর আগে কলকাতায় সেই অধ্যাপনা করতে করতে আর্থ্রাইটিসে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছিলাম। ডাক্তাররা বলতো মায়ের আর্থ্রাইটিস ছেলের হচ্ছে। তুমিই কী ভেবে সেই মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে। আর সেই ডাক্তার সে রকম বললে, তুমিও বলেছিলে, তাই ভালো, দূরে কোথাও চলে যাও, নতুবা এমন কোথায় নিয়ে চলো, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। হয়তো মুখ লুকাতে চেয়েছিলাম, সেজন্য বনের চাকরির জন্য পরীক্ষা দেয়া। হয়তো বটানির ডিগ্রি, জুলজির পড়াশোনা সাহায্য করবে, এই আশাও ছিল।

তুমি নিশ্চয় পরে বুঝেছিলে, মালঞ্চের লতার মতো জীবন হয় না, এক লতা ফুলপ্রসবে অশক্ত হলে, শুকিয়ে যেতে থাকলে নতুন লতার দিকে মালী আকৃষ্ট হলে যে কাব্য তৈরি হয়, মানুষের জীবনে সেরকম নবীন বসন্তের উজ্জ্বলতা আসে না। আমার আর্থ্রাইটিসে শয্যাশায়ী জননী সহ্য করতে পারেন নি, রোগশীর্ণ চল্লিশে পৌঁছানো জীবনকে নিজের হাতে শেষ করে দিয়েছিলেন। ঘুমের ওষুধ তো হাতের কাছেই থাকতো। মা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালোবাসতেন। তুমি তাঁর দূর আত্মীয়, তা সত্ত্বেও তাঁর রোগশয্যায় গান করে শুনাতে তাঁকে। তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তুমি এবং আমার পিতা অসহিষ্ণু ছিলে, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারো নি। অবিবাহিত তোমার চেহারা দেখে তিনি মুকুলের আসবার কথা বুঝেছিলেন।

এ অবস্থায় আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য যদি তোমাকে পাপী, ভ্রষ্টা বলে ঘৃণা করি, যদি পিতার উপরে বিদ্বেষ হয়, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুকে যথাযথ হয়েছে মনে করি, বোধহয় আমাকে দুর্বল বলা যায়, অস্বাভাবিক বলা যায় না। পিতার ফ্ল্যাট, পিতার সঞ্চিত অর্থ ভোগ করতাম কিন্তু আধুনিক হওয়ার চেষ্টায় আমার যে ফ্ল্যাটের রং বদলানো, পুরনো ভালো ফার্নিচার বদলে নতুন ফার্নিচার কেনা সে নাকি, পাইন ডাক্তারের মতে, পিতাকে পরাজিত করে তার জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর সে প্রতিষ্ঠা তোমাকে অধিকার করে। আর আমার সেই ক্রিপলিং আর্থ্রাইটস নাকি মনের ব্যাপার ছিল। তোমার উপরে ভ্রষ্টাচারী বলে যে ঘৃণা, মায়ের মৃত্যুর হেতু বলে যে বিদ্বেষ, তা নাকি কোন সময়ে তোমার ত্রিশের অস্তিত্বের উপরে মোহে পরিণত হয়েছিল। অসুখের অভিনয় করে আমার মন তোমাকে আমার কাছে আমার শয্যায় রাখতে উৎসুক ছিল।

আমি জানিনা, বিদ্বেষ আর ঘৃণা কি করে এক রকমের ভালোবাসা হয়? বাইরে কি মনের গতিবিধি দেখা যায়? আমার সুস্থ হওয়াটা কি পাইন ডাক্তারের সিদ্ধান্তকে সত্য প্রমাণিত করে? কিংবা সেই আর্থ্রাইটিস আমার মনের হলেও তার জন্য দায়ী কলকাতার সেই ফ্ল্যাটের জীবন, সেই প্রাইভেট কলেজে সেই বোকা বোকা ছাত্রমুখ যাদের সেই বোবা দৃষ্টির নিচে রাজনৈতিক হিংস্রতা, সেই দমবন্ধ করা ট্রামবাস। আর ফিরে এসে আমার ফ্ল্যাটের কয়খানি ঘরে, ছকে বাঁধা ওঠা, বসা, ঘুমানো। যেন এক ধূমল কাচনলের দুপ্রান্তে দুই স্যাঁতা কালো বুদবুদ–আমার কলেজ আর আমার ফ্ল্যাট। তার মধ্যে ইঁদুরের ছুটোছুটি। কলকাতায় কি দেখেছো কখনও আকাশ নীল হয়, বাদামি হয়, অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যায়? কখনও কি এত সবুজ দেখেছো যা আমার চারদিকে? সেখানে আকাশ ধূমল। সেখানে নিঃশ্বাসে অন্যের ব্যবহার করা বাতাস নিতে হয়। সেখানে তুমি জানতে পারো না, আকাশের নিচে তোমার মাথা মাটি থেকে কত উপরে। কলকাতার নাম তো আর্থ্রাইটিস হতে পারে। আমি সেরে গিয়েছি, তার কারণ কি আমার বন, পাহাড়, আকাশ হতে পারে না?

প্রভঞ্জন একটু ভেবে নিয়ে লিখলে, একটা কথা বলতে হবে। শান্তির জন্য দাম দিতে হয়। যেমন আমি হয়তো নিজের শান্তির জন্য অন্য কারো ক্ষতি করে ফেললাম। আমি যখন বদলি হয়ে অন্য কোথাও যাবো, রোজার কি নিঃসম্বল আর একা লাগবে না তার চিত্রকরের অভাবে? আর তা ছাড়া রোজাকে রকসি ছাড়াতে যে ফরেন বিয়ার ধরিয়েছিলাম, সে তো অন্য রাষ্ট্র থেকে স্মাগলড হয়ে আসে। সেখানে একসাইজ ডিউটি নেই বললে চলে, সেই ফরেন বিয়ার অনেক

সস্তা। কিন্তু যারা আমাকে ফরেন বিয়ার যোগান দেয় আরও সস্তায়, তারা কি অন্যভাবে দাম নেয় না? আমাদের এখানে তো কাঠই সম্পদ। কাঠচোর থেকে, পোচার থেকে বন বাঁচানোই আমাদের চাকরি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বিয়ার আর ছবির নেশায় কর্তব্যে চোখ রাখি নি, হয়তো যারা ফরেন স্মাগলড বিয়ার যোগান দিতো, তাদের কাঠচুরির সুবিধা করে দিয়েছি। এখনও প্রমাণ হয় নি। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারছি না।

এখন আমি ডেসপারেট। আর কর্তব্যে অবহেলা হতে দিচ্ছি না। যে চুরি হয়েছে, যদি হয়ে থাকে, তাতে আমার সই করা মিথ্যা গেটপাস ব্যবহার হয়ে থাকলে, ধরে ফেলবো। যদি তাতে নিজের অপরাধ প্রমাণ হয়, হবে। এ ব্যাপারে একটা মিনতি, সে অবস্থায় আমি লড়াই করবো, কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে, তার দাদার সেই ব্যক্তিত্ব গলে গলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার ভাই মুকুলের জ্ঞানে না আসে। ওকে মিলিটারিদের স্কুলে ভরতি হতে সাহায্য করো। ওদের স্কুল দূরে দূরে হয়, আমাদের খবর সেখানে সহজে পৌঁছায় না।

প্রভঞ্জনের চোখে জল এসে গেল। সে বরং টেবল থেকে উঠে পড়ল। নিজেকে সামলে নিলে। রোজাকে উঁচু গলায় বললে, স্নানে যাওয়ার আগে আর একটু চা দিও। রোজা যতক্ষণে চা আনলে সে লেখা চিঠিটা পড়লে। পরে চিঠিখানাকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। রোজা চা এনে দিলে সে বললে, স্নানে একটু গরম জল পেলে ভাল হয়। রোজা বললে, ব্রেকফাস্ট তৈরি। গরমজল চাপাচ্ছি। আপনি স্নানে গেলে টোস্ট বসাবো। প্রভঞ্জন বললে, থ্যাঙ্ক ইউ।

রোজা চলে গেলে চা খেতে খেতে প্রভঞ্জন এই ছোট্ট চিঠিটা লিখলে :

জননীপমা শ্রীযুক্তা বনানী দত্ত। পত্রপাঠ উত্তর দিও। মুকুল একটা ফটো পাঠিয়েছে তোমার। তোমাকে না বলে তোলা, তোমাকে না জানিয়ে আমাকে পাঠানো। তুমি ভাল নেই। ভীষণ রোগা। পঁয়ত্রিশে বুড়ি হওয়ার চেষ্টায় আছো। মনে হল, তোমার হার্টটা ভাল নেই। ঠোঁট রক্তহীন। এ অবস্থায় তোমার আমার কাছে না থাকা মুকুলের চোখে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। তুমি প্রস্তুত থেকো। আগামী বছরের গোড়াতেই ফ্ল্যাট ছেড়ে যাতে আমার কাছে আসতে পারো, সে ব্যবস্থা করো। মধ্যে আর দুমাস থাকছে। এখানে আমার বাংলো কাচ আর কাঠের। শীত পড়বে, রোদও আছে। বেশ ভালই প্রতিবেশীহীন দুর্গ। কিন্তু হিল স্টেশনের মতো লাগবে। এখানে না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা স্থগিত রাখো।

আমি সুস্থ আছি। পায়ে হেঁটে, পনিতে, বনারণ্য, পাহাড় চষে বেড়াচ্ছি। শুধু তাই? ভলিবল খেলছি। বাদলা থাকলে ঘরে পিং পং।

একটা কথা লিখি তোমাকে। আমি এক হালকা পলকা ছাব্বিশ-সাতাশের রূপসীকে ভালোবেসে ফেলেছি। সে কথা এখনই পাইন ডাক্তারকে জানাবো না। কী দরকার? হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না, আমি কোন তরুণীকে তেমন ভালবাসতে পারি। ভাল কথা পাইন পাইনকেও আমি আমন্ত্রণ করেছি, বড়দিন থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ তিনি আমার কাছে এসে থেকে যেতে পারেন। পুরনো রোগী কেমন আছে, দেখতে হয় না? তাই বলে তুমি সেই তরুণীর সঙ্গে বিয়ের যোগাড় করার কথা ভেবো না। প্রথম মাতৃত্বের গর্বে অলৌকিক সেই তরুণী আমার বন্ধুপত্নী, বন্ধু যাকে আমি ভালোবাসি।

আমার জন্য প্রস্তুত হও। ইতি

প্রভঞ্জন রেঞ্জ অফিসার।

রেঞ্জারের সেদিন অফিসে যেতে বেশ দেরিই হল। চিঠি লেখা শেষ হলে, স্নানে যাওয়ার আগেই সে বারান্দার সেই ইন-আউট প্লাকে রোজার কৌশল ভেস্তে দিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, কার

ভয়ে সে মিথ্যা করে বানাবে, সে ট্যুরে গিয়েছে। বেলা দশটায় ব্রেকফাস্ট করে সে শুয়েও নিল। বেলা দুটোয় অন্যদিনের তুলনায় যত্ন করে পোশাক পরে সে অফিসে চলল।

সে দেখতে পেলে, স্কুলের ঘর আর তার অফিসের মাঝামাঝি দূরত্বে নরবু পথের ধারে ঘাসের উপরে রোদ পোহানোর ভঙ্গিতে বসে। সে নরবুকে জিজ্ঞাসা করলে, ডাক আনা হয়েছে কিনা। নরবু জানালে ডাক আনা হয়েছে, অফিসে তার টেবলে রাখা আছে। প্রভঞ্জন থেমে দাঁড়িয়ে তাকে বললে, নেভার মাইন্ড নরবু, আর একবার ডাকঘরে যাও। আমার এই চিঠিটা ডাক ধরতে পারে কিনা দেখো। নরবুর হাতে বনানীকে লেখা চিঠিটা দিয়ে সে শিস দেয়ার মতো মৃদু শব্দ করতে করতে অফিসে চলল।

চেম্বারে পৌঁছে সে পাইপের তামাকটাকে ছাই করলে। ডাকে তার টেবলের উপরে, সব উপরের চিঠিটা তার নামে অ্যাড্রেস করা। তার অনুপস্থিতিতে ডাক খুলতে নিষেধ করে দেয়ায়, ডাক তেমনই আছে। পাওয়ার হাউস সম্বন্ধে সেই ডি.ও চিঠির গোলমাল হওয়াতে ডাক না খোলার হুকুম দিতে তার সুবিধা হয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি এই নয়, যে সেটা এক রকমের আগ্রহ, অন্য কারো চোখে পড়ার আগে ডাক পড়ে ফেলা। সে কি সত্যি আশঙ্কা করে কোন তিরস্কার, কোন বিপদ, কোন নালিশ বা থাকবে, যা খুঁজতে অন্য অনেক কিছু প্রকাশ পেয়ে যাবে?

তা কখনও নয়। সে স্থির করলে, এটা এক ভয়ের লক্ষণই, এই ডাকের ব্যাপারটা। সে বাইনেম চিঠিটাকে পাশে রেখে, অন্য চিঠিগুলোকে খুলতে খুলতে বড়বাবু মিত্রবাহাদুরকে ডাকলে। সে এলে, চিঠিগুলো তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, ডকেট করুন। মিত্রবাহাদুর ডাক খুলতে খুলতে ইতিপূর্বে খোলা তার হাতের খোলা চিঠিগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিতে শুরু করেই বললে, এই চিঠিটা কি দেখেছেন সার, স্কুল সম্বন্ধে?

কী আছে? প্রভঞ্জন চিঠিটা হাতে নিয়ে বললে, কী আছে? আপনাদের স্কুল সম্বন্ধে? পড়ে বললে, নিন, মশায়, দুজন শিক্ষক পয়লা নভেম্বর জয়েন করবে আপনাদের স্কুলে। তা হলে শিক্ষা বিষয়ে আপনাদের ডিমান্ড খানিকটা পূর্ণ হচ্ছে। আর যাই হোক, আর কোনদিনই আমাকে আপনাদের স্কুলে যেতে হবে না। আপনাদেরও অফিস পৌঁছতে দেরি হবে না। ওভারটাইম নিয়ে অশান্তি থাকছে না।

মিত্রবাহাদুর বললে, যাক, তা হলে, আপনার বাইনেমগুলো ছাড়া আমিই খুলবো আগেকার মতো? প্রভঞ্জন বললে, আগেকার মতোই চলুক। কী আর হবে?

তার মনে পড়ল ডাক খোলার ব্যাপারে একটা প্রেস্টিজের প্রশ্ন আছে। বড়বাবুর ডাক খোলার অলিখিত অধিকার অস্বীকার করে জানানো হয়েছে, সে বিশ্বাসভাজন নয়। সে জন্য তার বাইনেম এনভেলপটা কেটে চিঠিটার এক প্রান্ত বার করে ইনিশিয়াল দিয়ে, সেটাকেও মিত্রবাহাদুরকে দিয়ে দিলে। ঘড়িতে তিনটে হলেই সে উঠে পড়ল। ঘণ্টাখানেক তো অফিসে থাকা হলই। দশটায় ব্রেকফাস্ট হলেও তিনটেতে লাঞ্চে বসা উচিত। নতুবা রোজার সব আয়োজন অখাদ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু সে বেরোবার আগেই মিত্রবাহাদুর ফিরে এল। সে বেশ উত্তেজিত। বললে, আপনার এই বাইনেম চিঠিটা—

কী এমন?

হেডকোয়ার্টার।

বাই নেম চিঠিতো হেডকোয়ার্টার থেকেই আসে।

তা নয়, সার, রেঞ্জ হেডকোয়ার্টার শিফটিং।

তার মানে তাসিলা রেঞ্জ হেডকোয়ার্টার শিফট করছে জাকিগঞ্জে?

হ্যাঁ, সার, পরামর্শের জন্য যেতে বলেছেন ডিএফও।

ইনট্রেস্টিং তো। আপনাদের আর একটা ডিম্যান্ডও মেনে নেয়া হল।

তাই বলে আমরা কি এরকম চেয়েছিলাম? আমাদের সঙ্গে পরামর্শ হবে তো! যথেষ্ট সময় দেয়া হবে তো! এতো নভেম্বরের মধ্যে শিফটিং। এই নতুন ধরনের ফাইলমার্কও বুঝতে পারছি না। টি.জি.এস–ওয়ান। একি তাসিলা গ্রাউন্ডসোয়েল?

কই দেখি। চিঠি থেকে হাত বাড়িয়ে নিলে প্রভঞ্জন। পড়লে। পয়লা নভেম্বর থেকে শুরু করে ত্রিশে নভেম্বরে শেষ হবে শিফটিং, আর তাকে পরামর্শ করতে ডেকেছে ডিএফও। যত তাড়াতাড়ি সে যায় তত ভালো। গ্রাউন্ড সোয়েলই বটে। তাসিলা রেঞ্জের তলদেশে ঢেউ লাগার মতোই ব্যাপারটা।

সে হেসে বললে, আচ্ছা খেয়ে আসি, পরামর্শ করবো।

বাংলো যাওয়ার পথে সে দেখলে, যেখানে নরবু বসেছিল, সেখানে এখন মেয়রও এসেছে। দুজনে চিন্তিত মুখে কিছু আলোচনা করছে। নরবু উঠে এসে জানলে, পোস্টমাস্টারসাহেব বলেছেন, সাহেবের চিঠি আজকেই ডাকে যাবেন। মেয়রও এগিয়ে এসেছিল। মনে হল, সে কিছু বলতে চায়। প্রভঞ্জন বললে, আচ্ছা, মেয়র, তুমি কি অফিসে অপেক্ষা করবে? আমি খেয়ে এসে তোমার কথা শুনছি।

প্রভঞ্জন তাদের পার হয়ে এগিয়ে গেল। তার আবার সেই টিজিএস ফাইলের কথা মনে হল। অবাক কাণ্ড কিন্তু, সে ভাবলে। অনেকদিন থেকে এদের ইউনিয়ানের দাবি ছিল বটে তাসিলা রেঞ্জ অফিস জাকিগঞ্জে নিয়ে যাওয়া। এখন ঝড়ঝঞ্ঝার মতো ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে। সে ভাবলে, অফিসে গিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হবে। চিঠিতে যতটুকু বোঝা যায়।

চলতে চলতে হঠাৎ তার মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। সে সামনে পিছনে তাকালে। তার অবাক লেগে গেল। এই ফরেস্টকলোনির বাড়িগুলো আর অফিস চলে গেলে দুর্গের নিচে থেকে গ্রেগ অ্যাভেনুর শুরু পর্যন্ত সব খালি হয়ে যাবে। স্কুলটা হয়তো শুধু থাকবে।

তালা খুলে বাংলোয় ঢুকে প্রভঞ্জন দেখলে, খাবার টেবলের পাশে হিটারের উপরে জলের গামলায় জল ফুটছে, তার উপরে নানা কায়দায় রাখা তার লাঞ্চ। লাঞ্চ গরম রাখার ব্যবস্থা করে রোজা তাহলে স্কুলে গিয়েছে। এত যত্ন! প্রভঞ্জন খাবারের পাত্রগুলো টেবলে যত্ন করে নামিয়ে খেতে বসল।

তার স্কুলে মাস্টার এসে যাওয়ার কথা মনে এল। তার এই অর্থ, রোজা আর শর্মা স্কুলে আর পড়াবে না। ছাত্রছাত্রী তাদের কতই আর বেতন দেয়? তাহলেও কিন্তু গ্রেগ সাহেবের স্কুল বলে প্রায় দশ বৎসর পড়াচ্ছে তারা। তারপর তার মনে হল, টিজিএস মার্কা ফাইল থেকে লেখা চিঠিটার কথা। সে আবার হেসে ফেললে, তাসিলা গ্রাউন্ডসোয়েলে ফরেস্টকলোনি নাকানি চোবানি খাচ্ছে ইতিমধ্যে। এই সময়ে তার মনে হল, রোজা কিন্তু খুব নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে আবার। তার কী রকম মনে হল, খেতে খেতেই উঠে গিয়ে ইজেলে রাখা সেই চকচকে রোজার পোরট্রেটাকে দেখে এল। সুচেতনার ছবিটাও তো তার পাশেই। সেটাও দেখলে সে।

আর তাতেই যেন একটা সাহসী অনুভূতি এল তার মনে। রোজার ছবিটাকে সে তার ছেলেকে দিয়েই দেবে যদি সে চায়। তার পরে তার অনুভূতি ভাষা না পেয়ে ছবি হয়ে যেতে থাকল। যেন কেউ কাউকে বলছে, রুগ্ন শরীর সারাতে পাহাড়ে উঠে পড়ো। আর তখন সেই রুগ্ন লোকটা পাহাড়ে উঠছে। সাহস হচ্ছে না রোগকে আর দুরারোহতাকে পিছনে ফেলে উঠে যেতে। সামনে তাকালে দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে। পিছনে চাইলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় গা শিরশির করে। থেমে থেমে সে বেশি দূরে না চেয়ে উঠছে। একবার তো এক উপত্যকা পেয়ে সেখানে বসেই পড়েছিল। সেই ঝর্নার জল খেয়ে, সেই উপত্যকায় জিরিয়ে নিয়ে উঠতেই শেষ ক্লাইম্বটা যা তুষারধবল ও দুর্গমতম, অথচ চ্যালেঞ্জ করছে। সেটা পার হলেই চূড়া, সেই জমাট বরফের দুধসাদা নগ্নতা, নাকি সেটাই

গ্রেগের জন্য সংরক্ষিত মদ? আর তার পরই সেই ঝলমলে পুরো অক্সিজেনের চূড়া ওই ইজেলে। আর চূড়ায় পৌঁছে কারো কোন রোগ থাকে না।

সে নিজেকে বললে, না বোধ হয় ইজেলের ওই উজ্জ্বল সোনালি বাস্ট কাউকে দেয়া যাবে না। রোজার ছেলে চাইলে বলতে হবে, তোমার মা তোমারই রইল। তার বাড়িতে গেলেই দেখতে পাবে। এটা তোমাকে দিলে, আমার কী থাকে, ভাই? বরং ছোট ভাই-বন্ধুর জন্য সোনার গহনা কিছু নাও।

খাওয়া শেষ করে বাংলোয় তালা দিয়ে, ডুপ্লিকেট তো রোজার কাছেই, সে অফিসে চলল আবার। তার আবার একই দিনে একসঙ্গে আসা চিঠিদুটোর কথা মনে হওয়ায় মুখটায় দুষ্টুমির হাসি ভাব দেখা দিল।

যেতে যেতে সে দেখলে, নরবু আগে যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে আছে। উপরন্তু মেয়রও সেখানে। মনে হয়, দুজনে পরামর্শ করছে। নরবু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পোস্টমাস্টার বলেছেন, সাহেবের চিঠি আজকের ডাকে যাবে। প্রভঞ্জন চলতে চলতেই বললে, থ্যাঙ্কস। কিন্তু সে লক্ষ্য করলে, মেয়রও তাকে কিছু বলতে উঠে বসেছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবে, মেয়র? তুমি অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করো। ঘণ্টাখানেক অফিসে থাকবো। পরে তোমার সমস্যা দেখছি।

অফিসে ঢুকে মিত্রবাহাদুরকে ডাকিয়ে সে সেই টিজিএস ফাইলের চিঠিটা চেয়ে নিলে। খুঁটিয়ে খুটিয়ে পড়লে। কিন্তু চিঠিটা পড়া শেষ হতে না হতেই অফিসের অন্য স্টাফেরাও দেখা দিল। তারা একদল খুশি, একদল দ্বিধায়, একদল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সকলেই উত্তেজিত। এক সঙ্গে সকলে হৈ হৈ করে কথা বলতে চায়। স্কুলের চিঠি এল সে রকম সময়ে, যখন তাসিলার ফরেস্টঅফিস তাসিলায় থাকবে না। মিত্রবাহাদুর বললে, এর মধ্যে নিশ্চয় গোলমাল আছে। যাদের বাড়ি তাসিলা আর যাদের বাড়ি তা নয়, তার লিস্টি করে আপনাকে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। খুব যেন জরুরী! কিন্তু এতো শ্রমিকদের ভাগ করা। বিচ্ছিন্নবাদিতা। এ লিস্টি আমরা করে দেবো না, বরং লাগাতার করবো।

প্রভঞ্জন আজ কিছুতেই ঘাবড়াবে না যেন। সে হেসে বলল, আমিও সে রকম বলতে চাইছিলাম। এই স্কুল আর হেডকোয়ার্টার শিফটিং—এদুটোতেই আপনাদের ভালমন্দ দেখার আছে। এখনই বরং ছুটি নিয়ে মিটিংএ বসুন। একটা রেজোলিউশন করুন স্কুল সম্বন্ধে। এখানে এক সময়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল, যাতে মিত্রবাহাদুর এক সময়ে পড়েছেন। তার অনেক বছর পরে সেই গ্রেগ সাহেবের স্কুল। তাতেও এখানকার অনেকে প্রাথমিক পড়েছে। গ্রেগসাহেবের স্কুল নামটা ভাল। সরকার দুজন শিক্ষক পাঠাক, আপনারা দাবি করুন, শর্মা আর রোজাও স্কুলে থাকবে। ওদের দুজনের মাইনা মাসে ষাট। না হয় এখন থেকে আশি হবে। বছরে হাজার টাকাও নয়। আপনারা চেষ্টা করলে, আমাদের রেঞ্জের মধ্যে যে ব্যবসায়ীরা আছে, কনট্রাক্টররা আছে, তাদের থেকে ওদের দশ বছরের বেতন দশ হাজার টাকা তুলে দিতে পারেন। টাকাটা তুলে পোস্টঅফিসে রাখুন ফিক্সড ডিপোজিট করে। দ্বিতীয় রেজিলিউশন করুন, হেডকোয়ার্টার শিফট করা নিয়ে। আজ অফিস এই পর্যন্ত। যদি ঘণ্টা দুএকে রেজোলিউশন দুটো হয়ে যায়, আমি ডিএফওর কাছে নিয়ে যেতে পারি।

মিত্রবাহাদুররা মিটিং করতে চলে গেলে প্রভঞ্জন দশ মিনিট অফিসে বসল। তার মনে হল অফিস আবার সে নিজের কবজায় নিচ্ছে। দূরে দূরে পালাচ্ছে না। ডাক খোলার অধিকার কেড়ে নিয়ে আবার তা ফিরিয়ে দিয়ে সে বুঝিয়ে দিয়েছে, অফিসে সেই সেন্ট্রাল ফিগার। আর ইউনিয়ানের মিটিং করার পরামর্শ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে ব্যাপারেও সেই লিডারশিপ নিতে পারে। কাঠ চুরি হয়ে থাকে, দেখা যাবে। অথবা সেই তো পুরনো কথা, ইউ হ্যাভ টু পে ফর ট্র্যাঙ্কুইলিটি। ছবি আঁকতে রোজাকে দরকার ছিল, রোজার জন্য দরকার ছিল বিয়ার, আর ছবি দরকার ছিল শান্তির জন্য।

সে ভাবলে, শান্তিই কি কথাটা? এই ব্যাপারগুলো কেমন হয় শেষ পর্যন্ত!

আচ্ছা, মনে করো, সে নিজেকে বললে, সেই গ্রেগের মদ ছবিটাকে আঁকার কথা মনে করো। এক শনিবারের সারা রাত ধরে হুইস্কির বদলে গ্রেগের জন্য যত্ন করে তুলে রাখা সেই বিলেতি মদ, যার উপযুক্ত গ্রাহক রোজা তার বত্রিশ বছর বয়স থেকে না পাওয়ায় বিক্রি হয় নি, পরে গ্রেগের সঙ্গে দেখা হলে তার সম্ভাব্য প্রয়োজনের জন্য রেখে দেয়া হয়েছিল। সেই মদ খোলা হল। আর শীতও ছিল। মদেও শীত যাচ্ছিল না। যে অংশটা স্কেচ হয়ে গেছে শরীরের সেটুকু ঢেকে দিতে হচ্ছিল। এরকম কি বলবে যে পোস্টমাস্টারকে কিছু বোঝানো দরকার ছিল? সুচেতনার রূপ নয়, রোজাই তখন তার ইনসপিরেশন। কিন্তু সারারাত না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তেমন ছবি এঁকে চলা নিজেকে শীতে কষ্ট দিয়ে আর রোজাকে আরও বেশি শরীরে ও মনে কষ্ট দিয়ে—কেন? কার শান্তির, তৃপ্তির দরকার ছিল? সেই মস্তিষ্কবিশারদ পাইন যাকে আবিষ্কার করেছিল, তার?

কিন্তু রোজাকে দেখো। তার তো ছবিটা শেষ হলেই কুণ্ঠা কেন, অনুশোচনাই দেখা দিয়েছে। শুকানোর জন্যই ইজেলে রাখতে দিতে আপত্তি ছিল! সে ছবি যাতে তাসিলার কেউ না দেখে সে রকম ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছে। ওদিকে দেখো, সেই রাতে যেন মদ খেতে খেতে বেপরোয়া নেশায় নিজেই সে ভাবে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। কেন? সে কি কোন রকমের কৃতজ্ঞতা দেখানো?

তা হলে কিন্তু আশি রাতের জন্য সেই বিশ হাজারের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করা যেতো না। আর সে প্রস্তাব ঘরে আগুন দিয়েই যাতে থেমে যায়, সে জন্য সারা রাত গ্রেগের কাছে প্রার্থনা করা দরকার হতো না। ওদিকে আবার সেই তুষারঝড়ের রাতে ঠান্ডা দুধের চাইতে ঠান্ডা সেই উলঙ্গ গ্রেগের শরীরকে নিজের বুকের উত্তাপে গরম রাখা। তা ছাড়া দেখো, সেই ডম্বরির অসুখে সারা রাত জেগে পকসের সঙ্গে যুদ্ধ করা। সেই ভয়ঙ্কর রোগে তার স্বামী আর মেয়ের মৃত্যু হয়েছিল। সে ভয়ঙ্কর রোগের ছোঁয়াচে মৃত্যু না হলেও রূপসীর রূপ আর থাকে না কিন্তু।

প্রভঞ্জন অবাক হয়ে গেল। এসবের মূলে কিন্তু একটাই মন। তা কি এক স্নেহশীল ক্ষমাপরায়ণ আদিমতা।

মিটিংএ রেজোলিউশন সহজে হচ্ছেনা। বিতর্ক উচ্চগ্রামে। তার শব্দ কানে গেলে প্রভঞ্জন হেসে ফেলল। আর সে জন্য তার মনে পড়ল, অফিস ছুটি হয়ে গেছে। এখন বরং কফি খেতে হয়—নিজেকে এই বলে সে উঠে পড়ল।

৬

ময়ূর সেই বেলা দুটো থেকেই ভাবছে। বাংলোয় ফিরে সে দেখেছিল, নরবু রান্না শেষ করে শুকনো মুখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। মনে হয় কোন কারণে সে খুব ভয় পেয়েছে। পাশাপাশি খেতে বসেও কথা হয়নি। যার যার চিন্তা নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল।

ময়ূর তখন একবার ভেবেছিল, শুট আউটের কথাটা যদি অন্য কারো মুখে প্রকাশ না হয়ে যায়, তার পক্ষে চেপে যাওয়াই ভাল। জেন ম্যাডাম যে ভাবে প্রমাণ করতে চাইছেন, যে সে আদৌ সে রাত্রিতে বাইরে ছিল না, ক্লুটলংএ ঘুমিয়েছিল—সেটা বলা উচিত হবে না। অন্য কিছু না হোক, সে জেন ম্যাডামের সঙ্গে কোনভাবে ঘনিষ্ঠ জানলে, স্মাগলাররা প্রতিশোধ নিতে ক্লুটলং আক্রমণ করতে পারে। বিশেষ যে ভাবে ম্যাডাম একা থাকেন।

ময়র রেঞ্জারের সঙ্গে কথা বলতে সেই যে দুপা গিয়েছিল, ফিরে এসে রেঞ্জারের অপেক্ষায় আসা নরবুর পাশেই রেঞ্জারের অফিস থেকে বেরোনোর পথের ধারে, সেখানেই বসে পড়ল। সে ভেবে ভেবে কোন যুক্তিই খুঁজে পেল না কাল রাতে সেই অর্কিডের বনে যাওয়ার। পরের টুকু

না হয় বলা যায়, স্মাগলারই প্রথমে গুলি করেছিল তার দিকে, সে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় শুট করেছে। হয়তো মানুষ মরেছে। যদিও সে সকালে গিয়ে রক্তের চিহ্ন, মানুষের পায়ের দাগ, ঘোড়ার খুরের চিহ্ন কিছু দেখতে পারে নি। কিন্তু ঘটনা যে সত্যই, তার প্রমাণ দিতে সেই নতুন কিন্তু গুলিতে চুরমার বড় টর্চটাকে জলের ধারা ভাসিয়ে নেয় নি।

সে ভাবলে, রেঞ্জারসাহেব তাকে ভাবতে সময় দিয়ে ভাল করেছেন। নিজের চিন্তার ফাঁক এড়াতে তার কথা বলতে ইচ্ছা হল। সে বললে, কিরে নরবু, সেই দুপুর থেকে কী ভাবছিস?

তখন নরবু বললে, মেয়র, কাজটা আপনি ভাল করেন নি। ওটা একটা টর্চভাঙার মতো ঘটনা নয়। টর্চের পিছনে মানুষ থাকে।

ময়ূর স্তম্ভিত হয়ে গেল। নরবু কি করে জানবে? সেও কি সেই দলে ছিল? সে কি সকালে উঠে অর্কিডবনে খোঁজ খবর নিতে গিয়েছিল? কিংবা নরবু সেই স্মাগলারদের মেয়র কোনদিকে সেই রাতে টহল দেবে তা বলে দিতে পারে নি বলে, তারা এরই মধ্যে শাসিয়ে গিয়েছে তাকে?

সে বললে, টর্চ কিরে? কার কথা কী বলছিস?

নরবু সামনের দিকে চেয়ে মুখ শুকনো করে বসে রইল। একটু পরে সে কান্না ছলছল গলায় বললে, মেয়র, সার, রেঞ্জসাহেবকে বলে আমার ছুটি করে দিন। এখানে থাকা ভালো নয়।

অফিস থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে প্রভঞ্জন অনুভব করলে, আজ বোধহয়, চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়া দরকার। এই তাসিলা। কী আশ্চর্য, সে এখানে আর থাকছে না। অথচ সে এই অপূর্ব সুন্দর ল্যান্ডস্কেপগুলোর একটাকেও কি এতদিনে এঁকেছে? তার মুখে বিড়ম্বনার হাসি দেখা দিল। কেউ যেন শ্লেষ করছে তাকে।

সে ধীরে ধীরে বাংলোর দিকে চলতে থাকলে, তাকে দেখে ময়ূর এগিয়ে এল। সে বললে, আপনাকে এখনই কিছু বলা দরকার সার।

প্রভঞ্জন বললে, হাঁ, তা বলো, অনেকক্ষণ তোমাকে অপেক্ষা করতে হল। বলো, বাসায় যেতে যেতে শুনি। ময়ূর তখন পাশে চলতে চলতে গতরাতের সেই শুট আউটের ঘটনাটা সংক্ষেপ করে বললে। এখন সেখানে শুধু একটা ভাঙা টর্চ পড়ে আছে। রাতের বৃষ্টিতে আর সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গিয়েছে। আপনি কি একবার সেই ওক প্লান্টেশনের জায়গাটা দেখবেন।

কেন? তুমি তো বলছো কোন চিহ্ন নেই আর।

সার, নরবু মনে করিয়ে দিলে টর্চের পিছনে মানুষ থাকে। টর্চটা আমার গুলিতে ভেঙেছে। টর্চের আলো আমার দিকে পড়তেই গুলি করেছিলাম। দুবার সে রকম হয়েছিল, দুবারই আর্তনাদ শুনেছিলাম। প্রভঞ্জন বললে, ছিলে মেয়র, এখন দেখছি শেরিফও হলে।

মেয়র জিজ্ঞাসা করলে, শেরিফ কী, সার?

ইমমেটিরিয়াল। ওখানে গিয়েছিলে কেন? রাত করে সেখানে যাওয়ার কী যুক্তি ছিল তোমার? কী যুক্তি দেখাবে ময়ূর? সে তো ইতিমধ্যে মনের অনেক প্রান্ত হাতিয়ে দেখেছে, কোন যুক্তি খুঁজে পায় নি। সে বললে, সার, হয়তো অন্ধকারের টানে ভুল করেছি। আপনি সেই গালিতে সেই ঘোড়ার গন্ধ পাওয়ার পরে পাপের কথা বলেছিলেন। বোধহয় তাও মনে পড়েছিল। সে থেমে গেল। ভাবলে, যা মনে হচ্ছে তা কি বলা উচিত?

পাপ? রেঞ্জার বললে, তোমাকে তো বাইবেলের গল্প বলেছিলাম। ওখানে কিছু ওক প্রাচীন হয়ে উঠেছে, একজোড়া মার্কর আছে, হারানো এক উপজাতি ফেজ্যান্ট আছে, তাই বলে কি ওটা আদিম বাইবেলের দেশ হয়, যে ওখানে শয়তান সাপ থাকবে? ওসব কি গল্প ছাড়া আর কিছু? যত্তোসব! নাকি তোমার ডিএফওর ছোঁয়াচ লেগেছে। পোস্টমাস্টার যেমন বলে না, মনের তলায় মন তৈরি হচ্ছে? ওটাও এক গল্প হতে পারে। কে দেখেছে মনের তলাকার মনকে? উত্তর দিচ্ছো

না যে? কী ফ্যাসাদ বাধালে! •

মেয়র বলে ফেলল ধমক খেয়ে, সার, রোজা ম্যাডাম কি ডম্বরির অসুখের সময়ে মায়ের মতো সেবা করেন নি? কীসের মধ্যে কী কথা! প্রভঞ্জন বিরক্তি প্রকাশ করলে।

সার, আমার যে সেই হাত কেটেছিল, তখন রোজা ম্যাম আমার হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন। সারাদিন না খেয়ে ছিলাম, রান্না করে খাইয়েছিলেন। বিছানা গুছিয়ে দিয়েছিলেন। যেরকম মায়েরা করেন।

হল। তাতেই বা কী এগোচ্ছে? তুমি কি প্রমাণ করতে পারবে তারাই গুলি চালিয়েছিল আগে? তা প্রমাণ হবে?

সেখানে গাছেব গায়ে, ঝোপের মধ্যে এমনকি বৃষ্টির জলে যে হালকা পলিমতো পড়েছে, তার তলে ওদের গুলি পাওয়া যেতে পারে। গুলি ভারি জিনিস, জলে ধুয়ে যাবে না। আর ওরা অনেক গুলি ছুঁড়েছিল। আমার মনে হয়েছিল ওরা সেই গিয়ালপোর, যার এক চোখ, আর এক কানে দুল, তার দলেরই হবে। আর আমার মনে হয়েছিল, গিয়ালপোর লোকেরাই সেই গুড ফ্রাইডের আগের রাতে রোজা ম্যাডামকে ভয় দেখাতে তার বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল। প্রভঞ্জন অবাক হয়ে গেল। সে ভাবলে কিছুক্ষণ আগেই রোজার কথা বলছিল, আবার এখনও বলছে। তা হলে ওর মনে কি রোজাকে রক্ষা করার কথা উঠেছিল, যা ও নিজেই জানে না। রাগ হয় বটে সেই আশি রাতের দরুন বিশ হাজারের প্রস্তাব শুনলে, কিন্তু সেসব কোন যুক্তি হয় না স্মাগলারদের পথে পাহারা দিতে যাওয়ার।

সে বললে, তোমাকে কয়েকটা কথা মনে করিয়ে দিই। স্মাগলার ধরা পুলিশের কাজ, আমাদের নয়। আমরা কাঠের চোরাকারবারি ধরতে পারি। পোচারদের যারা লুকিয়ে বন্যপ্রাণী মেরে বেড়ায়, তাদের ধবতে পারি। সত্যি যদি তোমার গুলিতে মানুষ মরে থাকে তবে ডিএফওকে সব ব্যাপারটা জানাবে কিনা ভেবে দেখো। আর তোমার বোধ হয় বলতে হয়, সেখানকার মার্করজোড়া, কালো ঠোঁট ফেজ্যান্ট, এমনকি ভেঁরুলগুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলে। এটাই তোমাব সেখানে যাওয়ার যুক্তি। প্রভঞ্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে। বললে, যাক সে কথা। ডিএফও আমাকে আর তোমাকে জাকিগঞ্জে যেতে হুকুম করেছেন। যাও, তা হলে তৈরি হয়ে এসো।

রাত হয়ে যাবে না?

তাও বটে। ডিএফওকে বেশি আগ্রহ দেখানো হবে। রেঞ্জার হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। বললে, কাণ্ড! এতদিনে দুই পক্ষ তৈরি হল। একদিকে তুমি, আমি, রোজা, আমাদের কাছাকাছি যারা, আর অন্যদিকে সেই ক্রুকের দল। তো, একদিক দিয়ে ভাল হয়েছে। অদৃশ্য ভয় ছিল। আর এখন দৃশ্য হল। তার মানে মনের মধ্যে ছিল, তারা এখন চোখের সামনে এল। বুঝলে না? সেই ভয় অলৌকিক ভাবে নিজেকে অদৃশ্য রাখতে পারবে না। তার গায়ে বেঁধা তোমার স্টিলের স্লাগতো হাওয়ায় মেলানোর জিনিস নয়। তাতেই তারা ধরা পড়বে। এসো এসো, রোজা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরেছে। কফি খাওয়া যাক, চলো।

বাংলোর বারান্দায় উঠে সে উঁচু গলায় বললে, রোজা দুজনের জন্য কফি করো। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে বললে, আর তা ছাড়া মেয়র আজ সারাদিনে খেয়েছে কিনা সন্দেহ। তাকে কিছু খেতে দাও। দরজায় রোজার মুখ দেখা দিতেই সে বললে, তোমার সেই হটডগ না কি, বানাও। সেটাই তাড়াতাড়ি হবে। হটডগ আর জ্যাম। বসো মেয়র। আগে কিন্তু কফি। ভাল কথা, মেয়র, আমার রাইফেলটাকে দেখতে হয়। এত বড় বর্ষাটা গেল, একদিনও সাফসুতরো করিনি। ক্লিপটা খুলে রেখে চেম্বারটা, যন্ত্রপাতিগুলো একটু তেলা করে দাও। উঠো না। আগে খাওয়াদাওয়া হোক। আমরা বনের মানুষ, কেমন কিনা?

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

১

রেঞ্জ হেডকোয়ার্টার সরে গেলে কী হবে, কী ভাবে তা তাসিলার বাকি লোকদের প্রভাবিত করবে, তা যদি আগেই বোঝা যায় তবে তো সংবাদটা আকস্মিকতায়, আশঙ্কায় এমন অস্থির করে তোলে না।

এই সরকারি কর্মচারিগুলি তাদের আধুনিকতা, এমনকি তাদের ইলেকট্রিসিটি নিয়ে (তা কি আব তারা রেখে যাবে?) চলে গেলে, শহরটা এক গ্রাম হয়ে যাবে না? আর্মি থেকে জেলারদের হাতে যাওয়া, সেখান থেকে ফরেস্টের হাতে যাওয়ার মতো, এও আর এক পরিবর্তন, কিন্তু এই তৃতীয় পরিবর্তনে কার হাতে যাবে তাসিলা?

সেদিন সেই টিজিএস ফাইলের চিঠি নিয়ে মিটিং করার পরে সন্ধ্যা থেকেই সংবাদ তাসিলায় ছড়িয়ে পড়ল, ফরেস্টকলোনি নিচে জাকিগঞ্জে চলে যাবে নভেম্বরে।

যাদের বাড়ি সমতলে তারা উৎফুল্ল, বন্দীদশা থেকে মুক্তিব স্বাদ পাচ্ছে যেন। কিন্তু মিত্রবাহাদুরদের মতো যারা এই পাহাড়েই জন্মেছে, তারা বেশ বিব্রত এমনকি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু ধ্বজবীর রায়দের মতো যারা অনেক দূরের অন্য পাহাড়ের লোক, অথবা তারা যারা চিরদিনই সমতলের মানুষ, তারা বরং তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

বাজারের দোকানদাররা হতাশ হল। ধোপা, নাপিত, কামার, শাকসবজিবিক্রেতারা তাদের কী হবে বুঝতে না পেরে এক উদ্বাস্তু ভবিষ্যতের মুখ, যা দেখা যায় না, তার দিকে ভীতমুখে চেয়ে রইল।

একদিন এঞ্জিনিয়ার বিরিঞ্চি বললে পোস্টমাস্টার মুরলীধরকে, আমি মশায় এখানে থাকছি না। বিরিক ব্লকে নেমে যাবো। কোয়ার্টার খারাপ, তবু সেখানে আমার কিছু লোক আছে। আপনি?

মুরলীধর বললে, ডিসেম্বরে পুরোটাই থাকব, পয়লা জানুয়ারি থেকে আমি আর নেই, মশায়।

ডিএফওর সঙ্গে দেখা করার সেই জাকিগঞ্জ ট্যুর থেকে ফিরে এসে প্রভঞ্জন তিনটি কাজে জড়িয়ে পড়ল। পয়লা নভেম্বরের মধ্যে তার রেঞ্জ হেডকোয়ার্টার শিফট করে যাবে। দুভাবে সে কাজটা হবে। ধ্বজবীর অর্ধেক স্টাফ নিয়ে অক্টোবরের মাঝামাঝি জাকিগঞ্জে রেঞ্জ অফিস চালু করবে। বড়বাবু মিত্রবাহাদুর, তাসিলায় ডিসম্যান্টলিং-এর তত্ত্বাবধান করবে। এখনকার কোয়ার্টারগুলোব ফিটিংস ফারনিচার, ছাদের টিন, দরজা, জানালা খুলে খুলে নিচে পাঠাবে, যাতে জাকিগঞ্জের কোয়ার্টারগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হয়।

প্রভঞ্জনের তৃতীয় কাজটি অকাজ। তা তাসিলার ছবি এঁকে বেড়ানো। ওয়াটার, অয়েল, চারকোল স্কেচিং, কিছু সে বাদ দিচ্ছে না। যেখানে সেখানে ইজেল খাটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। এমন কি সপ্তাহে দুবার চেষ্টা করেও পোস্টমাস্টার তার সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। শনিবার এক হাস্যকর কাজ করলে প্রভঞ্জন। সে রোপওয়ের প্রস্তাবিত স্টেশনের কাছে উঠে, স্কাইলাইন পিঠে ধরে থাকা সেই তিব্বতী সিংহের স্কেচ করলে। রবিবার মুরলীধর সকালে গিয়ে দেখলে, রেঞ্জারের বাংলোটাই বন্ধ। সেদিন প্রভঞ্জন স্যান্ডউইচ, সাইডার, ইজেল, ক্যানভাস, রং, তুলি নিয়ে চোর্টেন পীক আঁকতে উঠেছিল। তত জিনিস একা নিয়ে যাওয়া যায় না, ফলে রোজাও সঙ্গে গিয়েছিল।

সেই ববিবারে রেঞ্জার-বাংলো থেকে ফিরতে ফিরতে মুরলীধরের অনুভূতি হল, সে যেন একা এক বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, পায়ে পায়ে ঝরাপাতার শব্দ হচ্ছে। আর একবার তার মনে হল, পিচের পথ তার পায়ের নিচে এখানে ওখানে ফেটে ফেটে যাচ্ছে, আর সেই সব ফাটলে ঘাস, গুল্ম, আগাছা গজিয়ে উঠছে। বেড়ে ওঠা ঘাসের ফলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কোথায় পথ, কোথায় খাদের ফাটল।

তার অনুভূতিকে অযৌক্তিক বলা যায় না। আগের দিন ধ্বজবীরের লোকেরা অনেক কয়েকটি বাড়ির ছাদ, দেয়াল, দরজা, জানালা খুলে নিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।

মুরলীধরের সৌভাগ্য যে এই সময়ে সে মেয়রকে তার বাংলোর সেই ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলে। রোদ পোয়াচ্ছে? নভেম্বর এসে যাচ্ছে, যখন শীত ঋতু আর রোদের অভাব শুরু।

সে মেয়রের দিকে চলতে শুরু করে ভাবলে, এটা তো মেয়রের নতুন পোশাক মনে হচ্ছে। খয়েরি হলুদ আর সবুজ। বাটিক নাকি? নাকি কামুফ্লাজ। সে আপন মনে হাসল। না, মেয়রকে মেয়রই ভাবতে হয় এখন। ছদ্মবেশী পুলিশঅফিসার ভাবা যায় না। অথচ এক সময়ে সে রকমই ভাবতো সে। তার চেহারা, নিঃশব্দে কষ্ট সহ্য করার শক্তি, বোবার মতো নির্বাক থাকা, তার শুটিং-এ দক্ষতা, গভীর রাতের অন্ধকারে একা ঘুরে বেড়ানো– এ সবই তার আশঙ্কার যুক্তি ছিল।

আহা, ওর যদি কোন রকমে অ্যামনেশিয়া হয়ে থাকে? হয়তো মনে করতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে সে কে। না, এ চিন্তাটাও পুরনো। পোস্টমাস্টার তার চিন্তাটাকে তোলাপাড়া করলে। এটা কিন্তু আশ্চর্য, কোন মানুষের সঙ্গে দশ দিন মিশলেই তার অতীত সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। অথচ মেয়রের অতীত সম্বন্ধে যদি একটা শব্দও জানো। জেন ডাক্তারকেই দেখো। তারও তো ছদ্মনামই মনে হয়। অথচ বোঝা যায়, সে শহরে থেকেছে, ডাক্তারি পাশ করেছে, পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি আছে তার। চিঠির, পার্সেলের, পত্রিকার ঠিকানা থেকে জানো, লখনৌএর সঙ্গে সে যুক্ত।

কিন্তু আর খানিকটা এগিয়েই তার মনে হল, কী হয় অতীতকে জেনে? অতীত সঞ্চিত ঐশ্বর্য হয় না। বরং কেমন নিঃসঙ্গ নয়? ভগবান, আমাদের অতীত ভুলতে সাহায্য করো। বাকপটু পোস্টমাস্টার নিজের মনে মনে বলা কথা যেন নিজেই শুনতে ফেলে। ফলে সে নিজেকে ঠাট্টা করে হাসল, দেখো, কেমন ভগবান টগবান বলছি!

মেয়রের দিকে এগিয়ে, কথা বলার মতো কাছে গিয়ে সে বললে, ক্লাবে আমার আর তোমার গরম কফি কী রকম হয়, মেয়র? মিস্টার দত্তকে তো পাচ্ছিই না।

খুব ভালো। আসুন সার।

কিন্তু সেদিন বেলা দশ-এগারোর কফি ক্লুটলং-এ হল। কিন্তু কোথায় বেরোচ্ছিলে নাকি, মেয়র, মুরলীধরের এরকম প্রশ্নের উত্তরে জানলে, সে ক্লুটলং-এ যাচ্ছিল। তখন মুরলীধর বললে, এই দেখো, তাই চলো। সেই ভালো। সেখানে মেমসাহেবের কফি আরও ভালো হবে। ভুলে যাচ্ছিলাম, তাঁকে একবার পোস্টঅফিসে আনা দরকার, মিসেসকে একবার দেখিয়ে নেই। চলো, কফিও হবে, ডাক্তারকে কল দেওয়া হবে।

সেদিকে যেতে যেতে মুরলীধর অনুভব করলে, এত বোঝাই যাচ্ছে, রেঞ্জার নেমে গেলে ভরকেন্দ্রটা ক্লুটলং-এই ঝুঁকে যাবে। ফরেস্টের কলোনিটাই থাকছে না তখন।

ক্লুটলং-এ অবশ্যই কফি ছিল। তারা কফি খেতেই সেখানে গিয়েছে, তা শুনে, জেন একজন অল্পবয়সী মেয়ের মতো হেসে উঠল। পোস্টঅফিসে সুচেতনাকে দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব পোস্টমাস্টার

দিতেই, সে বললে, সে রকম প্রয়োজন হলে সে তখনই যেতে পারে, নতুবা লাঞ্চের পরে পরেই সে যাবে।

মুরলীধর টুং ও মাইবং-এর আদিবাসীদের গল্প তুললে, জেন সে সব দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করলে।

মেয়র বললে, তা হলে রেঞ্জারকে পনির কথা বলতে হয়, পনি ছাড়া জেন ম্যাডাম কি করে যেতে পারবেন?

জেন জিজ্ঞাসা করলে, মেয়র তুমি কি আমাদের ছাড়ছো? জাকিগঞ্জে নামবে?

মেয়র বললে, সে তো শুধু তাসিলারই যা কিছু, কোথায় আর যাবে?

জেনের প্রশ্নের উত্তরে পোস্টমাস্টার জানালে, এখন যে রকম হয়েছে, চেষ্টা করেও সে জানুয়ারির আগে কোথাও যেতে পারবে না। পোস্টঅফিস একটা থাকবেই। টেলিফোন থাকবে না, লাইন খুলে নেবে হয়তো। টেলিগ্রাফটা হয়তো সীমান্ত বলে কিছুদিন আরও থাকবে।

তখন জেন বললে, রেঞ্জ অফিস চলে গেলে, আমরা তিনজনই থাকছি তা হলে?

সেদিন ক্লটলং থেকে ফেরার পথে যারা এই পাহাড়ে থেকে যাবে, তাদের নিয়ে কথা হল। মেয়র আর পোস্টমাস্টারের আসলে তা আত্মগত কথা, যে নির্জনতা পোস্টমাস্টারের মনে ভবিষ্যৎ থেকে নেমে আসছে, তাকে ঠেকাতেই নিজের সঙ্গে কথা বলা। মেয়র সঙ্গে চলায় কিছু সুবিধা হচ্ছে কথাগুলো বলতে। কৃষি হয় না, শিল্প নেই। ফরেস্টের কর্মচারী, দুতিনজন বড় দোকানদার, কয়েকজন ফরেস্ট কনট্র্যাক্টর, ববিজানের করাতকল, কয়েকজন আর্মি পেনশনার– তারা যে টাকা খরচ করে এখানকার বাকি মানুষের সেটাই উপজীবিকা। এখানকার ধোপা, নাপিত, লোহার, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, শাকসবজিওয়ালা, আন্ডাওয়ালা কোথায় গ্রাহক পাবে? কোথায় যাবে?

ময়ূর মনে মনে ছবিটাকে ধরতে চেষ্টা করলে। এক বিশীর্ণ, নির্জন, অন্ধকার তাসিলাই তার মনে ফুটে উঠল, যেখানে রোজ বাজার বসা দূরে থাক, একদিন সপ্তাহের হাটও কি বসবে? সে বললে, তা সত্যি, ফরেস্টকলোনির চকচকে প্রাধান্য ছিল তার সংখ্যায়। পরে কতজন?

রবিবারে জেন এয়ার ডাক্তার সুচেতনাকে পরীক্ষা করে গিয়েছে।

সোমবারেও মুরলীধর রেঞ্জারকে তার বাংলোয় পেলে না। রোজা বললে, কাল সন্ধ্যায় এক ভারি বাঘসাহেব এসেছেন। রেঞ্জার আর মেয়র তাঁকে নিয়ে বিরিক ব্লকের বন দেখতে গিয়েছেন।

মুরলীধর তাড়াতাড়ি হেঁটে ক্লটলং-এ গেল। কাল রাতে সুচেতনার ঘুম কয়েকদিনের মধ্যে ভালো হয়েছে। সে খবরটা ডাক্তার দেয়া যায়। সেটাই ক্লটলং-এ যাওয়ার যুক্তি হতে পারে।

তখন তো সকালই। আটটা হবে। ক্লটলং-এ জেনের পার্লারে আদিবাসীদের কথা উঠল আবার।

জেন জানতে চাইলে, মাইবং অন্তত পনি ছাড়া যাওয়া যায় কি না।

পোস্টমাস্টার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানালে, পাকদণ্ডির পথই বেশি। রাস্তা কখনই ছ ফুটের বেশি চওড়া নয়। নামতে এক ঘন্টা, উঠতে দু ঘন্টা, ডাক্তারি করা চলে সেখানে।

লাঞ্চের আগে ফেরা যায়?

তা যায়। যদি দুটো আড়াইটেতে লাঞ্চ করেন।

এরপরে দুজনে মাইবং-এর আদিবাসীদের সংস্কৃতির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই সোমবারের সকালে গরম কফির স্বাদের ভরসায়।

কিন্তু বাঘসাহেব এসেছিল তাসিলায়। টিজিএস মার্কা ফাইলগুলো তৈরি হয়েছিল। তাসিলা গ্রাউন্ড-সোয়েল নয়, টিজিএস বলতে যে টাইগার স্যাংচুয়ারি বোঝায়, এখন আর তাতে সন্দেহ নেই। গাছের আড়ালে আড়ালে যেমন, বনের ছায়ায় ছায়ায় যেমন, তাসিলার বাঘ স্কুল বসানোর উৎসবের ছায়া, হেডকোয়ার্টাকে সবানোর ডামাডোলের আড়ালে তেমন চলে এসেছিল।

এ বিষয়ে নানা মত আছে। তার মধ্যে মিত্রবাহাদুরের মতই সব চাইতে প্রণিধানযোগ্য। মিত্রবাহাদুর শ্রমিক ইউনিয়ান করতে গিয়ে বদলে যাচ্ছিল, তা তার জানা ছিল না। দ্রুক নামগিয়ালের সঙ্গী থেকে, কাঠচোরদের বন্ধু থেকে, তার মন বদলে যাচ্ছিল, নতুন ভাষায় তা প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু ভাষারে উপরে সব সময়ে দখল রাখতে পারছিল না। সে প্রকাশ্যে বলেছে, এক বুর্জুয়া-সুলভ নিষ্ঠুরতা নিয়ে, শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা না করে, তাদের উপরে এই বাঘ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ যে এক ষড়যন্ত্র তাতে সন্দেহ নেই। ফরেস্ট ডিভিসনেব হোর্ডিংগুলো থেকে তাদের বোঝা উচিত ছিল। যেগুলোকে ডিএফও বনের এখানে ওখানে নিঃশব্দে বসিয়ে দিয়েছিল। কী? না, ভিজিট তাসিলা। সে সব হোর্ডিং এ হুমদোমুখো বাঘের ছবি ছিল, যদিও তাসিলা ডিভিসনে বাঘ ছিল না। আর দেখো, এ ব্যাপারে কেন্দ্রই পৃষ্ঠপোষক, তাদেরই ইকোলজি মন্ত্রী আর তাদের সহায়ক সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী দুনিয়াই।

আসলে তাসিলার মানুষ মিত্রবাহাদুর, বাঘ না মানুষ, এই সমস্যার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। কিন্তু সে কথা পরে।

ইতিপূর্বে সেই চিঠি পেয়ে প্রভঞ্জন রেঞ্জার আর মেয়র ময়ূর জাকিগঞ্জে গিয়েছিল, যেটার উদ্দেশ্য একটা দুদিন-স্থায়ী রিফ্রেশার কোর্স বলা যেতে পারে। সেই ফরেস্ট ডিভিসনের সব রেঞ্জার তাদের সঙ্গে বাছাই করা বিট অফিসার, ফরেস্টগার্ড দু একজন করে যোগ দিয়েছিল। প্রভঞ্জন আর মেয়রকে একদিন আগে যেতে বলার যুক্তি এই, বাঘ ছাড়া হবে প্রভঞ্জনের রেঞ্জেই। সেই সময়ে রেসাস মাঙ্কি, হনুমান, মার্কর ছাগ, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তবে তা সাধারণভাবে অরণ্য, ইকোলজি, অ্যাফরেস্টেশন ইত্যাদি আলোচনার অঙ্গ হিসাবে। একবার বলিন বসু বলেছিল, রেসাস মাঙ্কিকে বন থেকে নিশ্চিহ্ন করার, তার রক্ত মাংস চামড়া নিয়ে গবেষণা করার, বাণিজ্য করার অধিকার যদি আমরা গ্রহণ করি, কোন নৈতিক বলে আমরা অপেক্ষাকৃত পুরনো টেকনোলজি জানা জনগোষ্ঠীর উপরে ইউরোপীয়দের অত্যাচারকে ধিক্কার দেবো?

দ্বিতীয় দিনের বিকেলের বক্তৃতায় ডিএফও বাঘের কথা তুলেছিল। তাদের জীবনযাত্রা, প্রজনন, আহারবিহার ইত্যাদি বিষয়ে স্লাইড সহযোগে সেই বক্তৃতা। সেদিনই প্রভঞ্জনের মনে পড়েছিল, ডিএফও বেশ অনেকদিন আগেই এদিকের বনে বাঘ থাকা না থাকা নিয়ে আলোচনা করেছিল। সে নিজে অবশ্য বিষয়টা নিয়ে তখন ভাবে নি, কারণ সে ছবি আঁকা-না-আঁকা নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

তারপরে এখন তো বাঘসাহেবই এসে গেল। তার সঙ্গে ডিএফওর পি-এ। পি-এর সঙ্গে সার্কুলার। বাঘসাহেব প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন ভারতীয় রাজবংশের মানুষ, যে নাকি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার পূর্বাঞ্চলের সভাপতি এবং পদাধিকার বলে অনুরূপ সর্বভারতীয় সংস্থার সহসভাপতি। বাঘ সম্বন্ধে এক্সপার্ট। দিন সাতেক তাসিলা ডিভিশনে ঘুরে ডিএফওর সঙ্গে সে একমত হয়েছে, তাসিলা রেঞ্জই বাঘের অভয়ারণ্য হওয়ার পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত।

পাঁচটি বাঘ এই ডিভিশনের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাসিলা রেঞ্জের কোথায় কোথায় তাদের কাকে কাকে ছাড়া হবে, এখন এক্সপার্ট তা দেখে বেড়াচ্ছে। রেঞ্জার জানতে পেরেছে ইতিমধ্যে, নভেম্বরেই বাঘেরা জাকিগঞ্জে এসে যেতে পারে।

তা সত্ত্বেও যেন গোপন পদসঞ্চার। প্রমাণ সে সময়ের সার্কুলার লেটারগুলো। নেপালি, বাংলা ও ইংরেজিতে সেই সার্কুলার লেটারগুলো রেঞ্জাররা তো নিজে পড়বেই, ফরেস্টের অন্যসব কর্মচারীদের পড়াবে, বুঝিয়ে দেবে, আর তা যে করা হয়েছে এমন সার্টিফিকেট পাঠাবে ডিএফও অফিসে, সবগুলিতেই যেন ইকোলজির পাঠ। যে রিফ্রেশার কোর্সের জন্য রেঞ্জার ও মেয়র জাকিগঞ্জে গিয়েছিল, তারই সার অংশ যেন প্রচারিত হচ্ছে, যাতে সব কর্মচারীই তা জানতে পারে। আর ইকোলজির কথা বলতে গেলে লুপ্তপ্রায় মূল্যবান বনস্পতি, গাছ, অর্কিড, সাদা ফেজ্যান্ট, মার্কর ছাগ, রেসাস বাঁদর আর বাঘের কথা।

দ্বিতীয় সার্কুলার লেটার অ্যাফরেস্টেশন নিয়ে। সেটাই বেশি মনোযোগ আর্কষণ করলে তাসিলাতে। কারণ লুপ্ত রেসাস বাঁদর, লুপ্ত মার্কর এসব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। বাঘ সম্বন্ধে তো আরও বেশি, মাথা নেই তো মাথাব্যথা! কিন্তু অ্যাফরেস্টেশন প্রোগ্রাম তাদের আগ্রহ সঞ্চার করলে। মেপল একটা বিদেশী গাছ। দেখতে সুন্দর। চেষ্টা করতে হবে তা তাসিলায় কোথাও হয় কি না। মাটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, মেপল জন্মাতেও পারে। তার রসে চিনিও হয়। তা ছাড়া তাসিলায় সন্তরা, মিষ্টিকুল, আপেল হওয়ার সুযোগ আছে, সোশ্যাল ফরেস্ট্রি হিসাবে। এ সবের চারা এবার তাসিলায় সরবরাহ করা হবে ডিএফও অফিস থেকে।

তৃতীয় সার্কুলারটা সচিত্র, এবং দৈর্ঘ্যে বেড়েছিল বাঘের জন্য। ডিএফও লিখেছে, ফরেস্টের সব কর্মচারী বাঘ সম্বন্ধে শুধু ভয়ের গল্পই বলে। তাদের শিক্ষিত করা দরকার। অশিক্ষা থেকে ভয়, ভয় থেকেই আক্রমণাত্মক মনোভাব, এসব লিখে সার্কুলারে বলা হয়েছে, বাঘ আদৌ হিংস্র প্রাণী নয়। বড় জোর সে আগুন বা ইলেকট্রিসিটির মতো, এক প্রচণ্ড নিউট্রাল শক্তি। মানব সভ্যতার পক্ষে, এ দুটি যেমন, ইকোলজির পক্ষে বাঘও তেমন অপরিহার্য। যাকে তার হিংসা হিংস্রতা বলা হয়, তা যেন বিপ্লবের অন্তঃস্থিত শক্তি– বাঁচার ইচ্ছা।

সার্কুলার যখন, তখন আর গোপন থাকে কি? মিত্রবাহাদুর প্রথমে পড়লে জোর গলায়, ব্যাখ্যা করলে, পরে বললে, আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। কর্মচারীদের সুবিধার জন্য রেঞ্জ হেডকোয়ার্টার সরানো না হাতি! লেখাপড়ার জন্য স্কুল করা ভোটের ঘোড়া! এক বাঙালীর খেয়াল মেটাতে আমাদের পাহাড়ভূমিকে ধ্বংস করা। আমাদের আগেই রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি করা দরকার ছিল।

বাঘসাহেবকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে কোর এরিয়া স্থির করে, দুর্গের থেকে বরং নুমপাইএর দিকে সরে গিয়ে তারা হাতি চলাচলের পথ আবিষ্কার করেছিল। পুরনো পরিত্যক্ত পথ। এখন হাতি নেই। কিন্তু বাঘ দেখতে ট্যুরিস্টরা এলে পোষা হাতিই ব্যবহার করবে তারা। এখানে জিপ চলবে না। প্রভঞ্জন এরকম প্রস্তাব করা ঠিক করেছে, ওই পথটাকেই কিছু সহজগম্য করবে, যাতে ট্যুরিস্টরা ধকলে না পড়ে। বোঝাই যাচ্ছে, তাসিলার মেয়র-বাংলো আর রেঞ্জারের বাংলো এক নম্বর, দু নম্বর ট্যুরিস্ট লজ হবে, তাসিলা থেকে ট্যুরিস্টদের যাত্রা সুরু হবে।

বাঘসাহেবকে জাকিগঞ্জে ফরেস্ট রেস্টহাউসে তুলে দিয়ে প্রভঞ্জন তাসিলায় ফিরতে ফিরতে কয়েকদিন আগেকার কথা ভাবছিল। পাশের পনিতে মেয়র থাকায় সুবিধা হচ্ছে ভাবতে।

সেটা সেই শুট আউটের রাত্রির পরে যা হয়েছিল। মেয়রের সেই ওক প্লানটেশন আর অর্কিড গলির কথা, ভাঙা নতুন একটা টর্চ পড়ে থাকার আলাপ শেষ হতে না হতেই ডিএফওর চিঠির

কথা উঠেছিল। আর তার পরের দিন সকালেই সে আর মেয়র পনিতে জাকিগঞ্জে রওনা হয়েছিল। তাসিলা রেঞ্জই ব্যাঘ্রপ্রকল্পের কোর সেক্টর কাজেই তাকে আর মেয়রকে ডিএফও সব সেশনেই উপস্থিত থাকতে বলেছিল। পুরো দুদিন সেখানে অ্যাফরেস্টেশন আর ইকোলজি, বিশেষ ছাগবংশ, বাইসন, হরিণ, বাঘ, মেপল, ভারতীয় ওক, শিশু, মেহগ্নি, শাল, এসবের আলোচনায় কেটে গিয়েছিল।

লাঞ্চের ব্যবস্থা দু-দিনই হয়েছিল ডিএফওর বাংলোর লনে সামিয়ানা খাটিয়ে। প্রভঞ্জন স্থির করেছিল, প্রথম দিনের লাঞ্চব্রেকটাকে সে কাজে লাগাবে। সামিয়ানার লাঞ্চে তার অনুপস্থিতি ডিএফওর দৃষ্টি আর্কষণ করুক এরকম চাইছিল সে। সে জন্য আর সকলে লাঞ্চের জন্য সামিয়ানায় চলে গেলেও সে ডিএফওর ড্রয়িংরুমের অ্যান্টিচেম্বারের কোণে বসে রইল। সে ঘরেই সাক্ষাৎ প্রার্থীরা অপেক্ষা করে। আর অল্পবয়সী সেই মেয়র যেন কী এক জালে ধরা পড়েছে, এভাবে রেঞ্জারকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে।

তার ডিএফওকে বলার তিনটি বিষয় ছিল সেদিন। প্রথমটি অবশ্যই উপর থেকে নিচে, তাসিলা থেকে জাকিগঞ্জ, ফরেস্টের বাড়িগুলোকে ডিসম্যান্টল করে নিচে পাঠিয়ে দেয়া। কিন্তু এই প্রথমটি থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে যেতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি, মেয়রের সেই অর্কিডগলিতে রাতের অন্ধকারের অদৃষ্ট লক্ষ্যে শুট আউট। জাকিগঞ্জ আসার পথে তারা সে বিষয়ে আবার আলাপ করেছে। প্রথমে তারা বিষয়টাকে একেবারে কিছুই হয় নি বলে উড়িয়ে দেয়া চলে কিনা না, এরকম আলাপ করেছিল। কারণ একটা ভাঙা টর্চ কিছু প্রমাণ করে না। প্রভঞ্জন বলেছিল, এমনও তো হতে পারে মেয়র, তুমি যে আর্তনাদ শুনেছিলে মনে করছো, সেটা তোমাকে ধাঁধাঁয় ফেলতে ইচ্ছা করে তারা সে রকম শব্দ করেছিল। তারপরে আবার আলোচনা হয়েছিল, ফরেস্টের কারো স্মাগলারকে ধরার কর্তব্য নেই। সেটা পুলিশের কর্তব্য। এমন কি কাঠচোর, যদি আক্রমণ না করে, তবে সে রকম চোরকেও গুলি করার অধিকার কাউকে দেয়া নেই। এক পোচারের ক্ষেত্রে, যারা বনের প্রাণীদের হত্যা করে তাদের বেলায় ফরেস্টাররা সেই তীরধনুকের যুগ থেকেই অস্ত্র ব্যবহার করে আসছে বটে। কিন্তু সেখানেই প্রশ্ন উঠবে। তারা পোচার ছিল, তার প্রমাণ দেখো নি। আরও প্রশ্ন উঠবে। রাতের অন্ধকারে, বিশেষ আকাশ যখন বাদলা, কেন তুমি সেখানে গিয়েছিল? রোজা, গ্রেগ, গিয়ালপো যার এক চোখ কানা এক কানে দুল, এসব কোন যুক্তি হয় না। তোমাকে যে বাইবেলের গল্প বলেছিলাম, সেটাও নয়। এসবই অলৌকিক ব্যাপার হবে যা কেউ বিশ্বাস করে না। ওদিকে দেখো, রোজার বাড়িতে আগুন লাগার দিন তুমি প্রথম সেখানে পৌঁছেছিলে, কে তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল? গ্রেগ বলবে? তা হলে সেও অলৌকিক। আর যদি বলো, রাতের অন্ধকারের গলিগুলোতে ঘুরে বেড়ানোই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, সে রকম ঘুরতে ঘুরতেই তুমি দ্রুকদের দেখতে পাও, সেটাও অলৌকিকের মতো শোনাবে। অন্ধকারে ঘোরা যার স্বাভাবিক, সে কি এক বাস্তবচরিত্র মনে হয়? সেটা কি পোস্টমাস্টার যেমন বলেন, চরিত্রের অবচেতন নয়? যে শুনবে সেই বলবে, সেই অন্ধকারের গলিগুলো তোমার অবচেতন যেখানে তুমি ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত। ওদিকে আবার দেখো, অবচেতনও তো অলৌকিক হচ্ছে, ভুতুড়ে হচ্ছে, কারণ তাকেও চোখে দেখা যায় না। বরং একদিকে ভালো হয়েছে, সেই অদৃশ্য শত্রু দ্রুক এখন তার অদৃশ্য থাকতে পারবে না। তোমার রাইফেলের হার্ডনোজড বুলেট যদি তার গায়ে বিঁধে থাকে, সেটা তো বাস্তব। সমস্ত শরীর অদৃশ্য করলেও সেই স্লাগ তো চোখে পড়বে। তাহলে যা যা দেখেছো খালি চোখে, তার বেশি বলবে না। মৃতদেহ দেখোনি, রক্ত দেখোনি, টর্চের আলো দেখেছো। ঘোড়ার গন্ধ পেয়েছো। মার্কর দেখেছিলে। অর্কিডে কালো ঠোঁট ডোবানো, কয়েক প্রজন্ম সেখানে থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, সেই বিরল উপজাতির ফেজ্যান্ট দেখেছিলে।

এবার সেখানে যাওয়ার যুক্তি শোনো, তুমি অদৃশ্য ভয়কে বুলেট বিঁধিয়ে দৃশ্য করেছো, বলেই বলছি। আমি আর তুমি প্রথম যেদিন সেই গলিতে, অর্কিড, ফেজ্যান্ট আর মার্কর দেখেছিলাম সেদিন কি এই সব মূল্যবান সম্পদে চোখ রাখা উচিত, এরকম বলি নি? তোমার মনে নেই, আমারও মনে নেই, সেই অনেক পাপপুণ্যের কথার মধ্যে সেই চোখ রাখার কথাও ছিল কিনা। থাকাটাই স্বাভাবিক। যে কোন রেঞ্জারের মনে এরকম সতর্কতার কথা ওঠা স্বাভাবিক। কাজেই তুমি অনায়াসে বলবে, রেঞ্জার চোখ রাখতে বলেছিল বলেই সেই রাতে তুমি সেখানে গিয়েছিল। নতুবা তুমি অলৌকিক অবচেতন হয়ে যাও, চরিত্র থাকো না।

সে সেই লাঞ্চ রিসেসে ডিএফওর অ্যান্টিচেম্বারে বসে থাকতে থাকতে দেখেছিল, মেয়র তার পিছনে কিছুদূরে অপেক্ষা করছে। সে তা দেখে বলেছিল, তোমার নিশ্চয় মনে আছে সেই মার্করজোড়া, সেই নতুন প্রজাতির অর্কিড আর ফেজ্যান্টের কথা। মেয়র হ্যাঁ সার বললে, সে বলেছিল, এটাই ভালো হবে। সেই যে আমরা ট্যুর করতে গিয়ে সেই গলিতে নেমে আবিষ্কার করেছিলাম, সেই ট্যুরের ডায়েরিতে কিন্তু এসব লিখে পাঠিয়েছিলাম ডিএফওকে। কাজেই ব্যাপারটা ডিএফওর জানাই আছে। কাজেই তুমি মার্করজোড়া যা নাকি পৃথিবীতেই আর নেই, আর ফেজ্যান্ট সে রকম যা অন্য কোথাও আবিষ্কারই হয়নি, তার উপরে চোখ রাখতে গিয়েছিলে। তোমাকে সেখানে সে রকম পাঠানোর দায়িত্ব আমার। ভয় পেলে চলে নাকি? ভয়কে দৃশ্য করে দেয়াই ভালো, সে রাইফেলের স্লাগে বা অন্যভাবে হোক।

প্রভঞ্জন ভাবলে, সে তখন নারেঙ্গিহাট ছাড়িয়ে উঠছে তাসিলার পথে, প্রথম দুটো বিষয় সম্বন্ধে তাদের তেমন কিছু বলতে হয় নি। আর যে রকম আশা করা গিয়েছিল, কনজারভেটরকে গেস্টলজে রেখে এসে নিজের পার্লারে ঢুকতেই ডিএফও তাদের সেই অ্যান্টিচেম্বারে আবিষ্কার করেছিল। ডিএফওই হেডকোয়ার্টার শিফটিং সম্বন্ধে কথা তুলেছিল। বলেছিল, পয়লা নভেম্বরে তুমি জাকিগঞ্জেই বসবে তোমার রেঞ্জ অফিসে। যারা এখানে আসতে রাজি তাদের জন্য ডরমিটরি তৈরি হচ্ছে। মাস দুয়েকে অনেক বাসাও তৈরি হবে। সিনিয়রিটি অনুসারে ফ্যামিলিমেনদের শিফট করতে থাকবে। যাদের বাড়ি তাসিলায়, আর এখানে আসতে চায় না, তাদের অন্য রেঞ্জে বদলির দরখাস্ত করতে হলো।

সে ইতস্তত করে বলেছিল, আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু বলতে চাই।

বলিন বললে, সে এখানে বসে থাকা দেখে বুঝেছি। মেয়র, তুমি কি মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করেছো? যাও ভিতরে, বলে এসো তুমি এখানে লাঞ্চ করবে। প্রভঞ্জন, আমার আব কনজারভেটরের সঙ্গে বসবে। তুমি কি তোমার রাইফেলটাকে বেঁধে ঝুলিয়ে ঘুরবে নাকি? ওটাকে বাংলোর ভিতরেই কোথাও রেখে এসো না হয়। আমার শোবার ঘরের অ্যান্টিচেম্বারে গানর‍্যাক, সেখানেও রাখতে পারো। কনজারভেটর দুটোয় লাঞ্চ প্রেফার করেন। মেম সাহেবকে বলো, আমার আর প্রভঞ্জনের জন্য কিছু ড্রিংক্স দিতে।

মেয়র বাংলোর ভিতরে গেলে ডিএফও বলেছিল, তোমাকে একা চাইছিলাম, দত্ত। কিছু গোপন কথা আছে।

আর সে তখন চূড়ান্ত শেষ ভয়টা পেয়েছিল। আর তখনই সে আর ভয় নয়, এরকম স্থির করেছিল।

ভয়ই যদি, আর অদৃশ্য অস্পষ্ট আতঙ্ক নয়। চোখের সামনে তাকে আনা। এরকম নিজেকে বলে হাতদুটোকে মুঠো করে এই পায়ের উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজেকে শুনিয়েছিল, তোমার কি এখনও আর্থ্রাইটিস? ডিএফও বলার আগেই তুমি বলো।

সে তারপরে সে রকম দাঁড়িয়ে পুরনো সিরিজের পোকাকাটা পাসের বই থেকে কয়েকটা পাতা

হারিয়ে যাওয়া, তা থেকে তার অমনোযোগিতার ফলে মিথ্যা পাস পাছে তৈরি হয়ে থাকে, তার সে আশঙ্কার কথা বলেছিল।

বলিন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ভেবে নিয়ে বলেছিল, পাসের সব বই নিজের কাছে রাখো তো? সেফে রাখা ভালো, পোকায় কাটে না। অর্ডার দিলাম, স্টকবুকে মন্তব্য রেখে পুরনো সিরিজের ড্যামেজড পাসের বইগুলো সকলের সামনে পুড়িয়ে ফেলো। আমাকে সিরিজ নম্বরগুলো জানিয়ে দিও।

সে বলেছিল, মাস তিনেক থেকে বইগুলোকে সে নিজের সেফে রাখছে। সে আসার আগে থেকেই পাসের বইগুলো অফিসের আলমারিতে থাকতো।

তোমাব কি সন্দেহ করার কারণ আছে, হারানো পৃষ্ঠাগুলো অন্যায় পাস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে, আর তাতে তোমার সই আছে? পোড়ানোর পর আব সে সুযোগ থাকবে না। তোমার রেঞ্জের গেট তো তিনটে। তিনটে গেটেই জানিয়ে দিও, কোন সিরিয়ালের বই ব্যবহার করছো। তোমার মুখ কালো হচ্ছে, শুকনো দেখাচ্ছে। নিজেই গেট তিনটে ঘুরে এনকোয়ারি করো না হয়। গেট রেজিস্টারে গেটপাসের সিরিয়াল লেখা থাকবে, যে পাস নিয়ে বেরিয়েছে তার নামধাম থাকবে। কাজটা কনফিডেনশিয়ালি করে দেখো। কাজটা নিজে টাকা পেতে করোনি, তা বুঝছি। যদি তেমন ঘটে থাকে, তা হলে আমাকে বলতে আসতে না। কেয়ারলেস ছিলে, একদিকে সুবিধা হয়েছে। তোমার অফিসের কারা কনট্র্যাকটারদের, কারা অবিশ্বাসী, তা ধরতে পারবে। বলিন হেসে বলেছিল, এওতো এক আদিম বন্য শক্তির মুখোমুখি হয়েছো। বাঘ না হয়, সাপ। তাকে কনট্রোলে এনে দেখো না, কিছু হয় কি না। পুলিশে, রাজনীতিতে অপরাধীকে সুবিধা দেয়ার প্রথা আছে। অপরাধী দিয়ে বড় অপরাধী ধরা, ভোটের মাসলম্যান তৈরি করা।

কিন্তু একটা কথা কি জানো? যে ফলস গেটপাস নিয়ে যাবে সে গেটে পাস দেখাবে না। কারণ গেটে ফলস পাসের নাম্বারে তার নামধাম লেখা হয়ে থাকলে তোমার গেটচেকিংএ ধরা পড়ে যাবে। কাজেই গেট পার হতে বরং সে একশো টাকার নোট ব্যবহার করবে। তবে ফলস নাম কেন? যদি নাছোড়বান্দা কোন গেটম্যান না ছাড়তে চায়! তখন গেটপাস দিতেই হয় আর স্থির করতে হয় ওই গেটে আর নয়। তা হলেও ফলস পাস লাগে। পুলিশ কাঠগোলায় হানা দিলে প্রমাণ করতে হয়, চোরাই কাঠ নয়, গেটপাস আছে।

বলিন হেসে উঠেছিল আবার। কাল দুপুরে এখানকার পুলিশ আউটপোস্টের এক এস আই এসেছিল। ভদ্রলোক আমার পূর্ব পরিচিত। আমার আগেকার ডিভিসনের পাশের থানার ওসি ছিল। এতদিনে প্রমোশন না হোক, বড় কোন থানায় কোন শহরে পোস্টিং হওয়া উচিত ছিল। ডিমোশন হয়নি র‍্যাঙ্কে কিন্তু বনের ধারে এই আউটপোস্টে তাকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বাকি জীবনটাই তাকে হয়তো এমন সব আউটপোস্টে চাকরি করতে হবে। কেন জানো? একবার টাকাসমেত এক কাঠচোরকে ধরেছিল। হাজতে পুরেছিল। তার বেশি কিছু করতে পারে নি। এরকম গোলমালের কথা কানাঘুষোয় আমিও শুনেছিলাম। যাক সে কথা, এখন সেই কাঠচোর মন্ত্রী। বুঝতেই পারছো, কেন ভদ্রলোকেরই উল্টো শাস্তি। বলছিল, কাঠচোর যে মন্ত্রীটন্ত্রী হতে পারে তা কি জানা ছিল? ওদিকে দেখো, ত্রিশ পার্সেন্ট বনভূমি যে তের পার্সেন্ট, সে কি আমাদের চেষ্টায়? কিন্তু এস আই যা বলতে এসেছিল, সেই মজার কথাটাই বলা হচ্ছে না, আর সেটাই তোমাকে একা বলতে চেয়েছি। এস আই জানাতে এসেছিল, তাসিলা রোডস্টেশনের কাছে জখমি একজনকে পাওয়া গিয়েছে, আর নারেঙ্গিহাট থেকে তাসিলা রোডস্টেশনে যাওয়ার পথের ধারে ঝোপের পাশে এক লাশ পাওয়া গিয়েছে। লাশের বুকে গুলির ঘা। জখমির গলায়, ভাগ্যে শ্বাসনালী কিংবা জাগুলার ভাঙেনি। মনে হয় বাঁচবে না। স্মাগলারদের নিজেদের মধ্যে মারামারি হতে পারে। নইলে তাসিলায় ডাকাতি করতে

গিয়ে হতে পারে। তাসিলায় কয়েকটা বন্দুক আছে, বলছিল। দেখো, আমরা রেঞ্জ হেডকোয়ার্টার শিফটিং, নিয়ে ব্যস্ত, বাঘ সম্বন্ধে ভাবছি, তখন কী উটকো ঝামেলা! না, না কিছু বলার চেষ্টা কোরো না। এসব ব্যাপারে নিজের চোখে না দেখলে একটা কথাও বলতে নেই। নিশ্চয়ই তুমি রাত করে রাইফেল নিয়ে বার হও নি।

সে কিছু বলার আগেই এই সময়েই, বাংলোর ভিতর থেকে মেয়র একটা ট্রেতে দুটো টেটম্বুর বিয়ারমাগ নিয়ে এসেছিল।

বলিন বলেছিল, আমাদের মেয়র সব সময়েই কী রকম হেল্পফুল, দেখো। তুমি কিছু পেলে, মেয়র?

মেয়র বলেছিল, ম্যাডাম বললেন, সাহেবেদের দিয়ে এসো, তোমার জন্য কফি দিতে বলছি।

বলিন বলেছিল, বাহ্, তোমার এই জিনস আর সোয়েটাব তো বেশ ভালো। আর তুমি কিনা বুনো সার্জ পরে রাইফেল পিঠে ঘুরছিলে। রাইফেলটাও নামিয়েছো দেখছি। দিনরাতই সঙ্গে থাকে নাকি?

সার, ম্যাডাম বকে দিলেন। বললেন, ওই জঙ্গুলে নোংরা পোশাকে বাংলোর ঘরে ঢুকবে না, বাইরে বসো গে।

আর রাইফেল?

মেয়র বললে, আপনার গানর‍্যাকের পাশেই কেউকেউ তাদের রাইফেল রেখেছে। সেখানেই রেখেছি আমারটাও।

আচ্ছা, মেয়র, ওতেই হবে। বরং মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলোগে। আমাদের লাঞ্চ দুটোয়-আড়াইটেতে। তোমার কফি ঠাণ্ডা হবে।

হ্যাঁ, সার।

আচ্ছা, মেয়র তুমি কি পুলিশকে ভালোবাসো? না বোধহয়। পুলিশদের সঙ্গে আমরা কেউই নিজে থেকে কথা বলি না। যার প্রমাণ দিতে পারবে না, সে রকম কথা জিজ্ঞাসা করলেও বলতে নেই। আর পুলিশদের সঙ্গে ঝগড়াও করতে নেই। মনে করো, পুলিশ তোমার এই জিনসটাই চেয়ে বসল। দিয়ে দেবে, কিন্তু রসিদ নিয়ে। সাক্ষী রেখে। যাও।

ময়ূর চলে গেলে বলিন বললে, দত্ত, আমাদের কি সমাজবিরোধী হতে হয়? সমাজের ভ্যালুজকে মেনে চলতে হয় না? যেখানে খুনীকে পুরো মেয়াদ খাটতে হয় না, যেখানে খুনের মামলা সরকার থেকে তুলে নেয়া হয়, পুলিশ হালকা করে তদন্ত করে, আমাদেরও কি সে রকম হালকা হতে হয় না?

বলিন বিয়ারে মন দিল।

প্রভঞ্জন স্বাদে ও রঙে বুঝতে পেরেছিল, বিয়ারটা ফরেন হতে পারে।

প্রভঞ্জন অনেকটা তাসিলার কাছে এসে পড়েছে। তার মনে পড়ল। বলিন মেয়রের রাইফেলটাকে বদলে দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়র, এটা নতুন ধরনের। দেখতে আগেরটারই মতো। ওধু এতে বুলেট ক্লিপের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম পাড়ানোর গুলির ক্লিপও ব্যবহার করা যায়। ঘুমপাড়ানোর ক্লিপ কিছু নিয়ে যেয়ো, প্র্যাকটিস কোরো। মেয়রের রাইফেল যদি অন্য কোন রেঞ্জে চলে না গিয়ে থাকে, ডিএফওর গান র‍্যাকেই আছে।

কিন্তু তা নয়, প্রভঞ্জন ভাবল। বিয়ারটাই আসল। হ্যাঁ, ফরেন। হয়তো ডিউটি পেইড। আসলে পাহাড়ে তৈরি রকসির অ্যালকোহলের তীব্রতা রোজার পক্ষে ভালো ছিল না। অথচ রোজার দরকার ছিল নেশা। রোজাকে দরকার ছিল ছবির জন্য। আর নিজেকে শাসনে না রেখে, বরং নিজেকে ক্ষমা করে করে, বরং ছবিটবি এঁকে, হ্যাঁ, সুন্দরী স্ত্রীলোকও– যাতে সেই দেওদার পাইন ডাক্তারের

মতে একজন সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

গলার ঠিক নিচে একদলা কুণ্ঠাকে অনুভব করে প্রভঞ্জন মৃদু গলা খাঁকারি করল। তো, অবচেতনে তো আলো পৌঁছায় না, আর সেই নির্জন মন যাকে বাস্তব বলে অনুভব করে তা– তা সিনেমা হলে আলো নেবার পর ত্বকগভীর পর্দায় যে অনুভূতি। তাতে দেহগুলো যতই ক্রোম হলুদ হোক, অঙ্গগুলি যতই মোমমসৃণ হোক– চারদিকে কিন্তু গভীর অন্ধকার, ফলে সে তো কারো মনে অনুভূতি নয়, কারো মনের দেখা নয়। অবচেতনের সেই কুয়াশা অন্ধকারে সত্যই কিছু দেখা যায় কি? তার চাইতে তার ক্যানভাসগুলোর, এমন কি তুলোট কাগজগুলোর উপরের ছবি অনেক বাস্তব।

কিন্তু এটাও নয়, আসলটা হচ্ছে নিজেকে ক্ষমা করা। ডিএফওকে পাসবই হারানোর কথা বলা তো অনুশোচনাই হল। আর তাও বুক খালি করে নয়।

প্রভঞ্জনের চোখে জল এসে গেল। সেই পাসবই-এর হারানো পাতা যদি ব্যবহার হয়ে থাকে তবে তা মিত্রবাহাদুরের হাতে; আর তা সে রোজার জন্য যে ফরেন বিয়ার যোগড় করে দিতো, তার কুইড প্রো কুয়ো নয়?

ময়ূর বললে, আচ্ছা সার, এই নতুন রাইফেলের নতুন ধরনের গুলিতে যদি মৃত্যু না হয় তবে মানুষের দিকে নিশানা করতে নিষেধ করলেন কেন? মানুষের দিকে নিশানা করার কথা কেমনধারা নয়?

প্রভঞ্জন বললে সে ওষুধে বাঘ ঘুমায়, ততটা ওষুধে মানুষ মরে যেতে পারে।

তখন তাসিলার আলো চোখে পড়ছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল প্রভঞ্জনের।

রওনা হওয়ার আগে সে দেখেছিল, সেই অ্যান্টিচেম্বারে বসেই ডিএফও আর কনজারভেটরের অর্ডারলি গোটা তিনেক রাইফেল একটা কাঠের ক্রেটে প্যাক করছে। সেগুলো নাকি কনজারভেটরের সঙ্গে কলকাতা যাচ্ছে, রিপেয়ার রিরাইফেলিং করে ড্রাগ-গান করা যায় কিনা তার চেষ্টায়।

প্রভঞ্জনের অবাক লাগল, মেয়রের রাইফেলটা কলকাতায় চলে গেল কি? গানমেকার কি নতুন করে রাইফেলিং করবে। তা হলে কিন্তু সেই লাশের শরীরে পাওয়া বুলেট কোন রাইফেল থেকে ছোঁড়া হয়েছিল তা প্রমাণ করা যাবে না।

সে মুখ তুলে মেয়রকে দেখলে। অন্ধকার সন্ধ্যাতেও বোঝা যাচ্ছে। বাদামি পনির উপরে লালচে জিন ট্রাউজার্স আর হলুদ টাচলনের সোয়েটার, পিঠের বন্দুকের চোং মাথা ছাড়িয়ে, যদিও এটা ড্রাগ-গান।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

১

খেয়াল চরিতার্থতা তো খানিকটা বটেই। সার্কুলারের পর যে সুদৃশ্য, সচিত্র এবং তিন ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশিত হল, সেটাই তার প্রমাণ। বাঘের দেখা নেই, পাঁচ বাঘের ছবি নিয়ে বই এসে গেল। ছবিগুলোর নিচে নিচে তাদের নাম, ইতিহাস অর্থাৎ পূর্বজীবন, উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, গায়ের রং, ডোরায় তারতম্য, বয়স, খাবার ছবি, খাবার মাপের অঙ্ক। বাঘবাঘিনীরা ইতিমধ্যে নাম পেয়ে গিয়েছে। তিনটি মাদি, দুটি পুরুষ। বড় মাদিটির বয়স বছর চারেক, তার নাম মতিয়া, এক লাট খাওয়া সার্কাস থেকে কেনা, পোচাররা ধরার পরে এক বৎসর প্রায় সার্কাসে ছিল। পুরুষটির নাম উইলিয়াম, ভেটের অনুমান বছর পাঁচেক হবে বয়স। তার সম্বন্ধে সঠিক বলা যাচ্ছে না। নীরোগ, নিখুঁত, কিন্তু উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে ম্যানইটার সন্দেহে তাকে তাড়া করা হচ্ছিল। অনেক তর্কবিতর্ক হয় জীবিত রাখা হবে কিনা, তা নিয়ে। সে সব বিতর্কও আছে পুস্তিকায়। মাস ছয়েক আগে সিডেটিব ডার্টে অবশ করে খাঁচায় পুরে উত্তরপ্রদেশের চিড়িয়াখানায় খোলা এনক্লোজারে মতিয়ার চোখে পড়ে এমন করে, অথচ শিকের বেড়াব আড়ালে রাখা হয়। পরে বেড়া তুলে নেওযাও গিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত ছোট তিনটির বয়স দুই থেকে তিনের মধ্যে। তাদের দুটি যমজ। একটি মাদি, অন্যে পুরুষ। দুজনের চেষ্টায় হরিণ, বনবরা, ময়ূর শিকার করতে পারবে, আশা করা যায়। মধ্যপ্রদেশের এক নরভুক বাঘিনীর সন্তান। মায়ের মৃত্যুর পরে শৈশবে ধরা হয়েছিল। সব চাইতে ছোটটি, যার নাম রঞ্জনা, সে সুন্দরবনের। পোচারদের হাতে মায়েব মৃত্যুর পরে এক বনকর্মচারী তাকে মানুষ করছিল।

ডিএফও যথেষ্ট বিচার করে অগ্রসর হচ্ছে, তাতেই বা সন্দেহ কী? একসপার্ট বন ঘুরে ঘুরে কোর এরিয়ার কোন অঞ্চলে কাদের ছাড়া হবে, তা তো খতিয়ে দেখছেই। জাকিগঞ্জের খাঁচাগুলোতে একজন ভেটই বাঘগুলোকে দেখাশোনার জন্য উপস্থিত। ইতিমধ্যে তার অনুমান, মতিয়া পরিবারের পথে। চারজন ফরাস বাঘগুলোর খাওয়া ও অন্য সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখছে।

অন্যদিকে যেমন সার্কুলারে, তেমন পুস্তিকাতে, পুস্তিকাতে বরং কিছু বাহুল্য করে, গ্রন্থকর্তা ডিএফও বাঘ সম্বন্ধে অহেতুক ভয়, যা থেকে অহেতুক হিংসা, তা দূব কবার চেষ্টা করেছে। যাতে মানুষ অকস্মাৎ বাঘের সম্বন্ধে ভীত না হয়ে পড়ে, সেজন্য পুস্তিকার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। ফরেস্ট কর্মচারীদের মধ্যে তো বটেই, নামমাত্র মূল্যে এমন কি বিনামূল্যে তাসিলা ডিভিসনে সর্বত্র, এমন কি অন্যান্য ফরেস্ট ডিভিসনে। সরকারি টুরিস্ট সেন্টারের কোন কোনটিতে সেই তিন ভাষায় লেখা পুস্তিকা বিতরণ করা হল।

ক্লটলং-এ ডাক্তার জেন, তাসিলাতে মুরলীধর, অবশ্যই প্রথমদিনেই সে পুস্তিকা পেয়ে গেল। ফলে জেন সুচেতনাকে পরীক্ষা করতে পোস্টঅফিসে এলে বাঘের গল্প উঠে পড়ল। পুস্তিকাটার কথাও উঠল। বাকপটু মুরলীধর বললে, ব্লেকের কবিতা পড়ে মনে এই প্রশ্ন ওঠে, ভগবান সুন্দর আর পারফেক্ট করে বাঘের মতো ইভিল কেন বা সৃষ্টি করলেন। ওদিকে দেখুন, ভগবান বলা মাত্র, শয়তান নিহত হয়। অথচ তিনি নিহত হও বলেন না। আমাদের ডিএফও তার উত্তর দিয়েছেন

জেন হাসিমুখে বললে, তুলনাটা পড়েছি। যেখানে আগুন, ইলেকট্রিসিটি, নিউক্লিয়ার ফিশন, বিপ্লব এসবকে সমমূল্যের বলেছেন। তেমন বাঘ।

মনে হয় রসিকতা, কিন্তু একবার মনে হয়েছিল, শয়তান না ঘটালে আমরা পৃথিবীতে মানুষ হতাম না। ইডেন বাগানে বয়স্ক শিশু থেকে যেতাম। আমাদের শিশু থাকতো না। এই বলে মুরলীধরও হঠাৎ থেমে গেল যেন। তাকে দারুন বিপন্ন দেখাল। জেন মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে সুচেতনাকে পরীক্ষা করতে অন্যঘরে গেল।

রসিকতা হোক, অথবা কাব্য হোক, ডিএফওর পরিকল্পনায় ফাঁক ছিল না। পুস্তিকার পরেও সার্কুলার এল আবার। তখন তো স্থিরই হয়েছে, বনের কোন অঞ্চলে বাঘদের কাকে কবে ছাড়া হবে।

ওদিকে বিটঅফিসার, ফরেস্টগার্ডদের বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। খাঁচায় রাখা বাঘগুলোর সঙ্গে পরিচয় করতে তারা জাকিগঞ্জে যাচ্ছে। তাদের পদচিহ্নের বৈশিষ্ট্য মুখস্থ করানো হচ্ছে। ফরেস্টগার্ডদের প্রত্যেককে একটা করে ফাস্ট এইডের ছোট পুলিন্দা দিয়ে অন ডিউটি সঙ্গে রাখার লিখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রভঞ্জন, মেয়র ও বিরিক ব্লকের বিট অফিসারকে আর এক শিক্ষা দেয়া হল, তা এক নতুন ধরনের রাইফেল চালাতে; যার একটি গুলি প্রকৃতপক্ষে এক সিডেটিবের অ্যামপিউল। দরকারে বাঘকে ঘুম পাড়ানো যাবে।

শেষ সার্কুলারে জানা গেল, মতিয়াকে বিরিক ব্লকে, উইলিয়ামকে নারেঙ্গিহাটে, রঞ্জু, রঞ্জিতা আর অঞ্জনা নামে অল্প বয়সের তিনটিকে নারেঙ্গিহাট আর গোরুমারার মধ্যেকার বিস্তৃত অঞ্চলে ছাড়া হবে। দিনও স্থির হয়েছে। দশই নভেম্বর থেকে ছোট তিনটিকে ছাড়তে সুরু করে, উইলিয়ামকে পনেরই, আর সব শেষে মতিয়াকে সতেরই। আর তা কিনা তাসিলার পরিত্যক্ত দুর্গ-টিলায়।

সংবাদ পাওয়া মাত্র তাসিলার মানুষ হকচকিয়ে গেল। বিস্ময়, ভয়, অস্বস্তি, কৌতূহল, কোনটাকে যে মূল্য দেয়া হবে তা স্থির করতে না পেরে, বসে, দাঁড়িয়ে নিজেদের কথায় পাক খেতে থাকল।

জাকিগঞ্জে ধ্বজবীরকে টেলিফোন করে মিত্রবাহাদুর সঠিক সংবাদ জানতে চাইল। বিরিক ব্লকের জঙ্গল তাসিলার অনেক নিচে, সেখানে ছাড়ার কথা বাঘিনীকে, তবে তাসিলায় কেন? তাসিলায় কি মানুষ বাস করে না? নাকি এটা এক মানুষমারা উৎসব? এ কি মজা দেখছি, না শয়তানের শয়তানি? ধ্বজবীর বললে, মতিয়া মানুষখেকো নয়। দেখো না কী হয়।

২

উৎসবের মতোই বন্দোবস্ত হল। ষোলর সকাল থেকেই ঢোল পিটিয়ে তাসিলায় ঘোষণা করা হল মতিয়ার আগমন। বাঁশের খোঁটায় খোঁটায় ইলেকট্রিকের তার টেনে ফোর্টের উপরে, তার নিচে খেলার মাঠে, সেই ছোট্ট শহরের প্রধানতর পথগুলোকে আলোকিত করা হল, যেন এপ্রিলের সেই মেলাই আবার বসবে মাঝ-নভেম্বরের এই শীতে। ট্রায়াল দিতেই ষোলর সন্ধ্যাতেই মেয়র-বাংলো, রেঞ্জার-বাংলো, ফোর্টের ধ্বংসাবশেষ আলোয় ঝলমল করে উঠল। ফলে সতের সন্ধ্যায় পোস্টমাস্টার বলতে পেরেছিল, ভালোই, উইথ আ ব্যাং বলা যায়।

তখন অবশ্য প্রভঞ্জনের দাঁড়িয়ে শোনার সময় ছিল না। মেয়র-বাংলো, রেঞ্জার-বাংলো গেস্টে বোঝাই। লাঞ্চ আর টি পার হয়েছে বটে, ডিনারের বন্দোবস্ত করতে হবে। তাকেই তো সব সুপারভাইজ করতে হচ্ছে। সে এক ফাঁকে ভিড় থেকে সরে সুচেতনার কাছে এক কাপ কফি নিয়ে

বসতে এসেছিল পোস্টঅফিসে। এই আয়োজনটাই নাকি রেঞ্জার হিসাবে তাসিলায় তার শেষ কর্তব্য। রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়। পরে তো বাঘসাহেব। এ শুনেই পোস্টমাস্টারের সেরকম উক্তি। প্রভঞ্জন এক মুহূর্ত ভেবে, কোটেশনটাকে যথাযথ স্থাপন করতে পেরে, মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

আমরা সতেরই নভেম্বর এবং মতিয়ার কথায় ছিলাম।

সবই ঘড়ির কাঁটায় ঠিক করা। ভেটের চোখ তো লাঞ্চে বসেও ঘড়ির দিকে। বেলা চারটেতে মতিয়ার ঘুম ভাঙ্গার অর্থাৎ সিডেশন মুক্ত হওয়ার কথা। হাতে সময় রেখে তাকে আড়াইতে ফোর্টের টিলায় বিশেষ ধরনের স্ট্রেচারে করে তুলে ফেলতে হবে। ইতিমধ্যে, যেখানে তাকে ছাড়া হবে তা শতিনেক গজ দূরে একটা পুরনো পিচগাছের গুঁড়িতে একটা ছাগল বেঁধে রাখা হয়েছে। শহরের লোকেরা আগের দিনের ঢোলে খবর পেয়েছিল, আজ সকাল দশটায় অদৃষ্ট অশ্রুতপূর্ব মোটরযানের শব্দেও তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। এটাও ডিএফওর বিচক্ষণতার প্রমাণ, যে বাঘিনীকে তাসিলায় তুলতে সে এক বিশেষ ধরনের, পাশে মাত্র তিনফুট, টেম্পোভ্যান তৈরি করিয়েছে যা পাহাড়ে ওঠে।

সুতরাং ফোর্টের টিলার কাছে বেলা তিনটে থেকেই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ভিড় জমতে লাগল। ভয়, ঔৎসুক্য, সম্ভ্রমবোধ। সেসময়কার তোলা মুভি ক্যামেরার ফটো থেকে প্রমাণ, সেই উৎসুক, নানা উজ্জ্বল পোশাকের জনতা আর বাঘিনীর মধ্যে রাইফেল হাতে সেই ওয়াইল্ড লাইফের বাঘসাহেব, ডিএফও, ভেটারিনারি ডাক্তার ও মেয়র। প্রভঞ্জনকে দেখা যায় না। বোধহয় সেই ক্যামেরার পিছনে ছিল। পোস্টমাস্টারের পাশে জেন বেশ স্পষ্ট, এমন কি তার স্টেথো-ঘেরা মুখের এক সুন্দর ক্লোজআপ। আর অবশ্যই রানীহেন রিনি বসু।

চারের কাছাকাছি সময়ে ফোর্টের টিলায় সেই স্ট্রেচারের উপরে অস্বস্তি নড়াচরা ইত্যাদি দেখা যেতে লাগল। তার আগেই ফরাসদের সঙ্গে নিয়ে ভেট বাঁধনগুলো কেটে দিয়েছে হয়তো, নবম অ্যান্টি-সিডেশনও কিছু দিয়েছে।

সাড়ে চারে বাঘিনী শোওয়া অবস্থাতেই মাথা তুললে। উৎসুক জনতা তাদের নিরাপদ দূরত্বে চাপা কোলাহলে সরগরম করে উঠে বাঘিনীকে সচকিত করলে। এই সময়েই ভেটের নির্দেশে ফরাসরা ক্যানাস্ত্রা পিটিয়ে হৈ চৈ করল। বাঁশের খোঁটায় খোঁটায় আলোগুলো একসঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল। এই জায়গায় রেঞ্জার অনভ্যস্ত হাতেও ভালো তুলেছে ছবি। দাঁত দেখানো, লেজ দিয়ে পেটে আঘাত করা, কিছুই বাদ যায় নি।

বাঘিনী উঠে পড়ে, এক রানীর মতো ভিড় আর আলোর বিপরীত দিকে গেল। গজ দশেক দূরে জল রাখা ছিল। বাঘিনী শুঁকে পরীক্ষা করে সেই জল খেল। ছাগলটা আর্তরব করলে একবার। টিলার অন্যদিকে ফোর্টের ধ্বংসস্তুপের এক চাতালে বাঘিনী কিছুক্ষণ হেঁটে চলল। ছাগলটাকে একেবারে অবজ্ঞা করলে। পরে চাতালের লাগোয়া একটা হাফ দেয়াল অবলীলায়, এক মসৃণ তরলের গড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে, পার হয়ে চোখের আড়ালে গেল।

বাঘ জীবন্ত শিকার ধরছে, তেমন দুর্লভ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না। ডিএফও বরং জনতাকে চলে যেতে নির্দেশ দিলে। রেঞ্জারও বুঝিয়ে বললে, আমরা সকলে বন্দুক নিয়ে চলে গেলে, কার ভরসায় বাঘের মুখে থাকবেন? সুতরাং জনতা জং-এর টিলা থেকে দ্রুত নেমে চলল।

কিন্তু এতগুলি মানুষের এত ঔৎসুক্য বাঘও উপেক্ষা করে না বোধহয়। দূরে, বেশ দূরেই আঁ আঁ আউঙ্গ করে একটা বাঘ যেন ডেকে উঠল। যেন একটা ময়ূরের ক্যাঁ ক্যাঁও শোনা গেল। আর সেই চোখের আড়ালে দূরে চলে যাওয়া বাঘিনী ডিএফওদের অনেক কাছে এক ভাঙ্গা দেয়ালের আড়াল থেকে নিঃশব্দে মুখ বার করলে। সে যেখানে দাঁড়িয়েছে তার নিচে ফুট দশেক টিলার খাড়াই। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল বাঘিনী। সেখানে হয়তো বাঘ আর ময়ূরের ডাকের সঙ্গে বাইসনদের গন্ধও আসছিল। বাঘিনী দশফুট নিচে হাতিদের চলার পরিত্যক্ত পথের উপরে লাফিয়ে নামল।

ভিড়কে পথ ছেড়ে দেয়ার কৌশলে জেন এয়ার ও মুরলীধর পাশাপাশি এসেছিল। টিলার নিচে পৌঁছেই মুরলীধর বললে, ক্লটলং তো দূরে, আসুন আমার বাসায়, চা খাওয়া যাক।

চোখ খুলে মুরলীধরকে দেখে জেন হাসল। বললে, থ্যাঙ্ক ইউ, এত কাছে যখন এসেছি, রোগিনীর সঙ্গেও কথা বলে যেতে পারি।

সেই ডর্মবির অসুখের সময় থেকেই মুরলীধর আদিবাসীদের বিষয়ে উৎসুক। ডাক্তার তো এ অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যেই কাজ করতে এসেছে। মুরলীধর সে রকম আলাপের কথা ভাবলে। সাহিত্যের কথা উঠবে কি আবার? কিন্তু আজ বাঘই উত্তেজক আলাপের বিষয়। তারা সে রকম আলাপ করতে করতে অগ্রসর হল।

পোস্টমাস্টার তার বাসায় পৌঁছে মৃদুভাবে অবাক হল, নিজেকে বললে, ওই অত আলো থেকে আসতেই তার বাসাটা অন্ধকার লাগছে কি? আজ তো দুপুর থেকেই অফিস বন্ধ। সে অনুভব করলে, বলা যায়, এখনই আলো জ্বালানোর সময় হয় নি, কিন্তু তা জ্বালালেই তা ক্ষতি কী?

অফিসের দরজা বন্ধ। সে জন্য বাসার দরজা দিয়ে অফিসে ঢুকে জেনকে সেখানে বসিয়ে ঘরটাকে উজ্জ্বল করতে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। তার তো তখন সুচেতনাকে চা করতে বলারই কথা, তা মনে আসতেই, সে অনুভব করলে, তার বাসাটাকে বিশেষ ফাঁকা লাগছে। তা হলে? ইন্দ্রবাহাদুর, পুষ্পমায়া যাতে বাঘ দেখতে পায়, সেজন্য কি সুচেতনা তাদের নিয়ে বেরিয়েছে? তাদের জন্য সে নানা রকম ঝুঁকি নেয় বটে।

সে অফিস থেকে বাসায় ঢুকল। কিন্তু যদি বেরিয়ে থাকে, তা হলে শোবার ঘর, বসবার ঘর তালা দেয়া না হোক, অন্তত দরজা চাপা দেয়া থাকবে। যে দরজা দিয়ে সে ঢুকেছে, সেটায় তালা থাকতো। সে একবার শোবার ঘরের দরজায়, একবার বসবার ঘরের দরজায়, উঁকি দিয়ে, পর্দা সরিয়ে স্ত্রীকে ডাকল। তার বেশ অবাক লাগল। সে আর কয়েকটি আলো জ্বাললে। প্যাসেজটায় আলো হতেই সে আবার সুচেতনাকে গলা তুলে ডাকলে। আলোকিত প্যাসেজে ডাইনিং টেবলের পাশে ফাঁকা চেয়ার তিনটে। সে এদিক ওদিকে চেয়ে দেখলে, বাতাসে বাথরুমের দরজা কিছু খোলা। তা হলে? এখন এই আলোয় কি রান্নাঘরে গিয়ে বসেছে, তাও আলো না জ্বেলে? পাহাড়ের গায়ে লাগা বলে, রোদ তেমন পায় না বলে, ঘরটা ঠাণ্ডা। পোস্টমাস্টার আরও দু-একবার সুচেতনা, সুচেতনা বলে ডেকে, রান্নাঘরের আলো জ্বেলে সেই ঘরে ঢুকে অবাক হল। আশ্চর্য, এই তো সে, কিন্তু সে কি তার পায়ের শব্দ পাচ্ছে না, তার গলা শুনছে না?

সে দেখলে, সুচেতনা সেই ঠাণ্ডা কাঠের মেঝেতে বসে আছে একা। তার সামনে মেঝেতে চকে আঁকা একটা ছক। তার উপরে একটা বড় রঙীন নুড়ি, আর সেটাকে ঘিরে বেশ কয়েকটি ছোট সাদা কালো নুড়ি। সুচেতনা যেন চিন্তাকুল, তার বসার ভঙ্গি যেন পরিশ্রান্ত।

হঠাৎ যেন মুরলীধর বুঝতে পারলে। এ কি বাঘবন্দী খেলা? সুচেতনা একা একা বাঘবন্দী খেলে বাঘকে আটকাতে চেষ্টা করছে?

মুরলীধর হেসে বললে, খুব যা হোক। এত ডাকছি। আলো জ্বালাও নি। ডাক্তার এসেছেন। চা করো। পরে তোমার সঙ্গে ডাক্তার কথা বলবেন।

মুরলীধর রান্নাঘরের দ্বিতীয় আলোটাও জ্বালালো। ততক্ষন সুচেতনা উঠে দাঁড়াল।

বললে, ওমা তাই! তা হলে কি করি? পোশাক পালটাই? চা করি? ডাক্তারের কাছে যাবো?

মুরলীধর হেসে বললে, চায়ের জল বসিয়ে পোশাক পালটাও। ডাক্তারকে নিয়ে বসবার ঘরে বসছি। সেখানে চা নিয়ে এলে হবে।

সুচেতনা তো এখন সাধারণভাবেই আশঙ্কার ব্যাপারই যেন। মুরলীধর জেনকে নিয়ে বসবার ঘরে এসে বসে বললে, শরীরের কথা ভেবে বাঘ দেখতে যান নি। বাঘের কথাই মনে ছিল। রান্নাঘরে বসে নুড়ি সাজিয়ে বাঘকে বন্দী করার খেলছিলেন একা একা।

এই বলে হেসে, সে আবার বললে, আচ্ছা, চা হতে হতে এখন আমরা– আচ্ছা আপনার নিশ্চয় ইউরোপীয় ক্লাসিক মিউজিক ভালো লাগে। শুনবেন? টসকানিনি, বার্নস্টাইন– এঁরা কনডাকটর।

জেন বললে, আপনার আছে সে সব রেকর্ড? কিন্তু ভয় হয় সন্ধ্যা হয়ে যাবে। অল্প সময়ে তা সবের সদ্ব্যবহার হবে না। থ্যাঙ্কস অল দা সেম।

তা হলে? মুরলীধর মনের মধ্যে হাতড়াল। কিছু একটা করা দরকার। নতুবা সময় থেমে গেল। সময় যা একটা অতল কূপ হয় তখন! আর সেই কূপের মসৃণ, পিছল, ভঙ্গুর গায়ে ধরবার কিছু নেই হাত বাড়িয়ে। সে বলে বসল, আপনি কি ছবি দেখতে ভালোবাসেন? আমার কাছে কিছু বড় সাইজের ভালো প্রিন্ট আছে ছবির। ক্যানভাসের গ্রেন, ব্রাশের স্ট্রোকও যেন ধরা যায়।

জেন ভাবলে, পোস্টমাস্টার কি এভাবে নিজের সুরুচির প্রচার করছেন? না, না। তা নয়, বড় শহরের মাপে এই নির্জন প্রায় পাহাড়ে ম্যানার্স বিচার হয় না। কিন্তু একবার সে রিফিউজ করেছে ইতিমধ্যে। সে বললে, সে রকম ভালো প্রিন্ট পাওয়া সৌভাগ্যের।

মুরলীধর উঠে গিয়ে সেই ঘরেই একটা সুদৃশ্য আলমারি খুলে দু-ফুট লম্বা, হাত দেড়েক চওড়া একটা বই বার করে নিজের গায়ের চাদরে অদৃশ্য ধুলো ঝেড়ে জেনের সম্মুখের টিপয়ে রেখে বললে, এটা ম্যাডাম, সেজান।

কিন্তু তখন অবশ্যই সেজানের সময় নয়। কয়েক মিনিটেই সুচেতনাও চা নিয়ে এল। ইতিমধ্যে সে পোশাক পালটেছে। তাকে সন্তানে ভারি, কিন্তু আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

চা নিয়ে জেন বললে, এদিকে আলো আলো ভাব, আধঘণ্টায় ক্লুটলং-র পথে সন্ধ্যা নেমে যাবে।

মুরলীধর বললে, তা বটে, তা বটে।

সুচেতনা তার ডান হাতটা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরলে।

জেন হেসে বললে, না এখন রোগী দেখা নয়। আপনার হাতের তৈরি চা খেতে। ঘুম ভালো হচ্ছে তো? সে মুরলীধরকে বললে, কালই তো আপনার ওষুধ আনতে যাওয়ার কথা?

সুচেতনা এই সময়ে মুখ তুললে, তার মুখ লাল, তার চোখ দুটি বাষ্পে আচ্ছন্ন হল।

সে বুকে হাত রাখলে। সে হাত গড়িয়ে নেমে নাভির কাছে এল। সে বললে, এই এক অন্ধকার, এখানে, এটাকে, কোন রকমে–

মুরলীধর চমকে উঠে দাঁড়াল। টেনে টেনে হাসল, বললে, এই দেখো, নিশ্চয় সময়ের কথা ভাবছো।

সময় দিতে হবে না? জানুয়ারিতে তো। আর তারপরে আমরা কখনই থাকছি না।

জেন বললে, আপনি খুব ভালো আছেন। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না।

কিন্তু তার নিজের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল।

চা শেষ হলে, সদরদরজায় এসে মুরলীধর বললে, একা যাবেন?

যেন রোগী সম্বন্ধে পোস্টমাস্টার আর কিছু বলবে কিনা জানতে জেন দু এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়াল, বললে, এখানে এখন সকলকেই সাহসী হতে হবে। উনি বোধহয় শহর নির্জন হয়ে যাবে, একা পড়ে যাবেন, এরকম ভাবছেন। আপনি বলবেন, দরকার হলে ক্লুটলং-এ নিয়ে যাবো।

দু-এক পা এগোতেই তাদের মুখে আলো এসে পড়ল। মেয়র-বাংলোর আলো ঝলমল রূপ চোখে পড়তে না পড়তে সেখানে তুবড়ির ফুলঝুরি দেখা দিল। একটা হাউই শোঁ করে উঠে অনেক

রঙের বল হয়ে ফাটল।

কিন্তু আন্দাজ করা যাচ্ছে ক্লুটলং-এ অন্ধকার নামছে, সন্ধ্যায় ওদিকে বিরিক ব্লকের পথ অন্ধকার হয়ে এল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট যে বাড়িগুলো তা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দু-একটা আলোর বিন্দু, নতুবা সব মুছে যাচ্ছে।

মুরলীধর যেন শীতে শিউরে উঠল। কিন্তু বাকপটু সে বললে, রেঞ্জারকে বলছিলাম, বেশ উইথ এ ব্যাং হচ্ছে।

জেন ম্লান হেসে বললে, দিস ইজ হাউ ইট এনডস। নট উইথ এ হুইমপার বলছেন? ওয়েল, গুডনাইট।

৪

মিউজিক ফ্ল্যাশড্ ইন দা হল। যেন কনডাকটরের ব্যাটন উপর থেকে নিচে নামামাত্র একসঙ্গে ভায়োল, ট্রম্বোন, ট্রাম্পেট, ড্রাম, সেই আলোকিত ডাইনিংরুমে বেজে উঠল।

প্রকৃতপক্ষে অবশ্য সে সব কিছু নয়। আলো সুপ্রচুর, সুবেশ সুন্দর ভোজনকারীরা, সুন্দর মনোহর পাত্রাদিতে সুদৃশ্য সুস্বাদ আহার্য, পানীয়, মৃদু আলাপ ও উচ্চহাস্য। এসবই একনম্বর বা ভি. আই পি. অথবা মেয়র-বাংলো যার নাম, তার ডাইনিংরুমে। বাইরে পটকা ছিল না, ব্যান্ড ছিল না, হাউই ছিল, যা দুই টিলার উপরে শাঁ করে উঠে লাল নীল সবুজ গোলক হয়ে নেমে আসতে আসতে অত্যুজ্জ্বল হতে হতে ফটফট করে ফাটছিল।

দ্বিতীয় কোর্সের প্রথমেই সেই অবিস্মরণীয়, প্রত্যাশার অধিক ভাগ্যটা শোনা গেল। আঁউঙ্গ আঁউঙ্গ আঁউঙ্গ, আঁ আঁ আঁ। আমেন বলার ভঙ্গিতে, মাথা নোয়ালে অখিল বিশ্ব বন্যপ্রাণী রক্ষাকারীদের সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট।

রেঞ্জার ভয়ে ভয়ে বললে, একি মতিয়া উইলিয়ামসাহেবকে ডেকে আনছে তাসিলায়!

ভেট বললে, নিজেও নেমে যেতে পারে। তা হলেও বেকার। আর দু-এক মাস পুরুষকে ভালো লাগবে, তারপর বরং দূরে দূরে।

ডিএফওর আলাপটা ততক্ষণে পূর্বতন ফরেস্টকলোনির রিজ বরাবর মেপল লাগানোর পরিকল্পনায় ঢুকেছে। দেখতে বিশিষ্ট সুন্দর, উপরন্তু সিরাপ হতে পারে। আর স্কাইলাইন-এর সঙ্গে মানিয়ে পীচ। ফল হবে না কে বলেছে? কিন্তু প্রিমরোজ-লাল ফুলের অজস্রতায় চেরিকে অনুসরণ করবে।

রিনি ডিএফওর তৈরি ভবিষ্যতের কাল্পনিক স্কাইলাইনটাকে উপভোগ করলে।

তৃতীয় কোর্সে চামচ দিয়ে রোজাকে পরিবেশনরত লক্ষ্য করে ডিএফও রিনিকে মনে করিয়ে দিল, শুধুমাত্র এক চাটগেঁয়ে মিঞার হাতের মোরগঝোল খেতে তারা কী রকম অন্তত দুবার এক গ্রাম্য ডাকবাংলোয় রাত কাটিয়েছে।

তাদের সামনে রোজা, তার মুখ উজ্জ্বল যেন রঙে ও মসৃণতায়, তার সেই অনেক কালো চুল চূড়া করে বাঁধা, তার উপরে সাদামসলিনের পাগড়ি। হতে পারে তা রেঞ্জারেব পরামর্শে, কেন না সে তো একদিক দিয়ে এই ডিনারে হোস্ট।

রোজার রান্নার স্বাদ ট্যুরিস্টদের টানবে, ডিএফও, সুতরাং প্রস্তার রাখলে : যেহেতু রোজার প্রভঞ্জনের হাউসকিপার হয়ে জাকিগঞ্জে যাচ্ছে না, তাকে এখানকার ট্যুরিস্ট বাংলোয় অথবা কোন সেকটরে, হাউসকিপার করা যেতে পারে। ডিএফও রেঞ্জারকে জিজ্ঞাসা করলে, রোজা কি

কনটিনজেন্ট এমপ্লয়ি হিসাবে, ধরো একশো টাকায় হাউসকিপার হতে রাজি হবে? অবশ্যই তার বোর্ডের খরচ থাকবে না।

যখন টেবলে এসব কথা হচ্ছে, এমন কি রিনি যখন বলছে, মেয়রের জন্য একটা পনি রাখা দরকার এখানে, আর ডিএফও বলছে, আমি মনে করি এখানে ডাক্তার থাকায় এখানকার আদিবাসীরা আর সম্ভাব্য ট্যুরিস্টরা ভরসা পাবে, তার ব্যবহারের জন্যই আর একটা পনি থাক রেঞ্জার বাংলোয়-- তখন তারা চারকোর্সের শেষে।

এই সময়ে এক লেবেলহীন সাদা পানীয়ের বোতল দেখে, ওয়াইল্ড-লাইফ যে নাকি ভালো হুইস্কি ছাড়া বনে ঢোকে না, সে কৌতূহল প্রকাশ করলে।

রেঞ্জার প্রভঞ্জন বিব্রত। সে বললে, এটা এখানে আসার কথা নয়। কারণ এটা ইনডিজেনাস, শতকরা চল্লিশ ভাগ অ্যালকোহল। তাতে নিরস্ত না হয়ে ওয়াইল্ড-লাইফ গ্লাসে দিতে ইশারা করলে।

বলিন শ্রাগ করলে। রিনি ঠোঁট মোছার ছলে ন্যাপকিন নাকের কাছে তুললে।

কিন্তু ওয়াইল্ড লাইফ বললে, বেশ একটা নিষিদ্ধ লোভ মনে হচ্ছে না-- সাদা বিধবা আর অভিজ্ঞ পাপ! বরনা সফেদ কা লিয়ে কুছ কম না থি করবিয়াঁ।

তখন এই নটিনেসে হালকা ভ্রুকুটি করে রিনিবসু টেবল ত্যাগ করলে।

যে সে যখন স্টেটরুমে ফিরছে, নবরু তাকে দেখে, কিছু কী দরকার, তা জানতে এগোলে রিনি বললে, শ্যাম্পেন।

এই সময়ে মতিয়া আর একবার ডাকল। একটা হাউই ফাটল। ম্যাগ্নেসিয়াম আলো, কাচের জানলার ফলে, বাংলোর ঘরেও বিৎ বিৎ করল।

রিনি জানতে চাইলে, তাদের মেয়র ফিরেছে কিনা। নবরু মাথা চুলকালে।

মেয়র আসেনি। সে একাই বাঘিনীর মুখোমুখি এইরাতে। চোখ রাখছে। শ্যাম্পেন আর গ্লাস নিয়ে এসে রোজাই এরকম বলেছিল।

৫

বিদ্যুৎ-চুম্বক-শক্তির ব্যবহারের ইয়ত্তা আর ইদৃকতার সাহায্যেই যে আধুনিকতা এবং সভ্যতার প্রাগ্রসরতা মাপা হয়, মুরলীধরের এই মত আমরা মানতে পারি। কারণ সন্দেহ হয়, সে আধুনিকতা, সভ্যতা, প্রাগ্রসরতা এসবকে মনে না দেখে দৃশ্যমান জগতে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছে। যেন সভ্যতা সে মনে ঢুকতে বিশেষ অনিচ্ছুক। কিন্তু তার এই মত (কবিদের রূপচেতনা যেমন নবউদ্ভাবনশালিনী চিন্তার, তেমন তা যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত, আবার তার অস্বীকারও) হঠাৎ যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়ে যেতে পারে। কেন না এ তো মিথ্যা নয়, তাসিলার এই পকেট হাইড্যাল পাওয়ার হাউস বন্ধ হয়ে যেতেই, যেন এক শতাব্দীর পুরনো অন্ধকারে ফিরে যাবে এই শহর।

ইংরেজ ফোর্টওয়ালাদের আধা মেগাওয়াট এই হাইড্রো-পাওয়ার হাউস পঁয়ত্রিশ বৎসর চলেছে। তা একদিন ধক করে থেমে যাবে, আর তা হৃদযন্ত্রের মতো বুঝিয়ে দেবে যা এতদিন ধকধক করতো, তা আর চলছে না।

কিন্তু তার প্রায় একমাস দেরি। আর তার জন্য তাসিলা শহর তার রেঞ্জারকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারবে না। ডিএফওকে বলে, ফরেস্টের লোকেরা চলে গেলেও যারা তাসিলায় থেকে যাবে, তাদের সুবিধার জন্যই, মতিয়া বাঘিনী যাতে ঘোর কালো রাতের আকাশব্যপিনী চেহারা না নেয়,

১৮৭৯ এর মধ্যে যে উৎরাই তার মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী আলোকিত গ্রাম রাখার চেষ্টা করেছে

প্রভঞ্জন রেঞ্জার। নামার আগে কয়েকদিনের বিশ্রামবিন্দু। ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকবে, পাওয়ার হাউস চলবে।

ডিএফওর দল রওনা হয়ে গেলে প্রভঞ্জন সেই সকালেই পোস্টঅফিসে গেল। না, ডাকের জন্য নয়। ডাক যাবে জাকিগঞ্জে। ব্যাপারটাকে সে যথেষ্ট পরিমাণে সেন্টিমেন্টাল করে তুললে। সে সেই রাতে ডিনারের ব্যবস্থা করলে এক নম্বর বাংলোয়। তাকে ফেয়ারওয়েল ব্যাঙ্কুয়েটই বলতে হয়।

সে বললে, সুচেতনা কোনদিনই আমার কাছে খান নি, কোনদিনই এক নম্বর বাংলোয় যান নি। ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে এক সঙ্গে খাবো আমরা। বিকেলে এসে আপনাদের নিয়ে যাবো। রাত নটা অবধি একসঙ্গে কাটাবো। কাল সকালে আমি নেমে যাচ্ছি।

বিকেলেই প্রভঞ্জন সুচেতনা আর মুরলীধরকে মেয়র-বাংলোয় নিয়ে গেল।

ডিএফও ইত্যাদির অবস্থানেব জন্য সেখানে বাড়তি আলোর ব্যবস্থা ছিল। প্রভঞ্জন তার উপরেও কিছু করেছিল। লনে যেখানে খান কয়েক বেতের চেয়ার, সেখানে বাঁশের খোঁটায় একটা নীল বালব। চায়েব পর সন্ধার অন্ধকার উপভোগ করতে যদি তাবা বসে সেখানে।

তারা যেটাকে ক্লাবরুম বলতো, সেই ক্লাবরুমও অন্য রকমে আলোকিত করা হয়েছে। বিকেলের চা খেতে সে ঘরে ঢুকে তা বোঝা গেল। মাঝখানে চায়ের টেবল, তিন দেয়াল জুড়ে প্রভঞ্জনেব আঁকা ছবি। বাকি দিকটায় তাদের সেই বইয়ের আলমাবি। তারা যখন সে ঘরে ঢুকছে, ময়ূর তখন শেষ ছবিটা দেয়ালে টাঙাচ্ছে।

বাকপটু মুরলধর বললে, বাহ, আর্ট অ্যাকাডেমি যে!

প্রভঞ্জন বললে, বাহ, সুচেতনাকে একবার জানাতে হবে না, কে তাঁর ছবি আঁকল।

প্রকৃতপক্ষে মুরলীধরও প্রভঞ্জনের এত ছবি একসঙ্গে দেখে নি। কখনও ছবি, কখনও কখনও সঙ্গীত আলোর পরিবর্ত হতে পারে, এরকম অনুভব করতে করতে মুরলীধর বললে, দেখো, সুচি, এর চাইতে ভালো রিসেপশন একজন শিল্পী আর কি দিতে পারে?

সুচেতনা ছবি দেখার জন্য প্রভঞ্জনের পাশে পাশে চলতে চলতে উজ্জ্বল মুখে একবার প্রভঞ্জনকে দেখলে। একবার সে বললে, আমার ছবিটা এখানে থাকলে মানাতো কি?

পোস্টমাস্টার মুরলীধরের ব্যবহারও বেশ সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠেছিল। চা খেয়ে তারা আবার বাইরের লনে এসেছিল ঘনায়মান দিবাশেষের আকাশ দেখতে। সেখানে নীল আলোটা জ্বালা হল। আর সেখানেই তখন সুচেতনার হরিণদুটি, সেই ইন্দ্রবাহাদুর আর পুষ্পমায়া উপস্থিত হল। তাদেরও রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ। কিন্তু তারা যেন খালি হাতে আসে নি। তাদের মাথায় কাগজে মোড়া দুটো চৌকো পুলিন্দা। আর তা দেখে মুরলীধর লজ্জিত হল, বিব্রত হল, ব্যাকুল হল, এমন যে প্রভঞ্জনকে বলতে হল, কী ব্যাপার মশায়? এগুলো কি বই?

প্যাকেটদুটো কাছের একটা চেয়ারে রেখেছিল তারা। মুরলীধর মৃদু হাঁপাল। সে ভাবেই প্রভঞ্জনের ডান হাত নিয়ে প্যাকেটগুলোর উপরে রেখে বললে, কাইন্ডলি নিন।

সে কী, কেন?

কিছু না, কিছু না। কয়েকটা ছবির প্রিন্ট। অন্ধকার হলে ভালো হতো।

অন্ধকার? এই বলে আগ্রহ দেখাতে প্রভঞ্জন কাগজের মোড়ক খুলে বিস্মিত হয়ে বললে, এ যে সেজান দেখছি। ও মশায়, এতো অনেক দাম, এতো এদেশে দুষ্প্রাপ্য। এটাতো মাতিস।

মুরলীধর বললে, সেজান? ও হ্যাঁ সেজানও বটে। তো, মশায় সব কি যোগাড় হয়? ছজনই আছে মাত্র।

প্রভঞ্জন বইগুলোকে হাতে তুলে তুলে দেখে বললে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। সেজান, মানে,

মাতিস, রেনোয়া, গগ্, গর্গ্যা। হোক, হোক। এগুলো মশায় কেউ হাতছাড়া করে? না, না। এত দুষ্প্রাপ্য দামী সংগ্রহ নেয়া যায় না। প্রাণ ছিঁড়ে দেয়া হচ্ছে।

মুরলীধর অদ্ভুতভাবে হেসে বললে, এখন আর কী করা যাবে? সবগুলোতেই আপনার নাম লেখা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু প্রভঞ্জনকে খুবই বিস্মিত হতে হল। প্রিন্টের বইয়ের সব নিচেরটির নিচে একটা খাতা। যেন কোন পাণ্ডুলিপি।

বিস্মিত প্রভঞ্জন বললে, এটা বোধ হয় আপনার কোন নোটস। ভুলে চলে এসেছে।

মুরলীধর বললে, কিছু না, কিছু না। আপনাকে উৎসর্গ করা। ওদের কথাই। গ্রন্থসত্ত্বও আপনার।

লনের চেয়ারগুলোর চারদিকে তখন দিনশেষের আলো আর সুহৃদ শীত। সাদা দিনের রোদ পেয়ে লনটা উত্তপ্ত হয়েছে। সুচেতনা এর আগে এমন খোলা জায়গায় বসে এমন দৃশ্য দেখে নি। সেজন্যই যেন তার ডাগর চোখদুটি আরও ডাগর হয়েছে। চিত্রী প্রভঞ্জন এক পলক চুরি করে না দেখে পারলে না। এরকম কি সে এঁকেছে বিস্মিত মুখ? কিন্তু তার মনে হল সুচেতনার চোখের কালোর উপরে পাতাদুটি যেন কখনও সংকুচিত হচ্ছে।

কী বলা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে, সে গলা খাঁকরি দিয়ে নিজের উপস্থিতি বোঝালে। বললে, ও মশায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। আমি তো জাকিগঞ্জে রোজই খবর-কাগজ কিনতে পারবো। আমার এখানকার ইংরেজি কাগজটার এক বছরের সাবস্ক্রিপশন দেয়া আছে। ওটা এখানে আসতে থাকবে। আপনি ব্যবহার করুন।

মুরলীধর বললে, মন্দ বলেন নি। এরকম নিঃশব্দ জায়গায় খবর-কাগজ মন্দ হয় না। পৃথিবীর সঙ্গে একটা যোগ থাকে।

আর কিছু হয়তো সে বলতো, কিন্তু তখনই মতিয়া এক অস্বস্তিতে যেন ডেকে উঠল। আর একই সঙ্গে প্রভঞ্জন আর মুরলীধর সুচেতনার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

মুরলীধর তার বাহুতে হাত রেখে বললে, ভয় নেই কিন্তু।

তা ছাড়া, প্রভঞ্জন উঠে গিয়ে তার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে বললে, তা ছাড়া দেখুন, এই ওখানে মেয়র দাঁড়িয়ে। ওর রাইফেল কাছেই কোথাও আছে। কিন্তু, মাস্টারমশাই, চলুন আমরা ঘরে গিয়ে বসি! ঠাণ্ডা পড়ছে এখন।

কিন্তু সন্ধ্যাটা ছিল ছবির যা যেন সঙ্গীতের স্থান নিচ্ছিল, যেকম বলা হচ্ছে।

সেই ক্লাবরুমে ছবির সামনে বসে মুরলীধর বললে, কালই চলে যাবেন। ছবিগুলো নামিয়ে প্যাক করতেও তো ট্রাবল হবে।

প্রভঞ্জন বললে, এগুলো এখানে থেকে গেলে ক্ষতি কী? আমাদের পরে যারা আসবে, তারা আমাদের বুনো আকাট মনে করবে না। আমরা তো লাইব্রেরিটাও নিয়ে যাচ্ছি না।

সন্ধ্যা সাত বাজতেই মুরলীধরের পরামর্শে তারা ক্লাবরুমেই আর পিংপং টেবলেই গিয়ে বসল।

সুচেতনার আগ্রহে রোজাকেও বসতে হল টেবলে। রোজার আপত্তি শোনা হল না। রেঞ্জার সুচেতনা, মেয়র, রোজা, পোস্টমাস্টার এইভাবে বসল তারা টেবলে, রেঞ্জারের বিপরীত প্রান্তে সেই ইন্দ্রবাহাদুর আর পুষ্পমায়া নামে সেই বালক বালিকাও। একভাবেই সব কয়েকটি কোর্স সাজানো হয়েছিল তার ফলে।

বাকপটু পোস্টমাস্টার ও বাচনপ্রিয় রেঞ্জার পাশাপাশি বসায় তারা একে অন্যের ইন্ধন যোগাতে লাগল।

টেবলে সুখাদ্য কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে ছবিও তো। চোখ তুললেই ছবি চোখে পড়ছে, যার প্রায় সবগুলির মডেলই তো রোজা, যে তাদের ঠিক মাঝখানে, আর বাড়ির গিন্নির মতো লম্বা চামচে

খাদ্যের এটা ওটা বাছাই অংশ, এর তার প্লেটে তুলে দিচ্ছে, বিশেষ কেউ যদি সঙ্কোচে কিছু কম নিয়ে থাকে। কিন্তু ছবি তাকে কিছু বিব্রত করছেই। নিজের নিভৃত আয়নার সামনেই নিজেকে পূর্ণ অনাবৃত করা যথেষ্ট সঙ্কোচের। আর এতো সব চোখের সামনে। শুধু রঙের বিন্যাস আর আর সৌকার্য কি পরিধান হয়? বড়জোর বলতে পারো, সুন্দরী বটে। তার চূড়া করে বাঁধা প্রচুর চুলসমেত মাথা, যা আগের রাতের মতোই সাদা মসলিনের পাগড়িতে জড়ানো, তার লাল হয়ে ওঠা গাল-- এসব সত্ত্বেও মাথা দুলিয়ে হাত বাড়িয়ে লম্বা চামচে বিশেষ সুচেতনাকে বোল থেকে মাংসের নরম টুকরো তুলে দিল।

এই সময়ে, সেই বাক্যপ্রিয় দুজনের কার কথায় ইংরেজি ডেকাডেন্স শব্দটা উঠে পড়ল। তখন কপট করে পোস্টমাস্টার বললে, ডেকাডেন্স বললেন নাকি? কে কে যেন, বিশেষ রেনোয়া সম্বন্ধে মানে তার অতি সুন্দর ন্যুডগুলিকে বুর্জুয়া ডেকাডেন্স বলেছে।

এটা একটা প্রমাণ, বন্ধুর বিদায়ভোজে মুরলীধর পোস্টমাস্টার সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লেও তাদের বাকপটুতা বজায় ছিল।

প্রভঞ্জন বললে, ও হ্যাঁ, ডেকাডেন্স কথাটা আমিই আনলাম বটে। সভ্যতা ভেঙে পড়ার সময়ে এরকম ছবি বেশি আঁকাটাকা হয়ে থাকে বোধহয়। তাই নয় কি? এরকম বললাম?

তা বলুন। কিন্তু মশায়, ডেকাডেন্স কি প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ নয়? সত্যকে প্রচারিত করাও নয়। সমাজে সঙ্গোপনে যে ন্যুড–স্পৃহা সর্বত্র আছে, তাকে ঢাকনার বাইরে আনা নয় কি? তাতে হয়তো বা ন্যুডের প্রতি আকুতি সুস্থ হয়। ডেকাডেন্স একটা বিদ্রোহ ও প্রাগ্রসর। কারণ সত্যনির্ভর।

বলছেন? তা হলে পিকাসোকেও কি তা বলতে হয় না? সে তো সমাজের অবচেতনে ন্যুডের প্রতি আর্কষণ যা, সেই বিকৃত নারীগুলিকে এঁকেছে। আর তার নিচের যে বাস্তবে অতিকায় নারীস্পৃহা সে তো তার মডেল, সেক্রেটারি ইত্যাদির জীবনীতে প্রমাণিত।

মুরলীধব হেসে বললে, তো, মশায়, এসব ছবি এখানেই বা সঙ্গোপনে রাখার কারণ কি এই বলবো, জাকিগঞ্জে আপনার বাসায় এতগুলি ছবি ঝোলানোর জায়গা নেই?

রেঞ্জার বললে, ও, মশায়, এই সব প্রি-পিকাসো আন্দোলন, এসব গ্রামেই শোভা পায় এখন। জাকিগঞ্জের মতো ক্ষুদে শহরেও লোকে হাসবে না? আপনি চাপ দিলে অবশ্য ওই শায়িতা রোজা আর লাইল্যাক সুচেতনাকে আমার কলকাতার বাসার জন্য নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু খুবই ব্যর্থ চেষ্টা নয় পিকাসোর আগের যুগে যাওয়া? সে হো হো করে হাসল।

এই সময়ে ময়ূর লক্ষ্য করলে, ছবিগুলোর অধিকাংশই রোজাকে দেখে দেখে আঁকা, কিন্তু কী যেন আছে যাতে ছবিগুলোকে ফটোগ্রাফ মনে হয় না। কী যেন একরকম শক্তিমান আর সস্নেহ বটে। অনেকবার দেখলেও ফুরাবে না।

এই সময়ে আবার আঁ আঁউঙ্গ করে বাঘ ডেকে উঠল।

মুরলীধর বললে, নিশ্চয় ভয় নয়, সুচি।

সুচেতনা মুখ তুলেছিল, প্লেটের দিকে মুখ নামাল লজ্জিত লাল হয়ে।

মুরলীধর বললে, আসলে, মিস্টার রেঞ্জার, ওকেও তো এখানে ডেজড অবস্থায় আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারপরে এখানে চোখ মেলে, হতভম্ব অবস্থায় থেকে, চোখ মেলে পাহাড় অরণ্যের আবরণ দেখেছিল। সেজন্য কখনও এটাকে স্বস্থান মনে করছে, কখনও সেই ডেজড অবস্থাকেই ভুল করে আশ্রয় মনে করছে।

কিন্তু গল্পটা আবার ছবির দিকে গেল।

রোজা মিন মিন করে বললে, আপনি কি বড় ছবিটা নিয়ে যাবেন, সার?

প্রভঞ্জন বললে, এই দেখো। নিলে তো ওটা নেবোই। ইংরেজিতে ওকে রিক্লাইনিং ন্যুড বলে।

ওটা থাকবে আমার চেয়ারেব পিছনের দেয়ালে। আর ওই লাইল্যাক ছবিটা আমাব সামনেব দেযালে, অর্থাৎ ডিএফও যদি কখনও এই ক্লাবরুম খালি করে দিতে বলেন।

সে মুরলীধরকে বললে, তো এবার স্বীকার করুন, ছবিব ব্যাপারে আপনারও কিছু গোলমাল আছে। সেই বাজনা যা সুচি একদিন শুনিয়েছিল, আর এই ছবির প্রিন্ট। আমবা অল্প জেনেই ছবিব রটনা করি। আর আপনি গোপনে ছবির উপরে বই লেখেন। মশায, আপনি রস-টেট্স্বুব বর্ণচোবা আম। মশায়, আপনি পুলিশ অফিসারের চাইতে বেশী আত্মগোপনকারী। এই এতদিন এক্সপার্ট হয়ে আনাড়ি সেজেছিলেন। এটা চাপান, উতোব দিন।

রোজা বললে, মেয়র, মেমসাহেব কিছু খাচ্ছেন না। ওঁকে ঝুডি থেকে বেছে এক প্লেট আঙুর দাও।

ময়ূর চা দিতে দিতে ভাবলে, যে পোস্টমাস্টাব তাকে ছদ্মবেশী বলে ভাবতেন, ছদ্ম ধবতে জেরা করতেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনি নিজেও তাই। নাকি ছবি আব বাজনার ব্যাপারে?

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

১

সমাপতনের মধ্যে কার্যকারণ খুঁজতে গেলে দিনটাকেই অস্থির, ফুটন্ত বলে মনে হয়। তাসিলায় তখন ডিসেম্বরের তেমন একদিন।

সুচেতনা যেখানে চা করছিল, সেখানে মেঝেতে বসে চা খেতে খেতে মুরলীধর বললে, এখনও সুচি, আলো নিবতে পনের দিন। তার আগেই আমার দুটো পেট্রললাম্প এসে যাবে। জানুয়ারি শেষ হওয়ার আগেই আমরাও চলে যাবো। অথচ দেখো, ক্লিনিক নিয়ে ডাক্তার জেন এয়ার থেকে যাবেন এখানে।

আগে ঠিক ছিল, সেদিন মাইবং থেকে আদিবাসী মুখোশনাচিয়েরা ক্লটলং-এ নাচ দেখাতে আসবে। ইতিমধ্যে আর একবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল মুরলীধর তাদের দিন ঠিক করতে।

চায়ের পর সে তার লিখবার টেবলে গিয়ে বসল। মাইবং-এর নাচের কথা মনে এল। সে তাদের রিহার্সাল দেখেছে। ওটা একটা ব্যর্থ নীরস ব্যাপার, ভূত অপদেবতা তাড়ানোর এক রকমের লাফালাফি, যার কার্যকারিতায় ওরাও তেমন বিশ্বাস করে না আর।

মানুষ জন্মায়, বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধ হয়, মরে। কখনও বা জন্মের পরে জরার আগেই মৃত্যু আসে। ভেড়াগুলো পাহাড়ের ঢালে ঢালে চরে। কারো কারো বাড়িতে কমলালেবু ফলে। কেউ ধনী হয না, কখনও হয় নি। ওরা নেচেই চলে, ভূত, পিশাচ, মারের সঙ্গে সংগ্রাম চলেই।

সে সুতরাং টুং-এর আদিবাসীদের দিকে মন দিলে। মাইবং এর নাচ তো তিব্বতী, ভোটনি নাচের অধোগত রূপ। টুং-এর বরং স্বাতন্ত্র্য আছে। সে টুং-এর ভাষা সম্বন্ধে তার গবেষণার খাতা খুললে।

কিছু পরে সুচেতনা মুরলীধরের দ্বিতীয়বারের চা নিয়ে এল।

মুরলীধর বললে, বসো, সুচি বসো। জানো, এখন টুং-এর ভাষা সম্বন্ধে লিখছি। খুব বেশি বড় নয় ওদের শব্দ ভাণ্ডার। শব্দ আর তার উচ্চারণ ইংরেজি ফোনেটিকেস প্রায় টুকে ফেলেছি। জানো, আঙুলে গুণে দেখো, এখনও কিছুদিন ইলেকট্রিক থাকছে। তুমি কি রেঞ্জার চলে যাওয়ার পরে একদিনও বাঘের ডাক শুনেছো?

না।

তবে? আমাদেব মেয়াদ শেষ তো বড় জোর এক মাস।

সুচেতনা কিছু বললে না।

পোস্টমাস্টার বললে, আচ্ছা, দেখো, হাবোল কিন্তু আর তোমাকে উপন্যাস পাঠাচ্ছে না। হতে পারে, সে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় বিয়ে করতে পেরেছে। আর সেই ভালোবাসার মেয়েটিব তুলনায় এটি খারাপ নাও হতে পারে।

সুচেতনা খিল খিল করে হেসে উঠল।

হাসলে যে? রসো। আজ মেয়র-বাংলোর লাইব্রেরিতে যাবো। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা উপন্যাস তো আছে। বারবার পড়া যায়।

সুচেতনা আঁচলে মুখ ঢেকে হাসি চাপতে চাপতে চলে গেল।

সুচেতনা চলে গেল। মুবলীধর একটা নিশ্চিদ্র নীরবতার মধ্যে ডাকঘরে গুমছের ডাকের ব্যাগ নামানোর শব্দ শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে উঠে গেল।

ডাক কাটছে গুমছে। চিঠিপত্রব পরিমাণ সিকিরও কম ইতিমধ্যে। মুবলীধর খান কয়েক ক্লুটলং-এর চিঠি পেয়ে আলাদা করে রাখলে। হ্যাঁ, খবরের কাগজটাকে এসেছেই। প্রভঞ্জনের ইংরেজি কাগজটা যা এ বছরের শেষ পর্যন্ত ডাকে আসতে থাকবে। ডিসেম্বরের আর কয়েকটা দিনই তো।

গুমছে ডাক কাটা শেষ করে চিঠিপত্র কয়েকখানা টেবলে তুলে দিলে, মুরলীধর রেঞ্জারের ইংরেজি কাগজটাকে হাত করে ডাকঘরের বারান্দায় চলে গেল রোদে বসতে। সে রাস্তাটার এমাথা ওমাথা পর্যন্ত চেয়ে দেখলে। একজন মানুষ যদি আসতে দেখা যায় ডাকঘরের দিকে। সে খবরের কাগজটাকে খুলে বসল। খানিকটা সময়ে এখবর সেখবরে চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ তার মনে হল, একি আশ্চর্য ব্যাপার, খবরের কাগজ কেন? কী হয় সংবাদে? হঠাৎ তার মনে পড়ল। সে তো অনেকদিন থেকে খবরের কাগজ পড়ছে না। নিজের পাঠানো সংবাদ সেই ডম্বরির অসুখের সময়ে, নিজের পাঠানো এদিকের এই শহর আর আদিবাসীদের সম্বন্ধে মালাধর বসু এই ছদ্মনামে লেখা ফিচারগুলো ছাড়া কি কিছু পড়েছে? তখন রেঞ্জারের সঙ্গে আলাপে সময় কেটে যেতো। কিন্তু লক্ষ্য করো, তাতে তাসিলার বাইরের সংবাদ থাকতো। কী হয় সংবাদে? সেও কি মালাধর বসু নামে গবেষণা করার মতো ছদ্ম কিছু? খবরের জামায় নিজের মনকে আড়াল করা? কী আশ্চর্য! সব সময়েই কি আমরা সকলেই নানা সংবাদের জামা পরিয়ে রাখি মনকে, যাতে ন্যাংটো মনটা ধরা না পড়ে?

পায়ের শব্দে, আলাপের গুঞ্জনে চোখ তুলে সে দেখলে একদল লোক চলেছে বটে তার ডাকঘরের সামনের পথে। একটু ঠাহর করেই সে চিনতে পারলে, এরাই মাইবং-এর নাচিয়ে দল। একটা বিতৃষ্ণায় তার মনে ভরে ওঠায় সে বারান্দা থেকে উঠে পড়ল। গুমছেকে ডেকে ডাকঘরে বসিয়ে সে ভিতরে নিজের বসবার ঘরে গিয়ে বসল। বসবার ঘরে খবরের কাগজ হাতে বসেও তার অপ্রয়োজনীয় সংবাদ মনের গায়ে জড়ানোর কথাই মনে হল আবার। আর তা ভাবতে গিয়েই সে অবাক হল আবার। ওটা কিন্তু আশ্চর্য, এই ডাক্তার জেন এয়ারের ব্যাপার, যে তার নামে ডাক্তারি পত্রিকা আসে, বইও আসে, ওষুধপত্র আসে, কিন্তু কখনও সংবাদপত্র আসে না। কী অদ্ভুত তা হলে সেই নিঃসঙ্গ মন নিজের মুখোমুখি? সে ভাবলে, একদিকটা তো কখনও ভাবিনি। ডাক্তারের নাম উপন্যাসের এক নায়িকার নাম বলে ছদ্মনাম বুঝেছি। এই সামান্য এক সীমান্তে, যেখানে চার্চ কোন কালে থাকলেও ক্রিশ্চান নেই, সেখানে চার্চ মিশন থেকে টাকা খরচ করার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ভেবেছিও, কিন্তু সেই ডাক্তারের পরিচিত পৃথিবী থেকে নিজেকে এমন সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবিনি তো! একি কোন রকমের ক্রিশ্চান অনুশোচনা, কিংবা তার চাইতে বেশী স্বেচ্ছানির্বাসন?

কিংবা সেদিন যেমন ক্যালভিনিস্ট স্বর্গের গাঢ় অন্ধকার আর মানুষের পতনশীলতা আর স্বীয় দূষণপ্রবণতার কথা হয়েছিল, তা থেকে পলায়ন?

কিছুক্ষণ সে ক্রিশ্চান ধর্ম, অনুশোচনা, পাপমুক্তি এসব ভাবতে লাগল। এরকম আছে মত, সে শুনেছে, কৃত পাপ থেকে মুক্তি পেতে, যে সুখের আশায় সেই পাপ, সেই সুখকে ত্যাগ করতে হয়, পাপে লব্ধ সম্পদ ভোগ করতে থাকলে অনুশোচনা হয় না।

এই বসার ঘরে সুচেতনার ড্রেসিং টেবল। তাতে নিজের ছায়া দেখে সে অবাক হয়ে গেল। তার চল্লিশও হয়নি এরকম মুখে এখানে ওখানে বাদামির ছোপ ধরা পঞ্চাশের। কপালটা কী অসম্ভব রকমে বড় আর সামনের দিকে ফুলেছে যেন, চিবুকটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়তে চাইছে যেন। চশমার ভিতরে চোখদুটি ঘিরে পোড়া সিয়েনার বৃত্ত।

সে তাড়াতাড়ি কিছু একটা, যা হোক কিছু, করতে আয়নার সামনে থেকে সরে এল।

পোস্টঅফিসের এ বেলার কাজ শেষ হওয়ার বেলা হয়েছে তখন। শব্দ পেয়ে সুচেতনা বসবার ঘরে এসে দেখলে, মুরলীধর তার শখের স্টিরিও, রেকর্ডগুলো, এমন কি চৌকোণ চৌকোণ সেই ড্রাইসেল ব্যাটারিগুলোকে বার করে কাঠের বাক্সে ভরছে।

মুরলীধর তাকে দেখে ঠাট্টা করার মতো হেসে উঠে বললে, এগুলো দিয়ে আসি ডাক্তারকে। তাঁরই বেশি দরকার। ভদ্রমহিলা খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়েন না। তা ছাড়া উনি এত করছেন আমাদের জন্য। ইন্দ্র আর আমি নিতে পারবো না? বসো, একজন লোক নিয়ে আসি। গুমছেকে খেতে দিও। আমি ফিরে এসে ওকে চিঠি বিলি করতে পাঠাবো।

২

মুরলীধর যখন ক্লটলং-এ পৌঁছল তখন নাচ সুরু হয়েছে।

বেলা নটায় শুরু হয়ে মাঝে চায়ের বিরাম দিয়ে সেই নাচ বেলা একটা পর্যন্ত চলেছিল। সে নাচে মুখোশ ছিল, রঙীন পোশাক ছিল, তীরধনুক, কাঠের তরোয়াল, চামর, শিঙা, চটপটি, নাকাড়া ছিল। সে মুখোশ কিছু পুরনো, রঙীন পোশাক কিছু জীর্ণ। দর্শকও কিছু জুটেছিল– জেনের বাংলোর ও খামারের লোকেরা, তার হাসপাতালের কুলি মিস্ত্রিরা। জেন তো থাকবেই। যোগাযোগের ফলে এঞ্জিনিয়ার বিরিঞ্চি, মেয়র, এবং মুরলীধর। বিরিঞ্চি এসেছিল হাসপাতালের ছাদ লাগানোর তদারক করতে, মুরলীধর এসেছিল স্টিরিও উপহার দিতে। অনেক লোক দল বেঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্লটলং-এর দিকে চলতে দেখে ময়ূর আশঙ্কা নিয়ে তাদের অনুসরণ করেছিল। তাকে দেখে জেন বলেছিল, তোমার রাইফেল পিঠ থেকে নামাও। তোমাকে নাচে নিমন্ত্রণ করছি, মিস্টার মেয়র। লিম্বুকে বললে, মেয়রসাহেবেকে চেয়ার দিও।

বাংলোর বারান্দায় জেন, মেয়র, পোস্টমাস্টার, এঞ্জিনিয়ার, সিঁড়িতে অন্য দর্শকেরা। সিঁড়ির নিচে অসমান চত্বরে আট-দশ জন নাচিয়ে নাচছে।

মুখোশগুলো হালকা কাঠ আর আঠা লাগানো কাপড়ে তৈরি। দুরকম লাল, দুরকম হলুদ, সাদা, নীল আর সবুজে রং করা সেই মুখোশগুলো, স্বীকার করতেই হবে, দন্তুর, বীভৎস, ভীতিজনক। যারা নাচছে তারা যে মানুষ তা মনে থাকে না। কারো হাতে মুগুর কারো কাঠের তরোয়াল, কেউ ধনুর্ধর, একজনের হাতে ধর্মচক্র ও ডমরু, লামার পোশাকে বাজনদার, ঝাঁজর, ঢক্কা ও লম্বা নলের শিঙ্গা বাঁশি।

প্রথম পর্যায়ের নাচ শেষ হতেই বিরিঞ্চি ইঞ্জিনিয়ার বললে, আহা, যদি সত্যজিত মৃণাল সেনের

ক্যামেরা থাকতো! ফার্স্টক্লাস।

মুরলীধর উত্তর দিতে দ্বিধা করলে, পরে বললে, বিষয়টা তো কোন এক রকমের সংগ্রাম, দর্শকরা কিন্তু হাসছে, দেখুন।

তৃতীয় পর্যায়ের নাচ তখন শুরু হবে, জেন মুরলীধরকে বললে, আর একবার চা দিতে বলেছি। অদ্ভুত বটে। একটু ক্লান্তিকর নয়?

মুরলীধর বললে, দুপুর হচ্ছে, আমার অফিস খোলা, আমি এখন যাবো। এ একরকম উদাহরণ বটে। কিন্তু মনে হয় না, এর মধ্যে ভুলে যাওয়ার ব্যাপার আছে? পদচারণ দেখুন, সবই ধুপধাপ, সংগ্রাম দেখুন বাস্তবের নকল। মুখোশের সঙ্গে হাতের মুদ্রার, অঙ্গবিক্ষেপের মিল নেই।

জেন বললে, পূর্বপুরুষেরা জানতো, এরা জানে না বলছেন? স্টাইলাইজেশন মিলছে না? প্রিজার্ভ করার কিছু নেই নাচে?

মুরলীধর বলতে গেল, আদিবাসীর সংস্কৃতি প্রিজার্ভ করা আপনার কাজ বটে। সে বললে, প্রিজার্ভ করার মতো করতে গেলে অনেক আর্টিস্টিক সেনস আমদানি করতে হবে। তা হলে তো চেঞ্জ করা হল, প্রিজার্ভ করা হল না।

এই অবসরে সে স্টিরিও ইত্যাদির কেসগুলোর দিকে জেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, এগুলোকে দেখুন। আমার ছিল, আপনার জন্য এনেছি। ব্যাটারিগুলো মাস তিনেকে বদলে নিতে হবে।

জেন খুবই বিব্রত বোধ করে বললে, এটা কি আমি নিতে পারি? এতো আপনারই শখের জিনিস।

মুরলীধর বললে, আমারই বরং বিব্রত হওয়া উচিত। সেকেন্ড হ্যান্ড। এই জন্যে সাহস পাচ্ছি, অত্যন্ত ভালো শব্দ রিপ্রডিউস করে। আর ইউরোপেও আধুনিক বলে। তা ছাড়া, ম্যাডাম, আমরা তো কয়েকদিনে চলে যাবো। আপনি বরং এখানে একা থেকে যাবেন। মিউজিক আপনারই দরকার। অন্তত পাঁচজন বিখ্যাত কম্পোজারের কিছু না কিছু আছে। দয়া করে নিন।... আর আদিবাসীদের জন্য আপনার বরং টুং-এ খোঁজ নেয়া ভালো। তাদের সম্বন্ধে আমার যা লেখা আছে কাল বা পরশু পাঠিয়ে দেবো। আমার অফিস খুলতে হবে। আমি বরং যাই এখন। আপনি আমার স্ত্রীকে দেখছেন। আমরা দুজনেই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

৩

মুরলীধর অফিসে তাড়াতাড়ি চলছে। খানিকটা চলার পরে সে নিজের শরীর ও মনের অস্থিরতার জন্য দিনটাতে ছড়ানো মেঘ, কুয়াশা ও অনুজ্জ্বল উত্তপ্ত রোদকে দায়ী করলে। সে ভাবলে, দেখাই যাচ্ছে মাইবং-এর আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণা কাজের কিছু হল না। হয়তো টুং-এ কিছু পেতে পারে। পাওয়া যায় কি?

খানিকটা আরও চলার পরে সে ভাবলে, তা হলে? খবরকাগজহীন এই নিঃসঙ্গতায় কি করে সংবাদের উত্তেজিত কোলাহলের বাইরে মানুষ তার মনের মুখোমুখি বাস করবে? সে হেসে মনটাকে অন্যত্র সরাতে গেল। কিন্তু আবেগেই যেন তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আশ্চর্য বুড়ো হয়ে জরাজীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কী করবে? নিজের লাভ নেই। বেতন-আয় বাড়ে না, নির্দিষ্ট এক আলাউএন্স নির্ভর করে অন্যের রোগ নিরাময় করে যেতে থাকা?

কয়েক পা চলে পুরনো শাস্ত্র থেকে সে কথা যোগাড় করলে, নিষ্কাম কর্ত্তব্য?

সে বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। বেশ হালকা বোধ করছে নিজেকে। কিংবা দু-তিন গেম

ভলিবল দুর্গের নিচে খেলার মাঠে খেলার পরে মেয়র বাংলোয় কফির জন্য যেতে যে রকম বোধ হতো। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারলে, রেঞ্জার সঙ্গে নেই। সে বরং একা। এখন বিকেল নয়, বরং দুপুর হতে চলেছে।

সেই দুপুরে সে একা চারদিকের নীরস পাহাড়ের ওঠানামার মধ্যে, যদি উঁচু নিচু পাথরের উপরের ছড়ানো, সে জন্য বিকৃত, তার নিজের ধূমল-কালো ছায়াটাতে বাদ দেয়া যায়।

সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারলে, হালকা লাগার কারণটা এই, সে স্টিরিও রেকর্ড কিংবা ব্যাটারির— কোনটার ভার আর বহন করছে না। যে লোকটি এগুলো আনতে সাহায্য করেছিল সে এতক্ষণে বাজারে ফিরে অন্য কিছুর ভার বইছে। ইন্দ্র এতক্ষণে ডাকঘরে ফিরে গিয়ে সুচেতনাকে খবর দিয়েছে। সুচেতনার এখন এই শরীরের অবস্থায় নিঃসঙ্গতা, দুশ্চিন্তা, কোন কিছুর ভারই বহন করা উচিত নয়।

হালকা মনে সে হাসল। এরকম হালকা মনে সে তাড়াতাড়ি চলতেও পারে। আর দ্রুত সিদ্ধান্তও নিতে পারে। যেমন মাইবং-এর আদিবাসী নাচ। সে তার মত বদলাচ্ছে না, ওটা এখন কিছুই নয়, সংস্কৃতির জীর্ণাবশেষ। ওটা তো ধর্ম ও অধর্ম, পুণ্য আর পাপের সংগ্রাম। ওরা হয়তো তা জানে না, নতুবা ভুলে গিয়েছে। হ্যাঁ, বলতেই হয়, নতুবা ওরা পাপকে ভয় করে না, পুণ্যকেও বিশ্বাস করে না, সবটাই হৈচৈ করা আর স্থূল ক্রুড হাসির ব্যাপার।

মুরলীধর কিছু একটাকে নিঃশব্দে চলতে দেখে থমকে দাঁড়াল। চারদিকে চেয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে আবার চলতে শুরু করলে। আসলে পাপ থেকে পুণ্যে যাওয়ার গল্পগুলো মিথ্যা হয়ে গিয়েছে, এমনকি আদিবাসীদের কাছেও। সে বেশ তরতর করে নামল এক পাকদণ্ডিতে ঘুরে ঘুরে। সে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত করলে, এই মাইবং-এর আদিবাসীদের ধর্ম, সংস্কৃতি, লোককথা নিয়ে লিখে কিছু হয় না। যারা নিজেরা কিছু ধরে রাখতে পারছে না, তাদের কী ধরে রাখা যাবে? টুং-এর এখনও স্বাতন্ত্র্য আছে। তাদের সমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে যা সে লিখেছে ইতিমধ্যে, তার বেশি লিখতে গেলে একটা বই লিখতে হয়, যার সময় হাতে নেই। তাদের ভাষা নিয়ে সে অবশ্য লিখছে। শব্দগুলোর গ্লসারি আর ব্যাকরণের খসড়া প্রায় তৈরি হয়েছে। তারা ভাবতেই পারে না, তাদের ভাষার ব্যাকরণ থাকতে পারে। এটা একটু হাত চালিয়ে করলে শেষ করা যাবে। তা হলে তো করলেই কিছু মালাধর বসু এখানে। আর তা হলে তা কিন্তু রেঞ্জারের ছবির মতোই কিছু হল। তারপর রেঞ্জার যার ছবি তাকেই দিয়ে গেল যেন। সেও পারে মালাধরকে জেনকে দিয়ে দিতে।

সে আবার থমকে দাঁড়াল। সে এবার স্পষ্ট দেখেছে, ধূসর-কালো কিছু একটা যেন সাঁৎ করে সরে গেল। তার বেশ আশঙ্কা হল। সে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে কিছু দেখতে গেলে না। কী হতে পারে? কোন শ্বাপদ? সে মনে মনে সাহস সংগ্রহ করে আবার চলতে সুরু করলে। ভয় পেলেই মুস্কিল, বললে সে নিজেকে, এখানে কী আসবে? এখানে ধূমল কালো ভালুকের কথা কখনও কেউ শোনে নি।

বলবে, টুং-এর আদিবাসীদের ভাষার ব্যাকরণ লিখেই বা কি হয়? বেশ নাই হল। আগামী বছর সে কি এখানে থাকছে? তখন মালাধর বসুকেও তার ব্যাকরণ-সমেত এখানে রেখে যেতে পারে তো। রেঞ্জারকে ছবির বই দেয়া হয়ে গেছে। স্টিরিও আজ জেনকে দেয়া হয়ে গেল। সে আর বেশি কথা কি, তার গবেষণার পাণ্ডুলিপিও ডাক্তারের কাছে থেকে যাবে। বাহ্, রেঞ্জারের ছবি কি মেয়র-বাংলোয় থেকে গেল না, আর তা হয়তো রোজার কাছেই?

এক অসুবিধা, ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ইলেকট্রিক থাকবে না। কিন্তু কয়েকদিনই দুই পেট্রললাম্প আনবে অসওয়াল। ওটা খুব ভুল হয়েছে, সুচেতনাকে নিয়ে জুলাই আগস্টে নেমে না যাওয়া।

মুরলীধর আবার চমকে উঠল। থমকে দাঁড়াল। ধূমল সেই কালোটাই সামনে থেকে তাকে বাধা

দিতেই যেন সামনের বাঁকের আঁড়ালে চলে গেল। ঠিক তখনই, দেখো, যখন সে ভাবছিল, ইলেকট্রিসিটি না থাকলে তার ভয় নেই। সে অবাক হয়ে গেল। ঘেমে উঠল। কী জন্তু হতে পারে? এই দুপুরে কি মানুষ সে, যে তাকে সে রকম আক্রমণ করবে?

সে আবার পা বাড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ধূসর কালোও নড়ে উঠল। সে দুহাত মুঠ করে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ঝুঁকে দাড়াল। সে হাঁপাতে লাগল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে হো হো করে হেসে উঠল। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! সে তো পাকদণ্ডির পথেই ঘুরে ঘুরে নামছে, আর গতির দিক বদলে বদলে যাওয়ায় ওটা তো তারই ছায়া, তা কখনও পিছনে, কখনও সামনে, কখনও একেবারেই পাশের উঁচু পাহাড় সূর্য আড়াল করলে, অদৃশ্য হচ্ছে।

হাসা উচিত ভাবলে সে, কিন্তু মুরলীধর হাঁপাতে লাগল। তার দুচোখ থেকেই ঝর ঝর করে জল নেমে এল। সে অনুভব করলে, পাপের সংগ্রহ রাখবো না বললেও তার ছায়া মনে থেকে যায়, সে নিজের ছায়াকেও ভয় করে।

৪

নাচিয়েরা তৃতীয়বার নেচে খেনডুপের বাড়িতে গেল। সেখানে তাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। বিরিঞ্চি তার মিস্ত্রিকুলির দল নিয়ে হাসপাতালের ছাদ লাগাতে গেল। বাংলোয় বারান্দার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল জেন। এ কিছু হল না, এরকম ভাবতে গিয়ে, কেমন এক চিন্তার ঘোর লাগল তার। সে যেন চামলিং নামে অত্যন্ত ময়লা পোশাকের যা পিশুপোকাযুক্ত, গায়ে মাথায় উকুন, জ্বরে ধুঁকছে এমন রোগীটিকে দেখতে পেলে, সেই চামলিং যাকে পাশাংএর প্রৌঢ়া স্ত্রী পিঠে করে বয়ে এনেছিল, যে কিশোর চামলিং আর পাশাং আর তার অন্যান্য ভাইরা একই সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটির স্বামী। আর আজ মাইবং নাচ দেখলে। এসব কি সংস্কৃতি? এসব রক্ষা করতে কি তার এখানে থাকা? আবার দেখো, মাইবং-এর আদিবাসীরা কি স্বাতন্ত্র্যে থাকতে পেরেছে? মনে হয় না কি, তারা অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে প্রধান স্রোত থেকে দূরে অবহেলিত এক জনগোষ্ঠী? এরা খুঁজে পাচ্ছে না, কী ভাবে এরা অন্যান্য জনগোষ্ঠী, যারা তাদের অপার দারিদ্র আর কুসংস্কারের তুলনায় কিছু উন্নত, তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

অথচ লখনৌ-এর ওরা, বিশেষ টোবি স্মোলেট, চিঠিতে এগুলিকে রক্ষা করার কথা মনে করিয়ে দেয়। তা হলে এটা কি টোবি স্মোলেটের প্রফেশন, তার চাকরি, যে সীমান্ত অঞ্চলে তার মতো একজনকে দিয়ে আদিবাসীদের দারিদ্র ও অশিক্ষার সুযোগে, তাদের প্রভাবিত করে জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা? আর তাকে বুঝতে না দিয়ে, মেরিয়ান রয়ের ফাইল, আর তার নিজের জীবনের ফাইল যুক্ত করে তাকে তাদের কাজের উপযুক্ত বলে বাছাই করেছিল?

সে এক মিনিট ধরে দেখছে, ময়ূর বারান্দা থেকে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে। সে তার সঙ্গে কথাও বলছে না।

জেন, হাই মেয়র বলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে নামল। ময়ূর, হ্যালো ময়ূর বলে জোরে জোরে ডাকল। তার কাছে পৌঁছাতে পেরে তার একটা হাত ধরলে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এই দেখো, তোমাকে আমি লাঞ্চে থাকতে বলতে ভুলেছি। মাফ করো, ডারলিং। তাসিলায় এখন কে আছে? তুমি কি ভেবে দেখো না, আমি এখানে কিরকম একা?

দেখো, ভেবেছিলাম, তাসিলায় আছে, হয়তো চেষ্টা করলে আমরাও ইলেকট্রিসিটি পাবো। এখন কি চারদিক অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ভয় হচ্ছে না? তুমি আমাকে তত বলো নি, তোমার নরবু

যত বলেছে।

জেন তার পার্লারে পৌঁছে বললে, নরবু বলেছে, যদি কিছু হয়, তাসিলার বেশির ভাগটা বন হয়ে যাবে, শাল, শিশু, মেহগ্নি এইসব গাছ লেগে যাবে।

ময়ূর বললে, ফলের চারাও একেবারে বর্ষায় দেবেন। কুল, পেয়ারা, আপেল, নাসপাতি এসবের চারাও তৈরি হবে।

জেন বললে, নরবু এসবের কথাও বলেছে বটে। তোমার কি মনে হয়, ক্লুটলং-এও এসব ফলের গাছ হতে পারবে? শোনো, নরবু কেন বা ভয় পেয়েছে। সে আমার কাছে এসে থাকতে চাইছে, এক-দু একর জমি চাইছে। তোমাদের সঙ্গে আর থাকতে চাইছে না। ও তো নিজে থেকে এসেই টিলার একদিকের ঘাস, ঝোপঝাড় সাফ করে, মজুরি নেয় না।

জেন হাসল। বললে, আসল কথা, নরবু নাকি লেপচা। সে অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছে। তোমাকেও ভয় পাচ্ছে। আর একদিন দ্রুকের কথা উঠেছিল। তাতে নরবু বলেছে, মেয়র পনি দ্রুক ছ। সেই একচোখো গিয়ালপো।

দ্রুক যেমন আছে একজন, মেয়রও তেমন একজন দ্রুক। গ্রেগ সাহেব গিয়ালপো দ্রুককে ক্রস নিয়ে তাড়া করেছিল বলে সে ক্লুটলং-এ আসে না। মেয়র তাহলে সে রকম দ্রুক যাকে ভোট-তিব্বতে আলো দিয়ে ডাকে। কারণ মেয়র চার্চের কাছে অনায়াসে আসতে পারে।

লাঞ্চের আগেই জেন লিম্বু আর নরবুর চাষের গল্প তুললে। লিম্বুর আলু ভালো হবে। থেনডুপের ভুট্টা আর গোরুর দুধ ভালো হবে। নরবুকে খানিকটা জমি দিলে ভালো হয় না?

লাঞ্চে বসে জেন আগের গল্পর জের টেনে ক্লুটলং টিলায় আপেলগাছের গল্প তুললে যাতে নামগিয়ালের আলাপে যোগ দিতে সুবিধে হয়।

নামগিয়াল তখন বললে, তার ছোটবেলায় সে ক্লুটলং-এ তিনটি গাছ দেখেছিল। ফল কাঁচা থাকতে পড়ে যেতো। দুএকটা পাকলে রং ভালো হতো, কিন্তু ভয়ঙ্কর টক। গাছগুলোতে উই লেগেছিল। বাজে লতায় ঢেকে গিয়েছিল। একদিন ফাদার গ্রেগরি পায়ুস নিজের হাতে কুড়াল চালিয়ে কেটেছিল শেষ গাছটাকে।

জেন হেসে বললে, ফাদার গ্রেগরি বোধহয় সে গাছটাকে পতনের আপেলগাছ মনে করেছিল। পতনের গল্পটা কি তুমি শুনেছো, ময়ূর?

লাঞ্চের পরে ময়ূরকে নিয়ে জেন তার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসল। নামগিয়াল তার চার্চে গেল, পেমা দুপুরের জন্য তার নিজের বাসায় গেল।

তখন জেন বললে, তোমার নিশ্চয় দুপুরে শোওয়ার অভ্যাস নেই। বসো, বাইরের দরজাটাকে বন্ধ করে আসি।

দরজা বন্ধ করে এসে জেন ময়ূরের মুখোমুখি বসল। তখন তাসিলায় বাঘ, নুমপাইয়ের সেই বড়বড় ছাগল, যারা কখনও কখনও অর্কিডের গলিতে নেমে আসে ওক প্লান্টেশনের পথে, সেখানে অর্কিডে এত মধু যে কালো ফেজ্যান্ট মধু-জড়ানো পাপড়িগুলো খায়, নুমপাইয়ের বনে অসুর জাতির আস্তানা হচ্ছে, কিছু নাসপাতি, কুল, আর পেয়ারার চারা সেখানেও বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে—এই গল্পগুলো করলে আবার ময়ূর।

জেন উঠে গিয়ে উল কাঁটা আনলে। উল বুনতে শুরু করলে, তাসিলায় যে মানুষগুলো থেকে গেল, তাদের কথা তুললে। কী খাবে তারা? কী হবে তাদের উপজীবিকা?

ময়ূর তখন বললে, যেমন সে রেঞ্জার ও পোস্টমাস্টারকে বলতে শুনেছে, এখানে এতদিন উপজীবিকা ছিল বাইরে থেকে আসা টাকা। এখানে এই মরা কাছিমের খোলার মতো পাহাড়ে কী ফসল হবে? এক যদি ডিএফও ট্যুরিস্ট সেন্টার করতে পারেন। নতুবা যদি খনি আবিষ্কার হয়।

তখন তো পাহাড়টাই থাকবে না।

শেলফে রাখা টাইমপিসটায় শব্দ হল। জেন বললে, তিনটে বেজে গেল। পেমা চারটের আগে আসবে না। বসো, কফি করে আনি।

জেন চলে গেলে, অনেকক্ষণ একইভাবে বসে আছি, এরকম অনুভব করে ময়ূর উঠে পড়ল। সে ভাবলে, চিন্তা করতে গেলে কিন্তু বিপন্ন হতে হয়। উপজীবিকা না থাকলে কী করে মানুষ? স্মাগলিং, পোচিং? ওদিকে কিন্তু এই আশ্চর্য, মানুষ উপজীবিকা থাকলেও এসব করে। রেঞ্জার যেমন একবার বলেছিল– একেবারে গোড়াতেই এক ভাই অন্য ভাইকে খুন করেছিল। নিজের টাকা থাকলেও মানুষ অন্যের টাকা চায়, নিজের নারী থাকলেও অন্যের নারী।

ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বুক শেলফের উপরে ঝোলানো আদিবাসীদের তৈরি গ্রেগের মুখোশটার টানে সে শেলফের কাছে গেল। তখন বইগুলোও তার চোখে পড়ল। হঠাৎ তার মনের অনেক পিছন থেকে কেউ বললে, বই, আশ্চর্য, বই, এত বই! মুখোশটার নিচে একটা সুন্দর বাঁধাই বই। হলুদে সবুজ মলাটের উপরে রুপালি অক্ষরে লেখা অক্ষরগুলো টুপ টুপ করে বসতে লাগল তার মনের মধ্যে পাশাপাশি। হোলি বাইবেল। আঙুল ছোঁয়ানোর আগেই তার হাতের পিঠে, গলায়, ঘাড়ে বিনবিন করে ঘাম ফুটল। সে মাথা নেড়ে এই ভয়ানক ব্যাপারটাকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করল। মনের মধ্যে পাশাপাশি এরকম অক্ষর বসা!

জেন অন্যমনস্ক হয়ে ঘরে আসছিল, কফি করতে করতে আগের গল্প থেকে তার চিন্তা নানা রকমের ফল বাছাই করছিল। তাদের রং, স্পর্শ, স্বাদ মনে আসছিল। এমন সময়ে সে ময়ূরকে বই-এর শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে। তার চটির শব্দ হল। টেবিলে কফির ট্রের শব্দ হল। আর সেই শব্দেই সেই আবেগ থেকে বেরিয়ে এসে জেন অবাক হয়ে দেখলে, যা সে কখনও চিন্তা করে নি, বুক শেলফের সামনে ময়ূর একাগ্র মনে কিছু পড়ছে যেন। বললে, কী পড়ছো? জিম করবেট? ওতে বাঘের গল্প আছে বটে। সে হাসল, তুমি পড়ে দেখো, গা শিরশির করবে। দেখবে বাঘিনী ডাকছে, ডাকছে বাঘকে, আর সেই বনে, রাতের বনে করবেট।

জেনের গলা শুনে হকচকিয়ে বইটাকে রাখতে গিয়ে, চুরি করে জ্যাম খেতে গিয়ে যেমন বালকেরা বয়াম ফেলে দিতে পারে, তেমনই বইটাকে ফেলে দিলে ময়ূর। অপ্রতিভ হয়ে, লজ্জিত হয়ে, বইটাকে ঠিক জায়গায় রেখে, নিজের নিরক্ষতা প্রমাণ করতে বললে, একদিন রেঞ্জার বলেছিলেন, বইতে নাকি ধর্মের কথা, আদম, ইভের কথা থাকে, এটা কি সেই বই?

জেন বললে, এসো কফি খাই। একদিন বেড়াতে হোর্ডিং-এ আঁকা বাঘ দেখে অবাক হয়েছিলাম, এখন সত্যই বাঘ এল। আমরা সেদিন গ্রেগ অ্যাভেনুতে পাথরে বসে চিতার চোখ দেখেছিলাম। সেখানে বাঘও একদিন আসতে পারে!

ময়ূর কফি নিলে জেন আবার বললে, আচ্ছা তোমার সেই অর্কিডবনের অর্কিড কি আমাদের এই ক্লুটলং-এ হতে পারে? একদিন কিন্তু সেখানে বেড়াতে গেলে হয়। খাবার পড়ে রইল, দরজা খোলা রইল, সারারাত পরে ভোররাতে মাদার সুপিরিয়ার ফিরল বন থেকে। সেদিন নামগিয়াল, পেমা, থেনডুপ তাদের মাদারকে কী ভেবেছে কে জানে?

ময়ূর বললে, জানেন, ম্যাডাম, রেঞ্জার বলতেন সেই অর্কিডবন টাকার খনি?

জেন বললে, তুমি যেমন বলছো, তাতো হতেই পারে। কিন্তু কে আসবে সেই অর্কিডের বাণিজ্য করতে? সেখানেই তো তুমি শিকার করেছিলে। আচ্ছা, তুমি কি শ্যুয়োর সেই শিকার ক্রুক নয়? আচ্ছা, সে কথা আমাকে ছাড়া আর কাউকে বলো নি তো?

ঘটনাটা মনে পড়ল ময়ূরের। আর সে অবাক হল। সে রকম মানুষ খুন করে ফেলেছে জেনে, সে আর কাউকে খবর না দিয়ে জেনের কাছে এসেছিল কেন? তাকে বিশ্বাস করে বলতে? তেমন

করে কাউকে বিশ্বাস করা তো জীবনে সেই প্রথম।

ময়ূর বললে, আমি আপনাকে সেই অর্কিড এনে দেবো। কিন্তু আমি আপনাকে কালো ফেজ্যান্টের সেই গভীর অন্ধকারের গলিতে নিতে সাহস পাই না।

শার্সির ওপারে বিকেলের রোদ ইতিমধ্যে সোনালি হচ্ছে, কোবাল্ট নীলের বাড়তি অংশ যেন আকাশ থেকে গড়িয়ে নামছে, যা কুয়াশা হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। বাইরে এখন বেশ শীত হবে। কাচঘরের মধ্যে কবোষ্ণ আরাম। আর কফি তাকে হৃষ্ট করছে।

কফি শেষ হলে জেন বললে, বসো আসছি।

জেনের ফিরতে পনের মিনিট লাগল। ইতিমধ্যে সে পোশাক পালটেছে, চুল ব্রাশ করেছে, আগে যেমন দেখে নি ময়ূর, তেমনভাবে তার ঠোঁট দুটি রাঙা।

জেনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ময়ূর লজ্জিত হয়ে, বললে, আপনাকে কি বলেছি, একদিন অর্কিড পাড়তে এক ভঙ্গুর পাহাড়ে উঠে পা ভেঙেছিলাম।

জেন বললে, বেশ গল্প তো, বলো শুনি।

এক বেলগাড়ির কামরায় এক লকেটদার সোনার হার কুড়িয়ে পেয়ে সে হার গলায় পরে চলতে গিয়ে কেমন করে পথের ধারে কাছে অর্কিড দেখে পাড়তে সে চেষ্টা করেছিল, ফেব্রুয়ারি সকালের কুয়াশার নরম সোনালি রোদে সেই অর্কিড কী অপূর্ব দেখাচ্ছিল-- সে গল্প বললে ময়ূর।

পেয়েছিলে সেই অর্কিড?

পেয়েছিলাম। কিন্তু পা ভেঙে শুয়েছিলাম এক মাস।

জেন খিল খিল করে হেসে উঠল। সত্যি সত্যি এ গ্রেট ফল।

বিকেল চারটেতে জেন বললে, পেমারা এসে কাজ করুক, ক্লটলং টিলায় ঘুরবো চলো।

সেই টিলায় ঘুরতে ঘুরতে তারা এমন জায়গায় এল, যেখান থেকে তাসিলার অনেকটা দেখা যায়। শীতকালের বিকেলের রোদে তখন লাল সোনালি ভাবটা লাগছে। জেন জিজ্ঞাসা করলে ময়ূর তাসিলার দৃশ্যমান অংশগুলোর কোনটা কী তা বলে দিলে।

তারপর তারা থেনড়ুপ, লিম্বু, এমন কি নরবুর সম্ভাব্য থাকার কুটির, চাযের বন্দোবস্ত এসবও দেখে বেড়াল। ক্লটলং-এ কখনও ফসল হবে ভাবা যায় নি, এখন দেখে আশা হল।

জেন কিছু ভেবে হাসছিল, তা লক্ষ্য করে ময়ূর বললে, কিছু বলবেন, ম্যাডাম?

জেন বললে, তুমি তো জেনেছো, এখানকার শেষ আপেলগাছটাকে ফাদার গ্রেগরি কেটে ফেলেছিল, আবার তুমি পরামর্শ দিচ্ছো আপেলচারা লাগাতে!

আপনি কি বাইবেলের আপেলের কথা মনে করছেন, ম্যাডাম?

তা বটে, তা নাও বটে। জেন বললে, কমনসেন্স কী বলে? অধঃপতনের পরেও কি আপেল খেতো না অ্যাডাম?

বোধহয়, বললে ময়ূর, নতুবা খেতো কী? ছেলেদের খাওয়াতে হতো। তখন হয়তো যব হযনি। যবের চোখা খসখসে ত্বক ফেললে ভিতরে সুস্বাদু সুখ তা বোধহয় জানতো না তখনও।

অবশেষে তারা যখন নামছে ময়ূর বললে, একটা উপায় হয় বটে, উপায় করার।

আচ্ছা, সে কী রকম?

অর্কিড যদি এখানকার বনে, তাসিলার গাছে গাছেও হতে পারে। নুমপাই আর ক্লটলং-এ যদি আপেল নাসপাতি হতে পারে, তাসিলার সব বাড়িতেই সে সব ফলের গাছ কি হতে পারে না? তাসিলাই যদি অর্কিড, নাসপাতি, আপেল, সন্তরা, পেয়ারা, কুলের বাগান হয়ে যায়?

অবাক স্বপ্নের মতোই কিছু বলছে ময়ূর, ভাবলে জেন। অথচ পিঠে রাইফেল, অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে ঘুরে বেড়ানো এই মানুষটাকে কী ভয়ঙ্কর দেখাতে পারে!

সে আড়চোখে ময়ূরকে দেখলে। বললে, আচ্ছা, ময়ূর, তোমার সেই অ্যাকসিডেন্ট। তোমার মতো পাহাড়ের দক্ষ লোক, অবুঝের মতো ভঙ্গুর পাহাড়ে উঠেছে শুনে সকলেই তোমাকে বোকা বলেছে নিশ্চয়। তুমি কি তখন তার নামঠিকানা জানতে যে অর্কিড পৌঁছে দেবে? তোমাব গলা শুনে মনে হয়, তুমি তাদের চাইতেও বোকা তারা তোমাকে তত বোকা ভেবেছে– যে এখনও জানো না, যে যার হার কুড়িয়ে পেয়েছিলে তার জন্যই অর্কিড আনতে গিয়েছিলে।

তখন তারা বাংলোব কাছে প্রায় নেমেছে, দেখলে বুড়ো নামগিয়াল হন্তদন্ত তাদের দিকে উঠছে। নিচ থেকে প্রায় অন্ধকার বাংলোর দিক থেকে অনেক মানুষের উত্তেজিত গলা শোনা যাচ্ছে। নামগিয়াল বললে, মাদার, বিরিক ব্লকের লোকেরা মেয়রকে খুঁজছে। জেন বললে, কী হয়েছে? এই তো মেয়র।

নামগিয়ালের পিছন পিছন কয়েকজন উত্তেজিত মানুষ উঠে এসেছিল। তারা শোকাবহ ক্রোধের স্বরে বললে, বিরিক ব্লকের উত্তরে আলুবখরা সড়কের শালবনে বাঘে মানুষ মেরেছে। ডাক্তার নাকি আছে এখানে?

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১

যাকে দুর্ঘটনা, ঘটনার সমাপতন মাত্র বলা যাবে, তারও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেয়ার লোক আছে। যেমন ডিএফও বলেছিল . বাঘে মানুষে পরস্পরের হারানো পরিচয় নতুন করে পেতে, এরকম যে কোনদিন ঘটতে পারে, মিস্টার বেঞ্জার। লক্ষ্য করো, বাঘ তার সীমার মধ্যে ছিল, মানুষই মাটিতে আঁকা টাটকা পাগমার্কের গণ্ডি পেরিয়ে বাঘের সীমায় ঢুকেছিল। পৃথিবীটা ইডেন নয়, মিস্টার দত্ত, ইভিল আছে, বড়জোর আর্ডেন বন। ব্লেকের কথাও মনে করতে পারো। ভালও আছে। মিস জেন এয়ারের মতো বিচক্ষণ ডাক্তার হাতের এত কাছে ছিল।

পেট্রলল্যাম্পের আলোয় জেনকে ওযুধের, ইনজেকশনের ব্যবস্থা করা, রক্ত বন্ধ করা, সেলাই করা, এসব করতে হয়েছিল, একা। মেয়র বড়জোর পেট্রলল্যাম্পটাকে দরকার মতো এদিক ওদিক সরিয়েছিল। হসপিট্যাল খুলবার আগে এক মারাত্মক রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেন।

পোস্টমাস্টার মুরলীধরের ব্যাখ্যায় বাকপটুতা ছিল, কথা বলার নেশাও ছিল। দু-চার দিনের মধ্যেই জেন সুচেতনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পোস্টঅফিসে এসেছিল। তখন পোস্টমাস্টার বলেছিল, দেখো সুচি, চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে পেট্রলল্যাম্প নিয়ে কেউ আছেন। ভয় কী? এ লেডি অ্যান্ড এ ল্যাম্প।

সুচেতনা কফি করে আনলে, সে, জেন, ময়ূর, সুচেতনা টেবল ঘিরে বসেছিল। মুরলীধরের কথার নেশা করার সুযোগ হল। বললে, তুমি খোঁজ করো, মেয়র। দেখবে, বাঘের সীমায় ঢোকার কারণ বাঘের মড়ি মৃগমাংস হতে পারে।

জেন জিজ্ঞাসা করলে, খাদ্যাভাব কি?

মুরলীধর বললে, ইডেনের আপেল কি খাদ্যাভাবে? এমন প্রমাণ নেই শাস্ত্রে। আসলে ইদ বলুন, লিবিডো বলুন, লোভ বলুন, কারো মস্তিষ্ক নেই, চোখ নেই যে যুক্তি তৈরি হবে'

এই পর্যন্ত বলতে পেরে সে খুশি হয়ে হাসল। বললে, বণিক সিন্ধবাদ যে সাপের দেশ থেকে

হীরা সংগ্রহ করতে রকপাখির পায়ে নিজেকে বেঁধে আকাশে ওড়ার সাহস রাখে, তারও জীবনের ট্রাজেডি সেই দ্বীপের বুড়ো, যে খোঁড়া, যে ঘাড়ে চেপে দুপায়ের চাপে সিন্ধবাদের দম বন্ধ করে আনে। জেন শিউরে উঠে হাসল। বললে, সেই বুড়ো কি সিন্ধবাদের ইদ?

মুরলীধর বললে, কেউ বলেছে, সেই অন্ধ বাসনার থেকে বাঁচার এক উপায় ঘোড়ায় চড়া। তা চড়া হয় না বলে, সেই বুড়োর হাত থেকে বাঁচার উপায়, তাকে সঙ্গে করে অথৈ সমুদ্রে লাফিয়ে পড়া।

এ সবই বড়জোর বক্তার মনের ভঙ্গি প্রকাশ করতে পারে।

তাসিলা তো তখন অতিদ্রুত পরিত্যক্ত পৃথিবী হতে চলেছে—কিংবা এক আদিমতায় ফিরছে সে আবার। তা সত্ত্বেও তাকে অনুভব করতে এই একটা প্রতীকী ঘটনার দরকার ছিল, যে ঘটনা যেন আগে থেকেই জানা ছিল ঘটবে বলে। বাঘের থাবার নিচে মানুষ।

২

সারাদিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে জেন ময়ূরের সঙ্গে পনিতে চেপে টুং এর আদিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেল। পোস্টমাস্টারের প্ররোচনাতেই বলতে হয়। ইতিমধ্যে ময়ূর ক্রুটলং টিলার জন্য জাকিগঞ্জ থেকে আপেলচারা এনে দিয়েছে। ডাক্তারের ব্যবহারের জন্য একটা পনি ধার দিয়েছে কৃতজ্ঞ ডিএফও।

এখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। আবহাওয়াতে শীতের সঙ্গে আরামদায়ক রোদ ভ্রমণের পক্ষে বেশ আরামদায়ক। প্রস্তুতি হিসাবে জেন মুরলীধর পোস্টমাস্টারের টুং এর আদিবাসীদের সম্বন্ধে লেখা পাণ্ডুলিপিটি পড়ে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে রোগীর প্রয়োজন ছাড়াই জেন তাসিলার মেয়র-বাংলোয় এসেছিল। দুপুর থাকতেই ময়ূর আর সে অর্কিডবনের গলিতে গিয়েছিল। মেয়র-বাংলোয় ফিরে এসে সন্ধ্যার প্রথম ঘণ্টাও চায়ের টেবলে কাটিয়েছিল তারা। হয়তো একা লাগায় ময়ূরের খোঁজে মুরলীধরও এসে পড়েছিল। ফলে তারা তার উৎসাহে প্রভঞ্জনের আঁকা ছবিগুলোকে দেখেছিল। জেন আশ্চর্য হয়েছিল, রেঞ্জার চলে যাওয়ার পরে তার ছবিগুলো কেন এখানে থেকে যাবে? সে কি ছবিগুলোকে আর চায় না?

টুং-এ যখন রওনা হল তারা, তখনও হালকা কুয়াশা থাকায় ময়ূর জেনের পনির লাগাম ধরে হাঁটছিল। তার পনি পিছন পিছন আপন মনে আসছে। জেন যখন বললে, পনিতে ওঠো, ময়ূর জানালে, রোদ না উঠলে নয়।

বিরিক ব্লকের কাছে রোদ উঠল। কুয়াশা কিছু থাকলেও তা তেলকাগজের মতো স্বচ্ছ।

পনির উপরেই তারা দুজনে তখন। ময়ূরের গায়ে সেই গরমে খাকি গ্রেট কোট, যার কলারের উপর দিয়ে পিঠে ঝোলানো তার রাইফেলের চোং উঁচু হয়ে আছে। খোঁজ করলে তার গ্রেটকোটের পকেটে সেই রেগুলেশন ফার্স্ট এড কিট পাওয়া যাবে। তার স্যাডলের পমেলে সুদৃশ্য চাঙারি বাঁধা। তাতে লাইট লাঞ্চ, খাবার জল ও কফির ফ্লাস্ক। জেনের পরনে জিনস ট্রাউজার্স, গায়ে টার্টলনেক ক্যাডমিয়াম হলুদ সোয়েটার, তার উপরে স্কার্লেট কেপ, মাথায় স্কার্লেট রিবন বাঁধা হলুদ ফেল্টহ্যাট যার ধার বেশ চওড়া। তার চোখে রিমলেস পোলারয়েড পরকলার চশমা, মনে হয় সানগ্লাস। তার পনির স্যাডল-পমেলে তার ডাক্তারিব্যাগ যাতে ভাইটামিন, অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়াও অনেকটা ঘায়ের মলম। সে মুরলীধরের কাছে গল্প শুনেছে, টুং-এর আদিবাসী মেয়েদের কারো কারো গায়ে ঘা পোষা থাকে, যা নাকি অন্যজাতের পুরুষদের লোভ থেকে নিজেদের বাঁচাতে। ময়ূরের চুলে আর

তার ইম্পিবিয়ালে কুয়াশা থেকে সংগ্রহ করা জলকণা রোদে চকচক করছে।

নারেঙ্গিহাটের কাছাকাছি এসে পথ চওড়া হওয়ায় তারা পাশাপাশিও চলতে পারছিল। একবার বনের মধ্যে একটা দোতলা কাঠের বাড়ি চোখে পড়ায় জেন জানতে চাইল। ময়ূর জানালে, নারেঙ্গিহাট বিট অফিস। দোতলা উঠছে টুরিস্ট লজ হতে। হরিণ, বাইসন, কখনও হাতি, ময়ূর, বানর আর এটা উইলিয়াম সাহেবের এলাকা। ময়ূর যখন জেনের প্রশ্নের উত্তরে বললে, উইলিযামসাহেব সেকালের দুর্গওয়ালা কোন গোরাসাহেবের ভূত নয়, মিস্টার উইলিয়াম বাঘের নাম, জেন হেসে নিতে পারলে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে, ম্যানইটার নয়তো?

তারা বনের পথে টুং-এর দিকে নামতে শুরু করল। অপরূপ চেহারার গাছ, লতা, অজানা ক্যাকটাসে ফুলের রং যেন মেলা উপলক্ষে জমেছে। জেন খুশি মুখে বললে, কী সুন্দর তোমাদের দেশ, মেয়র।

ময়ূর বললে, হ্যাঁ। রেঞ্জারসাহেব নেমে যাওয়ার আগে শেষ কয়েকটি দিন এসবেরই স্কেচ করতেন, আঁকতেন।

কিন্তু, জেন বললে, মেয়রসাহেব, ওটা হয় না। একজন মেয়রের যদি শহরের আদিবাসীদের দুর্দশার কথা ভেবে মাথা গরম হয়ও, তা হলেও তাসিলার যেখানে যতটুকু মাটি সেখানে আপেল, নাসপাতি, কমলা হচ্ছে, গাছে গাছে অজস্র রঙিন অর্কিড ঝুলছে, মৌমাছি গুঞ্জন করছে, এমন যে চলতে গেলে উড়ন্ত মৌমাছিতে ঠোক্কর খাচ্ছো--এরকম সম্ভব নয়।

ময়ূর হাসল, কিন্তু গম্ভীরও হল। তার ইম্পিরিয়ালের চিবুকে হাত রাখলে, বললে, অনেক সময় লেগে যাবে, না? তা তো বটেই। আমাদের বাংলোর মেপলের চারাকয়েকটি এতদিনেও মাত্র ফুট তিনেক হতে পেরেছে।

তারা বেলা এগারোটায় টুং-এ পৌঁছেছিল। সেখানে বিকেল চারটে পর্যন্ত তারা আদিবাসীদের মধ্যে ছিল।

জেনের মন বিশেষ ভাল হয়েছে, কারণ সেখানে অনেক চিকিৎসা করতে পেরেছে সে। তাদের জনসংখ্যা, ভাষা, ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মুরলীধরের পাণ্ডুলিপিতে অনেক তথ্য ছিল। টুং-এ অবস্থিত এই বিশেষ জনজাতির মোট জনসংখ্যা পাঁচ-ছয় শত হতে পারে। তাদের ভাষা পৃথক, চেহারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর হলেও, পার্থক্যও ধরা যায়। পাহাড় বুড়ি, নদী দেবতা আছে, ভক্ষ্য অভক্ষ্য আছে, পুজাপদ্ধতি আছে। মাটি, সূর্য, চন্দ্র এরাও জীবন্ত। তাদের সামাজিক অলক্ষ্য অলিখিত নীতি আছে। অশিক্ষা আছে, বই নেই, কুসংস্কার আছে। অসীম দারিদ্র্য আছে, অপুষ্টি ও অচিকিৎসায় মৃত্যু আছে। তা সত্ত্বেও তাদের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে চায়, যেন মরি, মুছে যাই তাও ভালো, তবু এই জীবনপদ্ধতি বদলালে থাকল কী? চাষের জমি, ভুট্টা, গোরু, এসবের মালিক মেয়েরা, পুরুষরা তাদের তীরধনুক, বেঁটে তরোয়ালের মালিক। বিবাহ হয়, তাই বলে আবার অজস্র বিবাহ করা যাবে না, এরকম নয়। তা না হলে তো প্রমাণ হয়, স্ত্রীলোকটি অন্য কোন পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। সম্ভবত বাবার নিকট আত্মীয়ে বিবাহের ফলে সন্তান ক্ষীণজীবী। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী হলেও তাদের বাহু অথবা পায়ের ঘা অন্যজাতের পুরুষের লোভ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নয়। গোপনে কথা বলার সুযোগ পেয়ে চার পাঁচজন স্ত্রীলোককে মলম দিতে পেরেছে জেন, অন্তত আর পাঁচজনকে জনডিস ও কৃমির ওষুধ দিতে। মোট জনসংখ্যার শতকরা দু তিনজনকে সে পরীক্ষা করে ওষুধ দিতে পেরেছে। কিন্তু তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। সদ্য মাটি থেকে তোলা শাক, আলু, সদ্য চাকভাঙা মধু, জেন ও ময়ূর হাত পেতে না নেয়া পর্যন্ত তারা ওষুধ নিতে রাজি হয়নি।

এখন বিকেল পার হচ্ছে দিন। তারা নারেঙ্গিহাটের কাছে এসেছে। জেন এই আদিবাসীগোষ্ঠীর তৈরি আদিসৃষ্টির মিথটাকে ভাবছিল। একবার নাকি মহাভোটে, মহা টানে আকাশ থেকে আগুন

নেমেছিল জলের বদলে। আর তার সঙ্গে বুনো কুকুরের মতো একদল শিকারী নেমেছিল উত্তরের পাহাড় থেকে। সে সব থেকে পালাতে পালাতে এক অল্পবয়সী মা আর তার বুকে ধরা এক ছেলে এই বনে পথ হারিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। সেই মা আর ছেলে থেকেই এই জাতি। ছোট্ট ছেলেটি বড় হয়ে বন বাদাড়ে ঘোরে, শিকার করে, সেই বুনো কুকুরদের মতোই হয়ে যাচ্ছিল। তখন সেই প্রায় বুড়ি হয়ে যাওয়া মা এক কৌশল করলে। একদিন ছেলেটি ঘুম ভেঙে দেখলে, তার কোলের কাছে একটা ক্ষুদে মেয়ে কাঁদছে। বুড়ি মা কোথাও নেই। ছেলেটিকে বুনো ছাগল ধরে দুধ দোয়াতে হল। সেই বুড়ি মা ওই পাহাড় চূড়া। আর নদীটি সেই বুড়ির ছেলে। ওদের বিশ্বাস ওই নদীও পাহাড়ের কোন গুহা থেকে বেরিয়েছে, এরকম এদের বিশ্বাস। এদের বিশ্বাস মানুষের মৃত্যু হলে আবার সেই গুহায় চলে যায়।

ময়ূর একবার জিজ্ঞাসা করলে, এখানে পুরুষদের কী কাজ?

জেন বললে, সেই বুড়িমা সেই প্রথম ছেলেটিকে দিয়ে যা করিয়ে নিয়েছিল, ছেলেমেয়েদের রক্ষা করা। মেয়েরাই আসল, সত্য কিছু, পৃথিবীর মতো, কারণ তারা সন্তান আনতে পারে। পুরুষরা তো ছায়া। সন্তান মানুষ করবার সুযোগও যদি না পেতো, যুদ্ধ আর ঝগড়া করা ছাড়া আর কিছু যুক্তি থাকতো না বেঁচে থাকার। সে ভাবলে, এই মিথটাই ওদের শিকড়। যতদিন ওই পাহাড় আর নদী আছে, দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু সত্ত্বেও শিকড় ছাড়বে না, অন্য কোথাও যাবে না। আমরা ওদের মিথের বদলে অন্য মিথ দিতে পারি, কিন্তু তাতে মাইরং, তাসিলা, নুমপাইএর আদিবাসীদের সঙ্গে এদের পার্থক্য আর থাকবে না, স্বাতন্ত্র্যও নয়।

তারা যখন নারেঙ্গিহাট ছাড়িয়ে পাহাড়ে উঠছে, ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল। ময়ূর তাড়াতাড়ি তার পনি থেকে নেমে, সেটাকে যথেচ্ছ চলতে দিয়ে জেনের পনির ব্রাইডল ধরে চলতে শুরু করলে। বিস্মিত জেনকে সে বললে, রাস্তা এখানে কিছুক্ষণ কেবলই বাঁক নেবে, চওড়ায় কমবে, এই অন্ধকারে প্রথম দিনেই আপনাকে এখানে পনি চালাতে দেয়া যায় না।

ঘটনাটা যেন এক অনুভূতি সৃষ্টি করে, কিংবা তাকে বাড়িয়ে দেয়। জেন ময়ূরের মাথার চুলে হাত রাখলে। সে অনুভব করলে, এভাবে কিন্তু কুটলংএ থেকে যাওয়া যায়, যদি আজকের দিনের মতো দিনগুলি আসতে থাকে। সুন্দর নয় জায়গাটা? সে বেঙ্গারের মতো আঁকিয়ে না হতে পারে, কিন্তু সুন্দর যে এখানে প্রকৃতি, তা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু একটা প্রচণ্ড দুর্গন্ধ লাগল তাদের নাকে। ঘোড়াগুলিও যেন অস্বস্তি বোধ করলে। ময়ূরের ভয় করে উঠল। যাওয়ার সময়ে এই দুর্গন্ধ ছিল না। এটা উইলিয়াম নামে সেই পুরুষবাঘের সীমানার বাইরে পড়ে। তা হলেও কোন কারণে সে কি মড়ি নিয়ে তাদের ডানহাতি পাহাড়ের মাথার উপরে কোথাও উঠেছে? পথটাও এখানে একটা চূড়াকে লুপ করছে। ময়ূর উপরে নিচে টর্চ ফেললে। জেনের ঘোড়ার ব্রাইডল ছেড়ে, তাকে তার পিঠ বরাবর ঘোড়ার মুখ রাখতে বলে, এক হাতে টর্চ অন্য হাতে রাইফেল নিয়ে আগে চলল সে।

কয়েক মিনিট ধরে ব্যাপারটা ঘটছে। তারা চললেও দুর্গন্ধটা তাদের ছাড়ছে না, কোন বাঁকে কমেছে, আবার বেড়ে উঠছে, আবার বেড়ে উঠছে। একবার এক বাঁকে টর্চের আলোয় তারা দেখলে, তাদের দশ-পনের গজ সামনে তিনজন আদিবাসী চলেছে। দারিদ্র্যের শেষ সীমায় যারা থাকে তাদের মতোই চেহারা। তিনজনেরই পিঠের উপরে পাতাপুতি, নোংরা কাপড়চোপড়ে ঢাকা মাল বইবার বাঁশের বাস্কেট। ময়ূরের অনুমান হল, সেই চড়া দুর্গন্ধটা সেখান থেকেই আসছে।

তারাও পনির শব্দ পেয়ে থাকবে, টর্চের আলোও অবশ্য লক্ষ্য করেছে, রাস্তায় পাশ দিতে পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রাইফেল ঘাড়ে ঝুলিয়ে, রুমালে নাক ঢেকে, টর্চ জ্বেলে জ্বেলে ময়ূর তাদের কাছে গেল।

সে শুনেছে, এদিকের আদিবাসীরা মাংস শুকিয়ে রাখে। আধশুকনো মাংসের এরকম দুর্গন্ধ হতে পারে বটে।

সেই তিনজন পাহাড়ের গায়ে গা মিশিয়ে স্তব্ধ। জেনের পনিকে পাশ দিয়ে চলে যেতে দিয়ে ময়ূর লোক তিনটিকে ভাল করে দেখতে গেল। তখন ঢাকা দেয়া সত্ত্বেও একটা ঝুড়ি থেকে শিং সমেত একটা বাইসনের মাথা টর্চের আলোয় ধরা পড়ল।

ময়ূর ধমকের সুরে পাহাড়িতে জিজ্ঞাসা করলে, বাইসন! কোথায় পেলে?

জঙ্গলে পড়ে নষ্ট হতো, তাই আনলাম।

জঙ্গলে? কে মারলে? রোগে মরেছিল?

কী করে বলবো?

হয়তো কেউ বিষ দিয়েছে। বিষে মরবে তোমরা।

জেন পনি থামিয়েছিল, এগিয়ে গেল, নাকে রুমাল চাপা। বললে, আর সহ্য হয় না ময়ূর, পালিয়ে এসো।

তোমাদের চিনে রাখলাম, বলে ময়ূর হাঁটতে শুরু করল।

তারা তখন অনেকটা উঠে বিরিক ব্লকের মিটমিটে আলোগুলো দেখতে পাচ্ছে, জেন বললে, এমন হতে পারে কি মেয়র যে বাইসনটাকে বাঘে মেরেছিল?

বাঘে? ময়ূর নিজেকে এই প্রশ্ন করে চিন্তিত মুখে হাঁটতে লাগল। উইলিয়ামের মড়ি?

জেন বললে, কী গন্ধ, কী পচা! এই ওরা খাবে?

টুং-এর সেই মধুর গন্ধই চাপা পড়ে গেল। জেন বললে, কিন্তু তুমি ভাবছো কেন, মেয়রসাহেব, পনিতে ওঠো। ভাবনা তো আমার। শখানেক গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস কেস হতে পারে।

এতেও যখন ময়ূরের ভাবনা গেল না, জেন বললে হালকা স্বরে, কী ভাবছো ময়ূর? খাদ্যাভাব তো গোড়া থেকেই, হোলি বাইবেলই প্রমাণ। অ্যাডামকে মাথার ঘামে খাদ্য যোগাড় করতে হয়েছে। কিন্তু ভগবানও বোধ হয় ভাবেন নি, মানুষকে এমন দুর্গন্ধ সহ্য করতে হবে। কার্সের মধ্যে ছিল না।

ময়ূর বললে, উইলিয়ামের মড়ি কিনা ভাবছিলাম। বিরক্ত উইলিয়াম ওদের অনুসরণ করে তাসিলা পর্যন্ত উঠতে পারে।

ও, আর ভেবো না, ময়ূর। হোলি বাইবেলের লেখক কেমন ঠকেছে, ভাবো। সে ভাবতেও পারে নি, মাথার ঘামেও রুটি পাওয়া যাবে না, এমন মাটির অভাব হবে এক সময়ে। মেয়রসাহেব, ওই কি তোমার তাসিলার আলো?

কিন্তু বাঁক ঘুরতেই আলোটা হারাল আবার।

আর সেই ময়ূর রঙের অন্ধকারে জেন বললে, আচ্ছা ময়ূর, তুমি ডিএফওর সার্কুলারে বাঘ সম্বন্ধে সব কথা পড়েছিলে?

ময়ূরের মনের মধ্যে কে বলে উঠল, বলো, বলো, না পড়িনি। এ যেন পোস্টমাস্টারের মতো কথা। জানতে চাওয়া ময়ূর পড়তে জানে কি না। সে অর্ধসত্য বললে, পড়তে হয় না আমাদের। ডিএফও আমাদের বক্তৃতা করে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর রেঞ্জারসাহেবও।

জেন বললে, ডিএফওর তুলনাগুলো কিন্তু বেশ নতুন ধরনের। বাঘকে সাধারণত ইভিল, শয়তান, মানুষের শত্রু এরকম মনে হয়। কিন্তু ডিএফও সার্কুলারে লিখেছেন, বাঘ যে শক্তি তা বিদ্যুতের মতো, বিপ্লবের মতো। দুটোই ভগবানের পরিকল্পনায় আছে। ডিএফও বক্তৃতায় বাঘকে দ্রুকের মতোও বলেছেন। দ্রুক? মেয়র বিস্ময় জানালে।

তা হলে বক্তৃতায় বলেন নি ডিএফও। কিন্তু সার্কুলারে দ্রুকের সঙ্গে তুলনা করেছেন বাঘকে।

আমি তো ভেবে পাই না। পরে নামগিয়াল আমাকে একদিন বলেছে, দ্রুকও ইভিল। মানুষের মনে থাকতে পারে। কিন্তু আসলে সে সমুদ্রে বাস করে। সেখান থেকে উঠে তিব্বতের দিকে, চীনের দিকে চলতে থাকে। তার চাপে গাছপালা ভেঙে পড়ে, তার নিঃশ্বাসে আগুন, তার থাবার নখ থেকে, পিঠের কাঁটা থেকে আগুন ঝলকায়। অথচ তাকে নিয়ে উৎসবও হয়। তার উপস্থিতিতে আনন্দও করা হয়। নামগিয়াল আমাকে গোপনে বলেছে, সে আবার নাকি গ্রেগের কাছে শিখেছে, দ্রুক আসলে মনসুন, বিদ্যুৎ জ্বালা চমকানো গর্জন করে ছুটে চলা ঝড়। শয়তানের পরামর্শে অ্যাডাম ইভকে না নিলে মানুষ তৈরি হতো না। দ্রুক সেভাবে পৃথিবীকে—কী বলবো?—র‍্যাভিশ করে, ভেঙে চুরে, নিজের না করলে, পৃথিবীর ফসল হয় না। বাঘ না হলে নতুন বনও হয় না। পুরুষের মনেও সেই জন্য দ্রুক রেখেছে ভগবান।

রাত প্রায় নটা হয়। ময়ূরও তখন পনিতে। তাসিলার আলো পড়ছে এ বাঁকে, ও বাঁকে। একটা কুয়াশার ভাব থাকায় অন্ধকারে মিশে সে আলোর বলগুলোকে নিচে নামা তারার মতো অপ্রাকৃত মনে হচ্ছে। ওই বাজার, ওই মেয়র-বাংলো, এই পরিত্যক্ত ফরেস্টকলোনির স্ট্রিটলাইটিং।

সুখী বোধ হচ্ছে জেনকে, সারাদিনের পরিশ্রম সত্ত্বেও। চিকিৎসা করে টুং-এর পাঁচ-ছশো মানুষকে সে কি কালে হাজার মানুষ করতে পারে? ওদিকে, মাইবং, টুং, তাসিলা, নুমপাই এসব জায়গা মিলে হয়তো তিন হাজার মানুষ আছে। হসপিট্যালে অল্পই রোগী রাখা সম্ভব। কিন্তু ঘুরে ঘুরে সে চিকিৎসা করে যেতে পারবে। হসপিট্যাল চলার টাকা, ওষুধের টাকা যদি চার্চমিশন দিতে থাকে, তবে পাকাচুলের বুড়ি হওয়া পর্যন্ত সে থেকে যেতে পারে। থেনডুপের আর নিজস্ব ফসলের উদ্বৃত্তে তার আর হাসপাতালের ইনডোর রোগীদের খাওয়া হয়ে যায়। টোবি স্মোলেটের সেটা রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে যে এখানে মিশন চার্চ। তাতে কী হয়?

জেন আপন মনে হাসল, টোবি স্মোলেট যা নাকি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ উপন্যাসিকের নাম, তা ব্যবহার করা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ।

সে একটু ভেবে বললে, জানো, ময়ূর? কখনও ভেবেছো? আমাদের নামগুলো—পৃথিবী থেকে যেমন গাছলতা জন্মাতে পারে, আমাদের নামগুলো কিন্তু আমাদের শরীর থেকে নয়। আমাদের ওদিকে, যার যার নামেই পরিচয়। তুমি ময়ূর—মেয়র, আমি জেন এয়ার। তা হলে আমরা কি আসল না হয়ে শুধু নামমাত্র হই না? ছায়া ছায়া হই না? যখন রোগী দেখে ওষুধ দিই, তখনই যেন শরীর পাই, এরকম কি তোমারও মনে হয়?

পনিদুটো পাশাপাশি চলছে। ময়ূর কথাগুলো শুনে, ভাবতে গিয়ে অবাক হল। তারা তখন পোস্টঅফিসের কাছাকাছি। তারা দূর থেকে পোস্টমাস্টার মুরলীধরকে দেখতে পেলে। তার পোস্টঅফিস আর বাংলোর কাচের শার্সি দিয়ে আসা আলোয় পথের ধারে দাঁড়িয়ে খাদের দিকে ঝুঁকে যেন কুয়াশার পাক খেয়ে ওঠা লক্ষ্য করছে। তেমন আলোতে খাদের ধারে দাঁড়ালে অন্ধকার আর কুয়াশাকে সেরকম মনে হয়। মুরলীধর চিন্তাশীল। খাদটাকে অতীত, কুয়াশাকে স্মৃতি মনে হচ্ছে হয়তো, তার।

জেন বললে, হ্যালো, সিন্ধবাদ।

মুরলীধর চমকে উঠে, তখনই সামলে নিয়ে বললে, এই ফিরছেন? গুডনাইট।

এই সময়ে ময়ূর পোস্টমাস্টারের বাংলোর দিকে চেয়েছিল। সে দেখলে, পোস্টঅফিস কোয়ার্টারের এক শার্সিতে পোস্টমাস্টারের স্ত্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে। যেন পর্দা সরিয়ে রাতের তাসিলা দেখছে। ডাগর কালো চোখ। ময়ূর তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলে। তার মনে পড়ে গেল, একদিন নিথর নির্জন মাঝরাতে সে পোস্টমাস্টারের স্ত্রীকে শার্সির কাচে এরকমই ভীরু চোখ মেলে থাকতে দেখেছিল।

পোস্টঅফিস পার হতে হতে জেন বললে, বলোতো, আজকের সব চাইতে ভাল অভিজ্ঞতা কী? মধু নয়? কী সুঘ্রাণ!

কিছু দূরে এসেছে পোস্টঅফিস থেকে পনি, অনধিকদূরে মেয়র-বাংলো তার আলোর জন্য চোখে পড়ছে। পশ্চিম প্রান্তের ঘরটাই যেন বেশি উজ্জ্বল। জেন অনুমান করলে, ওই ঘরটাতেই রেঞ্জারেব ছবিগুলো টাঙানো। সমালোচকেব বিচারে ছবিগুলোর কী মূল্য তা সে বলতে পারবে না। কিন্তু ছবিগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার মন যেন অনুভবেব ভাষা নিতে থাকল। দেখো, রেঞ্জারের ছবিগুলি এখানে পড়ে রইল। হয়তো তেমন মূল্যবান কিছু নয়। হয়তো তেমন, কোন জেনের এখানে কাটানো দিনগুলিও এক সময়ে পড়ে থাকবে। তার কি কিছু মূল্য থাকবে? কিন্তু রেঞ্জার তো আঁকার সময়ে সুখী ছিল।

দপ করে একসঙ্গে সব আলো নিভে গেল। যেন এক ভযঙ্কর কৃষ্ণদানব লাফিয়ে পড়তে চরাচর তার বুকে চাপা পড়ল। অন্ধকারের ধাঁধায় জেনের মনে হল, সে পনি থেকে পড়ে যাচ্ছে। ময়ূর ঝুঁকে পড়ে জেনেব পনির মুখডোব চেপে ধবলে। বললে, স্টেডি, ম্যাডাম। আজ ১৭ই ডিসেম্বব। আলোর শেষ রাত, মনেই ছিল না। তাব কথা অন্ধকাবে ডুবে গেল।

সেই সময়েই আর্ত চিৎকারটা কানে গেল তাদের। সুযোগ পেয়ে কেউ যেন কারো বুকে ধারালো অস্ত্র বসিয়ে দিয়েছে।

এসব আন্দাজ করতে দুএক সেকেন্ড সময় লাগে। ময়ূর অনুমান করলে চিৎকারটা মেয়েলি গলার, এখানে এ সময়ে পোস্টমাস্টাবেব স্ত্রী ছাড়া স্ত্রীলোক আর কে হবে? সে লাফিয়ে পনি থেকে নেমে, জেনকে তেমন নামিযে নিয়ে পনিদুটোর লাগাম তাদের পিঠে জুড়ে দিয়ে, জেনের ডাক্তারি ব্যাগ জেনের হাতে দিযে, এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে জেনের হাত ধরে পোস্টঅফিসের দিকে ছুটতে শুরু করলে।

তারা শুনলে, অন্ধকার পোস্টঅফিসে কেউ বলছে, আলো নিবেছে, সুচি, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, সাড়া দাও।

ময়ূর চিৎকার করে বললে, ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে আমি, মেয়র, এসে গেছি। দরজা খুলুন মাস্টারমশাই। এই যে আলো ধরছি। আমাব সঙ্গে ডাক্তাবও আছেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১

তাসিলা থেকে ইলেকট্রিসিটি বিদায় নেবার পরে, আটদিন পার হযে যাচ্ছে। ডিসেম্বর মাস আর বছরটাও শেষ হতে চলেছে। ২৫শে ডিসেম্বর এসে যাচ্ছে। ময়ূর সেদিন বিকেলে গত কয়েকদিনের কথা ভাবছিল।

সেই আলো নেবার রাতে পোস্টমাস্টারকে আলো জ্বালতে বলে, টর্চের আলোয় সুচেতনাকে তাদের বসবার ঘরে খুঁজে পেয়ে, বিছানায় এনে শোয়ানো হয়েছিল। পনির স্যাডলপমেল থেকে ওষুধের ব্যাগ খুলে এনে জেন একটা ইনজেকশন তৈরি করছে, ততক্ষণে পোস্টমাস্টার আলো জ্বালতে পেরেছিল, বলেছিল, ভয় নেই, সুচেতনা, দেখো মেয়র, দেখো তার পিঠে রাইফেল, দেখো ডাক্তারও আছেন। তুমি তো জানতেই ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে। দেখো, তোমার ঘরে এই পেট্রল-

ল্যাম্পে কত আলো। তখন পোস্টমাস্টারের নাকের দুপাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। সুচেতনা পনের মিনিটে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন ম্যাডাম, ভয় নেই, কাল সকালেই আসবো, বলে ক্লুটলং এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।

তখন রাত হয়েছে, জেন কি একা ক্লুটলং যেতে পারে? উপরন্ত বললে, এত রাতে তুমি কী রান্না করবে, ময়ূর? চলো, আমার খাবার ভাগ করে খাবো। পথে সুচেতনা সম্বন্ধে, তার কাছে আশ্চর্যজনক, এমন কথা বলেছিল জেন। সুচেতনাকে হজমের ওষুধ, আর হালকা ধরনের ঘুমের ওষুধ নাকি দিচ্ছে। ঘুমের ওষুধ হালকা রাখতে হয় এ অবস্থায়। কারো কারো, ক্বচিৎই, মাথায় সামান্য গোলমাল দেখা দেয়, ছেলেপুলে হয়ে যাওয়ার পরে সেরেও যায়।

সে জিজ্ঞাসা করেছিল, বোকার মতো হয়েছিল কথা, কেন ছেলেপুলে এই অন্ধকার তাসিলায় আসবে?

আর একটু ইতস্তত করে জেন বলেছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানকে পাপের প্রমাণ মনে হতে পারে কারো। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষটা সম্বন্ধে লুকানো তীব্র বিদ্বেষ থাকতে পারে।

পরে মেয়র-বাংলোর আস্তাবলে পনিদুটোকে রেখে তারা ক্লুটলং-এর পথে টর্চের আলোয় হেঁটে হেঁটে চলেছিল। সারাদিন পনির পরে সে রকম তাদের ভাল লাগছিল।

তখনই কিন্তু, ময়ূর ভাবলে, ওটাই সূত্রপাত, তেমন অন্ধকারে কারো আসা। জেন পাশাপাশি যেতে যেতে বললে, একটা কথা বলো, ময়ূর, তুমি কি বুকে কোন অসুবিধা বোধ করোই? এখনও করছো?

সে নিজে এরকম কিছু বলেছিল, না, কই? হ্যাঁ, সে কখনো কখনো। আসলে আমি গোড়া থেকে তো পাহাড়ের মানুষ নয়, এই সব ওঠানামায়–

জেন তখনই ময়ূরের এক হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকে রেখে বলেছিলে, দেখো এখানে। আজ সারাদিন হেঁটে পনিতে পাশাপাশি সমান ওঠানামা করেছি। তোমার নিঃশ্বাসও সমান নয়। কষ্ট হচ্ছে?

বাংলোয় পৌঁছে হতভম্ব হয়ে বসে থাকা থেনডুপ, পেমা, নামগিয়ালকে দেখে জেন হেসে বলেছিল, আজও তোমাদের কষ্ট দিলাম। আমাদের দুজনের খাবার টেবলে রেখে, ট্রেতে করে নামগিয়ালকেও খেতে দাও। থেনডুপ, পেমা কি তোমাদের বাড়িতে রান্না করেছে?

তারা চলে গেলে একসময়ে রাতের খাওয়াও শেষ হয়েছিল। তখন জেন বলেছিল, আর কয়েক ঘণ্টা তো রাত। রাতে একা চলতে তোমার ভয় করে না জানি, কী হবে এত রাতে তাসিলায় ফিরে গিয়ে? গল্প করে কাটিয়ে দেখা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বলেই উঠে পড়েছিল। নিজের বিছানায় তাকে শুতে দিয়ে, নিজে স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে নিজে লাইব্রেরিতে শুতে যেতে যেতে মত বদলাল, বলল, কিছু মনে করো না, ময়ূর, আমি আজ একটু পরীক্ষা করবো তোমাকে। ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম করেছো। আমার মনে হয়, আমি এর আগেও তোমার মুখের চেহারা বদলাতে দেখেছি, হাঁপাতে শুনেছি যেন।

সেই সতেরর রাতেই জেন তাকে বিছানায় শুইয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেছিল স্টেথো দিয়ে, নাড়ি গুণে। তখন সেও স্বীকার করেছিল, কখনো কখনো তার বুকে ব্যথা হয়, কখনো বুক যেন জোরে চলতে চায়, আর কেউ যেন তা চলতে দেবে না বলে চেপে ধরে। কিন্তু এরকম কি সকলেরই হয় না?

জেন বিছানাতেই বসে পড়ে বলেছিল, তোমার বুকের যন্ত্রটাকে যদি ভগবান বানাতে ভুল করতেন, তা হলে তুমি কি এমনটা হও? জেন হেসেছিল, বলেছিল, আচ্ছা তুমি কি জানো, তোমার মা, তুমি যখন পেটে, তখন খুব বাঁশের কোঁড়ার তরকারি খেতেন কি না। তা না হতে পারে। সে আমার এক সহপাঠীর মা। তার মা বাঁশের কোঁড়ার তরকারি খেতেন বলে সে বেচারা সাড়ে

ছ-ফুট ছাড়িয়েছিল। তো তোমারও নাক নাড়া উচিত নয়। কারো মাথা যদি রেলকামরার ছাদ ছোঁয়া হয়! কী মুস্কিল, আমার এই নিচু ঘরের সিলিং ফুটো করে উঠবে তোমার মাথা আর বাড়লে।

এসব কথায় সে নিজে হাসলে, জেন বলেছিল, একটু বেশি পরিশ্রমই তোমার হয়। এখন নির্জন তাসিলায় তার মেয়রের কাজ কমবে আশা করি। আচ্ছা, তুমি কি খুব বেশি আর খুব গভীর করে ভাবো? যারা খুব বেশি করে ভাবতে যায়, তাদের কারো কারো বুকের একটু তাড়াতাড়ি চলা অভ্যাস হয়ে যায়। ব্যথাও হতে পারে। আসলে সারাদিনের পরিশ্রমের পরে পোস্টমাস্টারের স্ত্রীর ব্যাপারটা তোমাকে ধাক্কা দিয়ে থাকবে। অন্য অনেককে হয়তো দিতো না। আসলে কবিরা আর ধার্মিকরা ছাড়া কারোও বেশি ভাবা উচিত নয়। বুকের কষ্ট বাড়ে। কিন্তু আমাকে ডাক্তার বলে একটু মানো। চড়াই-উৎরাই বেশি করবে না। একদম সেরে যাবে। আমি পাশের ঘরেই, দরজা খোলা থাকবে, একদম ভাববে না।

২

এখনও কিছুক্ষণ এই বিকেলের আলো থাকবে। আজ চব্বিশে। ময়ূর ভাবলে, পরের দিন সকালে তার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। পেমা চা এনে তার ঘুম ভাঙিয়েছিল। একি সত্য হতে পারে, অনেকদিন পরে সে স্থির হয়ে ঘুমিয়েছিল। তা কি এ জন্য যে পাশের ঘরে খোলা দরজার ওপারে জেন ছিল, আর ম্যাডাম ডাক্তার বলে? সে কি জিজ্ঞাসা করবে ম্যাডামকে, বিছানায় বিশ্রামে কেন অসুবিধা, আর অন্ধকারের চড়াই-উৎরাইএ কেন বরং স্বস্তি?

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবলে জেন মধুর বাক্সর কথা তুলেছিল। বলেছিল, ময়ূর তোমার আপেল, নাসপাতি, কমলা কিছুই ফলেনি যে জ্যাম করি। মধু থাকলেও মুখ বদলাতে। তোমার অর্কিডের মধু কি শুধু ফেজ্যান্টরাই খায়? তোমার বনে কি হানিবি থাকে না?

তখনই মৌচাযের কথা হয়েছিল। জেন বলেছিল, মধুর বাক্স হলে, থেনডুপ তার পোলট্রির সঙ্গে মৌচাষ করতে পারতো। ফল হোক আর না হোক, ফসলের জন্যও মৌমাছি ভালো।

থেনডুপ বলেছিল, তা হলে চায়ে আর চিনি দিতে হবে না। নামগিয়াল বলেছিল, সে চা মুখে দেয়া যাবে না। তবে গ্রেগরী ফাদার বলতেন, গরম জলে মিশানো মধু সবচাইতে ভালো। তাকেই ম্যানা বলে। জেন খিল খিল করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, নামগিয়াল, তুমি আর তোমার ফাদার গ্রেগরী, আর তোমাদের বাইবেলের গল্প! হয়তো ইজরায়েলি পাহাড়গুলোর গুহায় মৌচাক ছিল। আর মোজেজ সেটাকে ম্যানা ইন ডেজার্ট, মরুতে অমৃতবর্ষণ বলে চালিয়েছিল। পাগল হয়ে বাঁচল একজন। শান্তি কি পাও?

কিন্তু হাসতে হাসতেই মধু চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে। মধুর বাক্স আনতে আজই নরবু জেলা সদরে গেল। পোস্টমাস্টারই খবর দিয়েছেন। ম্যাডামকে তো রোজই যেতে হয় পোস্টঅফিসে ডাক্তারি করতে। সেই মধুর আলাপের পরের দিন সকালে পোস্টঅফিসে রোগী দেখা শেষ হলে মধুর বাক্স, মৌচাকের কথা তুলেছিল জেন। আর পোস্টমাস্টার বলেছিল, সে যখন জেলা সদরে চাকরি করতো তখন সেখানে অ্যাগ্রোইনডাস্ট্রি বিভাগে মৌবাক্স বিক্রি করতে দেখেছে। কি করে আনা যায় বাক্স, জেলা সদরের সঙ্গে আলাপ করে খবর নেবে। সেই পরে জানিয়েছিল, পাওয়া যায় মধুবাক্স, আর তারা বলেছে বাক্স কেনাই শুধু নয়, দিন সাতেক ট্রেনিংও নিতে হয়। তাহলে মধুর বাক্স নিয়ে নরবুর ফিরতে মাস শেষ হবে।

পোস্টঅফিসে রোগী দেখে জেন শর্মাদের বাড়িতেও রোগী দেখতে গিয়েছিল। জিনের উপরে

গলা পর্যন্ত উঁচু সোয়েটার, তার উপরে স্টেথো, আর হাতে ডাক্তারি ব্যাগ। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় কথা হচ্ছিল। নির্জনতায় নির্জনতা নিয়েই কথা হচ্ছিল। পোস্টঅফিসের ধারে কাছে কেউ নেই। ফরেস্টকলোনিতে রেঞ্জারের বাংলোটা আছে। নির্জন। নাকি রোজা থাকে একা? ফরেস্ট-কলোনিতে দু-তিনটে বাড়িতে দুএকজন ফরেস্টগার্ড থাকে। তারা তো সারাদিন কোন বনে বনে ঘোরে। দূরে দূরে বস্তিতে কয়েকজন করে নিরুপায় স্থায়ী বাসিন্দারা হয়তো থেকে গিয়েছে।

সে সময়ে জেন বলেছিল, আচ্ছা, ময়ূর, এটাও কি ধর্ম যে মেয়রকে মেয়র-বাংলোতেই থাকতে হবে? যেমন নামগিয়াল ক্লুটলং-এ একা থেকে গিয়েছিল? রেঞ্জারের বাড়িতে রোজা একা, তবু তো কাছাকাছি আস্তাবলে তোমাদের পনিদুটোর সহিস থাকে। এমন কেন হবে না, যে রোজা না হয় মেয়র-বাংলোয় এসে থাকুক, তোমার সঙ্গে দুজনের রান্না করুক?

বলেছিল, চড়াই উঠছি বাজারে। আস্তে চলো।

জানা ব্যাপারই। সেদিন তো হাটবারও। আটদশ জন মাত্র কেনাবেচা করছে। আর তার ফলেই আশ্চর্য হতে হয়, শর্মা আর অসওয়ালের দোকান তখনও আছে। যদি বলা হয়, এই ডাক্তার থেকে রোগীদের দূরে নেবে না বলেই তারা এখানে থেকে গিয়েছে, তা হলে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। প্রমাণ হয় না কি তাদের দোকান চলে সীমান্তের ওপারের ভরসায়?

৩

সেদিনই বাজার থেকে মেয়র-বাংলোর দিকে ফিরতে ফিরতে জেন বলেছিল, মিস্টার মেয়র, আমার উচিত হচ্ছে আপনাকে ফর্ম্যালি নিমন্ত্রণ করা। তারিখ মনে আছে তো? ক্রিস্টমাস ইভে তোমার ক্লুটলং-এ থাকা চাই। দেখো আবার কোন ডিউটিতে চলে যেয়ো না। ক্রিস্টমাস ইভে নামগিয়ালরা উৎসব করবে। চব্বিশের রাত বারোটায় চার্চের ঘণ্টা বাজাবে। তার আগে আমরা মোমের আলোয় ডিনার করে নেবো। রাত বারোটায় তো বড়দিন শুরু, তখন আমরা একটু ভালো মদ সিপ করতে করতে গল্প করবো।

কালই তো। সেই বড়দিনের সন্ধ্যার আগের দিনের সকালে সে অর্কিডগলি ওক প্লান্টেশন থেকে অর্কিড সংগ্রহ করেছিল। ফুলেল অর্কিড শিকড় বসিয়েছে, এমন ছোট ছোট গাছের ডাল টুকরো টুকরো করে ম্যাডামের বাংলোর বারান্দায় সে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

কখনও বা এক উৎসবকে দীর্ঘ করার ইচ্ছা থাকে। কাল রাতেও ডিনারেও অনেক আলো জ্বালানো হয়েছিল। তারপরে থেনডুপ আর নামগিয়াল চার্চে মোমবাতি জ্বালাতে গিয়েছিল। তারা ফিরে এলে ডিনারে বসা হবে। তখন ম্যাডাম আর সে সেই অর্কিড ঝোলানো বারান্দায় গিয়েছিল, সেখানেও নামগিয়াল মোম জ্বালিয়েছে।

সেখানে অর্কিডলতাগুলোর নিচে দাঁড়িয়ে জেন বলেছিল, বিলেতে সেই সন্ধ্যায় মিসেলটো ঝোলায়। দেখো, আজ স্টেথো রেখে দিয়েছি। সকলেই যে আজ সুস্থ থাকে। কাল বই পড়ছিলাম। তোমার অনুভূতি তুমি আমাকে বলো না, উদ্বেগ তোমার মুখে স্পষ্ট হয়, অথচ বলো না। যদি এত নিঃসঙ্গ না হতে, ভাল হতো। এমন কি যদি গ্রেগরীর মতো চার্চে যেতে, ভাল হতো। তুমি কিন্তু একটা কাজ করতে পারো, মেয়র। এখন কিছুদিন পথ চলতে পনি ব্যবহার করো। তুমি ভাববে না, বলো।

ডিংডং করে চার্চের ঘণ্টা বাজল। সে কী, এখনই কি মাঝরাত, এরকম বলেছিল সে। কিন্তু ঘণ্টা তখনই থেমেছিল, আর জেন বলেছিল, কাল মাঝরাতে অনেকক্ষণ বাজাবে বলে দড়ি পরীক্ষা

করলে ওরা।

কাল ডিনার শেষে জেন তার একটা হাতে নিজের কয়েকটা আঙুল রেখে বললে, তোমাকে একটা মাস ক্লুটলং-এ থাকতে হবে, ময়ূর। না হয় পনি করে মেয়র-বাংলো একবার দেখে এসো। তুমি কি জানো মিসেলটোর নিচে যুবকদের কিছু করার নিষেধ নেই। জেনের গালের রং গভীর হয়েছিল। যেন তা লাল অর্কিডের ছায়ায়, সে কিন্তু কাল। বললে, মনে করো, ময়ূর, আবার কোন একদিন আবার যদি আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করা ভয় পাই।... আচ্ছা, আচ্ছা, আমি কি তোমাকে গ্রেগের পাগলা হওয়ার কথা বলেছি? গ্রেগরী কিভাবে সময়ে পিছিয়ে যেতে যেতে পাঁচশো বছর যেন পিছিয়ে গিয়েছিল। নামগিয়াল সব বলেছে। পাঁচশো বছর আগেকার সন্ত, যাকে দেখলে আমাদের উন্মাদ মনে হবেই।

ডিনার খাওয়ার পরেও জেন তাকে তাসিলায় ফিরতে দেবেনা। রাত বারোটা পার হতে দেখতে হবে। বলেছিল, বাইরে ওরা ডিংডং ঘণ্টা বাজাবে। পোস্টমাস্টার আমাকে খুব ভাল ব্যাটারি ও স্টিরিও আর রেকর্ড দিয়েছেন, জানো? একটা সুন্দর শান্ত মধুর নেটিভিটি হিম আছে। আমি গির্জায় গেলে তুমি শুনবে। তারপর দুজনে আরও সেরকম সুন্দর মধুর বাজনা শুনবো যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ি।

৪

আজ দুপুরেই জেন যখন রোগী দেখতে পোস্টঅফিসে তাকে বললে নরবু, দিন ভালো আছে, আজই সে মধু আনতে রওনা দেবে। দিন ভালো? ও আচ্ছা। তাকে আর নরবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাডাম পোস্টঅফিসে গিয়েছিল আর সেখানে পোস্টমাস্টারের কাছে শহরের মধুবাক্সের ঠিকানা বুঝে নিয়েছিল।

নরবুর সে এক অদ্ভুত অবস্থা। ভয় ভয় যদি, যাবে কেন? লিম্বু যেতে পারতো। ভয়কে জয় করার চেষ্টা বরং বলা যায়। সে পাহাড়ি ভাষায় বলেছিল, একদিন বেরোতেই হবে, তোমার কুকুরকে নিয়ে যাই, আর আমরা কুকরি তো আছেই।

মেয়র-বাংলোয় কুকুরটা। যে জন্যই যেন ময়ূর তার সঙ্গে মেয়র-বাংলো যাবে স্থির করেছিল। ম্যাডাম পোস্টমাস্টারের সঙ্গে সুচেতনার চিকিৎসার কথা বলতে বলতে বলেছিল, তা হলে সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ময়ূর?

পথে বেরিয়ে সে বলেছিল নরবুকে, আচ্ছা ভয় কি নেই দ্রুকের দলকে? আচ্ছা তুই যদি জানতিই ওদের পথটাই ওক প্লান্টেশন দিয়ে, সেই রাতে আমাকে ভয় দেখালি না কেন? যেতাম না, সেই টর্চ ভাঙার ব্যাপার হতো না। আর নরবু আগে যেমন, সেদিনও বলেছিল, আমি তখন শুধু মদ খাই, ওদের নেশা খাই না, টাকা পয়সা লিন্দাই না। ওদের কথা তোমাকে, তোমার কথা ওদের কেন বলবো?

তাসিলা রোড স্টেশনে নরবুকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার পর থেকেই তো সে বিশ্রাম নিচ্ছে বাংলোর বারান্দায় এই চেয়ারটায়। হতে পারে বুকটায় তেমন আইঢাই করে বলেই মনে যন্ত্রণা, কিংবা মনে যন্ত্রণা বলেই বুক তেমন করে। একটা কমলে অন্যটাও কমতে পারে। সে ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে দিল। নেমে আসা শীতের মধ্যে এখানে এখনও দুপুরের জমা উষ্ণতা। বিকেল হয়ে আসছে। আজ সন্ধ্যা থেকে জেন ম্যাডামের উৎসব। বাংলোর বারান্দায় নিশ্চয় ময়ূরের প্রথমে চোখদুটি, পরে ঠোঁটদুটি হেসে উঠল। মুরগী? না, সিলভার ফেজ্যান্ট। নিচে লনের উপরে সারিবদ্ধ

চলেছে। দেখো, একটা বারান্দায় উঠল। এই কয়েকদিনের অন্ধকারে আর নির্জনতায় কত সাহস পেয়েছে, যে মানুষের বাংলোয় ফেজ্যান্ট।

তা তো হয়ই, ময়ূর ভেবে চললে, পরশু দিন দুপুরে ফোর্টের টিলায় যখন মতিযাবাঘের নতুন পায়ের ছাপ দেখতে উঠেছিল, তখন মনে হয়েছিল পুরনো ফরেস্টকলোনির ভাঙা ঘরগুলোর চারপাশে, ফোর্টের টিলার নিচে, খেলার মাঠে, এই কয়েকদিনেই ঘাসগুলো যেন আধহাত করে বেড়েছে।

আশ্চর্য নয়? সে ভাবলে, ফরেস্টের পাড়াটায় লোক নেই। রেঞ্জার-বাংলোতে রোজা। আর এদিকে এই বাংলোয় সে। বাজারের কাছে কিছু মানুষ, পিচপথটার দুধারে বস্তিতে কয়েকটি পরিবার। আর সব তো যার যার নিজস্ব জঙ্গলের আড়ালে লুকানো বাড়িতে। রাতে কখনও মিট মিট আলোয় ঠাহর হয়। দিনের বেলায় মনে হয় না মানুষ আছে। দূরে ক্লুটলং-এ তবু মানুষের সাড়া। এদিকে পোস্টঅফিসও কেমন যেন এক গভীর স্তব্ধতায়।

ফেজ্যান্টরা জোরে শব্দ করে উড়ে পালাল। এরকম ভয় পাওয়ার মতো তাদের ওড়ার কথা নয় তো। ধোঁয়াটে হয়ে আসা আকাশে কি আবার বিদ্যুৎ চমকাল? খানিকটা আগেও কি একবার চমকেছিল? তখন আকাশে আলো ছিল বলে কি চোখে পড়েনি? পাহাড়টার ওপারে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে বোধ হয়।

তো, নরবুর সঙ্গে যেতে সে আস্তাবল থেকে পনি নিয়েছিল! আর ফেরার পথেও ধীরে সুস্থে উঠেছিল। তিন ঘণ্টায় পনিতে এখান ফিরে আসার কথা। ফিরতে আড়াইটা হয়েছিল দুপুর। নারেঙ্গিহাটে উঠে আসতেই এগারোটা বেজে গিয়েছিল। সেখানে বিট অফিসারের ঘরে বসে, বিশ্রাম করে, তার অনুরোধে সেখানে খেয়ে, আধঘণ্টা শুয়ে থেকে তার পরে আবার পনিতে উঠেছিল। ওটা যদি তার বুকের এক বাজে অভ্যাস, তবে সে যন্ত্রণা কমা কি ভালো হয়? কবে আর সে পনিতে যাওয়া আসা করে? জেন বলেছে বলেই এই ব্যবস্থা। হয়তো, জেন যেমন বলেছে, ধুপপুক কম হলে হয়তো অনুভবের যন্ত্রণাও কমে। হয়তো অন্ধকার রাতে কিছু স্নিগ্ধতা খুঁজতে তেমন ঘুরতে হয় না।

না, এ ভাবাও ভালো না। সে ভাবলে, তার চাইতে... নারেঙ্গিহাটের বিট অফিসার খেতে বসে বলেছিল, উইলিয়াম নাকি মানুষ মেরেছে। তা নাকি উইলিয়ামের মড়ি বাইসনটাকে সরাতে যাওয়া মানুষ। ক্ষুধার্ত মানুষ যে কী রকম করে! কিন্তু সে ভেবে কী করে? ডিএফও ভাবছেন।

তার চাইতে... সে আজ আবার, সে ভাবলে, স্টেশনের কাছে আবার সেই নান্নী বুড়িকে দেখেছিল। বুড়ী আজও তার ডালপালা খাড়া করে তৈরি বেড়ার মধ্যে কিছু জ্বাল দিচ্ছিল আগুনে। সে পনির লাগাম ধরে সেখানে বসেছিল একটা পাথরে। তেমন খেয়াল করে নি আগের বার, আজ কিন্তু দেখে, ভাবতে গিয়ে অবাক লেগেছে। জরার দাগ পড়া ময়লা লাগা হলুদ মুখে, তোবড়ানো গালে, চোখা নাকে, ম্লান হয়ে আসা নীল জাতের চোখে তাকে বিদেশী মনে হয়। হয়তো বাজারের নিচে যেসব বিদেশী ক্যাপটেন, লেফটেন্যান্ট, সার্জেন্টদের গোরস্থান তাদেরই কারো হয়তো, মা তাসিলার। আশ্চর্য কোথায় সেই গোরা গোরা বিদেশীরা?

সে মনে করতে পারলে, দাওআ সাবধান করেছিল। সেই জরাজীর্ণ বুড়ীর এক অদৃশ্য প্রভাব আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকি প্রকৃতপক্ষে, না ডাইনী নয়, তাসিলা বুড়ী। আহা এখন তো পরিত্যক্ত রেঞ্জার বাংলোয় রোজাও দিনে দিনে বুড়ী হয়ে যাবে। নান্নী যা হয়েছে, তেমন।

না, না। তার চাইতে...সে মনে করলে, নারেঙ্গিহাটের দৃশ্যটা ভালো ছিল। পথের বাঁ দিকের বনে গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে তাঁবু আর মানুষ দেখে সে অবাক। পুলিশ? মিলিটারি? আর শ দুই-তিন মিউল। টাইগার রিজার্ভে এত মানুষ, এত মিউল!

সে ভেবে কী করে? নারেঙ্গিহাটে গার্ডরা আছে। বিরিক ব্লকে বিট অফিসার আছে। এখন কিন্তু শীতভাব হচ্ছে। সন্ধ্যাও নেমে আসছে। ময়ূর মনে মনে বললে, আজ তাসিলার স্টেশনে যাওয়া হল। কিন্তু এখন কি এসব ব্যাপারে ডাক্তারের মত নিতে হবে? অবশ্য কথাও রেখেছি, পনিতে যাওয়া আসা করেছি, বিশ্রাম নিয়েছি। এদিকে কিন্তু, ম্যাডাম বলতে পারেন না, সব পুরুষেরই এরকম হয় কিনা। যেমন আমাদের পোস্টমাস্টার, আমাদের রেঞ্জার। আমি কখনও তাঁদের ভাবতে দেখেছি। তাতে তাঁদের মুখের ছবি বদলাতে দেখেছি যেন। আর এখানে এখন যা হচ্ছে তা আর একটি প্রশান্ত বুকের কাছে না গেলে কি ধরা পড়ে?

দূরের মেঘটা হঠাৎ কাছে এসে গেল। জোলো বাতাসটা শরীর কাঁপিয়ে দিল। সে ঘরে গিয়ে আলো জ্বালতে বারান্দা থেকে উঠল। মেঘটা পাহাড় ডিঙিয়ে এল এবার। ঝড়ো বাতাসে ভর করে বৃষ্টি নামল এ দিকের পাহাড়েও। জোর বাতাস টিলায় টিলায় ধাক্কা খেয়ে নানা রকমের শব্দ করছে, দেখো।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘরের শার্সির পিছনে বৃষ্টি দেখতে সে আলোর পাশে বসল।

এই বৃষ্টি ধরলে তবে ক্লুটলংএ যাবে, না হয় পনিতে। সেখানে আজ উৎসব রাত। সে ভাবলে, মানুষের মন কি তার হৃৎপিণ্ডে থাকে যে মন যখন মাথা খোঁড়ে হৃৎপিণ্ডও অস্থির হয়?

একবার বিদ্যুৎ চমকালে, আর সে দেখলে কেউ যেন বাংলোর সেই ব্রিজের উপবে ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে এগোচ্ছে। আশ্চর্য! কে আসছে এখন এখানে? সে দরজা খুলে বাইরে আসতেই বারান্দায় জলের ঝাপটা তাকে ভিজিয়ে দিল। কী আশ্চর্য, এ যে পোস্টমাস্টার!

৫

পোস্টমাস্টার শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, মেয়র, মেয়র, সুচেতনাকে কোথাও পাচ্ছি না। ইন্দ্রবাহাদুরদের সুচেতনার কাছে রেখে ক্লুটলং-এ ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ঝড়ের ভাব দেখে একবার মনে হল, সুচেতনার কাছে ইন্দ্ররা রয়েছে, আর একবার মনে হল, ঝড় দেখেই তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারে সুচেতনা। এসে তাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। পাশাপাশি বাড়িগুলোতে খুঁজেছি, সেখানে নেই।

আলোর থেকে দূরে বাইরে তখন গাঢ় অন্ধকার। ধারাবর্ষণের গতিকে অন্ধকারে অন্ধকার গলে পড়া মনে হচ্ছে। শুধু গলিত পিচ সে রকম ঠাণ্ডা হতে পারে না। ঝড় টিলায় টিলায় শব্দ করছে। বৃষ্টি টিনের ছাদে ছাদে গুম গুম করছে।

ময়ূর অবাক হয়ে শুনলে, গভীর করে ভাবলে। বললে, আপনার পোস্টঅফিসের ধারে কাছে যে বাড়ি কয়েকটা তা দেখেছেন। তার থেকে দূরের সেই রেঞ্জের বাড়িগুলোতে যেতে সবই চড়াই আর পাকদণ্ডি। সুচেতনা তাঁর ভারি শরীর নিয়ে যাবেন না। যদি ধরে নিই ঝড়ের আগে সুচেতনা ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, যে সব পথ অপেক্ষাকৃত মসৃণ, চড়াই কম, ধীরে উৎরাই নামে, সে সব পথেই খুঁজতে হবে।

সে রকম পথগুলোতে ময়ূর আর পোস্টমাস্টার খুঁজতে বেড়াল। আরও এগিয়ে বাজারের নিচে সব বাড়িগুলোতে খুঁজলে। যদি কোন কারণে বাজারে কিছু কিনতে এসে ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়ে থাকে। যদিও যে কোনদিন বাজারে আসে নি, সে ঝড়বৃষ্টির মুখে কেন বাজারে আসবে, যদিও গোরস্থানের উপরে অসওয়ালদেরা দোকানগুলো বেশ খাড়াইতে, তা সত্ত্বেও সে অঞ্চলটাতে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে খুঁজলে তারা। পোস্টমাস্টার একবার বললে, সে যদি ইন্দ্রবাহাদুরদের

তাদের নিচু বস্তিতে পৌঁছে দিয়ে সেখানে আটকে পড়ে থাকে! তারা সেই নিচু বস্তিতে, আর সেখানে যাওয়ার পথে সেখানকার সব মানুষকে বিস্মিত করে খুঁজে বেড়াল।

ঘণ্টা দুয়েকে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। আশ্চর্য এই অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির রাতে একটা মানুষ এভাবে হারিয়ে যাবে! তাও শরীরের সে রকম অবস্থায়।

পোস্টঅফিসে ফেরেনি তো? এইভাবে সেখানে ফিরল তারা। সেই দারুণ শীতের বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গে ভিজে, হতাশায়, সারা শরীরে মনে সমান মুহ্যমান।

মুরলীধর পোস্টমাস্টার কেঁদে উঠল। সে রকম পুরুষমানুষের কান্না শ্রোতাকেও মুহ্যমান করে।

পোস্টমাস্টার কাঁদতে কাঁদতে বললে, হায় সুচি, হায় আমার সুচেতনা! মেয়র, মেয়র আমার পাপ, আমারই পাপ। একটা ভাল বিদেশী স্টিরিও, কিছু দুষ্প্রাপ্য বিদেশী রেকর্ড, কিছু বিদেশী ছবির প্রিন্ট যোগাড় করতে পাপ করেছি। এই তুচ্ছ জিনিসগুলোর জন্য পাঁচ-ছ হাজার জোগাড় করতে পারছিলাম না। যার জিনিস সে বিক্রি করে দিয়ে দুএক দিনে চলে যাবে। অবশেষে নিজের অফিসে গচ্ছিত দুখানা ইনসিওর চিঠি চুরি করেছিলাম। সেই টাকায় কিনেছিলাম স্টিরিও আর ছবির বই, কী তুচ্ছ, কী তুচ্ছ! একজন কেরানীর খুব বিপদ হয়েছিল। সেই ইনসিওরের কাজ করে। দিনের শেষে অফিসের সব ইনসিওর চিঠি আমার কাছে গচ্ছিত রাখার কথা। রেখেছিল। কিন্তু অনেক দিনের মতো সেদিনও সে আমার প্রাপ্তিস্বীকার নেয় নি। সেই কেরানীবাবু হাবোলকে পুলিশ ধরেছিল। সেদিনই তার বিয়ের দিন। বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। সে সেদিন অন্যমনস্ক ছিল, হাসিখুশি ছিল. আমাকে বিশ্বাস করে ইনসিওরের প্রাপ্তিস্বীকার না নিয়ে হাসতে হাসতে আমার আশীর্বাদ নিয়ে অফিস ছেড়েছিল। আর আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম সেই রাতে। মেয়র, আমি চেষ্টা করে তাকে বাঁচিয়েছিলাম কোর্ট থেকে। যাতে বেনিফিট অফ ডাউটে খালাস পায় তা করেছিলাম। নিজের উপরে কর্তব্যে অবহেলার দোষ টেনে এনেছিলাম। আমারই তো কর্তব্য ছিল, হাবোল অফিস ছেড়ে যাওয়ার আগে সে ইনসিওরগুলো দিয়ে গেল কিনা বুঝে নিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করা। সেই কর্তব্য অবহেলায় আমার এই নির্বাসন। চাকরিতে নেমে গিয়েছি। মেয়র, আমি অনুশোচনা করেছি। সেই পাপের সংগ্রহ স্টিরিও, ছবির বই বিলিয়ে দিয়েছি। পাপের সংগ্রহ ভোগ করছি না। সরকারের ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা থেকে। হাবোলকে ফাইন দিতে হয় নি। হাবোল আবার অন্য পাত্রী বিয়ে করেছে। কিন্তু সেই পাপে সুচেতনা আমাকে ভালোবাসতে পারে না, এখানে এভাবে থাকার অপমানে সে ম্রিয়মান। একটা প্রেমের মিলনকে ধ্বংস করে আমি অভিশপ্ত। কী তুচ্ছ পাপ!

সে তখন বলেছিল : এসব বলবেন না। এসব বলে কী হয়? সর্বাঙ্গে ভিজেছেন। পোশাক বদলান। তারপর একটা হ্যাজাক এখানে রাখুন, আর একটা সঙ্গে নিয়ে পিচপথ ধরে বিরিক ব্লকের দিকে যান। বৃষ্টির ধারা কমছে। যদি মনের অস্বাভাবিক ভয়ে এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে থাকেন, তবে বিরিক ব্লকের পথেই যাবেন। আর সে পথেই বৃষ্টিতে আটকে পড়ে কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন হয়তো। আমি দুর্গের টিলার তলা দিয়ে পুরনো ফরেস্ট কলোনির ভাঙা ঘরগুলোকে দেখে গ্রেগ অ্যাভেনু বরাবর যাবো। সে পথটাও সমতল, কম ঢালের উৎরাই। চড়াই নেই।

বাংলোয় ফিরে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিলে ময়ূর। সাধারণ দিনেও নিচু বস্তির পথে গিয়ে তখনই আসা সহজ নয়। শীত, অন্ধকার, বৃষ্টি, ঝড়, হতাশা তাকে অবসন্ন করেছে। হাত-পাগুলো যেন অসাড়। ভিজে ঘড়ি খুলে মুছে নিতে গিয়ে দেখলে আটটা বাজে। তিনঘণ্টা প্রায় হয়েছে খোঁজা। সে তখনই উঠে দাঁড়াল। কি ভীষণ কথা! এই দুর্যোগে সেই মহিলা, শরীরের সেই অবস্থায়, তিনঘণ্টার উপরে বাইরে। এই ঝড়ে বৃষ্টিতে।

সে পোশাক বদলালে। শীতের দাপটে গ্রেটকোট গায়ে চাপালে। তার উপরে ঝিরঝিরে সেই বৃষ্টির জন্য ম্যাকিনটশ। টর্চ নিলে। রাইফেলের দরকার নেই। তা হলেও ওদিকে বনের পথ। টাঙিটাকে

নিলে। ফার্স্ট এড কিট, তা এখনি সঙ্গে রাখতেই হয়।

ফোর্টের টিলার নিচে, খেলার মাঠে, ইতস্তত টর্চের আলো ফেলে ফেলে খুঁজলে সে। রেঞ্জারের বাংলোয় রোজাকে ডেকে তুলে তাকে সুচেতনার বিপদের কথা বুঝিয়ে, তার শরীরের অবস্থা বলে, জল কমলেই পোস্টঅফিসে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললে, পাছে সুচেতনা সেখানে ফিরে একা সেই বাড়িতে আবার ভয় পেয়ে আবার কোথাও চলে যায়। পুরনো ফরেস্টকলোনির পরিত্যক্ত ভেঙে পড়া ঘরগুলোতে খুঁজলে সে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে সেই হিমাঙ্কে নামা অন্ধকারে।

সব ব্যাপারটা যেন কেমন অপ্রকৃত বোধ হচ্ছে। এতক্ষণে মেঘ সরছে, অতি ক্ষীণ একটা চাঁদ যা মেঘের স্তর শেষ পর্যন্ত ভেদ করতে পারছে না। দুএকটা পদক্ষেপের স্মৃতি কিছুক্ষণ থাকছে, দুএকটা আলোকিত সময় কিছু এখানে ওখানে চোখে পড়ছে, নতুবা সব যেন অন্ধকারের প্লাবন। সে গ্রেগ অ্যাভেনু ধরে চলল।

এক সময়ে হঠাৎ তার মনে পড়ল, সে গ্রেগ অ্যাভেনুর সেই বিন্দু পর্যন্ত গিয়েছিল যেখানে পথটা অন্তত পঞ্চাশ গজ ধরে একটা উৎরাই সৃষ্টি করেছে ক্লুটলংএ পৌঁছানোর আগে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষা সেই জায়গাটা সব সময়েই স্যাঁতসেঁতে। এখন তো গজ পঞ্চাশ জায়গা জুড়ে জলের স্রোত টর্চের আলোয় প্লাবনের নদী, যা ডাইনের পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে পথটাকে ডিঙিয়ে বাঁয়ের খাদে পড়ছে প্রপাতের মতো।

ময়ূর থমকে দাঁড়াল। সেটা এখন তার পক্ষেও পার হওয়া সম্ভব হবে না। সুচেতনা যদি পার হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, যদি ততটাই বেপরোযা হয়ে থাকে, তবে তাকে দিনের বেলায় অনেক নিচে খাদে খুঁজতে হবে। সে ঘড়ি দেখলে টর্চের আলোয়। নটা বাজে।

সাধারণ সময়ে দিনের বেলা গ্রেগ অ্যাভেনুতে এতটা আসতে এ রকম সময়ই লাগে। কিন্তু ফোর্টের নিচে, পুরনো কলোনিতে, গ্রেগ অ্যাভেনুর সেই উৎরাই পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসায় অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, সেই খুব তাড়াতাড়ি দৌড়েছে। ভালো হয়নি এত তাড়াতাড়ি হাঁটা। বুকের ভিতরে—ওদিকে কিন্তু জেন, সেই ডাক্তার, বলেছে, ছুটোছুটি কোরো না। তা ছাড়া ভাববে কেন? সুচেতনা কে তোমার? সে বুকের উপরে হাত বুললে। এমন কি সে তো ডম্বরির মতো এক কিশোরীও নয়, যে মনে হবে অনেকদিন পরে তোকে পেলাম, কোলে আয়।

কিন্তু ওটা ভুল করেছে সে, গ্রেগ অ্যাভেনুর উৎরাইটা ভাল করে না দেখে আসা। কাল সকালে খুঁজলে একটা মৃতদেহই পেতে পারবে।

সে আবার গ্রেগ অ্যাভেনু ধরে ফিরতে লাগল। এখন কি হতে পারে সুচেতনা ক্লুলটং-এ ডাক্তারের কাছে যেতে চেষ্টা করছিল? সে গতিটাকে ধীর করলে, কিন্তু নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতে সে চারদিকে আরও বেশি করে খুঁজতে খুঁজতে এগোল। এখানে পথের দুপারেই বন। সে একবার অনুভব করলে বৃষ্টিটা কিছুক্ষণ থেকেই গুঁড়িগুঁড়ি মাত্র। কতক্ষণ থেকে? গাছের পাতার থেকে জল ঝরার শব্দ হচ্ছে, বাতাস নড়ে উঠলেই।

যাওয়ার সময়ে যেমন, ফেরার সময়েও তেমন, পথের উপরে, পথের এক পারের খাদ আর পথের মধ্যে যে গাছের সারি, তাতে অন্য পারের থেকে জল নামার ফলে, পশুদের চলাচলের ফলে তৈরি গাঢ় বনের মধ্যে নেমে যাওয়া সরু সরু পায়ে চলা চোরাপথগুলোতে তেমন আলো ফেলে ফেলে দেখে দেখে চলল সে।

বনের সেই বড় রঙীন ছবির হোর্ডিংটার গজ দশেক আগে তেমন একটা চোরা পথের সামনে তাকে থেমে দাঁড়াতে হল। সেই পথের মুখে বৃষ্টিতে ভেজা, কাদা মাখা, কিন্তু নতুন চকচকে একপাটি স্যান্ডাল টর্চের আলোয় যেন পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল। এই প্রথম যেন এক নিষ্ঠুর সত্যর মুখোমুখি হল। কী আশ্চর্য, সে কি মনে মনে এই আশাও ধরে রেখেছিল, বিরিক ব্লকের বনের কোথাও

পোস্টমাস্টার তার স্ত্রীকে খুঁজে পেয়ে বাসায় নিয়ে গিয়েছে?

রাত নটা বেজে গিয়েছে কখন। সেই অন্ধকারে সেই শুঁড়িপথটা, যা ক্রমশ সেই ওক প্লানটেশনের গলিতে গিয়ে পৌঁছাবে, তা ধরে সে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার একবার পোস্টমাস্টারেব গল্প যা এক ভয়ঙ্কর অধঃপাত আর নির্বাসনের, আর একবার তার কান্না মনে এল। তা হলে সুচেতনা কি ক্লুটলং-এ যাওয়ার ইচ্ছা ভুলে গিয়ে আবার বনে পালানোই ভালো মনে করেছিল? কী আশ্চর্য, সব চিন্তা কেমন মনে আসতে থাকে, দেখো, বললে সে নিজেকে।

অন্য সময় হলে অনেক ভাবা যেতো। অনেক দুঃখ করা যেতো, পোস্টমাস্টাবেব মতো একটা চকচকে সুন্দর মূর্তিকে মাটির তালের মতো গলে যেতে দেখে।

এই পথটা কম বিপদের নয়। সে একটা সল্টলিকে মোড় নিয়ে অবশেষে সেই গলি, যা দ্রুকদের চলার পথও...সে স্তম্ভিত হয়ে থমকে দাঁড়াল। ডালপালা ছড়ানো প্রথম ভারতীয় ওকটার নিচে, একটা উঁচু চাঁই পাথরের অর্ধেক আড়ালে, কাউকে কনুইযে ভর রেখে ভেজা মাটিতে অর্ধেক শোওয়া অবস্থায় দেখা গেল। সত্যিই? টর্চের আলোর ধাঁধা নয় সেই উজ্জ্বল শাড়ীর অংশ?

কী করবে সে? কি করে নেয়া যাবে শহরে? সে নিজের গায়ের ম্যাকিনটশটা খুললে। তা দিয়ে সব কিছু ঢেকে দেবে?

জেন বলেছেন, পরিশ্রম কোরো না, ভেবো না, এদিকে দেখো বুক কেমন মোচড়াচ্ছে। কেমন ক্ষেপে যাচ্ছে। সুচেতনাই তো? মুখ দেখা যায় নি, কিন্তু তার চকচকে চুলে আলো পড়েছিল। কী করবে? দৌড়ে গিয়ে পোস্টমাস্টাবকে ডেকে আনবে? সে এগিয়ে গিয়ে ম্যাকিনটশটা দিয়ে ঢেকে দিল, আব সেই সময়ে যেন প্রথম তার কানে এল এক সদ্যোজাতের ভীষণ-করুণ কান্না।

ময়ূর মনে করতে পাবছে না, কী কী ঘটছে পরপর। বাতাসের চাপা গোঙানি, পাতা থেকে পাতায় জল পড়ার শব্দ, নিজের দ্রুত নিঃশ্বাসের শাইশাঁই, তার মধ্যে সেই ভীষণ কান্নাই কী প্রথম শুনেছিল, অথবা সুচেতনাকেই প্রথম দেখতে পেয়েছিল?

এই সময়ে একটা ব্যথা, এক হাড় কাঁপানো শীত, এক দারুণ বিতৃষ্ণা, যার অন্য নাম পাপবোধ, পোস্টমাস্টারই তো তাকে পাপের কথা বলেছে,--তাকে পাথর করে দেবে যেন। সে উঁচু পাথবটার অন্যপাশে মাটিতে বসে পড়ল। চারিদিকে হিমাঙ্ক-ছোঁয়া অন্ধকার, যা এক অব্যক্ত অনুভূতিরও, সময়ের সব বোধ সে অন্ধকার গিলে ফেলেছে। সময়ের কথা মনে হতেই, সে ঘড়িতে আলো ফেলে দেখলে দশটা বাজে। কী সর্বনাশ! তা হলে সে কি আধঘণ্টা বসে বসে কাটিয়েছে নাকি এখানে?

সে লাফিয়ে উঠে, ডাক্তার জেনকে আনতে ক্লুটলং-এর দিকে পড়িমরি কবে দৌড়াল। কিন্তু পাঁচ মিনিটেই আবার সে দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। ম্যাকিনটশে ঢাকা দেয়ার আগে সে তো অনেক রক্ত দেখেছিল। তার ফার্স্ট এইডের কথা মনে পড়ল। গ্রেট কোটের পকেটেই তো পুলিন্দাটা থাকে বাঘের বন হওয়ার পর থেকে। হাতড়ে সেটা আছে কিনা দেখতে দেখতে সে ছুটল।

পাথরটার ওপারে গিয়ে সে আলো ফেললে আর তখনই আর একবার সে সেই করুণ বলশালী কান্না শুনতে পেলে। টর্চটা বনে ঘোরার উপযুক্তই বটে। বেশ শক্তিশালী আলো। কিন্তু এত রক্ত, ফার্স্ট এইডের কী করবে সে? ম্যাকিনটশ সরিয়ে, সুচেতনার অসাড় রক্তাক্ত পাদুটোকে সরিয়ে সরিয়ে উরুর ঈষৎ উষ্ণ দুই প্রাচীরের মধ্যে থেকে সদ্যোজাতটিকে বার করে আনলে। তার হাতের তেলোয় সেটি অদ্ভুতভাবে জীবন্ত আর উষ্ণ মনে হল। কিন্তু এত শীতে এটুকু উষ্ণতা কতক্ষণ থাকে?

এসব তাকে কে কবে বলেছে? সে মৃণালের মতো সেই প্রাণ সংযোগকে দেখতে পেলে।

ফার্স্টএইডের পুলিন্দা থেকে ব্যান্ডেজ বার করে লম্বা করে তাকে ছিঁড়ে, সদ্যোজাতর নাভির কাছে শক্ত করে বাঁধলে। এখন? তার মনে পড়ল, তার সঙ্গে টাঙি আছে। সেটাকে তুলে, তার তীক্ষ্ণ ধারে সেই প্রাণসংযোগ কেটে দিলে।

এখন? সময় যাচ্ছে, না থেমে গেছে? সে অনুভব করলে, ভয়ঙ্কর শীত এখন। সে নিজের গ্রেটকোট খুলে দুটিকেই ঢেকে দিলে। আবার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কিন্তু শিশুটি আবার কাঁদল কি? ময়ূর যেন কোথায় কতদূর, স্মৃতিরও অনেক ওপারে, অতীতে চলে যাচ্ছে। আপত্তি করছে তার মনে কেউ, তীক্ষ্ণ রব করার মতো কান্না পাচ্ছে তার।

দারুণ শীত এখন। মা জাগলে সে বাঁচে। তাব নিজেরও শীত লাগছে, তার শরীরটা রোগে কষ্টে কাঁদছে। মা বোঝেনা কেন?

ময়ূর খেয়াল করলে না, তার চুল বেয়ে, চিবুকের ইম্পিরিয়াল বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

সে সোয়েটার খুললে, শার্ট খুললে। শার্টটা শুকনো, নরম, গরমও আছে। সে সদ্যোজাতকে শার্ট দিয়ে জড়ালে। বিড় বিড় করলে, ড্যাম ইউ, ড্যাম ইউ, হাতের উপরে মরিস না। শার্টের উপরে সোয়েটারে জড়িয়ে পুলিন্দা করলে, আর বিড় বিড় করলে, ভাই, ভাই, কেঁদোনা। সে ম্যাকিনটশটাকে বিছিয়ে তাকে মায়ের পাশে শুইয়ে দিলে। সে খেয়াল করলে না কেন তার নিজের তত শীত লাগছে।

এবার? মা, না ছেলে? দুটোকে নিয়ে যাওয়া শিবের বাপের অসাধ্য। মা-ই বরং ঠিক করুক। সে সুচেতনাকে খানিকটা সোজা করে শুইয়ে, তার বিশেষ ফাস্ট এইড কিটের থেকে ব্রান্ডির ছোট শিশিটা বার করে শিশিটার সিল ছিপি দাঁতে কেটে সুচেতনার ঠোঁট ফাঁক করে খানিকটা ঢেলে দিলে।

মা, না ছেলে?

সে এদিক ওদিক চেয়ে ওকটার একটা মাঝারি মোটা ডাল দেখতে পেলে, মাটি থেকে হাত তিনেক উপরে। সুচেতনার আধখানা শাড়ি ছিঁড়ে তা দিয়ে ঝোলার মতো দোলনা করলে সেই ডালে। শার্ট সোয়েটারে জড়ানো সদ্যোজাতটিকে তাতে শুইয়ে দিয়ে, গ্রেট কোটটা দিয়ে চাপা দিয়ে বললে, এটাই, বেরাদর, তোমার তাম্বু এখন। সে নিজেকেই যেন ঠাট্টা করলে।

সে ঘড়ি দেখলে, তাতেই যেন সমাধান। সাড়ে দশ পার হচ্ছে? আর দেরি করলে রোগী ঠাণ্ডায় মরবে। তার নিজের কেন একটা গরমই লাগছে আদুড়গায়েও। সে সুচেতনার হাত পায়ের মধ্যে গলে তাকে পিঠের উপরে তুললে। কিন্তু মূর্ছিত মানুষ সে রকম পিঠে থাকে না। নিচু হয়ে সুচেতনার শাড়ির বাকিটুকু দিয়ে নিজের সঙ্গে রোগীকে বেঁধে ম্যাকিনটশে ঢাকা দিয়ে টাঙির ডান্ডায় ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

সে ভাববে না। হাঁপাবে না। জেন নিষেধ করেছে। অনুভব করবে না। সব আধ-অন্ধকার থাক। সে জন্য অল্প অল্প হাঁপাতে হাঁপাতে চলতে শুরু করলে। সেই ভারি নিঃসাড় শরীর বয়ে উঠতে কেমন বেদম লাগছে, কেমন একটা ভয় ভয়, নাকি গরম, অথচ বেশ শীতও। নাকি তার রাগই হচ্ছে। অনেক অন্যায় চারদিকে, অন্য কারো কারো কাদা কাদা পাপে তার পা আটকে আটকে ধরছে, সে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে চলতে লাগল।

পোস্টঅফিসে পৌঁছে দরজা খোলা পেয়ে, আলো দেখে সে সোজা শোবার ঘরে ঢুকল। আলো আছে, কিন্তু পোস্টমাস্টারকে পাওয়া গেল না। সুচেতনাকে বিছানায় শুইয়ে যেখানে রাগ, লেপ, যা পেলে, তাতে ঢাকলে সুচেতনাকে। একটু ভেবে নিয়ে আবার তার মুখে কিছু ব্র্যান্ডি ঢেলে দিলে।

এবার ক্লুটলং থেকে ডাক্তার আনা। দেরি করে ফেলেছে সে। সে তাড়াতাড়ি বার হল

পোস্টঅফিস থেকে, তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। সে রকম যেতে যেতে তার অনুমান হল, রোজাকে সে কী কী সব হাতে করে পোস্টঅফিসে ঢুকতে দেখলে।

অথচ তার মনে হচ্ছে, ঘুমানোর মতো রাত হয়েছে এখন। সে স্থির করলে ম্যাডামের কথা মতো ধীরে চলবে। ভাববে কেন? সুচেতনা কে তার? যেমন তার, সেই কবে, তার অ্যাথলেটিকসের মাস্টারমশাই, (কে যেন?) বলতেন, স্লোলি ফাস্ট, স্লোলি ফাস্ট। দম রেখে তিনশো মিটার, তার পরে স্পিড, প্রাণ বাজি।

কিন্তু সে আবার ভুল করে ফেললে। লেন ভুলে গেল কি? অনুভব করলে সে। সে যখন হোর্ডিংএর কাছেকার শুঁড়ি ওক-গলিতে নামার, পথ পার হয়ে ক্লটলং এ যাওয়ার জলে ডোবা উৎরাইএর কাছে পৌঁছেছে, সে যেন এক আর্ত, ভীত, নিষ্ফল কান্না শুনতে পেলে? যেন আমার কী দোষ বললে—

কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! এখানে তার শরীর হিম, হাত পা অসাড়, সেই বনে, সে অন্ধকারে, হোক গ্রেটকোটের ঢাকনা, ওইটুকু প্রাণের উত্তাপ কতক্ষণ থাকে? সে পিছন ফিরে আবার বনের দিকে ছুটল। উপরন্তু সেই বনে চিতা আছে। ওই হোর্ডিংএর কাছেই সে আর জেন এক রাতে চিতা দেখেছিল। উপরন্তু চিতা অনায়াসে গাছে উঠতে পারে। না, না, কারোকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার অধিকার তার নেই। না, না, কার পাপ? এরকম ভেবে কাঁদতে কাঁদতে সে ছুটল। না, না, সে ভাবছে না। এটা পরিশ্রমের জন্য, এরকম ম্যাডামকে বললেই হবে। কে বলেছে, তার বুক কাঁদতে চাইছে?

ওকটার কাছে পৌঁছে, গ্রেটকোটের তাঁবু থেকে সেই শার্টসোয়েটারে জড়ানো পুঁটলিটাকে তুলে নিয়ে, নিজের আদুড় বুকের উত্তাপে রেখে, আর একটু তাকে গরমে রাখতে গ্রেটকোটটাও পরে নিলে সে। এবার সে ক্লটলংএ গিয়ে সব বলতে পারে ম্যাডামকে।

উৎরাইএর সেই জলে ভেজা অংশটা পার হয়ে, শেষ চড়াইটা উঠতে তার পা হড়কে হড়কে যেতে লাগল। সে হঠাৎ ভয় পেয়ে নিজেকে বললে, আরে ক্রসক্রান্টি রেসের শেষ দিকে বুক এমন করে। তার গোড়ালি কাঁপছে। সে এমন নিরস্ত্র, রাইফেল নেই, টাঙিটাও নেই। সেই বিকেল পাঁচটা থেকে এখন মাঝরাত হতে চলে। সে আর কত ছুটবে? একী দুস্তর ব্যবধান, একী দুরারোহ বাধা—এরকম অনুভব করতে করতে সে হাঁ করে দম নিতে চেষ্টা করলে। সে অনুভব করলে, তার শরীরটাই যেন বেচাল হচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে উঠতে লাগল। নিজেকে বললে, হৃদ্দ বিশগজ। কিন্তু তার বুকই প্রচণ্ড শত্রুতা করছে, যেন তাকে ফেলে দেবে, শরীরের প্রান্তগুলোকে রক্ত না পাঠিয়ে অসাড় করে দেবে, কিংবা তাকে এখানে একা ফেলে পালাবে।

সে চাপাগলায় গর্জন করে উঠল, খবরদার মহীগোঁসাই, খুন করে দেবো, লাশ ফেলে দেবো। ভেবেছো কী শুয়োরের বাচ্চা? সারা জীবন বুকে ঢুকে কষ্ট দেবে?

সে দিনকার ঝড়টা ক্লটলং টিলার উপরের দিকে বেশি জোর পেয়েছিল। থেনডুপের কুঁড়েঘর দুটির একটির ছাদ উড়ে গিয়েছিল। লিম্বুর কুঁড়ে একদিকে হেলে গিয়েছিল। তা ছাড়া সেটা তো সেই এক নবজাতকের প্রতীক্ষায় রাত জেগে আলোর উৎসব করার রাতও। বারান্দার মোমগুলো বেশির ভাগ নিবে গিয়েছে। তা হলেও অত রাতেও তারা মিশনবাংলোর হলে জেনকে ঘিরে। মোমবাতি জ্বলছে, শীতের প্রকোপে আগুনের আংটায় আগুন। এক কোণে দূরে গ্লাস ও ব্যবহার করা প্লেট জমা করা। দেখে মনে হয়, হয়তো বুফে ডিনারের মতো কিছু সাঙ্গ হয়েছে। সে ডিনারে মেয়রের নিমন্ত্রণ ছিল, তা রাখা হয়নি। আগুনের আংটায় বড় কেটলিতে জল ফুটছে। তা কফির জন্য হতে পারে। জেনের মনে ময়ূরের জন্য চিন্তা ছিলই, অন্যদের তখনও ঝড়ের ভয়। জোর কড়া নাড়ার শব্দে জেন নিজে উঠেই দরজা খুললে।

ময়ূর তখন টলছে, যেন অন্ধকার অজানা এক তরঙ্গের উপরে। সে পা দুটোকে ফাঁক করে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। নিজেকে খাড়া রাখতে চেষ্টা করছে। অল্প কথায় সব কথা কী করে শেষ করা যায়, সেই চেষ্টায় গ্রেটকোটের ভিতর থেকে শার্ট সোয়েটারে জড়ানো পুঁটুলিটা দুই হাতে সামনের দিকে ধরে বললে-- ছেলে একটা।

কিন্তু ময়ূর কী বললে আদৌ যদি বোঝা যায়। ঘসঘস শব্দ শোনা গেল একটা। গ্রেট কোট থেকে বার করা পুঁটুলিতে কিছু আছে মনে করে হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিতে গিয়ে সে হতবাক। কিন্তু সে ডাক্তারও তো। বসো ময়ূর, মাত্র বলে পুঁটুলি খুলে সদ্যোজাতটিকে সদ্য জন্মের অবস্থায় দেখে, তাকে থাবড়ে, থুবড়ে, ফুঁ দিয়ে, তাকে জ্ঞানে আনার চেষ্টায় এমন ব্যস্ত হলে যে ময়ূরের দিকে চাইবার সময়ই পেলে না। সে থেনডুপের স্ত্রীকে ঠাণ্ডাজলের গামলা, গরমজলের গামলা এগিয়ে দিতে বলে, লিম্বুর স্ত্রীকে শোবার ঘর থেকে খদ্দর চাদর কম্বল ইত্যাদি আনতে বলে, নিজের গাউনের স্কার্ট হুইস্কিতে ভিজিয়ে সদ্যোজাতর গা মুছিয়ে দিতে দিতে, ডাক্তারের উপযুক্ত একাগ্রতায় একের পর এক ব্যবস্থা করতে থাকলে। সাদা চাদরে লাল কম্বলে জড়ানো সে আগুনের প্রাণদায়ী উত্তাপের পাশে প্রবল প্রতিবাদে কেঁপে উঠল।

কিন্তু জেন ময়ূরকে দেখেছিল। তখন তার মনে হল সে গ্রেটকোটের তলায় ময়ূরের খালি গায়ে রক্ত দেখেছিল! মনে পড়ল, ঘামে জলে ভেজা ময়ূরের মুখ যতটুকু দেখেছে, তাতেই তাকে অপরিসীম ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তার মনে পড়ল, সে ময়ূরকে দেয়াল ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে দেখেছিল। সে তখন চোখ তুলে দেখলে, সেই পুরুষটি যেন ভেঙে পড়ছে। সে থেনডুপের স্ত্রীকে শিশুটিকে ধরতে বলে ময়ূরের কাছে উঠে এল। বললে, সে কি ময়ূব, তুমি তো অসুস্থ, খুবই অসুস্থ। তুমি কি আগে স্নান সেরে নেবে? গ্রেটকোটের নিচে তোমার গা একেবারে খালি? এসো, এসো, ভিতরে এসো বলে নিজের শোবার ঘরের দিকে গেল।

তখন ময়ূর হঠাৎ খেয়াল করলে, কে বলে দিলে যেন, এখানে তা হতে দেয়া যায় না, না এখানে তা হয় না।

সে জেনের কথা ভুলে বুকে হাত রেখে টলতে টলতে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

জেন ধরে নিয়েছিল ময়ূর নিশ্চয়ই তাকে অনুসরণ করছে। সে আলনা থেকে আর এক গাউন নিয়ে বাথে ঢুকে, হাত পা ধুয়ে, গাউন বদলে, বাথে ময়ূরের জন্য স্পাঞ্জ তোয়ালে পাজামা আর গরম নাইটগাউন রেখে দেখলে ময়ূর আসে নি তখনও। তাকে শোবার ঘরে, এমনকি হলে না পেয়ে দৌড়েই প্রায় বারান্দায় গিয়ে দেখলে ময়ূর ক্লুটলং-এ নেমে আসা সিঁড়ি যেখানে রাস্তায় মিশেছে সেখানে হাত-পায়ে হামা দিয়ে উঠছে যেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১

ময়ূরের মাথায় সেই পুরনো ভাবনাটাই দেখা দিয়েছিল- এখানে এখন তার মৃতদেহটা একেবারে সেই মহীগোঁসাইএর মতো দেখবে। একটা সমাধানও তার মাথায় এসেছিল, মেয়র-বাংলোয় মরলে অন্তত সে অপমান থেকে সে রক্ষা পায়। মরবো না, নিজেকে এই বলতে বলতে, এমন কি শেষ পথটুকু গড়িয়ে হামা টেনে সে মেয়র-বাংলোর কাছে পৌঁছেছিল। জেন ময়ূরকে মেয়র-বাংলোর বারান্দার নিচে সর্বাঙ্গে কাদামাখা পড়ে থাকতে দেখেছিল। ময়ূরের দুই হাতের চেটো, নখগুলোও চোট পেয়ে রক্তাক্ত। যেমন ডাক্তার জেন পরে রেঞ্জারকে বলেছিল, এটা একটা এমন ব্যাপার যখন চিকিৎসাশাস্ত্রকে হিসাবের বাইরের সম্ভাবনাকে মানতে বাধ্য করে। বুকের সে অবস্থায় ক্লটলং থেকে মেয়র-বাংলোয় পৌঁছানোই মিরাকল। গ্রেগ অ্যাভেনু থেকে নেমে বনে ঢুকে সেই অবস্থায়, নিশ্চয় বুকে দারুণ তোলপাড় তখন, ি ানো যায় না, পোস্টমাস্টারের স্ত্রীকে পিগিব্যাক করে পোস্টঅফিসে পৌঁছে দিয়েছিল। রোজা তাই বলে।

সেই রাতে জেনের ঘুমানোর সুযোগ হয় নি। সে আন্দাজ করেছিল, সদ্যোজাতটি সুচেতনার। সুচেতনা আর ময়ূরের দুজনের দরকার হতে পারে ব্যাগে এরকম ওষুধ ভরে, ভাগ্যে তার স্টকে সে রকম কয়েকটি বড়ি ও ইনজেকশন ছিল, এবং সেখানে ইনটেনসিভ কেয়ারের কোন দুরাশাও নেই এরকম ভাবতে ভাবতে, ময়ূর সে রকম টলতে টলতে ক্লটলং-এর পথে উঠে চলতে শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, লিম্বু আর থেনড়ুপকে সঙ্গে নিয়ে তাসিলায় এসেছিল। ভাগ্যে এসেছিল। পোস্টঅফিসে পোস্টমাস্টার ছিল না। ভাগ্যে অজ্ঞান সুচেতনার পাশে রোজা ছিল। তার সাহায্যে সুচেতনার কিছু ব্যবস্থা করে, সে মেয়র-বাংলোয় এসে ময়ূরকে আবিষ্কার করেছিল, থেনড়ুপ আর লিম্বুর সাহায্যে তাকে বিছানায় এনে, গরম জলে তুলো দিয়ে সাফ সুতরো করে, কম্বলে ঢাকা দিয়ে অবশেষে বললে, ভয় কী আর? স্টেডি। ইনজেকশন দিয়েছি। আমি তো এসে গিয়েছি। ওষুধটাও খেয়ে নেবে এখন। আজ কথা বলা বারণ। এখনই সুস্থ বোধ করবে, ঘুমাবে। আমি সারারাত থাকবে পাশে। এসব মাঝরাতের পরে। ময়ূরকে বারান্দা থেকে ঘরে তুলতেও জেন আধঘণ্টা সময় নিয়েছিল। ঝড়বৃষ্টিতে ভেজা প্যান্ট ছাড়িয়ে গরমজল তুলোয় গায়ের ময়লা কাদা মুছে, লিম্বু আর থেনড়ুপের সাহায্য সত্ত্বেও তাকে নড়াতেই সাহস পাচ্ছিল না জেন। ওদিকে সারারাত ময়ূরের পাশে বসে থাকাও সম্ভব ছিল না। মাঝে দুবার সেই বৃষ্টিতে, তখন বৃষ্টি নেমেছিল আবার, অন্ধকারে সুচেতনাকে দেখতে যেতে হয়েছিল তাকে পোস্টঅফিসে।

আজ চতুর্থ দিন হল। চারদিনের হয়েছে সেই সদ্যোজাত বড়দিনের মাঝরাত থেকে হিসাব করলে। সে অবশ্যই ক্লটলং-এর মিশন হাউসের বাইরে আসেনি। জেন নিশ্চিন্ত হয়েছে। থেনড়ুপের স্ত্রী পেমা ও লিম্বুর স্ত্রী, তাদের অশিক্ষিত পটুতা থেকে কুসংস্কার ছাড়াতে পারলে, আর ইনফেকশন ঘটতে না দিলে, সদ্যোজাতটি তাদের কাছেই নিরাপদ।

সুচেতনাকে মেয়র-বাংলোয়, অথবা তাকে তো এখন এক নম্বর ট্যুরিস্ট লজই বলা হবে, তারই একটা ঘরে রাখা হয়েছে। সে এখনও নানাভাবেই অসুস্থ। তার এখন ডাকঘরের বাসায় থাকাও

সম্ভব নয়। সেখানে নতুন পোস্টমাস্টার। রোজাকে তো এই বাংলোর সব বন্দোবস্ত দেখতে এখানেই থাকতে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে জেন তার রোগীদের দেখতে মেয়র-বাংলোয় এসে ময়ূরকে বলেছে, সুচেতনা ভালো। রোজা এখনই তোমার চা আনছে। তোমার সেই টাঙি দিয়ে নাড়িকাটা বনের ছেলের নাম ময়ূরবাহন রাখলে হয়। এরকম নাম আছে গল্পে। সেও সুস্থ।

ম্লান মুখে, ক্লান্ত দৃষ্টিতে ময়ূর, নাকি সেই মুরারিকৃষ্ণ, মোর ইত্যাদি, জেন ডাক্তারকে তার বিছানার পাশ থেকে উঠে যেতে দেখেছে। এখনই কী খাওয়াল তাকে রোজা জেনের পাহারায়, সকালের ব্রেকফাস্ট না বিকেলের চা? সে অনুভব করলে, আবার তাকে সেই ঘুম, নেশা, অবসাদের খাদে শুইযে দেওয়া হল। সেখান থেকে কিছু ভাবাও যায় না। তার বাঁ পাশের ফ্রেঞ্চ উইনডোটার পর্দাটাকে রোজা আজ সরিয়ে দিয়েছে। নরবুর তৈরি ফুলবাগান যার পিছনে দূরের নীলাভ পাহাড়। এই শেষ ডিসেম্বরে ডালিয়া, ডালিয়া, হলি হক, গাঢ়লাল, লাল, মরা লাল, কমলা, সোনা হলুদ, সবজে হলুদ। তার ডানপাশে পায়ের দিকে আর একটা ফ্রেঞ্চ উইনডো, পর্দা ফেলা। শিয়রের দিকের দরজাতেও পর্দা টানা কিন্তু ভেজিয়ে রাখা।

ময়ূর অনুভব করার চেষ্টা করলে। অনেক কিছু ঘটেছে, অনেক কিছু। সে কি মনে করতে পারছে না, কিংবা তার মনই কি নেই? তা বলা ঠিক হয় না। অন্তত সে তো বুঝতে পারছে, এটা তাসিলা, মেয়র-বাংলোই হয়তো—যতবার জেন ম্যাডামকে, ততবার মিসেস রোজাকে দেখতে পাচ্ছে। আজই বরং জেন বলে গেল, ক্লুটলং যাচ্ছি, তোমার খাওয়ার আগে ফিরবো। আজই জেন বলে গেল, নতুন একজন মানুষ হিসাবে এক সদ্যোজাত শিশুর কথা। এই ঘরে ম্যাডাম ছাড়া তৃতীয় মানুষকে মাঝে মাঝে দেখেছে সে বদলে বদলে। যেমন রোজা যে খাওয়ার ট্রে আনে। অল্পপরিচিত সেই এক প্রৌঢ়া যে রোজা না থাকলে প্যান ঠিক করে দিয়েছে। যেন একবার রেঞ্জারসাহেবকেও সে বিছানার পাশে দাঁড়াতে দেখেছে।

ময়ূর ধারের জানলার দিকে মুখ ফিরালে, আর রোদে বাতাসে সকালের আলোয় চঞ্চল সেই ডালিয়া আর হলির ছবিটাকে দেখতে পেলে।

না। এখন বেলা বরং বিকেলের দিকে হবে। তখন সকালে রোজা ট্রেতে খাবার এনেছিল। আর জেন রুটির নরম শাঁস আরও নরম করতে সিকিসিদ্ধ ডিমে চুবিয়ে চামচ করে খাইয়ে দিচ্ছিল। চাও ফিডিং কাপে। তারপরেও আধঘণ্টা ছিল জেন। বলেছে, আবার আসবে।

ময়ূর জানলা থেকে চোখ সরালে। ফুলগুলোর তত উজ্জ্বল চঞ্চলতা ভালো নয়। বরং সে ঘুমিয়ে নিতে পারে। তখন ভাবতে হয় না।

২

তা হলে চারদিন হয়ে গিয়েছে, দেওদার পাইন বললে। আজ আটাশে।

শীত আছে। ঝড়বৃষ্টি নেই। কুয়াশা আছে। মেঘলাও আছে। আজ সকালেই মেয়র-বাংলোর বারান্দায় ডাক্তার পাইন এরকম দিনের হিসাব দিলে, প্রভঞ্জন রেঞ্জার যেন শুনতে পায় নি এমন ভাবে বললে, চোর্টেন পীকটাকে দেখুন। ব্লুব্ল্যাক ভেলভেটের ব্লাউজ, একটু পুরনো কিন্তু নিজেরই বোঝা যায়। দোপাট্টা বা আঁচলেও ঢাকা নয়।

সেই সাইকায়াট্রিস্ট দেওদার পাইন যে দিন সাতেক আগে বন ও পাহাড় দেখতে জাকিগঞ্জে এসেছিল প্রভঞ্জনের নিমন্ত্রণে, সেই প্রভঞ্জনের টেলিগ্রাম পেয়ে সুচেতনাকে দেখতে কাল বিকেলে

তাসিলায় পৌঁছেছে।

পীকের কথা শুনে পাইন ডাক্তারও দেখলে প্রভঞ্জনের মুখ ও চোখ উদাস। ডাক্তার তার চোখা দাড়িযুক্ত চিবুক দুএকবার উপরে তুললে, নিচে নামাল।

চারদিন তো হলই। দ্বিতীয় দিনেই বিরিক ব্লকের সেই এঞ্জিনিয়ার বিরিঞ্চি ঝড়বৃষ্টির পরে সকাল হলে, রাস্তা দেখতে বেরিয়ে, তাসিলার দু-আড়াই মাইল নিচে, ছোট একটা নতুন ধ্বসের কাছে, কালিঝোরার পুরনো খাদে, পোস্টমাস্টারের শরীরটাকে দেখতে পেয়েছিল। ধ্বসের ঠিক ওপারে, পথের উপরে চিমনি ভাঙা কিন্তু চকচকে এক পেট্রলল্যাম্প দেখে তার সন্দেহ হয়। দিনের আলো কাচে পড়লে চকচক করে। তার ফলে সেই নতুন ধ্বসের গায়ে এক জোড়া চশমা, পবে এদিক ওদিক করে ধ্বসের নিচে খাদে দেখতে গিয়ে দামি জুতো পরা একটা ট্রাউজার্সের পা দেখতে পায়। চশমা আর জুতো দেখেই পোস্টমাস্টার বলে সন্দেহ হয় তার। লোক পাঠিয়ে জাকিগঞ্জের পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেবে কিনা ভাবতে ভাবতে দেখেছিল, ঝুপ করে একটা শকুন নামল। তখন আর দেরি না করে, নিজের লোকজন কুলিকামিন নামিয়ে বাঁশ, দড়িদড়ার সাহায্যে সে শরীরটাকে তুলে এনেছিল।

এটাকে কি আঘাত বলা হবে?

জাকিগঞ্জে প্রভঞ্জন সেই ঝড়ের রাত ভোর হতে না হতে টেলিগ্রাম পেযেছিল। অদ্ভুত টেলিগ্রাম, যার অর্থ, লাইল্যাক হারিয়েছে, খুঁজে পেলে, নিন। তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা হাসির হয় না। কারণ টেলিগ্রামটা আর্জেন্ট। আর গুরুত্ব বুঝে জাকিগঞ্জের সিগন্যালার ভোর হতেই নিজেই বিলি করতে এসে বলেছিল, সে একটা-দুটো ক্লিয়ার দা লাইন মেসেজ তাসিলা থেকে সদরে যেতে শুনেছে। তাসিলার খবর ভালো নয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই সিগন্যালারবাবু আবার এসেছিল প্রভঞ্জনের কাছে। সে ক্লিয়ার দা লাইন মেসেজ তারে যেতে শুনেছিল, কিন্তু আইনের ভয়ে প্রথমবার প্রকাশ করেনি। দ্বিতীয়বারে তার কপি নিয়ে এসেছিল। সেই অত্যন্ত জরুরী টেলিগ্রামের কপি তাকে পাঠিয়ে কর্তৃপক্ষ সেদিনই তাকে তাসিলা ডাকঘরের চার্জ নিতে হুকুম দিয়েছে। সিগন্যালারবাবু তাসিলায় যেতে প্রভঞ্জনদের সাহায্য চাইছিল, যেহেতু সে তো এখন বাঘের দেশ। প্রভঞ্জন তখন টেলিগ্রামটা দেখেছিল। তাসিলার পোস্টমাস্টার মুরলীধর টেলিগ্রাম করেছিল : সব শেষ। কাল পোস্ট অফিস খুলবে না, চার্জ নিন।

ফলে নতুন সেই পোস্টমাস্টার এবং প্রভঞ্জন দ্বিতীয় দিনের বেলা বারোটার আগেই তাসিলা পৌঁছে গিয়েছিল পনিতে।

তৃতীয় দিনে জানা গেল, মুরলীধর তৃতীয় একখানা সুপার এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করেছিল তার শ্বশুরবাড়িতে কলকাতায়। তার ড্রাফট অফিসেই ছিল।

সেই টেলিগ্রাম পেয়ে তৃতীয়দিনের সন্ধ্যায় সুচেতনার পিসেমশাই এসে পড়েছেন। খুব বিপদ, তা তিনি কলকাতাতেই জেনেছেন সেখানকার বড় বড় ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে। সেই সুপার এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম আত্মীয়স্বজনের কাছে করা যায় না। করা এমন অপরাধ যে তার জন্যই শাস্তি হতে পারে। শাস্তির ঝুঁকি নিয়ে করা সেই টেলিগ্রামে বলা হয়েছিল, সুচেতনার মৃত্যুহেন বিপদ। দ্রুত আসুন।

আর কেউ না এসে তিনি এজন্য, যে মাঝবয়সী এই ভদ্রলোক অ্যাডভোকেট, আলিপুর কোর্টে ভালো ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিস, সুতরাং লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ, স্বাস্থ্যদৃঢ়, অ্যাডভেঞ্চার করার সাহস আছে, এককালে হিমালয়ে ঘুরেছেন। কলকাতা থেকে তৃতীয় দিনেই একা তাসিলায় পৌঁছে যাওয়া এসব প্রমাণ করে।

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাতেই চা খেতে বসে এসব জানিয়েছেন তিনি প্রভঞ্জনকে। তিনি জেনেছেন, তাঁদের তত ভালো জামাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। তিনি মৃতদেহ দেখতে পান নি বটে, ইতিমধ্যে রোড

এঞ্জিনিয়ার বিরিঞ্চির সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন, অকুস্থল দেখেছেন, পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছেন। জেনেছেন, পুলিশ সন্দেহ করে, এটা অপঘাত না হয়ে আত্মহত্যা হতে পারে। প্রমাণ, মুরলীধরের সেই তিনখানা টেলিগ্রাম! তিনি সেই টেলিগ্রামগুলোর কপি সংগ্রহ করেছেন, যেমন পুলিশও করেছে। নতুন পোস্টমাস্টার শ্রীশ অথবা প্রভঞ্জন রেঞ্জার কিছুমাত্র আপত্তি করেনি। শুধু লাইল্যাক কী তা ঠিক না বুঝে, প্রভঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলে, সেই রেঞ্জার প্রথমে না শোনার ভান করে, পরে উদাসমুখে অন্যদিকে চাইলে, তাঁর খটকা লেগেছিল। ফলে কিছুটা আদালতি ভঙ্গিতে, রাতে খাওয়ার সময়ে প্রভঞ্জনকে জেরা করতে থাকায়, সে বলেছে, লাইল্যাক এক ফুল, এক সেন্ট, এক রং, লাইল্যাক একটা ছবিরও নাম। তাতে খটকা আরও গভীর হয়েছে।

সুচেতনাকে এই বাংলোরই একটি ভালো ঘরেই দেখেছেন। সে বিশেষ অপ্রকৃতিস্থ। হয়তো সিডেটিবে অধিকাংশ সময় ঘুমের ঘোরে থাকে, শারীরিকও অসুস্থ। ঘুম ভাঙলে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে। অন্য সময়ে যেন ভায়োলেন্ট হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। গায়ের জামাকাপড় খুলে ফেলে, টেনে ছেঁড়ে।

তিনি দেখেছেন, পনিতে চেপে এক মেম ডাক্তার সুচেতনাকে দিনে অন্তত দুবার দেখতে আসছে। তিনি দেওদার পাইনকেও দেখলেন। তিনি জানলেন, সাইকায়াট্রিস্ট পাইন ডাক্তারের চেম্বার কলকাতায়। দেখলেন, পাইন ডাক্তার সেই মেমসাহেব জেন ডাক্তারের সঙ্গে চিকিৎসা বিষয়ে একমত। তিনি তখন স্বীকার করলেন, এরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য, কলকাতাতেও তাঁরা করতে পারতেন না। শুধু দুজন ডাক্তার নয়, একজন অ্যাংলোইন্ডিয়ান নার্সও।

কিন্তু তৃতীয় দিনের রাতে বাংলোর ক্লাবঘরে শুতে গিয়ে তিনি দেখলেন, সেই ঘরের দেয়ালে বেশ কিছু ছবি আছে। শুনলেন, সে সব নাকি রেঞ্জারের আঁকা। ঘরের উজ্জ্বল পেট্রললাম্পে ছবিগুলি বেশ স্পষ্টই। তার মধ্যে লাইল্যাক নাইটগাউন পরা সুচেতনার পোরট্রেট দেখলেন। কিন্তু ছবিগুলির মধ্যে কিছু নির্লজ্জ ন্যুডও। এরকম অনুভব করেছিলেন, এ ঘরে কি ঘুমানো যায়? তিনি কিছু আগে ডিনারে পরিবেশন করতে রোজা নামে কেয়ারটেকারকে দেখেছেন। ন্যুড ছবিগুলিতে সেই নয়? তাঁর এরকম মনে হল, এখানে সব কিছু পরিষ্কার নয়।

তা কেন? প্রথম রাতের ডিনারে তিনি রেঞ্জারকে প্রচুর মদ খেতে দেখেছেন। নিজে মদ খেলেও কলকাতার বাইরে এক গ্রাম্য রেঞ্জারের তেমন মদ খাওয়া তাঁর ভালো লাগে নি।

আজ চতুর্থদিনের সকালে, তাঁর এই পাহাড়ে ওঠার প্রথম সকালে, ব্রেকফাস্টে বসার আগের ঘটনাটাও মনে করার মতো। তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারে, তিনি টাই বাঁধতে বাঁধতেই সুচেতনার ঘরের দিকে ছুটেছিলেন। দেখলেন, ঘরে আলো জ্বলছে। সুচেতনা বিছানা ছেড়ে আয়নার সামনে। দরজা খোলা, কাচের জানলায় পর্দা নেই। সুচেতনা নিজেকে উলঙ্গ করে ফেলেছে। আর রেঞ্জার তাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে একটা শেমিজ পরাতে চেষ্টা করছে। সুচেতনা পরতে আপত্তি করছে, আয়নায় নিজেকে দেখে হাসছেও যেন। হঠাৎ সে হুহু করে কেঁদে, কী বলতে বলতে রেঞ্জারের কাঁধে মাথা রেখেও যেন পড়ে যাচ্ছে, এমন হলে রেঞ্জার তাকে জড়িয়ে ধরল।

পিসেমশাই রোগিনীকে পোশাক পরাতে মেয়েছেলের যাওয়া উচিত অস্ফুটস্বরে এ রকম বলে সরে এসেছিলেন। এ যদি জামাইয়ের আত্মহত্যাই হয়, কেমন যেন নোংরা কিছু আছে তার মূলে, এরকম মনে হয়েছিল তাঁর।

আবহাওয়াটাই যে নোংরা, তার আর এক প্রমাণ পেলেন ব্রেকফাস্টে বসার আগেই। রেঞ্জার ওদিকে ব্যস্ত, সেই কেয়ারটেকার অ্যাংলো মেয়েটারও দেখা নেই টেবলের কাছাকাছি। সুতরাং তিনি বাংলোর লনে ঘুরছিলেন। কলকাতাতেও তাঁর মর্নিংওয়াক অভ্যাস। তিনি দেখলেন, সেই জেন ডাক্তার আসছে পনিতে। রোগিনীর নিকট আত্মীয় বলে, তিনি ডাক্তারের সামনে সিঁড়ির কাছে

এগোলেন, গুড মর্নিং করলেন, বাও করলেন।

কিন্তু ডাক্তার চিন্তিত মুখে, বাও মাত্র করে, ঘোড়া থেকে তাঁর প্রত্যাশা মতো বারান্দার সিঁড়ির সামনে না নেমে, ঘোড়া নিয়ে বাড়িটার বাঁ দিকে ঘুরে গেল।

তাঁর ইচ্ছা ছিল, ডাক্তারের কাছে সুচেতনার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানোর আগেকার কথা শোনাব। তিনি সম্মুখের বারান্দায় মিনিট পনের অপেক্ষা করলেন। ডাক্তার তবুও সেদিকে না আসাতে, ডাক্তারের পথ অনুসরণ করে অবাক হলেন। সেদিকে একটা পৃথক ফ্ল্যাটের মতো ঘর, যাতে লন ও বাগান থেকে এক ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়েও ঢোকা যায়। অদ্ভুত দৃশ্যটাও তাঁর চোখে পড়ল। শয্যায় শায়িত এক যুবা পুরুষ। স্টেথো দিয়ে দেখা হলে, ডাক্তার তার পাশে বিছানায় বসে তার কপালে হাত রাখছে। একবার তার ডান হাতটা কুড়িয়ে নিয়ে, নাড়ি না দেখে, সে হাতটাকে নিজের ক্লোকের মধ্যে নিয়ে নিজের চিবুকের নিচে গলার কাছে চেপে রাখলে। এটাও, কিন্তু, কোন ডাক্তারের প্রফেশন্যাল এথিকসের সীমার বাইরে নয় কি? ডাক্তার হলেও যুবতী, আর রোগীর হাত বুকের অত কাছে তুলে নেয়া!

বিকেল চারটের চায়ের আসরে শসার স্যান্ডউইচ সহযোগে চা খেতে খেতে, পিসেমশাই কলকাতার বাইরে এরকম স্যান্ডউইচে বেশ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এটাও তো বিস্ময়ের, এক প্রৌঢ়া সুন্দরী ইউরেশিয়ান এই বেঞ্জারের বাঁধুনিও। রোগ সম্বন্ধে তা হলেও আলোচনা করতে হয়। সে আলোচনায় জানা গেল, জেন ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগিনীর জেনারেল হেলথ যথেষ্ট ইমপ্রুভ না করলে তাকে মনোবিকলনের সোফায় বসাতে জেন ডাক্তারের আপত্তি আছে। পাইন ডাক্তার তার দাড়ির অগ্রভাগ, যা বেশ তীক্ষ্ণ, মুঠিতে ধরে, সে বিষয়ে একমত হল। জেন বললে, পিসেমশাই শুনতে তো উদগ্রীব ছিলেনই, আমি ভাবছি মাঝে মাঝে ভায়োলেন্ট হলেও দিনের বেলার সিডেশন কমিয়ে দেবো। আপনাকে কি বলেছি, কেসটা প্রেগনেন্সির সঙ্গে জড়িত? পাইন বললে, সেক্ষেত্রে সাইকায়াট্রিস্টের কাজ কিছু সহজ হয়। রেঞ্জার বললে, ঈশ্বর করুন, সে রকম হয়।

ফলে কলকাতার ভূয়োদর্শী সেই অ্যাডভোকেট পিসেমশাই, যিনি প্রচুর পেরি মেসনের ডিটেকটিভ বই পড়ে থাকেন, খবরের কাগজে সাংবাদিকদের লেখা মনস্তত্ত্ব বা সামাজিক নীতি সম্বন্ধে রবিবারের আলোচনা বাদ দেন না, ঈশ্বর শব্দটা টেবলে উঠতেই, পাপ সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন। কিন্তু এই রেঞ্জার দত্ত বা সাইকায়াট্রিস্ট পাইন যদি কোন ভাবে পিনালকোডকে সুযোগ দেয়! রেঞ্জার পাপ ছেড়ে পাপবোধের দিকে গেল। টেবলের অন্যপ্রান্তে জেন ডাক্তার যেন রোগের কথাই ভাবছে। রেঞ্জার বললে, পাপ আর পাপবোধ বোধহয় এক নয়। যে পাপী তার পাপবোধ না থাকতে পারে, যে পাপী নয় তার পাপবোধ হতে পারে। আবার ডক্টর পাইন, আপনার কথা অনুসারে পাপ যদি অবচেতনের দ্বারা ঘটে, তবে মানুষকে পাপীও বলা যায় না। আর অবচেতনে বোধ থাকে না, পাপবোধও বোধহয় থাকে না।

ডাক্তার জেন টেবলটকে যোগ দেয়ার জন্য বললে, আমি মিসেস বসুর চিকিৎসা করছি। কিন্তু অবচেতন সম্বন্ধে আমার তেমন কিছু জানা নেই। আমার সাবজেক্ট নয়। ডক্টর পাইন এ সুযোগ ছাড়লে না। সে বললে, পাপ আর পাপবোধ একত্র থাকবেই এমন কথা নেই।

আনাড়িদের পেয়ে বিশেষত ডক্টর পাইন বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ নিলে। সে বোঝালে, নিজের জ্ঞানে ধরা পড়া পাপের কর্তা অনুশোচনায় এমনকী শাস্তিতে শান্তি পেতে পারে। এরকম মত আছে, কনফেশন করলে, পাপের অর্জিত বিষয় ত্যাগ করে ক্রমশ পাপবোধের চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু বদ্ধমূল পাপবোধ মানুষকে পাগল করতে পারে, আত্মঘাতী করতে পারে।

অ্যাডভোকেট পিসেমশাই লক্ষ্য করলেন, সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডাক্তার জেনের সাদা পাথরের মুখ আরও সাদা হল। সে বললে, ডক্টর পাইন, আপনি ক্রিশ্চান কালচার আর সেই এথিক্যাল ভঙ্গি

থেকে বলছেন কি? আপনার কি মনে হয়, মানুষের প্রথম শাস্তি নির্বাসন মানুষকে শাস্তি দিয়েছিল? নাকি মানুষের কৌম অবচেতনে এখনও সেই প্রথম শাস্তির মিথ, পাপ করে নি এমন মানুষকেও পাপবোধ থেকে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়?

রেঞ্জার প্রভঞ্জন পাইপ ধরালে, বললে, আমরা চা খেতে বসেছি, তাই নয়? গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সে হাসল, বললে, আসল কথা কি অনুভূতির তীব্রতা? অনুভূতির শক্তি তীব্র হলেই পাপবোধ তীব্র হয় কি? আর তা ভোঁতা হলে নিজের পাপ বা পাপ না করেও পাপবোধ, কিছু অশান্তি করে না।

প্রভঞ্জন ভাবলে, অসাধারণ অনুভবের ক্ষমতা ছিল তার বন্ধু পোস্টমাস্টারের। তার ইউরোপীয় চিত্রকলার বইগুলো আর তার চিত্রসমালোচনার পাণ্ডুলিপি তাই প্রমাণ করে। সূক্ষ্ম অনুভূতি কিংবা অনুভূতির আঢ্যতা।

জেন তো ইতিমধ্যে ময়ূরের কাছে পোস্টমাস্টারের বিদেশি স্টিরিও ও রেকর্ড সংগ্রহের কথা, যাকে পোস্টমাস্টার নিজেও পাপ বলেছিল, তার কথাও শুনেছে। তার মনে পড়ল, পোস্টমাস্টার সেই স্টিরিও আর রেকর্ডগুলো নিজে ভোগ না করে তাকে দিয়ে গিয়েছে। ডক্টর পাইন বললে, ওটা ভেবে দেখার মতো, ডক্টর এয়ার, সেই নির্বাসনের মিথ আর আত্মহত্যা, পাপবোধ থেকে মুক্তির উপায়ের কতটা কাছাকাছি যায়।

জেন বললে, আপাতত আমি আমার রোগিনী আব রোগীকে দেখতে যাচ্ছি। আপনাকে রোগিনীর জন্য আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে, ভয় পাচ্ছি।

সে মৃদু হেসে স্টেথো দোলাতে দোলাতে চলে গেলে প্রভঞ্জনও ভ্রুকুটি করে উঠে পড়ল।

তখন পিসেমশাই পাইনকে একা পেয়ে বললেন, আপনার হাতে কাজ নেই এখন বোধহয়?

রোগিণী এক সপ্তাহ আগে আমার হাতে আসছে না, শুনলেন। তবে সিডেশনে আমাকে কনসাল্ট করেন ডক্টর জেন!

তা হলে একটু ঘুরতে যাবেন? অথবা আপনি কি দেখেছেন, এঁরা যাকে ক্লাবরুম বলেন, সেখানে অনেক ছবি আছে? এখন আলো আছে, ছবি দেখা যায়। সময় কাটবে চলুন।

অপরাধবিশেষজ্ঞ পিসেমশাই স্থির করলেন, তাঁর নিজের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত, দ্বিতীয় একজন বাইরের মানুষকে দিয়ে তা যাচাই করা ভালো। এখানে ডক্টর পাইনই একমাত্র লোক যিনি কলকাতার হওয়ায় এই অদ্ভুত জায়গার নন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের ছবি, ওয়াটারকলারে, তেলরঙে, কালিতুলিতে অনেক। অয়েল ক্যানভাসে ওয়াটার কলারে বড় ছবিই পনেরখানা হবে। পিসেমশাই আগে একবার দেখেছেন। এখন হাতে সময় নিয়ে দেয়াল বরাবর চলে খুঁটিয়ে দেখাই উদ্দেশ্য, বিশেষ ন্যুডগুলোকে। একবার বললেন, আচ্ছা ছবিগুলোর মধ্যে ন্যুডগুলোই বেশী সতেজ মনে হয়, ন্যুড, সেমিন্যুড ধরলে সেগুলো সংখ্যায় বেশি। এর কি কোন কারণ আছে মনে করেন?

প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার বিদেশী ছবির প্রভাব বলছেন?

নাকি ফার্টিলিটি কাল্ট এখনকার সমাজের?

তা হলে বলতে হয়, ডক্টর পাইন বললে, তা হলে বলতে হয়, এখানকার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্ত্বেও, চিত্রকর হয়তো জায়গাটাকে বন্ধ্যা মনে করতো। এই পি. ডি সাক্ষর যে চিত্রকরের।

পিসেমশাই। এই পি. ডি চিত্রকর, মানে রেঞ্জারের নামও তো প্রভঞ্জন দত্ত।

পাইন। তাই সম্ভব।

পিসেমশাই। আচ্ছা, এই পিছন ফিরানো স্নানের ঘরে ন্যুড, ওই আপেল কাটা বুকখোলা ন্যুড, আর বিছানায় শোয়া ন্যুড। চেনা চেনা মনে হয় না? একজনকেই মডেল করে আঁকা মনে হয়

না? মনে হয় না কোথাও দেখেছি? আমি নাম করতে চাই না। কিন্তু এরকম মডেলের বদলে হালকা তরুণী মডেল কি ভালো হয় না?

পাইন। দেখে মনে হতে পারে, বয়স্ক ভারিক্কি চেহারার মডেল পাওয়া না পাওয়ার কথা আছে। চিত্রকর ইত্যাদির মনে নানা কমপ্লেকস থাকে। ইনসপিরেশন তো অবচেতন থেকে ওঠে, এরকম মত আছে। পিসেমশাই মনে করলেন, এই অবচেতনের ডাক্তার অবচেতন চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সাধারণ মানুষের মতো বাস্তবকে স্পষ্ট দেখে না। তাঁর তদন্ত ঠিক পথেই চলেছে। এবার আসল প্রশ্ন করতে পারেন তিনি। বললেন, আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, ব্রেকফাস্ট, চায়ে, ডিনারে রোগীব তদারক করতে একজনকে আপনি দেখে থাকবেন। সেই মাঝবয়সী আর ইউরেশিয়ানদের মতো দেখতে...

পাইন। সে আর বেশি কী? আপনি বলছেন, মিসেস রোজাই এ ছবিগুলোর মডেল। সে তো প্রথমেই বোঝা যায়। কিন্তু এদিকে এই ছবিটা দেখুন। এই সুন্দর লাইল্যাক রঙের নাইটগাউন পরা মহিলাটিকে। এ যদি কোন বিদেশী ছবির কপি না হয়ে থাকে, তবে, পি. ডির ইনসপিরেশনের হেতু বদলেছে, তারিখও দেখুন। সেমিন্যুড থেকে, এই লাইল্যাক, বেশ কিছুদিন বাদ দিয়ে শায়িতা ন্যুড, আর শেষ এই বাস্টটায় দেখুন সেই মডেলই এক দৃপ্ত রানীর মতো। এই বলে পাইন তার দাড়িসমেত মাথা উপর নিচে করলে। পিসেমশাই অবাক হলেন। কাল রাতে কোন ছবিই খুঁটিয়ে দেখেন নি। এতক্ষণ রোজাকে মডেল করে আঁকা ছবিগুলিতে রেঞ্জারের নীতিহীনতার কথাই ভাবছিলেন। লাইল্যাক ছবিটা দেখে সেই দুর্নীতির আর এক প্রমাণ পাওয়া গেল, ভাবতে গিয়ে চমকে উঠলেন। এটা ফটো নয়। কিন্তু একবার দেখলেই বোঝা যায় এই অতিস্বচ্ছ নাইটগাউনে এটা সুচেতনারই ছবি। যেন নিবিড় ভালোবাসায় আঁকা।

এ সময়েই পিসেমশাই হতাশ আর অবলম্বনহীন মনে করলেন নিজেকে। ঘরটার মাঝমাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাইন ডাক্তারের একটু সুবিধা হল। এই ঘরে একটা র‍্যাকে যে বই রাখা আছে, তা কে জানতো? সে সেদিকে এগিয়ে গেল এবং বই দেখতে শুরু করলে।

পিসেমশাই বললেন, কেমন স্টাফি নয়? বোধ হয় ছবির রঙের জন্য। একটু ঘুরতে গেলে কেমন হয়? এখনও আলো আছে বাইরে।

পাইন বললে, তা আসুন। একা যাচ্ছেন। টর্চ নিয়ে যাবেন। বেশি দূরে না যাওয়া ভালো। এখানে দেখছি দর্শন এথিকস এসব বইও আছে। ঘুমের আগে পড়ার কাজ দেবে।

সেই কলকাতার নাগরিক, বুদ্ধিমান, অ্যাডভোকেট পিসেমশাই প্রভঞ্জনকে বাংলোর বারান্দায় পেয়ে টর্চ চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ একা একা বাইরে ঘুরেই তাঁর অনুভব হল, এই শহর, এই তাসিলা যে এত সুন্দর, তার গোপন কারণ আছে। যেন একটু বেশি একত্রিত করা সৌন্দর্যের উপকরণগুলো। খুব দূরে, কিন্তু স্পষ্টতই এক বাঘের ডাক শুনে চমকে উঠলেন। তখন তাঁর মনে এই ধারণা হল, এটা কৃত্রিম। যাকে আমরা বলি, আমার চেতনার রঙে পান্না হয়েছে সবুজ, এ সেই জগৎ নয়। এখনই রায় দিও না। কিন্তু মনে হচ্ছে এটা অবচেতনের জগৎ। নতুবা সৌন্দর্যের মধ্যে ভয়ের বাঘ?

তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলোয় ফিরলেন। দেখলেন প্রভঞ্জন তখনও বারান্দাতেই বসে। এক ফালি রোদ অবশিষ্ট আছে। সেটাকে কাজে লাগাচ্ছে।

পিসেমশাই বললেন, দেখুন মিস্টার দত্ত, আপনারা এখানে সুচেতনার যে কেয়ার নিচ্ছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, এজন্য ধন্যবাদ দিলে তা যথোপযুক্ত হবে না। খুবই স্যাড যে আমাদের তেমন জামাইকে আমরা হারিয়েছি। সে শহরের লোক, তার এই নির্বাসনের খোলা জায়গায় আসা ভুল হয়েছিল। আপনারা এখানে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, তা কিন্তু আমরা কলকাতায় পারতাম না। একজন মাথার স্পেশ্যালিস্ট, আর একজন মেডসিনের এম. ডি. দিনে তিনচারবাব না ডাকতে

দেখছেন। আর আপনার ওই রোজাটি তো ট্রেনড নার্সই যেন একজন। তা ছাড়া কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথে যদি তেমন ভায়োলেন্ট হয় মেয়েটি, আমি তো আপনার মতো তেমন সামলাতেও পারবো না। আমি বরং আর অন্ন ধ্বংস না করে কালই ফিরে যাই। সুচেতনা সুস্থ হয়ে কলকাতা যেতে চাইলে জানাবেন।

প্রভঞ্জনের মনে হল, সে বলবে, সে কী, আপনিই তো এখানে তাঁর একমাত্র আত্মীয়। আপনি থেকে যান, বরং ওঁর মাকেও আনিয়ে নিন। আমার এই বন্ধুপত্নীকে তার এই অসহায় অবস্থায় পাহাড় থেকে নামানোর উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু এই অ্যাডভোকেটের কথাগুলো তার ভালো লাগল না। তার লালচে গোঁফযুক্ত মুখ একই সঙ্গে স্থূল ও ধূর্ত মনে হল। তার মনে পড়ল, এখানে প্রথম যখন দেখা দিয়েছিলেন তখন কালো স্যুট ছিল পরনে, আর অ্যাডভোকেটের স্কোয়ার সাদা টাই। সে উদাস স্বরে বললে, গাড়ি ধরতে হলে কিন্তু আপনাকে ভোর চারটেতে রওনা হতে হবে। সকাল সাতটায়, সারা দিনরাতের ওই একখানাই গাড়ি তাসিলারোড স্টেশনে। বেশ, পনি রাখতে বলে দেবো।

পিসেমশাই বললেন, তা হলে তাই করুন। আধঘণ্টার মধ্যে যদি আমার ঘরে এক কাপ কফি পাঠিয়ে দেন...

৩

পিসেমশাই তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে চলে গেলে, প্রভঞ্জন কিছুক্ষণ বারান্দাতেই বসে রইল। তখন পাঁচটা হবে বিকেলের কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ধকার। তার এই অভ্যস্ত অন্ধকারও বেশি অন্ধকার মনে হল। আর অ্যাডভোকেটেব নির্দয়তার ফলে, সেই অন্ধকারে সুচেতনা একা এরকম বোধ হওয়ায়, এক কারুণ্যে তার মন সুচেতনাকে রক্ষা করতে আগ্রহ বোধ করলে। আলোগুলো জ্বালানো দরকার। রোগীদের ঘরে ঘরে হারিকেন লণ্ঠন দিতে হবে। সুচেতনার ঘরের পাশে প্যাসেজে চায়ের টেবলে পেট্রলল্যাম্প একটা রাখা দরকার। তার ঘরে হারিকেন দেয়া সেফ নয়।

পাইন ডাক্তারের মনে হল, কাজটা ভালো হয়নি। পিসেমশাই চলে গেলেও সে সেই ক্লাবরুমে বইয়ের র‍্যাকের কাছেই সময় কাটিয়েছে। চিত্র নিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে যা বলেছে, তাতে প্রভঞ্জন সম্বন্ধে সেই অ্যাডভোকেট অফেন্সিব কিছু মনে করলে কিনা কে জানে! নিজের কোন রোগীর অবচেতন সম্বন্ধে আলোচনা করাও প্রফেশনল এথিকসে বাধে। সে সুতরাং বেশ অপ্রতিভ বোধ করছিল। কিন্তু আলোর অভাব বোধ হওয়াতে সে এথিকসের যে বইখানা পড়ছিল সেটাকে হাতে নিয়েই নিজের ঘরে যেতে বেরিয়েছিল।

কিন্তু বাবান্দা দিয়ে চলতে গিয়ে প্রভঞ্জনের আর কলকাতার অ্যাডভোকেটের কথা শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং প্রভঞ্জন আলোর খোঁজে উঠলে, সে অন্যের আলাপ সে রকম ভাবে শোনার জন্য অপ্রতিভ হয়ে প্রভঞ্জনকে অনুসরণ করলে।

তখন জেনও তার রোগিনীকে আর একবার চোখে দেখে যাওয়ার জন্য তার ঘরের কাচের জানলায় দাঁড়িয়েছিল। তার পরামর্শেই দরজা জানালার পর্দাগুলোকে ঘরের ভিতর থেকে সরিয়ে বাইরে থেকে ঝোলানোর ব্যবস্থা হয়েছে। রোগিনীর ঘরে তো লণ্ঠন রাখাও যায় না। অথচ অন্ধকারের ভয় পেলেও চলবে না। রোজা সে জন্য সে ঘরের প্যাসেজে অত্যুজ্জ্বল পেট্রলল্যাম্প রেখেছে ইতিমধ্যে, জানালার পাশ দিয়ে যাতে রোগিনীর ঘরে আলো যায়। সুচেতনার বাসা ছেড়ে সে রকম পালানোর মধ্যে সুইসাইডের আগ্রহ ছিল কিনা, তা এখনও বলা যাচ্ছে না। সে জন্য তাকে শাড়ি

দেয়া হচ্ছে না। নাইটগাউন, শেমিজ, ম্যাক্সি এসব পরতে দেয়া হচ্ছে।

জানলা থেকে সরতে গিয়ে প্রভঞ্জনকে দেখে জেন বললে, আপনি রোগিনীকে সাতটার মধ্যে খাইয়ে দেবেন। আমি আটটায় আসবো আবার। তখন একটা ইনজেকশন দেবো। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েই ডক্টর পাইনকে দেখতে পেয়ে সে প্রফেশনাল এটিকেটে হাসল, বললে, অ্যানালিসিসের বই নাকি? আমার আর ও বিষয়টা পড়া হল না। এম. ডিতে সাইকোসোমাটিকের কয়েকটি লেকচার অ্যাটেন্ড করতে হয় শুধু।

পাইন হেসে বললে, না, এটা এথিকস।

ও আচ্ছা। গুড ইভনিং এভরিবডি।

কিন্তু দুমিনিটও হল না, পাইন, সেই পেট্রলল্যাম্প যার উপরে, সেই টেবলটায় বসেছে, হাতের বইটা খুলে। প্রভঞ্জন কয়েক পা গিয়ে রোজাকে কয়েক কাপ কফি, বিশেষ সুচেতনার আত্মীয়ের জন্য করতে বলে, আবার সেই প্যাসেজে ফিরছে তখন। জেন বড়জোর বারান্দার নিচে নেমে থাকবে। সেও সেই আলোকিত প্যাসেজে ফিরে এল।

তাকে একটা পাপবোধই যেন পীড়িত করছে। গত চারদিনে অনেকবার দেখা হয়েছে তার সকলের সঙ্গে, অনেক কথা হয়েছে, অনেক ঘণ্টা একই ছাদের নিচে কেটেছে, কিন্তু একটা সত্যকে সে গোপন করে চলেছে। তা বটেই, প্রভঞ্জন একবার এক চাইলডের কথা তুলতে চাইছিল, সে তখন না শোনার ভান করেছে। যেন সে কিছু চুরি করতে চায়।

সে একটু ব্যস্ত ভাবে, ডাক্তারদের যেমন চলন তাদের ওয়ার্ডে, সেই আলো রাখা হয়েছে এমন টেবলটার দিকে এগিয়ে, প্রভঞ্জনকে আসতে দেখে বললে, কোথাও বসবেন? আপনার সঙ্গে, আপনাদের সঙ্গে কথা ছিল।

প্রভঞ্জন বললে, এই টেবলেই বসতে পারি। আসুন ডক্টর এয়ার। রোজাকে কফি দিতে বলে এলাম।

চেয়ারে বসেই জেন বললে, আমি আপনাদের কাছে প্রথমেই এই প্রতিশ্রুতি চাইছি, যে সমাধান বার করার আগে আমাদের এখানকার আলোচনা সম্বন্ধে আপনারা কাউকে বলবেন না। অবশ্য, সে হাসল, প্রতিশ্রুতি রাখা না রাখা আপনাদের ইচ্ছা। তারপরই সে গম্ভীর হলে, বললে, সেই ঝড়বৃষ্টি শীতের অন্ধকার রাতে কী কী হয়েছিল মেয়র আর রোজার কাছে জানতে পেরে আপনাদের দুটি বিষয় ছাড়া সবই বলেছি। প্রথম সেই রাতে পোস্টমাস্টার নিজের সম্বন্ধে মেয়রকে যা বলেছিল। মেয়রকেও অনুরোধ করেছি, সে সব কোনদিনই কাউকে বলবে না। সুচেতনার চিকিৎসা দুর্ঘটনার আগে থেকে করছিলাম। তখনও, পরে মেয়রের কাছে পোস্টমাস্টারের কথা শুনে আরও বেশি করে, মনে হয়েছিল, এই সন্তান সুচেতনার বাঞ্ছিত ছিল না। এমন হতে পারে, তাসিলা তার কাছে ঘৃণার ছিল। এখানে তার সন্তান হয়, তা ইচ্ছা ছিল না। তা যখন অনিবার্য হল, তখন সেই সন্তানকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। তাসিলার ভয় এত বেশি যে তার তুলনায় অন্ধকার বনের ভয়ও বরং তার কাছে নিরাপদ আশ্রয় মনে হয়েছিল। অথবা তার হয়তো তারিখটার বিশেষ গুরুত্ব মনে পড়েছিল, সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা হয়েছিল, হয়তো ধরে নিয়েছিল তার পুত্রই হবে। দ্বিতীয় কথা– সুচেতনার নিরাপদে প্রসব হয়েছিল, যদিও পরে ক্লান্তিতে মূর্ছিত হয়েছিল, জ্ঞানও ছিল না।

পাইন ডাক্তার বললে, এতে আমার মনে হয় সুচেতনার চিকিৎসা সহজ হয়ে যাচ্ছে। গর্ভবতীদের সাময়িক মানসিক বিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা সাময়িকই, অবচেতনে বদ্ধমূল কিছু নাও হতে পারে।

রোজা কফি নিয়ে এল। আর তাতে পরিবেশটা যেন হালকা হয়ে সন্ধ্যার কফির টেবল হল। প্রভঞ্জন বললে, কফি নিন।

কফির কাপ তুলে নিয়ে জেন হালকা ভাবে বললে, সে রকম মানসিক বিকার, যাক, সে অবচেতনের কিনা, আপনি ভাববেন। ওটা কি এথিকস?

পাইন। খুব পুরনো। রেঞ্জারের লাইব্রেরিতে ছিল।

প্রভঞ্জন। আপনি কিছু বলছিলেন?

জেন। আচ্ছা, ডক্টর পাইন, আমাদের রোগিনীর সেই সন্তান, একটা প্রবলেম হিসাবে মনে করুন, যদি চিতার পেটে না গিয়ে থাকে, যদি কোন আদিবাসী কুড়িয়ে পেয়ে থাকে, রোগিনীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য তার সন্তানের কী পরিণতি হয়েছে, তা খুঁজে বার করা কি আমাদের উচিত হবে?

প্রভঞ্জন। খোঁজ করতে পারি। কিন্তু যদি সে জীবিত থাকে, তা তো মির‍্যাকল হবে।

জেন। মির‍্যাকল কি ঘটে না? আর, (সে হাসল) সেটা মির‍্যাকলের উপযুক্ত রাত্রি।

মেয়র যখন সুচেতনাকে পেয়েছিল তখন তো বড়দিনের সেই মাঝ রাত হতে যাচ্ছে।

প্রভঞ্জন। আমি প্রায় কিছুই জানি না। আপনার নির্দেশমতো আমি মেয়বের সঙ্গে কথা বলিনি। ধরে নিয়েছিলাম, আপনি যদি তাকে কথা বলানো যুক্তিসম্মত মনে করেন, নিজেই বলবেন। রোজা বলেছে, মেয়র সুচেতনাকে রোজার হাতে পৌঁছে দিয়ে আবার বেরিয়েছিল। আর ঘণ্টাখানেকেব মধ্যে আপনি চিকিৎসা করতে এসে গিয়েছিলেন। আহা, যদি সে সন্তান ফিরে পেতো!

জেন। তাই কি? ফিরে পেলেই কি সমস্যা মেটে।

প্রভঞ্জন। যার ছেলে তাব কাছে এনে দিতে পারাই কি সব চাইতে শুভ হয না?

পাইন খিকখিক করে হাসল। বললে, সবই হাইপথেটিক্যাল। সেই শীতের বর্ষায় সেই সদ্যোজাতর হার্ট লাংস কি টিকেছিল? ভরসা করি রোগীর ভায়োলেন্সকে কমাতে এরকম মিথ্যা আশ্বাস কোন ডাক্তার তাকে দেবে না।

প্রভঞ্জন মনে মনে বললে, মিথ! সত্যি কি কেউ মিথে বিশ্বাস করে? তার মনে পড়ল, পোস্টমাস্টার জেন এয়ার নামটাকে ছদ্ম মনে করতো। সন্দেহ করতো, ক্লটলং-এ তার থাকার পিছনে গুপ্ত রাজনৈতিক কারণ আছে। কিন্তু তার জন্যই, বিশেষ ডাক্তার হিসাবে জেনের আদৌ চাকরি করা দরকার ছিল না, সে অবস্থায় এখানে ক্লিনিক করে, এখানে সমাজের বাইরে, বনেই প্রায় থেকে যাওয়া চার্চের কাজ নিয়ে–এর মধ্যে কি বিশ্বাসের ব্যাপার থাকতে পারে না? তার মনে পড়ল দুদিন আগে জেন যখন স্টেথো নিয়ে বুক দেখতে সুচেতনার উপরে ঝুঁকেছে তখন সুচেতনা জেনের ব্লাউজ চেপে ধরেছিল। তখন জেনের গলার সোনার হার বেরিয়ে এসেছিল, আর সে হারের জেডের লকেটটা একটা ক্রস যাতে হালকা রিলিফে ক্রাইস্ট। সুচেতনা ভাগ্যে হার চেপে ধরেনি।

জেন। আপনি কি ভাবছেন, সেই সন্তান ফিরে এলে দুর্ঘটনার ট্রমাব স্মারক হয়ে সুচেতনার আরোগ্যে বাধাই দেবে?

প্রভঞ্জন। এমনও হতে পারে, ডক্টর এয়ার, সেই সন্তানই তার অবলম্বন হবে, দুর্ঘটনার গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া পূর্বজীবনের সৌন্দর্যের স্মারক।

পাইন। আরও হাইপথেটিক্যাল। রোগিণীর বয়স খুবই কম। আরোগ্যলাভ করলে সে কোন পুরুষের ভালোবাসায় সাড়া দিতেও পারে। তখন এই সন্তান, যদি মিরাকিউল্যাসলি তার কাছে ফিরে আসে, বাধাই হবে না কি?

প্রভঞ্জন একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, ডক্টর পাইন, আপনার চিকিৎসা অবশ্যই খুবই মূল্যবান। কিন্তু এমনও হতে পারে, যে পুরুষ সুচেতনাকে ভালোবাসবে, সে তার সন্তানকেও ভালোবাসবে। তা ছাড়া মায়ের মনে কি নিজের পুরুষ আর নিজের সন্তানকে একইসঙ্গে ভালোবাসার প্রসার থাকতে পারে না?

প্রভঞ্জন ও পাইন একই সঙ্গে পাইপ বার করলে। তা দেখে জেন সিগারেট ধরালে। প্রভঞ্জন

বললে, আপনি স্মোক করেন, জানিনে। সরি, কখনও আপনাকে অফার করিনি।

জেন। সে কিছু নয়। খুব ক্লান্ত হলে কখনও সখনও। (ধোঁয়া ছেড়ে) অন্য একটা দিকও আছে। সেই চারদিনের সন্তান যদি কোন আদিবাসীনীর কোল পেয়ে থাকে, সে যদি সেখানেই থাকে, তবে তার বুকের কাছে মানুষ হয়ে তাকেই মা বলে জেনে স্বচ্ছন্দে বাড়বে। অন্যদিকে সুচেতনার কাছে ফিরে বড় হয়ে যদি কখনও এই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারে, তখন তার কাছে নিজের জন্মটাকেই পাপ মনে হতে পারে। নিজেকে পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করতে পারে।

পাইন। একটু ভাবার সময় নেয়া যাক। ডক্টর এয়ার, আপনি কি আমার সঙ্গে একমত হবেন? যদি বলি দারুণ এক মানসিক আঘাত ভুলতে গিয়ে রোগিনী উন্মাদ? এই যে ট্রমা, তা ভুলতে মন তাকে কী আকারে রোগিনীর অবচেতনে নামাবে, তা কি এখনই বলা যাচ্ছে? সুচেতনার দৈহিক আরোগ্যের পরে মানসিক সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য কতদিনে আসবে, তা কি এখনই বলতে পারি আমরা? পারি না। অন্তত কয়েকমাস গেলে সুচেতনার কাছে কোন মির‍্যাকল বোধ দেয়া যায় কি না তা চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে বলা যাবে। তার আগে রেঞ্জারের খোঁজখবর নেয়া কি ভালো হবে? ব্যাপাবটা ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট হতে পারে।

প্রভঞ্জন আবার একটু উত্তেজিত হল। বললে, ডক্টর পাইন, আপনি আমার উপকারী বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু একটা কথা কি, আপনি ট্রমা অবচেতন যত মাথায় রাখেন এথিকসকে বোধ হয় ততটা নয়। সরি। আমি বলতে চাইছিলাম মনের কথা, যে মন সত্য বলে, মিথ্যা বলে, ভালোবাসে, ভালোবেসে ভয়কে জয় করে, যে মন ঘৃণা করে, বিদ্বেষ করে, আবার পরের বিপদে নিজের প্রাণকে বিলিয়ে দেয়ার দৃঢ় সাহস রাখে। হাঃ, তার কথা বোধহয় আপনার কাছে তত মূল্যবান নয়।

জেন বললে, হাইপথেটিক্যালই ব্যাপারটা। এমনও হতে পারে সেই আদিবাসিনীরও পরে মনে হতে পারে, খোঁজ করে মায়ের সন্তান মাকেই ফিরিয়ে দিই।

পাইন। আপাতত তা চাইছি না। ওটা কমপ্লিকেশন হবে। সুস্থ হলে সুচেতনা মনে করুক বরং, সে স্বামী ও সন্তান একসঙ্গে হারিয়েছে। শোকও মানুষকে সুস্থ করে।

জেন উঠে দাঁড়াল। বললে, থ্যাঙ্ক ইউ ফর কফি। রোগিনীকে আপনি, কিন্তু, মিস্টার রেঞ্জার, সাতটার মধ্যে খাইয়ে দেবেন। সাড়ে পাঁচ হল। আমি আটটায় আসবো ময়রকে দেখতে, তখন সুচেতনাকেও ইনজেকশন দেবো। ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও সে তো এক মাদার সুপিরিয়ারও। প্রভঞ্জনের সন্দেহ হল, এতক্ষণ এই সব দুঃখের আলোচনা করে জেনের চশমার নিচে বাষ্প দেখা দিয়েছে।

ডাক্তারি ব্যাগ তুলে নিয়ে গুড ইভনিং বলে জেন বেরিয়ে গেল। প্রভঞ্জন বারান্দায় টর্চ নিয়ে এগোল। জেন পনিতে উঠে স্যাডলের আঁকড়া থেকে টর্চ নিয়ে জ্বালিয়ে ব্যাগটাকে স্যাডলের পমেলে আটকে রওনা হল। রেঞ্জারের নির্দেশ মতো পনির সহিস পনির সঙ্গে চলল। তার কোমরে বাঁধা ভুটিয়া তরোয়াল। পথটার দুপারেই বন। রাতের বেলার সহিসের হাতের লাঠি মশাল হয়ে জ্বলে।

সুচেতনার অদ্ভুত আর্ত চিৎকারে ময়ূরের তন্দ্রা টুটে গেল। যদিও জেনের পরামর্শে তার ঘর আর তার লাগোয়া বাথরুম, বাংলোর অন্য অংশ থেকে দরজা বন্ধ করে পর্দা টেনে পৃথক করে দেয়া হয়েছে।

ময়ূর অনুমান করলে, এখানে এই বাংলোয় এমন আর্তনাদ সুচেতনাই করতে পারে। যতদূর সম্ভব নরম করে হলেও কাল লাঞ্চের পর থেকে শুরু করে আজ সারাদিনে, ধীরে ধীরে সবই তাকে বলেছে জেন।

পাছে কেউ আচমকা খবর দিয়ে ময়ূরকে বিপদে ফেলে, সেজন্য জেন তাকে সময় নিয়ে, ধীরে, পোস্টমাস্টারের মৃত্যুর খবর, সুচেতনার উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথাও বলেছে। সে অবশ্য সব খবর থেকে ময়ূরকে দূরে রাখতে পারে নি। বিরিঞ্চি পোস্টমাস্টারের মৃতদেহ নিয়ে নিজের বুদ্ধিতেই

মেয়র-বাংলোয় এসেছিল। কারণ সে অনুমান করেছিল, পোস্টঅফিসে নিয়ে গিয়ে সেই বিকৃত মুখ পোস্টমাস্টারের স্ত্রীকে দেখতে দেয়া উচিত হয় না। ভিড় হয়েছিল বারান্দায়। বিরিঞ্চিকে তো বলতেই হবে, কী ভাবে সে পেয়েছে। জেন তাকে থামতে ইঙ্গিত করছিল, কিন্তু কোন এক মৃতদেহের কাছে ঝুপ করে এক শকুন নামার কথা ময়ূরের কানে গিয়েছিল। আর জেন, তাড়াতাড়ি তার ঘরে এসে বারান্দার কাছাকাছি ফ্রেঞ্চ উইনডোটাকে রোদ আসছে বলে বন্ধ করে দিয়ে ময়ূরের বিছানার পাশে বসেছিল, হাতে হাত রেখে নিজের মুখে ঘটনাগুলো জানাতে।

আর্ত চিৎকারে ময়ূর তার বুকেই যেন আবার ধাক্কা খেল। কিন্তু তখনই বললে মনে মনে, না, না, বিচলিত হওয়া নয়। জেন বলেছে, ভাববে না। নড়বেই না, যদি না নড়ে চলে। আর কয়েকদিনে সেরে যাবে। কী হয় ভেবে?

ময়ূর নিজেকে বললে, তার চাইতে বরং ভাবো, আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময়ে কেমন দেখিয়েছিল ম্যাডামকে। জেন তার জন্য চিকেন সুপ করে এনেছিল। রোজার তৈরি ব্রেকফাস্টের কিছু অংশের বদলে সুপটাই বরং বেশি খাইয়েছিল। তখনই সে প্রথম লক্ষ্য করেছিল, ম্যাডামের কপালের উপরে চুলগুলো সিঁথির দুপাশে ছোট ছোট খিলানে তোলা আজ। ভালো লাগলেও, তার সে রকম তাকিয়ে থাকা ভালো হয়নি।

সে বললে নিজেকে, আচ্ছা, দেখো, আজও আবাব জেন বলছিল, সে কেমন ভীরু। আবার একদিন ভয় পেতে পারে। তখন একজন শক্ত মেয়র না পেলে কী মুস্কিল! অথচ বোঝাই যাচ্ছে, সেই ঝড়বৃষ্টির রাতেই জেন থেনডুপদের সঙ্গে করে তাসিলায় আসতে সাহস পেয়েছিল। এখন তো নিজেই বলেছে, সেই রাতে প্রায় সারারাত একা একা ওষুধের ব্যাগ নিয়ে পোস্টঅফিস আর এই এক নম্বর বাংলোর মধ্যে যাওয়া আসা করেছে, যদিও এটা দ্রুকেরও দেশ, বাঘেরও দেশ। আর এখনও দেখো, তাকে ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে ক্লুটলং যেতে যেতে রাত নটাও পার হয়ে যায়। সেই অন্ধকারে ক্লুটলং যাওয়া, থাকলই বা একটা পনি আর তার সহিস তার সঙ্গে।

সেই আটটা-নটার রাতে এই এক নম্বর বাংলোর বাইরে, থাকলই বা টর্চ, সমস্ত তাসিলা পাহাড়ে একটা কেরোসিন কুপির আলো থাকে কিনা সন্দেহ, একজন মানুষ জেগে থাকে কিনা সন্দেহ। আর দ্রুক বাঘকে ভয় পায় তার প্রমাণ নেই। পাশাপাশি তারা থাকতে পারে। ডিএফওর সার্কুলারে আছে।

ভয় পাওয়ার কথা, আচ্ছা ভয় বলো আর যাই বলো, সে তো নিজের শরীরটাকেই। কে তবে ভয়টা পায়? ভয় তো বটেই, ফেলে যাওয়া রেলকামরায়, এক গুহার কোলে পালাতে হয়। যে ভয় পায়, সেই কি আবার অর্কিড খোঁজে? নাকি বলবে, শরীরটা সেভাবে নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করে?

কিন্তু এদিকে দেখো, এখনও তো দিনের বেলাই, তা হলেও পোস্টমাস্টারের স্ত্রী কাকে ভয় পেলেন? যে অমন বোবাকান্না!

আজ ব্রেকফাস্টের পরে তার মাথার কাছাকাছি বাঁয়ের বড় জানালাটাকে খোলা হয়েছে। রোদ আসছে। লনের খানিকটার পরে নীল-বেগনি পাহাড় আর সাদাটে মেঘ চোখে পড়ছে। ময়ূর স্থির হয়ে দৃশ্যটাকে দেখতে লাগল।

কিন্তু পরে আবার সে ভাবলে : কালতো আবার জেন বলেছে, যারা খুব বেশি ভাবে, বেশি অনুভব করে, তাদের ধার্মিক, কবি, এমন সব হতে হয়। না হতে পারলে বুকের কষ্ট নিয়ে কী করবে? কোথায় রাখবে সেই কষ্ট?

ধার্মিক? ময়ূরের মুখে হাসি ফুটল। ভাবলে সে, রসো, আজ জেন ম্যাডাম এলেই জিজ্ঞাসা করবে, যদি ময়ূরও ধার্মিক হয়? সেই গ্রেগ পাগলা কিন্তু ধার্মিক ছিল। আর কবি? কবি হওয়ার

মতো এখানে একজনকেই দেখেছে। তেমন বুদ্ধি, অনুভব কবার শক্তি গানকে, ছবিকে তেমন ভালোবাসা! গান আর ছবিকে তেমন ভালো না বাসলে, কিছু দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড আর ছবির বইয়েব জন্য তেমন জীবনের একমাত্র আর ভয়ঙ্কর ভুল কেউ কবে না। আর করলেও বোধহয়, তেমন যন্ত্রণা কেউ পায় না। কী অকারণ ভয়ও ছিল সেই যন্ত্রণায়, যে তাকে, ময়ূরকে পর্যন্ত, ভাবতেন ছদ্মবেশী পুলিশ।

কিন্তু ময়ূর নিজেও একটা যন্ত্রণা বোধ করলে। জেন বলেছে, পোস্টমাস্টার সেই রাতে দশটাব কাছাকাছি সময়ে অনেক টেলিগ্রাম কবেছিলেন, রেঞ্জারকে, উপরওয়ালাকে। টেলিগ্রাম করতে তো সময় লেগেছিল। তাহলে বোঝা যায়, পোস্টমাস্টার পোস্টঅফিসে ফিবেছিলেন, হয়তো আবার বেরিয়ে পড়ার আগে দশটা সাড়ে দশটার সময়ে ডাকঘবে ছিলেন। সে কি তার কাছাকাছি সময়েই সুচেতনাকে খুঁজে পায় নি? যখন সে খুঁজে পেয়েছিল, তখনই তাকে পোস্টঅফিসে নিয়ে এলে, হয়তো পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। তাহলে? দেখো, দেখো, সে নিজেই কি পোস্টমাস্টারের মৃত্যুর জন্য দায়ী হচ্ছে না? তার তো, দেখো, মনে পড়ছে সুচেতনার সে ব্যাপারে সে ঘাসে হতভম্ব হয়ে বসে কী সব দ্বিধা করছিল কতক্ষণ ধরে। বোধ হয় পাপ কিনা ভাবছিল। বিতৃষ্ণা অনুভব করার কী অধিকার ছিল তার? আর, দেখো, মনে পডছে, বোধ হয় বোকার মতো ভাবছিল, সেই সদ্যোজাতটিই ময়ূর কিংবা তা না হলে তার ভাই।

এই নতুন সংবাদ শুনে সে দিশেহারা হয়ে গেল। আগে জানলে তো ম্যাডামকে বলা যেতো। বলা যায় তার এই দায়িত্বের কথা? যা খুব কম হয়, তেমন হঠাৎ তা দুচোখ ভরে জল এল।

কিন্তু যতদূর সম্ভব হুঁসিয়ার হল সে। সংবাদ কেন? মনেই ছিল তার, মনে আসে নি। মনে করাই তো বারণ। ম্যাডাম বলেছে, কোন রাগেব কথা ভাববে না, কোন দুঃখের কথা ভাববে না, এমন কি নিজের কোন কাজের জন্যও দুঃখ করবে না। বিকেল হয়ে যায়, ম্যাডাম কি আসবে না? নিজেকেই প্রথমে ক্ষমা করতে হয়। বলেছে, এসো ময়ূর, আমরা নিজেকে ক্ষমা কবে ফেলি। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। কী সুন্দর ম্যাডামের সেই হাসি! কিন্তু তখনই জেন এল। এটা কি ইচ্ছাকৃত, বুদ্ধি করে করা, যে এখন তার উপস্থিতি আরও সুঘ্রাণের? সে ময়ূরের পাশে বসল তার বিছানায়। তার চোখে জল দেখলে, ব্যাগ নামিয়ে রাখলে, গাউনের হালকা নীল গলার কাছে হাত দিয়ে রুমাল বার করে চেপে চেপে ময়ূরের দুচোখের বাইরের প্রান্তদুটি থেকে যেন বাড়তি জলটুকু মুছে নিলে। নতুবা শান্ত নিঃশব্দ চোখের জলে তার আপত্তি নেই। ধীরে অশ্রুস্রাব হলে বুকে ধুকপুক কমেই বরং।

সে স্টেথোতে রোগীর বুক দেখলে, হাত তুলে ঘড়িতে মিলিয়ে নাড়িব গতি দেখলে। বললে, প্রায় স্বাভাবিকের দিকে। সে ময়ূরের হাতটাকে তখনই বিছানায় শুইয়ে না দিয়ে নিজের গলার কাছে তার আঙুলগুলোকে রেখে চিবুক দিয়ে একটু চেপে ধরলে। বললে, চোখে জল কেন? ভাবছিলে নাকি, ডাক্তার এল না? বেশ ভালো আছো। আর কিছুদিন একা থাকতে হবে। এখন এখান থেকে ক্লুটলং-এ শিফট করতে পারি না। সব সময়ে থাকি না কেন? ওই দেখো, সব সময়ে দেখলে চিকিৎসা হয় কি? বোঝাই যায় না রোগীর কতটা উন্নতি হচ্ছে। তা ছাড়া তোমার সেই ছেলে ময়ূরবাহন! একটু ব্রংকাইটিস মতো হয়েছিল। আজ সকাল থেকেই বেশ ভালো আছে। জানো কাণ্ড! লিম্বুর স্ত্রীর মেয়েটির বয়স ছমাস হল। সে বললে, তোমার ছেলেকে তার বুকের বাড়তি দুধ দেবে কি না। সাতপাঁচ ভেবে বললাম, তা দাও। দিলে, আর তোমার ছেলেও বেশ টেনে টেনে খেলে। অনেক দুধ লিম্বুর স্ত্রীর। এটা ভালোই হল। মায়ের দুধে অনেক রকমের ইমিউনিটি থাকে। আমি জানি না, সেই দুধ খেয়ে মাটিতে শুয়ে মানুষ হওয়ার, বনবাদাড়ে ঘোরার, যে কোন জল খাওয়ার, কম খাদ্যে স্বাস্থ্যবান থাকার, এসব ব্যাপারে ইমিউনিটি হয় কিনা—হলে তা পাচ্ছে। আচ্ছা

ময়ূর, অর্কিডে কি জল দিতে হয়? আজ সকালে ফিরে গিয়ে ক্রিস্টমাস সন্ধ্যায় তোমার ঝোলানো অর্কিডগুলোতে একটু জল দিয়েছি। মনে হল দড়িতে ঝোলানো ডালের টুকরোগুলো যেগুলোকে অর্কিড শিকড় আঁকড়ে ধরে আছে, সেগুলো বেশ শুকনো। পরে বোধ হয় টিলার উপরে বার্চগাছে কিংবা ক্যাশিয়াটাতে বসিয়ে দিতে হবে। আঙুলের ডগা দিয়ে ময়ূরের ঠোঁট ছুয়ে সে আবার বললে, না তুমি কথা বলবে না। আমি অন্যদিনের চাইতে আগে এসেছি। এখনও বিকেলের চায়ের সময় হয়নি–ভিজিটিং আওয়ার্স। গল্প করতেই তো এসেছি। মজার গল্প শোনো। আজ ফিবে দেখি, লিম্বু তার জমি থেকে কয়েকটা আলু তুলেছে। বেশ বড় আর গোল আর সাদারঙের। অবাক লাগে না? লিম্বুই বললে, প্রথম আলু মেয়রসাহেবকে দিতে হয়। বুঝলে? রসো, কাল সকালে আসবার সময়ে নিয়ে আসবো। কাল লাঞ্চে রোজা তোমাকে বেকড পোট্যাটো করে দেবে। আর নরবুর সেই পেয়ারাগাছ? তিন চারটে নতুন পাতা মেলেছে কিন্তু। কী? সময় কাটতে চায় না। আচ্ছা একটা দুটো হু হাঁ করো আমার গল্প শোনো। আচ্ছা, তোমার মনে আছে, ময়ূর, কেউ বলেছিল, তা-ই যদি, ডানা এমন মেলে দাও কেউ আমাকে দেখতে না পায়। সে কিন্তু খুব বড় সাদা রাজহাঁস ছিল যাকে আগে কেউ এরকম বলে থাকবে ভয়ে। এসব কথা মনের কোথায় থাকে, হঠাৎ প্রকাশ পায়। কিন্তু পরামর্শ শোনো। ওই ময়ূরবাহন, পরে ভাবা যাবে অন্য নাম রাখতে হবে কিনা, ওকে ডাক্তার করতে হয় না? আমি যখন পঞ্চাশষাটের বুড়ি, ওই ছেলে তখন হসপিট্যাল চালাবে। আচ্ছা, না হয়, ধরো তখন সে আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে স্পেশালিস্ট হতে গিয়েছে, মনে করো সে রকম কোন রোগের চিকিৎসা শিখতে যা আমরা এখানে সাহস করি না। হাসছো? ছেলে কেন ফিরবে ক্লুটলং-এ? নাই ফিরলে। ভালোই তো, মনের মতো বউ পেয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে সে দেশে কিংবা কোন বড় শহরে থেকে গেল। গেলইবা। একবারও কি তাদের আমার কাছে আনবে না দেখাতে? তাও ভেবেছি কাল রাতে। আমি হয়তো তখন ষাটসত্তরের এক বুড়ী, অপারেশন করতে পারি না আর। রোগীদের মৃদু মৃদু ওষুধ দিই। তখন জ্যোতি কমে আসা চোখের সামনে দিনের আলো কমলা রং নিতে থাকলে এক ছফিট বুনো প্রৌঢ় সস্নেহে সূর্যডোবানোর এক গ্লাস হুইস্কি সেই বুড়ীর হাতে দিতে পারে না? তখন হয়তো ইম্পিরিয়ালের বদলে মুখে ঝুলো ওয়লরাস মার্কা গোঁফই না হয় হল। মেয়রদের ইম্পিরিয়ালই থাকতে হবে এমন কথা নেই। কী? সময় কাটতে চায় না?

ওটাতো ময়ূরেরও অনুভূতি, কিংবা সময়ই কোথায় যে কাটাতে হবে? ভাবনা চিন্তা না করে সময়ের একটা স্থির জলাশয়ে ভেসে থাকা নয়? তার ছোট ছোট তরঙ্গ, যা যেন জলের চোখ মিট মিট করা, তা ভেসে থাকতে সাহায্যই করে। নিয়ম মতো সময়ে ম্যাডাম ডাক্তার আসে, দিনে একবার করে সেই আর এক ডাক্তারও আসে ম্যাডামের সঙ্গে, রোজা আসে কয়েকবার, পেমাও আসে। রেঞ্জারও কি এসেছেন কয়েকবার? সকালে চা, ব্রেকফাস্ট, দুপুরের খাওয়া, বিকেলের চা, রাতের খাওয়া, এগুলোর সময়ে ম্যাডাম নিজে থাকে, রোজা থাকে। ঘরে হারিকেন দেখে রাত্রি বোঝা যেতো, নতুবা কাল পর্যন্ত পর্দা চোঁয়ানো দিনের স্তিমিত আলোয় রেখেছিল তাকে ডাক্তার। কাল সকালেই বোধ হয় প্রথম পর্দা গুটিয়ে দিনের আলো, রং আর তীক্ষ্ণ বাতাসকে ঘরে ঢুকতে অনুমতি দিয়েছে। নতুবা বলতে হয়, কাল থেকেই সে আলোর তফাৎ বুঝতে পারছে। কতদিন এমন? অথচ সে বুঝতে পারছে, এটা এক নম্বর বাংলোয় তারই শোবার ঘর, যার বিছানায় এখন জেন ম্যাডাম তার পাশে বসে। তার ঘর তো বটেই। ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে ছোট আলনায় তার ইউনিফর্ম। যার নিচে তারই বুট আর স্যান্ডাল। তার উত্তরে সরে ছোট গানর‍্যাকে তারই রাইফেল। আসলে এ ঘরের ফ্রেঞ্চ উইনডোতে বা দরজায় এসব পর্দা ছিল না। কতদিন? এক সপ্তাহ, দশদিন, দুসপ্তাহ?

কিন্তু জেন তখনই বললে, কাল থেকে কিন্তু তিনবার করে আসবো না। দুবার দেখে যাবো।

সকালে আর সন্ধ্যায়, তাতে ওষুধের অ্যাকশন ভালো ধরতে পারবো। আচ্ছা বেশ, ব্রেকফাস্ট আর রাতের খাওয়ার সময়ে থাকবো। রোজা শিখে নিয়েছে কি করে খাওয়াতে হয়। কাল থেকে ওষুধও কমে যাবে। তা ছাড়া কাল থেকে নিজের ওষুধ নিজে খাবে। সামনের টিপয়ে গোছানো থাকবে। আজ দুপুরে ঘুমের ওষুধ দিই নি। এখন থেকে রাতে একটা করে খাবে।

আরও কিছুক্ষণ জেন ময়ূরের পাশে বসে রইল তার মুখে চেয়ে, কখনও বা তার হাতে, ক্বচিৎ বা তার চুলে হাত রাখলে। বাইরে মৃদু পায়ের শব্দ হতে সে বললে, তা হলে চারটে হল। সে ঘড়িও দেখলে। রোজা চা আনছে। সে খাইয়ে দেবে। আমি উঠবো। সুচেতনাকে দেখে ক্লটলং-এ ফিরব।

রোজা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলে জেন উঠে দাঁড়াল। বললে, ধীরে ধীরে খাও। ভয় নেই। আমি আরও আধঘন্টা কয়েক হাত দূরেই আছি। তোমার ডিনার রাত আটটায় দেবে, তখন আবার আসবো। সন্ধ্যার হিমে পর্দা টেনে না দেয়া পর্যন্ত পাহাড় দেখো। দেখো ওরা কত স্থির। জেন চলে গেল। রোজাও মেঝেতে ট্রে রেখে চা করে ফিডিংকাপে করে দশ মিনিট ধরে চা খাইয়ে, গায়ের রাগ গুছিয়ে দিয়ে, প্যান পালটে দিয়ে চলে গেল।

এখনও বাইরে দিনের আলো। ফুলগুলো এখন রাতভোর ঘুমানোর জন্য স্থির হচ্ছে। ময়ূর ফুলের লনের উপর দিয়ে পশ্চিমের আলো যাতে পড়ছে সেই পাহাড়ের দিকে চাইল। পাহাড় কী রং বোঝে যে পশ্চিমের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে? একটু আশ্চর্য লাগল। এতদিন এ ঘরে থেকেও এ পাহাড়টাকে অপরিচিত মনে হচ্ছে। তা হলে বলতে হয়, সে এরকম স্থির হয়ে তাসিলার কিছুই দেখে নি। সিনেমার ছবির মতো শুধু সরে সরে যেতে দেখেছে?

সে হাসিহাসি মুখে ভাবলে, ভুলেই গেলাম, একবার মনে হয়েছিল, জেনম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করা যেতো ঠাট্টা করে গ্রেগের কথা তুলে। বলা যেতো, ধার্মিক হলে বুকের কষ্ট কম থাকে যে বলেন, একজন বুকের কষ্ট কমাতে ধার্মিক হতে হতে গ্রেগের মতো হলে কী করতেন?

সন্ধ্যা হল। রোজা হারিকেন হাতে এসে শিয়রের দিকে দরজার কাছে রেখে, পায়ের দিকের আর বাঁয়ের দিকের জানালা বন্ধ করে পর্দা বেশ করে টেনে দিয়ে গেল। ময়ূরের মনে হল, তা হলে এতদিন এই নিয়ম ছিল। জানালা বন্ধ হয় না, সারা দিন যাতে বাতাস চলে।

আর সেই স্তিমিত আলোর আধ-অন্ধকারে ময়ূর ভাবলে, না, সে উত্তেজিত হচ্ছে না। ম্যাডামের ইচ্ছা নিশ্চয়ই মানতে হয়। কিন্তু ভেবে দেখো, সে সবই তো একজনের অন্য আর একের থেকে পালানোর চেষ্টা। অথচ, মোর যখন সেই হকার, কারো কি এত ভাবনা ছিল? কেউ কি বুকে এত অসুবিধা বোধ করেছে? নাকি তখন মহাজনের টাকা শোধ করা, নিজের খাওয়ার জন্য কিছু রাখা ছাড়া, আর কিছু যদি মনে থাকতো তা সেই ঢাউস ঢাউস গাড়িগুলোর উর্দ্ধশ্বাসে ছোটা, থামা, ছুটন্ত উন্মাদপ্রায় যাত্রীদের মিছিল। হৈহট্টগোল, আর তার মধ্যে দিয়ে যে যার ডালা বাঁচিয়ে ছুটন্ত গাড়িতে ওঠা নয় শুধু, এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার একাগ্র দুশ্চিন্তা। কখনও মনে হতো বটে, প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে আসা কালো দানবের মতো এঞ্জিন তার আগুনে গরম নিয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে যাবে, সেখানেই যেন পাতা আছে সেই রেললাইন যা সেই এঞ্জিনের দাপটে থরথর কাঁপছে। এসব শুনলে সেই বুঁচকু বলতো, সরে দাঁড়া, মোর, বিশ্বাস নেই। রেললাইন কাউকে কাউকে টেনে নেয়। নাকি সেই হকারি ছিল আর এক পালানো? আর তেমন করে নিজের শরীর থেকে অবিরত ছুটে পালাতে গেলে বুকের আইঢাই বেড়েই যায়, এঞ্জিনের আপশানিতে তুমি বুঝতে না পারলেও।

অবশ্য, এখন সেই সময়ের জলায় ভাসতে ভাসতে কে কোথায় পালাবে? মুরারি, মোর, ময়ূর ভাসতে ভাসতে গায়ে গায়ে জমে গিয়েছে। জলে ভাসা জিনিসগুলো তলায় কেন যে এক জায়গায় জড়ো হয়, তার কি কোন আইন আছে?

না, না। জেন বলেছেন, অনুশোচনা নয়। নিজেকেও ক্ষমা করা। তার মানে স্থির, শান্ত হওয়া।

সন্ধ্যার পরে, হারিকেনের স্তিমিত আলো তখন ঘরে, জেন এল। ময়ূর জিজ্ঞাসা করলে, যান নি?

গিয়েছিলাম। তুমি তো এখন খাবে। তাই আবার এলাম।

কত রাত হয়েছে?

বাহ্, আটটা বাজে।

কোথা দিয়ে চার ঘণ্টা চলে গিয়েছে।

রোজা খাবার ট্রে নিয়ে এসে টিপয়ে গুছিয়ে দিলে।

জেন ময়ূরের মাথার বালিশ উঁচু করে দিলে। বললে, ধীরে ধীরে খাবে, আমিও ধীরে ধীরে দেবো। আমরা কখনই মনে করি না খাওয়াটাও একরকমের পরিশ্রম! আমি গল্প করতে থাকি, তুমি ধীরে ধীরে খাও। আর সাতদিন এরকম। পরের সপ্তাহে কোন এক সময়ে দেখা যাবে, এই ঘরের মধ্যে টেবল চেয়ার দেয়া যায় কিনা, যদিও এখনই অনেক ইমপ্রুভ করেছো। চামচে ময়ূরকে খাইয়ে দিতে দিতে জেন আবার বললে, সুচেতনাকে রাতে রেঞ্জার খবরদারি করেন। রোজা উঠে উঠে তোমাকে রাতে দেখে যায়। আমি ক্লুটলং-এ পৌঁছালে সহিসের সঙ্গে পেমা আসে এখানে, দরজার বাইরে রাতে থাকে। বেশ ছেলেটি এই সহিস। পেমাকে পৌঁছে দিয়ে পনি নিয়ে ক্লুটলং-এ ফেরে, সকালে আমার আসার জন্য যাতে পনি ঠিক থাকে। এখনও বাংলোর বারান্দায় আসার জন্য অপেক্ষা করছে।

ময়ূর ধীরে ধীরে দুইহাত জড়ো করে নত চোখে কিছু মিনতি জানালে।

জেন বুঝতে চেষ্টা করলে। ময়ূরের মুখের দিকে ভালো করে দেখে বললে, কিন্তু, মেয়র, সার, আর দিন দশেকে আমরা ঘরের মধ্যে দুএকবার হাঁটার অনুমতি পেতে পারি। এখনই আমরা বিছানাতেই উঠে বসতে পারি কি? রোজা বলেছে, তার দুই স্বামী ছিল, সে জানে কি করে নিঃশব্দে পুরুষদের সেবা করা যায়। তাছাড়া তুমি নাকি কবে তাকে কোন ট্রুকের আগুন থেকে বাঁচিয়েছিলে। আর পেমা বলেছে, তুমি ডম্বরির গত জন্মের ভাই ছিলে। তাকে কবর দেয়ার সময়ে চিনতে পেরে বইনি বলে কেঁদে উঠেছিলে। ওরা এই সব জন্মান্তরে খুব বিশ্বাস করে। সে হিসাবে তুমি পেমার ছেলেই হলে। বেশ তো, আজ থেকেই আমরা কিছু কিছু স্বাধীনতা পাবো। তখনই বলেছি, আজ রাত নটার বড়ি আর ঘুমের বড়ি নিজেই খাবে। বেডসাইড টিপয়ে ফিডিংকাপে জল আর বড়ি থাকবে তোমার ঘড়ির পাশে। আর এই স্প্রিং-এর কলিংবেল। এটা শর্মা এনে দিয়েছে জেলা সদর থেকে। দরকার মতো ওষুধও সে কিনে আনে। পেমা আসতে ছটফট করে, কিন্তু আমি না গেলে সে আসতে পারে না। আমাকে বা তাকে তো ক্লুটলং-এ থাকতেই হয়। তোমার যে ময়ূরবাহন, তাকে এক মুহূর্ত একা রাখা যায় না। এই শীতে মায়ের শরীরের উত্তাপ বোধহয় চায়। কাল থেকে রাত দশটাতেও তাকে একবার দুধ খাওয়াতে হচ্ছে। ওটা আবার পেমাই ভালো পারে। ময়ূর বললে, ময়ূরবাহন আমার তো নামেই। যে প্রাণ ফিরিয়ে দিলে প্রাণ তারই তো, আপনারই। ময়ূরের খাওয়া শেষ হলে জেন তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, সুচেতনার খাওয়া হয়েছিল, তাকে রাতের ইনজেকশনটা দিয়েছি। তোমার সারা শহরে একটা কি আলো আছে? থাকলই বা সহিস মশাল নিয়ে সঙ্গে, বনের পথে আমার বুঝি ভয় করতে নেই? দেখে রাখো, তোমার ঘড়ির পাশে বড়িদুটো আর জলের ফিডিং কাপ। যদি নিজে খেতে অসুবিধা হয় কলিংবেল টিপবে। রোজা কিংবা পেমা কিংবা রেঞ্জার অথবা ডক্টর পাইন এসে যাবেন। একটা কথা বলি, তাই বলে তুমি সারারাত একা থাকবে এমন নয়। রোজা রেঞ্জার আর ডক্টর পাইনকে খেতে দিয়েছে। এখনই নিজে খেয়ে নেবে। জানো, এখানে আরও একজন ডাক্তার আছেন, ডাক্তার পাইন? এস ও এসে কী দিতে হবে তা তাঁকে বলে দিয়েছি। তা ছাড়া এ বাংলোর আস্তাবলে রেঞ্জারের পনি। তিনি বলেছেন, রাতে আমাকে

দরকার হলে তিনি অনায়াসে ক্লুটলং-এ যাবেন। এসব তোমাকে বলছি এজন্য, যে মনে এতটুকু উদ্বেগ আনবে না। তা ছাড়া দেখো, তুমি কেমন প্রিয় সকলেরই।

জেন বিছানার পাশ থেকে উঠবার আগে হাসল। বললে, তোমার ঘড়িটা ঠিক সময় দেয়। জানো, তুমি যখন জ্ঞান ফিরে পাচ্ছো তখন ঘড়ির দিদির কথা আর রূপসী নামে এক বোনের কথা বলেছিলে। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে সেই বোনকে আমরা আনতে যাবো, সেই দিদিকে দেখে আসবো। বি আ গুড বয়। কথা শুনবে আমার কেমন। দেখো, কেমন নিরুপায় আমি। একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার পর্যন্ত যোগাড় হয়না যেখানে। তোমাকে সুস্থ করে তুলতে আমাকে সাহায্য করো। দেখো ঘড়িটা। তারিখ দেখাচ্ছে আজ বছরের শেষ দিন। সত্তরের দশকের এটা শেষ রাত। ওই দেখো, ভুলে গেছি। ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছিলাম।

জেন নিজের গলা থেকে তার সেই ক্রাইস্টলকেট হারটা খুলে ধীরে ধীরে ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিল। বললে হেসে, দেখো আর তুমি একা নও। ক্রাইস্ট সঙ্গী। গুডনাইট, ডাবলিং। সে ময়ূরের গালে কপালে নিজের আঙুলগুলোকে ছুঁইয়ে উঠে দাঁড়াল।

৬

রাত নটা বেজে গেল। গিয়েনচং তখনও বারান্দায় বসে। তার পাশে একটা নিচু টেবলে একটা দুফিতের হারিকেন লণ্ঠন মৃদুভাবে জ্বলছে। আলোটার পাশে তার সেই টেলিস্কোপ। তার সারাদিনের খেলার সঙ্গী অন্তত গত বিশ বছর ধরে। তারও আগে ত্রিশের দশকে চল্লিশের দশকে ওটা কাজের জিনিস ছিল। এখন অভ্যাসের বিষয়, খেলার বিষয়। তার যা করার এখনও তা করে --বাইরের, দূরের পৃথিবী কাছে টেনে আনে। গিয়েনচং-এর বোকুর উপরে একটা সাদা পশমের চাদর, তার মাথার চুলের মতোই সাদা, ভালো ভাবে জড়ানো। ডিসেম্বরের শেষে তার এই পঁচাত্তর বছর বয়সে বাইরের এই দোলনার বারান্দায় বাতাস যত পরিচ্ছন্ন, শীতও তত তীক্ষ্ণ। এমনকি মনে হয়, হারিকেনটার আসল উদ্দেশ্য আলো দেখা নয়, উত্তাপ দেয়া। আলোতে গিয়েনচং আর কী দেখবে এই রাত দশটার কাছে এসে? বিকেল থেকেই তার বাড়ির নিচের হাট থেকে লোক চলে যেতে যেতে এখন একটি মানুষও নেই। স্থায়ী যে তিনটি বাড়ি দূরে দূরে থেকেও তার বাড়ির প্রতিবেশী, সেগুলির দুটিতে দরজা-জানালা বন্ধ হয়েছে, আলো নিবেছে। পথের ধারে, অর্থাৎ যেটি তাসিলায় উঠে যাওয়া পথের সব চাইতে কাছে, সেটার দরজা খোলা থাকায় খানিকটা আলো গিয়ে পড়ছে পথে। ওটায় মদ বিক্রি হয়, সে জন্যই বোধ হয় দোকানটা এখনও খোলা। গিয়েনচং-এর পাশে রাখা হারিকেনের কথা বলছিলাম। তার আলোতে হাটখোলার দুতিন হেকটার জমি, যা এখন একেবারে খালি, তার কিছু দেখা যায় না, বরং গিয়েনচংকেই নিচে থেকে, কিছু দূর থেকেও দেখা যায়। সাদা চুল, সাদা পশম চাদর, আলোটা মুখের যে পাশে পড়েছে সেখানে খানিক রক্তাভতা। গিয়েনচং ঘুমাতে না গিয়ে স্তব্ধ ভাবে অন্ধকারে চোখ, বোধ হয় মনও ডুবিয়ে বসে আছে।

ডোলমার কথা পৃথক। তারও সত্তর হল। সারাদিন তার কাজ থাকে। তবে অনেকটাই বসে বসে করা। দুজনের জন্য রান্না করা, বাড়ির কাজে সাহায্য করতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। রাখাল আছে বটে। সে সন্ধ্যাতেই দোতলার দুটি হারিকেন জ্বালে। আর একতলার চায়ের দোকান বন্ধ হওয়ার আগে দুজনের জন্য রাতের খাবারও তুলে দিয়ে যায়। এটাই নিচের চাওয়ালার দেয় খাজনা। দিনের বেলা ডোলমা উপরেই রান্না করে। কিন্তু রান্না করাই তার একমাত্র কাজ নয়। সেই রাখাল দুকপা ঘরদোর ঝেড়ে দেয়, কম্বলটম্বল রোদে দেয়, তোলে। তা সত্ত্বেও কাজ থাকে ডোলমার। শোবার ঘর থেকে

কাঠের দেয়াল দিয়ে পৃথক করে ছোট একটা গোম্ফা মতো করা আছে। তার দেয়ালের গায়ে একটা থাংকায় বুদ্ধ, তার নিচে কাঠের বেদি, যা গেরুয়া লাল কাপড়ে ঢাকা, তার উপর তথাগত বুদ্ধের মৈত্রেয় রূপ, তার পাশেই পদ্মসম্ভবগুরুর মূর্ত্তি। দুটোই পিতলের। মূর্তিদুটির সামনে সব সময়ে পানীয় জলের পাত্র, আহার্যের পাত্র, মাখনের প্রদীপ, তা এমন কি দিনের বেলাতেও ঘণ্টা, ঢক্কা, ডমরু। সেই মূর্তিগুলির সামনে সারাদিনে ডোলমার কাজ থাকে। বিরতি দিয়ে দিয়ে সে একাই ঘণ্টা, ঢক্কা, ডমরু বাজিয়ে প্রার্থনা করে যায়, প্রার্থনা করে যায় অন্তত তিনবারে সাত-আট ঘণ্টা। আর অন্য সময়েও সে ব্যস্ত থাকে। কিংবা বলা যায়, সে তারই এক নতুন উদ্ভাবন, যা গত দশ বৎসর থেকে তাকে ব্যস্ত রেখেছে। কিংবা ব্যস্ত কথাটা ঠিক নয়। বরং বলতে হয় স্থির রেখেছে। তার এক কাঠের বাক্সভরতি পুরনো পোশাক। তা থেকে রেশম আর পশমের বোকুগুলোকে বার করে নিয়ে নতুন বোকুর জন্য পেটতাঁতে কাপড় বোনে। এটা তার প্রয়োজন এমন নয়। তারা আর ব্যবসাবাণিজ্য করে না গত বিশবছর থেকে। তাদের কিছু সঞ্চয় আছে। তার বেশি তাদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন বোধ থাকলে ছেলে মেয়েদের জানতে দিলেই অর্থের প্রাদুর্ভাব হবে। তাদের বড় মেয়ে মণির এখনও উত্তুরে পাহাড়ে মাঝারি বড় ফলনশীল কমলাবাগান, মধ্যম সন্তান পুত্র পেম্বার শিলিগুড়িতে মাঝারিমাপের হোটেল, ছোট মেয়ে তারা টেলিফোন সুপারভাইজার। তারা একে-একে একে-দুয়ে একবছরে ডোলমা আর বাবাকে দেখতে আসে। নতুন পোশাক আনে। জোর করে টাকা গছাতে চায়। বিশ্বাস করে না, তাদের অভাব নেই, অভাববোধই নেই। গত দশ বছরে এরকমই চলে আসছে। এসব মনে পড়লে ডোলমা একা একা হাসে, তার সত্তর বছরের চোখে শান্ত স্নেহ দেখা দেয়।

মেয়ে দুটি এবং ছেলেটা অবশ্যই তার, প্রত্যেকেই তার শরীর থেকে এসেছে। বিশ বৎসর আগেও এরকম মৃদুস্বর প্রশ্ন উঠতো, সন্তানগুলি দোর্জের অথবা চং-এর। কিন্তু সে প্রশ্ন নিরুত্তরই থাকবে। কেননা পঁয়তাল্লিশ থেকে চল্লিশ বছরের আগের সময়ে—মণির পঁয়তাল্লিশ আর সব ছোট তারার চল্লিশ হবে—প্রশ্নের উত্তর হয়নি। তার নিজের ধারণা আছে, প্রমাণ নেই, মণি দোর্জের আর তারা চং-এর পেম্বা দোর্জের হতে পারে, চং-এরও হতে পারে। তা বললেও নিশ্চিত হত কি? পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর আগে একটা দিনের কথা মনে করা যেতে পারে। তারা তিনজনে, ডোলমা, দোর্জে, চং, সেবারই তাদের কলকাতা ভ্রমণ শেষ করে ফিরেছে। তখনই এই নারেঙ্গিহাটের বাড়ি। ত্রিশের দশকের প্রথম দিকেই সে সময়। এক তলায় তেমন কমলার গুদাম, তেমন কমলাব ঋতু ছাড়া দুর্গের গোরা সৈন্যদের চা, বিয়ার আর রামের দোকান। দশ-বিশ হাজার কমলা অপেক্ষা করতো পাইকারদের জন্য। আর সে সিজনে গোরা সৈন্যদের চায়ের দোকান হতো সুন্দর সামিয়ানার নিচে। ট্রেন থেকে নেমে তাসিলা ফোর্টে ওঠার আগে চা কিংবা বিয়ার কিংবা অন্য কোন মদ না খেয়ে সেই গোরা সৈন্যরা ফোর্টে উঠতো না। আর সে সময়ে তাদের ব্যবসা তো শুধু কমলালেবু নয়, ফোর্টের জন্য মাংস আর ভেজিটেবল সাপ্লাই করাও বটে। তো সেবার কলকাতা থেকে ফিরে এখানে বিশ্রাম করার দ্বিতীয় দিনে ডান পায়ের গোড়ালি কি করে মচকে গেল। বেশ ব্যথাই। দোর্জের সেদিনই পুনাখা যাওয়ার কথা। তার সঙ্গে ডোলমারও তার নিজের কমলা বাগানে যাওয়ার কথা। তখন তো বছরের শেষ ফল তুলে চালান দেয়ার সময়। কি করে মচকানো পা নিয়ে ডোলমা যাবে? সবটুকু পথে তো পনিও চলে না। দোর্জের যেতেই হয়, তার পুনাখার দোকানের জন্য যে মাল এনেছে কলকাতা থেকে, তা পৌঁছে দিতে। সুতরাং ডোলমা চং-এর কাছে নারেঙ্গিহাটে থেকে গেল। চং ফোর্টের গোরা ডাক্তার এনেছিল। সে তো ডোলমার সুন্দর গোড়ালি হাতে পেয়ে ছাড়তেই চায় না, যে গোড়ালি মচকায় নি সেটাকে হাতে করে যেন অন্যটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে ধরে থাকা। ডাক্তার অ্যাসপিরিন খেতে দিয়ে, ম্যাসাজে সেরে গিয়েছে বলে এক বোতল মদ বগলে করে ফোর্টে যাওয়ার পনিতে বসলে, তাকে বিদায় দিয়ে, তখনতো সন্ধ্যাই হবে, চং ফিরে এসে

দেখেছিল, ডোলমা চংএর নিজের বিছানায় শুয়ে আছে তখনও। পায়ে চোট পেলে চংএর সিঙ্গলবেডেই তাকে তোলা হয়েছিল। সেখানেই তাকে ডাক্তার দেখেছে। দোর্জে আর ডোলমার ডবলবেডটা দোর্জে চলে যাওয়ার পরেও অগোছালো ছিল বোধ হয়। চং বলেছিল, ডাক্তার বললে, একটু রাম মালিশ করলে আর অ্যাসপিরিন খেলে সেরে যাবে। ডোলমা যেন অভিমান করে বলেছিল, দেখো, আমার হাঁটুদুটো ডোলমার মতো গোলাপি হয়ে ওঠে নি। চং কী উত্তর দেবে? এই গোলাপী হাঁটু আর গোলাপি গাল, তাই তো দোর্জে আর ডোলমা তাদের পৃথক জাতের মনে করিয়ে দেয়। বোকুর উপরে দুজনেরই কাঁধ পর্যন্ত চুল। দোর্জের গাঢ় লাল মুখে সব সমেত সাত-আটটা দাড়িগোঁফ। ডোলমার গোলাপি মুখে তা নেই। আর বোকুর নিচে দুজনের হাঁটুতেও সেরকম তফাৎ, ডোলমার গোলাপি আর দোর্জের তামালাল হাঁটু। এভাবেই কলকাতা যাওয়া। তখন দুজনকে ভাই বলে মনে হতো। তো, ডোলমা বললে, গোলাপি হয়ে আছে না হাঁটুটা? আর বোধ হয় গরমও। চং বলেছিল, গোড়ালি সেরেছে কি? কখন! সাহেবই সারিয়ে দিয়ে গেল। চং বলেছিল, একটু ভাবো ডোলমা, দোর্জে আমার ভাই নয়। আর ডোলমা বলেছিল, ব্যবসা করতে করতে যে বন্ধুত্ব তোমাদের, তা কি ভাইয়ের চাইতে কম ভালোবাসা? ডোলমার এখনও সন্দেহ আছে বলা ঠিক হবে না। বিশ বছর আগে মনে তোলপাড়া করেছে শেষবার। যতদূর তার মনে আছে, সেই হিসাবের ব্যাপারটার আগের রাতে দোর্জে, আর তার থেকে চতুর্থ দিনে তার পা মচকেছিল। এতদিন পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ভেবে কী হবে, দোর্জে তার বিবাহিত ছিল না, চংও তার ভাই নয়।

কিন্তু কথা হচ্ছিল সেই পুরনো বোকুগুলো নিয়ে। দশবছর আগে শুরু আর পাঁচ বছর আগে থেকে সেগুলোই তাকে সারাদিন ধরে রাখে, স্থির রাখে। কোথায় শুনেছিল, বিলেতি গরমজামা এদেশে এনে তা থেকে উল বার করে গরম কাপড় বোনা হয়। সে পুরনো বোকুগুলো সেরকম করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে উলে পরিণত করে, তাকে জলে সাবানে ধুয়ে, তকলিতে নতুন করে উলেব সুতো বুনে, পেটতাঁতে সে নতুন বোকুর জন্য কাপড় বুনছে। পাঁচ বছরে চংএর জন্য একটা নতুন রঙীন বোকু করার কাপড় হয়েছে। প্রার্থনা আব তকলি, আর তাঁত বোনা আর তার স্থৈর্য।

এই সত্তর দশকের শেষ রাতে দোতলা থেকে নেমে পরিত্যক্ত হাটের মাটিতে অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে ডোলমা এসবই ভাবছিল। এটাও তার কয়েক বছরের অভ্যাস। সারাদিনের পরে কোমর-হাত-পা যেন জমে কাঠ হয়ে যায়। এই রকম রাত আট-নটাতেই সে নেমে আসে। প্রথমে বাড়ির পিছন দিকে চলে যায়। সেখানে আবার মাটি সমতল থেকে উঁচু হতে শুরু করেছে। সেখানে তার গোরুগুলো থাকে। রাখালও। সেই কুকুরদুটোর পাহারায়। আগে এ সময়ে অন্ধকার হয়ে যেতো যেন সেদিকটা। বনে বাঘ আসার গল্প ছড়িয়ে পড়লে রাখাল ছেলেটি গোয়ালের টঙে উঠে পড়ে সন্ধ্যায়। বাড়ির সামনে বাঁশ আর শালপাতার মশাল জ্বলে। কুকুরদুটো গোরুগুলোকে পাহারা দেয়।

সেখান থেকে ফিরে তাসিলার রাস্তা পর্যন্ত সে হাঁটতে থাকে, আজও যেমন। চাঁদ থাকলে, কুয়াশা না থাকলে তাকে দেখা যেতো। সবুজে খয়েরিতে সোনালিতে স্ট্রাইপ দেয়া বোকুর উপরে, সাদা পশমের চাদরের উপরের দিকের এক প্রান্ত কোমরবন্ধে গুঁজে বাঙালিনী শাড়ির কায়দায় সেটাকেই গায়ে জড়ানো। এক মাথা সাদা চুলের মধ্যে কিছু গেরুয়া হলুদের বলি চিহ্ন আঁকা কাগজ-সাদা মুখ। এমন এই কুয়াশার মধ্যে তাকে দূর থেকে কুয়াশার চলমান অংশ মনে হচ্ছে।

এরকম বেড়াতেই হয়, নতুবা চলবার শক্তি থাকবে না। দ্বিতীয়ত, অন্ধকারের নিঃসঙ্গতায় বুঝতে চেষ্টা করতে হয়, সকলেই নিঃসঙ্গ শেষ পর্যন্ত। সব চাইতে নিঃসঙ্গ মৃত্যু, সে ভয়ও কমাতে হয় এই অন্ধকারে। তাছাড়া মার। মার ভালো নয়। সে আলোয় থাকে না। মারকে চিনে নেয়া ভালো। পরখ করতে হয়, মারকে সে উপেক্ষা করতে পারে কিনা। মাস তিনেক আগে এক আধ-অন্ধকারে মারকে সে দেখেছিল।

তাসিলার রাস্তার ধারে প্রায় এক বৎসর হয় এক কুঁড়েঘর তৈরি হয়েছে। হাটের সীমার বাইরে। সেখানে হাটের দিনে চা, আর সস্তায় ভাত বিক্রি হয়। হাটের সবচাইতে গরীব ভারবাহীদের কেউ কেউ যায়। সে রাতে হাট শেষ করে সকলেই চলে গিয়েছে। সেই কুটিরে মিটমিট আলোতে এক ছেঁড়া জামা পরা যুবক ও মাঝবয়সী সেই কুঁড়ের মালকানিকে দেখা যাচ্ছে। যুবকটি বলছে, সারাদিন আর্মি মিউলের ঘাস কেটে সাতটাকা পাই। দেড়টাকা নিয়েছো ভাত, ধুঁধুল ভাজা আর একগ্লাস চায়ের দাম। একঘণ্টা তোমার ঘরে শুতে পাঁচটাকা লাগলে, ঘরে নিয়ে যাব কী? বাবা মা খাবে কী? কিন্তু সেই প্রৌঢ়ার বোকু তখন এমন কৌশলে টানা যে তার একটা মাইয়ে আর হাঁটুদুটোর উপরে, উরুর ভিতরের পাশে ঘরের মিটমিটে আলো। ডোলমার মনে পড়েছিল, শ্রাবস্তীর কাছে এক শহরে এক অতি সুন্দরী নর্তকী ছিল। শহরের বহু ধনাঢ্য তার জন্য উন্মত্ত ছিল। বুদ্ধের জেতবনের দুএক ভিক্ষুও তার সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিল। অকস্মাৎ সেই নর্তকীর মৃত্যু হলে বুদ্ধ জানতে পেরে সেই ভিক্ষুদের বলেছিলেন, শ্মশানে সে শায়িতা, যাদের ইচ্ছা তাকে দেখে এসো। না, এরকম নয়, সেদিন কিছুক্ষণের মধ্যেই ডোলমা ভেবেছিল। যুবকটি ঘাস কাটে। আর্মির মিউল না এলে ঘাস কেটেও কিছু হতো না। বোঝাই যায়, এত দরিদ্র যে যুবক হয়েও নারীর শরীর স্পর্শ কবা দূরে থাক, দেখার সুযোগও পাবে না জীবনে। এটা মোহ আর বীতরাগের ঘটনা নয়। যুবকের যা স্বাভাবিক ভাবে পাওয়ার কথা, দারিদ্র্যের জন্য তা স্বপ্নের বাইরে থেকে যাওয়ার ব্যাপার।

যাক সে কথা। ডোলমা ভাবলে, আজ রাত বারোটা হয়ে গেলে, তিন ঘণ্টা আর, এই সত্তরের দশকও শেষ হবে। তার অবাক লেগে গেল, ত্রিশের থেকে শুরু করে চল্লিশ পঞ্চাশ, ষাট হয়ে সত্তরের দশকও কেটে গেল এখন।

সে এরকম সময়েই হাটের স্থায়ী দোকানগুলোর একটির কাছে এসে পড়েছিল। দোকানের ভিতরে দুটো উজ্জ্বল আলো। কিন্তু লোকও প্রায় ত্রিশজন। আর কুয়াশাও খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। সেজন্য কিছু স্পষ্ট নয়, অপ্রাকৃত বরং। আধখানা মুখ, কাঁধসমেত বোতল ধরা হাত, একটা খাড়া করা টাঙির ফলার পাশে মাথার টুপি। নেশা করেছে বোঝা যায়। হাটতো কখন শেষ হয়েছে শীতের রাতের ভয়ে সন্ধ্যা হতে না হতে। এরা এই এতগুলো লোক হাট শেষ হলেও এখানে কেন? হঠাৎ তার মনে পড়ল, গিয়েনচং দুপুরে তার টেলিস্কোপে চোখ রাখতে বলেছিল। বলেছিল, দেখো ওখানে ওই মরানদীটার খাতে নেমে ওই অতগুলো লোক। সকালেও দেখেছি, দুপুরেও এখনও দেখছি। পিকনিক বলবে? কিন্তু ওদের সঙ্গে তীরধনুক, টাঙি, কয়েকটা বন্দুকও। ডোলমা দুচার মিনিট তাদের দেখেছিল টেলিস্কোপে। এখন তার মনে হল সেই দলটাই। যে দুএকটা মুখ কিছু স্পষ্ট, তা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ওরা তখন কথাও বলছে। একজন বললে, উঠতে হয়। তাসিলা যেতেও সময় নেবে।

তা হলে? ডোলমা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে অন্ধকারে সরে গেল। তা হলে? তাসিলাই যদি যাওয়া, এত রাত করা কেন? সকালে নদীর খাতে বসে না থেকে তখনই যাওয়া যেতো। দুপুরের রোদ না পুইয়ে তাসিলার দিকে হাঁটা যেতো। তা হলে এরা কি অশুভ, ডাকাত? ডাকাতি করতে যাচ্ছে? সে শুনেছে তাসিলায় এখন আলো নেই, অফিসার নেই। কিছু অসহায় লোক আছে।

সে তাড়াতাড়ি হেঁটে নিজের বাড়ির দিকে চলল। মুখ তুলে একবার দেখল—বারান্দায় আলোর পাশে গিয়েনচং স্থির হয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে। তার মনে হল, সে তখনই গিয়ে এই অশুভ মারদের কথা গিয়েনচংকে বলে, কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে গিয়ে তার অনুভব হল ওই শান্তশ্রী বৃদ্ধের শান্তি বিঘ্ন করা উচিত হবে না। সে বরং করজোড়ে বললে, হে প্রভু মৈত্রেয়, হে গুরু পদ্মসম্ভব শুভকে প্রেরণ করো। মাররা ধ্বংস হোক। ফলে সে হাসিমুখে গিয়েনচংএর পাশে পৌঁছে বললে, কগিয়েন, রাত দশ বাজে, ঠাণ্ডা লাগে না কি? শোবে না কি? আজকের দিনটা

আমাদের এখানে শেষ হোক। গিয়েনচং মধুর করে হাসল। বললে, ডোলমা, প্রার্থনা যার জরাকেও সুন্দর করে, তার সুগন্ধ বুক ঘেঁষে বিশ্রাম করতে ইন্দ্রও লুব্ধ।

তা হলে এসো কগিয়েন, তুমি ইন্দ্র হও। গিয়েনচং বললে, সত্তরের দশক শেষ হতে আব দুঘন্টা, চোখ মেলে আশির দশকে যাই এসো।

ডোলমা মধুর করে হাসল। বললে, আরিয় অমৃতগন্ধ, অমৃতস্নান করেও তোমার কি ইন্দ্রের মেঘমালা কিংবা সূর্যের চক্রাবর্তকে ভাবতে হবে?

গিয়েনচং বললে, আমি তো জাতিস্মর নই। ভাবতে গিযে প্রথম দশকটাকে পূর্বজন্ম মনে হচ্ছে। তোমাকে তো বলেছি কি করে আমি এখানে এলাম।

ডোলমা বললে, সেই একটা ছ বছরের ছেলে একটা খুব সুন্দব বড় ঘরে একটা বিছানায় একটা কমলালেবু হাতে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে পড়া স্বাভাবিক, কারণ সে সুস্থ ছিল না। তুমি বলেছিলে, সে অসুস্থ শরীরে মায়ের জন্য কাঁদছিল। কমলালেবুটাকে খেতে পারেনি। তার বাড়ির অনেকে এসে সান্ত্বনা দিয়েছিল, কিন্তু মা আর ফেরেনি। তারপর ছেলেটি দাসদাসী আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বেড়ে উঠতে লাগল, কিন্তু যুবক হয়েও এরকম হল, একা একা সামনের দিকে হাত বাড়ালেই সেই রাজবাড়ির ছেলে হাতের উপরে একটা নিটোল কমলা রঙের কমলা দেখতে পেতো।

এই পর্যন্ত বলে ডোলমা অনেকবার শোনা গল্পটাকে মনে করলে, তারপর সেই ছেলেটা কমলার উৎস, যেন নিজের হাতের সেই কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য ছায়া-কমলাকে, অনুসরণ করতে করতে এদেশে এসে ফিরে যায়নি।

সে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি কি সেটা রাজবাড়ি ছিল? আর মেজরানী শ্যামা কি কারো মা ছিল?

গিয়েনচং বললে হেসে, যেন খুব কৌতুক বোধ করে, সত্যি রাজবাড়ি ছিল না। চংদাররা রাজা ছিল না। খগেন্দ্রনারায়ণ চংদার রাজপুত্র ছিল না। এরকম ছিল, সেই বড় বাড়িটাকেও কলকাতার প্রতিবাসীরা রাজবাড়ি ভাবতো। সেজন্য বাড়ির বউদের রানী বলতো। আর বাড়ির পুরুষদের মহাশয় বলতো। মহারাজ অবশ্য বলতো না। তুমি তো জানোই, খগেন্দ্রনারায়ণ ইংরেজদের মুখে কি ভাবে কগিয়েন হয়েছিল। আর এখন তো ডোলমার পুরুষ হিসাবে গিয়েনচং। তা খগেন্দ্রনারায়ণের জননী শ্যামাকে মেজরানী বলতো বাড়ির দাসদাসীরা।

ডোলমা বললে, সেই মেজরানী শ্যামা অসুস্থ ছেলেকে একটা কমলালেবু দিযে ভুলিয়ে চলে গেলেন, আর এলেন না। আমি পারতাম না।

গিয়েনচং হাসল। বললে, আজ ভেবে ভালো হয়েছে। আমি মেজরানীকে এতদিন ক্ষমা করেছিলাম। আজ আবার ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে, যেমন তোমার মণিকে ভালোবাসি। তোমাকে কি বলেছি, সেই হাস্যময়ী শ্যামাসুন্দরী বিধবা ছিলেন? আর কলকাতার সমাজে বিধবার মা হওয়া খুবই নিন্দার। আজ বারবার মনে হচ্ছে, সেই বিধবা গর্ভস্থ সন্তান নিয়ে লজ্জায় দুঃখে অনুশোচনায় কি আত্মহত্যা করেছিলেন? অথবা মুখ নিচু করে দীর্ঘদিন কোথাও লুকিয়ে আছেন? আমাদের এদেশ হলে সেরকম হতো না।

ডোলমা বললে, তুমি তো আমাকে সেই শ্যামারানীর এই কষ্টের কথা এতদিন বলো নি। আজ থেকে আমাকেও তুমি তাঁকে ভালোবাসতে সুযোগ দিলে, খগেন্দ্রনারায়ণ।

কিছুক্ষণ তারা সেই আধ-অন্ধকার আধ-কুয়াশা ঢাকা সংসারের দ্রষ্টা হিসাবে পাশাপাশি স্মিতমুখে বসে রইল সেই শ্যামাসুন্দরীকে ভালোবেসে। ডোলমা সম্বিত পেয়ে বলে উঠল, এটা কী বুঝতে পারছি না। তুমি সকালে দুপুরে টেলিস্কোপে যাদের মরানদীর বুকে বসে থাকতে দেখেছিলে, তারা কিছুক্ষণ আগে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাসিলায় গেল।

খগেন্দ্র গিয়েনচং বিস্মিত হয়ে বললে, বলো কী, এত অশুভ সূচনা নতুন দশকের?

ডোলমা বললে, সে জন্য প্রার্থনা করলাম, শুভকে পাঠাও।

গিয়েনচং চমকে উঠল। সেই অন্ধকারে যেন কিছু দেখা যাবে, এমন মনে করে টেলিস্কোপটা তুলে নিলে। যে দোকানটায় বসে সেই মানুষগুলো মদ খেয়েছিল, তার একটা জানালা বোধ হয় খুলে রেখেছে রাস্তার উপরে, সেজন্য একটা আলোর চৌকোণ আধ-অন্ধকারের মধ্যে। টেলিস্কোপে রাস্তাটা সেখানে এক শূন্য আয়তক্ষেত্র। একবার সে রকম দেখে নিয়ে গিয়ে চং বললে, একি তুমি ভালো করলে, মেয়ে? ভালোকে পাঠাতে কি প্রার্থনা করতে আছে? ভালো যদি তার গতিকে দ্রুততর করে?

ডোলমা অন্যায় করে ফেলেও যে স্নেহ হারায়নি এমন এক মেয়ের মতো আদুরে গলায় বললে, আচ্ছা, আর কোন সময়ে সেরকম প্রার্থনা করবো না। রাত এগারোটা হবে এখন। কাল সকালে আমাকে অনেকক্ষণ উলের তকলি চালতে হবে। চলো ঘুমোতে যাই। তুমি দেখো, আমরা জেগে না থাকলেও আশির দশক এসে গিয়েছে।

কিন্তু তাদের শুতে যাওয়া হল না। খগেন চং তার সেই টেলিস্কোপটাকে হাতে করেছিল। সেই টেলিস্কোপ তাসিলার আর্মি কম্যান্ড্যান্ট দিয়েছিল তাকে, যা দিয়ে সে দেখতো তাসিলা স্টেশন থেকে আর্মির কতজন তার দোকানে চা আর রাম খেতে আসতে পারে। আর আর্মিরা চলে গেলে ফোর্টের জেলারের অনুরোধে সে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতো, বন্দীবাবুরা কেউ পালাচ্ছে কিনা। চার দশকের টেলিস্কোপ।

গিয়েনচং হঠাৎ বললে, দেখো, দেখো ডোলমা।

রাস্তার উপরে সেই আলোর সামন্তরিকটা যেন গতিশীল হচ্ছে। গাঢ় বাদামি রঙের একটা স্রোতের মতো কিছু অন্ধকার থেকে আলোর সেই সামন্তরিকে ঢুকে তা পার হয়ে আবার অন্ধকারে মিলাচ্ছে। কী আশ্চর্য, ঘোড়ার স্রোত নাকি? ঘোড়সওয়ারকে দেখা যাচ্ছে না, দ্রুত ধাবনশীল বাদামি চারখানা পা আর দুলছে এমন লেজ, চলছেই চলছেই। একের পর এক।

ডোলমাও টেলিস্কোপে দেখে নিয়ে বললে ভয়ে, আমার ভয় করছে, গিয়েন। এগুলি কি অলৌকিক, সেই ভর ও গতিমাত্র, যা দেখছি? শুভ কি জোয়ারের মতো চলে?

গিয়েনচং উঠে দাঁড়াল। বললে, চলো ডোলমা। আশির দশকও সংঘাত নিয়ে আসছে। আমরা ঘুমাই গে চলো।

৭

নটা বেজে কিছু সময় পার হয়েছে এখন, ঘুমের ঘোরে এরকম মনে করতে করতে ঘুম ভাঙতে ভাঙতে ময়ূর অনুভব করলে, ঝুপ করে একটা শকুন নামল তার পাশে। ভয়ে তার ঘুম চলে গেল। শকুন! সে তো এখনও বেঁচে আছে।

সে নিজেকে শান্ত করতে চোখ মেলে, দুঃস্বপ্নটাকে দূর করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে, আরে এটা তো তাদেরই কুকুরটা যা নরবুর সঙ্গে ছিল। নিশ্চয়ই কোন ভাবে ঢুকে পড়েছে। তা পারবে, এই বাংলোর অন্ধিসন্ধি দরজাজানালা তো ওর মুখস্থই। তা হলে নরবু কি ফিরেছে? তার পয়লায় ফেরার কথা। ইতিমধ্যে মাসের পয়লা এসে গেল নাকি? কুকুরটা তার বাঁ পাশের খাট আর দেয়ালের মধ্যে ফাঁকায় ঢুকে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখ চাটছে। সেজন্যই তা হলে তার ঘুম ভেঙেছে; আর কুকুর যদি এসে থাকে, তা হলে নরবুই আছে সঙ্গে। নরবুর পয়লা তারিখে ফেরার কথা বটে।

স্বপ্ন? সে চোখ মেলল স্পষ্ট করে। হাত বাড়িয়ে ঘড়িটাকে চোখের সামনে আনল। ঘরের সেই মৃদু আলোর দিকে এগিয়ে ধরে দেখলে, বারোটা বাজতে চলেছে। আর ৩১ নেমে সেখানে ১ দেখা নিচ্ছে। রেডিয়াম অক্ষরগুলো বেশ স্পষ্টই।

পায়ের দিকে ডানদিকে ঘেঁষে বরং যে ফ্রেঞ্চ উইনডো, যার পর্দার উপর দিয়ে এক চিড় আধ-অন্ধকার, সে দিকে দেখলে, স্বপ্ন নয়। তার ডানদিকে দেয়াল ঘেঁষে ওই তো আলনা যাতে তার ট্রাউজার্স, কোট, গ্রেটকোট, জুতো। তার পাশে ছোট গানর‍্যাকে তার রাইফেল। তার বেশ মনে পড়ছে, তাকে বেল বাজাতে হয়নি, ওষুধও নিজে খেতে হয় নি। বোজাই এসেছিল রাতের মতো তার সুবিধা করে দিতে, সেই ওষুধও খাইয়েছে।

দূর, সকাল কেন হবে! মাঝরাত। আর শকুনও নয়। সেটা স্বপ্ন যা কুকুরটার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। ওই তো নরবুও ঢুকছে বাগান থেকে ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়ে। নরবু ভূত না হলে স্বপ্নের অংশ হয় না। ঘরের আলোতেই এসে গিয়েছে। ওই তো তার মাথার ফেট্টি থেকে দড়িতে বাঁধা একটা বাক্স পিঠের উপরে ঝুলছে।

ময়ূর হাসি মুখে বললে, আয়। কখন এলি? এটাই মধুর বাক্স নাকি?

হুঁ। আইলে।

এত রাতে কেন? সকালে আসতে পারতিস। তুই আর তোর ম্যাডাম! ঘুম ঘুম গলায় ময়ূর বললে, মধু বলে পাগল। মধু, আলু, পেয়ারা, ফল ফলানোর জন্য, ফসলের জন্য পাগল। দেখিস, পাহাড়ে কমলা আর আপেলও ফলাবে একদিন। তোর ম্যাডাম কিছু আগেই গেলেন। তুই যা, বড় ঘুম পাচ্ছে রে। কাল।

নরবু মৃদুস্বরে কী গোলমালের কথা বলতে শুরু করে থেমে গেল, তোমার খুব ভারি বিমার কি? ওরা সকলে বলতে আছে। আমি আসতাম নাই। কুকুরটা তোমার কাছে আসতে ঘরে ঘুসিয়ে গেল।

মেয়র চোখ বন্ধ করতে করতে বললে, কাল সব শুনবো, তোর ম্যাডাম ঘুমাতে বলেছে।

নরবু এগিয়ে এসে কুকুরটার বকলস ধরে সেটাকে টেনে নিয়ে ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়ে বাগানে নেমে গেল। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ময়ূর বিড়বিড় বলে, মধু, মৌমাছি, তা হলে ফল, আর নেশা, ঘুমের ওষুধ।

কিন্তু আবার ঘুম ভেঙে গেল, আর তাতে ময়ূরের মনে হল, এরই মধ্যে সকাল হল। সে মৃদুভাবে অবাকও হল, কেউ যেন নাড়া দিয়েছে তাকে। না, জেন ম্যাডাম নয়। সে রকম ছোঁয়া নয়। বাঁ দিকের জানালার পর্দার দুপাশে আর মাথার উপরে সে সরুসরু ফাঁক তাতে যেন দিনের আলো। ওদিকের পাহাড়ের গায়েই আলোর ভাব। কিন্তু ওই, ওই পশ্চিমের পাহাড় যা তার এই জানলা থেকে দেখার কথা, সেখানে সূর্য ওঠে না। তা হলে পুবের সূর্যের আলো পশ্চিমের মুখে পড়ছে?

কিন্তু তার চোখ বোঁজা হল না। পরপর কয়েকটি শব্দ হল। পাহাড়টায় আবার আলো পড়ল। আগুন লেগেছে? পুব দিকে? বাজারে? নাকি অসওয়াল শর্মারা কোন কারণে বাজি পোড়াচ্ছে? যদি আগুন হয়? জল কোথায় যে আগুন নিবানো যায়? সে বিছানায় উঠে বসল। তার বুকের মধ্যে কিছু আইঢাই করে উঠল। দূরে কোথাও বাঘ ডাকল নাকি? সে কি অথবা ভুল শুনছে? বিছানার বাঁ পাশে দেয়ালটা আর জানালাটা তিন হাতের বেশি দূর নয়। সে এটুকু গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখবে? সে পর্দা সরিয়ে দেখলে, উত্তর-পশ্চিম পাহাড়টাতে যা আলোভাব, আর সবই অন্ধকার। তা হলে আগুন। আর তাসিলায় আগুন লাগা মানে... কিন্তু জেন তো তাকে বিছানায় উঠে বসারও অনুমতি দেন নি।

সে বিছানায় বসল। কিন্তু হাঁপাতে লাগল। আচ্ছা, দূর থেকে নানা রকম শব্দ কি কানে আসছে?

ভয়ে দিশেহারা অনেক মানুষের চেঁচামেচি?

পর পর কয়েকটা শব্দ হল। বাঁশ ফাটছে? বন্দুক? নাকি বাজারে বাজি পোড়ানো?

আচ্ছা, সে খুব ধীরে ধীরে যদি ব্রিজটা পর্যন্ত যায়? জানা তো দরকার, কেন এই রাতে বাজি পোড়ানো হবে। আগুন আর বন্দুক যদি হয়? আর সে সব যদি এই বাংলোর দিকে নেমে আসে? এই বাংলোয় সকলেই ঘুমাচ্ছে।

সে বিছানা থেকে চাদর একটা তুলে নিয়ে তার গায়ের হালকা সোয়েটারের উপরে জড়িয়ে নিলে। এবার সে বাঁয়ের উইনডো দিয়ে নেমে বাগান পেরিয়ে খুব ধীরে ধীরে ব্রিজটা পর্যন্ত যেতে পারে। জানা তো দরকার, আগুন কি না, বন্দুকের শব্দই সে শুনেছে কিনা।

সে সেরকমই বেরিয়ে তার পাগলা বুক আর পাকখাওয়া মাথা নিয়ে পা টিপে টিপে ব্রিজের উপরে দাঁড়াল। পরিশ্রম কম করতেই যেন, ব্রিজের প্যারাপেট ধরে তাতে শরীরের ভার রাখলে। আর তখনই আভায় লাল আকাশে আগুনশিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেলে সে। বাজারের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলে সে গোলমালটাও বাজারের উপরে অসওয়ালদের উঁচু পাড়ায়। কী করবে সে, কি করে আগুন নেবাবে সে? এই পাহাড়ে ঘাসে গাছপালায় আগুন ধরে গেলে গোটা পাহাড়টাই পুড়ে যাবে। মানুষও বাঁচে কি? কিন্তু আগুন নিবানো দূরের কথা, সে তো ওখানে গিয়ে পৌঁছাতেই পারবে না। এখানে দাঁড়িয়েই বুকের আইঢাই বেড়ে উঠছে।

আবার দুম দুম করে বেশ ঘন ঘন কয়েকবার বন্দুকের শব্দ হল। আর পাহাড়ে যা হয়, একটা শব্দ তিনবার প্রতিধ্বনিত হয়ে তিনদিক থেকে ছুটে এল। এই সময়েই হাউই উঠল যেন আকাশে অনেকগুলি। দূরে একটা বাঘ ডেকে উঠল আবার। বনের বাঘরা অস্থির হয়ে উঠছে শব্দে। কিন্তু হাউই নয়। ফ্লেয়ার। পাহাড়ের অনেকখানি জুড়ে দিনের মতো আলো হয়ে যাচ্ছে। আর সেই আলোতে সে দেখতে পেলে, বাজারের দিক থেকে অনেক ঘোড়া নেমে আসছে। স্মাগলার? স্মাগলারে স্মাগলারে লড়াই, অথবা সেই একচোখো গিয়ালপো অনেক লোক নিয়ে এসেছে এবার। কেন? শোধ নিতে? রোজাকে নিয়ে যেতে এই বাংলোয় থেকে? শোধ নিতে ক্লুটলং-এ যাচ্ছে? নরবু বলেছিল, সকলেই বলছে মেয়রের ভারি বেরাম– তারই সুযোগ নিতে? ফ্লেয়ার নেভায় অন্ধকার হল, কিন্তু ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়েই আসছে। কিন্তু কী করা যায়? এতেই তার বুকের মধ্যে বেশ অসুবিধা। সে তো এখন ডাক্তারের কাছে জেনেছে, ওই আইঢাইটা বেড়ে ওঠাই মরণ। তার তো সেই আশঙ্কাতে বিছানায় উঠে বসাও নিষেধ। এখন মরা তো আশঙ্কার ব্যাপার। জেনের চিকিৎসার মান থাকে না, তার গলায় ঝোলানো এই ক্রাইস্টের মান থাকে না, তাদের তো রূপসীকে এখানে নিয়ে আসার কথা আছে, ক্লুটলংএর চাষ, ফল... আর একটা ফ্লেয়ার। বাঘের ডাক দূরে। দুর্গের উপরে ফ্লেয়ার?

তাতে সন্দেহ নেই। মতিয়া? মতিয়ার সঙ্গে দুর্গের টিলার যোগ হয়েছিল। সে টিলার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আর তার ফলেই দুর্গের টিলাতেও যেন আলোর বিন্দুগুলোকে নড়তে দেখলে। মতিয়াই বা এদিকে এল কেন? সার্কাসে ছিল, তাই আলো হট্টগোল– এসবের কৌতূহলে উঠে এসেছে? কিন্তু এতেই তার বুকের মধ্যে বেশ অসুবিধা। সে যে এতটুকু এসেছে, তা জানলেও তো জেন রাগ করবে। তার কান্না আসছে যেন। কী অসহায় সে!

এই শীত। একটু বেশি শীত লাগছে কি? এই কেমন এক অন্ধকার, যা কুয়াশার মতো আগুনের আভায় পাক খায়। কেমন সব অপ্রাকৃত দেখায়। আবার কয়েকটা গুলির শব্দ হল। আর এবার তা দুর্গের টিলায়। এই সময়ে দুদ্দাড় করে কারা যেন ছুটছে, এমন শব্দও হল। সে দেখলে ব্রিজের ওপারের পথের উপরের যে রিজ সেটার কাঁধ বেয়ে কারা যেন দৌড়ে চলে গেল। আধ-অন্ধকারে গাঢ় অন্ধকারে ছুটছে। আশ্চর্য কী হচ্ছে আজ তাসিলায়? দলবেঁধে দ্রুকই তবে আক্রমণ করেছে

তাসিলা? নাকি দুই দল দ্রুক? এক বাজারে আর এক দুর্গের টিলায়? আর দেখো, ঠিক নরবুও এসে গিয়েছে, এদের পক্ষে বা বিপক্ষে হোক, নরবু ওদের কাছাকাছি এসে যায়। অথচ বুকের আইঢাই আরও বেড়ে যাবে শুধু এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই। কী আশ্চর্য আজ কি দ্রুকেরা সম্পূর্ণ তাসিলাটাকে ধ্বংস করবে? পৃথিবীটাকেই শয়তানরা নিয়ে নেবে?

এই সময়ে তাসিলার সব কুকুরগুলোও যেন ভয় পেয়ে ডেকে উঠল। ভয় পাচ্ছে, ক্রুদ্ধ হচ্ছে। শত্রুকে ভয় দেখাতে রুখে দাঁড়াচ্ছে, ভয় পেয়ে পিছিয়েও আসছে। একটা ডাক যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ডাকটা কি তার পরিচিত? নরবুর কুকুরটা নাকি? সে কি অনেক আগেই ক্লুটলং পৌঁছে যায় নি? কিংবা ক্লুটলংও আক্রান্ত বলে কুকুরটা জানাতে এসেছে? কিংবা সে তো ঘড়ি দেখে নি, রাতের চেহারা দেখে বয়স বোঝা যাচ্ছে না। নরবু রওনা হওয়ার পর সে সামান্যই হয়তো ঘুমিয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার বুক– সে বুককে স্থির করতে, ভরসা দিতে ব্রিজের প্যারাপেটটাকে চেপে ধরলে আবার।

কিন্তু তাকে ভাবতে হল না। তীরের মতো গতিতে তার সেই নিজের কুকুরটা, যা নরবুর সঙ্গে ছিল, সেটা যেন তার গায়ের উপরে এসে পড়ল। তার পাশে দাঁড়িয়ে যে দিকে দুর্গের টিলা, পুরনো ফরেস্টকলোনি, যা থেকে ক্লুটলং যাওয়ার পথ গ্রেগ অ্যাভেনিউ, সে দিকে মুখ করে অস্থির হয়ে ডাকতে লাগল। ঘং ঘং করছে, এগোচ্ছে, পিছোচ্ছে। আচ্ছা, জেন তো তাকে কিন্তু ভাবতেও মানা করেছে। তার বুকের নাকি এমন অবস্থা যে বিছানায় উঠে বসাতেও আপত্তি। তা হলে আজকের এই গুলিগোলা, এই অগ্নিকাণ্ড, দেখো, কমে এলেও আগুন জ্বলছেই বাজারের বস্তিতে। নরবুই কি তা হলে বিপন্ন? যারা দৌড়ে গেল, তারা কি বাজারের দোকানদার কাছে থেকে শক্ত বাধা পেয়েছে? দেখো, দুর্গে আবার গুলি চলল। তা হলে দ্রুকেরা দুই দল মিলে ক্লুটলং-এ যাচ্ছে তার এই মেয়র, বাংলোয় পাশ কাটিয়ে।

কুকুরটা ডাকছে, ডাকছে। দেরি হচ্ছে, দেরি হচ্ছে। ময়ূর নিজেকে বললে, আবার কি তার বুদ্ধি স্তম্ভিত হচ্ছে না? এই দেখো, কী করা উচিত ভুলে যাচ্ছো!

ঘর থেকে ব্রিজে আসার সময়ে জেনের কথা মনে রেখে আস্তে আস্তে এসেছিল, এবার সে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ফিরে এল। আলনার হ্যাঙ্গার থেকে জ্যাকেট নিয়ে পরলে। ওয়াড্রোব খুলে গ্রেটকোট গায়ে চড়াল। র‍্যাক থেকে রাইফেল নিয়ে চেম্বার ঠিক আছে কিনা দেখলে, দ্বিতীয় ক্লিপ অ্যামুনেশন পকেটে নিলে, এটুকু করতেই সে হাঁ করে নিশ্বাস নিলে।

সে ঘরের বাইরে এসে দ্রুত হাঁটতে সুরু করলে। সে নিজেকে বললে হাঁপাতে হাঁপাতে, দূর দূর, ম্যাডাম জানে না পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটতে সব পুরুষের বুকই এমন আইঢাই করে, মুচড়ে মুচড়ে ওঠে, এই দেখো সে টর্চ আনতে ভুলেছে। নিজের কথা অত ভাবলে কাজের কথা কি মনে থাকে? আর তা ছাড়া জেন আর কারই বা বুকের তত কাছে গেছে, যে বুঝবে যে সকলের বুকই আইঢাই করে উড়ে যেতে চায় না? সে ভাবলে, নরবুর কথা হয়তো এই ডাকাতে স্মাগলাররা জানতো না। হয়তো বাজারে কোন কারণে প্রচণ্ড বাধা পেয়ে পালাতে গিয়ে, কিংবা সেখানে লুঠ শেষ করে ক্লুটলং-এর দিকে হামলা করতে এগিয়ে নরবুকে দেখেছে। আর হয়তো তার উপরে পুরনো রাগের জাল ঝাড়ছে। আর তা ছাড়া যদি দুই দল এসে থাকে, তবে তারা হয়তো ফোর্টের নিচে একত্র হয়ে পুরনো ফরেস্টকলোনি ধরে এগোবে ক্লুটলং-এর দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে দেখলে কুকুরটা সঙ্গে ছুটছে। দুর্গের টিলার নিচে, রেঞ্জারের বাংলোর কাছে কোথাও মোকাবেলা হবে। যারা রিজ দিয়ে গেল, তাদের লিম্বু আর সহিস আর থেনডুপ ঠেকিয়ে রাখুক। নেমে আসা ঘোড়ার দল আর ফোর্টের উপরে যারা, তারা একত্র হওয়ার আগে মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে।

ময়ূর তখন ভোর হওয়ার আগে অন্ধকারে দৌড়াচ্ছে। চেষ্টা করছে। সে ঠিকই চলেছে, নতুবা

কুকুরটা আপত্তি জানাতো। বাজারে আগুন দেখে থাকলে, দুর্গের টিলাতেও মশাল দেখেছে সে।

অন্ধকারে সে রকম ছুটতে গিয়ে ময়ূর একবার পড়ে গেল। সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। দেখলে দুর্গের টিলায় বেশ কয়েকটি মশাল। তা হলে এখনও খুব দেরি হয়ে যায় নি। টিলাটা থেকে নামার সিঁড়ির কাছে যে বড় পাথরগুলো উপর থেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে, তার আড়ালে পজিশন নিতে হবে। সে একা, আর ওরা ভাবছে মেয়রকে পাশ কাটিয়ে ক্লুটলং ধ্বংস করবে। কিন্তু কিছু ভেঙেছে? সে অনেক বৎসর পরে ভয় পেলে। হাঁ করে, নিঃশ্বাস নিতে নিতে সে অনুভব করলে কেউ যেন মুগুর দিয়ে তার বুকে মেরেছে। সে বারবারই এপাশ ওপাশ টলে যাচ্ছে সেই মারগুলো এড়াতে।

সে নিজেকে বললে, না, না, তাও কি হয়? কে কোথায় যে মারবে? কিন্তু তার পা দুখানা, যা একদিন এই পাহাড়ে, বুকের ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে, অন্ধকারের গলিতে গলিতে চড়াই উৎরাই ভেঙে ছুটেছে, তারা যেন বশে থাকবে না। আর এটাও কেমন, যে যা কিছু সে দেখছে, তা এদিকে ওদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে!

জোর করে সে আরও দু-এক পা এগোল।

কেমন সব দুলছে না সব কিছু? নিজের সঙ্গে ঝগড়া করা ভালো নয়, এই মনে করে সে বিড় বিড় করলে, ওইতো কুকুরটা ওই কালো অন্ধকার পাথরগুলোর কাছেই থেমেছে। আচ্ছা, এটুকু শুয়ে শুয়েই চলো! সে রাইফেল হাতে শুয়ে পড়ে নিজেকে সামনের দিকে টানতে চেষ্টা করলে।

কী আশ্চর্য, সে কি নিঃশ্বাস নিচ্ছে না? ঘুমিয়ে পড়ছে? জেন... ঘুমের ওষুধ, খুঁজতে হবে। সে বুকের ব্যথাটাকে মাটি থেকে বাঁচাতে বুকের তলায় বাঁ হাত রেখে, মাটিতে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল। কে যেন শেষ মুহূর্তে তার রগে প্রচণ্ড আঘাত করলে, আর সেজন্য তার ডান হাতের আঙুল শেষ সতর্ক আক্রমণে রাইফেলটাকে চেপে ধরতে চেষ্টা করলে। অনেক যুগ পরে মা গো এই ক্ষেদোক্তি করলে।

৮

ভোররাতে নানা রকমের শব্দে রেঞ্জারের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তার ঘরের জানালার কাচে আগুনের আলো ও চেহারা দেখে অনুমান করলে, তা বাজারে দিকে। সে বেশ কয়েকবার বন্দুকের শব্দ শুনলে। আগুন খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু বন্দুক কেন? ডাকাতি? শর্মা বা অসওয়ালদের টাকাও আছে, পণ্যও যা এই পাহাড়ের পক্ষে খুবই বেশি।

সে ঘর থেকে বেরোতে ভাবলে, সুচেতনার ঘুম ভেঙে থাকতে পারে। সুচেতনার ঘরের জানালা দিয়েই প্যাসেজে রাখা পেট্রলল্যাম্পের আলো তো সে ঘরের মধ্যে, দেখলে সুচেতনা বিছানায় উঠে বসেছে। এদিক ওদিক তাকানো দেখে মনে হয়, খুব ভয় পেয়েছে। রোজারও ঘুম ভেঙেছিল। তাকে ভীত বিবর্ণমুখে প্যাসেজে আসতে দেখে, রেঞ্জার বললে, সুচেতনার কাছে গিয়ে বসো।

শুনেছেন?

হ্যাঁ, সুচেতনাও খুব ভয় পাচ্ছে নিশ্চয়। ফ্লেয়ার। স্মল আর্মস।

রোজা সুচেতনার ঘরে যেতে না যেতে পাইন ডাক্তারও প্যাসেজে এল। সে শুকনো, হঠাৎ ঘুমভাঙা মুখে জিজ্ঞাসা করলে, কী, আগুন নাকি? রাইফেলের শব্দ নাকি? প্রভঞ্জন বললে, হ্যাঁ, বাঘের ডাকও। বুঝতে চেষ্টা করছি। আপনি রোগীদের চার্জ নিতে প্রস্তুত হয়ে আসুন। আমাকে

যদি বাইরে যেতে হয়!

পাইন ডাক্তারির পোশাকে প্রস্তুত হয়ে আসতে গেলে প্রভঞ্জনের মনে হল, মেয়র বুকের রোগী, তা ছাড়া রাইফেলটাও তার ঘরের কাবার্ডে। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে থাকা চলে না। সে স্থির মাথায় ভাবতে চেষ্টা করলে। তার মনে হল, ব্রিজের উপরে দাঁড়ালে সব দিকেই অনেকটা দেখা যায়। মেয়র অভ্যাস বশে সেখানে যায় নি তো? কী বিপদ তার ঘরের বাইরে যাওয়া! সে ঘর থেকে টর্চ এনে ব্রিজের কাছে গেল দৌড়ে। ঘরে তবু বাতির আলোতে অনেকটা দেখা যায়, এখানে ভোররাতের কুয়াশায় অন্ধকারে টর্চের আলো কয়েক ফুটমাত্র যায়। মেয়র ব্রিজে নেই। প্রভঞ্জনও এই সময়ে প্রবল শীতে অন্ধকারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় জড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবার রাইফেলের শব্দ তাকে সচকিত করলে, সে লক্ষ্য করলে তার পরনে ড্রেসিং গাউন, আর সে নিরস্ত্র। সে দেখলে, বাজারের উপরের আগুনটা এখনও নেবে নি, কমেছে, দুর্গের টিলায় মশাল যেন বিৎ বিৎ করছে। ওখানে মশাল কেন? সে নিজের ঘরে গিয়ে ড্রেসিং গাউনের কোমরে রিভলবার বেল্ট আঁটলে, মোজা ও শু পরে, গ্রেটকোট চাপালে গায়ে। টর্চ হাতে সে ক্লিপ খুঁজতে মেয়রের ঘরে ঢুকলে।

বিছানার নিচে চাদর লুটাচ্ছে। আলনার সামনে বুটজোড়া আছে, স্যান্ডাল নেই। আলনায় জ্যাকেট, ট্রাউজার্স নেই। হাটখোলা কাবার্ডে গ্রেটকোট আর গানর্যাকে রাইফেলটা নেই।

শরীরের অবস্থা যাই হোক, মেয়র রাইফেল হাতে বেরিয়ে গিয়েছে, সন্দেহ নেই। সে আবার ব্রিজ পর্যন্ত গেল। আবার বাজারের দিকে নিবন্ত আগুনের আভা দেখলে। সেদিক থেকে মুখ ঘুরাতে গিয়ে দেখলে, দুর্গের টিলায় মিটমিটে আলো, কুয়াশার ফলে যা বিন্দু বিন্দু গ্লোব। কিন্তু যার বিছানায় উঠে বসা নিষেধ, সে কোথায় গেল? বাজারের অথবা দুর্গের দিকে? অথবা ফরেস্টকলোনি দিয়ে ক্লুটলং-এর দিকে? দুর্গের উপরে দুমিনিট ধরে স্মল আর্মসের একত্র শব্দ আবার। আবার দূরে বাঘ ডেকে উঠল। বাঘও ভয় পাচ্ছে নাকি?

মেয়র কি কোথাও অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে? তার রোগের অবস্থায় সেটা স্বাভাবিক হবে। বেশি দূরে যেতে পারবে কি?

এদিকে কিন্তু এদের স্মাগলার হওয়া সম্ভব, ডাকাতদলও হতে পারে। তা হলে খুবই বড় দল। হয়তো ইলেকট্রিকসিটি নিবে যাওয়ার, ফরেস্টকলোনি চলে যাওয়ার সংবাদ রাখে, বাজারের দোকানদারদের, বরিজানের মতো কনট্রাকটারদের যথাসর্বস্ব এক রাতে লুঠ করে নিতে এত ভারি দলে এসেছে। বাংলো ছেড়ে গেলে সুচেতনা, রোজা ওদের অসহায় রেখে যাওয়া হয়। ওদের রাইফেল বা শটগানের বিরুদ্ধে রিভলভার নিয়ে এগোনও বুদ্ধিমানের কাজ হয় কি? বিশেষ যখন ভোররাতের অন্ধকারে নামা এই কুয়াশায় দশ হাত দেখা যায় না, টর্চের আলো তেমন দশ হাত গিয়েই কুয়াশার দেয়ালে আটকে যায়।

প্রভঞ্জন ব্রিজ থেকে ফিরে বাংলোর বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। শীতে পাদুটোকে গরম রাখতেই যেন, বারান্দার উপরে ঠুকতে লাগল।

কুয়াশার রং কালো থেকে নীলাভ হতেই, ভোর রাতের আলো ফুটবে মনে হতেই, সে আবার ব্রিজে গিয়ে দাঁড়াল। ঘণ্টা দু-এক হয়ে যাচ্ছে তার ঘুম ভাঙার পর।

সে নিজেকে যুক্তি দিলে, বাজারের দিকে চড়াই হাটের রোগী স্বভাবত এড়াতে চাইবে ; ফোর্টের দিকের রাস্তা যা পুরনো কালোনি হয়ে, রেঞ্জার-বাংলোর পাশ দিয়ে, খেলার মাঠের সমতল হয়ে, পরে গ্রেগ অ্যাভেন্যু ধরে ক্লুটলং যায়, মেয়রের শরীরের অবস্থায় এই সহজ উৎরাইএর পথটার দিকে ঝোঁক হবে তার। সে একবার ভাবলে, ক্লুটলং-এ যদি এই শব্দ শোনা গিয়ে থাকে, তবে গ্রেগ অ্যাভেন্যু, দুপাশে যার জঙ্গল, সে রকম অন্ধকারে মেয়রের জন্য ব্যস্ত হয়ে জেন যদি আসতে থাকে, সেও বিপদের। ডাকাতদের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি।

ওদিকে পুরনো ফরেস্টকলোনি, দুর্গের টিলার পথ এসব তার এত পরিচিত, আক্রমণকারীরা যা পারবে না, তেমন আন্দাজ আন্দাজে কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে সে চলতে পারবে।

সুতরাং সে ব্রিজ থেকে নেমে ফরেস্টকলোনির পথ ধরলে।

সে রকম কিছুক্ষণ যাওয়ার পরেই আন্দাজে যখন সে গ্রেগ অ্যাভেন্যুর দিকে মুখ করে খেলার মাঠের সমতলে, পথের উপরে একেবারে সামনে কালো কিছু দেখে টর্চ জ্বালতেই একটা ছোট গুঁতো খেয়ে দেখলে, পেটা টিন আর কাঠে তৈরি বিশেষ চেহারার একটা বাক্স। যার কিছু ভেঙেছে, যার গায়ে কিছু মৌমাছি। টর্চের আলো পড়ায় তারা যেন ক্রুদ্ধ, গুঞ্জন করছে। কিছু মৃত মৌমাছি মাটিতে। সে ভাবলে একে মৌচাকের বাক্স বলে নাকি? গোলমালের সঙ্গে এই বাক্সের কী যোগ? এখানে কে আনলে এটাকে?

কিন্তু তাকে ভাবতে হল না। ফোর্টের উপরে আবার একটা ফ্লেয়ারগান ছোড়া হল। দিনের মতো আলো দেখা দিল। আর সেই আলোতে রেঞ্জার দেখলে ফোর্টের উপরে অনেক মানুষ। ফোর্টের নিচে অনেক মিউল, তার উপরে আরোহী, আর তাদের প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল। দুমিনিটে আলোটা নিবে গেল। রেঞ্জার নিজের পুরনো বাংলো দেখে নিয়েছিল। আলো নিবতেই তাড়াতাড়ি সে দিকে গেল। তার নিশ্চিত ধারণা হল, ফোর্টে যখন অত মানুষ মেয়রও তার কাছাকাছি হবে। একবার ভোররাতে মেয়রকে না বলে শিকার করতে ফোর্টে উঠে মেয়রের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল।

রেঞ্জার স্থির করলে, এই ব্যাপারে এখন তাড়াতাড়ি কিছু করা যাবে না। আর একটু আলো ফুটুক। সে তার পুরনো বাংলোর বারান্দায় উঠে দাঁড়াল।

নিচে যখন অন্ধকার, উপরে তখন আলো এসে যায়। ফোর্টের উপরে তখন সূর্যের লাল আলো আসতে শুরু করেছে। তখন ব্যাগপাইপাররা উঠে দাঁড়াল। ব্যাগপাইপের ক্রিল শোনা গেল। সে জন্য তাদের থেকে কয়েক পা হেঁটে দূরে গিয়ে কর্নেল হার্দিকার ভিএসএম তার ওয়াকি টকিতে ইংরেজিতে কথা বললে, মেজর চিবস, বাজার, হ্যালো হ্যালো চিবস। ফোর্ট বলছে। খবর বলো। ওভার। বাজার অঞ্চল থেকে মেজর চিবস বললে, চারজন মৃত, ছজন অ্যারেস্টেড। বাজারের দোকানদার গুলি চালিয়েছিল, ডাকাতরাও, আগুন আমাদের লোকেরা নিবিয়েছে। আমরা বেশির ভাগ ফায়ার করেছি আকাশের দিকে। দুটো এলএমজি পাঁচ মিনিট করে চালানো হয়েছিল বাজারের পূবে খাদের দিকে জঙ্গলে। শুধু ভয় দেখাতে।

কর্নেল হার্দিকার মাঝবয়েসী। ফরসা রং, গোঁফটা কর্নেলের উপযুক্ত, মুখটা ভরাট। তাতে লাল সূর্যের আলো পড়ে বেশ লাল দেখাচ্ছে। তার এরকম ভঙ্গি, সে একটা টার্গেটেড কর্তব্য ভালোভাবে সম্পাদন করেছে।

হার্দিকার বললে, চিবস, ডেডবডিতে হাত দিও না। জাকিগঞ্জ পুলিশ আউটপোস্টে খবর দিতে পারো কিনা চেষ্টা করো। আউটপোস্টে ওয়ারলেসের অ্যান্টেনা দেখেছিলাম। পুলিশ এসে দেখুক, যারা মরেছে তার দোকানদারদের শটগানে কিংবা আমাদের গুলিতে। বেচারারা!

মেজর চিবস বললে, বাকি ডাকাতরা পাহাড়ের অলিগলি দিয়ে পালিয়েছে। তারা নিশ্চয় ভগবানের ভয় পেয়েছে।

হার্দিকার বললে, তবে আর কী, তোমার মিউলদের গোটা পঞ্চাশ এদের খেলার মাঠে ঢুকেছে। এবার বাকিগুলো নিয়ে তুমি পিচের পথ দিয়ে নেমে এসো। এক লেফটেনেন্টের পাহারায় বন্দীদের আর ডেডবডিগুলো রেখে এসো। এখানে মেডিক্যাল ইউনিটের কাজ শেষ। তিনটি ক্যাজুয়ালটি। সবই পড়ে গিয়ে চোট পাওয়া। দেখতে পাচ্ছি, কুক আর তার পার্টি চায়ের জল চাপিয়েছে। বোধহয় আনিয়ান সুপ দেবে চাপাটির সঙ্গে।

মেজর বললে, থ্যাঙ্ক ইউ সাব। গরম সুপ এই শীতে সকলেই প্রেফার করবে।

হার্দিকার বললে, দোকানদারদের অ্যাশিওর করে খেলার কাঠে চলে এসো। ভোর।

হার্দিকার হাসিহাসি মুখে ফোর্টের টিলার ধারের দিকে চলে এল, অনুমান হল, সে খেলার মাঠের দিকে নামবে। তার ইউনিফর্মে, তারায়, অশোকস্তম্ভে সূর্যের প্রথম আলো ঝিকমিক করতে শুরু করল।

রেঞ্জার তার বাংলোর বারান্দার কোণে এসে ফোর্টের দিকে চেয়েছিল। সেখানে ভোরের আলো ফুটছে, লোকজন দেখা যাচ্ছে। অনুমান হয়, ব্যাগপাইপ বাজছে। বাংলোর বারান্দায় তার তার চারপাশেই তখনও অন্ধকার। আর পাহাড়ে যেমন হয়, কুয়াশা কাটতে কাটতে আর এক জোয়ার কুয়াশা এসে যাচ্ছে। সে তো অনুমান করেইছিল, মেয়র এদিকেই আছে আর তা ওই টিলার কাছাকাছি হবে। ফ্লেয়ারে সে নিশ্চয় টিলায় মানুষজনের জটলা দেখেছে। টিলার উপরে সূর্যের আলো ফুটতেই রেঞ্জার সেদিকে মুখ করে অগ্রসর হল। তার তখনও মেয়রকে খুঁজে বার করা হয় নি। দ্বিতীয়ত এরা যারাই হোক, রেঞ্জার হিসাবে নিশ্চয়ই এনক্রোচার বলে সেই তাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এটা খুবই অবিশ্বাস্য যে ডাকাতদল এমনকি চম্বলেও এত বেপরোয়া হয়!

তাকে এখন আর টর্চ জ্বালতে হচ্ছে না বটে, কিন্তু অনেকটা দূর পর্যন্ত এখনও দেখা যাচ্ছে না। তার অনুমান মতো মেয়র যদি এদিকেই এসে থাকে, টিলার মানুষগুলো আর খেলার মাঠের মিউলগুলোর মাঝখানে পড়ে তাদের একত্র হতে বাধা দিতে, তা হলে তাকে তো এখানেই দেখতে পাওয়া উচিত। তখন সে মনে করলে, তা হয় না। সে যদি এখানেই এসে থাকে, তবে কভার নেবে, আড়াল নেবে। সুতরাং সে টিলায় উঠবার সিঁড়ি উদ্দিষ্ট করে চলতে চলতে টিলার গোড়ায় যে ঝোপঝাড়, ছোট বড় পাথরের চাঁই সেদিকে চোখ রেখে রেখে খুঁজতে থাকল।

সে কিছু দূর গিয়েই দেখতে পেলে, একবার টিলার দিকে চোখ তুলতেই, সেই ভোরের ঠাণ্ডা কুয়াশায় জড়ানো খুব কচি ধরনের আলোতে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা একজন যেন তাকে লক্ষ্য করতে করতে বেশ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছে। তা হোক। ঝোপঝাড় এত ঘন নয় যে তাতে একজন মানুষ অনেকক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারে। তার বরং এরকম সন্দেহ হল, সিঁড়ির ডানদিকে, গত বর্ষায় ফোর্টের টিলার প্যারাপেট ধ্বসে পড়ায় টিলার সে দিকের গোড়ার কাছে যে বড় চাঁই চাঁই পাথর, তার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকবে মেয়র। ওখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শিশির কুয়াশা ইত্যাদি থাকবে।

রেঞ্জারকে চলতে চলতে, সুতরাং, দুদিকে চোখ রাখতে হল।

কিন্তু সে, পাথরের সেই ভেঙে পড়া চাঁইগুলো যা একটা কভার হতে পারেই, সেদিকে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির গোড়ায় এসে পড়তেই, টিলা থেকে যে নামছিল, সেও বেশ তাড়াতাড়ি শেষ কয়েকটি অসমতল পাথরের ধাপ নেমে এল। তখন তাকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। রেঞ্জার তার চেহারা, পোশাক, তারা, অশোকস্তম্ভ ইত্যাদি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হল এবং বুঝতে পারলে, ডাকাত সম্ভবত এরকম হয় না। সম্ভবত আগন্তুক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে পাথরের চাঁইগুলোর দিকে যেতে যেতেই এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। ততক্ষণে আগন্তুক তার দুএক হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। সেই বললে, আমি কর্নেল হার্দিকার, আপনি? রেঞ্জার বললে, সে এই রেঞ্জের রেঞ্জার।

গুড মর্নিং গুড মর্নিং. আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাইছিলাম।

গুডমর্নিং একটু পরে। রেঞ্জার এই বলে পাথরের সেই চাঁইগুলোর দিকে অগ্রসর হল।

কিন্তু কর্নেল হার্দিকার তার সঙ্গে চলতে লাগল। কথাও বলে চলল। কর্নেল বোধ হয় সেরকম একজন অফিসার যে কর্মদক্ষ, সাহসী, নতুবা ভিএসএম পায় না, কিন্তু একটু বেশি কথা বলে, খানিকটা জোক করতে চায়, আর তা সম্ভবত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নিজের আর কাছের অফিসারদের

নার্ভগুলোকে সুস্থিত রাখতে।

সে বললে, কালই ডিএফওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, আপনি এখানে। আপনি শুনে থাকবেন, তাসিলার ফোর্ট অঞ্চল অর্থাৎ টিলা, পুরনো ফরেস্ট কলোনি, খেলাব মাঠ এই সব অঞ্চল ১লা জানুয়ারি থেকে আর্মি টেকওভার করছে। চিঠি পান নি? কনজারভেটর আর ডিএফওব কনসেন্ট আমার কাছে আছে, দেখাবো। এখানে মিউল ট্রেনিং সেন্টার হবে, আর মাউন্টেন ডিভিশনের রিক্রুটদের হিলক্লাইম্বিং ট্রেনিং সেন্টারও।

কিন্তু সেই মুহূর্তে রেঞ্জারের অনুমান সত্য প্রমাণিত হল। সে একটা কালো কুকুরকে পাথরগুলোর মধ্যে নড়াচড়া করে আবার যেন আড়ালে যেতে দেখলে। ওটা মেয়রের কুকুর সন্দেহ নেই। সে তাড়াতাড়ি সে দিকে চলল। দু এক পা যেতেই তার বুক মুচড়ে উঠল। দুই পাথরের মাঝের ফাঁকে শিশির ভেজা মাটিতে ছড়ানো গ্রেট কোটের অনেকটা, আর সেই কালো কুকুরটাও সেই মাত্র তার পাশে শুয়ে পড়ল কুণ্ডলী করে। সামনের বড় পাথরটা ঘুরতেই সে দেখতে পেলে, বাড়ানো ডান হাত তখনও রাইফেলে, কুকুরটার পাশেই মেয়রও যেন মাটিতে মুখ রেখে ঘুমাচ্ছে। ছড়ানো পায়জামা-স্যান্ডাল পরা পায়ের ভঙ্গি, বুকের নিচে ভাঁজ হয়ে থাকা বাঁ হাত রাখার ভঙ্গি খুব খারাপ মনে হল তার।

হার্দিকার পাশ থেকে বললে, নর্ম্যালি সকালবেলা এ রকম সময়ে পৌঁছেই আপনার সঙ্গে ফর্ম্যাল আলাপ করার কথা। ডিএফও বলেছেন, এক নম্বর বাংলো এখনই দেয়া যাবে না। দু নম্বর অর্থাৎ আপনার এখানকার বাংলো খালি, সেটাকেই আমার অফিস আর কোয়ার্টারের জন্য নিতে পারি। খেলার মাঠে আপাতত টেন্ট বসবে। পরে টিলার উপরে আব পুরনো ফরেস্টকলোনি বরাবব ক্যান্টনমেন্ট কনস্ট্রাকশন হবে।

রেঞ্জার সেই গ্রেট কোটপরা হাতে রাইফেল ধরা ভূশায়িত তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হার্দিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

কর্নেলও সেই মুহূর্তে মাটির দিকে লক্ষ্য করল। বললে, সরি। অ্যান অ্যাকসিডেন্ট, ডু ইউ সে। সে তৎক্ষণাৎ তার ওয়াকিটকিতে কথা বললে, ক্যাপটেন রশিদ, সেন্ড সার্জন উইথ হিজ টিম ডাউন হিয়ার।

সে নিজেই মেয়রের রাইফেল ধরা ডানহাত স্পর্শ করলে। বললে, কোল্ড অ্যান্ড স্টিফ, মাস্ট হ্যাভ বিন ডেড ফর অ্যান আওয়ার অর টু।

ডেড? রেঞ্জার চাপা আর্তস্বরে বললে, যেন তখনই তার অবশিষ্ট নিবু নিবু আশাটা নিবে গেল।

সে তার মাথার ফেল্টহ্যাট খুলে ফেললে। আওয়ার মেয়র। ডেড? আর ইউ শ্যুয়োর?

সে তার চোখের কোণগুলোকে শক্ত করতে চেষ্টা পেলে।

কর্নেল বললে, মেয়র? ওযেল আই নেভার... ওঅজ দেয়ার আ মেযর ইন তাসিলা?

জাস্ট লেন্ড মি আ হ্যান্ড।

সে এবং রেঞ্জার মেয়রের শরীরটাকে চিৎ করে শোয়ালে মাটিতেই। মুখ দেখেও আর আশা করার কিছু থাকে না। নীল হয়ে উঠেছে কয়েকদিনের বাসি দাড়ি সত্ত্বেও সেই সুন্দর মুখ। চোখদুটো বন্ধ, নীল ঠোঁটদুটোর কষে শুকনো রক্ত, যেন শেষবার হাঁ করেছিল বলে আর বন্ধ করার সময় পায় নি। বুকখোলা গ্রেটকোট। সে জন্য গলায় একছড়া মোটা লকেটযুক্ত সোনার হার দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল হার্দিকরের মনে হল, ফরেস্টগার্ডের পোশাকে এই মানুষটির গলায় ওই হারই কি মেযরের অফিস-ব্যাজ? ওয়েল আই নেভার...

কুকুরটা জেগে উঠল। তার সেই ভারিগলার ডাকেও যেন কান্নাব ভার এসে গেল। যেন কেউ অকারণে তাকে মেরেছে, এমন নালিশ।

কর্নেল ইংরেজিতে বললে, ঘণ্টা দুয়েকও হতে পারে। কোথাও কিছু আঘাতের চিহ্ন নেই। হাঁটুর কাছে দেখুন। শেষের দিকটা যেন ক্রল করে এগিয়েছেন। একটা হাত রাইফেলে এখনও। হেভি এনিমি শেলিং হতে থাকলে আমরা যেমন করি। হ্যাঁ, মাথাটায়, এই রগে, আঘাতও লেগে থাকবে। সামান্য রক্ত জমে আছে। হাউ ইজিলি উই ডাই।

সে তার কর্নেলের ক্যাপ খুলে ফেললে।

দেখা যাচ্ছে টিলার উপর থেকে দলবেঁধে কারা নামছে।

হার্দিকার বললে, তারা কিছুদিন থেকে এখানে আসবে আসবে করছিল। এখন এসেই পড়েছি। আগেও তাসিলা ক্যান্টনমেন্ট ছিল। এখনও সে রকমই হয়ে উঠবে আবার, এই ট্রেনিং সেন্টার।

প্রভঞ্জনের মন আবার যেন স্থবির হয়ে গেল। সে সেই লাল ঝোপড়াগোঁফ, লাল ভ্রু, আরও বেশি লাল মুখের কর্নেলকে দেখতে লাগল। তার কথা শুনে যেতে লাগল।

কর্নেল হার্দিকার তার উর্দুমিশানো ইংরেজিতে বললে, আজ পয়লা জানুয়ারি। নববর্ষ নয়? নববর্ষের সকাল এই পুরনো ফোর্টের টিলায় উদযাপন করতে কাল সন্ধ্যা থেকেই আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কাল রাত বারোটায় এদিকে পৌঁছে একটু অ্যাসল্ট অ্যাসল্ট খেলেছিলাম, অর্থাৎ তাসিলাকে অ্যাসল্ট করে ফোর্টটাকে দখল করার খেলা রাতের অন্ধকারে। মিউল ট্রেন লাইট মাউন্টেন গান ইত্যাদি নিয়ে মেইন কলম উঠছিল বিরিক ব্লক থেকে চলতি পথ ধরে বাজার লক্ষ্য করে। একদল ডাকাত এসে পড়ে লেন্ট সাবস্ট্যান্স টু দি অ্যাটাক। আসলে ওটা ছিল ডাইভার্সনারি ট্যাকটিকস যাতে মেজর চিবস ওস্তাদ। বিরিক ব্লকের কিছু উপর থেকে আলুবখরা রোড নামে অব্যবহৃত অর্ধেক ধ্বসে যাওয়া যে পুরনো পথ, সেই পথেই কয়েকটি মাত্র মশালের আলোয় ফোর্টটাকে অ্যাসল্ট করতে উঠছিল আমার ইনফ্যান্ট্রি। ট্রুপস ভালো চড়েছে। রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে ক্লাইম করেছে। চারটে ক্যাজুয়ালটি। হাত পা ভাঙার কেস তিন, একজনের ক্ল্যাভিকালে চোট।

রেঞ্জার এতক্ষণে যেন কথা বলতে পারলে, তা হলে ততক্ষণ ততবার শুটিং কেন বাজারের দিকে আর টিলাতেও?

হার্দিকার হাসিমুখে বললে, একটা অ্যাসল্ট হচ্ছে, ফোর্ট জিতে নেয়া হচ্ছে, অথচ শুটিং নেই, ফ্লেয়ারিং নেই তা কি করে হয়? বাজারে পৌঁছে শুটিং করেও তারা জানাচ্ছিল, বাজারে পৌঁছেছে, টিলায় ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে জানানো হচ্ছিল, ফোর্ট দখল হচ্ছে। ওদিকের খবরও মন্দ নয়। বেশ কৌতুকের। এক ব্যানডিট দল বাজারের দোকানদারদের লুঠ করতে এসেছিল। আগুন লাগিয়েছিল। ওয়াকিতে খবর পেয়ে ব্যানডিটদের দোকানদারদের আর আমাদের ক্রসফায়ারের মধ্যে আনতে বলেছিলাম। ব্যানডিট আর দোকানদারদের মধ্যে গুলি বিনিময় হচ্ছিল। আমাদের ট্রুপস কাছে পৌঁছালে তাদের লাইট মেশিনগান আর রাইফেলের শব্দে ব্যানডিট দল ডিসপার্স করে। সে সময়ে তারা নাকি বলছিল, পুলিশ নয়, মেজরের লোক। তারা, বাই এনি চান্স, মেয়রের ফোর্স মনে করেছিল? তারা বলছিল, মেজর অসুস্থ, এই সংবাদটা মিথ্যা। তারা, আমার মেজর চিবসকে জানবে কি করে? তারা কি আপনাদের মেয়রের কথা বলছিল, মনে করেন?

এরই মধ্যে ক্যাপটেন পদপ্রাপ্ত সেই ডাক্তার তার মেডিক্যাল টিম, স্ট্রেচার, স্ট্রেচার বেয়ারারদের নিয়ে নেমে এসেছিল। তাদের পক্ষে তখনও হয়তো ১লা জানুয়ারিতে দুর্গ দখলের খেলাই চলছে, তাসিলা তাদের কাছে ওয়ারজোনই সম্ভবত। স্ট্রেচার বেয়ারারদের পিঠেও রাইফেল, ডাক্তারের কোমরে সার্ভিস পিস্তল। ডাক্তার মেয়রকে তা সত্ত্বেও পরীক্ষা করলে। স্ট্রেচারে শোয়ালে। উঠে দাঁড়িয়ে তার মত দিলে।

সে জিজ্ঞাসা করলে, এ কেসটি এখানে এরকম কেন?

হার্দিকার বললে, ইনি এখানকার মেয়র।

প্রভঞ্জন বললে, এর সাতদিন আগে স্ট্রোক হয়েছিল। শয্যায় ছিল। আপনাদের মিউলগুলোকে বাজার থেকে কিছু কিছু নামতে দেখে আর টিলাতেও আপনাদের ফ্লেয়ারিং আর স্মলআর্মস ফায়ার শুনে থাকবে। বোধহয় ভেবেছিল, আক্রমণকারীদের দুটো মুখ যেখানে এক হতে পারে সেখানেই কভার নিয়ে আক্রমণ করা দরকার।

ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে এঁর ফোর্স?

কেমন এক অদ্ভুত ধরনের মনোভাব হচ্ছিল প্রভঞ্জনের। তা কি হাসির কাছাকাছি? সে বললে, আমাদের মেয়রের ওয়ানম্যান আর্মি।

ক্যাপটেন ডাক্তার বললে, সাবাস! থার্মপলি নাকি?

কর্নেল মানুষটির চেহারাই যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট, তার উপরে তার টাকমাথা, লাল চুল, লাল বুনো গোঁফ, লাল ভ্রূ, আরও তার চাইতেও বেশী লাল মুখ দেখলে মনে হয়, সে সব সময়েই মহাখুশিতে আছে। হয়তো এরকম খুশি মনেই এনিমির ফায়ার পাওয়ারের মুখোমুখি হয়। রেঞ্জার ভাবলে আর পয়লা জানুয়ারির সকালের শীতে সফল একটা প্ল্যানিং শেষ করে হয়তোবা এখন রামই তাকে মুখর করেছে। কারো কারো আধবোতল রামেও পা টলে না।

স্ট্রেচারে মেয়রের শরীর এখন কম্বলে ঢাকা। এখন তো সকালের আলোও বেশ স্পষ্ট। কিছুটা দূরের বিষয়ও বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। কুকুর কি বোঝে? অথবা তত মানুষ দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে, প্রভঞ্জন দেখলে, মধুর বাক্সটার কাছে বসে, রাতে চাঁদ দেখে যেমন, আকাশের দিক মুখ করে কাঁদছে। কর্নেল বললে, বেশ সুন্দর আর ইয়ং ছিলেন আপনাদের ইনি। তাসিলা এত ছোট শহর– ওয়েল আই নেভার... মেয়র বলছেন? কোথায় নেবেন এখন?

রেঞ্জার বললে, এক নম্বর বাংলো।

কর্নেল স্ট্রেচার বেয়ারারদের অর্ডার দিলে। তারা স্ট্রেচার তুলে নিলে। মেডিক্যাল টিমের সৈনারা লক্ষ্য করেছিল, কর্নেলের মাথায় ক্যাপ নেই। স্ট্রেচারের পাশে চলতে চলতে তারা রাইফেল পিঠ থেকে হাতে নিয়ে উলটে নিলে। কর্নেল মেয়রের রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটিকেও উলটে ধরে সঙ্গে চলল।

রেঞ্জার বাঁ হাতের তেলোয় ঠোঁট আর চিবুক ঢেকে চলেছিল। নিজের মনের সঙ্গে নানা যুদ্ধে জিতে আর একটা যুদ্ধের দিকে সে সাহস নিয়ে এগোচ্ছিল, তা সত্ত্বেও তার মনে হচ্ছে যে তার কেউই নেই ; প্রকৃতপক্ষে এক ছায়া ছায়া মানুষ, তার জন্য কান্না উঠে আসছে এই এতগুলি বাইরের মানুষের সামনে। মেয়রকে নিয়ে তারা তখন এক নম্বর বাংলোর কাছে এসে পড়েছে, রেঞ্জার দেখলে ডাক্তার জেন এয়ার পনি থেকে নামছে। সে বুঝলে, যেন মেয়রের ঘুম ভাঙিয়ে নিজের হাতে ফিডিং কাপে করে মেয়রকে চা খাওয়াতে এসেছে। বুকের এমন অবস্থা, খাওয়ার পরিশ্রমে খারাপ হওয়ার শঙ্কা থাকে। তার মনে পড়ল রোজা বলেছে, এই ডাক্তার জেন আর মেয়র দুজনে মিলে ন্যাড়া ক্লুটলং পাহাড় ফুলে ফসলে ভরিয়ে তোলার বুদ্ধি করেছিল। মৌমাছি এলে নাকি সব হয়ে যাবে।

ঠোঁট-চিবুক ঢাকা হাতের উপর দিয়ে তার চোখের জল গড়াতে লাগল। চোখ কুঁচকে কে কবে সেই জলকে ঠেকাতে পারে!